শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

মাঘ, ১৮৮৩, ১৩৬৮ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র, এম, এ পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

17 FEB 1962

সাকি লো, সাজা ফুলে
নিবিড় এলো চুলে
চুনীর পানাধার
দে' লো দে' হাতে তুলে।

—ওমর খৈয়াম

নিবিড় ঘন কালো চুল সবার মন হরণ করে। বহুকাল ধ'রেই কেশচর্চায় অলিভ অয়েলের উপকারিতা স্বীকৃত। ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারলে আছে সেই অলিভ অয়েল। আজও মেয়েরা তাই কেশপরিচর্য্যায় ক্যান্থারল ব্যবহার করেন।

ক্যান্থারল

সুগন্ধিযুক্ত ক্যান্থারাইডিস কেশ তৈল

দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ কলিঃ-২৯

মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

(তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক)

কর্ম্মদক্ষতা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ব্যাঙ্কিং-এর যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

হেড অফিস :

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

শাখাসমূহ

মিশন রো (কলিকাতা)
উত্তর কলিকাতা
দক্ষিণ কলিকাতা

খড়্গপুর
কোচবিহার
আলিপুরদুয়ার

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি
শান্তশীল দাশ রচিত
গুণীজন প্রশংসিত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ

১। জীবনায়ন ২। পরিক্রমণ
৩। একটি প্রসন্ন স্বর
৪। তোমায় কী দিয়ে বরণ করি
(রবীন্দ্র অর্ঘ্য)

: প্রাপ্তিস্থান :
গ্রন্থ জগৎ
কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

উজ্জ্বলভারত

7563
.026/9

ফোন নম্বর : ৫১-২৫১০

(মাসিকপত্র, পঞ্চদশ বর্ষ)

বার্ষিক মূল্য ৫৲। প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ'মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার। বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আধার ৮"×৬"।

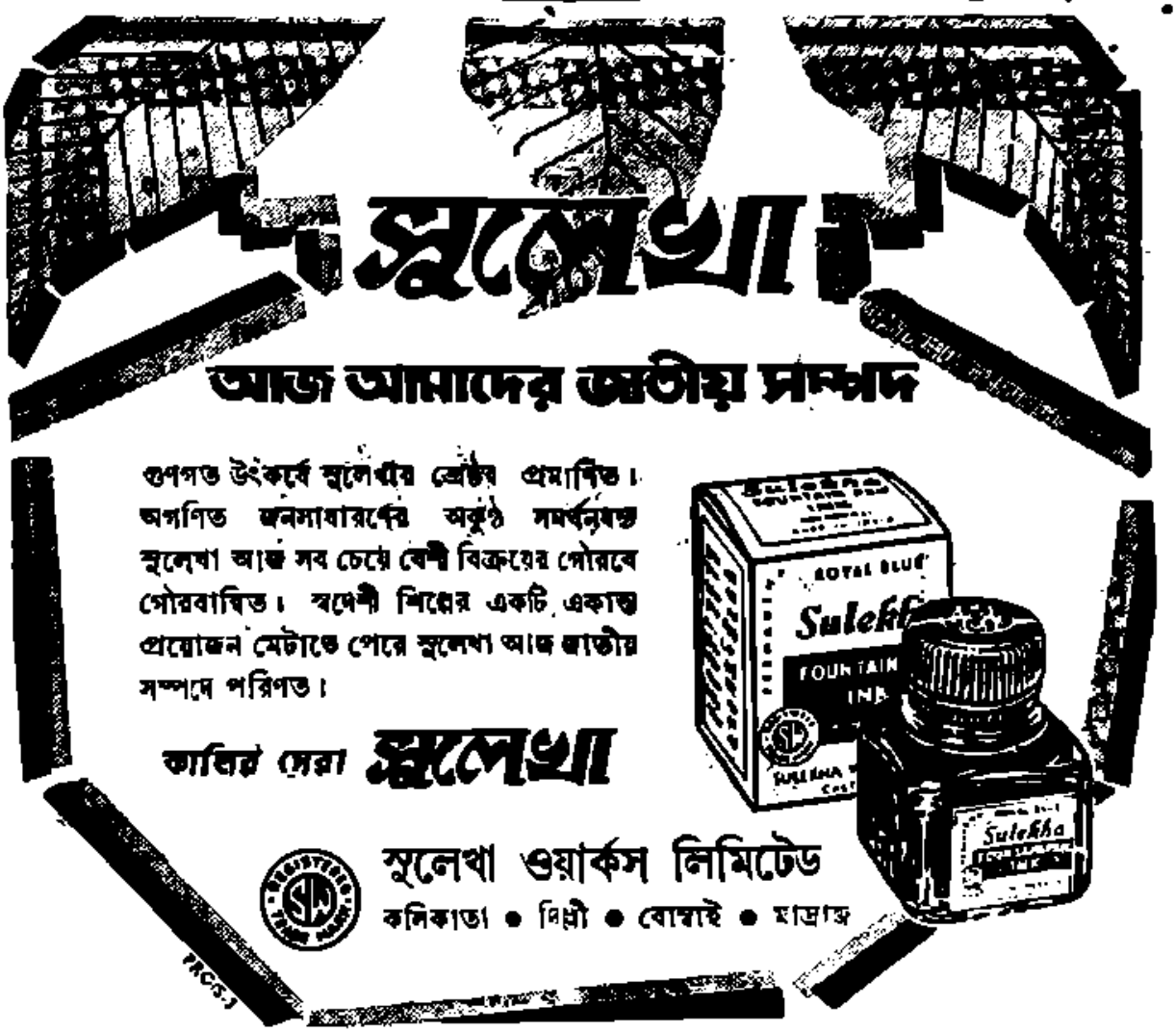

সূচীপত্র : মাঘ ১৩৬৮, ১৮৮৩ ১৩৬৮—৬৯

আমাদের কথা

২। শাক্ত শাহিত্ত দৈবিক পতাকা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৮)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫০)
(১২)

কন্নড শৈব সাহিত্য (২)
শ্রীবিরূপাক্ষ ভট্টাচার্য

অভিসার (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ

৭। পুণ্যভূমি অযোধ্যা
শ্রীবিভা সরকার

বন্ধুবরেষু
শ্রীগুপ্ত

সাময়িকী ২৩শে জানুয়ারী
২৬শে জানুয়ারী

নিয়মিত কুমারেশ সেবনে শিরার দুষ্ট ও সবল থাকে—দেহের রোগ প্রতিরোধের শক্তি বাড়ে, অজীর্ণ, অম্বুবা প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না। বিটখিটে মেজাজ, কাজে উৎসাহের অভাব, সহজে ক্লান্ত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না—

কুমারেশ

দি ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ অ্যাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

কুমারেশ হাউস, শালকিয়া : হাওড়া

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী
শ্রীকৃষ্ণ	৫·০০	ছাত্রদের কর্মবাণী
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	Sould of India Speaks

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাংলার ঋষি
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	রাজর্ষি রামমোহন
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	আচার্য জগদীশ
বাংলার বিদুষী	১·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
বাংলার মনীষী	১·২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ
জীবন গড়া	·৭৫	রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমীলিমা ঘোষ এম. এ, বিটি,

বিদ্যাসাগর	২·৫০	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ—সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

758.3
·09B/9

উজ্জীবনভারত

মাঘ, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

'উজ্জীবনভারত' পত্রিকার চৌদ্দ বৎসর শেষ হইল। একদিকে শ্রীনিত্যগোপালের আশীর্বাদ ও প্রেরণাতে পূর্ণচিত্ত হইয়া আর এক দিকে বিশ্বের সর্ব মানুষের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক একাত্মতা বোধহেতু শক্তিমান হইয়া কর্পর্দকহীন পুরুষোত্তমানন্দ চৌদ্দ বৎসর আগে একদিন 'উজ্জীবনভারত' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই 'উজ্জীবনভারত' কোথাও কণা না রাখিয়া চৌদ্দ বৎসর নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং আজও কর্পর্দকহীন হইয়াই আছে অথচ পথ চলিতেছে। যে প্রেরণা লইয়া চৌদ্দ বৎসর আগে পুরুষোত্তমানন্দ উজ্জীবনভারত প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই প্রেরণাকে আজ পনের বৎসরের যাত্রারম্ভ কালে আমরা স্মরণ করি। ব্যক্তিগত-ভাবে আমাদের, সমাজের, দেশের তথা বিশ্বের কোথাও আর চৌদ্দ বৎসর আগেকার সে আবেষ্টন আজ নাই—কিন্তু 'দ্রষ্টা' পুরুষোত্তমানন্দের দৃষ্টিতে চৌদ্দ বৎসর আগে কেন, বিয়াল্লিশ বৎসর আগে যে সত্তা আত্মপ্রকাশ করিবে বলিয়া ধরা পড়িয়াছিল, এই চৌদ্দ বৎসরে সেই সত্তা অধিকতর প্রস্ফুটিতই হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। যাহা পুরুষোত্তমানন্দের মত দুই চারিজন সেদিন দেখিতে পাইয়াছিলেন, আজ তাহা আপনার আমার মত সাধারণ মানুষও দেশের ভিতরের ও বাহির বিশ্বের ঘটনাবলী দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছে যে, পরস্পরবিরুদ্ধ ও পরস্পর পরিপূরক সত্তা লইয়া গঠিত 'মানুষের' জীবনে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কলা, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সকল দৃষ্টিভঙ্গি, সর্ব ক্ষেত্র, সর্ব মতবাদ এবং সর্বজাতি সমন্বিত হইতে পারে যে ব্যাপক গভীর জীবন-বোধের মধ্যে, যে মহামিলনের রাসের কল্পনায়, সেই জীবনবোধই, সেই মহারাসই বর্তমান বিশ্বের সাধ্য। এ কোন এক জাতির বা দেশের নয়—সমস্ত বিশ্বের সাধ্য আজ ঐ একটিই। তাই যে প্রেরণা ক্রমশঃ স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, তাহারই কথা পাইব শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের চৌদ্দ বৎসর আগেকার যাত্রারম্ভ দিনে। আমরা উহা এইখানে উপস্থিত করিলাম।

"আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না?

"এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার-সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, তোমার পণ কি?

"প্রত্যুত্তরে বলিল, পণ আমার জীবনসর্বস্ব।

"প্রতিশব্দ হইল, জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?

"তখন উত্তর হইল, ভক্তি!"

—আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র।

ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশকবলমুক্ত। এই মুক্ত ভারতকে মূর্ত করিয়া একটি উজ্জীবনভারত এবং তাহার অনুপ্রেরণায় একটি "এক জগৎ" (One World) গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সনাতন আর্য শাস্ত্রের প্রগতিশীল ও তেজস্বী ব্যাখ্যানসাহিত্য সৃষ্টি এবং তাহারই ভিত্তি-ভূমিতে বাস্তবের দেশে, সর্ববিধ সংগঠনক্ষেত্রে তাহার কর্মগত রূপের ও প্রয়োগ-কৌশলের সম্যক আবাহন

করাই এই উদ্বোধন পত্রের পরম প্রয়োজন। সাধনা তাহার আনন্দমঠের 'ভক্তি,' একমাত্র যাহা বুদ্ধি ও প্রেম ইত্যাদি পরস্পরবিরুদ্ধদিগকে পরস্পরের মাঝে গলাইয়া হজম করাইয়া এক সমগ্র জীবন্ত সত্তার সৃষ্টি করিতে পারে। একমাত্র ইহারই (ভক্তিরই) সৃজনী শক্তির যাদু-স্পর্শে সর্বক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রাম (Class war) পরিণত হইতে পারে শ্রেণী-সমন্বয়ে।

ভারতবর্ষ আজ সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক শেষ প্রশ্নের সম্মুখীন। তাহার প্রশ্ন আজ আর বিশেষ কোনও ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া নয়; তাহার প্রশ্ন সর্বতোমুখী। জটিল এই প্রশ্নসমূহের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে জাতির সর্বাঙ্গীণ জীবন্ত সৃষ্টির যাত্রাপথে অচলায়তন ভারতবর্ষের মূলতঃ স্থিতিপ্রধান কৃষ্টির পিছটান তাহার গতিরোধ করিবেই। ভারত আজ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে মো-টানার ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া। ব্রিটিশ আজ আর নাই; তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে রাজনৈতিক প্রেরণা সে এতদিন পাইয়াছে, সে রাজনীতি—তাহা আবেদন নিবেদন বা শান্তিপূর্ণ সহযোগই হউক, সশস্ত্র বিদ্রোহ বা অহিংস অসহযোগই হউক—আজ সর্বতোভাবে অচল। সে প্রেরণার কেন্দ্র আজ তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আর তো "হুইট ইণ্ডিয়া" খানি তাহার দেশ-প্রেমের প্রেরণা দান করিবে না। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, ব্রিটিশের রক্ত শোষণে যে আসুরশক্তি জাতির বুক চিরিয়া মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে শক্তির উৎসকে কোথায় আজ সে ধ্বস্ত করিবে? কোনও নূতন হাঁ-ধর্মী (positive), ব্যাপক ও গভীর দর্শন ও ভাবধারার শরণ না লইলে তো পুরাতনকে হজম করিয়া আগাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইবে না। কে তাহাকে এই নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন প্রেরণা যোগাইবে? ব্রিটিশ ভারতও নাই, আবার দার্শনিক যুগের ঋষিধর্মী, প্রজ্ঞাবাদী যে ভারত নেতিবাদের যুক্তিতে জগতের ও-পারে তাহার ইষ্ট লোকের ধ্যানে ব্যাপৃত ছিল, সে ভারতও নাই। কালপ্রবাহে তাহারই অন্তর হইতে উদ্ভূত প্রাণঘন বৌদ্ধ ধর্ম ও বহির্গত প্রাণের ধারার গতি ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যন্ত্রচালিতবৎ সামনের দিকে অনেকখানি সে আগাইয়া আসিয়াছে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই প্রাণস্পন্দন সমূহকে হজম করাইয়া ভারতীয় জীবনকে অনুপ্রাণিত ও পরিপূরিত করিবার জন্য নানক-কবীর-তুলসীদাস প্রভৃতি বীরভক্ত ও দার্শনিক সমাজ-সংগঠকগণ, বাংলার গৌরসুন্দর এবং বর্তমান যুগের দয়ানন্দ-রামমোহন প্রভৃতি পুরুষসিংহগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সমাজের একটা অংশকে সেই ধর্মে দীক্ষিতও করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজ-কাঠামোর যেমনতরকে দর্শন ও চিন্তাধারাকে জীবনের ছাঁচে ঢালিয়া না নেওয়ার ফলে তাঁহারা সনাতনকে ধাক্কা দিতে গিয়া নিজেরাই বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িলেন। সেই সনাতন সেই সনাতনই আবার রহিয়া গেল। ভারতবর্ষ কি আবার পিছনে ফিরিয়া অতীতকেই তীব্র বেগে আঁকড়াইয়া থাকিবে, না অতীতকে নিশ্চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া প্রাণ-ধর্মের উদাম স্রোতে একান্ত বর্তমানজনের পথ বহিয়া চলিবে? সে যে বহির্গত প্রাণধর্মীদের আকর্ষণে অনেকটা দূর আগিয়া পড়িয়াছে, পিছনে ফেরার পথ ও সুযোগ কি তাহার একটুকুও আর খোলা আছে? সামনে তাহাকে চলিতেই হইবে, অথচ সামনে চলিবার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান কিছুই তাহার জানা নাই। সর্বগ্রাসী একটা অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও অজ্ঞেয়তা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এমন কি কোনও ভারতবর্ষ আছে যেখানে পরস্পর-নিরপেক্ষ অথচ পরস্পরাপেক্ষ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মহামিলন সম্ভব, যেখানে স্থিতি ও গতির, প্রজ্ঞা ও প্রাণের সমন্বয় বাস্তব সৃষ্টিতে কার্যকারী? এমন মহান উদ্গত ভারত যদি থাকেই, তবে তাহার স্বরূপ কি, বিশ্বজগতের ক্ষেত্রে তাহার পরিধি কতদূর, কোন্ সাধনাতেই বা তাহার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হইতে পারে—সর্বপ্রথমে এই প্রশ্নেরই একটা স্পষ্ট সমাধান এই নবীন সৃষ্টির প্রাক্কালে খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা যেমন নিরাশিষ, সাহিত্য ক্ষেত্রে সে বিষয় অতোধিক ঘনীভূত। "বাজবে শিঙা

বাজ এই রবে"—"পরের পণ্যে পোরা সৈন্য আহার কেন বয়"—"তুল বীণ হতে পদপাশ এসে"—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"—ইত্যাদি গীতি কবিতার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। বেশ আজ মুক্ত। দেশপ্রেমের উদ্বোধনমন্ত্রে যে নীলদর্পণ, জাগাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী শিবাজদৌলা প্রভৃতি নাটকগুলি জাতীয় সত্তার নিংকালো রূপরূপে আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহারও পরিপূর্ণ সার্থকতা আজ মিলিয়াছে। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, কোন্ বাস্তব আদর্শকে বুকে লইয়া সাহিত্য আজ জাতি-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে? সাহিত্যের আদর্শ নিশ্চয়ই হইবে পরিচিতি; তাহাকে আজ অন্তরারূপের নেশা কাটাইয়া স্বরূপ-ব্যবস্থিতির পথ বাহিয়া চলিতে হইবে। জগতের ওপারে আদর্শলোক-স্থাপনেচ্ছু মত-বাদ সমূহ দ্বারা অনুবিদ্ধ ভারতবর্ষে বর্তমান সাহিত্যের কর্তব্য আরও গুরুতর, সাহিত্যিকে আজ নবযুগ সৃষ্টির পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে। "মনের দুতের বেগের বেটে"—"পক্ষীরাজের কাঁধে ব্রহ্ম পড়ে কাঁধে"—"চল মন নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে"—ইত্যাদি চোখের সামনে জাজ্বল্যমান রূপ-রস-গন্ধময় এই বাস্তব বিশ্বের প্রতি বিদ্বেষ-উৎপাদনকারী গানগুলি আর এই জাতিকে আবৃত্তি করিতে দেওয়া চলিতে পারে না। যাহার প্রত্যক্ষ বংশীনিনাদে বিশ্বের আকাশ, বাতাস, সর্বক্ষেত্র নিনাদিত ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারিবে, সেই বাঁশীর খোঁজ, সেই বংশীধারীর খোঁজ আজ আমরা কোথায় পাইব? ইহাই তো আজিকার প্রশ্ন।

আধ্যাত্মিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা দ্বিমুখে অবস্থান করিতেছি। ইহলোক-পরলোক, নরনারী উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনিক-শ্রমিক ও হিন্দুমুসলমানের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে সনাতন ভারতের স্থায়ী চিন্তাধারা এতদিন ঠিমাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারই সুযোগ লইয়া ইংরেজ এদেশকে পরশাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। উপনিষদের গভীর ও বিস্তৃত প্রার্থোপাসনাকে কার্যাত্মকরূপে সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োগ করিতে না পারার ফলে সমাজব্যবস্থায় যে ফাঁকি রহিয়াছিল, তাহারই সুযোগ লইয়াছিল তাহারই অন্তর্ধান দিয়া একান্ত প্রাণধর্মী বহিরাগতদের আক্রমণ সম্ভবপর হইয়াছে। প্রাণধর্মের সব জটিলতা কুটিলতা হইতে মুক্ত একটি নিখুঁত সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টাতেই সিঁড়িতন্ত্রের (ladder system) নিয়মানুযায়ী শূদ্রতন্ত্র, ব্রাহ্মণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও নিবৃত্তিপর কৃষ্টি আপনাআপনি গড়িয়া উঠিয়াছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে সেদিন ভারত শুধু নিজেকে গুটাইয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে, আত্মপ্রসারের কোন সাধনাই সে বরণ করিতে পারে নাই। বহিরাগত ব্রিটিশ শক্তি আজ তাহাকে যখন ইহকাল-সর্বস্ব করিয়া ফেলিয়াছে, নারীকে ঘরের কোণ হইতে টানিয়া আনিয়া বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে যাত্রার সাড় করাইয়াছে, শ্রেণিবর্ণের অন্তরে সুপ্ত আত্মসম্মান-বোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে, শ্রমিক-সঙ্ঘ রচনার মন্ত্র দিয়া ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের প্রবর্তন করিয়াছে, মুসলমানকে ধর্মসূত্রের নেশায় উন্মাদ বানাইয়া পাকিস্থান স্থাপনে প্রেরণা যোগাইয়াছে, তখনই ভারতবর্ষের চক্ষু মেলিয়া বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর মিলিয়াছে। সে অন্তরের অন্তরে বুঝিয়াছে যে, সে তো আর পূর্বের মত ঘর লইয়াই 'ঘর' সামলাইতে পারিবে না, তাহাকে বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। আজ কী তাহার আশ্রয় হইবে? ইহকাল না পরকাল? ঘর না বাহির? পর না আপন? সে যদি আজও ইহাদের সমন্বয় বিধানের জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, সব পরস্পর-বিরুদ্ধের রক্তাক্ত সংঘর্ষে তাহার অস্তিত্বই মুছিয়া যাইবে। বাহিরের মধ্যে ঘরকে এবং ঘরের মধ্যে বাহিরকে গলাইয়া দিয়াই আজ তাহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ভারতকে বিশ্বভারত হইয়াই উজ্জ্বল ভারতে গড়িয়া উঠিতে হইবে।

বিশ্ব জগৎ আমারে মিলিলে কে মোর আত্মপর
আমার বিধাতা আমাতে আসিলে কোথায় আমার ঘর?
—রবীন্দ্রনাথ

স্থিতি-গতি, প্রাণ-প্রজ্ঞা, ঘর-বাহির, আপন-পরের, এই কথার সব পরস্পরবিরুদ্ধ ও পরস্পরপরিপূরকদের পরিচিত মন আমাদেরই হইতেছেন সার্বিক বিশ্বরূপ ও ঐতিহাসিক

মানব শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই জগৎ জগতের বুকে আজও আকর্ষণীয়কের একটি পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র বিশ্বের দরবারে সর্বপ্রথম এঁকে রেখেছেন। তিনিই নিজেকে শ্রীমদ্ভাগবতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টি পুরুষোত্তম কৃষ্টি, উত্তম ভারতের কৃষ্টি। পুরুষোত্তম-কৃষ্টির মধ্যে মিলিয়াছে আর্য, অনার্য, বৌদ্ধ, ইসলাম এবং পাশ্চাত্য কৃষ্টির পরিণতি ঐ কমিউনিজম কৃষ্টিসমূহের সমন্বয়ের উপাদান; ইহাই ইতিহাসের বিবর্তনের ধারা বহিয়া আজ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বসভ্যতার ভিতর দিয়া বহিয়া উঠিতে চাহিতেছে: বাস্তবের ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই বলিয়াছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমিও সেই ভাবেই তাহাকে ভজনা করি। "কৃষ্ণ কেমন? যার কাছে যেমন।" প্রচলিত প্রত্যেকটি -ism দ্বারাই তাঁহার জীবন ও দর্শন ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

মানব কৃষ্ণই সর্বাঙ্গসুন্দরমূর্তি। যথা তদবিদঃ।

মন্মথোমন্মথনি নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।

ভাগবত ১০।৪৩।১৭

"মল্লদিগের দৃষ্টিকোণে যিনি অশনি, যিনি নর সমাজের কাছে নরবর, তিনিই স্ত্রীদের জীবনে মূর্তিমান কন্দর্প, গোপসমাজের স্বজনও তিনিই। যিনি অসৎ ক্ষিতি-পোষকদের শাসক, দেবকী-বসুদেবের যিনি কোলের শিশু, ভোজপতি কংসের যিনি সাক্ষাৎ যম, অবিদ্বানদের দৃষ্টিতে তিনিই বিরাটরূপে বিরাজমান, যোগিগণের পরতত্ত্ব চৈতন্যও তিনিই, তিনিই আবার বৃষ্ণি কুলের পর দেবতা। পরস্পরবিরুদ্ধ সর্বপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আরাধিত হইবার উপযোগী এমন একখানি সমগ্র জীবন লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ কাল-কলকে অঙ্গন কলরোলের সহিত আসিয়া দাঁড়াইলেন।" তাঁহার জীবনেই যৌগপদ্য বিরুদ্ধ রস ধারা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণই ভারতবর্ষের পরম আত্মা। বিশ্ববাসী সকলের সব "হওয়া"র পরিপূর্ণ সার্থকতা তিনি। মানব-কৃষ্ণের জীবনে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য শিল্প, ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গিগুলি স্ব স্বরূপের আস্বাদনে নব নবের যাজন করিয়াছে। এই ভরেই সম্ভব হইবে সর্বাঙ্গক্ষেত্রের, সর্বমতবাদের এবং সর্বজাতির মহামিলন, যাহার প্রেরণা বর্তমান যুগ অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিতেছে। জীবনের বাহিরে দাঁড়াইয়া বুদ্ধি কোনদিনই এই সর্বাঙ্গীণ মহামিলনের দ্বারা 'এক জগৎ' গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। একমাত্র আত্মভক্তি সাধনাই সে পথের নির্দেশ দান করিতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি দৃষ্টিকোণ একটী বস্তুর ব্যাখ্যাদান করিলেও যখন প্রত্যেকের একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইবে, তখনই প্রমাণিত হইবে যে, প্রতিটী ব্যাখ্যান সত্য বাস্তব। 'The difference between a true and a false philosophy is that a false philosophy fixes its eye on a part only of the materials submitted to it, and would explain the whole, therefore, by a principle which is adequate merely to one of its facts or spheres; a true philosophy on the other hand, is one which "sees life steadily and sees it whole"—whose principle, therefore, embraces in its evolution every phase of the actual.'—"The Idea of God"—Pringle Pattison. P. 109 "অবাস্তব দর্শনশাস্ত্র এবং সত্য বাস্তব দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অবাস্তব দর্শন তাহার নিকট উপস্থাপিত উপাদান সমূহের মধ্য হইতে কোনও বিশেষ একটীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, কাজেই এক একটী মূলনীতির অবলম্বনে সমগ্রের ব্যাখ্যা দান করে যাহা কেবলমাত্র একটী অংশ বা ক্ষেত্রের পক্ষেই উপযোগী; পক্ষান্তরে সত্য বাস্তব দর্শন এমনই একটী শাস্ত্র, যাহা সমগ্র জীবনকে স্থির-নিপুণ দৃষ্টিতে দেখে এবং সমগ্র হিসাবেই দেখে,

ব্যবহার মূলনীতি কাজে কাজেই ক্রমবিবর্তনের যাত্রাপথে বাস্তব বস্তুর প্রত্যেকটী দিককেই আলিঙ্গন করে।"

সত্য বাস্তব দর্শনে কোনও দৃষ্টিকোণই একান্ত মুখ্য বা গৌণ, একান্ত আদি বা অন্ত নয়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া যে সিদ্ধান্তের খোঁজ মিলিবে, আদর্শের স্তর হইতে রওয়ানা হইলেও যদি তাহাতেই উপনীত হওয়া যা যায়, বুঝিতে হইবে যাত্রারম্ভ ও যাত্রাপথে নিশ্চয়ই কোথাও কোন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। জীবনযাত্রার কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে রওয়ানা হইলেও অন্য যে কোনও দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছিতে হইবে; যেহেতু প্রত্যেকটিই যে পরস্পরনিরপেক্ষ অথচ পরস্পরাপেক্ষভাবে অন্যোন্যমিথুন (interpenetrated) হইয়া একই জীবন্ত বস্তুকে বাস্তবিক করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছে। বিশেষ কোনও দৃষ্টিকোণ হইতে বস্তুর যে একান্ত ব্যাখ্যান, তাহা নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক ও বাস্তিক। একান্ত আইডিয়াও ভিত্তি হইবার যেমন স্পর্দ্ধা রাখিতে পারে না, অর্থনীতির একান্ত ভিত্তি হইবার স্পর্দ্ধাও তেমনি বাস্তব বস্তু বেশীদিন ও বেশীদূর সহ্য করিবে না। ইহার সমাধানও আজ পুরুষোত্তম-জীবনের আলোকে জীবনকে সংগঠনের উপরে নির্ভর করিবে।

ভারতবর্ষ গত ২৭ বৎসরের আন্দোলনের ধারা বহিয়া আসিয়া পলিটিক্স কোন আদর্শের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় আজ আটকাইয়া যাইতে চাহিতেছে। ইহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য সে প্রাণপণ করিলেও তাহার সম্মুখের পথ রুদ্ধ। স্বরূপ ও বিন্যাসের সমন্বিত জীবন্ত আদর্শই শুধু ভারতবর্ষের এই রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করিতে পারে। এই আদর্শকে দর্শনে সাহিত্যে ও জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই "উজ্জয়ন্তভারত" পত্রিকা আত্মনিয়োগ করিবে। বরিশাল হইতে গত বাংলা ১৩৩২—১৩৩৪ সালে দুই বৎসর প্রতি সপ্তাহে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর আমি বৃন্দাবন চলিয়া যাওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঘটনাবহুল দীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে আবার সেই পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিল। ১৩৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে কারাবরণ করিয়া যখন আমি বরিশাল ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, তখন সর্ব্ব দৃষ্টিকোণসমন্বয়ের ভিত্তিতে ঈশ, কেন, কঠোপনিষদ প্রভৃতি উপনিষদ ও সর্ব্বোপনিষদের নির্য্যাস গীতাশাস্ত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করি; ইতিপূর্ব্বে ১৯১৯ সালে সমন্বয়োজ্জ্বল ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলাম। আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক, জিন্স, হাইসেনবার্গ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহ দ্বারাও সমর্থিত হইবার যোগ্য এই "জীবন দর্শনের" আলোকেই উজ্জয়ন্তভারত পত্রিকা এই অকূল সমুদ্রে দিক নির্ণয় করিবে। ঐ সমগ্র জীবনের পথেই সব শ্রেণী বিভাগ, জাতি বিভাগ, দেশ বিভাগ গলিয়া এক অবিচ্ছিন্ন জীবন্ত বিশ্ব গড়িয়া উঠিতে পারে।

যিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন—"I am a cosmopoliton—আমি বিশ্ব-নাগরিক"—যাঁহারই শ্রীচরণতলে আত্মানাত্মসমন্বয়ের, জড়াজড়-সমন্বয়ের, নিত্যানিত্য সমন্বয়ের দীক্ষালাভ করিয়াছিলাম, আজিকার রওয়ানায় এই যাত্রাপথে জীবনসর্ব্বস্ব সেই শ্রীনিত্যগোপালদেবের আশীর্ব্বাদ ও প্রেরণা আমরা বারবার কামনা করিতেছি।

মহামানবত্বের এই স্পন্দন বিশ্বের যে নর-নারীর অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাহিরে সজ্ঞবদ্ধভাবে প্রকট হইবার জন্য পথ খুঁজিতেছে, আমরা তাঁহাদের সহিত একাত্ম হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। নরনারায়ণ আমাদের সহায় হউন। বন্দে মাতরম্।"

—এই হইল উজ্জয়ন্তভারতের আদর্শ, প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন ও পথ চলার ছন্দ। পাঠক এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন কেন কপর্দকহীন হইয়াও উজ্জয়ন্তভারত চলিতে পারিয়াছে—যেহেতু ইহা দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ সর্ববিশেষ সমন্বিত এক মহামানবিক মহাজিজ্ঞাসার কথা বলে বলিয়া। নামগোত্রহীন সর্ব্বমানুষের একটা আত্মিক সহযোগিতাই বিশেষ করেক জনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—ভবিষ্যতেও বাঁচাইবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। তাই ঘন দুর্যোগের মধ্যেও পথরেখা আজ পর্যন্ত মুছিয়া যায় নাই—

আমরা সর্বমানুষের সেই কল্যাণ-মূর্তির প্রসন্ন হইয়া সর্ব-মানুষের সেবায় পুনরায় এই পঞ্চাশবর্ষ বয়ঃক্রম দিনে নিজেদের নিয়োজিত করিলাম। পূজ্যপাদ শ্রীনিত্যগোপাল আমাদের পথচলায় সহায় হোন, আমাদিগকে শক্তি দান করুন।

'উদ্বোধন'-এর পাঠক পাঠিকাদের নিকট আমাদের আরও একটু কথা নিবেদন করিবার আছে। উদ্বোধন যেদিন আরম্ভ হইয়াছিল সেদিন মানুষের চিন্তাধারার কাছে একটা ব্যাপকসত্তার জীবনচেতনা পৌঁছানই একমাত্র কাজ ছিল। তারপরে বিগত ১৯৫৩ সনে শ্রীমৎ পূজ্যপাদস্বামী তাঁহার নরনারায়ণ আশ্রম লইয়া বাগবাজারে গ্রামে আসেন। এখানে গ্রামের মধ্যে আসিয়া জন-সাধারণের সঙ্গে মিশিবার যে সুযোগ পাওয়া গেল তাহার সূত্র ধরিয়া গ্রন্থাগার-পাঠাগার, বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র, মহিলা শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া কাজ করা হইতে থাকে। বর্তমান বৎসরে একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হইয়াছে। এ ছাড়া আশ্রমের কর্মী মারফত কয়েকটি ছেলে মেয়েকে রাখিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সঙ্গে উদ্বোধন ও শ্রীমৎ পূজ্যপাদস্বামী-লিখিত উপনিষদাদি প্রকাশিত করিবার প্রয়াসও চলিতে থাকে। এই অবস্থায় আজ প্রায় চার বৎসর হইয়া গেল শ্রীমৎ পূজ্যপাদস্বামী তাঁর স্থূল দেহকে সরাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ অবর্তমানতা সত্ত্বেও তিনি কেবল কাজ চালাইয়া লইতেছেন তাহা নহে, অনেক বিষয়ের মধ্যেও সকল দিকেই বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইবে। আমরা উদ্বোধনের গ্রাহক অনুগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা শুভানুধ্যায়ী প্রত্যেকের নিকট এই আবেদন জানাই যে, তাঁহারা নরনারায়ণ আশ্রমের এই সকল কর্মের প্রতিও আগ্রহশীল হইয়া ইহাদের অধিকতর অগ্রগতিতে সহযোগিতা করুন। আশ্রমের কর্মীসংখ্যা অতি স্বল্প, অথচ কাজ ও দায়িত্ব প্রচুর—আমরা উদ্বোধনের এই পঞ্চাশবর্ষ বয়ঃক্রম দিনে আমাদের আদর্শ, সংকল্প বার বার স্মরণ করি, আর সেই সঙ্গে ইহার সহিত কম বেশী সংযুক্ত প্রত্যেকের নিকট আবেদন জানাই যে, শ্রীমৎ পূজ্যপাদস্বামী যে চিন্তাধারা, যে কাজ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই চিন্তাধারাকে ছড়াইয়া দিতে, সেই কাজকে আগাইয়া দিতে তাঁহারা যেন আমাদিগকে আরও সাহায্য করেন। বিশ্ব জুড়িয়া সকল সংঘাত-মুক্ত 'মানুষে'র সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীমৎ পূজ্যপাদস্বামীর জন্মবার্তা সফল হউক, মানুষ ধন্য হউক, ধন্য হউন পূজ্যপাদস্বামীর জীবনদেবতা সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত শ্রীনিত্যগোপাল, এই বিশ্বই তাঁহার মহাপীঠ।

সম্পাদকমণ্ডলী

"...প্রকৃতির দুই রূপ—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। আচার্য শঙ্কর দিমনকে এই দুই শক্তির বাহিরে যাইবার নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভাগবত আবরণশক্তিকে মানিয়াই মিলনের কথা বলিয়াছেন। দুই দুইয়ের কত নিকট, কত এক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুই দুইয়ের কত দূর, দুই কত ভিন্ন। ইহাই তো বৈষ্ণব দর্শনের প্রেম-বৈচিত্র্য। বিরহীর পাওয়াও অনন্ত, না পাওয়াও অনন্ত; সুখও অনন্ত, দুঃখও অনন্ত। বিরহীর সুখদুঃখের এক কণাও সংসারী সহ্য করিতে পারে না। ঐ ভক্তিযোগদর্শনে তোমায় গোপাল লিখিয়াছেন—শ্রীরাধার বিরহের এক কণাই জীব তাঁর কৃপায় আস্বাদন করিতে পারে। Whole time worker হিসাবে তোমাকে চাই। বিরহী ছাড়া কে Whole time worker হইবে? বিরহীর বেদনার এক কণার খবরও সংসারী জানে না।...: শুধু তোমাকে বলিব তুমি ও তোমার গোপাল একতনু হও, একপ্রাণ হও, একমন হও, একবিশ্বাস হও, একানন্দ হও। গোপালের মধ্যে তোমার সব কিছু যেন গোপালময় হইয়া যায়।...অন্তরে অন্তরে নির্দেশ পাইবার জন্য একমন, একপ্রাণ, একবুদ্ধি হইবার জন্য অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধ হও। দুই বুদ্ধি যখন এক, তখন নির্দেশের জন্য আর ভাবিতে হয় না। তখন নিজের প্রাণের নির্দেশই শ্রীভগবানের নির্দেশ। আমি তোমাকে সেইরূপই পাইতে চাই।..."

শ্রীমৎ পূজ্যপাদস্বামীর পত্র

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

তিন বৎসর আগে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যেদিন নয়নারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার নয়নারায়ণ আশ্রমের পতাকায় গৈরিকের মধ্যে লাঙ্গল রাখিয়াছিলেন। গৈরিক হং সন্ন্যাস বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্যোতক, লাঙ্গল মাটিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীক—লাঙ্গল লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা ব্রহ্মজ্ঞানকে পাথেয় করিয়া মাটির বুকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানকে বহন করিতেছে। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে উজ্জ্বলভারতের যাত্রারম্ভ দিনে এই পতাকাকেই সে গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর চৌদ্দ বৎসর আগেকার সংকল্পবাক্য সহ নূতন বৎসরে এই পতাকাকে সে অভিবাদন জানায়। আমরা লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকাকে অভিবাদন জানাইয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত সে সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিতেছি।

"বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র ও চক্রী--'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া দিয়া একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোক-চক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চকল বাহিরে মজদুররাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোন একটিই একান্ত সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটী দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বজাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজ-মূর্ত্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্য্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি-ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংবাবৃত। হৃষিকেশ-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত্ত হইবে হলধরেরই বেশে। তাই নয়নারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা।'

উজ্জ্বলভারতের প্রজ্ঞাপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।"

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮)

আপনারা বুঝি চেয়েছেন মানুষের বাইরে—মানুষকে তো চান নি।...বুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের dynamic aspectটা ধরে দিয়ে গেছেন।...আপনাদের অনেক কিছুর প্রতিবাদ বুদ্ধ... চুম্বক কাহিনী—কত কল্পনা—। আনন্দকে বললেন, আত্মদীপো ভব...প্রহলাদ...ধ্রুবদেব—প্রত্যেকে মুক্তিকে বরলে সাধারণতঃ ভারতবাসীর কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে আটকায় কিসে?—ভাগবতে আটকায়। বুদ্ধের নিকটও আটকায়।...ভাগবতে বুদ্ধ অবতারের কথা রয়েছে বলে কেউ কেউ বলেন ভাগবত বুদ্ধের পরের গ্রন্থ। কিন্তু বুদ্ধ একটা তত্ত্ব—গতির তত্ত্ব—যখন যখন স্থিতির অত্যাচার হয় তখনই গতি-তত্ত্ব নিয়ে আসেন বুদ্ধ—বুদ্ধেরা অনেক অবতার...কৃষ্ণজীবনেই এই গতি-তত্ত্ব রয়েছে।... ধ্রুবদেব কৃষ্ণ-প্রসাদ নয়—দুঃখপ্রসাদ—সকলের দুঃখ আমি তবে নেব—এই তাঁর কথা। সকলের ঘরে না-থাকা আমার হোক, সকলের দুঃখকে নিজের করে নেব—এই ছিল ধ্রুবদেবের কথা। বুদ্ধদেবও তো এইজন্যই বের হলেন দুঃখকে এড়াতে চাইলে দুঃখ দূর করা যায় না।...কে কবে রাজত্ব রেখে রাজা হতে পেরেছে?...যারাই গতিত, তাদেরই বুদ্ধ স্থান দিলেন—

তনেহে তোমারি নাম, অনাথ আতুর জনে
এসেছে তোমারি দ্বারে মুক্ত কেরে না যেন।

...প্রাণ নিয়ে এসেছেন তিনি।—নাস্তিকতা যে ভগবানের এক রূপ নয়, তোমায় কে বলেছে?...তাই form নিয়ে যখন বাড়াবাড়ি চলল, তখনই তিনি এলেন—বললেন—আত্মদীপো ভব, আর আত্মনা উদ্ধরেৎ আত্মানম্। গীতাতেও বুদ্ধমার ছিল।...নিত্যগোপাল বলেছেন প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিবাদযোগ্য নয়। বুদ্ধদেব বললেন, এস, দেখে যাও আমি আনুমানিক ধর্ম দিতে আসি নি। বুদ্ধ সঙ্ঘ গড়তে বললেন—বললেন মিলতেই হবে। অহংকার গেলেই তো মেলা যায়। রাম বললেন, যাক অযোধ্যা, যাক ভরত—ভরত রাজা হলেও তো বাবার রাজত্ব থাকে, আমি চলে গিয়ে ভরতকে রাখব—আর আমরা এক ইঞ্চি জমি নিয়ে মারামারি করি, এক গ্রামে বাস করে দুইটী দল গড়ি—খুঁজুন নিজেদের মধ্যে মিলবার প্রবণতা কতটুকু। বুদ্ধদেব বলে গেছেন—মিলতেই হবে।...

২৫, ৫, ৫৬

...প্রণত ক্লেশনাশায়—প্রণতদের ক্লেশ তুমি নাশ কর ...ঐশ্বর্য লালিত্য অবহেলিত প্রকৃতির রুদ্রময়ী রূপ... নিত্যগোপাল, আমার আমি তোমারি মাঝে মহাপরিনির্বাণ লাভ করুক। সকল জঞ্জাল অহংকার হইতে, বিচ্ছিন্নতা হইতে আমায় রক্ষা কর...তোমার সঙ্গে আমার সবকিছু ছাড়া ভাল হৌক।...আমার সঙ্গে তোমার বিশ্বের সঙ্গে সকল অনৈক্য, সকল অশ্রেয় ঘুচিয়া যাউক—আমি সকলের, সকলে আমার।...জীবন সায়াহ্নে শ্মশানের তীরে দাঁড়াইয়া আমি প্রণত—তোমার উপদেশ আমার জীবনে মূর্ত হউক—সংসারে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুজন কিছুরই অভাব যেন তোমার পরিত্যাগ না করি...মানুষের সুবুদ্ধি হউক, তোমায় চরণে প্রণত হউক...তোমার ইচ্ছা আমার জীবনে পূর্ণ হউক...এ দেহ দিয়া তোমার কি পূজা করিব?... আমায় দেখিয়া লোকে তোমায় দেখিবে, আমায় পাইয়া লোকে তোমায় পাইবে...তুমি আলো আমি অন্ধকার... মাথা নত করে দাও তোমার চরণধূলায় তলে...আমার দেহ দাও...কাঁদি যেন সেই মা—আমার যা কিছু সব তোমার...তুমি আমায় অঙ্গীকার কর...আমার আত্মসাৎ কর...সর্বতোভাবে আমায় আপনার করিয়া লও।

তোমার আমার মাঝের সকল ব্যবধান দূর হউক।...তুমি আমার আছ,...আমিও তোমার থাকতে চাই...মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ।...

সন্ধ্যা

কেন আসিয়াছি, কোথা আসিয়াছি, এ কথা প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় বার বার স্মরণ করিতে হয়। ছুটিল রথের পথ ধরিয়া ঘুরে মরিয়া আছি পড়িয়া—। এই ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই আসিয়াছি—আমার আহ্বানেই তোমরা আসিয়াছ—আমি দীর্ঘ দিন পথ চলিয়াছি—আমার অভিজ্ঞতা ও সংকল্পের কাছে তোমাদের মাথা নত করা উচিত।...এসেছি বিশ্বনাগরিকত্ব প্রচার করতে—আমার কাছে শিখতে হবে নিত্যগোপাল তত্ত্ব; আমার কাছে না শিখলে কিছুতেই পাবে না—তিনি আমাকে তাঁর তত্ত্ব দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন,—"আননা, ভগবান অন্তর্যামীরূপে তোমার যখন যা দরকার বুঝিয়ে দিচ্ছেন।"—আমি তোমাদের প্রার্থনী হিসাবে যদি মানুষের কাছে উপস্থিত করতে পারতাম, তবে সে যে আমার কত আনন্দের হত।...আমার কাছে কিছু না থাকলে আমি তোমাদের ডাকতাম না। বিশ্বাস কর নিত্যগোপাল আমার কাছে কিছু দিয়ে গেছেন—সেটা বিশ্বনাগরিকত্বের সাধনা।... এই বাগবাজারে বসে আমি বাঙালী—কেমন করে এইখানে বসেই আমি বিশ্বরাগী তা জানতে হবে... মানুষকে ভালবাসি আমি—বিশ্ব আমার হবে না—বিশ্ব আমার নিকটে এসে যাবে।...কাল অনেক লোক হয়েছিল, আমি লক্ষ লোক এখানে এনে দিতে পারি, কিন্তু তোমাদের মানুষ হতে হবে, আত্মযোচিত জীবন যাপন করতে হবে—নিজেরা মানুষ না হলে মানুষ পাবে না।...আমি সোজা কথা দিই নি—স্বার্থপর হয়ে মানুষের তোয়াজ করে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম।... বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় কিছু দরকার নেই—পরপাগল হয়ে পড়ে থাক—বিবেকানন্দ যে, এ পাগল করার জন্য গর্জন করেন নি—ঐ মানুষের আশীর্বাদে গর্জন তাঁর বুকের মধ্যে এসেছিল।...এক উদ্দেশ্য, এক কর্ম, এক তহবিল, এক স্থান—এই-ই অদ্বৈতসিদ্ধি।...একটা বিরাট কাজ করতে আমি এসেছি, কোন ছোট কাজ করতে আমি আসি নি।...আমার আহ্বানকে খুশী মনে যেন নিয়ো, নির্দেশ যেন চলো।...জল-পড়া ঘরে থাকব, দরিদ্রের মত খাব, যদি টাকা হয় মানুষের সেবা করব। নিত্যগোপাল ভোগ করেন নি...আমার সান্নিধ্যে যে থাকো, যেন আমার দেখে মানুষ তোমায় দেখে।... ছেলেরা খাটে,—হাঁ, আশ্রমের ছেলেরা খাটবেই—মানুষী ধ্বংসোন্মুখ সমাজের হুকুমে চলব? প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক কর্ম ব্রহ্মকর্ম যদি সেই ভাবে করা যায়—অহংকারীর কর্ম ব্রহ্মকর্ম নয়—ভগবানের মন্দির মার্জনা করা, তাঁর জন্য রান্না করা—বৈষ্ণব পায়ে এ পরম সৌভাগ্যের কাজ।...group by group সকলের সব কাজ করতে হবে।...অকপটে আমার বাক্য যেন নিয়ো—আশ্রম তোমাদের—তোমাদের দ্বারা নরনারায়ণ আশ্রমের মুখ উজ্জ্বল হোক।...নিত্যগোপালের কাছে তোমাদের পৌঁছে দেবার ভার আমার...তোমরা আমার প্রত্যেক আদেশ মেনে নাও...মাটির মত যেন আমি তোমাদের দিয়ে শিব গড়তে পারি...শিবের রূপ যার আলা আছে সে-ই শিব গড়তে পারে। মাটি তো আর নিজেই শিব হয়ে উঠতে পারে না?...

২৯, ৫, ৫৩

...রমণীদের ব্রহ্মময়ী রূপ শ্রীরাধা, জননীদের ব্রহ্মময়ী রূপ শ্রীকালী। বিশ্বময়ী পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধা, তোমার পরশে আমার অপরা প্রকৃতির পরিবর্তন হউক।...কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধা...। নিত্যগোপাল, তুমি যে কথা কহিতে আসিয়াছ আমার জিহ্বায় তাহা স্ফুরিত হউক; আমি আন কথা যেন না বলি, তোমার বাণী যেন আমার জিহ্বায় ফুটিয়া উঠে। নিত্যগোপাল, আমার জীবনধন, আমার সর্বস্ব, আমি তোমাছাড়া যেন আর কিছু নাহি চাই, আমি তোমার কর্ম ছাড়া যেন আর কোন কর্ম না করি—তুমি বিশ্বকর্মা—তোমার এই বিশ্বকর্মে আমি

গৃহিণী হইব—তোমার বরণী হইয়া তোমার ঘর আমি করিব। আমার স্বামী, এই বিশ্বঘর তোমার; বিশ্বনাথ, এই বিশ্বই তোমার মহামঠ। তোমার এই বিশ্বমঠে আমায় সেবায়েৎ করিয়া রাখিও—তোমার বিশ্বের সেবা করিব—আমার ছোট ঘর ভাঙিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ, এই জগৎ তোমার খেলাঘর। নিত্যগোপাল, আমি তোমার হইব, আমার সকল তোমাকে দিব, আমার দেহমনপ্রাণবুদ্ধি সব তুমি লও, তিলতুলসী দিয়া সব তোমায় দিলাম।—আমার বিশ্বাস দাও, নির্ভরতা দাও—'যেই তিলতুলসী দেহমন সমর্পিবু'। আমি তোমার মত সহজ হইব, আমার সরল অকপট করিয়া দাও, আমার দেহমনপ্রাণ কায়মনবাক্য এক করিয়া দাও—নিত্যগোপাল, দিন যায়, এসো—আমার জীবনবল্লভ, সাধনদুর্লভ—অযাচিত করুণায় তোমায় পাইয়াছি, যেন তোমার দানের অপমান না করি, তোমার আদরের যেন অপমান না করি—তোমার স্নেহের কাছে যেন আমি বিকাইয়া যাই।·· তোমার স্নেহের মাঝে আমি ডুবিব—নিত্যগোপাল, ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম মানুষ···।

[২৬শে সন্ধ্যায় মহানির্বাণ মঠে বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীযুৎ পুরুষোত্তমানন্দের বক্তৃতা থাকায় তিনি মহানির্বাণ মঠে গিয়াছিলেন, তাই সান্ধ্য ভ্রমণ হয় নাই।]

২৭, ৫, ৫৬

···কৃষ্ণের সাময়িক দর্শনকে আবার বর্তমানে রূপ দিবার জন্য সেই কৃষ্ণই আজ নিত্যগোপালরূপে আসিয়াছেন। সেই সাময়িক দর্শনের একদিক শংকর দিয়াছেন, অপর দিক দিয়াছেন বুদ্ধ—নিত্যগোপাল শংকর ও বুদ্ধকে সমন্বয় করিয়া সেই সাময়িক সত্যকে আমার প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি নবীন শংকর ও নবীন বুদ্ধ।···নিত্যগোপাল, তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দরতম···এই বিশ্বে এমন সহজ সুন্দর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলাম না।···আচারসর্বস্ব ভারতবর্ষে তুমি আচারমুক্ত ও অনাচারমুক্ত। আচারের বাড়াবাড়ি, অনাচারের বাড়াবাড়ি, মানায় গোলামী ও মানামার উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মানুষকে তিনি মুক্ত করিয়াছেন।···নিত্যগোপাল, তোমার সব মধুর—তোমার একত্ব মধুর, তোমার বহুত্ব মধুর···তোমার মানাও মধুর, তোমার না-মানাও মধুর···তুমি মধুরম্, তুমি মধুরম্···তুমি ভবিষ্যৎ ভারতের, উজ্জ্বল ভারতের ভাগ্যবিধাতা···নরনারায়ণ, নরনারায়ণ, নরনারায়ণ, নরনারায়ণ···জাগো নরনারায়ণ···ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।···

২৭শে সন্ধ্যা—ওঁ নমঃ ভক্তমূর্তয়ে ভক্ত-ভগবতে···

রঘুনাথদাস মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—অন্তের ভিতর আমার সাধনার কথা বল। মহাপ্রভু বলেন...

গ্রাম্যবার্তা না কহিবে, গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে
ভাল না খাইবে, ভাল না পরিবে
অমানী মানদ হয়ে কৃষ্ণ নাম লবে
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।

ইলিশমাছ খেলাটা পাপ নয়, কিন্তু সেই খেলা ও খাওয়া নিয়ে যে এক ঘণ্টার গাল গল্প—এটা পাপ·· কাউকে বঞ্চিত করে খেয়ো না—ভক্ত বিশ্বের সেবক—তার ভাল খেতে গেলেই অপরকে বঞ্চিত করতে হবে। এ সব দিকে বাড়াবাড়ি করলে কৃষ্ণ-অনুরাগের দিকে কমে যায়।··· সন্তোষ থাকলে তাই দিয়ে স্বামী বশ করা যায়—বেশভূষা দিয়ে নয়। অনুরাগ দিয়ে সেবা কর।·· এখানে আমরা নিত্যগোপালের কাছে বসে আছি—এটা সংসার নয়—এটা জগন্নাথ ক্ষেত্র—তিনি যখন টেনে এনেছেন, তখন কৃপা করেছেন, তখন সাধবোচিত জীবন যাপন—আত্মবোচিত ব্যবহার, আত্মবোচিত কথাবার্তা—এই-ই তো সব দিক থেকে উচিত। গ্রামের কষ্ট ভোগ করতে এসেছি তোমাদের নিয়ে এইজন্য যে একটা উচ্চ জীবন যাপন করব। মানুষের দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে হবে। কারও যাতে গল্পের মধ্যে পড়ব না—অপরকে মান দেব, নিজে অভিমান রাখব না।···আমার সঙ্গে তালমত লাগা না মেলালে কিছু তো করতে পারবে না—আমি যা ভালবাসি তাই যদি তোমরা ভাল না বাস তাহলে কেউই কিছু করতে পারবে না।···

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(১২)

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিকাইল করি। ইহা আবার আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। ব্রহ্মসূত্র ছাপা হইতেছে, ভয়ও হয়, আনন্দও হয়। জানি না কি লিখিয়াছি। এই পথে যে আমি বিচরণ করিতে পারিলাম ইহা বিশ্বরূপ নিত্য-গোপালের কৃপায়ই শুধু সম্ভব হইল; নইলে কোথায় আমি, আর কোথায় শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি? তবুও একটা নূতন পথের খোঁজ যে ইহার মধ্যে আছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। প্রতিভা পত্রিকা পোষ্টাফিসে দেওয়া শেষ করিয়া ১২টায় আসে। সে আজও এখানে প্রসাদ পায়। রেণু আসে কাপড়ের দোকান, ডালহৌসী ঘুরিয়া প্রায় ৩টায়। ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখে। সে আগে চলিয়া যায়। বীরেনবাবু কড়া নাড়িয়া চলিয়া যাইতে ছিলেন, তখন রেণুর সঙ্গে দেখা। গীতার অমৃত-ভাষ্য (তার প্রদীপ) পাঠ করে রেণু প্রায় ১ঘণ্টা। আজ তাহার গীতা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ (যাহা আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষে বাহির হইয়াছে) আনিতে পারেন নাই। 'বিদ্যা ও প্রতিভা'ই পাঠ হইতেছিল। জীবের প্রতি 'কর্ম' বিশ্বকর্ম না হইলেই যে অতীতের কর্ম প্রারব্ধরূপে ভূতের মত ঘাড়ে চাপে, ইহা সেখানে আছে। প্রতি কর্মের মধ্যে অতীত কর্ম, বর্তমান কর্ম ও ভবিষ্যৎ কর্মের সমন্বয় থাকিলে তাহাই হইবে পুরুষোত্তম-কর্ম। তাই পুরুষোত্তম-কর্মে প্রারব্ধ কাটে। কর্মের অন্তরের বিশ্বকর্মত্বের দেখা হয় নাই বলিয়াই 'Law of Karma' এমন ভাবে লৌহনিগড় সৃষ্টি করিয়াছে। আজ হেতমপুর রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক উচ্চলভারতের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া ৪৫০ টাকা পাঠাইয়াছেন।...বৈকালেও ব্রহ্মসূত্র দেখি, বেশ শ্রম হয়। মনে পড়ে ১৯১৯ সনের সেই সমস্ত দিন খাটিয়া ডুমরের মুদীর দোকানে attend করা। হরি প্রসাদের ও গোপালবাবুর পুত্রদের কাছে পত্র দেই, তাহাদের মৃত্যু সংবাদে বেদনা জানাই :...

২৬শে জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিকাইল করি। রেণু সকালে প্রিয়রঞ্জন বাবু, সুহৃৎ বাবু ও প্রিয়রঞ্জন বাবুর ওখানে যায়। প্রিয়রঞ্জন বাবুকে পায় না, তিনি কলিকাতায় বাহিরে গিয়াছেন। হেতমপুরের অপূর্বশরণকে প্রথম করা হইয়াছে। প্রথম তিন জনের নিকট মহাত্মাজী সম্বন্ধীয় বইগুলির লিষ্ট পাঠানো হইবে, যাহাতে তাহারা তাহাদের বই পছন্দ করিয়া লইতে পারে। ভাদ্র মাসেই একটী ভূমিকাসহ প্রথম ছেলেটীর প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রতিভা ১১টায় পর আসিয়া ব্রহ্মসূত্রের ৬৪-৮০ পৃঃ-র দ্বিতীয় প্রুফ প্রেসে দিয়া থাকে ও ৮০-৯৬ পৃঃ-র দ্বিতীয় প্রুফ নিয়া থাকে। রেণু ছানা নিয়া আসে প্রায় ১টায়। গোকুল আজ সকালে আফিসে আসিয়াছিল.....রেণু বলিয়াছে, 'বাবিজী তো কাল বলিয়াছেন যে, যতটুকু মুক্ততা আমাদের সঙ্গে আছে, তাহা সম্বল করিয়াই রওয়ানা হওয়া ভাল, পথে কাজ করিতে করিতে যেরূপ হয় সেইরূপ করা চলিতে পারিবে। মুক্ত হইয়া কাজ করা বা কাজ করিতে করিতে মুক্ত হওয়া কোনও একটীই একান্ত সত্য নয়। দুই-ই একত্র চলিতে থাকিতে পারে।' রেণুর কথা ভাল লাগে নাই। প্রাণখোলা মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা কাহারও সঙ্গে চলে না। যাক। রেণু আগে যায় ও রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট হইতে রামানুজ ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়া আসে। সঙ্গে সুবোধ বাবুও আফিসে আসেন। রেণু তাহাকে অপূর্বশরণের প্রবন্ধ শুনায়। কিছু কাল থাকেন। একবার শ্রীরামপুর

যাবার কথা বলেন। প্রতিভা ৮টায় যায়। ১১০টায় চলিয়া আসি।...

২৭শে জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। রেণু ১২টার পর আসে। আজ সে একা হাঁটিয়া বেড়িয়া ও নিয়া ৩টার পর ইউনাইটেড কফিহাউসে নিয়া গেলে যায়। সে তখান হইতে অফিসে যায়। প্রতিভা আসে ২টায় পর। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'পলিটিক্স নারায়ণেস অব দি হিন্দুস্' রেণুর জন্য পত্রিকা নিয়া আসে। আমার ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতির সেবায় ভিতর দিয়া কি যে ঠাকুরের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বলিতে অক্ষম। কী সাত আমার মত দীনহীন মানুষের এইরূপ এক ভূলোকাতিরিক্ততার কাজে হাত দেওয়া? ঠাকুরই জানু, ঠাকুরই জানু ইহার মূলে আমার নূতন জীবনস্পন্দনে। আমার জীবনের অবলম্বন তিনি। তিনি—আমি এক। কি অর্থে নিতাই বাবু বলিয়াছিলেন, 'তুমি বেরাজ দেখ।' তাহা জীবনকে স্পর্শ করিয়া। তখন তাবি নাই ইহা কত বড় ভূলোকাতিরিক্ততার কাজ। আজ তাহা ছাপা হইয়া আসিতেছে। আজ তৃতীয় কর্মাং ফাইল তুলি প্রেস হইতে রেণু নিয়া আসিল। চতুর্থ কর্মের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। মাসে ৮ কর্মের বেশী ছাপানো আমাদের উদ্বোধনের কাজের সঙ্গে সঙ্গতপূর্ণ হইবে না। বলিতে ভেসে উদ্বোধনের উপর চোট পড়িবে। মেদিনীপুর হাসকা স্কুলের হেডমাষ্টার লিখিয়াছেন ১৪৫৩ সনের চৈত্র সংখ্যা উদ্বোধনের তাহার হাতে পড়ায় উহা তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছে। যদি ঐ পত্রিকাটি তবে তবে বর্তমান বর্ষের মাঘ হইতে তাহাকে যেন ভি. পি-তে পাঠানো হয়। এই ভাবে প্রতিটি মত চিঠি সাজা আসিয়া উঠে, তবে উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে আর কত দিন লাগে!...নিত্যগোপাল আমার 'সর্বমিদং সর্বম্'—তিনি আমার সব—ইহাই আমি জানি।

২৮শে জুলাই

রবিবার

সকালে প্রার্থনার পর 'পলিটিক্স নারায়ণেস অব দি হিন্দুস্' হইতে 'The Hindu Anuman... anticipates' অংশটা আমি লিখি। ইতিমধ্যে রেণু আসে ও সে লিখিয়া যায়, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে লাগাইয়া যায়। ৮৪০ টায় পর উমারিণী প্রতিভা ও রেণু পূজা করে। তাহার পর আমি প্রতিভা রেণু মহানির্বাণ মঠে যাই। কিছু পরে শিশির ও কমলা এখান হইয়া মঠে যায়। তাহাদিগকে নিয়া ঠাকুরের ওখানে যাই।... ঠাকুরের বেদীতে প্রণাম করি ও বিছুক্ষণ ওঁহাকে দেখি। আমিই আমাকে দেখিলাম। বাঙ্ময়োপ প্রণাম পাই। পরে বারান্দায় বসিয়া শিশিরের কাছে আমার জীবনে ঠাকুরের স্থান এবং বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার যে ঠাকুরই সমাধানকর্তা, পরমহংসদেবের 'তুই এবেছিস আমিও এসেছি' বাক্য, ওঁহার সঙ্গে যুক্ত আছি বলিয়াই যে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে হারাইয়া যাই নাই,—came out safe and unhurt,—আমার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত সবই যে ঠাকুর—ইহা আলোচনা করি। তখন সুধাংশু সেখানে গিয়া উপস্থিত। ১১।০টায় সময় চলিয়া আসি।...আসিয়া শুনি জয়া ৩।০ টায় আসিয়াছে।...কমলার এখানে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার আসা উচিত। রেণু কিম্বা আমি পত্র লেখাইয়া দিতে পারিব। রেণু প্রভৃতি তাহার বাসায় যাইতে পারে। তাহা হইলে সেখানের আবেষ্টন বদলাইতে পারে।...মনু পুরুষোত্তমসহ আসিয়াছিল।...আমি ও জয়া ৩টায় পর মঠে যাই। মঠে বিকেল হইতে আগত লোকদের সঙ্গে কথা হয়।...আমি আশ্রমে আসি।...৯টায় পর আশ্রমে ফিরি।

২৯শে জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্র বেড়িয়েছি এমন সময় ঘরিশালের ডেপুটেশন চক্রবর্তী উকীল আসেনর্থ তাহার সঙ্গে প্রায় ১ঘণ্টা কথা হয়।—ঠিক এমন ভাষ্যবাদের জন্য লিখিতে আরম্ভ করি। রেণু ১২টায় আসে, প্রতিভা আসে ১টার পর। নীরেনবাবু ৪টার পূর্বে আসেন।.. প্রথমে তাহার প্রবন্ধ (ভারতবর্ষে বাহির হইয়াছে) পাঠ

করেন ধীরেনবাবু নিজেই, পরে অবধূতজীর (ভাদুপ্রদীপ) বেণু পাঠ করে ১৭টার উপর। পরে আমি ধীরেনবাবু একত্র হইয়া ট্রামে চড়ি। আমি মঠে যাই।... মঠ হইতে আফিসে আসি, তখন ৮টা বাজে নাই, ৯টার পর চলিয়া আসি। বৈকুণ্ঠের ঠাকুর নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ যে আত্মকৃতি পরিণাম (creative evolution), কালের সঙ্গে adapt করিয়া স্তরে স্তরে আগাইয়া আসিয়াছে তাহা আলোচনা করি। রাত্রি ও প্রভাতের মাঝে, সকাল ও সায়াহ্নের মাঝে, সায়াহ্ন ও রাত্রির মাঝে সন্ধিমূর্হুর্তে দাঁড়ানো পুরুষের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়াই কাল হইতে কালান্তরে আগাইয়া যাইতে হয়। খণ্ড কালের সঙ্গে খণ্ড কালের যোগসূত্র ঐ পুরুষ। তাই তিনি কালপুরুষ, পুরুষোত্তম। আমি আমার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়া অচল থাকিতাম যদি ঈষাদিদী, প্রতিভা বেণু আমাকে আশ্রয় না দিত।...আমার বর্তমান প্রচেষ্টা সার্থক হইত কি যদি না ইহারা আমাকে ঘিরিয়া থাকিত? আমি বুঝি রাধাকে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম পেয়েছি অনেক আগে-র অর্থ কি।

আজ আর গোকুল আসে নাই। আমাকে নিয়াই মাতৃত্বের ঝঞ্ঝাট!

৩০শে জুলাই

সকালে ব্রহ্মসূত্রের ৩য় অধ্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ দেখি। ইতিমধ্যে দাদা মহানির্বাণ মঠ হইতে লেবানন্দ সহ এখানে আসেন।.. ইহার মধ্যে অতীন চক্রবর্তী আসেন। তাঁহার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়। পাকিস্থানের হিন্দুদের সম্বন্ধে আমি যাহা করণীয় মনে করি এবং পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার যাহা বিশ্বাস সে সম্বন্ধে তিনি ও আমি একমত। গোপাল গুহের ছেলে ঘোষ করে আজ সন্ধ্যায় সেখানে যাইবার জন্য—আমি স্বীকৃত হই। বেণু ১০টায় আসে প্রিয়দারঞ্জনবাবুর বাসা হইয়া। এখান হইতে পোষ্টাফিস যায়, পরে বাসায় যায়। তাহার পর কলিকাতা যায়। সেখান হইতে ৩টায় পর আবার এখানে আসে। বেণু ৫।০টার পর চলিয়া যায়। গোপালবাবুর ছেলে আসে প্রায় ৭টায়।...সেখানে বেলুর মঠের ৫ জন সাধু ছিলেন। একজন সাধু ২টী ভজন গান করেন, পরে খাওয়া হয়।...প্রতিভা খেলাধিয়া ও কাঁকিনাড়া যাওয়ায় এখানে আজ আর আসে নাই। নীলুর এক এনভেলাপ আসে।...তাহার পিতার যে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে তাহাতে আমাকে ৵০ আনা দিতেই হইবে। ৵০ আনার টিকিট পাঠাইতে লিখিয়াছে।

৩১শে জুলাই

সকালে দেবপ্রসাদ (হরিপ্রসাদের পুত্র) চলিয়া যায়। ...সকালে 'অখিলরসামৃতমূর্তি' প্রবন্ধ শেষ করি। 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম স্থলে রাখা হয় 'অখিলরসামৃতমূর্তি'। বেণু ছানা দিয়া গেছে যায়। দুপুরে আসিয়া প্রবন্ধটী নকল করা শেষ করে। ৪টার এখান হইতে অফিসে যাই। ৬টায় একটী যুবক···তাহার দাদাকে প্রাণবন্ধেশীভুক্ত করিয়া যায়, ৪৲ টাকা দিয়া যায়। গত শ্রাবণে বেণুর 'চরিত্রহীন' প্রবন্ধ পড়িয়া কালিদাসবাবু ও মাখনবাবু খুব প্রশংসা করিয়াছেন জানিলাম। সুহৃৎবাবু 'চরিত্রহীন'কে পুস্তকাকারে বাহির করিতে বলিয়াছেন। আমি···ষোল আনা প্রাণ দিয়া মুকের ভিতর পুরিয়া রাখিতে চাই, সকলকেই চাই। তবেই না আমার ঠাকুরকে আমার হৃদয়ে পাইব? হৃদয়াকাশ কোথায় না বিস্তারিত? বিশ্ব যদি ভগবানের হৃদয়, আমারও তাহারা যা কেন হৃদয় হইবে না? কিন্তু বর্তমান বিশ্ব হৃদয় চায় না, নিজ স্থিতিভূমিকে পঙ্কলিত করিয়া সে বুদ্ধি-স্থিত হইতে চায়।...

১লা আগস্ট

সকালে 'অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ' প্রবন্ধটী আবার রিডাইস করি, ব্রহ্মসূত্রও রিডাইস করি। ধীরেন রায়ের বাসা হইতে টাকার টাকা লইয়া বেণু ছানা দিয়া যায়। পরে বাসায় গিয়া খাইয়া কলিকাতায় বহু জায়গায় যায়। ৫টায় পর বাসায় ফেরে। এখানে আসে না। প্রতিভা আসে ৭টায়। আজ সারাদিন মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি হয়। নিত্যব্রত কারখানায় যাইতে পারে না। ছয়টার

কিছু পূর্বে আমি ও প্রতিভা বাহির হইয়াছি এমন সময় খুব বৃষ্টি সুরু হয়। পাশের বাড়ীর দাওয়ায় দাঁড়াই। কিছু পরে একটু থামিলে আফিসে যাই। প্রেস হইতে কিছুই দিয়া যায় না। বেণু স্নান করে নাই। সর্বত্রই পুরুষদের মুখে নারীদের নিয়া বিব্রত হওয়ার কথাই শুনিয়া আসিতেছি। পুরুষ প্রজাপ্রধান, তাহাদের স্বরূপবিচ্যুতি তেমন ভাবাবহ হয় না, যেমন হয় প্রজাপ্রধান নারীদের স্বরূপবিচ্যুতিতে। ভাত-পোড়া খাওয়া যায়, দুধপোড়া অখাদ্য। ইহার জন্য নিশ্চয়ই দায়ী সমাজব্যবস্থা ও কুলীন পুরুষসমাজ।—বাবুর স্ত্রী বলিয়াছেন যে, পুরুষেরা যেমন কর্তৃত্বাভিমান লইয়া নারীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তাহাতে নারীদের পক্ষে উগ্র হইয়া উঠা ছাড়া গতি নাই। সত্যই তাই। পুরুষেরা যদি নিজ অধিকারম-প্রভুত্বের হাত হইতে মুক্ত হইয়া 'স সো রমন' হইতেন, মেয়েরাও 'মা হাম রমণী' হইয়া, inferiority complex হইতে মুক্ত হইয়া 'সহজ' জীবনে লাভে সমর্থ হইতেন। আমাদের জীবনদর্শন ও সাধনা তো ইহাই চাহিতেছে। নর ও নারী যে একই primitive whole-এর দুইটি বিভাগ, দুইটাই যে প্রত্যেকের কাছে ও পরস্পরের কাছে 'নেতি নেতি' হইয়া পুনরায় পুরুষোত্তমরূপে ফুটিয়া উঠিবার জন্য উন্মাদ, তাহাই আজ সমাজকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। প্রতিভা ৭৷৷০টার পর যাদায় যায়, তখন বৃষ্টি থামিয়াছিল। আমি ৯টার পর আসি। বেণু সারাদিনের দুটাদুটিতে খুব ক্লান্ত।

২রা আগস্ট

সকালে রুকসুম রিকাইস করি। বেণু আসিয়া ছানা দিয়া যায় ও কলিকাতা যায়। সে ১২৷৷০টার পর ফেরে। খাওয়া সারিয়া ২টার মধ্যে আসে। প্রতিভা সোয়াকিস হইয়া আসে প্রায় ৩টায়। সুবোধ মুখার্জী একটী খামে একটী চিঠি বেণুর নামে আফিসের যাজে রাখিয়া যায়, তাহার মধ্যে কাশীর এক অধ্যাপকের প্রাইভেট হওয়া যাবত ৫৲ টাকা রাখিয়া যায়। উত্তরপাড়ার একটী সভার বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে সে দিবে। ৮টার পর আখিলগতের বীরেন বাবু আসেন তাহাদের রায়োয়ানের সঙ্গে। শ্রাবণ যাবত ২৪০৲ টাকা ও ভবির খরচ যাবত ৬০৲ টাকার চেক তাহাকে দেওয়া হয়। মেদিনীপুর মুকুন্দপুর পোঃ ঠিকানায় একটী গ্রাহক যাদ হইতে পত্রিকা ভি, পি, করিতে লিখিয়াছে। আলোচনা হইতেছিল—সাধারণতঃ কাহারও দৃষ্টি আজ আর সমগ্র ভগবানের দিকে নাই, সংসারের ও-পারের কোন কিছুর দিকে নাই, বিশ্বজনীনতার দিকে, আন্তর্জাতার দিকে, সামাজিকতার দিকে, পারিবারিকতার দিকে নাই। সকলেই ব্যক্তি-কৈন্দ্রিক; তাই যে যেখানে পারে পাশের সব কিছু দিয়া কাজ আদায় করিয়া লইতেছে। সংসারময় এই চিত্র। কেহই তো আবেষ্টনের মধ্যে ভগবান পাইতে চায় না। প্রাণপণ চেষ্টা আবেষ্টনের হাত হইতে রেহাই পাইয়া অনন্তের দিকে চলিয়া যাওয়া। নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া এখানের সঙ্গে যোগ। Transcendent যে trans-cendent হয় না immanence-এর মধ্যে অনুপ্রবেশ না করিলে, সর্বভাবে আলিঙ্গন না করিলে যে কিছুতেই পুরুষোত্তম-'আমি' ফুটিয়া উঠিবে না, বিশ্বময় হইয়াই যে বিশ্বাতীত হইতে হইবে—এই তত্ত্বটীই তো আমার সমস্ত লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারই তো আজ প্রয়োজনীয়তা। ৯টার পর চলিয়া আসি। মালতীর একটা ইনভেলাপ বেণুর নামে ও ঠিকানায় আসে। আমার প্রবন্ধে লেখাও ছিল। সে গুরুপূর্ণিমায় খুব উৎসব করিয়াছে। আবেষ্টনের মধ্য দিয়া কিছুটা চলিতে পারিতেছে। তাহার বাবা তাহার উপর সংসারের ভার দিতে চাহিতেছে।

৩রা আগস্ট

সকালে রুকসুম রিকাইস করি।৹ ঠাকুর ঘর হইতে আসার পর কোমরের একটা স্নায়ু ফুল করিয়া উঠায় শয্যাগত হইয়া পড়ি। ক্রমান্বয়ে বাড়ে। সতীনাথ সকালে খবর জানাইয়া গেল সে তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে।...বেণু সকালে ছানা দিয়া গেল। ১১৷৷০টার

পর কলিকাতা যায়, ৪টায় ফেরে। প্রেস হইতে প্রুফ ও বাকী র‍্যাপার (মোট ৪০০) দিয়া যায়। প্রতিভা পোষ্টাফিস ঘুরিয়া আসে ২টায়।...বেদনাটা কিছু কম বোধ হয়। ঔষধ খাই C.P 200× +N.M. 200× +Silecia 200× ২ মাত্রা ও C.P 200×N.S. 200× এক মাত্রা।...

৪ঠা আগস্ট

সকালে ঠাকুর ঘরে যাইতে পারিলাম না। বেদনাটা কম ঘটে। ৭টার পর প্রতিভা আসে। সে ব্যাগ দিয়া গরম জলের সেক দেয়। ১ঘণ্টা পর যায়। বেশ বৃষ্টি হয়। রেণু আসে ১০টায় পথ থাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া। সে প্রুফ দেখে। আমি ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। প্রতিভা আবার ২টার পর আসে।...সকালে ১১টার পর মনোরঞ্জন গুপ্ত আসে। তাহার সঙ্গে ১ঘণ্টার উপর আলোচনা হয়। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাঙাইয়া মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই এই ব্যাপার উদ্দেশ্য। নীচের মুসলমানেরা বাধা চায় না, কেননা তাহারা suffer করে। নূতন মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছোটদের শোষণই করে। কোনও সুবিধা দেয় না, যাহা হিন্দু মধ্যবিত্তেরা করিত। হিন্দুদের সম্বন্ধে একটা মুস্ত আবহাওয়া ধীরে ধীরে সৃষ্ট হইতেছে। সরকার বুঝিয়াছে যে ব্যাপার climax-এ পৌঁছিয়াছে। আর বেশী হইতে দিলে রাষ্ট্রই চলিবে না। মুখ বন্ধ তাহার নাই। এত সময় রাষ্ট্র পাইবে না যে, ইহাদের সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্র চালাইবে।...

৫ই আগস্ট

সকালে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি ও নূতন রিভাইস করি। সকালে বেহালা কারখানা হইতে চৌকী পাঠাইয়া দেয় সেখানের মজুরদের দিয়া। ইহার মধ্যে রেণু ছানা দিয়া যায়। মাখনবাবু ও গোকুল আসে। গোকুল র‍্যাপার লেখে। সকালে বেদনাটা কম থাকিলেও দুপুরের পর আবার বাড়িয়া যায়।...ময়রী আসিয়া রাবড়ীর একটা ওষুধ মালিস করিতে বলে। রেণু ঐটা কিনিয়া আনিয়া দুপুরে মালিস করে। প্রতিভা ১টায় আসে। সে গরম জলের সেক দিয়া আবার মালিস করে। রেণু ৩টার পর বীরেন চৌধুরী ডাক্তারের খোঁজে যায়। ভবানীপুরে পাওয়া গেল না। সে আবার পার্ক ষ্ট্রীটে চলিয়া গিয়াছে। ...রাত্রিতে এখানে প্রতিভা থাকে।...মেরুদণ্ডের প্রত্যেক স্থানে কি সূক্ষ্ম কলাকৌশল? বলিয়া শেষ হইতেও একটী সূক্ষ্ম যন্ত্রের দরকার। সারা দেহের মধ্যে রহিয়াছে সংখ্যাতীত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রের সমাবেশ। প্রাণশক্তির কি অদ্ভুত যন্ত্র ব্যবস্থা। কোথায়ও কোনও মেসিনের এত টুকু স্থানও নাই।...

৬ই আগস্ট

সকালে বেশ বেদনা।...প্রতিভা সকালে রেণুর স্তন হইতে আমার জন্য দুধ, ঔষধিদীর ছানা আনিয়া দিয়া প্রেসে ৭ম ফর্মের দ্বিতীয় প্রুফ দিয়া আসে। ভাদ্র মাসের কপিও দিয়া আসে। এখান হইতে বাসায় যায়। রেণু ১১টার পূর্বেই আসে...রেণু সকালে ডাক্তারের বাসায় (পার্ক সার্কাস) গিয়া তাহার স্ত্রীর নিকট এখানে আসার কথা বলিয়া আসে। নিশির ৩টার পর আসে। সে অনেক সেবা করে।...ডাক্তার আসে ৫টায়।...

৭ই আগস্ট

সকালে রুশন সল্ট খাই। ব্রহ্মসূত্রের ৭ম ফর্মের প্রুফ দেখি। ৭।০টার পর নলিনী পুত্র আশীষ সহ আসে। ...সকাল বেলার দিকে সতীনাথ আসিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য (পরীক্ষায় পাশ হওয়া উপলক্ষে) ২টী টাকা রাখিয়া যায়। এই বৎসরের নিজের গ্রাহক হওয়ার ৩৲ টাকা দিয়া যায়। মনোরঞ্জন গুপ্ত আসে। উজ্জয়িনীতে আলোচনার্থে 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা' দিয়া যায়। সে কেনোপনিষৎ নেয় ১৲ টাকা দিয়া। রেণু সকালে একবার আসে। আবার কলিকাতা হইয়া এখানে আসে। প্রায় ৭টায় যায়। বীরেন চৌধুরী আসে ৮টায় পরে, নিশির তখন আসে।...আমি মনে হইতেছিল—

'সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী যদি বর্ত্ততে'। কে একজন বলিয়াছিলেন, 'ষাট বৎসর হাঁটিয়াছি, দৌড়াইয়াছি, আজ ২ মাস শয্যাগত, নয় ৩ মাস, নয় ২ বৎসর; সেদিন তো কোনও শুশ্রূষা পাই নাই; তার বেলা তো আর শুইয়া থাকিব না, 'রোগ'ই পাইব কেন?' একটি মহাপ্রাণের খেলা চলিতেছে, কখনও সুস্থতা, কখনও রোগভোগ। সামনের দিকে চাহিয়া সবই সহ্য করিতে হয়। প্রতিভা সকালে সন্ধ্যায় গরম জলের সেক দেয় ও মালিশ করে। প্রতিভা না থাকিলে আমার সেবার অসুবিধা হইত। এখানে তো ছেলেপুলে নিয়া কাজের অভাব নাই। উনি তো তাহাদের নিয়া দিনরাত থাকেন। কে করিত? সুহৃদের কোনও চিঠি আসিল না।

৮ই আগষ্ট

...রেণু এখান হইয়া নীচে তিনটি কোল করিয়া কলিকাতা যায়। খুব বর্ষার ভিতর ৪টায় ফেরে। প্রেসে গিয়াছিল। প্রতিভা মালিশ করিয়া দিয়া বাসায় চলিয়া যায়। শিশির আসে।...কমলা ভিজিতে ভিজিতে ...আমার খবর পাইয়া দেখিতে আসে। প্রতিভা তিনটায় আসে হাঁটিতে হাঁটিতে। বৃষ্টির জন্য ট্রাম বাস সব বন্ধ। রেণু ৭টায় চলিয়া যায়। মালতীর একটা চিঠি আসে।

৯ই আগষ্ট

সকালে খুব গরম দেখি। প্রতিভা সোহাগিনে... চিঠিগুলি দিয়া প্রেসে গম কর্মের অর্ডারটা দিয়া আসে। রেণু ১১টার পর আসে। গরমগুলি ফেলে। বীরেন চৌধুরী ডাক্তার আসে। ইনজেকসন দেওয়া স্থির হয়, শিশিরকে উহা আনিবার জন্য ৫৲ টাকা দেওয়া হয়। ...বাহিরের সঙ্গে যোগ না থাকিলে কোনও ঘরই যে সুশৃঙ্খলভাবে চলে না, বৃদ্ধদেরও বিপদ ঘটে হয়, কেননা ছেলেপুলে লইয়া সংসারেরই অনেক কাজ, তখন বৃদ্ধদের মনে হয় সংসারের লোকদের সংঘাত, এবং রেণু প্রতিভা শিশির না থাকিলে যে আমার সঙ্গতও সেই অবস্থা দাঁড়াইতে পারিত তাহা উষাদিদির সঙ্গে আলাপ হয়। সেও তাহা স্বীকার করে। এই জন্যই তো মানুষ ঠিক এই কার্যের জন্যই বাহিরের নার্স রাখে উষাদিদি বলিল। সন্ধ্যায় সেক দেওয়া হয়। প্রতিভা অফিসে যায়। ফেরে ৯টার পর। বীরেন ডাক্তার বর্ত্তমান ডাক্তারদের পেশাগত নৈতিক অধঃপতনের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে।...

১০ই আগষ্ট

সকালে উজ্জয়ন্তায়ত তাজ ও ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি। রেণুর ওখান হইতে দুধ আনিয়া দিয়া প্রতিভা বাসায় চলিয়া যায়। ১১টার পর রেণু আসে। এ যাবত শিশির ইনজেকসন ও ঔষুধ পৌঁছাইয়া না দেওয়ায় রেণু তাহার বাসায় যায়। পায় না। সেখান হইতে ন্যাশনাল মেডিসিন সার্টিফিকেটে যায়। সেখানে এখনও অনুমতি পাওয়া যায় নাই। ১২ টার পর জব (শিশিরের বন্ধু) ২টী ঔষুধ দিয়ে যায়। রেণু ১টার পর ফেরে। প্রতিভা জয়ার ওখান হইয়া প্রায় ৪টায় আসে। জয়া আসে ১টী আপেল ও ১টী মোসাম্বী লইয়া। বীরেন ডাক্তার আসে ৫টার পর। সে ইনজেকসন দেয়। জীবনে এই প্রথম ইনজেকসন দেওয়া। রেণু সন্ধ্যার পর যায়। প্রতিভা ও জয়া দুবার ইনজেকসনের জায়গায় সেক দিয়া দেয়। সুহৃদের কোনও পত্র নাই, কুমারের চিঠি অনেক দিন আসে না। উকিল, ডাক্তার ও শিক্ষকের ভরণপোষণের ভার রাষ্ট্র নিবে, তাঁহারা শুধু সেবা করিয়া যাইবেন—ইহা ছাড়া খাওয়া পরার ভার তাহাদের উপর থাকিলে তাহাদিগকে ব্যবসায় করিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে দুর্নীতি অনিবার্য। ইহারা হইবে বিলাসী। তবেই দেশ সুস্থ হইবে।

১১ই আগষ্ট

সকালে জ্বরমুক্ত রিডাইস করি। প্রতিভা রেণুর ওখান হইতে দুধ আনিয়া দিবার পর জয়া ও প্রতিভা যায়।...আগামী শনিবার (জয়া) আসিবে বলিয়া গেল।

রেণু ১১টার পর আসে। রেণু প্রুফ দেখে। ১টার পর প্রেসের লোক আসিয়া উজ্জলভারতের ১ম ২য় ফর্মের প্রুফ নিয়া যায়, ব্রহ্মসূত্রেরও ৮ম ফর্মের ২য় প্রুফ ছিল। প্রতিভা ২টার পর আসে। গতকাল সিনিয়রের সঙ্গে কি আলোচনা হয় তাহা বলি—মানুষের জীবন যদি closed হইয়া যায়, জীবনে যদি ফাঁক না থাকে যাহার ভিতর দিয়া বহির্জগতে চলিয়া যাওয়া যায়, তবে সে জীবন নিজের মধ্যেই নিজে শ্বাসরুদ্ধ হইবে। জানালা খোলা থাকিলেই বাহিরের বায়ু ঘরে এবং ঘরের বায়ু বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে, তবেই বায়ু বিশুদ্ধ থাকে। রাহুতা-র মধ্যে যদি বহির্বিশ্ব অবতরণ না করে, কোনও ঘরে যদি বাহির না আসে, তাহা হইলে মানুষ ডুবিবেই। নদীর জল যদি সাগরে না যায়, সাগরের জল যদি নদীতে না আসে, নদীর জল দূষিত হইবেই। মানুষের মাথা ফাটিয়া যায় যদি ভিতরটা বাহিরে আসিতে না পারে, বাহিরটা ভিতরে যাইতে না পারে। আমার পরিবারের সঙ্গে বাহিরের এই আনাগোনা ছিল বলিয়াই আমার পরিবারের হাওয়া বিশুদ্ধ ছিল, আজও আছে। মানুষই ঘরের লক্ষ্মী—বাবা এ কথা বহুবার বলিতেন শুনিয়াছি। যে সংসারে তামাকের ছাই জমে না, মানুষের পায়ের পাড়া পড়ে না—সে ঘরে লক্ষ্মী নাই, ইহা তিনি বলিতেন।...

১২ই আগস্ট

ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। রেণু ১১টার পর আসে। মনু নীহার ছেলে মেয়ে সহ আসে ১০টায়...৪টার সময় ধীরেন ডাক্তার আসে ইনজেকশন-এর জন্য।...বৈকালে ৪টায় সত্যেন কর আসেন। তাহার সঙ্গে প্রবন্ধ প্রতিযোগীদের পুস্তক সম্বন্ধে কথা হইল। একটা বইয়ের লিষ্ট তাহাকে দেওয়া হইল।...আজ অনেক মাস পর প্রতিভার সঙ্গে গৌরী আসে। তাহার সঙ্গে কথা হয়। ২ঘণ্টার উপর থাকে। সত্যেন কর যখন আসেন, তখনও গৌরী ছিল, বাতাস করিতেছিল।

১৩ই আগস্ট

ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। একটা উদ্ধৃতি মিলাইবার জন্য ব্র্যাডলীর সহিত খোঁজ করি। বোধহয় উহা তাঁহার Essays বইতে থাকিবে। ডাক্তার ১০টায় আসে।... রেণু প্রেসে প্রুফ দিয়া...এখানে আসে ৩টার পর। প্রতিভাও সেই সময় আসে।...ঊষাদিদীকে নীহার আসিয়া ৭টায় নিয়া গেল। রেণু আজ রাত্রিতে এখানে ছিল। চারুরিয়ার ধীরেনবাবু আসেন ৪টার পর। ৭টায় যায়।... কাল ধীরেনবাবু আসিবেন বৈকালে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য।...

১৪ই আগস্ট

রেণু সকালে ঠাকুর ঘরে প্রার্থনা করে। পরে চলিয়া যায়। আবার দুধ ও ছানা দিয়া যায়। ঠাকুর-পূজা করিবার জন্য প্রায় ১২টায় আসে। প্রতিভা আসে ২টার পর, যমুনা যাইবার পর। রেণু সাময়িকী (১৮ই আগস্ট) লেখে ১২ পৃষ্ঠা। ধীরেনবাবু (চারুরিয়া) আসেন প্রায় ৪টায়।...ধীরেনবাবুকে 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি' পড়িতে দেওয়া হয়।...শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিশ্ব-সত্তার একটী পরম অর্থ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে আছে এবং উহা হইতে অতীত (অধিকম্—something extra) আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বত্রাতা। আমার জীবনে শ্রীনিত্য-গোপাল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যেমন করিয়া কৃষ্ণ হইলেন, রাধা হইলেন, গৌর হইলেন, তাহার একটু আভাস দেই। আমি কৃষ্ণকে আমার মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া নিংড়াইয়া পাইয়াছি। সকালে '১৮ই আগস্ট' প্রবন্ধটী একটানে শেষ করি।...রেণু ঠাকুর-পূজা করে। রাত্রি প্রায় ৮টায় শেখরবাবু আসেন। তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে প্রথমে তিনি ভূমিকম্প হইতেছে অনুমান করেন। পরে শোনা গেল চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি হইতেছে, তখন খুব বৃষ্টি আসে। শেখরবাবু তাহার গাড়ী ভিজিয়া গেল আশঙ্কায় নীচে চলিয়া গেল। জীবনের কোনও একটী aspect বাদ দিলেও যে বাদ পড়ে না, সে যে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিবেই, এই সব

phenomena দিয়া প্রমাণ হয় যে, জীবনের সব aspect-এর বিকাশই পরিপূর্ণ সার্থকতা।…

১৫ই আগস্ট

ক্লেসকে ব্রহ্মসূত্রের ১২২—১৪৪+১৪৫—১৬৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেওয়া হইল। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ভাষ্য শেষ দেওয়া গেল। সকালে আজ ঠাকুর ঘরে যাই ও প্রার্থনাদি করি ১০।১১ দিন পর। রেণু ছানা ও দুধ দিয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রের কণাদের অংশ দেখি। কলিকাতা হইতে ২টার পর রেণু আসে। প্রতিভা কেন যে আসিল না, বুঝিলাম না। কোনও অসুখ হয় নাই তো? বীরেন ডাক্তারের আজ ইন্‌জেকসন দেবার কথা, কিন্তু সেও আসিল না।…

১৬ই আগস্ট

সকালে ব্রহ্মসূত্রের ৯ম কর্ষের প্রুফ দেখি। রেণু আসিয়া দুধ ছানা দিয়া যায়, মধুর কাপড় দিয়া আসে। নীরোদের কাছ হইতে ১৮৲ নিয়া আসে। …আজ ডাক্তার আসিয়া ইনজেকসন দিয়া যায় ১১টার পূর্ব্বে। ডাক্তারও কিন্তু বেদনায় কাতর ছিল গত তিন দিন হইতে। ১২টায় প্রতিভা আসে। রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া আসে ৩টারও পর। ৪॥০টার পর আজ ১৩ দিন পর আফিসে যাই। রাত্রি ৯টায় ফিরি। প্রতিভা পৌঁছাইয়া দিয়া বাসায় যায়। অফিসে আর্থিক জগতের বীরেনবাবু আসেন। …অমলজন রায় একটি চিঠি দিয়া এক প্রস্থ পূর্ণা সংখ্যার জন্য পাঠাইয়াছেন। ধীরে ধীরে উজ্জলভারত পথ কাটিয়া আগাইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়।…

১৭ই আগস্ট

সকালে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি। সাতটার পর রেণু ছানা ও আমার দুধ দিয়া যায়। সে কিছু সময় থাকিয়া প্রুফ দেখে। রেণু বিদ্যাসাগরের জন্য কলিকাতা ঘুরিয়া ২টার পর আসে। ব্রহ্মসূত্রের 'মহদ্দীর্ঘবদ্বা' সূত্রটি বিশেষভাবে দেখি। ৩টার পর… -র কবিরবাবু ফোন করেন উজ্জলভারতের যে কাহাকেও চাহিয়া। রেণু যায়। তিনি শুনিয়াছেন যে রেণু অন্যত্র চাকুরী নিয়া গিয়াছে। যখন শুনিলেন যে ইহা সত্য নয়, তিনি সুখী হইলেন। তিনি চান যে রেণু ইহাই করে।…পিসির আসিল না। মানুষ একটা অন্ধ 'জীবন' ভালবাসে; সে জন্য অস্তিত্ব বৃদ্ধি পরিণাম অপক্ষয় বিনাশের দিকে আদৌ দৃকপাত করে না। বুদ্ধির ভাষায় যখন কথা বলে, তখনই সে বাঁচামরার কথা বলে। মানুষ যে আত্মহত্যা করে তাহাও মরিয়া বাঁচিবার জন্য। 'জীবন' নিয়া সে চলিতে চায়; জীবনের পথে যাহাকিছু বাধা সে পায়, তাহাকে হজম করিতে পারে না বলিয়াই সে তাহাকে আঘাত করিয়া চলিতে চায়। সহজ প্রাণধারা শুধু ছুটিয়া চলিয়াছে। সে বাঁচামরা, বুদ্ধি-অপক্ষয়ের ধার ধারে না। এই কয়েকটি কথাই অফিসে বসিয়া আলোচনা হয়। ৪॥০ টায় আমরা অফিসে যাই। ৯টার পর প্রতিভা আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়।

১৮ই আগস্ট

সকালে ব্রহ্মসূত্র দেখি। রেণু কলিকাতা যায়। কবিরবাবু প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া বাড়ীতে আসিয়া খায়। দুধ আসে ১টায়। পুরাণো উজ্জলভারত গুলিকে ঊর্ধ্বাদিকীর ঘরের তাকের উপর রেণু প্রতিভা রাখে। কেন পরিশ্রমের ব্যাপার! এই শ্রমে রেণু বেশ ক্লান্ত হইয়াছিল।

১৯শে আগস্ট

কন্নড শৈব সাহিত্য

॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥

(২)

ভক্তের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া কিরূপে যে সাধনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে সেই প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন: এই মনের চঞ্চলতা আর কী বলিব? বানর যেমন গাছের একডাল হইতে অন্য ডালে লাফাইয়া চলে, আমিও সেইরূপ চলিতেছি। এইরূপ দুষ্ট মনকে আমি কিরূপে বিশ্বাস করি? (৪)

ভক্তিপ্রিয় দেবতার কাছে কবি ইহার প্রতিবিধান চাহিয়াছেন। কিন্তু ভক্তের আহ্বান হইলেই যে দেবতা সাড়া দিবেন তাহা নয়। ভক্তের সেই কাতর বেদনার কথা বলা হইয়াছে এইভাবে—'প্রভু, প্রভু' বলিয়া আমি তোমাকে ডাকিতেছি; 'প্রভু প্রভু' বলিয়া আমি চীৎকার করিতেছি; 'এই যে আমি' এই বলিয়া তুমি সাড়া দিতেছ না কেন? সর্বদা তোমাকে ডাকিতেছি। 'এই যে আমি' ইহা না বলিয়া তুমি মৌন রহিয়াছ কেন। (৫)

এদিকে সংসার জ্বালায় কবি জ্বলিয়া যাইতেছেন। ওদিকে তাঁহার আরাধ্য দেবতা নির্বিকার। তাই কবির কণ্ঠে আবার শোনা যায় কাতর প্রার্থনা: সাপের ছায়ায় ব্যাঙ যে অবস্থায় থাকে, তেমনি হইয়াছে আমার জীবন। হায়! সংসার বৃথা হইল। হে কূডলসঙ্গমদেব, আমাকে ইহা হইতে মুক্ত করো ও রক্ষা করো। (৬) আর একটি বচনে বলা হইয়াছে: বাবা তুমি, মা তুমি, বন্ধু তুমি, আত্মীয় তুমি; তোমাকে ছাড়া আমার আর কেহ নাই। তুমি আমাকে দুধের মধ্যেও ডুবাইতে পারো, আবার জলের মধ্যেও ডুবাইতে পারো। (৭)

কবি তাঁহার অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। বিদ্যাপতির ন্যায় তিনিও বলিতেছেন—'গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি', তবে তোমার কাছে যখন আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলিয়াছি তখন 'ধরা জন্ম ছোড়বি মোয়'। বসবন্ বলিতেছেন: যখন আমার অপরাধসমূহ গণনা করি, তখন তাহার শেষ দেখিনা। আমার আচার-ব্যবহারে দোষ, কাজেকর্মে দোষ, দানে গ্রহণে দোষ। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমার অনেক দোষ। হে দেব, তুমি এই দোষের কথা খেয়াল না করিয়া আমাকে ক্ষমা করো। (৮) কবির আকাঙ্ক্ষা অতি সামান্য, এককথায় তিনি শিব-ভক্তের চরণরেণু-প্রার্থী।—'আমি ব্রহ্মপদবী চাইনা, বিষ্ণুপদবী চাইনা, রুদ্রপদবী চাইনা। অন্য কোনো প্রকার উচ্চপদও আমার কাম্য নহে। হে দেব,

---

(৪) মাবনেন্নি মকটিয়ন্তে হলু কোণেয ঘাতুবিনিবেরে।
বেন মবর মাবের নমুবেরয়া। এন্ন মেচ্চুবেরয়া!
এন্ন তবে কূডলসঙ্গমদেব নিন্নিগে সোলুবুদয়া।
—কদলবর্দার বচন সং ৭২

(৫) অপ্পা অয়া প্রভু বিট্টিরুবুদিনিবেরে। অয়া অয়া প্রভু ওরুবুদিনিবেরে। ও এন্নলারেয়ে অয়া। অবাদল, বিষ্ণুর তরে বুডিবেরে। ও এন্নতে মৌনবে কূডলসঙ্গমদেবা। —ঐ বচন সং ৬৯

(৬) তলে সর্প নেরলন্তি ইর্পন্তে এনবাস্তিত্বা। অকটকটা। সংসারবু বৃথা হোয়িত্তা। কন্তু কূডলসঙ্গমদেব, ইন্ত তরিসি নন্তু রক্ষিসয়া প্রভুবে। —ঐ বচন সং ৫৮

(৭) অবে নেন্তু, তায়ি নেন্তু, বন্ধু নেন্তু, ঘনর নেন্তু, এনগে পরিপালন মাডলু ইরুবন্ত কূডলসঙ্গমদেবা, নীনল্লদে নারায়ন।
—ঐ বচন সং ৬৩

(৮) আন্ত অপ্পিন্ত অনেকানেকরিন্দেনগে পাপবেল্লি। অনন্ত জন্মদল্লি অপ্পি তায়ন্দিরি, পাপি তায়ন্দিরি, কূপি তায়ন্দে অপ্পিন্ত তায়ন্দিরি, মনেয় তায়ন্দিরি। এন্ত তলেমোল মাডিকায়ুদ্দরদে নিমগে অনন্তকোটি কূডলসঙ্গমদেবা। —ঐ বচন সং ৭৪

তুমি আমার প্রতি এই করুণাই কর যাহাতে আমি তোমার সদ্‌ভক্তের চরণে আশ্রয় পাই।' (৯)

"শিবশরণত্রিমূর্তি"র অন্যতম হেন বসব (অর্থাৎ মুখর বসব বা বীর বসব)। একজন প্রকৃত সদ্‌ভক্তের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন: 'শীল শীল' বলিয়া চীৎকার করিয়া তুমি খুবই গর্ব বোধ করিতেছ। তুমি কি জানো শীল কাহাকে বলে? শোন ভাই, যাহা আছে তাহা গোপন না করাই শীল; যাহা নাই তাহা উধার লওয়াই শীল; পরধন ও পরস্ত্রীকে স্পর্শ না করাই শীল। গুরুনিন্দা শিবনিন্দা শ্রবণ না করাই শীল, আমাদের কূডলচেন্নসঙ্গের (শিবের) শরণে আসিবার পরে নিজের সব কিছু দেওয়াই শীল। (১০)

উল্লিখিত বচনে কবিকে অনেকটা উপদেষ্টার ভূমিকায় পাওয়া যায় যেন সকল সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি সমস্ত লৌকিক স্খলন-পতন-ত্রুটির ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কিন্তু নিম্নলিখিত বচনে পাওয়া যাইবে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। কামিনী কাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া করি যে কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অবশেষে দুর্গতি-হরণ দেবতার চরণে শরণ লইয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: পরের সম্পদের প্রতি লোভ আমাকে অন্ধের মতো পাইয়া বসিয়াছে—আমি বিকল। স্বর্ণ, রমণী ও ভূমি চাহিয়া চাহিয়া আমি বৈকল্য-প্রাপ্তের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছি। হে প্রভু, তুমি আমার এই দুঃখের বন্ধ করিয়া তোমার করুণামৃত বর্ষণ কর এবং সকল প্রলোভনের উদ্ভাস হইতে আমাকে বাঁচাও। (১১)

(৯) ಪ್ರಭುವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನರಿಯದ ಪ್ರಭುವಿನೊಳು ಮಾತು ಸಭೆಯೊಳಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಯ್ಯಾ। ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಮಹಾಘನವಿನೋದದೊಳಗಿರಿಸಯ್ಯಾ। —ಐ ವಚನ ಸಂ ১০০

(১০) ಶೀಲ ಶೀಲ ಎಂದು ಘರ್ಜಿಸಿ ಕುಣಿದು ಕಿರಿಚುವಿರಿ। ಶೀಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಿಲ್ಲಾ। ಇಂದ್ರಿಯ ವಚನದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶೀಲ। ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೀಲ।...ಗುರುನಿಂದೆ ಲಿಂಗನಿಂದೆ ಕೇಳಲಿನಲ್ಲಿ ಶೀಲ।...ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶೀಲ। — ঐ বচন সং ১০৩

বীরশৈবদের দৃষ্টিতে জীব মূলতঃ শিব। তবে সেই জীব আবদ্ধ হইয়া আছে অজ্ঞান-রূপী আবরণে। শিবৈক্য-প্রাপ্তির জন্য জীবকে এই আবরণমুক্ত হইতে হইবে এবং তাহার সহায় হইতে পারে—গুরু, লিঙ্গ, জঙ্গম (শিবভক্ত), প্রসাদ, পাদোদক, বিভূতি, রুদ্রাক্ষ ও মন্ত্র। এই আটটি বিষয়ের স্তোত্র 'অষ্টাবরণস্তোত্র' নামে পরিচিত। কোনো কোনো কবি 'অষ্টাবরণস্তোত্র' লিখিয়াছেন। জঙ্গম প্রভুদেব তাঁহার একটি বচনে শিবৈক্য প্রাপ্তির আনন্দানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এইভাবে: সেই লিঙ্গের সহিত মিলন নবমুক্তার হারের ন্যায় মনোহর। স্ফটিক-নির্মিত পাত্রের প্রভার ন্যায় মনোহর। নির্মল বায়ুর পরিমলের ন্যায় মনোহর। (১২) কিন্তু সেই শিবৈক্য প্রাপ্তির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদাচার ও সদ্‌ভক্তি। বীরশৈব-ভক্তি সাধনায় সদাচার ও সদ্‌ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝাইতে গিয়া জঙ্গম প্রভুদেব বলিয়াছেন—যাহার ভিতরে সদাচার-সদ্‌ভক্তি নাই সে কিরূপে গুরুত্ব পাইবে? সদাচার-সদ্‌ভক্তি শূন্য কিরূপে নিষ্কলঙ্ক লাভ করিবে? তাহার জঙ্গম ও পরমত্ব-ও বা কিরূপে হইবে? লিঙ্গের প্রতি সদ্‌ভক্তিশূন্য ব্যক্তি কখনও মুক্তি পায় না। (১৩) অপর একটি স্থলে বলিয়াছেন—যে সত্য বলে না, যে সদাচারী

(১১) ಪರಸ್ಪರೇಯರ ಅಪಹರಿಸಿ ತಾನು ಬಲವಂತನೆನಿಸಿ ಕುಹಿರವಣ್ಣಾ, ಕೋಪ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ವಿಷಯವೆಂಬ ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ಬಲಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಹಿರವಣ್ಣಾ; ಈ ಬಲವಂತ ನಿನ್ನಿಂದಿ ನಿಜ ಕರುಣಾಮೃತ-ವೆಂಬ ಮಳೆಯಾ-ಗಲಿಸಯ್ಯಾ ಪರಾತ್ಪರನೆ ಅಜಯ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಕೂಡಲಿಯ ಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ।

—কর্ণাটক কবি চরিতে (প্রথম খণ্ড) বচন সং ৬০

(১২) ಲೋಹವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಕ್ಯವು; ಸ್ಫಟಿಕದ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಪರಿಮಳದ ಪರಿಮಳ ನಿಲ್ಲಲಿಬಹುದೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪರಿಮಳವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರಸವಾಗಿ ತುಳುಕಿತ್ತು।

—কর্ণাটক কবি চরিতে (১ম খণ্ড) বচন সং ৩৮৮

(১৩) ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನೆ ಗುರುವಲ್ಲದೆ? ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಸದಾಚಾರವಿಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಇದ್ದವನೆ ಲಿಂಗವಲ್ಲದೆ? ನಿಜಜಂಗಮ ಇದ್ದವನೆ? ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶರಣ ಇದ್ದವನೆ? ಇವುಗಳ ನಿಜದ ಸದಾಚಾರ ಸದ್ಭಕ್ತಿವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಲೆ ಅರಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಕಾಣಾ।

—বচনসাহিত্য বচন সং ১৫০

মন, যাহার মধ্যে সদ্‌ভক্তি নাই, যে সৎক্রিয়া করে না, যাহার সম্যক্ জ্ঞান নাই, তাহার বেশভূষা দেখিয়া ভক্তের শিব হাসিতেছে। ধিক্ ধিক্ এইরূপ লোক-গুলিকে। (১৪)

পণ্ডিতত্রয়ের অন্যতম শিবলেন্ক একটি বচনে মানুষকে কায়লোক হইতে শিবলোকে উন্নীত হওয়ার প্রেরণা দিয়া বলিয়াছেন: শরীরকে ভুলিয়া গিয়া জীব-কে জানিবে; জীবকে ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানকে জানিবে; জ্ঞানকে ভুলিয়া গিয়া আলো-কে জানিবে; আলো-কে ভুলিয়া গিয়া প্রভু শিবকে জানিবে। ১৫

মল্লিকার্জুন পণ্ডিতারাধ্য তাঁহার একটি বচনে মানুষের যাবতীয় অন্যায় দুষ্কৃতির জন্য স্বয়ং প্রভুকে অভিযুক্ত করিয়া বলিতেছেন: চিন্তা করা যে মনের ধর্ম তাহাকে তুমি অমি দেখাইয়া প্রলুব্ধ কর; যে চোখ তোমাকে দেখিবে তাহাকে তুমি নারী দেখাইয়া প্রলুব্ধ কর; যে হাত তোমার পূজা করিবে সেই হাতে তুমি ভুলিয়া ধাও কাঞ্চন। এই তিনটি বস্তু দেখাইয়া তুমি মানুষকে নষ্ট করিয়াছ। হে প্রভু, আমি তোমার বিলাস দর্শনে অবাক হইয়া আছি। ১৬

ষাদশ শতাব্দীর অন্যতম বচনকার সিদ্ধরাম একটি বচনে সংসারকে সর্পের সহিত তুলনা করিয়া প্রভুর চরণে আমার প্রার্থনা করিয়াছেন এইভাবে: সংসার-রূপী সর্পের মুখের নিম্নভাগে আমি বসিয়া আছি। ইহা কোন্ সময়ে আমাকে গিলিয়া ফেলিবে জানিনা; আবার কোনো সময়ে বা আমাকে ফেলিয়াও দিতে পারে তাহাও জানি না। হে প্রভু, তুমি আমাকে এই সর্পের মুখ হইতে তুলিয়া লইয়া রক্ষা কর। ১৭

ষাদশ শতাব্দীর বচনকারদের মধ্যে আমরা একজন ভক্ত মহিলার নামোল্লেখ করিয়াছি, তিনি হইলেন মহা-দেবিয়ক্ক (বা অক্ক মহাদেবি) অর্থাৎ অক্কিনী মহাদেবী। কন্নড় শৈব সাহিত্যের ইনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী; মহিলা কবিদের শীর্ষস্থানীয়া। দরিদ্র ঘরের সন্তান হইলেও মহাদেবীর রূপের খ্যাতি ছিল। তৎকালীন জৈনরাজা কৌশিক মহাদেবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাঁহার সেই প্রেম-ভিক্ষা প্রত্যাখ্যাত হইল। তখন সেই গোপন ভিক্ষা দরিদ্র পিতামাতার কাছে আসিল রূঢ় রাজ-আজ্ঞা রূপে। পিতা-মাতাকে বাঁচাইবার জন্য মহাদেবী বিবাহে সম্মতি দিলেন কয়েকটি শর্তাধীনে। একটি শর্ত ছিল এই যে, রাজা কোনোদিন তাঁহার সাধন-ভজন পূজা-উপাসনায় বাধা দিতে পারিবে না। রাজা সমস্ত শর্ত মানিয়া লইল বটে, কিন্তু সর্বদা শিবধ্যানে তন্ময় পুত-চিত্ত রমণীর পক্ষে একটি ভক্তিহীন কামুক পুরুষের সাহচর্য অসহনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে একদিন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া মহাদেবীকে বাহির হইয়া পড়িতে হয় কল্যাণনগরের শিবানুভবমণ্ডপের উদ্দেশে। হিতৈষীকুল পথের দুঃখকষ্টের কথা বলিলে তিনি বলিয়া-ছিলেন: যদি ক্ষুধা পায় ভিক্ষায় যাইব; যদি পিপাসা লাগে পুষ্করিণীর জল পান করিব; নিদ্রার জন্য আছে ভগ্ন মন্দির, আর রক্ষকরূপে সর্বদা সঙ্গে রহিয়াছেন শিব। ১৮

---

১৪) সভায় ঘুমিল, সমাচারস্থল অভেদ, সৎকর্ম দিবিল, শিবভক্তিশূন্যের, সমস্তির কর্মবাস, সম্যক্ জ্ঞানের দূরে রহু, ঈ বেহজ্ঞানের মোহি, ভবের নিমগ্নি বঞ্চিতাদে কাণা মোহনরঙ্গা।

—ঐ বচন সং ১৪৪

(১৫) কায়ব করদু জীবনরহিতরেদু। জীবব করদু জ্ঞানরহিতরেদু: জ্ঞানব করদু মোহনরহিতরেদু: মোহন করদ ঈশান মূর্তি মল্লিকার্জুনলিঙ্গ নমরিতরেদু। —কর্ণাটক কবিচরিতে (প্রথম খণ্ড) ভূমিকা ৪৮৩

(১৬) মোহব সময়ে স্ত্রীরূপে তোরিসি, মোহুব করিদে বেরেবে তোরিসি, পূজিসুব বৈলে হেলিসি তোরিসি, ঈ ত্রিবিধদলে তোরি-কোট্ট, মহালিঙ্গি দেবা অমরগণেশ্বর মল্লিকার্জুন। দী ঘালিদ বিনমিতাদে দেবাগণেশ। ঐ বচন সং ৪৮৫

(১৭) সংসারদেবে সর্পন অনমোলকিরেন্কা। আবাগ তুলী-ত্তেনরিসে, আবাগ উগলীতেনরিসেনন্না। অবর বাল্লিদন্ত মোহন্ন ক্রোধন্ন কল্পিসিদ-মল্লিকার্জুন। —কর্ণাটক কবিচরিতে (১ম খণ্ড) ভূমিকা পৃঃ ৩১৯

(১৮) হসিবাদরে ভিক্ষাকনুট্ট। তৃষেবাদরে কেরে জলবাপি-গলুট্ট। নিদ্রেয হাদু দেবালয়ট্ট। রক্ষেয়িকার্জুনয্য আবালগোপাল নীনেয়ল্লট্ট। —ভক্তমাল পৃঃ, ভূমিকা পৃঃ ২০০

239415

মহাদেবীর ভক্তিসাধনায় অপূর্ব ভাবের সুন্দর প্রকাশ হইয়াছে। শিবিরের গোপালের জন্য বীরার যে প্রেম-বিহ্বলতা ও বিরহবেদনা, রত্নদাসের জন্য তামিল মহিলা কবি আণ্ডালের যে ব্যাকুলতা, অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে মহাদেবীর রচনায়। তাঁহার কোনো কোনো বচনে আমরা দেখিতে পাই সেই প্রেম-ভক্তির চিত্র। একটি প্রসিদ্ধ বচনের ভাব এইরূপ: যে বৃন্দাবনের তমালবৃক্ষ, তোমরা কি দেখিয়াছ? যে গায়ক কোকিলকুল, তোমরা কি দেখিয়াছ? ওগো উড়িয়াচলা ভ্রমরপুঞ্জ, তোমরা কি দেখিয়াছ? সরোবরে ক্রীড়ারত হংসযূথ, তোমরা কি দেখিয়াছ? ওগো গিরি-কন্দরে নৃত্যরত ময়ূর, তোমরা কি দেখিয়াছ? নীলু কাণিরে, নীলু কাণিরে? যদি তোমরা দেখিয়া থাকো, তবে বলোনা কেন আমার শিব তোমার আছেন? ১৯

পরমাত্মার জন্য এই যে জীবাত্মার অভিসার, সেখানে মাঝে মাঝে আসিয়া বাধার সৃষ্টি করে প্রেহের বিদ্রোহ। দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বে বিকল কবি যেন চিৎকার করিয়া বলিতেছেন: ধ্বংস হোক এই দেহ—পূঁজের পাত্র, মলমূত্রের হাঁড়ি, হাড়ের কাঠামো; বাঁচিয়া থাক আত্মা। ২০

আর একটি বচনে দেখিতে পাই ভক্তের নিন্দা-স্তুতি সম্পর্কে গভীর ঔদাসীন্য লইয়া পরমাত্মাতে কবির আত্ম-সমাহিত হওয়ার চেষ্টা। সেখানে ভাব-প্রকাশের ভঙ্গিটি লক্ষণীয়: পাহাড়ের উপর ঘর তৈরী করিয়া মশা মারিতে কে চলিবে কেন? সমুদ্রে ঘর বাঁধিয়া কেমিল তরঙ্গে ভীত হইবে? হাটের মধ্যে কুটীর তুলিয়া গোলমালকে ভয় করিলে কেমন হয়? পৃথিবীতে যখন জন্ম লইয়াছ, তখন স্তুতি নিন্দা শুনিয়া মনকে ক্রোধে বিচলিত না করিয়া শান্ত চিত্তে অবস্থান করা। ২১

বচন সাহিত্যই যে কন্নড় শৈব সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান অংশ দ্বাদশ শতাব্দীর সাতজন ভক্ত-কবির রচনা হইতে আমরা তাহার পরিচয় লইলাম। অন্যান্য রচনার মধ্যে দেখা যায় কিছু কিছু প্রবন্ধ কাব্য, কিছু জীবন-চরিত এবং কিছু নাটক সাহিত্য। এই জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য দ্বাদশ শতাব্দীর কবি হরিহর। শিল্পীমনস্ক, সৃষ্টিসের অপূর্ব প্রকৃতির রচয়িতা হইলেও হরিহর প্রধানতঃ 'গিরিজাকল্যাণ'-এর কবিরূপে পরিচিত। তাঁহার 'আহাস' বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই চম্পূকাব্যখানির বিষয়-বস্তু গিরিজার কল্যাণ অর্থাৎ (শিব) পার্বতীর বিবাহ। কালিদাস তাঁহার কাব্যের জন্য যে বিষয়টিকে বাছিয়া লইয়াছিলেন, পরবর্তী-কালের প্রাদেশিক ভাষাসমূহে বহু কবিরেই (বিশেষত শৈব) সেই বিষয় অবলম্বনে কাব্য রচনা করিতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে হরিহরের প্রায় সমকালীন তেলুগু শৈব কবি শ্রীনাথ-রচিত "শৃঙ্গার-নৈষধম্" কাব্যের কথা।

পার্বতীর চরিত্র-চিত্র বর্ণনায় কন্নড় কবি হরিহর কয়েকটি ক্ষেত্রে কালিদাস হইতে ভিন্নরূপ দেখাইয়াছেন। কালিদাসের পার্বতী পিতার আদেশে শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু হরিহরের পার্বতী পূর্ব হইতেই শিবানুরক্তা। কুমারসম্ভবের পার্বতী মদন-ভস্মের পরে শুভক্ষণে ও অনঙ্গভয়কে গুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গিরিজাকল্যাণের পার্বতী মদন-ভস্মের সঙ্কটকে নিজের উপরে লইয়া নিজের যুক্তিতে সখীদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কুমারসম্ভবে 'নবপরিণয়লজ্জাভূষণা' পার্বতীর জড়োচের অবধি নাই, কিন্তু গিরিজাকল্যাণে পার্বতী যেন শিবের চির-সহধর্মিণী। কালিদাসের পার্বতী সাধারণ

(১৯) চিত্তিনিলি চেলুবাবর নিলিসলিল্লা, নীলু কাণিরে নীলু কাণিরে? সমবसिसुव कोकिलवेल्ला, नीलु काणिरे नीलु काणिरे? एरिगेयोडुव तुम्बिगेल्ला, नीलु काणिरे नीलु काणिरे? कोमल तरिलेयोळु हंसेयेल्ला नीलु काणिरे नीलु काणिरे? गिरिगुहेय मेलोडुव मयिलेल्ला, नीलु काणिरे नीलु काणिरे? नोडिदरिवुदु नीवेल्लि नेनेयि नीलु नेनेयिरे। —ঐ খণ্ড পৃঃ ২১৪

(২০) अम्मेयल्ल मेलिके मूरु मूरिटिन अन्दिन ओडलिगे मेलिके मूरु मूरिटिन अन्दिन ओडलिगे मेलि; अदनरिवुदिल्ल केडलिल्ल। —কর্ণাটক কবিচরিতে পৃঃ ৯১২

(২১) पेट्टेय मेलेनु मरेयदंते मृत्युविनोळिरिसिदिरु देहवा? समुद्रद तटदल्लि मनेयंते लोकवेल्लवनोळिरिसिदिरु देहवा? मनोजनन्तेनु मरेयदंते मातिनोळिरिसिदिरु देहवा? देह मतिगळलु निन्देय केळदा देहमोन्दर्गे हरिसलरिदु तळिदिरेयेनु, रुद्रने सर्वदा नोन्दवनन्ते सर्वाघातिसलि देहि। —ঐ খণ্ড পৃঃ ৯১৪

বালিকা, হরিহরের পার্বতী অনামাস্তা। এইরূপে হরিহরের লিখিতা যদিও দৈহসৌন্দর্য ও তপঃশক্তির সাকার মূর্তি, তথাপি কখনও কখনও কবি তাঁহার মধ্যে ক্রোধ, অহঙ্কার ইত্যাদি বৃত্তির সঞ্চার করিয়া পার্বতীকে মানবিক গুণেও ভূষিত করিয়াছেন।

অন্যান্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "হরিশ্চন্দ্র কাব্য"-রচয়িতা রাঘবাঙ্ক (ষোড়শ শতাব্দী), "উদ্ভটারাধ্য" রচয়িতা সোমরাজ (ত্রয়োদশ শতাব্দী), পালকুরিকি সোমনাথ (ত্রয়োদশ), ভীমকবি (চতুর্দশ), চামরস এবং নেমণ্ণ-শিবযোগী (পঞ্চদশ)। সোমনাথ ও ভীমকবি প্রধানত তেলুগু ভাষার কবি। সোমনাথের তেলুগুতে রচিত "বসবপুরাণম্"-র উপর ভিত্তি করিয়া ভীম কবি কন্নড় ভাষায় লিখিয়াছেন "বসবপুরাণ"। কন্নড় ভাষায় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ জীবনী-কাব্য হইতেছে চামরস-প্রণীত "প্রভুলিঙ্গ-লীলে" (রচনাকাল ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ)। অন্যতম প্রধান শৈব ভক্ত অল্লম প্রভুদেবের জীবন ও কীর্তি অবলম্বনে রচিত এই কাব্যখানি তামিল, তেলুগু, মারাঠী ও সংস্কৃত এই চারিটি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই কবির ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে: ক্রোধাবেশে কষ্ট পাইয়া, দর্পের তাপে নষ্ট পাইয়া, মাৎসর্যের কূপে বসিয়া থাকিয়া, আত্মাহংকারে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া বৃদ্ধিহীন হইল। যে প্রভু, আমার ন্যায় মহাপরাধ-নিমগ্ন পাপীর পক্ষে ভক্তিলাভ কি সম্ভব? (২২)

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বীরশৈবকবিদের লিখিত অনেক শতক কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর যেমন বিশেষ রচনা বচনসাহিত্য, তেমনি ষোড়শ শতকের বিশেষ রচনা শতকসাহিত্য। তেলুগু শতককাব্যের আদর্শে গঠিত এই কন্নড় শতককাব্যে বীরশৈবসম্প্রদায়ের তত্ত্বনিরূপণের সঙ্গে ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কন্নড় ভাষার দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ (বড় জোর পঞ্চদশ) শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে আমরা শৈবসাহিত্যের যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। সুতরাং অভিজাত-শৈবযুগে যে উচ্চাঙ্গের শৈব সাহিত্য রচিত হয় নাই ইহাই স্বাভাবিক। তবু উহারই মধ্যে ষোড়শ শতকের শেষভাগে এক মহান্ শৈব সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি 'সর্বজ্ঞ' নামে পরিচিত। তাঁহার পূর্ব নাম জানা যায় না। শোনা যায়, পিতা ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার মাতা ছিলেন নিম্নশ্রেণীর রমণী। পিতা-মাতার এই অসবর্ণ বিবাহের জন্যই বোধ করি শিশুপুত্রকে প্রতিবেশীর তাড়নায় বাল্য-কালেই গৃহত্যাগ করিতে হয়। সম্ভবত এই কারণেই উত্তরকালে আত্মপরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিতেন—'আমি শিবের পুত্র'।

সর্বজ্ঞের কিছু কিছু মিল দেখিতে পাওয়া যায় তেলুগু শৈব কবি বেমনার সহিত। বেমনা জন্মিয়া ছিলেন শৈব আন্দোলনের শেষে বৈষ্ণব আন্দোলনের যুগে। সর্বজ্ঞও তাই। বেমনা রচনা করেন প্রধানত তেলুগুর একটি ক্ষুদ্র ছন্দ 'আটবেলদি'তে; সর্বজ্ঞ রচনা করেন কন্নড় ভাষার একটি ক্ষুদ্র ছন্দ 'ত্রিপদি'তে। শিবের ভক্ত হইয়াও বেমনা শৈব সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ সীমায় বাঁধা থাকিতে পারেন নাই। সর্বজ্ঞ-কেও আমরা ঠিক সাম্প্র-দায়িক কবি বলিতে পারি না। তেলুগুভাষীদের মধ্যে বেমনার ন্যায়, কন্নড়িগদের মধ্যে সর্বজ্ঞের রচনাও এক একটি প্রবাদবাক্যরূপে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বেমনা-রচিত পদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার; সর্বজ্ঞ-রচিত পদের সংখ্যা দুই হাজারের কিছু বেশি। (চন্নপ উদ্ভটি সংকলিত 'সর্বজ্ঞ বচনগলু'তে (১৯৫০খৃঃ) ২০৯২টি পদ পাওয়া যায়।) সর্বজ্ঞের বচন কন্নড়িগদের জ্ঞান-ভাণ্ডার। ভক্তি ও ভক্তের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন: ভক্তিতেই মুক্তি মেলে; ভক্তিতেই শক্তি। যদি ভক্তি ও বিরক্তি (বৈরাগ্য) না জন্মে, তবে জগতে মুক্তি নাই। (২৩) বহিরঙ্গ ভক্তি অপেক্ষা অন্তরঙ্গ

(২২) কোপ্পারিলিনি কোরবি, দুর্গদ ভাগবলি সলবানি, বংসা কৃপবলি কুরিয়িনি, তিমির সীমেবলি সিক্কি, রোপমুরিবে সোমনাদি, মহাপরাধলোলুকি পাপিগন্মে ভক্তিসাধ্য বসব কেলেম।

—কর্ণাটক কবি চরিতে (২য় খণ্ড) পৃঃ ৬১

(২৩) ভক্তিবিনলে মুক্তি। ভক্তিবিনলে শক্তি।

ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন; সেই দেবতার; জীবই শিবলিঙ্গ। বাহ্য ব্যাপার হইতে মুক্ত হইয়া যে ভজনা করে নিশ্চয়ই সে মুক্তি পায়। (২৪)

হিন্দী সন্তকাব্যের মধ্যে আমরা যে সকল প্রসঙ্গের ছিটা দেখিতে পাই, সর্বজ্ঞে তাহাতে যেন তাহারই অবিকল প্রতিধ্বনি। গুরু ঈশ্বর অপেক্ষাও বড়, ভক্তিহীন হইয়া জগতের তীর্থযাত্রা প্রভৃতি বাহ্য অনুষ্ঠান একান্তই নিরর্থক, যিনি ভক্তিমান্ তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরকে বাহিরে খোঁজার কোনো আবশ্যকতা নাই, উদ্ধারকর্তা ভগবান যখন অন্তরেই রহিয়াছেন তখন ঘাটে ঘাটে ঘুরিবার কী প্রয়োজন, আত্ম-জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান বিনা ভক্তির বিকাশ হয় না, ইত্যাদি প্রসঙ্গ সর্বজ্ঞের বচন সমূহে নানাভাবে ছড়াইয়া আছে।

ভক্তিবিহিনজিবী জগমাহি।
মুক্তিবিহিন সর্বজ্ঞ।— সর্বজ্ঞবচনামৃত সং ২৩৪
(২৪) যেহ দেবালয়ম্। জীবহি শিবলিঙ্গ।
বাহ্যকর্মাণি তদ্ধ্যক্ত্বা মুক্তিদাঃ।
সেবিতব্যো সর্বজ্ঞ।—ঐ সং ২৩১

অভিসার

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

এ তরী আমার ভেসে ভেসে চলে,
চলে আর যাবে যাবে
এ ঘাটে ও ঘাটে খানিক দাঁড়ায়,
তারপরে আর যায়
চলে সমুখে, পিছনের পানে
আর ফেরে নাক' কভু :
এমনি করেই আমার এ তরী
চলে, থামে আর চলে।

এ ঘাটে কোথাও শোনে হাসি ওঠে,
সুমধুর কলরব
স্নিগ্ধ মুখের, চারিদিকে দেখে
হাসি হাসি কত মুখ ;
সে-হাসির-মাঝে খুঁজে পায় সে কি
যাকে খুঁজে খুঁজে ফেরে ?
পায় না, আবার চলে ভেসে ভেসে
আবার আর এক ঘাটে।

এসে থামে, দেখে কান্নার তীর,
শুধুই কান্না-ভরা ;
ছল ছল আঁখি যার পানে চায়,
চোখের জলের মেলা ;
তবু দেখে চেয়ে যদি খুঁজে পায়
এই বেদনার তীরে
তাকে—যার তাকে ঘরছাড়া হয়ে
বেরিয়েছে অভিসারে।

এ-ঘাটে ও-ঘাটে কোথাও মেলে না :
সে কি আছে কোনখানে !
কে জানে ! তবু এ ভেসে ভেসে চলা
এই বেশ, এই ভালো।
তীর নয়, তরী অতলে তাসুক—
হাসি আর কান্নার
বাঁধ দূর দিয়ে ; চিরকাল ধরে
চলুক এ অভিসার।

পুণ্যভূমি অযোধ্যা

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

একটানা গাড়ী ছুটে চলেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আসছে তাদের প্রাকৃতিক বিভিন্নতা নিয়ে—কোথাও বন্ধুর, কোথাও পর্বতময়, আবার কোথাও বা শ্যাম শ্যামলিমায় ঢাকা। প্রত্যেকটি প্রদেশের মানুষের রুচি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সামাজিক রীতিনীতি ভিন্ন, আহার ও আচারের সামগ্রীও ভিন্ন তবু সকলের মধ্যেই আছে একটি জায়গায় বড় নিবিড় মিল। আমরা প্রত্যেকেই ভারতবাসী, ভারতবর্ষই আমাদের দেশ। এরই জলবায়ুতে সব বয়ে আমরা প্রাণরস গ্রহণ করছি। এই মাটি-মায়ের সঙ্গে যে আমাদের নাড়ীর টান—এরই বুকে যে আমাদের সুখ দুঃখের খেলা। আমাদের দৈনন্দিন বেদনা আনন্দ একই সুরের। আমরা ঠাঁই ঠাঁই, তবু ভাই ভাই!

ওগো গরিয়সী মাতৃভূমি! তোমার আপন সত্তায় তুমি সর্ব বাধা অতিক্রম করে চিরন্তনী হয়েছো। তোমার ঐতিহ্য সামান্য নয়। মানব সভ্যতায় তোমার দানের তুলনা নেই। তোমারই বুকে একদিন জেগেছিলো বিশ্বমৈত্রী ভাবনা—সে ভাবনা আজও বিশ্বের অণুতে অণুতে কম্পিত। মানব সভ্যতায় তোমার দানের তুলনা নেই, তোমার সত্যদর্শী ঋষি সন্তানেরা তোমারই বুকে অমরত্ব লাভ করে চিরন্তন হয়ে গেছেন আপন তপস্যায়, পুরুষকারের বলে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—এ আত্মা কদাপি বলহীনের দ্বারা লভ্য নয়। আমাদের ঋষিবাক্য জীবনময় দিয়ে গেছেন ত্যাগ, সত্য-নিষ্ঠা, আত্মজিজ্ঞাসা।

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'

হে মানব! ওঠ, জাগ, মহৎ আচার্যগণকে আশ্রয় করে জ্ঞান লাভ কর। এই সাধনার পথ বড়ই দুর্গম। বিবেকীগণ এই পথকে ক্ষুরের নিশিত ধারের ন্যায় দুর্গম বলে থাকেন। তবু যে অমৃতস্য পুত্রা, তাকেই অনুসরণ করে যেতে হবে।

খুলে যাও চৈতন্যের দুয়ার—সেই খোলা পথেই আসবেন তোমার জীবন দেবতা। এই হানাহানির রক্তাক্ত যুগে আমাদের কিছু দেবার আছে। আমরাই এনেছি শান্তির বাণী, সমন্বয়ের কথা—

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং বো মনাংসি জানতাম্
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সং জানানা উপাসতে।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ
সহ চিত্তম্ এষাম্
সমানং মন্ত্রম্ অভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা
জুহোমি।

এর বাড়া সাম্য আর কোথায়?—সব এক হও, এক ভাবনায়, এক ভাবে লিপ্ত হও। এশিয়া আজও অনেক যুগে অনেক সাধনায় তার জ্ঞানের দীপটি জ্বালিয়ে রেখেছে—তাই আজ আর্ত জগৎ আকুল হয়ে চেয়ে আছে এরই পানে পথ নির্দেশের আশায়! এরই মাটিতে প্রভু যীশু বলে গেছেন "সম্ভবামি যুগে যুগে।" এর বাড়া প্রয়োজনের দিন কি আমাদের আর আসবে? এই সঙ্কটময় যুগ-সন্ধিক্ষণে তুমি কোথায়?

আমরা এগিয়ে চলেছি অযোধ্যার পথে—আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পতিপত্নী ও আদর্শ লোকরঞ্জন রাজারামের রাজধানীতে। এত মহৎ প্রাণ কিন্তু কি দুঃখময় জীবন! কি বেদনাময় পরিণতি! সুখ নয়! ভোগ নয়! শান্তি নয়! কঠোর পরিশ্রমী, ভাবপ্রবণ, কর্তব্যে অটল সে পাষাণের স্মরণে মন উদাস হয়ে যায়। আমাদের আধুনিক মন থেকে থেকে প্রশ্ন করে, কে বলে তিনি ভাবপরায়ণ পতি? সত্যনিষ্ঠ পিতা? প্রজারঞ্জন রাজা?

সীতা পরিত্যাগের অভাব কই—কই যোগ্য সমাধান? স্বপ্নের সত্য সত্য, না অনভিজ্ঞতা? লোকাপবাদ? কোন্ সত্যকে বড় করব? সীতা বর্জনে কি পতিধর্ম লিখিত হয় নি? সীতা বিসর্জনে কি পিতৃধর্ম ধূলায় লুণ্ঠিত হয় নি? প্রজা পালন, তাকে রক্ষা রাজধর্ম—সে রাজধর্ম কি রক্ষিত হয়েছে সীতা পরিত্যাগে? সীতা যে একাধারে তাঁর পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী—পুত্রের জননী ও প্রজা। বুঝতে পারি না এর মহিমা—শুধু মন ব্যথায় টনটন করে ব্যর্থ আতুরতায়? যে রাম শবরীর সেবা নিয়েছিলেন, বনবাস গ্রহণ করেছিলেন, রাবণ বধ করে সীতায় করেছিলেন উদ্ধার, তাঁকে বুঝতে পারি কিন্তু এই অভিমানব রাজারামকে বুঝতে পারি না—চিনতে পারি না সেই রামচন্দ্রকে যিনি বধ করেছিলেন তপস্বী শূদ্র রাজা শম্বুককে।

এইখানেই "ন্যূচোরক্তো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" সূর্যবংশ-শ্রেষ্ঠ রাজা দিলীপ প্রবল প্রতিপত্তিতে অকম্প মহিমায় রাজত্ব করে গেছেন—যোগ্য পুত্র কামনায় রাণী সুদক্ষিণাকে নিয়ে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমের পথে পথে শোভন চরিত্রে ফিরেছিলেন। পেয়েছিলেন লোকশ্রেষ্ঠ রঘুর মত পুত্র—যার নামে রঘুবংশ অমর হয়ে গেল। রাজারাম সেই মহান বংশেরই শেষ সূর্য।

অযোধ্যায় আজ আর সেদিনের কিছু নেই—সব শ্মশান সব শূন্য। এর পথের ধূলায় আকাশে বাতাসে আজও হিন্দুর মনে রামরাজ্যের স্মৃতির বেদনা—নানা কল্পনার মুকুর।

মন ভেবে চলে, চোখের ওপর ছবির পর ছবি ফুটে ওঠে ...বনবাসে—হৃদয় বিদারক সে দৃশ্যে সবাই ব্যথিত। বৃদ্ধ রাজা দশরথ মৃত্যুশয্যায় পুত্রশোকে। রাজমাতা কৌশল্যারাণীর হাহাকারে পুরী কম্পিত—কিন্তু অপরা মহিমায় যে ঐ মহিমাময়ী একবার মাত্র দর্শন দিয়ে চিরদিনের মত অন্তরালবর্তিনী হয়ে রইলেন। ধীর শান্ত চিত্তে সংযত ভাবে যে পুত্রকে বলছেন, যাও বাছা! রামের অনুগামী হও!

রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা সুখম্।

সমস্ত কাব্যে হে লোকশ্রেষ্ঠা! তোমার দর্শন আমরা বেশী পাইনি। কিন্তু যে একবার তুমি আমাদের দর্শন দিলে, পরম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে তুমি চিরন্তনী হয়ে রইলে। হে লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রা, তুমি অতুলনীয়া! যজ্ঞের চরু নিয়ে এলেন রাজা অন্তঃপুরে—স্মরণ করলেন প্রবীণা কৌশল্যাকে—স্মরণ করলেন প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে। তোমার কথা কি বারেকও মনে পড়েনি? সপত্নীদের কৃপায় পুত্রলাভ করেছিলে সে কথা তুমিও ভোলনি—ভুলতে দাওনি পুত্রদের। হে পতিস্নেহ বঞ্চিতা কাব্যে উপেক্ষিতা রাণী—তোমার মত জননী না হলে তো লক্ষ্মণের মত পুত্র হয় না। আর কি দেখি—দেখি সেই শূন্য রাজপ্রাসাদে পাটনীর মত নীরবে দাঁড়িয়ে আছে উর্মিলা।

হায় উর্মিলা! তোমার সে লুকিয়ে ফেলা চোখের জল, গোপন বেদনার বিফল দীর্ঘশ্বাস কেউ কি দেখেনি? কেউ কি শুনতে পায়নি? হে কাব্যে উপেক্ষিতা! তোমার কথা আজ আমরা মানবীর হৃদয় নিয়ে স্মরণ করছি!

শূন্য সে প্রাসাদে বসি কাঁদে একাকিনী
যেন রে দুখের মাঝে কোন্ বৈরাগিনী,
যৌবনে যোগিনী সাজি কি দুঃসহ দুখে
বাল্মীকির উপেক্ষিতা কাঁদিছে উর্মিলা।
বরষ বরষ ধরি তপস্যা তাহার
একাকিনী ধ্যানরতা অন্তরবাসিনী
শূন্য গৃহ ব্যর্থ দিন নবীন যৌবনে
কেটেছে প্রহর যত পল গণি গণি।
আনমনা তুমি, কবি, আগে চলে গেলে
মানস-দুহিতা লয়ে পূর্ণ সে গৌরবে
লয়ে তার সুখ দুখ ভাগ্য বিড়ম্বনা
চতুর্দশ বর্ষ বনে লক্ষ্মণ কাটাবে।
আবার ফিরিবে যবে উর্মিলার পাশে
চমকি দেখিবে হায় কোথা সে কিশোর?
তপস্যারী বন শুধু এ কোন্ তাপস,
কোথা সে মোহন রূপ নয়ন-বিভোর।
নাই নাই সে লক্ষ্মণ, সে উর্মিলা নাই,
সময়-সাগর দিল মুছি বাববার—

যবে যবে অবতীর্ণ বিষ্ণু পাপার
যা গিয়েছে চিরতরে তাহার প্রমাণ।
হে নিষ্ঠুর রত্নাকর, হে কবি বাল্মীকি।
তারে কভু ভুল করে জাননি স্মরণে
চির উপেক্ষিতা কেন উর্ম্মিলা স্বভাগী?
দেখ নাই কি বেদনা বিম্বোষ্ঠ লক্ষ্মণে!
তবুই কি ভ্রাতৃপ্রেম কর্ত্তব্য কঠোর?
বনে ফিরি ধনুর্দ্ধারী যুগলের সাথে
একক জীবনে তার হৃদয়ে গোপনে
জাগেনি কি কারো ছবি সন্ধ্যার প্রভাতে?
বাজেনি কি কারো কথা কোকিল কূজনে
কাঁদে নাই নীরবে কি সে পাষাণ প্রাণ,
অন্তর প্রতিমা কভু জাগেনি কি ভুলে
হৃদয় কি চাহে নাই কোন প্রতিদান?
বসন্তের সমারোহে রোমাঞ্চিত বনে
গোপন মানস ফুলে লাগেনি কি দোলা
অশোক কিংশুক শাখা রংয়ে রংয়ে রাঙি
করেনি কি বিরহীর হৃদয় উতলা?
নব ঘন আষাঢ়ের ঘন ঘোর ঘটা
স্মরণে কি জাগায়নি আকুল-আকুতি?
সন্ধ্যায় সঘন মেঘে প্রেমদীপ জ্বালি
কেহ কি রে পাঠায়নি স্মরণে প্রণতি?
মাঘ ভাদর আসে বরষে বরষে
বুকে ধরি বিরহিনী রাঘিকার ব্যথা,
ধনুর্দ্ধারী ব্রতচারী একক জীবনে
শুনিবারে প্রিয়তমা প্রিয়ার বারতা—
হয়নি কি কোনও দিন একান্তে গোপনে
উঠেনি অধীর হিয়া বেদনা উন্মনা?
হে বাল্মীকি! এ তোমার কবিতা-বিতানে
এ ব্যথার কোনখানে নাইতো সান্ত্বনা।

—হে মহাকাব্য রচয়িতা মহাকবি!—এ প্রশ্নের অবাব কই?
তোমার কাব্যে—এ দুর্লভ ফুলের কেন অবহেলায় ধূলিলুণ্ঠিতা?

কৈকাবাদ থেকে যে পথে অযোধ্যায় এসেছে তারই প্রবেশ পথের কিছু দূরে অক্ষয়বান মন্দির—এই খানেই নাকি অন্তর্ধান করেন লোকনেতা সীতাপতি রাম। মন্দিরে রামসীতার মূর্ত্তির শোভা। এই মূর্ত্তিতে একটি বৃহৎ মণি সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করছে। এই মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে সোনাসক বা কনকভবন। এই কনকভবনে রামসীতার কনকমুকুট শোভিত মূর্ত্তি আছে।

অক্ষয়বানের প্রাচীন মন্দির অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল; তারই জায়গায় যে অপেক্ষাকৃত নতুন মন্দির রচিত হয়েছিলো, সেটিকে ধ্বংস করিয়ে বাবর রচনা করান মসজিদ। কি পরধর্ম্ম অসহিষ্ণু এই মোগল বাদশাহরা! মন্দির থেকে নেওয়া বারটি কষ্টিপাথরের সুন্দর স্তম্ভ এর অক্ষয় ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

রামায়ণ-প্রসিদ্ধ সরযূনদী তীরের এই অযোধ্যায় আজও বহু প্রসিদ্ধ ঘাট আছে, স্বর্গদ্বার বা রামঘাটই তার মধ্যে প্রধান। এই ঘাটেই নাকি লোকোত্তর ধামের নশ্বর দেহ ত্যাগ করা হয়। আছে লক্ষ্মণের নামে প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণ ঘাট। দুর্ব্বাসা মুনির ক্রোধ-ভীত লক্ষ্মণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রামকাজে অকালে গমনে বাধ্য হয়ে রামসেবা রক্ষিত জীবন এই ঘাটেই বিসর্জন করেন; ইহাই প্রবাদ। মণি পর্ব্বত, কুবের পর্ব্বত, সুগ্রীব পর্ব্বত ইত্যাদি বহু ছোট ছোট পর্ব্বতময় এই পৌরাণিক যুগের স্মৃতি সমন্বিত হিন্দুর মহা পবিত্রস্থান অযোধ্যা। সেই গত গরিমার আজ আর কিছু নেই—তবু আছে শতাধিক মন্দিরের মনোহরণ শোভা আর হিন্দুর মনে রামরাজ্যের স্মৃতির বেদনা।

রামচন্দ্রের জন্মস্থান এই অযোধ্যা হয় লীলাভূমি। তাই এইখানে রামলীলার বিশেষ সমারোহ হয়। বহু জনসমাগম হয় এই মহোৎসবে আর সাড়ম্বরে মহা ধুমধামে একে উদযাপিত করা হয়।

মন যখন দেখে—বহু দুঃখ সেবে নীলকণ্ঠের মত যত গরল পান করে সীতাকে নিয়ে রাম সিংহাসনে বসেছেন। অন্তঃপুরে তাঁর কৌশল্যারাণীর মত জননী, জানকীর মত প্রিয়া। ভরতের মত ভাই লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মত অনুজ তাঁর সহায়। রাম বুঝি ক্ষণেকের জন্য আপনাকে সর্ব্বসুখে সুখী মনে করলেন—আনন্দের স্বপ্ন দেখলেন। অলক্ষ্যে বসে হাসলেন বিধাতা!

লক্ষ্মণ শেল পাষাণ রামের কাছে সীতা-বনবাসের আদেশ। স্তম্ভিত বিস্মিত লক্ষ্মণ বারেক দিয়ে চাইলেন রামের পানে বিফল বেদনায়। রাজারাম অটল অনড়। আপন বিড়ম্বিত ভাগ্যকে অভিশাপ দিলেন বুঝি লক্ষ্মণ। উপায় তাঁর নেই। ভ্রাতৃ-আজ্ঞা পালনই তাঁর ধর্ম।

হায় সীতা!

অতুল ভুবনে তুমি, হে বরবর্ণিনী
তোমার জীবন গাঁথা তুলনা অপার
কে পেয়েছে এত দুখ একটি জীবনে
মর মর্মে অন্তহীন এত দুঃখ কার?
বীরশ্রেষ্ঠ পত্নী তবু হায় বিড়ম্বনা
রাক্ষসের রাজরোষে কে হ'ল লাঞ্ছিতা।
জীর্ণ বাস কীর্ণ দেহ বিরহে ব্যাকুল
কাঁদিছ অশোক বনে, সে তো তুমি সীতা!
কাহার জীবনে বল এত ভুল-ভোলা
মহিমায় মহীয়সী তুমি ঐ ভুবনে
সব পেয়ে সব হারা আর কেবা বল
প্রিয় নাম জপি যাপ' অশোক কাননে।
চিতাস্তে আলিঙ্গিয়া অনলে হেলায়
কে উঠিল অগ্নি হতে সত্যে উদ্ভাসিতা!
বিস্ময়ে সম্ভ্রমে স্তব্ধ করি পৌরজনে
সুখে দুখে অচঞ্চল বিজয়িনী সীতা।
নিলোভোরে কলঙ্কিতা পতিত্যক্তা তবু
জাগাওনি মনে কভু ক্ষুব্ধ অভিমান
কে পেয়েছে ধরণীতে এতখানি প্রেম
কে হয়েছে তোমাসম ক্ষমার মহান?
বারেক কি জাগে নাই ক্ষুব্ধ অভিমান
উথলিয়া ওঠে নাই আকুল ক্রন্দন?
পেয়েছিলে কোন্ প্রেম শ্রীরামের কাছে
যার বলে বলহীন শান্ত তব মন।
সকলি সয়েছ হাসি প্রিয়-দান মানি
নির্বাসিতা তুমি সীতা তবু স্মিত হাসে
রাজধানে একাকিনী কাটালে জীবন
কলঙ্কিতা বিনা দোষে ঘোর বনবাসে।
রাজসুয় যজ্ঞ রাজা করিছে পালন—
বাল্মীকির আশ্রমে এল আনন্দ বারতা
চমকি উঠিলে তুমি উতলা-হৃদয়ে
তবে কি হয়েছ তুমি সত্য নির্বাসিতা?
জাগিল সংশয় চিত্ত কণ্টকিত করি
শ্রীরাম কি রাখে নাই জানকীর মান?
তবে কি তপস্যা তব হয়েছে বিফল
সীতা প্রেমে পূর্ণ নয় শ্রীরামের প্রাণ।
এতদিনে জেগে ওঠে বেদনা পাষাণ
কম্পমান আঁখি দুটি ভরে ছলছল,
সর্বহারা কিশোরিণী মরিছে লজ্জায়
দুঃখ তব এতদিনে হয়েছে অতল।
রামের জীবনে নাই অন্য কোন নারী
ধৈর্যে বুক বাঁধা ছিল এই আশা লয়ে
কাছে থাক দূরে থাক হৃদয় মন্দিরে
তোমারই আরতি রাম করে রহে রহে—
এই মহাসান্ত্বনা তব অনন্ত সম্বল,
সেথায় জাগিলে দোলা হও বাঙালিনী,
সমস্ত জীবন ধরি করেছ সম্বল
বিশ্বাসের মহাপাশ হায় বিরহিনী।
সে কি ভুল? সে কি তবে মায়া মরীচিকা?
একান্ত নির্ভর তব সকল ভুলিয়া
শ্রীরাম কি ভুলে যাবে এই মর্ম কথা—
থেকে থেকে কেঁদে ওঠে ব্যথাতুর হৃদয়।
অনিন্দ্য সে অনুরাগ ছড়াল বাতাসে—
নাই সীতা—স্বর্গসীতা গড়েছেন রাম।
আনমনা করে চোখে উথলি উছলি
ক্ষমা চাহি, মনে মনে জানাও প্রণাম।

সব দুঃখকে বুকে নিয়ে ধন্য তুমি সীতা। হে রাম। সীতা বিহনে স্বর্ণ সীতায় পরিকল্পনা ধরায় তুলনাহীন। তোমরা সেই গতদিনের সৌরভ, হে আদর্শ মানব-মানবী তোমাদের নাগাল পাই না—তবু তোমাদের লীলা-ভূমি এই পুণ্যময়ী অযোধ্যার ধূলি স্পর্শ করে আজ আমি ধন্য।

বন্ধুবরেষু

শ্রীশান্তশীল দাশ

সাধারণ নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে। তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে চতুর্দিকে। দেয়ালে দেয়ালে নানা রকম ছোট বড় পোষ্টার পড়েছে, আরও পড়বে। সময় মতই উঠে পড়ে লেগেছে আপন আপন দলের, তথা দল মনোনীত প্রতিনিধির গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে। স্থানে স্থানে সভা সমিতি, নানা আকারের, বসছে; গরম গরম বক্তৃতা চলছে; যিছিল বের হচ্ছে শীতের হাড়-কাঁপানো তীব্রতাকে অগ্রাহ্য করে। নানা রকমের শ্লোগান শোনা যাচ্ছে, এক কণ্ঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠে। প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তিবোধ হত, কেন বিরক্তও লাগতো, এখন সয়ে গেছে।

দেখছি সব, শুনছি যা কানে ভেসে আসছে। কিন্তু মুখ-খোলার প্রয়োজন হয়নি। এবার মুখ খুলতে হলো, কারণ তুমি প্রশ্ন করে বলেছ, কাকে ভোট দিচ্ছি, অর্থাৎ দেব।

প্রশ্নটা খুব সহজ হলেও উত্তরটা ঠিক অত সহজে দিতে পারছি না। কেন পারছি না, তাই বলি :

আমরা সাধারণ মানুষ, রাজনীতির ধার ধারি না, কোন মতে খেটে দুবেলা দু'মুঠো খেতে পেলে আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মত মোটামুটি কিছু গায়ে দিতে পেলেই খুশি। লেখা পড়া সামান্যই যা হয় কিছু শিখেছি। অভিমান করার মত বিদ্যাবুদ্ধি যে নেই, এ স্বীকার করতে লজ্জা পাই না।

এই সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি দিয়েই ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলতে পারি। এ আমাদের শেখাবার দরকার হয় না। তাই যখন কেউ সভা করে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভালো ভালো শব্দ দিয়ে কথার মালা গেঁথে বোঝাতে চেষ্টা করে যে তার মত ভালো আর দুনিয়ায় কেউ নেই, তাকে ভোট দিলে রাতারাতি আমাদের স্বর্গের চাবি এনে দেবে, তখন হাসি পায়, সত্যি বলছি, আমার ভারি হাসি পায়, আমি মজা দেখি।

সেদিন এক বক্তার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনছিলাম। তিনি সাড়ম্বরে জানাচ্ছিলেন সুশোভিত মঞ্চের ওপর থেকে হাত পা ছুঁড়ে অগণিত শ্রোতার কাছে (এবং দর্শকের কাছেও, কারণ বড় বড় মানুষদের দর্শন পাওয়া তো সব সময় সম্ভব নয়) যে তাঁর দল দেশের কত মঙ্গল সাধন করেছে এবং আরও করতে যাচ্ছেন। নানা উদাহরণ দিয়ে, বড় বড় সংখ্যার অবতারণা করে তিনি দীর্ঘকাল স্থায়ী বক্তৃতার ইতি টানলেন। শুনে মন ভরে উঠলো। ভাবলাম সত্যিই তো অনেক পেয়েছি, আরও কত পাব; আমাদের ভাবনা কি ?

বেশ খোস মেজাজে বাড়ী ফিরলাম। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! রাত পোহাতেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হল। খবরের কাগজে চোখ বোলাতে গিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট সংবাদের দিকে নজর পড়লো, সেগুলো ছোট হলেও উড়িয়ে দেবার মত নয়। একটি সংবাদ ঘোষণা করছে, অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে মানুষ 'ব্লাড-ব্যাঙ্কে' রক্ত বিক্রী করে সংসারের অভাব মেটাচ্ছে। কোথাও দেখি, যক্ষ্মাগ্রস্ত স্বামীর স্ত্রী স্বামীর চিকিৎসার জন্য আবেদন করছে জনসাধারণের কাছে। কোথাও দেখি মাইনে বাড়ানোর জন্যে ধর্মঘটের আয়োজন। এই রকম ছোট ছোট অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো বেশ চিন্তান্বিত করে তোলে। তখন ভাবি দেশে মঙ্গল হয়েছে কাদের এবং সে মঙ্গলের রূপই বা কি ?

সেদিন এক প্রতিবেশী ভদ্রলোক তো হতাশ হয়ে এসে বললেন, ভাই, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে

দিলাম। পারলাম না বড়ো সামলাতে। তা বইয়ের ব্যাপার আর ইস্কুলের মাইনে, ও আর আমাদের জন্তে নয়। কথা দূর ভদ্রলোকের কণ্ঠে। কোন সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। কী সান্ত্বনাই বা দেব!

বক্তৃতার কি অভাব মেটে! অথচ রোজই তেমনি এই রকম বড় বড় বক্তৃতা আর নানা প্রতিশ্রুতির কথা।

অপর পক্ষে দেখ, আর একদলের কথা বলি: বক্তৃতা-মঞ্চে এরা চীৎকার করছেন, আমাদের ভোট দিন, তাহলে দেখিয়ে দেব কাকে বলে দেশ সেবা। কোন অভাব থাকবে না কোথাও, কোন অভিযোগ। ঠিক যা চাইবেন, তাই পাবেন একেবারে হাতের কাছেই। শুধু এইটুকু বলেই শেষ নয়, সঙ্গে সঙ্গে অপর দলের প্রতি নানা কটূক্তি বর্ষণ করতে শুরু করলেন। এখানেও লোকের অভাব নেই। বিশেষ করে সভার শেষে আবার বিচিত্রানুষ্ঠান, নাম-করা শিল্পীদের সঙ্গীতাদির বিপুল আয়োজন।

এমনি করেই দিনের পর দিন চলেছে নির্বাচনী মহড়া।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কী জান? যাদের আমরা 'রক্তবাজ' 'সমাজবিরোধী' প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছি, এরা আজ পুরো উদ্যমে কর্মী সেজে বিভিন্ন দলের মধ্যে সোতা বর্ষণ করছেন। 'দাদা'-দের এরা এখন দক্ষিণ হস্ত।

এবার বোধ হয় বুঝতে পেরেছ যে ভোট দেওয়া ব্যাপারে খুব উৎসাহ বোধ করছি না।

আর একটা বড় বিপদ হয়েছে কি জান? এ কথা তো আমরা সকলেই স্বীকার করবো যে দীর্ঘকাল পরে স্বাধীনতা ফিরে পেলেও পর শাসনের গ্লানি-মুক্ত হওয়া খুব সহজসাধ্য নয়, সময় সাপেক্ষও। অথচ এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজের প্রতি যে রকম আন্তরিকতার সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া উচিত, তা কি দেওয়া হচ্ছে কোথাও? কাজের পরিকল্পনার জন্ত বর্তমান শাসকেরা যে-পরিমাণে আত্মনিয়োগ এবং জনসাধারণের কাছে থেকে গৃহীত অর্থের যে পরিমাণ ব্যয়িত, তার ফল কি আশানুরূপ হচ্ছে? অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে না, বরং অপব্যয়ই হচ্ছে প্রচুর। অথচ অভিমানেরও তো অন্ত নাই এঁদের।

এই সঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে পুরাণো দিনের কথা। তখনকার দিনের মানুষ কত বড় আত্মত্যাগ করে, নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে, এমন কি জীবন দিয়েও মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা ব্রত নিয়েছিল। তাদের নাম তনি মুহুর্মুহুঃ কিন্তু তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার মত মানুষ কই? তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু নেই তেমন মানুষ, যাঁদের জীবন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। 'আপনি আচরি ধর্ম' যাঁরা দেশবাসীকে পথ দেখান।

সুতরাং সমস্যা কোথায় বুঝতে পারছ। যে প্রতিষ্ঠানকে ভালবাসি, যার অতীত ত্যাগের দীপ্তিতে ভাস্বর, দেশপ্রেমের জলন্ত উদাহরণ, তার বর্তমান শ্রদ্ধা জাগায় না।

অপর পক্ষে কিন্তু দলের মধ্যেও এমন মানুষ দেখছি, যাঁর বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান, মানব প্রীতি মনকে আকৃষ্ট করে, শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে তার প্রতি। কিন্তু যে কারণেই হোক তিনি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন, যে দলের কার্য কলাপ, মনোভাব মনকে আকৃষ্ট করে না; শ্রদ্ধা আনে না তাদের প্রতি, যখন দেখি অতীতকে, দেশের বৈশিষ্ট্যকে, দেশের মনীষীদের, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জাগতে তাঁরা কার্পণ্য করেন।

সুতরাং ভালো মানুষ আর ভালো দলের সমন্বয় দেখতে না পেয়ে আমাদের মত মানুষ খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

ব্যতিক্রম যে নেই তা' বলছি না। কিন্তু। অনেক ক্ষেত্রেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। মানুষের চেয়ে দল বড় হয়েছে। এবং দলের স্বার্থই দেশের স্বার্থকেও অবহেলা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না।

আর যে গণতন্ত্রের আমরা অভিমান করছি সে তো সংখ্যার গণতন্ত্র। স্বাধীনতা পাবার চৌদ্দ বছর পরেও যখন মানুষকে বোঝাতে হচ্ছে ভোট কী জিনিষ, কেমন করে দিতে হয়, এবং অজস্র টাকা ব্যয় করে আপন আপন যোগ্যতা জানাতে হয়, তখন সমস্যাটা যে খুব সামান্য নয়, তা বুঝতেই পারছো। কী যে করবো বুঝে উঠতে পারছি না। প্রীতি নিও।

স্নেহশ

সাময়িকী

২৩শে জানুয়ারী: এক একটা বিশেষ ঘটনা দিয়া কালের বুকে এক একটা দিন চিরদিনের মত চিহ্নিত হইয়া যায়—২৩শে জানুয়ারী এমনই একটী চিহ্নিত দিন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ইহা জন্ম দিন। ১৯৬২-র ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর ৬৬-তম জন্মদিনটীকে আমরা গভীর আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করিয়া বলি, 'হে অগ্রগামী পুরুষ, তোমার মত আমাদেরকে আগাইয়া লইয়া চল'। এই বিশেষ দিনটীতে নেতাজীর খানিকটা শক্তিও যাহাতে আমরা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করিতে পারি—আমাদের সে চেষ্টা করা উচিত। নেতাজীর গুণের অবধি ছিল না—যেজন্য বিশ্বের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরদিনের জন্য লেখা হইয়া গিয়াছে। আমরা সাধারণ মানুষেরা তাঁহার সকল গুণ ধারণাও করিতে পারিব না—কিন্তু কিছুটাও যদি আয়ত্ত করিতে প্রাণপণ না করি, তবে নেতাজী-উৎসবই শুধু ব্যর্থ নয়—তাঁহার জীবনধারণই ব্যর্থ। তাঁহার নানা গুণের মধ্যে একটী ছিল তাঁহার আগাইয়া যাইবার তীব্র সংবেগ। কী ঘনিবিড় অন্ধকার—সেদিনের ব্রিটিশ রাজত্বের সেই আষ্টেপৃষ্ঠের বন্ধন—কোথাও পথ নাই—বন্দী নেতাজী—তবু তাহারই মধ্য হইতে তিনি সম্মুখে আগাইয়া যাইবার পথ বাহির করিয়া লইয়াছিলেন! আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেই অগ্রগমনকে স্মরণ করি সেদিনের সেই মহা অনিশ্চয়তার মধ্যে যাহার প্রতি পদক্ষেপ প্রতি ভারতবাসীর হৃৎস্পন্দনে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। এই আগাইয়া যাইবার মনোবৃত্তি যা বীর্য আমাদের আজ প্রয়োজন। আমরা সব ঝিমাইয়া পড়ার দলের লোক। সংসারের বিপর্যয়ের সম্মুখে তো ঝিমাইয়া পড়িই, সাধারণভাবেই জীবনে কি ভাবে আগাইয়া যাইতে হইবে, তাহারই কোনো প্রেরণা, কোনো সংবেগ আমাদের জীবনে নাই। থাকিলে আজি বিগত চৌদ্দ বৎসরে আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিত। তাই আজ নেতাজীর জন্মদিনে তাঁহার এই আগাইয়া যাইবার প্রেরণাকে স্মরণ করি, ধ্যান করি, অনুধ্যান করি। আমরা আগাইয়া যাইব—ব্যক্তিগত ভাবে সমষ্টিগত ভাবে আমরা আগাইয়া যাইব—আমরা বসিয়া থাকিব না। উপনিষদের ঋষির সেই বাণী—'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—নেতাজীর জীবনে সার্থক হইয়াছিল, আমাদের জীবনে সার্থক হউক।

২৬শে জানুয়ারী: ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের প্রজাতন্ত্র দিবস। ১৯৪৭ সনে ব্রিটিশের নিকট হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৯৫০-এর ভারতবর্ষ তাহার সংবিধান রচনা করিয়া নিজেকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করিল এই ২৬শে জানুয়ারী। তাহারও পূর্বে ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে ১৯৩০-এর এই ২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। আজ ১৯৬২-এর ২৬শে জানুয়ারী। ১৯৩০—১৯৪৭—১৯৫০—১৯৬২—আমরা কী ছিলাম, কী চাহিয়াছিলাম, কী পাইয়াছি, কী করিয়াছি, কী হইয়াছি? স্বরাজের অর্থ সেদিন সংগ্রামের দিনে কি বুঝিয়াছিলাম, আজ শান্তির দিনে কি বুঝিয়াছি? স্বরাজকে জীবনের ব্যাপকতম অর্থে না বুঝিলে আমরা আজ হটিয়া যাইব—নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ 'স্বরাজ' সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

..."নরনারায়ণ আশ্রমের সাধ্য বস্তু (Creed) পূর্ণ স্বরাজ। সাধনা তাহার আত্মসমর্পণময়ী ভক্তি, বহ্নিচক্রের আনন্দ-মঠের নির্গুণা "ভক্তি"। আধ্যাত্মিকদের স্বরাজই অর্ধসত্য, দেশসেবকদের স্বরাজও অর্ধসত্য। দুই "রাজে"র সমন্বয়ে যে স্বরাজ, তাহারই স্বরূপ ভাগবত প্রথম শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। স্বরাজ ভাগবতের, উপনিষদের, মনুসংহিতার, সপ্তশতী-ব্রাহ্মণের; পক্ষান্তরে স্বরাজ কংগ্রেসেরও। স্বরাট্-শব্দের মূল অর্থ—"স্ব"-এর দ্বারা যিনি "রাজতে"—দীপ্তি পান্। "স্ব"-এর অর্থ আত্মা অর্থাৎ অক্ষর স্থিতিক্ষেত্র; "স্ব"-এর "সমগ্র" দিক লইয়া দীপ্তি পাওয়ার কৌশল আজও তেমন করিয়া বিশ্বে আসে নাই। কাজেই জীবন মুক্তিপথে চলিতে চলিতে আটকাইয়া গিয়াছে। স্থিতি-গতি, অপরিণামী-পরিণামী দুইই যখন দুইয়ের পরিপূরক, —তখনই পরিপূর্ণ স্বরাজ। ইহাই গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের পুরুষোত্তমযোগ। দেহকে বাদ দিয়া আত্মা স্থিতি লাভ করিতে চাহিলে বাহির হইতে দেহ দেয় বাধা; দেহ

আত্মাকে অস্বীকার করিয়া আগাইতে চাহিলে ভিতর হইতে আত্মা দেয় বাধা। একান্ত আত্মার স্বরাজ চলিবে না; একান্ত দেহ-মন-প্রাণের স্বরাজ, সমাজ-রাষ্ট্রের স্বরাজ চলিবে না। একান্ত অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্বরাজও চলিবে না। পূর্ণ স্বরাজ যাহা, তাহা সমগ্রের সমান মানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বরাজই "অমানী মানদ"। আত্মা যেখানে নিজের একান্ত মানদণ্ড ছাড়িয়া "অমানী", এবং অনাত্মার অর্থাৎ পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের মানদণ্ড স্বীকার করিয়া "মানদ"; পক্ষান্তরে অনাত্মার বিকাশ ঐ পরিবার-সমাজও যেদিন নিজের মানদণ্ড ছাড়িয়া অমানী, এবং আত্মার মানদণ্ড মানিয়া মানদ, সেখানেই সত্যিকার পূর্ণস্বরাজ। পুরুষ-প্রকৃতি যেখানে সম-মান ও সম-মানদ, রাজা-প্রজা যেখানে সম-মান ও সম মানদ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য যেখানে সম-মান ও সম-মানদ, ধনিক-শ্রমিক যেখানে সম-মান ও সম-মানদ, স্বর্ণ ও কৃষিজাত দ্রব্য যেখানে সম-মান ও সম-মানদ, সেখানেই পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত। নিছক স্বর্ণ-মানের উপর সমাজ দাঁড়াইলে কৃষিক্ষেত্রে লুঠ অনিবার্য্য। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পরিণামী প্রকৃতি ও অপরিণামী পুরুষের সমন্বয়ে গড়া হইলেও কোনও বস্তু পরিণামধর্ম্ম-প্রধান, কোনও বস্তু অপরিণামধর্ম্ম-প্রধান। স্বর্ণ অপরিণামী বলিয়াই বুদ্ধির রাজ্যে উহার অনাদর; কৃষিজাত দ্রব্য পরিণামধর্ম্মী বলিয়া উহা "হেয়"। স্বর্ণ কালের আঘাতে বাস্তবিকই অপরিণামী; উহা oxidised হয়না। মাটিতে, জলে, বাতাসে স্বর্ণের পরিণাম হয় না; চাল, ডাল অল্প সময়েই পচে। স্বর্ণ 'রাশি' করা যায়, ধান-চাল দীর্ঘকাল 'রাশি' করা যায় না। কৃষিজাত দ্রব্যের বাহ্যিক এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়াই স্বর্ণ আজ বাধিয়াছে প্রভু। তাই ভাগবতমতে স্বর্ণই কলির আবাসভূমি। রাজচক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎ সোণার ভিতর কলির অর্থাৎ কলহের আবাসভূমি দেখিয়াছেন। কৃষিকুল নিবারণ করিতে হইলে চাই কৃষিজাত-দ্রব্যমান ও স্বর্ণমানকে যুগলমিলনে বাঁধিয়া দেওয়া। পূর্ণ স্বরাজ জীবনের "সমগ্রতা"রই পরিপূর্ণ দীপ্তিমানে, মানমানে পরিপূর্ণ, সফল ও সার্থক।

বিশ্বে রক্তপান থামাইবার জন্য চাই প্রথমে জীবনের "সমগ্রতা"র প্রেরণাদান; ইহাই জীবনের বিপ্লব। জীবন নিত্যবিপ্লবময়। জীবনে কোনও কোঠাকাগ (water-tight compartment) নাই। দেহের রক্ত যখন বিপ্লবময়, তখন কোনও যন্ত্রে উহার জমাট (congested) বাঁধিবার জো নাই। তাজা রক্ত কোন যন্ত্রেরই একচেটিয়া নয়, অথচ সকলেরই। রক্তের এই ধর্ম্মটীর নামই বিপ্লব। রক্ত নিত্যবিপ্লবী, জীবনও নিত্যবিপ্লবী। জীবনে যখন নিত্যবিপ্লব (Permanent Revolution) থাকে, তখন শ্রেণীসংঘর্ষ (Class war) সম্ভবপর নয়। এই বিপ্লব বিশ্বে যত ছড়াইয়া পড়িবে, ততই বিশ্বে "সমগ্র" ভাব জাগিবে, তাহাতেই বিশ্ব গড়িয়া উঠিতে থাকিবে, বিশ্বশান্তি নামিয়া আসিবে।

বিশ্বের প্রতি অণুটীও বিশ্বরূপ—ইহাই গীতাকারের জ্ঞান। প্রতি মানব বিশ্বমানব, প্রতি ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম, প্রতি আশ্রম সর্ব্বাশ্রম, প্রতি জাতি সর্ব্বজাতি, প্রতি সম্প্রদায় সর্ব্বসম্প্রদায়, এবং এই সবগুলির হাত-ধরাধরিতেই বিপ্লব সার্থক। বিপ্লবে বিশ্বের প্রতি অণুরও যা-কিছু সম্পদ, তাহা সকলেরই; অথচ প্রত্যেকের দাবীরই স্বয়ম্পূর্ণতা (self-contained character) সেখানে সার্থক। পূর্ণ স্বরাজ অর্থ আত্মরাজ, সমাজরাজ, পরিবাররাজ, অর্থনৈতিক রাজ। যাহারা ধর্ম্ম ও দেশকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন, তাঁহারা ঠিক দেখেন না। দেশছাড়া ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্মছাড়াও দেশ হয় না।..."

—স্বরাজের এই ব্যাপকতম বোধ আজ মানুষের চিন্তাধারায় স্পষ্টতম করিয়া তুলিতে হইবে। অন্যথায় ২৬শে জানুয়ারীর এত দীর্ঘদিনের আত্মসাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

শ্রীবেণু মিত্র কর্ত্তৃক ব্রহ্মানন্দ আশ্রম পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সকল সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

ফাল্গুন, ১৮৮৩, ১৩৬৮ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম. এ পঞ্চবিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র-ধর্ম্মের ভেদের কাটলে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটি স্বয়ংমূল্য আস্বাদন—ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম আস্বাদন করায় জীবনের অতিগ (transcendental) দিক, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (immanent) দিক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুইই। তাইত্যো তিনি জীবন-স্বামী। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম্ম বা একান্ত রাষ্ট্র চলে। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ' (ভোজপতি কংসের মৃত্যু) বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্ম্মপতিরূপে 'তদং পরং যোগিনাম্' (যোগিগণের পরতত্ত্ব কৈবল্য)।

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

সুলেখা

আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ

গুণগত উৎকর্ষে সুলেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। অগণিত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনধন্য সুলেখা আজ সব চেয়ে বেশী বিক্রয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। স্বদেশী শিল্পের একটি একান্ত প্রয়োজন মেটাতে পেরে সুলেখা আজ জাতীয় সম্পদে পরিণত।

কালির সেরা **সুলেখা**

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

সূচীপত্র : ফাল্গুন ১৩৬৮, ১৮৮৩

প্রার্থনাকালীন ভাষণ (১)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রভুজী

২। আকাশ হল আনন্দ (কবিতা)
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

একটি পত্র
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

প্রদীপ
শ্রীঅরুণচরণ চক্রবর্তী

৫। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫০)
(১৩)

বিস্মৃতপ্রায় মহিলা কবি
শ্রীমানসকুমার রায়

বন্ধুবরেষু
শ্রীমৃগত

উদ্বোধন উৎসব
শ্রীভূমিভূষণ বিশ্বাস

সাময়িকী : দোল পূর্ণিমা
নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ সংবাদ

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কয়েকটি
প্রয়োজনীয় পুস্তক

তিন বৎসর ডিগ্রী কোর্স

১। অর্থবিজ্ঞান পরিচয়—অধ্যাপক সুব্রত গুপ্ত
২। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি (৮ম সংস্করণ)—অধ্যাপক সুব্রত গুপ্ত
৩। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ইতিহাস
—অধ্যাপক বীরেন্দ্র চক্রবর্তী

প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স

১। অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি (২য় সংস্করণ)
—অধ্যাপক সুব্রত গুপ্ত
২। সরল পৌরবিজ্ঞান—অধ্যাপক সুব্রত গুপ্ত ও
এন্. এল্. মুখার্জী
৩। সহজ বিশ্ব ইতিহাস—যোগব্রত গুপ্ত
Revised by অধ্যাপক এস. ভট্টাচার্য

প্রাপ্তিস্থান :—

এস্ গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাইভেট লিঃ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৮, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬.

উজ্জ্বলভারত

ফোন নম্বর : ৫৭-১৫১০

(মাসিকপত্র, পঞ্চদশ বর্ষ)

বার্ষিক মূল্য ৫৲। প্রতি সংখ্যা ৪৪ ন. প.।

মাঘ থেকে উজ্জ্বলভারতের বর্ষারম্ভ। ছ'মাসের জন্য গ্রাহক করা হয় না। রচনা নকল রেখে পাঠানো বিধেয়। অমনোনীত রচনা ফেরত নিতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট দরকার। বিভিন্ন লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নন।

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় আকার ৮"×৬"।

উদ্বোধন

ফাল্গুন, ১৮৮৩ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ ১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৭)

শিক্ষা যার হয়েছে, হৃদ্য যে শিখেছে, তার সি, এ এম, এ পাশ লাগে না।...আমি বিশ্বাস করি তোমরা সরল ভাবে আমাকে গ্রহণ করেছো। ঠাকুরের জীবন তোমাদের দৃষ্টান্ত হউক—তোমাদের যেমন বলি আমার সঙ্গে একান্ত হও, তেমনি প্রাণপণে আমি তাঁর সঙ্গে একান্ত হয়ে চলতে চেষ্টা করি—তিনি ছাড়া আমার কেউ নাই। এই বিরাট বিশ্বের আমি গৃহিণী। তাই তোমাদের বলি আমার আনন্দের দিকে না তাকালে, বাইরে খুব মিশলে তোমরা টিকে থাকতে পারবে না—আমি লক্ষ লোকের মধ্য দিয়ে চলে এসেছি—ফাঁকিতে পড়ে যেয়ো না..... তোমাদের সেবা তিনি গ্রহণ করুন—আমি সর্বদা তোমাদের তাঁর কাছে নিবেদন করি—তোমরা সুন্দর হও—ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম মানুষ।

২৮,৫,৫৬ সকাল

...রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতম্ নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ · কৃষ্ণবর্ণ)... যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।...জয় রাধে... শ্রীরাধা কৃষ্ণসাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে উন্মাদের মত জাতি-কুলশীল তেয়াগিয়া আপন ভুলিয়া, এক উন্মাদ আকর্ষণে ছুটিয়াছে দুকূল প্লাবিয়া...আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিব শ্রীরাধা, আমার বিপ্রবধূরী · আমার পরাণপুতলী শ্রীরাধা .....আমার নিত্যগোপাল, তোমার জীবনের মাঝে আমার সকল শাস্ত্রের অর্থ আমি পাইয়াছি, সকল শাস্ত্রের তুমি পরম অর্থ, তুমি মূর্তিমান অর্থ, সকল শাস্ত্রের তুমি সমাধান, সকল শাস্ত্র তোমায় প্রতিপন্ন করিতেছে। নিত্যগোপাল, আমার প্রাণের ঠাকুর, সখা সখী বন্ধু পরম সুহৃৎ স্বামী, আমি তোমার সঙ্গে রহিব। ...তোমার চরণে আমার স্থান—আর কোথায় যাইব? তোমার চরণই আমার শ্রেষ্ঠ স্থান, নিরাপদ স্থান, নিশ্চিন্ত স্থান। আমি আমারই বোঝা আর বইতে পারি না—আমার কাছে আমি নিরাপদ নই। নিত্যগোপাল, আমি আমার কাছে ভার—যখন তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হই তখন আমার বোঝা আমি আর বইতে নারি—আমায় তুমি লও, আমায় তুমি স্বীকার কর... ...আমার তুমি আছ। তোমার নির্দেশ মস্তক পাতিয়া লইব—নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, আমার জীবন-মরণ ধন, আমার দুঃখসুখধন।

সন্ধ্যা

নিত্যগোপাল-জীবন ও দর্শন অবলম্বন করেই মায়া-জীবন চলেছি—নিজেকে পৃথক করে কখনো দেখিনি। ভগবান আকাশে আছেন—জল সর্বত্র আছে—তবু পিপাসায় জল পুকুরে অর্থাৎ যেখানে জলের প্রকাশ সেইখানে যেতে হয়। তেমনি নারায়ণকে যদি কোন মানুষের মধ্যে না দেখি—আকাশের ভগবানে ভুলাবে না—ভুলালে অহংকার চলে, সাধনা থেকে যায়। আর এক কথা—আকাশের ভগবানের কাছে দোষ করে ক্ষমা চাওয়া সহজ, প্রত্যক্ষ মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জা করে। ...এতক্ষণ জলধরবাবু কানাইবাবুর সঙ্গে আলোচনা হল—ইন্দ্র আকাশে থাকলেও মাটিতে প্রত্যক্ষভাবে আছে গোবর্ধন। ...মানুষের কাছে টাকা দিতে সাহস হয় কিনা—ঠাকুরের বালিশের নীচে টাকা রেখে গোবিন্দ তোমায় দিলাম বলা সহজ।.....এসেছ আমার কাছে। সেবা করছ এজন্য আমি ধন্য—নগেন

যাই, সন্তোষ তাই আসে—আমি কী বোঝ কবি—ঠাকুরকে বলি, এসেছে তোমারি দ্বারে মুক্ত ছেড়ে না যেন। তোমরা এসেছ—ঠাকুরের কাছে তোমাদের সঁপে দিয়েছি··· অর্জুন পর্যন্ত বললেন অকূল পাথারে ঠাঁই পাচ্ছি না—তোমরা নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী কাজের বিচার করলে চলবে কেন? মা যেমন মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে বরের কাছে দেন, তেমনি বড় লোভ ছিল তোমাদের সাজিয়ে গুজিয়ে ঠাকুরের কাছে তুলে ধরে বলি—দেখ তো ঠাকুর কেমন হল?···শিশুর ভাল শিশু বোঝে না—তোমরা কি করবে, কোথায় যাবে, তোমাদের ভাল কি মন্দ কি, তা তোমরা জান না—কাজেই আমার উপর নির্ভর কর—জীব নিজে নিজে শিব হবে কি করে? শিবই তাকে শিব করতে পারেন। যে জানে সে মাটি দিয়ে শিবদুর্গা করতে পারে—মাটি তো জানে না। যারা বয়সে বড়, সাধনায় বড়—তাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর তোমার কিসে মঙ্গল। শিশু জানে না সাপ ধরলে কি হবে—তেমনি সাধনার জগতে শিশু যারা, তারা কি করে জানবে ভবিষ্যতে তাদের কোন্ কাজে কি বিপদ হবে?···সিদ্ধান্তদর্পণ তো তিনি লিখেছেন—আমি তো লিখি নি—সৌভাগ্য আমার যে সে কথা আমি বুঝতে পারি—যেদিন প্রথম আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, সেদিন তিনি আমার কাছে শুধু একজন সাধু ছিলেন—সেই তিনি যে আমাকে গ্রাস করে ভগবান্ হয়ে বসলেন—সে কি এই পরমকৃপার যোগ—চল্লিশ টাকা মাইনের মাস্টারের যোগ্যতায় যে একটা M. A. পাশও করেনি?—একমাত্র তাঁর আশীর্বাদ। ...যা বুঝি না তাকে মিথ্যা বলতে পারার অহমিকা আমার না থাকে—[সেই ঘনিষ্ঠবন্ধুর সঙ্গে কৃষ্ণ নিয়ে কাহিনীটি বললেন]। ...তাই নিজের ভালমন্দ নির্বাচন করার ভার গুরুর উপর দিও...তোমরা সেবা করে যাও। ...আমি কষ্ট, তাই বলে মনে করো না আমাকে লাথি মেরে ঠেকিয়ে রেখেছে—তাহলে এই ১০ বৎসর পর্যন্ত আসতে পারতাম না।... সব আমার উপর নির্ভর করে শান্ত মনে চলো—এই অকূল পাথারে গুরু না থাকলে সব পাবে না—ভারতবর্ষ তাই গুরু না করাকে অনার্য কাজ বলেছে। ...একজন মানুষকে মেনো...বিশ্বাস করি তোমাদের উপদেশ দেবার মত অবস্থা আমার আছে। বাপ থাকতে ছেলেরা একত্র থাকে, বাপ গেলে স্বতঃ পৃথক হতে পারে।...

১৯, ৫, ৩৬—[তোমরেই করিয়াছি জীবনের এবতারা গানটী প্রতি লাইনে লাইনে নিজের ব্যাখ্যা ও কথা যোগ করিয়া গাহিয়াছেন]।...এ কূলে ও কূলে দুকূলে গোকুল আপনা বলিব কায়। শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়—সংসারের কূলে সন্ন্যাসের কূলে কোন এক কূলে নাই—আমি মধ্যপথ ধরিয়া চলিব। তোমারই চরণ বুকে লইয়া চলিব। দেখা আমি যাই নাক, তুমি প্রকাশিত থাক—যেখানে যেখানে যেখানেই যাই নাক—রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমাজে—তুমি আছ বলিয়াই সকল আসক্তির মূল চিরিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছি। যখন সকল আলো নিভিয়া যাইবে, চক্ষুর্য আলো দিবে না, তখনও তোমার আলো আছে—তোমার অনিমেষ আঁখি আছে চাহিয়া আমার পানে—সকল অনাদরের কাছে, সকল ছোটদের দ্বারা অসম্মানের মাঝে তুমি আছ আমার সম্মান লইয়া—আমার সারা জীবনের এই অভিজ্ঞতা। —তুমি আমাকে ফেলিয়া যাও নাই—প্রতি মুহূর্তে তুমি বুঝাইয়া দাও তুমি আছ। তোমার স্নেহের যেন অপমান না করি—এত অনাদরেও তুমি স্নেহদানে বিরত হও নাই···তোমার স্নেহ দানে বিরত হও নাই—প্রতিদানে কিছু পাও নাই। তোমার চরণে আমি শরণাগত; তোমার প্রীতির, স্নেহের, আদরের পুরস্কার শুধু আমার সকল তোমায় দিয়া নিঃশেষ হওয়ায়। —তুমি পূর্ণ, আমি শূন্য—আমি নাই তুমি আছ—আমার অনন্তায়িত দেবতা—সকল সব যেদিন ঘুচিয়া যাইবে, অসঙ্গ আমি সেদিন তোমার সঙ্গে রহিব: নিত্যগোপাল, আমার সখা বন্ধু,—তোমার বাঁধনে আমি বাঁধা পড়িব—আমার নিত্যবন্ধু—নিত্যগোপাল আমার ভিখারীঠাকুর—তোমাকে বুকে লইয়া আমি বিড়ালের ছানার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কোথায় তোমাকে রাখিব? তোমার আদর-

যন্ত্রের সন্ধানে আমি যেই নাই, তবে বুক হইতেও নামাই নাই। সকল দল ছাড়িয়া—সাধুর দল, অসাধুর দল—ছাড়িয়া আমি চলিয়াছি। নিত্যগোপাল, কত এল, কত গেল—আমি চলিয়াছি। তোমার আহ্বানে চলিয়াছি, চলিয়াছি—। কাহারও আসক্তিতে আটকাইয়া যাইও না—ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে তাই পরশিয়া চলো দিনে রাতে। নিত্যগোপাল, আমার পথের ঠাকুর, অনিকেত তুমি কারো বাড়ীতে নেই, আছ সকলের বাড়ীতে—তুমি সহজ, প্রিয়তম, তুমি সহজ—টাকা ছুঁলেও তোমায় হাত বেকায় না, তুমি সহজ—গোলাপ গয়নানী পায়ে হাত দিলেও সহজ, সাধুতেও তুমি সহজ, অসাধুতেও তুমি সহজ, গোলোকেও তুমি সহজ, জগতেও তুমি সহজ। তোমারও সংসারে কেউ ছিল না, আমারও সংসারে কেউ নাই—তুমিও দল ভালবাসতে না, আমিও ভালবাসি না—আমরা দুই পথিক একা পথ চলব—কেউ যদি না আসে একলাই চলব আমরা দুজনে—দুর্যোগের দিনে গৃহস্থ যখন ঘর বন্ধ করে ঘুমাবে, তখন আমরা দুজনে চাদর মুড়ি দিয়ে পথে চলব—পথ আমার কাছে সত্য—আমি পথিক—আমি বৃন্দাবনের পথিক—আমি বৃন্দাবনের পথ চলব, যাযাবরের পথে চলব—ভারতবর্ষের যাযাবরি আগ্রত হও। —আমি পরিতের দলে নই, আমি লাঞ্ছিতের দলে—যারা নিপীড়িত, আমি তাদেরই সন্ধান দিতে চাই। শ্রীনিত্যগোপাল, প্রতিষ্ঠিত হও—রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও—আমি একটু দেখে যাই—তাহলে শান্তিতে মরতে পারতাম। কই, তোমায় তো প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না—দল যেখানে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ যেখানে সেখানে আমি নাই—।

সভা—অনেকদিন বলেছি বিশ্ব আজ প্রার্থোপাসনার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে—দীর্ঘকাল যাবৎ, ভোত্র, মন ইত্যাদি অবলম্বনে মানুষ সাধনা করেছে—একমাত্র বাকি প্রাণ—সেই সাধনায় বিশ্ব আজ পাড়ি জমিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, সব ছেড়ে গেছে, এখন প্রাণ…। দেবতা ও অসুর, প্রজাপতির দুই পুত্র—দুই ভাইয়ে সন্ধীতি থাকলেই ভাল হত, কিন্তু তা থাকল না—অসুরদের সঙ্গে দেবতারা পারল না। দেবতারা পূজা করলেন—বাক্য সহায়ে করলেন—অসুরেরা শুধু শেষে দুইল থাকাকে বিশ্লিষ্ট করায়। বিশ্লিষ্ট করল, মনকেও বিশ্লিষ্ট করল। শেষে দেবতারা প্রাণের শরণাপন্ন হলেন—প্রাণকে আঘাত করতে এসে অসুরেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এ কাহিনীর মর্ম হচ্ছে বোলচাল দিয়ে কোনদিন বড় কাজ হতে পারে না—কথা দিয়ে দল হয় না—মানুষ বলে এক, বোঝে এক—ভাল বাক্য মন্দ বাক্য। ঋষিরা এজন্য খুব বাক্য সংযম করতেন। অসুর হল ভেদবুদ্ধি—এই ভেদবুদ্ধি যতদিন থাকবে ততদিন দল করতে পারবে না—বিশ্ব দল করতেও তো হবে। কিন্তু বক্তৃতায় ভুলোবে না—ফাঁকি দিয়ে চালাকী করে বড় কাজ হয় না। চক্ষুও তাই—ভাল দেখে মন্দ দেখে—মন দিয়েও তাই—তাই কৃষ্ণ বার বার বলেছেন মন আমায় দাও।—প্রাণ একমাত্র বস্তু যাকে আঘাত করতে এসে মানুষ কিছু করতে পারবে না। প্রেম-বিবাদিনী পাপনাশিনী মুক্তিরিণীর মত ফিরতো।

থাকতো তাকে যাকে, দেখতো তাকে যা কে
আপনি বিপাকে পড়ত॥

…প্রাণের কাছে বেশী চালাকি টেকে না—বুদ্ধি প্রাণের কাছে অন্ধ—এই প্রাণ এসেছে বিশ্বের সাধনে।…এই অন্ধ সমগ্রের সাধনা যার আছে, যার প্রাণ আছে, তার কথা ভাল, বুদ্ধি ভাল, দেখা ভাল।…অখণ্ডলালের সহজ সরল বুদ্ধির কাছে বিশ্বের চালাকী ধরা পড়ে গেছে।… অতএব ফাঁকি দেওয়া অর্থ নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। কেননা অন্ধ বলে কিছু নেই—আন্ধা তো একটা। জীবন যার আছে সে ভুল দেখে না, অসুর-প্রভাবিত চক্ষু ভুল দেখে।…প্রার্থোপাসনা যে করে, তার সমস্ত বৃত্তি অতি-বেড়েছে। জীবন হচ্ছে L. C. M.।…নিত্যগোপাল, যেদিন থেকে আমার মাথা তোমার পায়ে রেখেছি, সেদিন থেকে আর আমার পা বেতালে পড়ে না, মুখ কুকথা বলে না…।

কল্যাণ

আকাশ হল আনন্দ

॥ শ্রীসচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

আনন্দ উজ্জ্বল বস্তু এ আকাশে চির ব্যাপমান—,
আনন্দ ওষধি—সূর্য—মেঘ নদী—পর্বত পৃথিবী—
সমুদ্র-বনস্পতি আনন্দের আরোগ্যে অম্লান।
আনন্দের ধ্যানমন্ত্র প্রত্যেক প্রাণের প্রবাহে
সৃষ্টির স্বরূপ সেই—অণুও আনন্দে উপজীবী।
আনন্দে আলোর জন্ম—আনন্দেরই আগুনে, উৎসাহে—
প্রত্যেক প্রকাশে সেই আনন্দেরই দূর অভিলাষ।
আনন্দ প্রাণের মূলে—আনন্দই অমর ঈশ্বর।
আনন্দে পৃথিবী ব্যাপ্ত—নাম-রূপে জগৎ সংসার
আনন্দ-লাবণ্যে স্নিগ্ধ। বেঁচে আছে যন্ত্রণা জীবন
আনন্দের অমৃত পানে—ধারাপাতে এই মৃত জড়
প্রাণে সে প্রমুক্তি পায়—রূপময় নিখিল যৌবন
আনন্দে সে প্রণায়িত—বৃদ্ধিও সে আনন্দেরই ফল।
মৃত্যুও আনন্দ রূপ; আনন্দেরই অমৃতে বিলীন
রূপ থেকে রূপান্তরে। আনন্দের উজ্জ্বল আকাশে
এ দিনের পরমায়ু—আনন্দে মহান ভাস্বিমান।
আনন্দে আকাশ-গঙ্গা নিরবধি বহে ছলছল॥

আনন্দ যজ্ঞের ধূম—মেঘ-মাটি বৃষ্টির উৎসার,
আনন্দ শ্যামল মেঘে, আনন্দের অমের উন্নানে
আশ্বিনের ভরা নদী, মাঠভরা হিরণ্য ফসল।
আনন্দে আকাশ নীল। আনন্দের দূর অভিযান
নক্ষত্রে ছড়িয়ে গেছে—দূর-ব্যাপ্ত সৌর সত্তার
চারিদিকে সে আনন্দ। প্রতি কোষে হৃদয়-আকাশে
দেহে-মনে পরিব্যাপ্ত—অমল মনোময় দেহে
বিজ্ঞান-বোধিতে দীপ্ত। আনন্দের নীল পদ্ম ভাসে
এ প্রাণের সরোবরে, আনন্দ সে উজ্জ্বল মরাল।
যৌবন-প্রণয় সেই আনন্দেই ছড়িয়ে পড়েছে।

এ সব আনন্দ যার সৃষ্টির গভীর চেতনা
যে পেয়েছে—সেও সেই আনন্দের উজ্জ্বল প্রবাস
দেখেছে হৃদয়ে মনে,—সৃষ্টির স্বরূপে মন মেলে
রহস্যের ব্রহ্মপদ্ম—সে তখন সূর্য-বন্দনা॥

একটী পত্র

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

[শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত বহু পত্র রহিয়াছে যাহা পুরুষোত্তম-চিন্তাধারায় ভরা। সেগুলি সব প্রকাশিত করিতে পারিলে আমরা এক মহার্ঘ্য বস্তুর অধিকারী হইতাম। ১৩২৩-এ তাঁহার এক গুরুভাইকে লিখিত একখানি পত্র আজ প্রকাশ করিলাম। —সম্পাদিকা]

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

বহিমাল

৭ই চৈত্র ১৩২৩।

ভাই নিতাই, তোমার দুই পত্রই পাইয়াছি। উত্তর বিলম্ব জনিত অপরাধ ক্ষমার্হ; চিরদিনই তো মার্জ্জনা করিয়া আসিয়াছ।

শ্রীশ্রীব্রজবালাগণ শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবীকে অর্চ্চনান্তে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহ রাস মিলনে ধন্যা হইয়া জগতে মহারাসের বারতা প্রচার করিয়াছিলেন; তাদৃশভাবও তেমনি যোগমায়ান্বিত হইয়া ব্রজদেবীদের হৃদয়ে বিহার করতঃ জগতে তাঁহার মহীয়সী প্রেমমাধুর্য্য প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীযোগমায়াই এই শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীদের যোগসূত্র। রাসলীলা আস্বাদন করিতে হইলে যোগমায়া তত্ত্বটী সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া চাই। মায়া শব্দের ক্রম পরিণতিতে বর্ত্তমান অর্থ 'কৃপা,' অতএব ত্রিতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের যে কৃপা বা দীক্ষাশক্তি, কৃষ্ণের স্বামী-মূর্ত্তি (গুরুভাব) ও ব্রজগোপীদের স্ত্রীমূর্ত্তি (শিষ্যভাব) ভাঙ্গিয়া এক করিয়া উভয়ের পৃথকত্ব মুছিয়া ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এক "পর" (প্রকৃতির অতীত, সর্ব্ব সম্পর্কশূন্য বলিয়াই সর্ব্ব সম্পর্কাধীন) পুরুষভাবে ও গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্তভাবে মিলনোপযোগী পরনারী ভাবে সাজাইয়া রাস মন্দিরে আকর্ষণ করতঃ মহাযোগে যুক্ত করিয়াছিলেন, সেই শক্তির নামই যোগমায়া।

'মা যো রমণ না হাম রমণী

দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি। চৈঃ চরিতামৃত।

স্বামী গুরু, স্ত্রী শিষ্যা। শ্রীকৃষ্ণ ত্রি-তত্ত্ব বলিয়াই স্ব-যোগমায়া প্রভাবে গুরু, শিষ্য ও তদুভয় কামশক্তি এই তিন তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া এক কৃষ্ণ-সত্তায় পরিণত করিতে পারেন।

ত্রিরূপ তত্ত্ব পূর্ব্বং নিত্যবাদে নিত্যকাঙ্ক্ষাত্মকং

প্রেম এব কার্য্যং প্রেম এব কার্য্যং। নারদ ভক্তিসূত্র। যোগমায়া, কামাখ্যা বা দীক্ষাশক্তি পূর্ব্বোক্ত কৃপা শক্তিরই নামান্তর মাত্র। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী যোগমায়া কামাখ্যা দুর্গাদেবী।

ত্রিতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপনিষদে একটি নাম "হিরণ্যরেতাঃ;" স্বামী যেমন স্ত্রীর গর্ভে নিজকেই রেতঃ বা বীর্য্য (বীজ) রূপে আধান করিয়া তাহার প্রাণময় তাহার অনিচ্ছা ও অজ্ঞানসত্ত্বে আকর্ষণ করতঃ ভূমে এক হইয়া মোহন পুত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, পর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণও তেমনি তাঁহার আচার্য্য (গুরু) মূর্ত্তিতে শিষ্যের হৃদয়ে কৃপা বা মন্ত্র শক্তি প্রভাবে নিজকেই হিরণ্যয় (চিন্ময়) রেতঃ (বীজ) রূপে আধান করেন এবং শিষ্যের অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাসত্ত্বে জোর করিয়া, সর্ব্ব প্রাণমনটুকু স্বকীয় প্রেমে আত্মসাৎ করিয়া গুরু, শিষ্য ও কৃপাশক্তি এই তিন তত্ত্ব (Trinity) ভাঙ্গিয়া নিজে গুরুভাব পরিত্যাগ করতঃ রসরাজ রূপে সাজিয়া ও শিষ্যকে সর্ব্বত্যাগিনী পরনারী কৃষ্ণময়ী সাজে সাজাইয়া মহাভাব রসের আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মূর্ত্তিতে তাঁহার কৃপা বা মন্ত্রশক্তি প্রভাবে নিজকেই শিষ্য হৃদয়ে স্থাপন করেন, ইহাই দীক্ষার মূল তাৎপর্য্য, তথাকথিত অক্ষরাত্মক মন্ত্র এই কৃপার বহির্নিঃসরণ মাত্র। অক্ষরাত্মক মন্ত্র বাদেও দীক্ষা হইতে

পারে। তাই তো নিত্যগোপাল লিখিয়াছেন "মহাপ্রভুর কর্ণোচ্চারিত "হরিবোল" ধ্বনিতে অনেকের দীক্ষা হইয়া গিয়াছিল"—বাস্তবিকই তাঁহার দীক্ষার অক্ষরাত্মক মন্ত্রের আবশ্যক ছিল না। দুর্বলের বিশ্বাস স্থাপনের জন্যই অক্ষরদানের ব্যবস্থা; দীক্ষা হয় প্রাণে; জিহ্বায় নয়।

মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে।
জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।

প্রাণের মাঝে গর্ভাধানই মন্ত্র দান। এই কৃপা শক্তির চিন্তনই প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র জপ; মন্ত্রশক্তিই কৃপাশক্তি আবার কৃপাশক্তিই মন্ত্রশক্তি। স্বামী-প্রদত্ত বীজে স্ত্রী মন না দিলেও সেই বীর্যই যেমন নিজের স্বয়ংপ্রকাশ শক্তিতে স্ত্রীর মন প্রাণ হইতে নিজের প্রকাশোপযোগী তত্ত্ব সংগ্রহ করতঃ ফুটিয়া উঠে, সংগুরু মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পর্শ অযোঘ জীব বীর্যও তেমনি শিষ্যের হৃদয়ে প্রকাশিত হন এবং শিষ্যের সকল প্রাণ মন তাঁহার সর্বনাশী টানে নিজের মাঝে ডুবাইয়া উভয়ে প্রেমময় প্রেমঘনীভূতে মহালিঙ্গনে যুক্ত হন্। বর্তমান সময়ে জীব শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তির চিন্তাধারাই তাঁহাকে পাইবে। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"। আমাদের জিহ্বা এত দূর জড় ও বুদ্ধি-শক্তি এতদূর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে যে, বীজ মন্ত্রাদি পরিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারই প্রতীকারার্থ শাস্ত্র শ্রীভগবানের কৃপার দিকে হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥

অর্থাৎ—"হে সুরেশ্বর কৃষ্ণ! আমার এই সাধনায়—আমার জিহ্বার জড়তা-প্রসূত অক্ষরোচ্চারণে যে প্রমাদ হইয়াছে, এই মন্ত্র জপে বা পূজার মাঝে যেখানে তাল লয় মান ভঙ্গ হইয়াছে তাহা তোমার কৃপার ভিতর দিয়া পূর্ণ হইয়া উঠুক। জীবের সাধনোপযোগী পুরুষকার যতই প্রাকৃতিক নিয়মে চূর্ণীকৃত হইতেছে ততই শ্রীভগবান এই অহেতুকী কৃপাশক্তি অবলম্বনে জীব হৃদয়ে চিন্ময় বেদঃ রূপে অবতীর্ণ হন্। বাহিরের অক্ষরাত্মক মন্ত্রই, ভিতরের এই কৃপাশক্তিকে ইঙ্গিতে বোঝাইয়া দিতেছেন। ভিতরেরটুকু প্রাণ, আর অক্ষররাশি দেহ বটে। তাইত নিত্যগোপাল লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণের দেহ কালী"। শ্রীমন্তে হর বাহিরের অক্ষররাশি অবলম্বনে অন্তরের কৃপাশক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা; হউক না কেন উচ্চারণ ভুল, উহা ত বর্তমান অবস্থায় হইবেই সন্দেহ নাই। কৃপা-স্মরণই প্রকৃত মন্ত্র জপ। কৃপা প্রদত্ত বীজ শক্তির মহিমায়ই ফুটিয়া উঠিবে ইহা স্থির, তবে জীবের কৃপাস্মরণে উহার সাহায্য হয় বটে। পতঞ্জলি বলেন, "তজ্জপঃ তদর্থ ভাবনং"—তাঁহার অর্থ-ভাবনাই তাঁহার জপ অর্থাৎ জীবকে একেবারে কৃষ্ণ-রসে ভাবিত করিয়া আপনার করাই শ্রীকৃষ্ণের অর্থ (প্রয়োজন); এই কৃষ্ণ-প্রয়োজন ভাবনাই প্রকৃত পক্ষে মন্ত্র জপ। জীবকে আকর্ষণ করিয়া সকল ফুলাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া শ্রীভগবান কৃষ্ণ। এই আকর্ষণ, কাম, কৃপাশক্তি বা ক্লীং বীজই জীবের চিন্তন, মনন বা ধ্যান করিবার বিষয় বটে। ক্লীং বীজ তাঁহার আকর্ষণের বা কৃপা-প্রবাহের সাঙ্কেতিক অক্ষর বই আর কিছুই নয়; উহার শুদ্ধ উচ্চারণ বর্তমান সময়ে সম্ভব নয়, তবে ভিতরের কৃপার কথা স্মরণ রাখিয়া বাহিরের উচ্চারণ যথাসম্ভব করিলেই অপূর্ণ পূর্ণ হইবে, ভুল শুদ্ধ হইবে। পূর্বোক্ত শ্লোক ও পরিষ্কারই বলিতেছেন যে, কোন অক্ষর পরিভ্রষ্ট হইলেও উহা তাঁহার প্রসাদে ভরিয়া উঠিবে। তাঁহার কৃপার জন্য আকাঙ্ক্ষা, তিনি আমাদের চান, তাইত আমরা তাঁহাকে চাই। পূর্বে তাঁহার চাওয়া, তারপর আমাদের চাওয়া। তিনি যখন আমাদিগকে প্রিয় মনে করেন তখন কি তাঁহাকে না পাইয়া আমরা থাকিতে পারি? শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—"প্রিয়োঽসি মে"—"অর্জুন তুমি আমার প্রিয়"। আমি জানি আমার সাধন ভজন ভুল ত্রুটি অপেক্ষা তাঁহার দাবী সত্য, স্বভাব সত্য; আকর্ষণ করিয়া আপনার করাই তাঁহার স্বভাব। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে জীবের প্রাণের মধ্যে গোপনীয় মন্ত্ররূপে স্থাপন করতঃ জীবের জীবত্ব দূর করিয়া নিত্যদাস বা নিত্যকান্তা সাজাইয়া দেন, ইহাই একমাত্র সত্য। যখন তিনি একবার কৃপাপুরুষ রূপে, বা ভক্ত-হৃদয়ে প্রকট হন

হইয়াছেন, তখন বাহিরের মন্ত্র উচ্চারণ দোষে পরিত্যাগ করিবেন না ইহা বিশ্বাস করিও। তাঁহার যখন প্রকাশিত হইবার ইচ্ছা হইয়াছে তখন সে ইচ্ছার প্রতিরোধ করে কাহার সাধ্য? ঐরাবত একবার চেষ্টা করিয়াছিল গঙ্গার প্রতিরোধ করিতে। কিন্তু মূর্খ ঐরাবত জানে নাই যে গঙ্গা বিষ্ণু পাদোদ্ভবা কৃপাশক্তি—উহার অবাধ গতি। তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় জীবের পুরুষকার-শক্তি ম্লান হইয়া চিরদিনের জন্য কোথায় আসিয়া যায়। জীবও মূর্খ ঐরাবতের মত, অসুর রাবণের মত ভগবৎ শক্তিকে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিতে লাগাইতে চায় ও ঐ শক্তির স্বামী হইতে চায়; কিন্তু সে অবশেষে তাঁহার আকর্ষণে স্থির থাকিতে না পারিয়া ঐ মহাশক্তির হাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া ধন্য ও নিশ্চিন্ত হয়। ভাগ্যবান সেই অজ্ঞলোকটী, তিনি নিত্য-কৃপায় ধন্য হইয়াছেন। তার কি তাঁহার, নিত্যগোপাল যখন একবার ঢুকিয়াছেন তখন আজই বা কালই হউক, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হউক, তাঁহার চরণে আত্মদান করিতেই হইবে। ঐ বিষ হজম করিবার সাধ্য নাই। উহা পাত্রার মত ভাসিয়া উঠিবেই উঠিবে। তিনি যে মন্ত্র পাইয়াছেন, তাহা যদি একেবারেই ভুলিয়া যাইতেন, তাহাতেই বা ভয়ের কারণ কি ছিল? শাস্ত্রীয় পণ্ডিত কৃপার ধার ধারে না, তাহারা পুরুষকারের উপর ভগবৎ প্রাপ্তিকে স্থাপন করিতে চায়। নচেৎ যে তাহাদের পাণ্ডিত্য মূল ছাই হইয়া যায়। কৃপার ইতিহাস ভক্তই জানেন। ভগবানের স্নেহাধীন ভক্ত-হৃদয়ে তাহার সম্যক উপলব্ধি হয়। ঐ অজ্ঞলোকটী যেন তাঁহার বর্ত্তমান মন্ত্র অবলম্বনেই প্রকৃত মন্ত্র শক্তির চিন্তা করেন ও তাঁহার কাছে প্রার্থনা করেন। নিত্য-কৃপাই সব ঠিক ঠাক করিয়া দিবেন। জীবের ভুল প্রমাদের কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া নিরাশ হইলে শ্রীভগবানের কৃপায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নাকি? আমা অপেক্ষা তাঁহার কৃপা সত্য। তিনি যখন অভয় দিয়াছেন, তখন তাঁহাকে না পাইয়াই পারি না। আমি সত্য না তিনি সত্য, তিনি যে সত্য স্বরূপ। আমার যাহা কিছু সব ভুল, তিনি একমাত্র শুদ্ধ পূর্ণ। আমার দিকে চাহিলে সব অন্ধকার, কেবল অন্ধকার। আমার স্নেহ-প্রসারিত কৃপাময় তাঁহার যাহার দিকে তাকাইলে কেবল জ্যোতিঃ, কেবল জ্যোতিঃ। তবে আর ভাই আমাদের ভুল প্রমাদের কথা অত ভাব কেন? ভাব তাঁহার "অভয়বাণী", শ্রীনিত্যগোপাল ভীত ত্রস্ত জীবকে অভয়ের কথা শুনাইতে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়াছেন জীবকে নিশ্চিন্ত করিয়া সাধনে নিযুক্ত করিতে। তিনি জীবের সাধনের পূর্ব্বে শ্রীভগবানের কৃপা স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তিযোগ-দর্শনে তিনি লিখিয়াছেন "ভক্তিযোগ সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ না করিলে, শ্রীভগবানের আশ্রিত হওয়া যায় না, ইহা অনেকের ধারণা। ঐ প্রকারে শ্রীভগবানের আশ্রিত না হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া যায় না, ইহাই অনেকের ধারণা; কিন্তু স্বয়ং শ্রীভগবান কৃপা করিয়া কোন ব্যক্তিকে তাঁহার আপনার আশ্রিত করিলে কিম্বা স্বয়ং শ্রীভগবান কৃপা করিয়া কোন ব্যক্তিকে তাঁহার আপনার শরণাপন্ন করিলে, ভক্তিযোগ সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভের অপেক্ষা করিতে হয় না। শ্রীভগবানের কৃপায় ভক্তিযোগ সাধনা না করিয়াও সে ব্যক্তি তদ্বিষয়িণী সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবানের আশ্রিত হইতে পারিলে—শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে—ভক্তিযোগ বিষয়িণী কোন প্রকার সিদ্ধিরই অভাব হয় না।" ১২৬—১২৭ পৃঃ। শ্রীশ্রীগুরুদেব "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"ভগবান যাহাকে ঐ প্রকার আশ্বাসজনক বাক্যদ্বারা সাধনা করেন, তিনি অতি ভাগ্যবান্, তাঁহার প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। যিনি অনন্যা ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ নাই,—তিনি পরামুক্তি লাভ করিয়াছেন। যিনি অনন্যা 'ভক্তিলাভ করেন নাই, শ্রীভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকেও শরণাগত করিতে পারেন। শ্রীভগবান ইচ্ছা করিলে মহা পাপীকেও নিষ্পাপ করিতে পারেন ইত্যাদি।" নিত্যগোপালের এই কৃপা, এই ইচ্ছার ধ্যানই আমাদের সাধনা। অন্য সাধনা বুঝি না, তাঁহার আশ্বাস বাক্যই একমাত্র ভব-ভেলা।

আমরা ভক্তিযোগ-সাধক নহি, আমরা নিত্য-বাণী অবলম্বনে "নিত্য-কৃপাযোগ সাধক"। নিত্য-কৃপাই জীবনে মরণে গতি। ভক্তিযোগ সাধনের উপযোগী মেরু মনও আমাদের নাই। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তিযোগ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, গুরুদেবও বহু বিধিও বিধিপথ করিয়া গিয়াছেন, আমাদের মহাপ্রভু শ্রীগৌর-নিত্যগোপাল "কৃপা যোগ" প্রচার করিয়া গিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। সেই জন্যই তিনি বেশী বিধি স্থাপন করিয়া যান নাই, ইহাই যোগধর্ম। জয় নিত্য কৃপা, জয় নিত্য কৃপাযোগ, জয় শ্রীনিত্য ভক্ত, জয় শ্রীনিত্যগোপাল।

তোমার শরৎ

পুঃ পত্র পাঠান্তে তোমাদের মনোগত ভাব জানিতে উৎসুক রহিলাম।

প্রদীপ

॥ শ্রীঅরুণ বরণ চক্রবর্তী ॥

(১)

প্রতিদিন হায়
করিতেছি কত ভুল নাই তার কোন গণনাই।
আমার সাধনা শুধু এই শুধু রয়,
ভুল করে শিখি যাহা তার তুল্য আর কিছু নয়।

(২)

যে সুখের আলোর মত শিখা
মত মাতাল, সুপ্ত-হিয়া,
সে দুখের রাতের আঁধার-বিবে
মরণ-মলিন, পাগলা দিশে।

(৩)

ভাবে সবে প্রেমে কি বা সুখ।
থাকে তাই সদাই উন্মুখ।
হায় তারা জানে না যে প্রেম
আনে সাথে অন্তহীন দুখ।

(৪)

মন যার
দুখে সুখে নির্বিকার,
নির্বন্ধক তার পথ।
তার রথ
মহানির্বাণের যেন চলিয়াছে একটানা।
রথের চূড়ায় তার নিশ্চয়ের উড়িছে নিশানা।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(১৩)

সকালে উদ্বোধনে তাঁর সংখ্যার 'ধর্ম ও অপধর্ম' ও সাময়িকী প্রবন্ধদ্বয় দেখি। পরে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। রেণু দুধ ছানা দিয়া সুবোধ দে-র ওখানে যায়। ৯টার পর মাখনবাবু আসেন। তাঁহার সঙ্গে প্রাইজের বইগুলি···ইত্যাদি বিষয়ে কথা হয়। তাঁহার পরই সন্তোষ অধিকারী আসে। ···রেণু আসে ১টার পর। প্রতিভাও আসে। ধীরেন ডাক্তার আসে ৭টায়। ইনজেকশন দেয়।... সন্তোষ ৮টার পর অফিসে আসে। তাহার একটী গল্প: কোনও বনে অনেক হরিণ থাকিত। রাজা হরিণ মারিত না, নিজে রক্ষা করিত, কিন্তু অপরে মারিলে তাহা রক্ষা করিত না। ইহা দেখিয়া হরিণদল পাশে অন্য এক বনে চলিয়া গেল, যেখানে রাজা অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, সে রাজা নিজে হরিণ মারিল। সন্তোষ বলিল—এ দেশের অজ্ঞবাদ এ দেশকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে নাই। অজ্ঞবাদ এ দেশকে পরাক্রমণ হইতে বাঁচাইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞবাদ নিজেই তাহাদিগকে ও বিশ্বকে ছলন করিতেছে।

২০শে আগষ্ট

সকালে ব্রহ্মসূত্রের বৈশেষিক দর্শনের 'সমবায়াত্ত্যাপগমাচ্চ' সূত্রটী রিভাইস করি। রেণু দুধ-ছানা দিয়া যায় ও এখানে বসিয়া প্রুফ দেখে। এখান হইতে প্রেসে প্রুফ দিয়া আসে। পরে বাসায় যাইয়া আবার 'ইণ্ডাষ্ট্রিজে' যায়, অর্ধ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন আনে। প্রায় ৪টায় আসে। প্রতিভা পূর্বেই আসে। ৪টার পর অন্য আসে···অন্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণই যে বিশ্ব-জীবনের যাবতীয় ক্রটীর মূর্তিমান ব্যাখ্যান, তিনিই যে পরম আত্মা, তাঁহাকে ভজনার অর্থ যে নিজের ভজনা, বিশ্বের ভজনা, বিশ্বাতীতের ভজনা যুগপৎ হয়, ইহা আলোচিত হয়। কোন জীবন্ত আদর্শ ব্যতীত কাল্পনিক আকাশের দ্বারা মানুষের প্রাণ তৃপ্ত হয় না, মানুষ মানুষ হইতে পারে না! কমলা আসিয়াছিল··· (তাহার নিকট) রাহুতার খবর কিছু শুনিলাম। ১৫ই আগষ্ট রাহুতার ছেলেরা বাসুদেবপুরের এবং বাসুদেবপুরের ছেলেরা রাহুতার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে নাকি ঝগড়া! নারীশিক্ষা সমিতির মেয়েরা নাকি থাকিতে চায় না:···প্রকৃতি বিশেষ-প্রসূতি: তাই কি মেয়েদের মধ্যে এই বিশেষের ঝগড়া? বিশেষে বিশেষের সমন্বয় কি মেয়েরা কিছুতেই পারে না? বৃন্দাবনে ইহার সমাধান পাওয়া যায়, যেখানে গোপীসমূহ হাত-ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণ-গৃহীতকণ্ঠ হইয়া নির্বিশেষ পরমপুরুষকে ঘিরিয়া রাস করিয়াছিল। ১টার পর ফিরলায় আসি, বৃষ্টি পড়িতেছিল।···

২১শে আগষ্ট

সকালে 'সমবায়াত্ত্যাপগমাচ্চ'···সূত্রটীর ব্যাখ্যা দেখি। রেণু আসিয়া দুধ-ছানা দিয়া যায়। প্রতিভা ১০টার পর আসিয়া বিজ্ঞাপন ও ৪র্থ বর্ষের প্রুফ প্রেসে দিয়া ১টার মধ্যে ফেরে। একটা ভিসিও করে···আমার ঘরটা নূতন করিয়া গুছায় রেণু। টেবিলটা পায়ের দিকে, চেয়ারটা খাটের বাম পাশে। যতটুকু যুক্ততা মানুষের সঙ্গে আছে, সেইটুকুকে অব্যাহত রাখিয়াই সেখান হইতে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার চালাইয়া যাইতে হইবে। বেশী টানাটানি প্রাণ বরদাস্ত করে না। আজই দর পাকা করিয়া লইব—ইহা অত্যাবশ্যক। যাপনের মত ছোট হইয়াই ঢুকিতে হইবে, বিশ্ব হইয়া বাহির হইতে হইবে। লোকুলের সম্বন্ধে এবং প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ঐরূপ

ব্যবহার চলা সম্ভব। যখন যে-অবস্থায় মানুষ থাকে, তাহার সঙ্গে সেখানে যুক্ত থাকিয়া সেখান হইতেই ধীরে ধীরে তাহাকে আগাইয়া নিতে হইবে। কাহাকেও ছাড়িবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যতটুকু সম্পর্ক যাহার সঙ্গে আছে, ততটুকুই পুরুষোত্তম-দর্শনে সত্য, পূর্ণ। এখানে অংশও পূর্ণ। অংশকে পূর্ণ দেখিতে পারিলে সেই অংশই একদিন সমগ্রকে গ্রাস করিতে পারে। অতৃপ্তি ও অসহিষ্ণুতাই টানাটানি করে। অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'অরবিন্দ কি ব্রহ্ম' এই প্রবন্ধের সমালোচনা বাহির হইয়াছে নারদি পত্রিকার ৪ঠা ভাদ্র সংখ্যায়, শ্রীসুন্দরম দাস কর্তৃক লিখিত। অমলেন্দুবাবুর লেখাতে প্রথম অংশের জবাব ইহার মধ্যে নাই। শেষ অংশের জবাব এককল্প হইয়াছে। অরবিন্দ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি যে জগৎকে transform করিতে চাহিতেছেন, ইহা বর্তমান যুগেরই চাওয়া। কিন্তু শুধু অতি-মানুষের অবতরণেই তাহা সম্ভবপর হইবে না যদি না পৃথিবীর সম্বন্ধে অতীত ধারণা, নিউটনের যুগের ধারণা, 'matter is dead, inert'—এই ধারণা বদলাইয়া এই ধারণার প্রবর্তন হয় যে 'জড়ের প্রতি কণা স্বয়ংপূর্ণ এবং স্বয়ংপূর্ণ জড়কণা সমূহের সমবায়ই বিশ্ব'। পুরুষোত্তম ঈশ্বর + জীব। ঈশ্বরের descent ও জীবের ascent-এর সমন্বয়েই জগৎটার transformation সম্ভব। অরবিন্দ অতীতের প্রচারবাদীদের মতই সত্ত্ব-রজ-তমঃ-র rigid ব্যবধান মানিয়া উহাদের উপর উঠিয়া তবে transformation চান। ইহা মায়াবাদীর বর্তমান যুগীয় সংস্করণ মাত্র। জগতের কাঠামোটাকেও নূতন করিয়া জন্মাইতে হইবে জগৎকে ধরিয়াই। রামগোপাল আফিসে আসে। ৫টার পর প্রতিভা আমার সঙ্গে আশ্রমে আসে। বৃষ্টি হইতেছিল।

২২শে আগষ্ট

সকালে 'কমল-দর্শন' রিভাইস করি। রেণু দুধ-ছানা দিয়া চলিয়া যায়। বেলা ১৭টা পর্যন্ত লিখি। রেণু সকালে জ্যোতিষবাবু, মেট্রোপলিটানের জানেজারের ওখানে যায়। ১০টার পর কলিকাতা যায়। মেট্রোপলিটানের বিজ্ঞাপন ৩টার পর নিয়া প্রেসে দিয়া প্রায় ৪টায় প্রাতরাশ সারিয়া ফেরে। ৫টার পর ডাক্তার আসে।...দুই দিন আগে বাবু বলিয়াছিলেন, আবেষ্টনে কেমন ভয় ভয় করে। আমি বলিলাম, 'প্রাণ ছাড়া অজানা আবেষ্টন, ভীতিপূর্ণ অবেষ্টনকে পাল্টি দিবার উপযোগী কেহ নাই। প্রাণস্পর্শ যেখানে পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গ করুন। ভয় দূর হইবে। অজানা রাজ্যে প্রাণই বান্ধব, বাক্য বন্ধু নহে। শেখরবাবু সেদিন রেণুকে বলিয়াছেন, আপনারা সুখী, সুখদুঃখ বলিবার স্থান পাইয়াছেন, বাসিন্দীকে পাইয়াছেন। আমাদের তাহা নাই। পাইতে তো চাই। সত্যি, জীবনের সকল দিক দিয়া একজন 'মানুষ' পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্য, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই 'মানুষ'-ই তো বিশ্ব খুঁজিতেছে। সে মানুষই ব্রহ্ম-মানুষ। যাহারা এখানে আসিল, টিকিয়া রহিল না তাহারা পাইয়া হারাইল। আমি তো প্রাণপণ করিয়াছি তাহাদের কাছে রাখিবার জন্য। পারি নাই। আমারও দুর্ভাগ্য, তাহাদেরও। ধীরেন ডাক্তারকে পাইয়া একজন আপন মানুষ ডাক্তার পাওয়া গেল।... ৫ম ইনজেকসন।

২৩শে আগষ্ট

সকালে ব্রহ্মসূত্র দেখি। রেণু ছানা-দুধ লইয়া আসে। কিছু পরেই শিশির আসে। সে গতকল্য রাঁচি হইতে আসিয়াছে। 'কৃষ্ণ' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাহাকে 'অখিলরসামৃতমূর্তি' পড়িতে দেওয়া হয়। সে পড়ে আমি ব্যাখ্যা করিয়া বলি। সে ১০টার পর যায়। প্রতিভা তাহার ভিসির ওখানে (আলিপুর) যায় ৮টার পর। ফেরে ৩টার পর।...সুবোধ যে আসিয়াছিল ১১টায় অফিসে। আমি ও প্রতিভা সন্ধ্যার সময় অফিসে যাই। দুপুরে রেণু-প্রতিভা ব্যাপার দিলায়। অফিসে ত্রিপুরাবাবু আসেন। তাঁহার লেখা সমালোচনা (দক্ষিণারঞ্জন বসু সম্বন্ধে) পড়েন। দক্ষিণাবাবুকে এতখানি মূল্য দিয়াছে কিনা ত্রিপুরাবাবু ও উদ্বোধন দিতে পারে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা

করা হয়। জিপুরাবাবু দক্ষিণাবাবুকে আধুনিক কালের 'কবি' বলিয়া অভিহিত করেন। মাখনবাবু আসেন। তাঁহাকে পূজা সংখ্যার রেট কার্ড ছাপাইবার কাগজের টাকা দেওয়া হয়।···আফিসে সন্ধ্যার পর ছুধোর মুখার্জি আসেন। তিনি বিভূতি যোগের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। জীবনের extensive, macrocosm, extrovert দিকই জীবনের বিভূতি। গোটা মানুষ অরূপ-বিরূপ সমন্বয়। গীতা মতে আত্মাও বিভূতি। কথায়-কথনের মূল্য ও স্থান সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। উদ্বোধন পত্রিকা হইতে মাখন সেনের কন্যা বাসনা সেন এম্. এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থের লেখা 'ভারতীয় দর্শনে অধিরোধ' প্রবন্ধটী রেণু পড়িয়া শুনায়। ভাল হয় নাই। শঙ্কর যে বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'আরব্ধ পরমাণুকারণবাদো ন কৈশ্চিদপি শিষ্টৈঃ কেন চিদপ্যস্মেন পরিগৃহীত ইত্যত্যন্তমেবানাদরণীয়ো বেদাভিজ্ঞৈঃ'। ইহাই তো অধিরোধের নমুনা!

২৪শে আগষ্ট

···হিন্দু আত্মরক্ষা করিতে গিয়া কোটি কোটি হিন্দুকে বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান করিয়া দিয়াছে। অবশ্য ইচ্ছে করিয়াই সে এই ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু শুধু আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায়ই তো কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাই আবার বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃষ্টান-হিন্দুকে পরিপাক করা। মুসলমানকে মুসলমান রাখিয়া, খৃষ্টানকে খৃষ্টান রাখিয়া উহাদিগকে হিন্দু করিবার দিন আসিয়াছে। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়। হিন্দু শব্দটার অর্থ (connotation) এত ব্যাপক করিতে হইবে যাহার মধ্যে বিশ্বের সব জাতি স্থান হইতে পারিবে। পেট-কোলা হিন্দু বাঁচিবে না। এতদিন পশ্চাদপসরণ করিয়াই হিন্দু টিকিয়া রহিয়াছে, এইবার অগ্রসর হইয়া সকলকে জীবনে আয়ত্ত করিয়া লইবার, ছড়াগো জিনিষকে সংহতরূপ দিয়া পাইবার দিন আসিয়াছে।··· প্রতিভা ৮টার পর রামকৃষ্ণ ইন্সটিটিউট হইতে অমলদা (রায়মহল) পুনরায় ইন্দু করিয়া আনে।···

২৫শে আগষ্ট

সকালে তাজের উদ্বোধন হইতে শ্রীকৃষ্ণ (স্বামী পবিত্রানন্দ লিখিত), ঐতিহাসিক মহামানব শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীসাহাজী লিখিত) ও ভারতদর্শনে ঈশ্বরবাদ (গোপিকা-মোহন ভট্টাচার্য লিখিত) পড়ি। রেণু দুধ-ছানা দিয়া যায়। তাহার সঙ্গে প্রায় ১টায় অফিসে যাই। প্রতিভা সকালেই আসিয়া র‍্যাপার লাগাইতেছে। সে রেণুর ওখানে দুপুরে খায়। আমি ও রেণু ১০টার পর একত্র হইয়া বাহির হই। সে ট্রামে কলিকাতা যায় বেঙ্গল লেন্ট্‌।ল ব্যাঙ্কের চেকটার ভুল তারিখ ঠিক করিতে ও ধীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া আবতীর বিষয় জানিতে।··· আমি ২টায় আবার প্রতিভার ছাতা মাথায় দিয়া অফিসে যাই।···ইহার মধ্যে প্রেস হইতে রেটকার্ডগুলি দিয়া যায়, আর মাখনবাবু তরকারিগুলি (তাঁহার নিজের হাতে তৈয়ারী) আফিক জগতে রাখিয়া গিয়াছিলেন সেগুলিও তোলা দিয়া যায়···সকালে আফিসে যাওয়ার পর ধীরেন ডাক্তার আসিয়াছিল।···উজিরপুরের দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ দেখা করিতে আসে। 'আমায় চাকর রাখ'—গানটী তাহার মুখে অনেক আগে শুনি। উহা তখন বেশ ভাল লাগিয়াছিল।

২৮শে আগষ্ট

সকালে বঙ্কিম পণ্ডিতের 'শ্রীকৃষ্ণ ও পূতনা' প্রবন্ধ ও প্রতিভার সেবাব্রত দেখি। রেণু আসিয়া দুধ-ছানা দিয়া যায়। ১০টায় সুধাংশু আসে। সুধাংশুর সঙ্গে অনেক কথা হয়।···'রাসরহস্য-বর্ণনই মানুষকে সকল আবেষ্টন ভুলাইয়া করাইয়া আগাইয়া নিতে পারে। কাহারও উপর অনুরাগ বা বিদ্বেষ না রাখিয়া একটা ব্যাপক চিন্তা প্রণালীর মধ্য দিয়া সামনের দিকে আগাইয়া চলিলে তাহাকে পরিপাক করা খুব সহজ হয়, অনুরাগের বা বিদ্বেষের পথে অগ্রসর হইলে বাড়িয়াই চলে।···সিঁড়ি ভাঙ্গ করিতে করিতে ছাদে উঠিতে হয়, ছাদে উঠিলে সিঁড়ি একেবারে ভাঙ্গ

হয়—এই দৃষ্টান্ত সাধনার ক্ষেত্রে সত্য নয়। পথ-চলা ও পৌঁছানো একই সত্যের দুই দিক। সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে যদি ছাদ, ছাদের স্থান না থাকিত, সিঁড়ি বহিয়া ছাদে উঠাই যাইত না। সিঁড়ি ও ছাদ একান্ত ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। 'যাহা কাম তাহা নামি রাম, যাহা রাম তাহা নাহি কাম'—কাম হইবে যত দূরে, রাম তত নিকটে, এই দৃষ্টান্তও অচল! বর্ত্তমান পদার্থবিজ্ঞান দেখা গিয়াছে যে, আলো-কণা (Photo-electric) যতই দূরে থাকুক না কেন, সে একই থাকে। দূর নিকটের ভেদ পুরুষোত্তম-ব্রহ্মবস্তুতে নাই। প্রতিভা ২টার পর আফিসে আসে। রেণু এখানে আসে ১টার পর। মাখনবাবু সিল ঠিক করেন। আমি প্রায় ৪টার রেণু সহ আফিসে যাই। ফিরি ৯টার পর। প্রতিভা দিয়া যায়।...

২৭শে আগষ্ট

...আখিল জগৎ সম্বন্ধে যথাযথ অবস্থা জানিবার জন্য আশুবাবু ও অমিয়বাবুর ওখানে রেণু যায়। তাহাদের পাওয়া যায় না, চিঠি দিয়া আসে।...আজ ভোরে ৮টার মধ্যে উজ্জ্বলতারত পৌঁছাইয়া দিয়া আসে রিক্সায় প্রতিভা। যে সব মূল প্রতিষ্ঠিতার বোগ দিয়াছে, তাহাদের কাছে কাল যাইবে।...অ্যাডলীর Collected Essays আনা সুবোধবাবুর ওখান হইতে নিয়া যাবে।

২৮শে আগষ্ট

...সকালে ঘুমাই রেজলার্সের 'আর্থে'র জন্য 'দুই পৃথ্বী' প্রবন্ধটী লিখি। রেণু দুধ ছানা দিয়া যায় ৮টায় পড়ে। ১২টায় আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করে, খোসেয়ারে যায়।...আশুর সঙ্গে প্রতিভার কথা হয়। আশু বলে, আপনার বুঝি আমার সঙ্গে কথা বলিতে ভাল লাগে না? প্রতিভা বলিল, তা কেন লাগিবে না? আরও বলিল, তুমি কেবল বিচারদ্বারা সব বুঝিতে চাও, তাহা হয় না। বিশ্বাস ও চিন্তার দুই না থাকিলে কোনও মীমাংসা সম্ভব নয়। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, বিচার যদি subjective হয়, তবে বিচারে ফাঁকি থাকে। মানুষ যাহা বিশ্বাস করে বিচারদ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করে। বিচার থাকে face-saving রূপে। যুরোপ তো ইহাই করে। যেখানে সকলের বিচার সমন্বিত হইতে পারে এবং সর্ব্ব বিচার সকল বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিত হইবে, সেখানেই বুঝিতে হইবে বিশ্বাস ও বিচার দুই-ই ঠিক হইয়াছে। শঙ্করের বিচারও একদেশদর্শী, রামানুজেরও, বুদ্ধেরও। যাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন, বিচারে তাহাই প্রতিপন্ন করেন। ইহা তো বিচারের পক্ষে ব্যভিচার। বিচার যদি সর্ব্ব দিক বিচারকে তাহাদেরই মূলে বিচার করিয়া বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারে, তবেই হয় বিচারশুদ্ধি, বিশ্বাসশুদ্ধি। বিচার ও বিশ্বাস পরস্পরকে বিশুদ্ধ রাখে। রাত্রি ৯টার কিছু আগে সন্তোষ আসে। আমরা একত্রে বাহির হই। সন্তোষ আমার পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসে। প্রতিভাকে মোড় হইতে বিদায় দেই। সত্যব্রত আমার জন্য একটা ক্যামেল সল্ট কিনিয়া আনে...।

২৯শে আগষ্ট

ব্রজেন্দ্রের 'বৌদ্ধ-দর্শন' দেখি। রেণু দুধ ছানা দিয়া যায়। রেণু কলিকাতা যাবে 'মিউচুয়াল, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, সেক ডিপজিট,' প্রেস ইত্যাদি আরগায় ঘুরিয়া ২টার পর আসে। প্রতিভা তাহার পূর্ব্বে আসে। শিশির আসে ৩টায়। তাহারও আর একটী মেয়ে শিক্ষয়িত্রী আসিয়াছে। সে আমাদের সঙ্গে একত্র হইয়াই বাহির হয়। সতীশ মুখার্জীর মোড় হইতে সে চলিয়া যায়। রেণু শশিবাবুর ওখানে সকালে যায়। সুবোধ যে ৮টার পর আফিসে আসে। ৩টার পর যায়। রেণু মোড় পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসে। প্রতিভা ৪টার পর বাসায় যায়। সে কাল ভোরে বকুলার ওখানে যাইবে। সুবোধ একজন নূতন গ্রাহকের টাকা দিয়া গেল। ৩ জন নূতনের নাম দিয়া গেল। শনিবার ভোরে রেণু তাহার ওখানে যাইবে লক্ষ্মীবিলাসের বিজ্ঞাপনের জন্য, টাকাটা নিয়া আসিবে।...শিশিরের সঙ্গে যে সব কথা হয়: আমি

সাইকো-এনালিসিসের মত সারফিক্যাল অপারেশন করিয়া মানুষের মনস্তত্ত্বে পুরুষোত্তমকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করি। জীবন বদলাইতে কেহ চায় না, তাই আমার কাছে লোক আসে না। নিরাবরণ হইয়া নিজের তালমন্দ একেবারে উলঙ্গ হইয়া ভগবানের কাছে উপস্থিত না করিলে ভগবান কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবেন? আমি অগ্রে গোটা মানুষকেই গ্রহণ করি, জীবনে জীবন মিলাই, তাহার পর বিশ্লেষণ করি। যে থাকিবে, যত হইবে, আমিও অন্নজলান্তরের দায়িত্ব নিব। না হয় চলিয়া যাইবে, আমাকে ঋণ-মুক্ত করিয়া যাইবে। মানুষ স্বাধীনভাবে আসিবে, স্বাধীনভাবেই যাইবে। Heart to heart talk হওয়ার পর প্রত্যেকেরই অধিকার থাকিবে বিচ্ছিন্ন হইবার—স্বামী স্ত্রীরও। একান্ত ভিন্ন হইজনের অভিন্নতাই আমি আদর করি। এমন একান্ত ভিন্ন করিয়া কোনও দুইজনকে অভিন্ন করে নাই।···

৩০শে আগস্ট

সকালে 'দুই পক্ষী' প্রবন্ধটা লেখি। উহা আর্যের জন্য রেণু দিতে চায় না। তাহার ভাল লাগিয়াছে। আর-একটা লিখিয়া দিব। উদ্বোধনের জন্য উহা থাকিবে। দুধ-ছানা দিয়া যায়। ১০টার পর ফোন করিয়া গোস্বামীকে পায় না। মন্থর বাসায় রেণু সকালে যায়। ১১টায় গোস্বামীর কাছ হইতে একটা খামের চিঠি আসে। ১৪০ টায় স্নান হইয়া রেণু আশুবাবুর ওখানে যায়। ২টার সময় আশুবাবুর সঙ্গে দেখা হইবে। প্রেসে গোস্বামীর সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা হয়। সে বলিল যে কাজ চলিবে, কাগজ নিবার প্রয়োজন নাই। কাল সকাল ৭টায় ফোন করিয়া সঠিক জানিবেন। মাখনবাবু ফোন করেন। রেণু ৩৫০ টায় চলিয়া আসে। মাখনবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না। আজ চাকেশ্বরী হইতে ২০ রীম মেকানিক্যাল কাগজ কেনার কথা ছিল। রেণুর এখানে আসার পর মাখনবাবু আবার ফোন করেন। আগামী রবিবার আসিয়া কাগজ কিনিবেন বলিলেন।··· যাইতে বলিয়া সত্যব্রতের সঙ্গে জীবনের—ব্যবসায়েরও organic growth-এর কথা হয়। Organic growth-এর পথে চলিতে হইলে নিজেদের 'solidarity,' প্রাণশক্তি থাকা চাই, ব্যাপক জীবন, দৃষ্টি ও কৌশলের সহিত পরিচয় চাই। বেজাউল করিম, সন্তোষ ও গৌতম সেনের প্রবন্ধ আসে। লেখকবাবু সন্ধ্যার পর আফিসে আসেন।

৩১শে আগস্ট

··ব্রহ্মসূত্রের যৌক্তদর্শনের অংশ রিডাইস করি। রেণু ছানা-দুধ দিয়া যায়। ···রেণু সকালে সুহৃৎবাবুর ওখানে যায়। ১টায় ফেরে, আবার ২টায় বাহির হয়, ফেরে ৩টার পর। আর্যস্থানের এস, সি, রায় (যিনি আর্যিকজগৎ প্রেসের ভার নিয়াছেন)-এর সঙ্গে আর্যিক জগৎ সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়।···

আফিসে যাওয়ার কিছু পরেই শিশির সেখানে যায়। সৌর সাহা আসে, তাহার ৬ মাসের চাঁদা ও বিশ্ববাণী হালের (নূতন গ্রাহক) ২৲ টাকা চাঁদা (বৈশাখ হইতে) দিয়া যায়। পরে শ্যামগোপাল আসে। যূথিকা শীলের ৪৲ দিয়া যায়। পরে রণজিৎ সেন আসে। সে তাহার প্রবন্ধ পড়িয়া শুনায়। আমাদের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়, রাইভার সেতার, এস্রাজ, বেহালার স্কুল খোলা হইয়াছে কিছুদিন আগে এবং তাহাতে ছাত্রও হইয়াছে শিশির বলিল। তাহার এক বন্ধু প্রতি রবিবারে গিয়া বিনা টাকায় শিক্ষা দিয়া আসেন। বৃহস্পতির ছাম ১২০৲ টাকা হইয়াছে, আজ কিস্তির ২০৲ টাকা দিতে হইবে। ···বিশ্বনাথের প্রাণের কথা হইল। বিশ্বনাথের প্রাণটা ভাল; কিন্তু উহা তাহার বন্ধনের কারণ হইয়াছে। নিষ্ঠুরতাও যেমন বন্ধন, দয়াও বন্ধন। 'ভাল মানুষ' শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই বর্তমান যুগের আদর্শ। আগের কালের ভাল-মানুষি উচ্চাদর্শ ও ব্যবহারজীবনেরও অনুমোদিত নয় ইত্যাদি ···।

১লা সেপ্টেম্বর

সকালে 'ব্রহ্মসূত্রের প্রতিসংখ্যানিরোধ' সূত্রটি রিডাইস করি। রেণু ছানা-দুধ দিয়া যায়। এখান হইতেই সুবোধ-

যে'র এখানে যায়। সন্ধ্যাবিহারের ডিরেক্টারের কাছেও যায়। সেখান হইতে কার্টেন হইয়া গভর্নমেন্টের টাকাটা নিয়া আসে। বাসায় যায় ১-৩০-এর সময়। প্রায় ৩টায় আসে। ইহার পর কমল আসে···ইহার পর বীরেন ব্যানার্জী আসেন। তাহার সঙ্গে তাহার লেখাটি স্থির হয়। উহার নাম দেওয়া হইল 'ভগবদ্ভাবনান্বিত শ্রীকৃষ্ণ'। সেবানন্দ আসে, পত্রিকা দিয়া যেই, মঠের প্রাবণ মাসের চাঁদা ২৲ টাকাও। ইতিমধ্যে অন্য আসে। ···দুপুরে প্রেস হইতে ব্রহ্মসূত্রের ১২শ ফর্ম-এর প্যালী প্রুফ দিয়া যায়। সোমবার সকালে নিয়া যাইবে। ···সকাল বেলা কিতীশ চক্রবর্তী আসিয়াছিল। গভর্নমেন্ট উদ্বাস্তুদের তত্ত্বাবধানের ভার সাধুদের উপর দিতে চায়। মহানির্বাণ মঠের ট্রাষ্টিবোর্ড রাজী নয়। 'ভক্ত সঙ্ঘ' ভার নিতে চায়। কি করা উচিত। ভক্তসঙ্ঘের কোন legal status নাই। তাহাদের তাই দিবে না। আর আমার ভার নিবার সময় শক্তি বা ইচ্ছা নাই। আমাকে উহারা আমার অজ্ঞাতসারেই ভক্তসঙ্ঘের সভাপতি করিয়াছে। আমি উহাতে রাজী নহি। ওখানে এখনও কিছু করা সম্ভব নয়। রাত্রি ২টার পর বোড় পর্যন্ত রেণু আগাইয়া দিয়া যায়···

২য় সেপ্টেম্বর

সকালে প্রতিভার সেবারত প্রফ আরও ছাট দেই ও শুদ্ধাই। রেণু দুধ ছানা দিয়া যায়। সকালে অমূল্য (ভাগিনেয়) আসে পুণা হাঁটী হইয়া। রেণু আসে প্রায় তিনটায়। প্রুফ রেখে। ···আমার জীবনে তুরীয়াতীতেরও একটা পরম লাগিয়া আছে, তাই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয় কোন অবস্থায়ই ধরা না পড়িবার মত একটা অবস্থা আমার জীবনে আছে। আমি সকলের মধ্যে থাকিয়া সকলকে সার্থক করিয়াও সকলের বাহিরে থাকিয়া আগাইয়া চলিয়াছি। নিত্যগৌরধানন্দ একদিন বলিয়াছিল, তোমার জীবনের ব্যাপকতা আমাদের চেয়ে বেশী, তাই তোমাকে আমরা সজাতীয় মনে করি না। বাস্তবিকই আমি বুঝি প্রকৃতির কোনও স্তরেরই সজাতীয় নাই। কেহই আমাকে আপন করে না। আমি সকলকে দূরে দিয়াও তাহাদের বাঁধিয়ে থাকি। কি করিয়া আমার এমন হইবে? অনিলবরণ 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' নামে এক প্রবন্ধ দিয়াছেন আলমবাজারে। বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈন দর্শনের atomic theory মানিয়া না নেওয়ার বেদান্ত মাটির ধর্ম দিতে পারে নাই। অরবিন্দের ভাগবত-বিশ্বও আকাশেই থাকিবে যত দিন না এই বিশ্বকে পরমাণুতে ভাগ করিয়া সেখান হইতে রওনা হইতেছেন। সমস্ত পরমাণু সৃষ্টি করিবে অণুকে, অণু-পরমাণু মিলিয়া সৃষ্টি করিবে বিশ্বকে। বিশ্ব আবার সৃষ্টি করিবে অনন্ত অণু-পরমাণুকে। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন বিশ্বকে, বিশ্ব সৃষ্টি করেন বিশ্বেশ্বরকে। যাহার ভিতর এই সৃষ্টি ব্যাপার চলিতে পারে, তিনিই পুরুষোত্তম, সর্ব্ব দর্শনসিদ্ধান্তধন।

৩রা সেপ্টেম্বর

বিশ্বের দূর-সুদূর পরম অর্থই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অযাচিত অনাহূতভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন আমার হৃদয়-আঙ্গিনায়। কি অবিবেচক! মূঢ় আমি মনে মনে শঙ্কিতে। আমাকে নিয়া টানাটানি করিয়া কি লাভ? 'তেবে মরি লাজে পরবে, তুমি আমার কাঙ্গাল!' যে দায়িত্ব আমার উপর বর্ত্তাইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিই মুক্তি। আমার আর কোনও বন্ধন নাই। তাঁহার কথা বিশ্বকে শুনাইব, তাঁহার জীবন বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করিব, তাঁহার ছাঁচে ধরার প্রতিটি অণু গড়িয়া তুলিব —তবেই আমি দায়মুক্ত। ৮টার পূর্ব্বে রেণু আসে। ঠাকুরকে ঘরবেল ভোগ দেওয়া হয়। সুধাংশু আসে 'রস মাধুরী' মিষ্টি লইয়া। জ্ঞানেন্দ্র দাস আসেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার লেখা 'আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বশ্যতা' নিয়া আলোচনা হয়। 'Pull from within' না থাকিলে পক্ষপরবিরোধী দুই কেমন করিয়া যথাযথভাবে যথাস্থানে আকর্ষিত হইবে?···গীতার উদ্বেগ ও বিষের আজ শেষ হয়। বীরেন বাবু পড়েন। রেণুর শরীরটা খারাপ, জ্বরভাব।

সে রিকসায় আসে যায়। মন্মথবাবুর 'হ্যামিকেন' কথানাটা পাঠ করে রেণু। মাতার স্নেহ বিকৃত হইয়া পরিয়া দাঁড়াইলে তাহার প্রতিক্রিয়ায় কেমন করিয়া সন্তানের কাছে বিশ্ব-প্রকৃতি বিভূতিতে পরিণত হয়, কেমন করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির বুক চিরিয়া কেবল হাতছানি দিয়া ডাক আসে এবং মাতৃ-স্নেহ অপসরণের সঙ্গে কেমন করিয়া সন্তান বিভূতির অতল তলে ডুবিয়া যায়, তাহারই একটি ছবি নাট্যকার আঁকিয়াছেন। আমি প্রতিভা ও বীরেন একত্রে বাহির হই।

৬ই সেপ্টেম্বর

সকালে বৌদ্ধ-দর্শন রিভাইস করা শেষ করি, বৈকালে জৈন-দর্শন আরম্ভ করি। শরীর অসুস্থ থাকায় রেণু ছানা-দুধ নিয়া আসে না। প্রতিভা ভোরে বাসা হইতে আসিয়া ছানা দুধ নিয়া আসে; প্রেসে উদ্ভোধনের প্রথম ফর্মা কপি (১ম ৪টা) দিয়া আসে। এইখানেই দুপুরে খায়, 'আমাদের দেশ ও আমার জাতি' নকল করে। দুপুরেও রেণু আসে না। ৫টার পর আমি প্রতিভা আফিসে যাই। সকালের দিকে সুবোধ যে আসে। ট্রামের monthly করিয়া দিবার জন্য টিকিটটা নিয়া যায়। সন্ধ্যার পর প্রেস হইতে এই মাসের বিল ও ব্রহ্মসূত্রের ১১-শ ফর্মের শেষ প্রুফ দিয়া যায়। আজ চেক দেওয়া হয় নাই। দরকার হইলে কাল পাঠাইতে বলা হইয়াছে। ...সকালে 'জড়বিজ্ঞান ও কোয়ান্টাম্' (ব্রজেনবাবুর লেখা) পড়ি। বেশ লাগিল। ক্ষুদ্র আবেষ্টনের ভিতর সুশৃঙ্খলিত থাকার পর বৃহৎ আবেষ্টনের মধ্যে পড়িলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, সেই বিশৃঙ্খলাকে পুনরায় শৃঙ্খলায় গড়িয়া তুলিবার জন্য 'h' রূপ কোয়ান্টামের প্রয়োজন। নচেৎ সে ঘরেও ফিরিতে পারিবে না, বাহিরেও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে পারিবে না। এতদিনের শাস্ত্র সমাজ ছিল ঘরমুখো। আজ ঘর-বাহির একত্র করিয়া জাতিকে শৃঙ্খলার ভিতর থাকিতে হইবে। ইহার জন্যই প্রয়োজন অবধূত-ভাবের। অরবিন্দ ascent-এর কোনও কৈফিয়ৎ দেন নাই। Ascent-এর জন্য চাই নীচের মাটিতে নূতন-রূপে বিন্যাস করা। বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈন দর্শন ছাড়া কোনও দর্শনই ইহার খোঁজ দিতে পারিবে না। অরবিন্দ-দর্শন মোটামুটি বেদান্তেরই..., ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া। মাটির সঙ্গে এই ব্রহ্মের সংযোগ অরবিন্দ-দর্শন দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। ব্রহ্ম যতই descend করুন, কিছুতেই মাটিকে তিনি স্পর্শ করিতে পারিবেন না, যতক্ষণ না পৃথিবীর প্রতিটি কণাকে স্বরূপ-বিস্বরূপ চিদানন্দঘন বলিয়া আস্বাদন করা যায়। এই জন্যই বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈনদর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করা।

৭ই সেপ্টেম্বর

সকালে জৈন দর্শন রিভাইস করি। রেণু দুধ-ছানা দিয়া যায়। ইহার পূর্বে প্রেস হইতে দারোয়ান আসিয়া উদ্ভোধনের ৩য় সংখ্যার বিলের টাকা বাবদ চেক নিয়া যায় যাহা গত রাত্রিতে আমার সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সাময়িকী 'ভারত ও রাসেল' লিখি। রেণু ১০টার পূর্বে সুহৃৎবাবুর ওখানে ও লক্ষ্মীবিলাসে যায়। সুহৃৎবাবুর 'আনন্দ' প্রবন্ধ নিয়া আসে। নকল করিতে হয়। কতকটা করে রেণু, বাকিটা প্রতিভা। ২টার পর রেণু আসে, প্রতিভা আসে ৩টায়। উমাস্বামীর 'তত্ত্ববিলাস' দেখি। 'হিংসানৃতস্তেয়ব্রহ্মপরিগ্রহেভ্যঃ বিরতিঃ ব্রতম্'—৭-১, 'প্রমত্তযোগাৎ প্রাণব্যপরোপণং হিংসা' (৭।১৩) 'অসদভিধানম্ অনৃতম্—৭।১৪, 'অদত্তাদানম্ স্তেয়ং' (৭।১৫), 'মৈথুনং অব্রহ্ম' (৭।১৬), 'মূর্ছা পরিগ্রহঃ'—৭।১৭ সব কয়টী সূত্রের সঙ্গে 'প্রমত্তযোগাৎ' পদটী যুক্ত আছে। প্রমত্তযোগ হইতেছে 'Passional vibration'। এই প্রমত্তযোগ না থাকিলে প্রাণব্যপরোপণ হিংসা হয় না, অসদভিধান অনৃত হয় না, অদত্তাদান স্তেয় হয় না, মৈথুন অব্রহ্ম হয় না, মূর্ছা (infatuation or intoxication) পরিগ্রহ হয় না। বেশ সাইকোলজিক্যাল জৈন দর্শনের এই ব্যাখ্যা। আমরা সন্ধ্যার পূর্বেই আফিসে যাই। মাসতীর আসার কথা ছিল ৬ই আজ, আসিল না। যাইবার সময় পথে দেখিতেছিলাম আসিতেছে কি না। সন্ধ্যার পর বালুরঘাটের নলিনীবাবুর

পুত্র তাহার বক্তব্য সহ আসে।...ইহার পর আসেন রামাচরণ-বাবু তাহার বক্তব্য সহ।...ইহার পর চিদানন্দ আসে।...

৬ই সেপ্টেম্বর

সকালে 'সুদর্শন' পত্রিকার কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করি। রেণু দুধ-ছানা দিয়া যায়। পরে সুহৃৎবাবুর কপি-করা প্রবন্ধটী শুনাইয়া অনুমোদন করাইয়া আনে।...রেণু এখানে আর আসে না। ৪টার পর বাসায় ফেরে। প্রতিভা আসে ৬টার পর। আমার সাময়িকীটা নকল করে। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আফিসে যাই।...একটী লোক যদি প্রাণ খুলিয়া খাটে, রেণু ও প্রতিভা তখন যে সময় পাইবে তাহাতে আমার দিক হইতেও অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। রেণু লিখিতে পারিবে, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন যোগাড় করিতে পারিবে।...যেমন হউক নামে এক ভদ্রলোক আসেন। সর্ব্বসাধারণের কাছে পৌঁছাইবার জন্য পত্রিকায় 'খেলাধূলা-র খবর নেওয়া কিনা জিজ্ঞাসা করেন। তখন পত্রিকার উদ্দেশ্য ও পথের আলোচনা হয়। খেলাধূলা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি লিখিতে তাহাকে অনুরোধ করা হইল। ধর্ষিতা নারী, অশ্লীলতাবর্জ্জন প্রভৃতি ঘটনা অবলম্বনে আমাদের বক্তব্য সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। তিনি গ্রাহক হন।...

৭ই সেপ্টেম্বর

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের পৃষ্ঠা ১-২৩ পর্যন্ত আজ প্রেসে গেল। সকালে জৈন-দর্শন সম্বন্ধে পড়াশুনা করি ও রিডাইস করি। রেণু দুধ-ছানা দিয়া যায়।...রেণু কলিকাতা লক্ষ্মীবিলাস, দীপ্তি লর্চন খুরিয়া ১টায় এখানে আসে।...বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হইতে Analysis of Matter, ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ের তামতীপাদ শঙ্করভাষ্য রেণু নিয়া আসে। রেণু ব্রহ্মসূত্র, উদ্ধরণভারতীর প্রুফ দেখে। যখন আমরা বাহির হইব, তখন আমার ঘুরে দেখিবার চলমা খুঁজিতে পাওয়া গেলই না। গরু-ভোলানাথ ছুড়িয়া ফেলিতেও পারে। কি জানি? কি অদ্ভুত খেলা প্রকৃতির আমাকে নিয়া! দেখিয়া যাই। আফিসে প্রেস হইতে উদ্ধরণভারতীর ২ কর্ম্মা ও ব্রহ্মসূত্রের ১১শ, ১২শ, ১৩শ-এর প্রুফ দিয়া যায়।...

৮ই সেপ্টেম্বর

সকালে Analysis of Matter (Russel) পড়ি, Matter & Light ও পড়ি। প্রতিভা সকালে ছানা-দুধ দিয়া বাসায় যায়।...রেণু হুমায়েশে যায় ১০টায় সময়, ফেরে ১৫০ টায়।...ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনের মধ্যে কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়া সারা জীবন বিশ্বের সেবা করিয়া আসিয়াছি, তবুও সে প্রয়োজনটুকু 'সহজে' উপস্থিত হয় নাই, 'অযাচিত না প্রসিদ্ধতি'। আবেষ্টন এমনই প্রতিকূল। এমনই প্রতিকূল সাইকোলজির মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। কিছুতেই যেন আমার অধিকার নাই, কিছুই যেন গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। পাওয়া বা দেওয়া সবই তো 'process'—দিতেও তো পারিতেছি না, পাইতেও পারিতেছি না। 'Commonsense holds—though not very explicitly—that perception reveals external objects to us directly: when we 'see the sun', it is the sun that we see. Science has adopted a different view without always realising its implications. Science holds that, when we 'see the sun', there is a process, starting from the sun traversing the space between the sun and the eye, changing its character when it reaches the eye, changing its character again in the optic nerve and the brain, and finally producing the event which we call 'seeing the sun.' Analysis of Matter P192

৯ই সেপ্টেম্বর

কোন বিস্মৃত-প্রায় মহিলা কবি

॥ শ্রীমানস কুমার রায় ॥

প্রতিভার অকালমৃত্যু বেদনাদায়ক। সম্মান, যশ ও কৃতকার্যতার চরম বিকাশের পূর্বেই বসন্তবায়ুবিচ্ছুত শিশিরের মত এই আকস্মিক বিদায় অত্যন্ত মর্মন্তুদ।

১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট একবিংশ বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনের উপর যবনিকা পড়ল। এই স্বল্পপরিসর জীবনেই তরুলতার কবি-প্রতিভা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া তিনি ইংরেজী, জার্মাণ, ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় লেখা তাঁর রচনা ও কবিতা এক অমূল্য সম্পদ।

১৮৫৬ সালে ৪ঠা মার্চ কলকাতায় রামবাগানের দত্ত পরিবারে তরুলতার জন্ম হয়। পিতা গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত ছিলেন রুচিবান কৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। তিনিও ফরাসী ও জার্মাণ ভাষা ভাল জানতেন ও অনেক কবিতাও অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর এই ক্ষুদ্র পরিবারকে যথার্থই বলা হত "বিহগ কূজিত কুলায়"।

তরুলতার এই প্রতিভার উন্মেষের পূর্ণতম সুযোগের জন্যে পিতাই একমাত্র দায়ী। তিনি তাঁর সন্তানদের স্বদেশী ও বিদেশী উভয় প্রকারের শিক্ষাতেই শিক্ষিত করেছিলেন। সমগ্র পরিবারটা শিল্পে, সাহিত্যে ও কাব্যে মুখরিত ছিল। রামবাগান থেকে জোড়াসাঁকোর দূরত্ব খুব বেশী ছিল না। ১৮৬১ সালে, তরুলতার জন্মাবার পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ঠাকুর পরিবার ও দত্ত পরিবারের মধ্যে সাদৃশ্যও হয়ত কিছু খুঁজে পাওয়া যায়।

১৩ বছর বয়েসে পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে তরুলতা ইয়োরোপ যাত্রা করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নী অরুলতা ছিল মাত্র ১৮ বছরের বড়ো। অরুলতা খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন। দুই বোনের অনেক দিনের সাধ ছিল যে তাঁরা একটা বই লিখবেন যেটা অনেক ছবি ও অনেক কবিতায় ভরপুর থাকবে। একমাত্র ভাই আদুকে তাঁরা রাখিয়েছিলেন মাত্র ১৩ বছর বয়েসে।

১৮৬৯ সালে দত্ত পরিবার ফ্রান্সে এসে পৌঁছলেন। দক্ষিণ ফ্রান্সে 'নিস'-এর এক স্কুলে দুই বোনকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হ'ল। ফ্রান্স তাঁদের খুবই ভাল লেগেছিল, বিশেষ করে সৌন্দর্য, বিলাস ও ব্যসনের শ্রেষ্ঠা নগরী রাজধানী 'পারী'কে। ১৮৭১ সালে যখন ফ্রান্সের পরাজয় ঘটল, সমগ্র পরিবারের মধ্যে বিষাদের ছায়া পড়ল। তরুলতা লিখলেন :

তবুও সে ঘুমিয় নয়! দৃষ্টি তার এখনো অনিমেষ।
স্মরণ রেখো, ঐ তার অসি!
এখনো ক্ষুণ্ণ সে—এখনো ক্ষুরধার,
সংগ্রামে এখনো সে অক্ষয় নয়। *

* (লেখক কর্তৃক অনূদিত)

এক বছর পরে ১৮৭০ সালে দত্ত পরিবার ফ্রান্স থেকে লণ্ডনে এলেন ও সেখান থেকে ক্যাম্ব্রিজে কিছুদিন কাটালেন। এখানে তাঁরা তখনকার অনেক বিদ্বজ্জনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ক্যাম্ব্রিজে দুই বোন আবার কিছুদিন ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য অধ্যয়ন করলেন। এখানেই তরুলতা সর্ব প্রথম ফরাসী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করলেন।

ইংলণ্ডে থাকার সময় তরুলতা হঠাৎ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন; সকলে আবার ১৮৭৩ সালে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। এক বছর পরে তরুলতার মৃত্যু হয়। "ভগবান আমাদের কাছ থেকে তরুলতাকে নিয়ে এলেন। আমাদের পক্ষে এটা একটা কঠিন দুঃসহ পরীক্ষা: কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্...আমার মায়ের অন্তিম শয্যার পাশে সে শায়িত আছে..."।

তরুলতা অবিরাম লিখে যেতে লাগলেন। ঘরেরে সাহিত্যকে আরো ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। "Bengal Magazine" পত্রিকায় তিনি কয়েকজন ফরাসী কবির সমালোচনা করলেন। কিছুদিন পরে বেরুল কতগুলো ফরাসী কবিতার অনুবাদ—" A sheaf gleaned in French Fields"। দু'একটা ক্ষুদ্র ব্যাকরণের ভুল ব্যতীত বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকরাও তাঁর অনূদিত ফরাসী কবিতাগুলোর খুসী প্রশংসা করেছিলেন। তাঁরা প্রথমে কল্পনাই করতে পারেননি যে এই কবিতা-গুলো কোন ভারতীয়ের লেখা। Edmund Gosse-এর মতো বিখ্যাত সমালোচক তরুলতা সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "When the history of literature of our country comes to be written there is sure to be a page in it dedicated to this fragile, exotic blossom of song" "যদি কোনদিন আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাস লেখা হয়, তবে সেইদিন এই বিদেশী লতা কবিতাগুলোর জন্যেও একটা পাতা উৎসর্গীকৃত করা থাকবে।" তরুলতার অল্প বয়সেই স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে লাগল। অন্য মতো তিনিও এক খারাপ রকমের কাশিতে ভুগতে লাগলেন। তাঁর কলম কিন্তু থামল না। সেই ক্ষীয়মান স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি অবিশ্রান্ত লিখে চললেন—সংস্কৃত ও ভারতীয় মহাকাব্যগুলোকে ভিত্তি করে তিনি লিখলেন কতগুলো কবিতা ও উপকথা (Ancient ballads and legend of Hindustan)। এগুলো তাঁর মৃত্যুর পরে ছাপা হয়েছিল। "Bengal Magazine" এ তাঁর কিছু উগোর "লে মিজেরাব্ল"-এর অনুবাদ প্রকাশিত হল। তিনি লিখলেন Binaca বা The young Spanish Maiden ও সম্পূর্ণ ফরাসীতে লিখলেন Le journal de Mademoiselle d' Arvers"। শেষোক্ত দুটো লেখাই বহুলাংশে আত্মজীবনীমূলক; নিজের জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যে ভরপুর—মর্মপ্রাণ মহৎ ব্যক্তির অকাল বিয়োগের আলেখ্য নিয়ে রচিত। এর কিছুদিন পরেই তরুলতা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও ১৮৭৭ সালের ৩০ আগষ্ট মাত্র ২১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

তরুলতা তাঁর সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রম বিকাশ লাভ করলেন না। এটাই অত্যন্ত দুঃখের কারণ। তাঁর লেখা "A sheaf gleaned from French fields" প্রকাশিত হবার এক বছর পরে ১৮৭৬ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "ভানুসিংহের পদাবলী"।

কথায় কাজে ও আদর্শে তরুলতা ছিলেন গভীরভাবে ভগবানে বিশ্বাসী। "Those whom the Gods love, die young" কথাটা মনে হয় বস্তুতঃ সত্য। তাঁর স্মরণে Edmond Gosse লিখেছিলেন:

"Thy generous fruits though gathered ere their prime
Still showed a quickness, and maturing time
But mellows what we write to the dull sweet of Rime."

তোমার অকাল ফলের দান যদিও
অসময়ে হয়েছে আহরণ,
তবুও ক্ষিপ্র পরিপক্কতা তাদের ছিল;
হায়! ছন্দমাধুর্যে আমরা যা লিখি
তাদের মধ্যে পাকা ফলের স্বাদ নেই।

বন্ধুবরেষু

॥ শ্রীসুব্রত ॥

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতীর পূজা সর্বত্র সাড়ম্বরে হয়ে গেল। ইস্কুলে, কলেজে পাঠাগারে তো হলোই। এ ছাড়াও হলো নানা ক্লাবে, দোকানে, বাড়ীতে, বাজারে, পথে ঘাটে ছোট ছোট ছাউনি করে। একটি দুটি নয়, অসংখ্য। কোথাও কোথাও একই বাড়ীতে বিভিন্ন কক্ষে দুখানি, তিনখানি পর্যন্ত প্রতিমা পূজা হতে দেখলাম। সম্প্রতি আবার নানাস্থানে কোচিং ক্লাস খোলা হয়েছে, এখানেও বাদ যায়নি। কোচিং-এর ছেলে মেয়েরাও পূজো করেছে। সুতরাং সরস্বতী পূজোর সংখ্যা যে ক্রমবর্ধমান, এ কথা বলছি বাহুল্য। এখন এই প্রতি বৎসর প্রতিমা পূজোর সংখ্যা নিয়ে যদি বিচার করতে বসি যে, যেহেতু ভক্তের সংখ্যা বেড়েছে, সেহেতু ভক্তিও বেড়েছে, তাহলে ভুল হবে, কারণ অঙ্কের হিসেব সব সময় কাজে আসে না। অঙ্কে যা সহজ, বাস্তবে তা তত সহজ নাও হতে পারে। অন্ততঃ এক্ষেত্রে যা চাক্ষুষ দেখছি, তাতে ব্যতিক্রমটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

একথা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আমাদের ছেলেবেলায় এত পূজো হতো না। ইস্কুল কলেজ লাইব্রেরীতে অবশ্যই হতো। এবং বাড়ীতেও কিছু কিছু। কিন্তু বাড়ীতে পূজোয় প্রতিমা আসতো না, বই পূজো হতো আর তার সঙ্গে লেখনী ও মসীধার।

নিশ্চয়ই খুব বেশি দিনের কথা নয়, স্মরণ করা খুব অসুবিধা হবে না। একবার ভেবে দেখ তো, সেদিনের কথা।

এই পূজো আমাদের কত আনন্দের ছিল। কত ভক্তির। পূজোর আগের দিন কত যত্ন করে সমস্ত বই ভাল করে মলাট দিয়ে, খোরাক্ত বলম পরিষ্কার করে রাখতাম। তারপর দিন সকালে উঠে তাড়াতাড়ি স্নান করে নিতাম, কিছু না খেয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। তোর বেলা বেশ শীত, বসন্তো, মাঘ মাস তো। বাড়ীর পূজো হত বই দিয়ে, প্রতিমা এনে নয়। রামায়ন, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি সুন্দর করে সাজিয়ে তার সঙ্গে আমাদের পড়ার বইগুলো যুক্ত করে দেবীর আরাধনা করা হত। ইস্কুলে দেরী হবে বলে, বাড়ীতেই অঞ্জলি দিয়ে নিতাম। বেলার খিদে পেয়ে যায়। তাই মত তাড়াতাড়ি হয়। আজও বেশ মনে পড়ে সেই সমস্বরে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার কথা। ঠাকুর মশাই হাতে ফুল দিয়ে অঞ্জলির মন্ত্র বলছেন, আর আমরা তাঁকে অনুকরণ করে বলছি :

জয় জয় দেবি চরাচর সারে
কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে।
বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে।
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে॥

তারপর সব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। সে কথা ভাবতেও কেমন গা শির শির করে ওঠে।

কিন্তু আজকাল কি ঠিক সেই ছবি দেখতে পাও? হয়তো কোথাও আছে। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় বিপরীতটাই নজরে পড়ে। নানারকম প্রতিমা সাজানোর প্রতিযোগিতা : প্যাণ্ডেল, মাইক, ছুটোছুটি, লাফালাফি কত রকমের সব ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র, আবার কোথাও সভা করে উদ্বোধন। আড়ম্বরের অন্ত নেই। কিন্তু সত্য করে বল তো, সেদিনের সেই নিরুদ্ভব ভক্তির ছবি কি নজরে পড়ে এই পথে ঘাটে মাঠে অনেক টাকা

---

* গত সংখ্যায় 'বন্ধুবরেষু' রচনার লেখক 'শ্রীনারায়ণ বাগ' ছাপা হইয়াছে, উহা 'শ্রীনারায়ণ বাগচিকে লিখিত' হওয়ার কথা ছিল। এই মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত। — সঃ ছঃ ভাঃ।

খরচ করা পুজোর মধ্যে! এমন কি বিজ্ঞাপনেও আর সেই ছবি নজরে পড়ে না। দেবী সরস্বতীর অঙ্গনে যখন পাড়াগাঁয়ে-পরা ছেলেদের আর নানা রঙা শাড়ী-পরা ও চুলেট করা মেয়েদের মুখ দেখি, তখন হঠাৎ মনের পরদার ভেসে ওঠে সেই চাদর-গলায় দেওয়া হাত-জোড় করা কচি কচি কিশোরদের মুখগুলো আর লাল পাড় ধানসী রঙে ছোপানো কাঁসড়-পড়া সব স্নান করা পূজারিণী বেণী কিশোরীদের মুখগুলো। তারা কোথায় আজ হারিয়ে গেল। আমার এ চিঠি পড়ে তুমি হয়তো হাসবে, বলবে, বড় সেকেলে আমি; এ যুগের পরিবর্তনকে নিতে পারছি না। মন আমার বাঁধা পড়ে আছে সিছনের পানে। পরিবর্তনকে আমি মেনে নিতে পারি বন্ধু, যদি সে পরিবর্তন কল্যাণকর হয়, সুন্দর হয়। কিন্তু শুধু পরিবর্তনের জন্যই কিংবা যদি দেখি সে পরিবর্তনের দ্বারা আমরা অতিগ্রস্ত হচ্ছি তাহলে পরিবর্তনকে মেনে নিতে মন চায় না।

একটা কথা তোমায় এখনো বলা হয় নি। সেটা যদি: আমি এবার অনেকগুলো জায়গায় পুজো দেখতে গিয়েছিলাম—ছোট বড় মাঝারি সব রকম। এই সব পুজোর উদ্যোক্তাদের বয়স ৬।৭ থেকে আরম্ভ করে ৪০।৫০ পর্যন্ত। সকলেই যে বিদ্যার্থী, তাও নয়। পড়াশুনোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এমন দলের পুজোও দেখেছি। বিস্মিত হয়েছি কী বলে আলো? এদের শিল্প-চেতনা দেখে। শিল্পবলার কোন চর্চাই যারা করে না, তাদের সেই অপটু অশিক্ষিত হাত দিয়ে যে কেমন করে সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাজানো, আলপনা দেওয়া ও মনোভঙ্গী করার বৈশিষ্ট্য অর্জন করলো, এ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়—প্রশংসা না করে থাকা যায় না। বিনয়াত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যা কিছু তারা করেছে, তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাদের স্বাভাবিক শিল্প-চেতনা। এ তো অস্বীকার করতে পারি না।

অথচ আশ্চর্য এই যে, এই সব শিল্পীরাই অত্যন্ত অরুচিকর পোষাক পরিচ্ছদ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখের ফাঁকেই সিগারেট থাকছে, এবং অত্যন্ত বিরক্তিকর কতকগুলো হিন্দী গান মাইকের সাহায্যে বাজিয়ে যাচ্ছে।

এই যে অসংগতি, আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে বেদনাদায়ক। সৌন্দর্য সম্বন্ধে যারা স্বাভাবিক ভাবে সচেতন, তাদের মধ্যে 'শিবের' প্রতিষ্ঠা নেই কেন? 'সুন্দর' যদি 'শিবের' সঙ্গে যুক্ত না হয়, তাহলে যে সে সৌন্দর্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই দু'য়ের সমন্বয় কী করে ঘটানো যায়!

প্রীতি নিও।

উদ্বোধন উৎসব

বাঁকীপুর স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহ-বিদ্যালয়ের চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবসে পতাকা উত্তোলন উৎসবে পঠিত।

শ্রীকপিভূষণ বিশ্বাস,
অধ্যক্ষ সা ব্রাকোন নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

সমাগত সুধী মণ্ডলী, শিক্ষাব্রতী, পূজ্যাস্পদ গুরুজন! আজ আপনাদের আহ্বানে এই স্নাতকোত্তর মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব মঞ্চে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন সৌভাগ্যের পাহাড়তলীতে উঠেছি। উৎসাহের আলো দেখিয়ে যাঁরা সাধারণের সমতল থেকে আমাকে এখেন সম্মেলন উচ্চশিখরে উঠিয়েছেন, তাঁরাই পাহাড়তলীর ঘোর অধিবাসী। তাঁদের সৌজন্যের কাছে, অনুকম্পাস্নিগ্ধ স্নেহের কাছে স্বীকার করছি আমার প্রথম কৃতজ্ঞতা। অভিভূত হচ্ছি আমার পরমারাধ্য উত্তরসূরি আচার্যদের সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁদের অশোধ্য ঋণের কথা স্মরণ করে। আর আনন্দে বিহ্বল হচ্ছি এই রিক্ত পরিবেশের এখেন ঐশ্বর্যময় রূপান্তর দেখে। আজ তের বছর পরে, আমি যেন রিপভ্যান উইঙ্কিলের মত নেমে এসেছি সুদূর-স্মৃতির পাহাড়তলীর থেকে। বিস্মৃতির ঘুম ভাঙতেই দেখছি, আমার আপন ঘরেই আমি যেন পরদেশী, অচেনা আগন্তুক। আজ এখানকার অনেকেই আমাকে চেনে না। অথচ এখানকার মাটী নক্সা আমার জানা। এখানকার পরিবেশ, তার আলো বাতাস, গাছ পালা তৃণ মাটি, কঙ্কর কুঙ্কর আমার কর্মে ধর্মে, উল্লাসে কলরবে, ভাবে ভাবনায় বিস্তৃত, বিজড়িত ছিল। সেদিন আমরাই ছিলাম এখানকার ঔদার্য ধ্বনি। একাধারে সঙ্গীত সম্বত। আজ আমরা প্রতিধ্বনি। তাও অনন্তে নয়, একেবারে আছে। আর সে অস্তিত্বটাও ফুরো, যেন এক কোরাস গানের একটুখানি সুরো।

আজ মনে হচ্ছে যেন বিগত আর সমাগতের যোগসূত্র আজ দাঁড়িয়েছি। আমার সাধনের দিগন্তে অনাগতের পূর্বাশায় অরুণাভা। পশ্চাতে অতীতের অপসৃয়মান তটরেখা। প্রত্যুষ পুরোভাগে অনুরক্ত উদীপনার সমাবেশ। বিচিত্র জিজ্ঞাসার ঢেউ এখন ঠেলাঠেলি করছে। পরিকল্পনার বেলাভূমে না জানি কত তরঙ্গ উঠবে। ভাবীকালের বন্দরে যারা নোঙর গাড়বে, সেই জাহাজে নানা ভাবের সওদা উঠছে। অচেনা অচেনা চিনে নেবে। মহড়ার পালে লাগবে নিষ্ঠার হাওয়া। এখানকার কর্মাবর্তেই বিরচিত হ'বে শিক্ষার ইতিবৃত্ত। আমি শুনতে পাচ্ছি সেই প্রস্তুতির বিশ্বকর্মা এখানে নিরন্তর হাতুড়ি ঠুকছে। সেই তালে তালে চলবে সৃষ্টির অনুশীলন। আর দেখতে পাচ্ছি এখানে জ্বলছে জ্ঞানের হবি। শিক্ষিরা আদর্শের সমিধকাষ্ঠ আহরণ করে আনছে। বেদমন্ত্র সমুচ্চারণে পাচ্ছি আরণ্যক সভ্যতার আর্ষ ঋষিদের নিবিড় নৈকট্য। আরণির গুরুভক্তি এখানে কাজ করছে, যোগদেবের অধ্যবসায় এখানে মূর্ত হ'চ্ছে, নিউটনী জিজ্ঞাসা এখানে প্রশ্ন করছে, রঘুনাথ এখানে তর্ক করছে, একলব্য এখানে দুষ্কর যন্ত্র সিদ্ধির সাধনায় ব্রতী। এক কথায় এখানে চলেছে মানুষ গড়ার গবেষণা। আর সেই জীবন-রসায়নের আমরা গবেষক।

পথ এখানে পাথের দেয়, মতবাদ এখানে মন্ত্রণা দেয়। এখানকার জ্ঞানের এষণা দেয় জীবন-প্রস্তুতির নিশানা। এখানে কাজে মগজে সমন্বয় ঘটে। এখানকার আধারেই আকাঙ্ক্ষিত ভাবী কালের প্রাণ-পাত্র। এখানকার শিক্ষণ প্রকল্প পূর্ণ করবে দেশের সঙ্কল্প। সেই ব্রতের যাঁরা ব্রতী, তাঁরা যদি সাধনায় সচেতন হন, শিক্ষাযন্ত্রের যদি অধিক হন, তাঁদের যদি পরিচ্ছন্ন হন, তবেই সেই সমন্বয়ের অন্বিতে

সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ্ অ্যাকস্-এর কথা মনে পড়ছে। তিনি তাঁর 'দি হেড্ মাষ্টার্স লিকস্' গ্রন্থে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, যখন আমি শিক্ষার কথা ভাবি, তখন যুগপৎ সন্ত্রস্ত এবং হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ি। কিন্তু সান্ত্বনা পাই শিক্ষার বরাভয় মন্ত্রে। অভিভূত হয়ে ভাবি, কি অফুরন্ত প্রাণের যন্ত্রণাদায় আমাদের নিয়ন্ত্রণ। সেখানে উত্তেজনার বিহ্বলে, কল্পনাপ্রবণ, সামর্থ্যে উদ্বুদ্ধ যুবশক্তিকে বস্তুরূপে পাওয়ার যে সুযোগ পাই, সেই সৌভাগ্যের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না।

আর শিক্ষা আমাদের কি দেয়? পদ্ধতি থেকেই বা আমরা কি পাই? মোটে এ প্রশ্নের চমৎকার সদুত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, 'we learn nothing, but become something' আমরা কিছুই শিখিনা, আমরা একটা কিছু হই মাত্র। লেখা পড়া শিখে আমরা হই শিক্ষিত, শিল্পকলা আয়ত্ত করে হই শিল্পী, সাহিত্য অনুরাগে হই সাহিত্যিক। কিন্তু তার বিকল বাবস্থায় আমরা কেবল চাপ সহ্য করি, ছাপ পাই। কিন্তু সে কেবল একটা অভিজ্ঞান মাত্র, আসল শিক্ষা নয়। তা না হ'লে মুক্তির জীবনের ছাড় পত্র পাই কৈ?

এই দুওয়াটা কিন্তু চাওয়া মাত্রই পাওয়া যায় না। ওটা আসে স্বভাব থেকে। প্রকৃত শিক্ষা এই স্বভাবের খবরদারি করে। শিক্ষাবিদ অ্যাকস্ও এই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। বলেছেন, যেমন ধরুন একজন ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড় এক অর্থে শিল্পী। আর তার সে শৈলী-বিশিষ্টও তার নিজস্ব। কোন সঠিক পদ্ধতির ছকে কি তার সব কুমার ব্যাখ্যা করা যাবে? আমি এমন কোন স্বাভাবিক পদ্ধতির কথা ভাবতেই পারি না, যার মাধ্যমে খেলোয়াড় তার তিলতিলকার শিল্পীকে প্রকাশ করতে পারে। খেলার জন্যই পদ্ধতি, শিল্পীর জন্য তার স্বভাবসৃষ্টি। এই স্বভাবকে, এই শিল্পীকে খেলার জন্যই প্রতি পদক্ষেপে পাঠে পাঠে হাজার মন সমাপ্রয় হয়। শিক্ষার মাধ্যমেও আমরা এই শিল্পীকে, এই স্বভাবকে দেখতে চাই।

অ্যাকসের এই প্রত্যাশা চমৎ আশাবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আগামী কালের জগৎ আজ লাভ করছে আমাদের বিদ্যালয় থেকে। কেমন হ'বে সেই পৃথিবী? তা' কি অযোগতির নিম্ন গহ্বরে নেমে যাবে, না স্বর্গরাজ্যের দিকে উন্নীত হ'বে? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে শুধুক শিক্ষার উপর, আর বর্তমানের শ্রম এবং ভাবী বংশধরদের সাধনার উপর। যে ছাত্র-উপাদান নিয়ে আমরা কাজ করছি, তার উপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল। আমাদের পুত্র কন্যারাই এই প্রশ্নের উত্তর দেবে, আমি কিন্তু প্রধান শিক্ষকের আশাবাদেই বিশ্বাসী। আমি সেই ছেলে মেয়েদের বিশ্বাস করি, যারা হ'বে মহৎ আগামী কালের জনক জননী।

সেই মহৎ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই স্পেনসার শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বেঁচে থাকার প্রকৃত অর্থ কি, তিনি তার একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছেন। বলেছেন, for complete living we must know in what way to treat our body, in what way to treat our mind, in what way to manage our affairs, in what way to utilize those sources of happiness that nature supplies—how to use all our faculties to the greatest advantage of ourselves and others। স্পেনসারের এ কথায় অতিরিক্তের স্বপ্ন দেখার কিছুনি নেই, আছে বর্তমানের সজাগ কর্ম-কৃতি।

এই উদ্বোধন প্রসঙ্গে মনে পড়ছে উপনিষদের একটি গল্প। সমাবর্তনের কাহিনী। স্নান মুখে দাঁড়িয়ে আছে ব্রাহ্মণ কুমার। সমাবর্তনের অভিজ্ঞান পত্র বিলি হয়ে গেল। কেবল তার ভাগ্যে অভিজ্ঞান পত্র মিলল না। তিন বছর আগে তার শিক্ষানবিশী কাল শেষ হয়েছে। অথচ কি অন্যায় অবিচার, তার সমাবর্তন হয় না কেন? অভিমান করে ব্রাহ্মণকুমার আশ্রম ত্যাগ করল। ঠিক করল জনপদে ফিরে গিয়েই পুথী হ'বে।

জনপদে গিয়ে সে কন্যার পাণি-প্রার্থী হল। গৃহস্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার সমাবর্তন হয়েছে? কৈ অভিজ্ঞান পত্র দেখি? সমাবর্তন হয়নি শুনে গৃহস্বামী মুখভার করলেন। জনপদের আর কেউ তাকে কন্যাদান করল না। সে তখন অনন্যোপায় হ'য়ে ফিরে গেল ঋষির আশ্রমে। তখন ঋষিকন্যা গোদোহন করছিলেন। তাঁকে গিয়ে ব্রাহ্মণ কুমার জিজ্ঞাসা করল, আমার সমাবর্তন হয় না কেন বলতে পারো? ঋষি-কন্যা জবাব দিলেন, তুমি গুরু-কুল শোধ করোনি, পরিবেশকে ভালোবাসোনি; এ আশ্রমে তোমার অবদানের কোন চিহ্ন নেই। তাই বোধ হয় তোমার সমাবর্তন হ'চ্ছে না। কি করে গুরু-কুল শোধ করবো? ব্রাহ্মণ কুমার জিজ্ঞাসা করল। ঋষি-কন্যা বললেন, প্রথমেই ক্রোধ ত্যাগ কর, শ্রদ্ধাশীল হও, অহঙ্কার ত্যাগ কর, নিরক্ষরকে শিক্ষা দাও, বিনয় বিনম্র বচনে সবার সেবা কর। ব্রাহ্মণ-কুমার তাই করল। আশ্রম-কৃত্যের শিক্ষার ভার গ্রহণ করল। নিজেকে ঢেলে সাজাল, তার পর সমাবর্তন উৎসবে প্রথমে অভিজ্ঞান পত্র পেল সেই ব্রাহ্মণ-কুমার। তার প্রকৃত শিক্ষা হল।

আজ সেই সালতামামির দিন। আত্ম-বিশ্লেষণ করতে বসে বিবর্তনবাদের কথা মনে পড়ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ইতিহাসের নিঃশব্দ-পদসঞ্চার। বিবর্তনের আবর্তনে সভ্যতা শিক্ষা সংস্কৃতির যে রূপান্তর ঘটেছে, সেই নব নব উন্মেষধারার উদ্বেল পরিণতি আমাদের ধমনীতে। আমাদের ভাবনায় কত বিচিত্র ঐতিহ্যের কত স্রোত প্রবহমান। কত মনীষার জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় আমরা অবগাহন করেছি। হারার যুগের অন্তর্ধানের আমরা দোলক—অতীত অনাগতের মধ্যে সংশয়ে দুলছি। কখনও সম্ভাবনার দিকে এগুচ্ছি। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি —নিশ্চ প। মেটো-ন্যাচিসটটল-মনু-বেদব্যাস-বাগীকি-শিলভদ্র-দীপঙ্কর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের আমরা সবল উত্তর সাধক। আমরা পরিণতির উদ্গতি। মানব সভ্যতার বর্তমান প্রতিনিধি। কবির ভাষায়—

আমরা এখন মূর্ছনা নীড় সমবে,
জানিনা কখন কোন সুরে প্রাণ চমকে!
তোমারা বিকচ তরুণ স্বপ্ন অঙ্কুরে,—
তাকে যে বিশের আহ্বান যেন সুদূরে।
ঐতিহ্যের রক্ত বহে যে স্রোতে,—
আমরা এখন এক সতি গতিতে।
অনেক কালের বেদনা দুঃখে রচিত,—
আমরা হারার উন্মেষ করে ক্ষচিত।

পরিশেষে উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করে বলি, 'অপাবৃণু'। আবরণ উন্মোচিত হোক। অপগত হোক চিত্তের তমসা, অপসৃত হোক মোহের আবরণ, বিদীর্ণ হোক জীর্ণ-জরা-সংস্কার, উদ্ভিন্ন হোক যৌবন শক্তি, উৎসারিত হোক সাধনার স্রোত; উদ্ভাসিত হোক দেহ-মন, বিকীর্ণ হোক জ্ঞানের জ্যোতিঃ, প্রজ্ঞার আলো। উঠ, জাগো, এস অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করি। অমৃতের পুত্র আমরা। আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সেই পরমাশ্চর্য অদ্ভুত সত্যবাণী: যাতে অমৃত নেই, তা নিয়ে আমি কি করবো। এই আপ্ত বাক্য বলে আমার ভাষণ শেষ করি। তার আগে বলি, আপনাদের প্রত্যাশা মেটাতে পারিনি, বহু মনোজ্ঞিই শিক্ষা-তত্ত্ব-সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞিই নূতন বাণী শোনাতে পারিনি, সেজন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর যারা শ্রবণ সহিষ্ণুতার ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে, আমার পূজ্যপাদ আচার্যদের প্রণাম জানিয়ে, বিদ্যার্থীদের শুভ প্রার্থনা করে, প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আমার ভাষণ শেষ করি। ওঁ শান্তি।

সাময়িকী

দোল পূর্ণিমা—'চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়',—যে মূর্তির রূপ ও স্বরূপ প্রকাশ করিতে বাংলার দার্শনিক-কবিগণ একদিন ঐ রকম সহস্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াও একদিন কিনারা পান নাই, মানুষের মন-প্রাণহরণকারী তত্ত্বমূর্তি সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্তিথি ফাল্গুনের এই দোলপূর্ণিমার দিনটিকে সহস্র সহস্র ভারতবাসী আজ সাড়ে চারি শত বৎসর হইয়া গেল স্মরণ করিয়া আসিতেছে। একজন মানুষ—রাজা নন মহারাজা নন—কী অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইতে পারেন, শক্তিমানের যে শক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিচিত তেমন কোনও শক্তি প্রয়োগ না করিয়াও একজন মানুষ কেমন করিয়া সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া চির দিনের মত স্থান করিয়া লইতে পারেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন তাহারই একখানি জলন্ত দৃষ্টান্ত। সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয় তিনি কাড়িয়া লইয়া ছিলেন, শত শত বই তাঁহার জীবন ও তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করিতে লিখিত হইয়াছে, লক্ষাধিক সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, আজও সে জীবনখানি মানুষের নিকট ফুরাইয়া যায় নাই, আজও তাহা মানুষকে আহ্বান করিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষের অবতারতত্ত্ব।

দোলপূর্ণিমা দিনে আবির্ভূত এই মানুষটী কি বলিতে আসিয়াছিলেন, কি বলিয়া গেলেন?

মানুষের সাধনার বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে—তত্ত্ব জ্ঞান-সাধনার কচ্‌কচিতে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যখন আচারপ্রধান হইয়া পড়িল—তখনই অনিন্দ্য-সুন্দর এই মানুষটী আসিয়া সব খোল ঘাঁটাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ভালবাস,—মানুষকে ভালবাস, ভগবানকেও ভালবাস। ভগবানকে যে ভালবাসা যায়, তাঁহার জন্য যে একজন মানুষ পাগলের মত কাঁদিতে পারেন, ধূলিয় ধাওয়া এ কথাটি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিয়া সেদিনের মানুষ নূতন করিয়া শিখিল, কৃষ্ণকে সেদিন পর্যন্ত মানুষ যেরকম যতটুকু জানিত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে সেই কৃষ্ণকে নূতন করিয়া জানিল, নূতন করিয়া জানিল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম-তত্ত্ব। মহাপ্রভুকে দেখিয়া ভগবানকে যেমন নূতন করিয়া জানিল, তেমনি মানুষে মানুষেও নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল—তাইতো আচণ্ডালে হরিনামের অধিকারী হইল, তুলসী গাছ সকলের গৃহে স্থান পাইল। মহাপ্রভুকে দেখিয়া মানুষ বিস্ময় মানিল—অত বড় পাণ্ডিত্যের সাথে এত প্রেমের জন্ম সম্ভব কি করিয়া? এমন অনিন্দ্য একখানি চরিত্র যাহার, তিনি কৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যে কি তত্ত্ব আস্বাদন করেন? আমাদের দেশের একজন মহান্ ব্যক্তি বলিয়া ছিলেন, কৃষ্ণকে বুঝি না—কিন্তু যখন দেখি মহাপ্রভুর মত একখানি বিশুদ্ধ জীবন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছেন, তখন আর আমার বলিবার কিছু থাকে না। মহাপ্রভু বাংলা দেশকে কেবল ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেই অনেক কিছু দিয়া যান নাই, বাংলা দেশের সমস্ত চিন্তারই তিনি একটা স্তর বদলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের যে, মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনকে সমগ্র সমাজ-জীবনে গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে ধর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। হরিনামকে ধর্মের জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহাপ্রভু তাহাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করিয়া সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া ছিলেন; কাজীর অন্যায় নির্দেশের প্রতিবাদ করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; সঙ্ঘবদ্ধ হরিনাম সংকীর্তন করিয়া দেখাইলেন ধার্মিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবে, সে অন্যায় যেখান হইতেই হউক না কেন; মনে মনে কোণে নীরবে ভগবানকে ধ্যান করিতে অভ্যস্ত ভারত-বাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ হরিনাম শিখাইলেন খোলকরতালের ধ্বনিসহযোগে; জাতি ভেদ করিয়া স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার সর্বাপেক্ষা প্রকাশ ছিল খাদ্য লইয়া—খাওয়ার ছোঁয়াছুঁয়ির চূড়ান্ত নিয়ম রক্ষা করিয়া ভারতবাসী মনে করিয়াছে সে আত্মাকে রক্ষা করিল, পারলৌকিক সদ্গতির ব্যবস্থা করিল—মহাপ্রভু সেই খাওয়ার মধ্যেই বিপ্লব আনিলেন—

মহোৎসবে সকলে মিলিয়া একত্র খাইলেন; ভগবানের নাম লইবার সকলের অধিকার ছিল না, তিনি বলিলেন ভগবানকে সকলেই ভালবাসিতে পারে, ভালবাসিয়াই ভগবান লাভের অধিকারী হইতে পারে!

ইহা ছাড়া মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যের প্লাবন আসিয়াছিল, সে প্লাবন বাঙ্গলা তথা বিশ্বের সাহিত্যে একটী চিরন্তন স্থান করিয়া লইয়াছে।

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু একটী বিস্ময়কর জীবন ও ব্যক্তিত্ব লইয়া এই ষোল পুণিমা দিনে বাংলার মাটিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষকে ভালবাসিয়াছিলেন, আর মানুষ তাঁহাকে মানুষ বলিয়া শুধু ভাল বাসে নাই, ভগবান বলিয়াও ভালবাসিয়াছিল। মানুষের মধ্যে এই ভগবদ্ প্রকাশের অনির্বচনীয় মহিমা ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালী আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছে—সে আস্বাদন-কাহিনী আজ পর্যন্ত ফুরাইয়া যায় নাই, কোন দিন ফুরাইবে না। একদল মানুষ চিরদিন এই বিস্ময়কর আবির্ভাবের সামনে বিমূঢ় চিত্তে তাকাইয়া ধন্য মনে করিবে, আর একদল অবিশ্বাসে মুখ ফিরাইয়া লইবে, আর একদল কিছু না বুঝিয়াও আনন্দ লাভ করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মহান্ অপূর্ব আবির্ভাবের সামনে মুগ্ধ আমরা নির্বাক শ্রদ্ধায় নিজেদের বার বার নোয়াইয়া দিতেছি, তিনি আমাদেরও মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠুন। "হে পরম, অনাবৃত-প্রকাশ, বিকল্পরহিত অতএব আনন্দমাত্র, তোমার যে 'স্বরূপ', তোমার এই 'রূপ' হইতে তাহা পর নহে, ভিন্ন নহে বলিয়া দেখিতেছি, উপলব্ধি করিতেছি, এই কারণে তোমার বর্তমান এই রূপেরই উপাসিত হইতেছি। তোমার এই 'রূপ' উপাসনার পক্ষে যোগ্য, কেননা এই রূপ উপাসনামূলের মধ্যে এবং অর্থাৎ মুখ্য। হে আত্মন্, এই 'রূপ' অবিশ্ব হইয়াও বিশ্বস্রষ্টা। তুমি বিশ্বস্রষ্টা হইয়াও বিশ্বাতীত। আরও বিশেষ কথা এই যে তোমার এই 'রূপ' কৃত ও ইন্দ্রিয়সমূহের 'আত্মা'"।

নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ সংবাদ ঃ বিগত ১৯৫৭ হইতে নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ বরফামহিলা শিক্ষা-কেন্দ্র, মহিলা শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র (১৯৬১ হইতে লেডী ব্র্যাবোর্ণ ডিগ্রোমা সহ) এবং নরনারায়ণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার (ফ্রান্স লাইব্রেরী) এই তিন উপায়ে সমাজ সেবামূলক কাজ চালাইয়া যাইতেছিল। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ হইতে সঙ্ঘ একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আরম্ভ করিয়াছে। নিম্ন বুনিয়াদীতে ১ম শ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত রহিয়াছে। সরস্বতী পূজার শুভ দিনটীতে নরনারায়ণ আশ্রম প্রাঙ্গনে স্থানীয় বহু লোকের এবং কলিকাতা হইতে আগত আশ্রমের অনেক বন্ধু-জনের আশীর্বাদ লইয়া আশ্রম-দেবতা শ্রীনিতাগোপালের নাম স্মরণ করিয়া বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় —ডেপুটী চীফ ইনসপেকটার, বেসিক এডুকেশন, সভাপতি এবং প্রসিদ্ধ সমাজ সেবক ডাক্তার শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথি ছিলেন। স্থানীয় বিদ্যুবিদ্যা-পীঠের সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি আরও অনেকে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। প্রদ্ধেয় সুধীরবাবু তাঁহার ভাষণান্তে তাঁহার স্বভাব সুলভ প্রাণপূর্ণ আচরণ দ্বারা উপস্থিত শিশু-দিগকে বেতারে গান গাওয়াইয়াছিলেন, তাহা সকলেরই বিশেষ আনন্দের ও উৎসাহের কারণ হইয়াছে। আমরা নিম্ন বুনিয়াদী ইস্কুলটীর জন্য সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

প্রতি বৎসরের এবারেও সরস্বতী পূজার দিন যথাবিধি সরস্বতী পূজা, অঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। শিল্প-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমীনাক্ষী দাসের স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমা সকলকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছে। নিম্ন বুনিয়াদীর ছাত্র-ছাত্রীরাও পূজা-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। এ ছাড়া প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও লেখাই ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইয়াছিল এবং পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীযুত জিষ্ণু কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

UJJWAL BHARAT

FORM IV

(See Rule 8)

	Place of Publication	Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
	Perio licity of its publication	Monthly.
3.	Printer's Name Nationality Address	RENU MITRA M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiali P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
4.	Publisher's Name Nationality Address	RENU MITRA M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
5.	Editor's Name Nationality Address	RENU MITRA M. A. Indian. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	RENU MITRA M. A. Naranarayan Ashram Vill. Baguiati P. O. Ashwininagar, 24 Parganas, West Bengal.

I, RENU MITRA, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 19th February, 1962.

Sd. RENU MITRA,
Signature of the Publisher.

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

চৈত্র ১৮৮৩, ১৩৬৮ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম. এ পঞ্চদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র-ধর্ম্মের ভেদের ছাটনে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটি স্বয়ংমূল্য আস্বাদন—ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম-আস্বাদন করায় জীবনের অতিগ (transcendental) দিক, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (immanent) দিক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুইই। তাইতো তিনি জীবন-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম্ম বা একান্ত রাষ্ট্র অচল। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ' (ভোজপতি কংসের মৃত্যু) বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্ম্মপতিরূপে 'তত্ত্বং পরং যোগিনাম্' (যোগিগণের পরতত্ত্ব-কৈবল্য)।

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ	৫·০০	ছাত্রদের কর্মবাণী	১·২৫
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	Sould of India Speaks	৫·০০

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাংলার কবি	
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	রাজর্ষি রামমোহন	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	আচার্য জগদীশ	
বাংলার বিদুষী	১·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
বাংলার মনীষী	১·২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	
[illegible] গড়া	·৭৫	রবীন্দ্রনাথ	

শ্রীসীলিমা ঘোষ এম. এ, বিটি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০	বঙ্কিমের গল্প	১·১৭

ব্যবহারিক শব্দকোষ—সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

সূচীপত্র : চৈত্র ১৩৬৮, ১৮৮৩

১। বেদান্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

২। খেয়াঘাটে (কবিতা) ৬৩
শ্রীঅনিল কুমার সমাজদার

৩। প্রার্থনাকালীন ভাবণ (৮)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯০০)
(১৪)

৫। গোবিন্দ সিংহের ইসলাম-নিষ্ঠীকা
শ্রীযতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়

৬। বিভোৎসাহী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ

৭। বন্ধুবরেষু : স্বগত

৮। সাময়িকী : সমনীকান্ত দাস
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না,
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

নিয়মিত কুমারেশ সেবনে লিভার সুস্থ ও সবল থাকে—দেহের রোগ প্রতিরোধের শক্তি বাড়ে, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না। ঝিটখিটে মেজাজ, কাজে উৎসাহের অভাব, সহজে ক্লান্ত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না—

কুমারেশ

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যাণ্ড
কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ
কুমারেশ হাউস, শালকিয়া : হাওড়া

উদ্বোধন

চৈত্র, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

বেদান্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গ

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবঃ চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমাই বাঙ্গালার জন্মতিথি গাইবার তিথি। বৃন্দাবনের যৌবনঘন তরল-আবির-রাগরঞ্জিত দোল-লীলা-আবর্তের মাঝে রসিক-ভাবুক বাঙ্গালা সত্য বাংলা নিজেকে পেয়েছে, বিশ্বকে চিনেছে ও তাদের মিলন-সৌখ্য সকল দেহপ্রাণে অনুভব করেছে; সে আজ তাই জগতের ইন্দ্র, বরণ-দেবতা অন্নদা। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি-ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'—এই উপনিষদ্ মন্ত্রকে কার্য্যকরী মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তুলে যে বাঙ্গালা ঘরের সন্ধ্যারতিতে, বাইরের রাজপথের খোল-করতালসহ উচ্চ নাম কীর্ত্তনে, মুমূর্ষুর শিয়রে মহাযাত্রার প্রাক্কালে 'হরে রাম' 'হরে রাম' ধ্বনিতে ও শ্মশান-যাত্রায় 'হরিবোল' 'হরিবোল' রবের উচ্চ কীর্ত্তনে, ধনীনির্ধন, কুলীন-অকুলীন, পণ্ডিত মূর্খ, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ সম্মিলিত মহা মহোৎসবে আজও আস্বাদন কচ্ছেন; 'রসো বৈ সঃ' মন্ত্রের উজ্জ্বল কার্য্যকরী আস্বাদন যে বাঙ্গালার তরলতা, দর্শন-সাহিত্য, কাব্য-অলঙ্কার-ইতিহাস তার বুকের ভিতর অনুভব কচ্ছে, সে বাঙ্গালাকে যে বিশ্বের বুকে বিশ্বরাজ মূর্ত্তিতে দাঁড়াতে হবে, তাতে আর বিচিত্রতা কি? কেনোপনিষদের ইন্দ্র সকলের পূর্বে ব্রহ্মকে চিনেছিলেন, তাই সে দেব ইন্দ্র; বাঙ্গালাও বর্ত্তমান যুগের সকল জটিল কুটিল সমস্যার সহজ সরল সনাতন সমাধান অন্তরে অন্তরে টের পেয়ে তাকেই দেহ মনে ও প্রাণে মূর্ত্ত করে দেখেছে, তাইত সেও জগৎ-আধার, জগৎগুরু। রাগ সাধনার যে উজ্জ্বল পথ বাঙ্গালাদেশের 'ধূলিরেণু'-বুকে হাসি-খেলা, নাচ-গান, কেঁদে গড়াগড়ি দেওয়ার ভিতর দিয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে, উজ্জ্বল রসসাধনার যে মূর্ত্তিমতী নয়ন-ধাঁধা মহা মানবের অন্তরাত্মাকে বিধি-মার্গের শুকনো, ভেদবুদ্ধিদগ্ধ কামগন্ধ হতে উদ্ধার ক'রে অনুরাগের শীতল হাওয়ায় কণ্টকিত কচ্ছে, যে উজ্জ্বল সাধনা দুনিয়ার সকল ছোট, সকল হেয়, সকল উপেক্ষিতকে বুক-কোল দিয়ে বিশ্ব-মেলায় তাদের স্ব স্ব স্থানে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ হবার লালসা জাগিয়ে তুলেছে, যে রসরাজ মূরতি অন্তরের ঐক্য, অন্তরের সন্ন্যাস-গৌরাঙ্গকে অন্তরেই আবৃত দেখে বাইরে মহা-ভাবোজ্জ্বল নৃত্যগীতকলাচাতুর্য্যময়ী প্রকৃতির ভাববিলাসকে অনন্ত ধারায় প্রকট কচ্ছেন, তিনিই পৌর্ণমাসীর হৃদয়-নিংড়ান ধন, বিশ্বের 'পূর্ণমিক চাঁদ,' সকল রোদনের কৌস্তুভ মণি, বাঙ্গালার সহজ মানুষ শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌর-স্পর্শে বাঙ্গালা আজ 'সোনার বাঙ্গালা'। গৌর আসার পূর্বে বাঙ্গালার গরব করবার মত

কিছু ছিল কি? সে যে ছিল 'পতিত'। পতিত বাঙ্গালাকে 'পাখণ্ড'-মুক্তিতে কে জগতের সামনে উঁচু করে তুললে? সে যে আমার গৌর সো, সে যে আমার গৌর। এমন গৌর কার আছে, বলতে পার কি? তার পাদস্পর্শে বাঙ্গালার মলিনতা উজ্জ্বলতায় ফুটে উঠল, জান কি? যার প্রসাদে বাঙ্গালা আজ বিশিষ্ট কিছু, তাঁর খোঁজ না করলে যে বাঙ্গালাকে আত্মঘাতী হতে হবে। বাঙ্গালার সকল শক্তি, সকল সিদ্ধি, সকল মুক্তি শ্রীগৌর। বাঙ্গালার কর্ম-সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম, কাব্য-অলঙ্কার, মীমাংসা-ন্যায়, গান-বাদ্য, নাটক-অভিনয়, পদ্য-গদ্য, খোল-করতাল, নয়নের বারি ও হৃদয়ের কমনীয়তা এক কথায় বাঙ্গালীর 'বাঙ্গালী হওয়া'-টাই শ্রীগৌরাঙ্গের দান। বাঙ্গালার স্বরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ। বাঙ্গালা শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীগৌরাঙ্গদেবই বাঙ্গালা। নৃসিংহ-ধারা, রাম-ধারা, কৃষ্ণ-ধারা ভারতের সকল নগর-প্রান্তর প্রেমপ্লাবনে ভাসিয়ে বাঙ্গালায় গৌর-ধারামূর্তিতে ঘনীভূত। সোনার গৌরস্পর্শে বাঙ্গালার আজ সব সোনা।

সোনার বাঙ্গালা আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥

কৃষ্ণাবনের বাঁশী যে আজ বাঙ্গলার আকাশে-বাতাসে বেজে উঠছে, এ কার সাধনা? গৌরাঙ্গসুন্দর ব্রজের বাঁশীকে বাঙ্গলার প্রতি অণু-পরমাণুতে সঞ্চারিত করে গিয়েছেন, ব্রজের বাঁশী এবার বাঙ্গলার হাতে, কৃষ্ণাবন আজ বাঙ্গালায়। কৃষ্ণের বাঁশরী বাঙ্গালায় কেবল ভাব-প্রবণতাই আনেনি, বাঙ্গলায় শৌর্য্য, বীর্য্য, বিপ্লবের সাহস—সবই ঐ বাঁশরী প্রদান করেছে। শ্রীগৌর সব সম্প্রদায়ের, কারও একচেটে সম্পত্তি নয়।

গৃহে, পরিষদে, সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, ধর্মনীতিতে চলছে যে শোষণের তাণ্ডব লীলা, শ্রীগৌরাঙ্গ সেখানে মূর্তিমান হন। শ্রীগৌর-প্রেমে প্রকৃতি আজ সৌম্য হতেও সৌম্য; মোহিনী ভীষণা প্রকৃতি সেখানে উমা, হৈমবতী, মেনকাদুলালী বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে। মহাপ্রভুকে বাদ দিয়ে বাঙ্গালার প্রাণের খোঁজ মিলবে না, মহাপ্রভুই আমার রাষ্ট্র-গুরু, ধর্ম-গুরু সমাজ-গুরু। Logic ও History মিলে মিশে একটী তত্ত্বের আবিষ্কার না করলে বিশ্ব-কল্যাণ হতেই পারে না। বাঙ্গালার যুক্তি-শাস্ত্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস যুগল হয়ে শ্রীগৌরকে প্রতিপন্ন করছে, বাঙ্গালার মাপকাঠি তাই শ্রীগৌর। মহাপ্রভুকে সরিয়ে রেখে যা কিছু গড়তে যা'বে, তা ত বাঙ্গালার নিজস্ব হবে না। বাঙ্গালার রক্তস্রোতে যে রোল-লীলা-মাদকের আবির-রঙ্গিন প্রেম-ধারা নিত্য বহমান। জগতের বুকে যত রকমের শাসন খেলছে, সকলের গোড়ায় যে মহাপ্রভু, তা বুঝতে কিছুই অসুবিধা হয় না। যে অহিংস স্বরাজের বীজ তিনি ঘনশ্যাম ও মহাভাব পরিপূরিত বাঙ্গালার মাটিতে পুতে রেখে ছিলেন, যে বীজকে বৈষ্ণব-ভক্ত-কবি-দার্শনিক সাহিত্যিকগণ নয়নাসারে অঙ্কুরিত করে রেখে গিয়েছেন, কালক্রমে আজ তা কৃষ্ণাকারে পত্রপুষ্পশোভিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে মধুগন্ধ, মধু-আস্বাদন, শীতলস্পর্শী নিত্য স্বরাজের জন্য আকর্ষণ করছেন। ঐ যে পাশ্চাত্যের সার্বজাতিক নিরস্ত্রীকরণ আইনের প্রস্তাব—ওর ভিতর দিয়েই কি অহিংস স্বরাজের আগমন সূচিত হচ্ছে না? "সর্বধর্মময় প্রভু যাতে সর্বধর্ম"—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। পরিবার-ধর্ম, সমাজ-ধর্ম, জাতীয়-ধর্মকে সার্বভৌমক্ষেত্রে মধুর রসাল করে সর্বসাধারণের আস্বাদন-যোগ্য সাধন-পন্থা যেন করেছেন এই বাঙ্গালার ঘরের ঠাকুর। ঘরের ঠাকুরকে অবহেলা করে যতই আমরা স্বরাজের জন্য বাইরে বাইরে ঘুরছি, ততই আমরা আত্মহারা হচ্ছি। প্রাণগৌর, এই দুর্দিনে, অন্ধকার-তমসাচ্ছন্ন নির্জন নির্জন মরুভূমিতে একা একমাত্র তোমার কৃপার ভরসায় আজও দাঁড়িয়ে আছি, "রাখ রাখব, না রাখ মরব"—এই ত জীবনে সত্য বলে বুঝেছি। মানুষের মুখের দিকে তাকাবার শেষ আকাঙ্ক্ষাটুকু কেড়ে নিয়ে, মানুষের সঙ্গে প্রাণের সকল পরদা খুলে কোলা-কুলি গলাগলি করতে যাও। মহাপ্রভুর কাছ থেকে বাঙ্গালী এমন কোন্ বর পেয়েছে, যা সে সমগ্র বিশ্বকে উপহার দেবার সাহস রাখে, এইবার আমরা তার আবাহন করবার প্রয়াসী হব।

ত্রিভঙ্গ মদনমোহন তথাই বিশ্বের ঘরবাবে মহাপ্রভুর দান।

শ্রীমান্ নারদ ভক্তিসূত্রে লিখেছেন—"ত্রিরূপভঙ্গ পূর্ব্বকং নিত্যদাস-নিত্যকান্তাত্মকং প্রেম এব কার্য্যং প্রেম এব কার্য্যম্"। ত্রিরূপকে ভেঙ্গে নিত্যদাস, নিত্যকান্ত ভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীভগবানে প্রেম করতে হবে। তিনের কাঠিন্য (Rigidity) ভেঙ্গে, তিনকে গলিয়ে জীবন্ত এক পঙ্কে তোলাই ত্রিভঙ্গতত্ত্ব। তিনটী সোনার পুতুলকে গলিয়ে যে একটী মূর্ত্তি, তাইত ত্রিভঙ্গ। ত্রিভঙ্গই মদন-মোহন। "তিনি" বলতে শাস্ত্র বোঝেন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কিম্বা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কিম্বা কার্য্য, করণ ও কর্ত্তৃত্ব কিম্বা তৎ, ত্বম্ ও অসি। মদনের খেলা সুরু হয় তখনই যখন কঠিন সত্ত্ব, কঠিন রজঃ ও কঠিন তমঃ নিজের সামঞ্জস্য হারিয়ে পরস্পরকে বাধা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, যখন জ্ঞাতা নিজের ক্ষেত্র থেকে এক বিন্দুও না সরে নিজের কঠিন মাপকাঠিতে জ্ঞেয় বস্তুকে বোল আনা মাপতে চায়, যখন জ্ঞাতা ভুলে যায় যে সে শুধু জানবার মালিকই নয়, তাকে জানবার প্রয়োজনও দুনিয়ার মানুষের থাকতে পারে এবং সে জ্ঞানের পুঞ্জীকৃত আধারও বটে; যখন কর্ত্তা তার নিছক কর্ত্তৃত্ব নিয়ে কার্য্য ও করণকে কেবল আত্মতৃপ্তির জন্যই ব্যবহার করে, যখন কর্ত্তার প্রয়োজন পূরণ ছাড়া করণ বা কার্য্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা না থাকে, যখন ঈশ্বরের দল অনীশ্বরদের স্থানচ্যুত করিয়ে ঐশ্বর্য্যের মাপকাঠিতে মেপে তাদের অপমানই করে। সহজ মানুষ জ্ঞাতাও বটেন, জ্ঞানও বটেন, জ্ঞেয়ও বটেন; পূর্ণ মানব যে একাধারে কর্ত্তা, করণ ও কার্য্য; আদর্শ মানব তৎ, ত্বম্ ও অসির সমান অধিকারের দৃষ্টান্ত স্থল; নিত্যসুন্দর মানুষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমন্বয়। সহজ মানুষ "তৃণাদপি সুনীচ" হয়ে ব্রাহ্মণ, "তরোরপি সহিষ্ণু" হয়ে ক্ষত্রিয়, "অমানী" হয়ে বৈশ্য, "মানদ" হয়ে শূদ্র; সে যে নিত্য ব্রাহ্মণ, নিত্য ক্ষত্রিয়, নিত্য বৈশ্য, নিত্য শূদ্র। কেবল ব্রাহ্মণ, বা কেবল ক্ষত্রিয় বা কেবল বৈশ্য বা কেবল শূদ্র হলে ত পূর্ণ মানবের চলে না, তাকে যে সব হতে হবে। এই ত্রিভঙ্গ মদনমোহনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত জগতে আস্বাদন করতে ও করাতে এলেন অদ্বীয় শ্রীগৌর। তাঁর ভক্তকবিগণ তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য অতি সুন্দর করে বর্ণন করে গিয়েছেন—শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো ইত্যাদি।

শ্রীগৌরচন্দ্র তিনটি বাঞ্ছা নিয়ে শচীগর্ভসিন্ধুতে অবতীর্ণ হলেন।

তাঁর প্রথম বাঞ্ছা :—

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'।
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ।
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
মনে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

দ্বিতীয় বাঞ্ছা :—

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

তৃতীয় বাঞ্ছা :—

হেন আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে।

ভক্তের মহিমা, ভগবানের মহিমা ও ভক্তির মহিমা গলিয়ে এক করলে আমরা বাঙ্গালী গৌরকে সহজেই হৃদয়ে ধারণ করতে পারব। এই ত্রিভঙ্গরূপ আমরণ ধারণ করে গিয়েই না শ্যামসুন্দর রাধাভাব গায়ে মেখে ধরায় এসেছিলেন?

এই তিন বাঞ্ছা মোর নহিল পূরণ।
ত্রিজাতীয় ভাবে তাহা নহে আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
এই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥

রাধাভাব অঙ্গীকরি, ধরি তাঁর বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥

মহা গম্ভীর বেদান্ত শাস্ত্র এই রাধাভাব-অঙ্গীকারের সাধনা সূত্রকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

শ্রীগৌর লীলা ও ব্রহ্মের প্রকৃতি ভাব
ব্রহ্ম প্রকৃতি হলেন। কেন?
প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ॥
বেদান্তসূত্র ১।৪.২৩

২। অভিধ্যোপদেশাচ্চ॥ বেঃ সূঃ ১।৪।২৪

৩। সাক্ষাচ্চোভয়ান্নানাৎ—বেঃ সূঃ ১।৪.২৫

"ব্রহ্ম 'প্রতিজ্ঞা' ও 'দৃষ্টান্তে'র আবরণ দূর করতে প্রকৃতি হলেন"। ব্রহ্ম প্রকৃতি না হলে কি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্ভব হত? কিম্বা প্রতিজ্ঞা পূরণ ও দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য প্রকৃতি না হলে কি ব্রহ্ম ব্রহ্মই হতেন? তাঁর যুগে যুগে প্রতিজ্ঞা 'প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'—জীব যেদিন নিজকে ভগবৎ-প্রিয় বলে মেনে নেবে, সেদিনই হবে ব্রহ্মের প্রতিজ্ঞাপূরণ। জীব-প্রতিষ্ঠাতেই ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা। 'নহ্যকৃতাত্মোপলব্ধিরিতি চেৎ অধ্যাত্ম-সম্বন্ধভূমা হি অস্মিন্'—পূর্বোক্ত যখন 'আমি' 'আমি' বলেন, সেই আমিতে কাঁচা 'আমি'র নামগন্ধও নেই, ঐ 'আমি'র ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে ভূমা ব্রহ্মের ঘন প্রেম-সম্বন্ধ, ঐ 'আমি' ব্রহ্মেরই 'আমি'। ঈশা বলেছিলেন 'প্রাণোঽস্মি প্রজাত্মা তং মামায়ুরমৃত মিত্যুপাস্ব'—বাঙ্গালা ভেসকে আজ গৌরবময় হয়ে জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করতে হবে আমি প্রজাত্মা, আমি প্রাণ, আমি জগতের আয়ু; ওগো বিশ্বের মরণশীল জাতিসমূহ, অমৃত আমাকে ভজনা কর। আমি নরের ভিতর দিয়ে যে আমি প্রতিষ্ঠা, তাহাই ব্রহ্মের প্রতিজ্ঞা। 'ব্রহ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠা অহম্'—নিত্য, অব্যয়, অচ্যুত 'আমি'তে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ হয় না; প্রকৃতির 'আমি' যেদিন ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ বিশ্রামে, তখনই পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান। 'আমি'র গৌরব ভুলে গিয়ে ভারত আজ পরাধীন; পরাধীন প্রতিষ্ঠার প্রাভাবে তাই ও চাই 'আমি'র প্রতিষ্ঠা।

ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন —এই পাঁচটি স্তরে অনুমান সাহায্যে বস্তু-তত্ত্ব নির্ণয় করতে হয়। দৃষ্টান্ত ব্যতীত প্রতিষ্ঠার কোন মূল্যই নেই। আর্য্য শাস্ত্রের এই দৃষ্টান্ত-মহিমা আচার্য্য শীল তাঁহার Positive Sciences of the Hindus নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি বলতে চান, দৃষ্টান্ত দ্বারা আর্য্যচিন্তাধারায় Mill-এর Inductive logic ও Aristotle-এর Formal logic-এর সমন্বয় হয়ে আছে। অন্বয় ও ব্যতিরেক, theory ও practice, analysis ও synthesis একমাত্র দৃষ্টান্তে আলিঙ্গনাবদ্ধ।

রাধাপ্রেম তৈত্তে সদা বিরুদ্ধধর্মময়—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। কেবল শুষ্ক বুদ্ধিতে যা দুই, জীবনে তা দুই হয়েও এক। দৃষ্টান্ত যেন দুইটি বিরুদ্ধমান তত্ত্বের মধ্যে Argumentum ad Baculum। আমি কেমন করে মরণ-সাধনা অঙ্গীকার করেই বাঁচতে সক্ষম, এ ত দৃষ্টান্ত ছাড়া শুধু ন্যায়ের কচকচিতে বোঝা যায় না। জীবনে অহম্-লয় ও অহম্-প্রতিষ্ঠা একই জীবন্ত সত্যের এদিক ও ওদিক।

'অভিধ্যোপদেশাচ্চ'—এই মহাসূত্রে ব্রহ্মের প্রকৃতি হবার গূঢ় তাৎপর্য্য আস্বাদিত। 'অভিধা' শব্দের অর্থ অমরকোষ দিচ্ছেন—পরস্ত বিষয়ে স্পৃহা। পাঠান্তরে আছে—'পরস্ব বিষয়ে স্পৃহা'। এর টীকায় ভানুজী দীক্ষিত লিখছেন, 'চৌর্য্যাদিনা স্পৃহা'। অর্থাৎ চোর যেমন পরের বিষয়ে স্পৃহাযুক্ত, ব্রহ্মও তেমনি পর-প্রকৃতির ভাবে চোরেরই মত লালসাবান হয়ে প্রকৃতি হলেন। বেদান্ত দর্শনের এই সূত্র আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গেই কি মনে হয় না কেন গৌর অবতীর্ণ হলেন?

'যিনি মধুর রস আস্বাদন করতে গিয়ে প্রণয়িজনের অপার মাধুর্যভাব চুরি করেছিলেন এবং তাদের কাছে অঙ্গীকার করে যাঁর রূপ গোপন করেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি গৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে শান্তির অনুকম্পা করুন'। বেদান্তের 'অভিধ্যা' শব্দের অর্থ 'চোরের মত পর বিষয়ে স্পৃহা' অবলম্বন করেই না গৌর রাধাভাবে ভাবিত হয়েছিলেন?

রস-সাগরে তখনই বাতিচার, তখনই কাব্যের বাক্-বাসর সেখানে জমে ওঠে, যখন এক দুইকে, ব্যক্তি

জাতিকে, সন্ন্যাসী সংসারীকে, কুলীন অকুলীনকে, চেতন জড়কে পদদলিত করে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়। কৃষ্ণ নিজকে আবরণ করে রাখলেন, প্রকট করলেন রাধাদ্যুতি। রাধা-হীন কৃষ্ণ মদনমোহন নহেন, সাক্ষাৎ মদন। যারা রাধা-ভাবকে ঠেলে ফেলে কৃষ্ণের ছাঁচে জাতি গড়তে চান, তারা জাতিকে মদনানলে নিক্ষেপ করবার বন্দোবস্তই করছেন। রাজা যেদিন প্রজার দীপ্তির মাঝে আত্মগোপন করবেন, ব্যক্তি যেদিন নিজকে কালো করে পরিবার সমাজ বা জাতির আলোতে আলোকিত হবেন, সন্ন্যাস যেদিন সংসারের যাবতীয় বন্ধনকে মুক্তির আলোকে ব্যাখ্যাত করবেন, সেদিন না হবে জাতিগঠনের সূত্রপাত? বিশ্বে আজ প্রয়োজন প্রজার পিছু রাজার, বিরোধের পিছু মিলনের, সংসারের পিছু সন্ন্যাসের স্থাপনা। গৌরাঙ্গদেবের 'কৃষ্ণ যামাবতীর্ণ দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্' লীলা আজ দুনিয়াকে নূতন ছাঁচে গড়বার জন্য প্রতি পরিবার, প্রতি সমাজ ও প্রতি জাতির হৃদয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী এই গোরা-রসকে বিশ্বের মহা মেলায় উপহার দিয়ে জগদ্গুরু হবেন, ইহাই ভগবৎ-বিধান। গৌরের বাঙ্গলা, এখনও আত্মস্থ হও; তোমাকেই "নিজের রুচি আবরণ করে জগতের দ্যুতিতে দ্যুতিমান্ হবা"র কৌশল বিশ্ব-দরবারে শিখিয়ে দিতে হবে, বিশ্বের এই মহাসঙ্কটে মুক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য ও সহজ সরল স্থায়ী পন্থা দান করবার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে। প্রাণ গৌর, যদি তুমি বাঙ্গালাকে এতবড় মহৎ অধিকার দিয়ে সাজিয়েছ, আর কতদিন সে অধিকার থেকে ভ্রষ্ট হবে তোমার নামের, তোমার বেদনুভূবার কলঙ্ক উৎপাদন করব? আমরা যে তোমারই; আজ তোমার এই আবির্ভাব-দিনে তোমার সাধের বাঙ্গালাকে সকল অবসাদ, সকল হীনত্ব, সকল Divide-and-Rule-Policy থেকে মুক্ত করে একমাত্র ত্রিতত্ত্ব তত্ত্বের আস্বাদনে মাতিয়ে বিশ্বকে রস-বৃন্দাবনে পরিণত করব, আমরা তোমার অন্বেষণে বিশ্বকে মুখরিত করে তোমার আবির্ভাবকে সার্থক করি।

বন্দেমাতরম্*

খেয়াঘাটে

॥ শ্রীঅনিল কুমার সমাজদার ॥

একা আমি পরিত্যক্ত নিষ্ঠুর পৃথিবীর পাশে
অশ্রুত সম্ভব-বার্ত্তা কোথা হবে পুনঃ অন্বিষ্টান,
গোধূলির অবেলায় বিশৃঙ্খল অন্তিম সকাশে
রিক্ত মোর দুই হাত। বিস্মৃতির ঘোর ব্যবধান
সজ্ঞান পাথেয়-সাধ্য। জীবনের অধীর বরণা
নিদাঘ-বিষাণ ধ্বনি-ছলনায় দিছে আরাধনা।
করেছে সম্বলহীন শুভ্রকেশ নগ্ন বিবসন
ভ্রান্তির আঁধারে মুগ্ধ—পথিপাশে আমি নিশ্চেতন
ঘিরে আসে পৃথ্বীবারে কুণ্ডলিত নিবিড় আঁধার
লেলিহান প্রলয়ের প্রচণ্ডতা আহ্বান হুংকার
বাড়ায় অনন্ত ত্রাস; থর থরি কাঁপে বসুন্ধরা,
না নিভিতে হোম বহ্নি যাত্রা পথে এত তাড়াতাড়া!
তন্দ্রাহীন ছিলো যারা চেতনার নিমেষ ঝংকারে
এলো তারা সহসা যে দলি' মোরে জমাট আঁধারে।

ছুটে যায় খেয়া ঘাটে মৃত হতে মৃতক বিশেষ,
পাথেয় বিহীন আমি খেয়া পার হ'ল নাকো মোর।

---

*বন্দেমাতরম্ (প্রথম পর্য্যায়) ১৩০২ বঙ্গাব্দ ১৭ই ফাল্গুন হইতে পুনর্মুদ্রিত।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৮)

…নিজে ছ বৎসর পর্য্যন্ত বোবা ছিলাম—বোবা-রাজার ব্রত যা করেছিলেন।…প্রাণের ভাষা সবাই বুঝত—কৃষ্ণের বাঁশী সবাই বুঝত—গরুরা বুঝত আমাদের ডাকে, যশোদা বুঝতেন যা বলে ডাকে, রাধা বুঝতেন রাধা রাধা বলে, সখারা বুঝত সখা বলে ডাকে।…কথার তপস্যা কর, মনের তপস্যা কর; প্রাণময়ী বাক্য হোক, প্রাণময়ী কায হোক,—। এসেছ আমার কাছে—আমি চেষ্টা করব—তোমরা নিজেদের জীবন বিশ্লেষণ করে দেখ মন মুখ কায এক আছে কি না…। প্রাণবল্লভকে আমি যে পড়ে পাই নি—পেয়েছি জীবনে—আমি আমার উপলব্ধির কথা বলি, তাই লক্ষ লক্ষ পণ্ডিতের মধ্যে বুক ফুলিয়ে নিজের কথা বলেছি। তুমি যাহা তাহাই তুমি বল, ভগবানের কৃপা পাবে—সহজ সরল অনাড়ম্বর হও—এই-ই বর্ত্তমান জীবনের সাধনা—ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ।

৩০, ৫, ৪৬—সকাল।…বিশ্বসৃষ্টির নবীন মন্ত্র লইয়া গৌরহরি বল—তুমি মীনরূপে, কূর্ম্মরূপে, শূকররূপে…জগৎ ধারণ করিলে—সৃষ্টির এক এক অবস্থায় তুমি জগৎ ধারণ কর।…নরহরিরূপে, অর্দ্ধ নরত্ব—অর্দ্ধ সিংহত্ব।…বামন-রূপে ব্রহ্মবামন—ক্ষুদ্র হলেও বিরাট—বামনরূপে বিশ্ব গ্রাস করিলে—বামনরূপে তুমি বিরাট…ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রিয়ের শোষণ হইতে ধরাকে রক্ষা করিলে। রাম—বিশ্বের আরাম—বিশ্বের শান্তি। এদিকে রাবণ বিশ্বের…উৎপাৎ, অপর দিকে তুমি রাম বিশ্বের শান্তি…কৃষ্টি-সভ্যতা স্থাপন করিতে ইলধর বলরাম তুমি, স্বরাজ সুন্দরের জ্যেষ্ঠ সহোদর…বুদ্ধ—গণতন্ত্রের বার্ত্তা প্রচার করতে, নরের সত্যতা, মাটির সত্যতা, হৃদয়ের সত্যতা প্রচার করতে বুদ্ধের আসা—কল্কি অবতারে…হয়েছেন হয়েছ; তারপর নিত্যগোপাল—সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যিনি গৌর গোপাল, আজ তিনিই নিত্যগোপাল—জন্মান্তর, নিত্যানিত্য প্রভৃতি সর্ব সমন্বয়ের বার্ত্তা স্থাপন করিতে আসিলেন—নিত্যগোপাল নবীন গৌর, নবীন বুদ্ধ—তিনি সহজ—তাঁহাকে শুধু হৃদয় দিয়া ধরিতে হয়, বুঝিতে হয়—ভালবাসা ছাড়া চিনিবার অন্য কোন পন্থা নাই।…ভারতের কথা-সুরের, বাঙ্গালাদেশেই তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচিত—কেননা হৃদয় কেহ বোঝে না—বুদ্ধির কথা শুধু লোকে বোঝে, প্রাণ কেহ বোঝে না—প্রাণের সাধনা বাহির বাড়ীর সাধনা নয়—সে অন্তঃপুরে থাকে। নিত্যগোপাল, তুমি বাক্য মন বুদ্ধির অগোচর—তুমি কেবল হৃদয়ের গোচর—ভালবাসা দিয়া তোমাকে পাইতে হয়—মরিয়া মরিয়া তোমায় পাইতে হয়—যা যেমন করিয়া সন্তান সৃষ্টি করেন, বীজ যেমন পচিয়া শচিয়া অঙ্কুর সৃষ্টি করে—তেমনি আমি মরিয়া মরিয়া তোমাকে প্রকাশিত করিব। তুমি আমি এক হইব।… ইহা হৃদয়ের ধর্ম—এই বিশ্বে না মরিয়া কেহ বাঁচিতে পারে নাই—বাঁচিতে চাহিলে মরণ আসে। বাঁচিতে হইলে মরিতে হইবে। নরের তপস্যায় সন্তান সৃষ্টি, ভগবানের তপস্যায় বিরাট বিশ্বসৃষ্টি…তোমাকে আমার বুক চিড়িয়া পড়িয়া তুলিব…শ্রীরাধা মরণ-মূর্ত্তি …। আমার আমিত্ব লয় হউক, আমার নির্ব্বাণ হউক। যেমন গঙ্গাজলে মুন পড়িয়া গঙ্গাজল হয়, তেমনি আমি তোমার মাঝে পড়িয়া তোমাময় হইব—তেমনি জীব হউক শিব…ধরার ধূলি হউক বিশ্বধূলি, ধরার মানুষ হোক্ বিশ্ব-মানুষ।…প্রাণ দিয়া দিয়া প্রাণের তোমায় পাইব। নিত্যগোপাল,

তুমি যেভাবে আমায় চাহিয়াছ, আমায় সেইভাবে গড়িয়া তোল।···তোমার সেই পরিহাস-বাক্য আজিও স্মরণ করিয়া আমি পুলকিত হই—রোমাঞ্চিত হই—'শরৎ কাঁদিছে অঝোর নয়নে, কি জানি কি ভাবিয়া মনে'। ·· তোমার আমার ব্যবধান ঘুচিয়া যাক ··তুমি পিতামাতা বন্ধু···ধনজন···আমার দেহ আমার প্রাণ তুমি...জগন্নাথ নিত্যগোপাল...হরিবোল···।

সন্ধ্যা। শ্রীমন্মধুসূদনের একটী খুব পরিচিত শ্লোক, মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।

যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।

—আমি তো মূকই ছিলাম—সেই বিন্দু থেকে কথা পেয়েছি, মায়ের ভিতর দিয়ে নিত্যগোপালই কথা দিয়েছেন—সেই কথাকে নিত্যগোপাল এমন এক ঘোড় দিয়ে দিলেন যে, সেই কথা দিয়েই আমি বেদান্তের ভাষ্য লিখলাম। ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ কোটী লোক যে-উপনিষদের ভাষ্য লিখতে পারে নি, লিখেছেন জন পঞ্চাশ লোক—সেই পঞ্চাশ জনের মধ্যে আমায় ফেলে নিত্যগোপাল আমায় আবার বিন্দুতে ফেলেছেন। এমন কি পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করব, না গালি দেব? এ তো গিরিলঙ্ঘনই বটে—আমি জেনে মরি লাজে পরবে।···আমি তো গ্রাম্য বার্ত্তা বলি না, গ্রাম্য বার্ত্তা শুনি না···কিন্তু এ কথা কার কাছে কইব? নিত্যগোপাল আমায় আরো বিন্দুতে ফেলেছেন—প্রতিদান না চেয়ে ভালবাসা শিখিয়ে—একই আসনে বসিয়ে, একই থাওয়া খেয়ে, একই বসন পরে আমি মানুষকে কোল দিয়েছি—মানুষের কথাকে, মানুষের সত্তাকে ছেপে আমি কোনদিন শোষণ করি নি। তাই তোমাদের বলছি কথা শুনে চলো—না হয় আমি একদিন চলে যাব—পথ আমার খোলা—চলতে আমার হবে।···তোমরা সরল হও, যা আছ, তাই আমার কাছে প্রকাশ কর—আমি মনতত্ত্ব কিছু জানি—অন্ততঃ নিত্যগোপাল-আশীর্বাদে চৌদ্দ হাত জলের তলার কথা বুঝতে পারি—তাই যে যুগ আসছে তাতে মন মুখ এক করতে হবে। খুন করে এলেও আমি ক্ষমা করতে পারি, সে দৃষ্টান্ত আমার আছে। বলাইবাবুর সেই যে স্বীকৃতি নিত্যগোপালের কাছে—সেইখানেই মুক্তি।·· এটা একটা সত্য।···নিত্য-গোপাল, আমায় তুমি বিপদে ফেলে গেছ—সন্ন্যাস চেয়ে ছিলাম—বললে সংসারে যাও, কাজ আছে। কি কাজ করব? কাউকে তো আমার কথা শোনাতে পারলাম না—ভুলের কথা বললে তো মানুষ রাগ করে—কেউ তো তোমরা এসে বল না, ঠাকুর, আমার কি দোষ আছে বল।···আমার মন মুখ এক জেনো—এ ভুল করো না। আমি বকি—তোমাদের দোষ দেখাই তোমাদের পরিপূর্ণ সুন্দর করতে চাই, তাঁকে দেখাতে চাই বলে। কিন্তু তোমাদের জন্য আমার মনে গভীর প্রীতি, অনন্ত স্নেহ...। নিত্যগোপাল, তোমার সঙ্গে অনন্ত হব, তোমার সঙ্গে একাত্ম হব; আর আমার কোন সাধনা নাই—যোগক্ষেম তুমি বহন করবে—যেভাবেই কর—; আমি যেন অনন্ত হই—আমি যেন তুমি ছাড়া আর কিছু জানি না।···তোমায় নিয়ত ধ্যান করব—তোমাকে স্বপনে স্বপনে স্মরণ করব।···বৃন্দাবনে গৌররূপে দেখা দিয়ে বললে, বাংলায় যাও, কাজ আছে।...মানুষ যাতে আমার কথা শোনে, আমাকে সেই যোগ্যতা দাও, তাদেরও কথা শুনবার শক্তি দাও। জগন্নাথ··। ৩১, ৫, ১৯৫৩।

·· কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব রক্ষ মাম্।

রামবাঘব রামরাঘব রামবাঘব পাহি মাম্।

···সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বভূতাধিবাস...সর্ব্বভূতের মধ্যে গোরা আপনার আমিকে খুঁজিয়া বেড়ায় ··মুরলী বাজে···আমি বিশ্বনাগরিক···এই বিশ্বই আমার মহামঠ··· আমার কর্ম বিশ্বকর্মে গড়িয়া উঠুক—তুমি বিশ্বকর্মা··· বিশ্বনাগরিক...নিত্যগোপাল, গৌরীদুলাল নিত্যগোপাল··· মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা...মদ্ভক্ত শ্রীজগৎগুরু··। ওগো প্রাণ, মহাপ্রাণ, বিশ্বপ্রাণ,...আমাদের সকল অনৈক্য, সকল অজ্ঞান ঘুচাইয়া দাও,·· মুছিয়া ফেল;···হরিবোল, হরিবোল ···নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্য-গোপাল, নিত্যগোপাল, জাগো, জাগো—মহাসমাধিনিদ্রা হইতে নিত্যগোপাল জাগো...গৌরীদুলাল নিত্যগোপাল, প্রাণ, মহাপ্রাণ—তোমারি জীবনে মুছিয়া যাইব···ধরার

ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ঘরের মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ।

সন্ধ্যা—নিত্যগোপাল জড় ও অজড় এবং তারই ফলে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটে গেছেন। তারই ফলে তাঁর ঘরে মেয়েদের স্বামী স্থান দিয়েছেন। তিনি জানতেন মেয়ে পুরুষ দুইজন না হলে সংসার চলে না।...মার্কণ্ডের মুনি বলেছেন, 'পিতুঃ অত্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ'—একটী সন্তানকে জন্ম দিতে মায়ের যা কষ্ট তা পুরুষ পারে না—এটা বুদ্ধির কাজ নয়, এটা প্রাণের কাজ।... সন্তান নিয়ে যা ও বাবার ঝগড়া...নিমাই লেখাপড়া করতেন না—বাপ বলতেন, ছেলেটা লেখাপড়া করে না, ওটা বাঁচার থেকে মরা ভাল। মা ছিব কেটে বলতেন, 'দুখ হইবা ঘরে মোর থাকুক নিমাই'।...ব্রহ্ম-মায়ার ঝগড়ার স্থানে নিত্যগোপাল দুজনকে সমান মূল্য দিয়া সমন্বয়-ধর্ম এনেছেন—তাই মেয়েদের স্থান দিয়েছেন। মার্কস্ মায়ের সত্যতা দিয়েছেন, ছেলেন বাপের মূল্য দিলেন—নিত্যগোপাল দুজনকে মেলালেন।...যীশু খোষের ও তার স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্য দিয়ে সন্তানের মৃত্যু। একদিকে শিব, একদিকে কালী—এই দুইয়ে মিশিয়ে সংসারটা সত্য হয়ে আছে...নর নারীর সমান মূল্য।...দুঃখের সাধনায় নারী অগ্রবর্তী—মহাত্মাজী বলেছেন···in this peaceful struggle a woman outdistances a man by many a mile...। কন্যাদান সব চেয়ে বড় দান—অন্য দানে সকল তীর্থকে আহ্বান করা হয়—কিন্তু কন্যাদানে তীর্থ আহ্বান করা হয় না—আমার কলিজার মাংস দিয়ে দিচ্ছি—সেটা এমনিই পবিত্রতম বস্তু।...আত্ম-নিবেদন, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই কলিযুগের সাধনা।... সমস্ত সাধনার শেষে নারী হতে হয়—যেমনপ্রাণ দিয়ে বুঝতে হয় স্বামীর সব কিছু আমার—এটা নারীত্ব...। নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন, কৃষ্ণভাবপুরের আহিরী গোপের ঘরে কবে নারী হয়ে জন্মাইব···। আত্মনিবেদন শিখতে হলে নারীত্বের সাধনা করতে হবে।...মাতৃহীন সন্তান সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল হয়—যদি কোন নারীর প্রাণস্পর্শ সে না পায়।···ওজন অর্থ সেবা—জীবনভর নারী-শক্তিকে সম্মান করেছি।... ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি, যখনই যেন মেয়েদের হাত দিয়ে আসে।...নারীকে নরকের দ্বার বলে—আমি দেখাতে চেয়েছি নারী স্বর্গেরও দ্বার।...বুদ্ধিমান জজ-সাহেবকেও ঘরে আসতে হয়।...আমার ভবিষ্যৎ আন্দোলন মেয়েদের হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চাই...।

—আমার সুখের সঙ্গে তোমার সুখ জড়িত—আমি প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণকে বজায় রেখে আমার স্নেহের মধ্যে তাদের এনেছি—প্রাণপণ করে মানুষকে চেয়েছি—ভাল করতে চেয়েছি।...তোমাকে কে কি বলে সেইটে দেখতে হবে,—নিজের ত্রুটির আলোচনা করবে, অন্যের ত্রুটির নয়—নিজের বাহাদুরী নিজে করো না—নিজের স্বীকৃতি এবং বিশ্বের স্বীকৃতি—ঘটনায় এই দুটো দিক ..। সকল উপদেশের সেরা উপদেশ মানুষকে ভালবাস।—

১।৪।৫৬—সকাল ॥···প্রকৃতির যে পরিবর্তন হইলে কৃষ্ণময়ী হওয়া যায়, শ্রীরাধা, তুমি সেই পরিবর্তিত প্রকৃতি। ···তুমি এসে আমার জীবনে, আমার প্রকৃতির পরিবর্তন কর।···তাই সাধক ভক্ত গাহিল, কবে কৃষ্ণভাবপুরে আহিরী গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জনমিব।···শ্রীরাধা বিনীতা বিদগ্ধা—পরস্পরবিরুদ্ধধর্মময়ী—সর্বোপিতা গুরোস্নেহঃ কৃষ্ণপ্রেমবসতি · শ্রীরাধা; জয় রাধা—কৃষ্ণ মনোমোহিনী—পরব্রহ্মমহিষী···কৃষ্ণসাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে দুকূল ভাসিয়া দুকূল প্লাবিয়া উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া আতিকূল তেয়াগিয়া···। শ্রীরাধা, আমি তোমারই সঙ্গে চলিব—চরৈবেতি, চরৈবেতি; সকল দুর্যোগের বুক চিরিয়া, সকল জটিলা কুটিলার···, সকলের ছাড়িয়া যাওয়ার মাঝ দিয়া চলিব তোমারই সঙ্গে ওগো বিপ্লবময়ী, ওগো নৈর্ঋতী, ওগো নৈর্ঋতী, সরলময়ী, আত্মনিবেদনময়ী—সকল ওগের নির্বাস-তোমারই মাঝে—আমার শরণাগত যুবতি শ্রীরাধা।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(১৪)

সকালে ব্রহ্মসূত্রের জৈনদর্শন রিডাইস করি, তত্ত্বার্থাভিগম দেখি।...৯টায় একটু আগে শেলবাবু আসেন। তাহার সঙ্গে প্রায় আধ ঘণ্টা কথা হয়। তাহার গাড়ীতেই আশ্রমে ফিরি।...আর পত্রিকা না পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছে, কেননা পত্রিকার বহিমাসের দাদা সম্বন্ধে কিছু লেখা হয় নাই নাকি। আমার কি বলিবার আছে?

১০ই সেপ্টেম্বর

সকালে Analysis of Matter পড়ি, ব্রহ্মসূত্র রিডাইস করি। 'In the present state of physics, many questions of considerable philosophical importance cannot be answered, although they are such as science may hope to answer, and largely such as were for merely supposed to have been already answered. This makes the task of the philosopher more difficult; it is necessary to develop various hypothesis, so as to be prepared for, whatever decision science may arrive at. Analysis of Matter. 304. 'The point which concerns the philosophy of matter is that the event out of which we have been constructing the physical world are very different from matter as traditionally concieved. Matter was expected to be impenetrable and indestructible. The matter that we construct is impenetrable as a result of definition; the matter in a place is all the events that are there and consequently no other event or piece of matter can be there.'—P. 385...বেলু বেলা ১০টায় S. N. Roy এর ওখানে যায়। ১ ঘণ্টা থাকার পরেও দেখা না হওয়ায় চিঠি রাখিয়া আসে। বহু জায়গায় যায়।...বেলু ফিরিয়া ৭টার পর পৌঁছায়।...

১১ই সেপ্টেম্বর

সকালে প্রতিভা...দুধ দিয়া যায়।...বেলু কলিকাতা ঘুরিয়া ২টার মধ্যে আসে। চিদানন্দকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বই এবং বেলু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট হইতে একটা ব্লক (বুধাদেবের) আনিতে দেওয়া হয়। প্রতিভা আসে প্রায় তিনটায় ব্যাঙ্ক হইয়া। Analysis of Matter পড়ি। সকালে ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদভাষ্যের প্রুফ দিয়া যায়।...বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশনের পরীক্ষক হইবার জন্য বেণুর কাছে চিঠি আসে। সন্ধ্যার পর মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী (পূর্ব্বে জামালপুরে ছিল) আসে। সৌরমোহন সাহা আসে। জগতের রূপ না বদলাইলে পুরুষোত্তমকে কিছুতেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না। জগতের বর্ত্তমানে যে পদার্থবিদ্যা, তাহাতে "ব্রহ্ম"ই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞানকে, মুক্তিকে জগতের বুকে আস্বাদন করিতে হইলে Atomic theory-র আশ্রয় নিতেই হইবে, বৈশেষিক-বৌদ্ধ-জৈন দর্শনের ভিত্তিতে বেদান্তকে স্থাপিত করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য পদার্থবিদ্‌গণ বর্ত্তমান

বিশ্বের এইরূপ চিত্র আঁকিবার জন্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।···বিশ্লেষণের পথে পুরুষোত্তমতত্ত্ব বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে আকার-নিরাকার, চৈতন্য-অচৈতন্যেরও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদী জড়ের বিশ্লেষণ করিয়া পাইয়াছেন চৈতন্যকে, আমরা চৈতন্যের বিশ্লেষণ করিয়া পাইব জড়-চৈতন্য সমন্বিত পুরুষোত্তমকে। বিশ্লেষণ আরম্ভ হইলে তাহা পুরুষোত্তমে পৌঁছাইয়া দিবেই। প্রায় ১০টায় আফিস হইতে আসি। রেণু মোড় পর্যন্ত দিয়া যায়।

১২ই সেপ্টেম্বর

সকালে 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' হইতে শৈবদর্শন দেখি ও 'সত্যমেবাবজয়তে' সূত্রটী পুনরায় লিখি। রেণু এখানে বসিয়া কিছুকাল প্রুফ দেখার পর প্রেসে যায়। সেখান হইতে ২।১ জায়গা ঘুরিয়া বাসায় আসে···২।০ টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে। ৫টার পর খাতা লইয়া বাসায় ফেরে, এখানে আর আসে না। প্রতিভা ব্যাঙ্ক পোস্টাফিস হইয়া এখানে আসে ৬টায়। রাত্রি ৯টার পর ফিরি। মোড় পর্যন্ত রেণু আসে।...প্রতিভার আমাদের কাছাকাছি থাকিলে কাজের সুবিধা হয়, ছোট ছোট কাজগুলি যাহা ফাঁকে পড়িয়া থাকে, সেইগুলি করা সম্ভব হয়। সেইজন্য মনে করিয়া ছোট ছোট কাজগুলি আগে বলিয়া দিতে পারে না। কাল সকালে প্রতিভা আসিবে ও রেণুর ওখানে যাওয়া করিয়া যাইবে এইরূপ কথা হইল।...

১৩ই সেপ্টেম্বর

প্রতিভা সকালে দুধ-ছানা দিয়া যায়। সে রেণুর ওখানেই আফিসে যায়, নিজে বেঙন-আলু সিদ্ধ ভাত, দই, খাবন খায়। পোস্টাফিস হইতে রেণুর টাকা তুলিয়া পোস্টকার্ড এনভেলাপ কিনিয়া এখানে আসে। রেণু প্রেস হইয়া কবিরাজবাবুর ওখান হইয়া ২টার মধ্যেই ফেরে। রেণু পরীক্ষার কাগজ রেখে।...প্রতিভা ম্যাপার লেখে ও 'সত্যমেবাবজয়তে' সূত্রটী পুনরায় লেখে। ডাক্তার বীরেন আজ আসিল না। মহেন্দ্র দত্ত আসে। হরিবাবু বাবুর বড় পুত্রবধূ স্টেশন অপারেশনে মারা যাওয়ায় আগামী সোমবার সকালে সেখানে ভাগবতপাঠ করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। আবার গীতাপাঠ করিবার জন্য অনুরোধও করে।···নিত্যগোপালের দর্শনের মধ্যে সর্ব দর্শনের বিশেষভাবে বেদান্তদর্শন, জৈনদর্শন ও শৈবদর্শনের সমন্বয় ঘটিয়াছে। অবধূত সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক শিব; এই সম্প্রদায় লুপ্ত হইলে ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন ভগবদ্দত্ত। ইনি জৈনদের আদি তীর্থঙ্কর এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতারও বটেন। বিষ্ণু-দর্শন শিব-দর্শন জৈন-দর্শনমূর্তি নিত্যগোপাল। আজ পশুপতিদর্শন ও শৈব-দর্শনের কিছুটা "সর্বদর্শনসংগ্রহ" হইতে পড়ি, রক্তসূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত করি। রাত্রি ৯টার পর ফিরি। রেণু মোড় পর্যন্ত আসে।...

১৪ই সেপ্টেম্বর

...সকালে সর্বদর্শনসংগ্রহ হইতে রসেশ্বর দর্শন (মাহেশের সম্প্রদায়ের অপর শাখা) পড়ি।

সচ্চিন্নিত্যানিজাচিন্ত্যাপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্।
নৃসিংহতাপনং মন্বে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতম্। সাকারসিদ্ধি
from সর্বদর্শনসংগ্রহ।

বহুদর্শনেঽপি মুক্তির্ঘর্ষিতা পিণ্ডপাতনে।
করামলকবৎ সাপি প্রত্যক্ষা নোপলভ্যতে।
তস্মাত্তং রক্ষয়েৎ পিণ্ডং রসৈস্তৈস্তৈর্ঘনাদনৈরিতি।
···আয়তনং বিজানাং মূলং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাম্।
শ্রেয়ঃ পরং কিমন্যৎ শরীরমজরামরং বিহায়ৈকমিতি।
···একোঽসৌ রসরাজঃ শরীরমজরামরং কুরুতে ইতি।

১৫ই সেপ্টেম্বর

.. বীরেন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্য খিদিরপুর যাই। গেট দেখা হইয়াছে, নশ্বরাশীর ডান lung উপরের দিক বেশ affected...। আমার আজ আর আফিসে যাওয়া হয় না। রক্তসূত্রের ১২শ বর্ষের ফাইল কপি আজ প্রতিভা নিয়া আসে, ১৩শ-এর প্রথম প্রুফ আজ আসে।

১৬ই সেপ্টেম্বর

...এমন অবস্থার মধ্যে পড়ি নাই, তাই আমার কথা বলিবার জন্ত রেণু প্রতিভার কথা মনে হইতেছিল। কেহ না আসায় দুঃখ বোধ হইতেছিল। আমি তো বিহ্বল হই-ই; মনের অসুখে খুব বিহ্বল হইয়াছিলাম।..একবার আফিসে যাই। ৯টায় ফিরি।...

১৭ই সেপ্টেম্বর

সকাল ৬টায় হরিদাসবাবুর বাসায় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভাগবত পাঠ করিতে যাই, মহেন্দ্র দত্ত রিক্সায় নিয়া যায়। রেণুর বাসার কাছ দিয়া যাই, খবর দিয়া যাই। রেণু-প্রতিভা হাঁটিয়া যায়। 'নিবৃত্ততর্ষৈঃ উপগীয়মানাৎ'—'শ্রোণ্যক্ষ-বিলুইন্'—'গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং'—'যথা বিচিত্রব্যসনা',—'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা'—'কায়েনবাচামনসৈন্দ্রিয়ৈর্বা' শ্লোক কয়টি পাঠ ও ব্যাখ্যা করি। বর্তমান শ্রাদ্ধ যে ভাগবতধর্মানুমোদিত নয়, 'আনন্দাশ্রুর' মন্ত্রের সঙ্গে যে 'পাপোঽহম্' শ্লোকের বিরোধই রহিয়াছে—ইহাও আলোচনা করি। সেখান হইতে রিক্সায় বরাবর আশ্রমে ফিরি। আরও ছয় দিন সন্ধ্যায় পাঠের কথা বলিল, রাজী হইলাম। অনেক দিন পুরুষোত্তম-কথা আলোচনা হয় নাই। সুযোগ ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না।...রেণু...বেঙ্গল ল্যাম্প, বাসন্তী কটন মিল, টি বোর্ড-এ বিজ্ঞাপনের জন্ত যায়। এখানে আর কেরে না। প্রতিভা ব্যাগে একাউন্ট দিয়া আসে।...আফিসে যাই ৬টার পর। ৮৪০টার পর ফিরি, যোড় পর্যন্ত রেণু আসে।...পত্রিকার কাজ গুছাইয়া করিবার জন্ত বলি। আমি একটু বিব্রত বোধ করিতেছি। একটি সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতি, ইহারা বিজ্ঞির...মন মতির ঠিক রাখিয়া চলিতে হইবে, তবে পথের সন্ধান মিলিবে। আবেষ্টন আমার স্থির হইবে। আবেষ্টন আজ ক্ষিপ্ত, সব ছত্রভঙ্গ। কোন্ অধিকতর কল্যাণের জন্ত [illegible] আয়োজন?...

১৮ই সেপ্টেম্বর

রাধাষ্টমী

...ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয় রাধাষ্টমীর জন্ত কিছু রসগোল্লা।...মহেন্দ্র দত্ত আসে ৪৯০টায়। আমি ও প্রতিভা রিক্সায় হরিদাসবাবুর বাসায় যাই। সেখানে পুনরাবৃত্তিসহ 'তত্র দ্বিতীয়াভিনিবেশঃ' ও 'অবিস্ম... শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করি। হরিদাসবাবুর গাড়ী আমাকে চিদানন্দকে ও প্রতিভাকে আফিস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। ৯টায় পর আশ্রমে ফিরি।...প্রাণপণে ত্যাগ করিয়া আমার মনের বৌকে বিড়াল ছানার মত পার করিতে পারিব না। যদি যাদবপুর সীট পাওয়া না যায়, পরে যাহা হয় দেখিব। আমার ধর্ম রক্ষা করিয়াছি—তাহার পর যদি এখানে রাখা সম্ভব না হয়, তখন ব্যবস্থা অবশ্যই করিব।...

১৯শে সেপ্টেম্বর

...আজ 'শৃণ্বন্...' শ্লোকটী আলোচনা হয়।...

২০শে সেপ্টেম্বর

...আমি একাই ভাগবত পাঠে যাই। আজ বিশেষ ভাবে 'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা' ও 'যং যান্তমিঃ' শ্লোক আস্বাদন করি। প্রথমে ভগবানকে নিজ জীবনে তেজাতেজভাবে পাইয়া তেজের রাজ্যের দিকে 'শৃণ্বন্,' 'গায়ন্' চলিতে হইবে। জীবনে অনুরাগ জাত হইবে, দেহ-মন-প্রাণ অনুরঞ্জিত হইবে, চিত্ত গলিয়া যাইবে, প্রাণ খুলিয়া 'উচ্চৈঃ হসতি রোদিতি রৌতি'। ভক্ত তখন এই জগতে পুরুষোত্তমকে বুকে করিয়া প্রবেশ করিবে। প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া ভক্ত শুধুই প্রণাম করিবেন, 'যং যান্তমিঃ'। যে-ভগবানকে পাইয়াছিলাম ব্যক্তিগত জীবনে, তাহাকেই পাইব সকল ইন্দ্রিয়দ্বার মুক্ত রাখিয়া জগতের বুকে। 'অনুক্ষণ-শ্রবণ' হইতে আরম্ভ করিয়া যদি সর্ব গুহাশয়ের পানে অবিচ্ছিন্ন মনোগতি লইয়া ছুটিতে হইবে। চিদানন্দ পাঠে উপস্থিত ছিল, রেণু-প্রতিভা ছিল না। হরিদাসবাবু, তাঁহার স্ত্রী, মহেন্দ্র উপস্থিত ছিল।...

২১শে সেপ্টেম্বর

...হরিদাসবাবুর গাড়ী আসে ৪৷ টায় পর।...আজ

বিশেষ করিয়া 'ভক্তিং পরেশানুভবং' শ্লোকটী আস্বাদন করি। 'বন্ বায়ুং' শ্লোকও আস্বাদন করি। পুরুষোত্তম-তত্ত্ব যখন সংসারে প্রবেশ করে, তখন আকাশের সঙ্গেই প্রথম পরিচয়। আকাশাদ্যা হইয়াই সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে। 'ছেড়ে রাখা'ই আকাশ-তত্ত্ব। আকাশের পরে বায়ুতত্ত্ব। বহন করে যে, সে-ই বায়ু; তারপর তেজ-তত্ত্ব, জল-তত্ত্ব, পৃথ্বী-তত্ত্ব। পৃথ্বী সর্বংসহা।...

২২শে সেপ্টেম্বর

...৭টার সময় গাড়ীতে গীতাভবনে যাই। জয়া, তাহার বোন ও কন্যা আসে। আজ ভাগবতস্বরূপের আদ্য-পরিচয় পাঠ হয়। 'নাহং তু সখ্যঃ' পর্যন্ত। অফিসে আসি। প্রায় ১০টায় ফিরি। রেণু প্রায় শুক্রবার পর্যন্ত আসে।

২৩শে সেপ্টেম্বর

সকাল ৭টায় হরিদাসবাবুর বাসায় যাই। আজ ৭ দিনের শেষ ভাগবত পাঠের দিন। 'নাহন্ত সখ্যঃ' শ্লোক হইতে 'ন পারয়েঽহম্' শ্লোক পর্যন্ত আস্বাদন করি। বেশ ভাল লাগিল। ভগবান। ...রেণু দুপুরের পর আসে। প্রতিভা...২৪টার পর আসে। রেণু শক্তি ঔষধালয়ের পাবলিসিটি অফিসারের বাসায় যায়, দেখা হয়। তাহার পর বিভা সরকারের বাসায় যায়।...যে-কোনও পরিস্থিতির মধ্যে নিজের সাহস ও ধৈর্য্য লইয়া কাজ চালাইয়া যাইবার সাহায্য ঔষধিদ্বীর কাছ হইতে পাইয়াছিলাম বলিয়া বিপর্যয় আমাকে কাবু করিতে পারে নাই।...

২৪শে সেপ্টেম্বর

...প্রতিভা দুপুরের পর যাইয়া ব্যাঙ্ক হইয়া অফিসে ৩টায় যায়। রেণু আসে প্রায় ছয়টায়। জয়া আসে তিনটায়। ৪টায় আসে মালতী। মালতীকে মাতৃস্নেহ লইয়া যথাসাধ্য শিক্ষার সেবা করার কথা বলি। আমি যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পড়াইতাম, ক্লাসে প্রবেশ করিবার পূর্বে ভাবিতাম, সাক্ষীগোপাল মূর্তির পাঠশালায় শ্রীকৃষ্ণের ছাত্ররূপের কথা। ছাত্রদের মধ্যে বালগোপালকে, শিশু রোগীদের মধ্যে বালগোপালকে দেখিয়া সেবা করিলে শিশুদেরও কল্যাণ হয়, নিজের নার্সিং-ও সেবাকর্মে পরিণত হয়। যে-কোনও আবেষ্টন হইতে পুরুষোত্তম-সাধনায় রওয়ানা হওয়া যায়—ইহাই ইহার বৈশিষ্ট্য। আমি-রেণু-জয়া একত্র হইয়া বাহির হই। কিছুপরে চিদানন্দ আসে। সে বাথগেটে ও কুমারেশে গিয়াছিল। গ্রেসে প্রফেসর দিয়া আসিয়াছে। বাথগেটের বিজ্ঞাপন নিয়া আসিয়াছে। ৯টার সময় চলিয়া আসি। রেণু আশ্রম পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসে। ঘরের মধ্যে আমি যেমন ঠাকুরকে 'অধিকতর' নিকটে পাইবার জন্য ব্যগ্র, ইহাদিগকেও তো নিকটতর পাইবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল। বীরেন ব্যানার্জী আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্র গীতা প্রচারের একটী কমিটী করিতে চান, আমাকে তাহার সভাপতি করিতে চান। আগামী সোমবার বসা সভা হইবে। পরে শুক্রবার শনিবার আমাকে সঠিক জানাইবেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর

ভোরে প্রার্থনার পর নিত্যব্রতসহ বীরেন ব্যানার্জীর বাসায় যাই দেশপ্রিয় পার্কের ওখান হইতে বাসে দাঁড়াইয়া। ...বীরেনের ওখান হইতে অফিসে যাই। রেণু ৯টার পর বাহির হইয়া যায়। চিদানন্দ মেট্রোপলিটান এবং ইণ্ডাস্ট্রীয়ার বিজ্ঞাপন নিয়া আসে।...কেহ আসিবে না, অথচ কৈফিয়ত। চিঠি লিখিয়া সত্যব্রতকে আনিতে পারি নাই, নীহার আসে না। রাত্রি ৯টার পর আশ্রমে ফিরি, রেণু মোড় পর্যন্ত আসে। মোড়ে সুহাস সেনের সঙ্গে দেখা। ..

২৬শে সেপ্টেম্বর

...ভোগও যে ব্রহ্ম, ঠাকুর তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সেই 'ভোগ' তাঁহার সন্তানদের বর্তমানে দুর্ভোগে পরিণত হইয়াছে। এই ভোগকে কোন্ কৌশলে যোগের

সঙ্গে সমন্বয় করা যায়, সেই কৌশল হৃদয়াইয়া দিতে পারিলে ঠাকুরের সম্প্রদায় দাঁড়াইতে পারে। যোগের দেশে, ত্যাগের দেশে ভোগবাদকে ত্যাগের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে চাহিলেও প্রথমে ভোগের কিছু ব্যভিচার হওয়া স্বাভাবিক। ভারতীয় সভ্যতার বুকে নিত্যগোপালের দর্শন 'বোমা'র মত মুসাফিরখানা। ঠাকুর শক্তি দিন, সহায় হউন, চরম বিপর্য্যয় হইতে বিশ্বকে রক্ষা করুন। রাত্রি ১০টায় পর আশ্রমে ফিরি, রেণু মোড় পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া যায়। প্রতিভা ৪টায় এখানে আসে।

২৮শে সেপ্টেম্বর

রেণু ৮টার পর আসে।...এর সঙ্গে খোলাখুলি কথা হয়। ব্যবধানে থাকা ছাড়া বর্ত্তমানে পারিপার্শ্বিক মঙ্গল অসম্ভব।...রেণু দুপুরে আসে না। সে কলিকাতা বহু স্থানে ঘুরিয়া ফেরে ৭॥ টায়। আমি ও প্রতিভা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আফিসে যাই।...নীহার আফিসে আসে ৮টার পর। দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে কিনা জানিতে চায়। আরও কটায়ও বেশী থাকে। পত্রিকা সম্বন্ধে কথা হয়। এখন পর্য্যন্ত পূজার জন্য ৩১। পূজা বিজ্ঞাপন হইয়াছে।...মাধবী রোজ ঠাকুরের কাছে বসিত, ঠাকুরের নাম নিত।...আজ কাল বিকৃত; তাই এই শিশু-মৃত্যু। কাল-বিকৃতির মূল কারণ (১) কালকে ডিঙাইয়া কালাতীতে যাওয়ার সাধনায় কালের উপর পড়িয়াছে প্রকাণ্ড চাপ; তাই কাল বিকৃত, (২) যে কালের কর্ম্ম সে-কালে না-করার মনোবৃত্তির ফলেও কাল এলোমেলো, জীবন বিশৃঙ্খল; তাহাতেও কাল বিকৃত। সময়ানুবর্ত্তিতা উঠিয়া গিয়াছে। কালের কাছে অপরাধ অর্থ-ই জীবনের স্পন্দনের কাছে অপরাধ। জীবন-স্পন্দনই আজ বিকৃত; দেহ বিকৃত, খাদ্য বিকৃত। কাল-বিকার দেহ-বিকার ও খাদ্য-বিকার দূর হইলে অকাল মৃত্যু উঠিয়া যায়। ৯টায় পর আসি। রেণু মোড় পর্য্যন্ত আসে।

২৯শে সেপ্টেম্বর

রেণু সকালে...দমদম গ্রামোফোন কোংতে গিয়া বাসায় আসে, পরে ১২॥টায় পর অন্যান্য স্থানে যায়। প্রতিভা দুপুরে আসে নাই। আমি একাই অফিসে যাই। বেশ বৃষ্টি হয়। আমার অফিসে যাওয়ার পর রেণু আসে, তাহার পর প্রতিভাও আসে। যমুনা আসিয়াছে। মাখনবাবু ৮॥টায় পর আসে। আমি ৯টায় পর ফিরি, রেণু মোড় পর্য্যন্ত আসে। ...ধীরেনবাবুর চিঠি আসিয়াছে শৈলেন বাবুর বাসায় সোমবার ৮টায় গীতাপ্রচার প্রতিষ্ঠানের সভা হইবে। আমাদিগকে সেখানে যোগ দিবার জন্য জানাইয়াছে।...

৩০শে সেপ্টেম্বর

...যে আগ্রহ লইয়া ধীরেন যাওয়া আসা করে, তাহার ভিতর দিয়া ঠাকুরের স্নেহস্পর্শই উপলব্ধি করি। অন্য দেখিয়া ঈর্ষ্যিত হইয়া রেণুকে আসিতে চিঠি দেই। ইহা বুঝিতেছি, যদি এই প্রকৃতির বুকে কোনও একটি প্রকৃতি পরা প্রকৃতি বনিয়া গিয়া আমার জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে সারা অপরা প্রকৃতির ক্ষেত্র পরা প্রকৃতির ক্ষেত্রে পড়িয়া উঠিতে পারে। উমাঙ্গিনীর জীবনে প্রকৃতির যতখানি 'পরা' ভাব ছিল, ততখানিই আমি অপরা প্রকৃতির ক্ষেত্র জয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। কোন ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হইলেই 'রাধারাণী'র কথা বিশেষ ভাবে মনে হয়। তিনিই পরাপ্রকৃতি। নিজ জীবনের প্রকৃতি পরা হউন, তাঁহার স্পর্শে বহিঃ প্রকৃতিও পরা হউন। ...যেখানে পরস্পর পরস্পরের গুণে মুগ্ধ, পরস্পরই যোগ্য, সেখানে সাধনা সুরু হইতে পারে সমানে সমানে; কিন্তু যেখানে পারস্পরিক তারতম্য রহিয়াছে, সেখানে ভক্তিভাবের সাধনা নিতেই হইবে। ভক্তি-প্রেম মিলিত সাধনাও সম্ভব। রাধা গোবিন্দের ছিল প্রেম সাধনা। ভক্তির মধ্য দিয়া ছাড়া সবল কিছুতেই দুর্ব্বলকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সবলে দুর্ব্বলে প্রেম সাধনা সুরু হইলে দুর্ব্বল সব সময়ে সবলের কাছ হইতে সুযোগ লইয়া দুর্ব্বলতাকে আরও শক্ত করিয়া ফেলে। ভক্তি অভিধেয়, প্রয়োজন প্রেম, সম্বন্ধ কৃষ্ণ।...মাখনবাবু আসিয়া কিছু কাগজপত্র লিখিয়া

যেন। দুপুরে আমি প্রুফ দেখি।...

১৩ই অক্টোবর

...রেণু আসে ১২টার পর। আমি ও রেণু ২।০টার পর ট্রামে বালিগঞ্জ যাই; ৩-২৫-এর গাড়ীতে চাকুরিয়া পৌঁছি, শৈলেনবাবুর (ধীরেনবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) বাড়ী যাই; টোকা যেই, দুয়ার খুলিয়া যেন। শৈলেনবাবু আসেন। তখন কেহ আসে নাই। ধীরে ধীরে ব্রজেন বাবু, ধীরেন মজুমদার, নকুলেশ্বরবাবু, ধীরেনবাবু, ধীরানন্দ, অমরবাবু, রবীন ও আরও একটী যুবক আসে। সভার কাজ আরম্ভ হয় ঠিক ৪টায়। ব্রজেনবাবু সভাপতি হন। প্রথমে রবীন্দ্র গীতাপ্রচার প্রতিষ্ঠানের এতদিনকার কার্যবিবরণী, পরে নূতন কার্যকরী সমিতির নাম প্রস্তাবিত হয়। আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়, ধীরেনবাবু সম্পাদক ও রবীন্দ্র সহ সম্পাদক। ধীরানন্দ ও ব্রজেনবাবু সহ সম্পাদকদ্বয়। প্রথমে আমাকে গান্ধী জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হয়। আমি বলি, ঠাকুরের যে স্বরূপ-বিশ্লেষণ সময়ের আদর্শ পাইয়াছিলাম, তাহা জ্ঞানগত থাকিত যদি না মহাত্মাজীর স্পর্শ পাইতাম। মহাত্মাজীর আন্দোলনকে আমার বেদান্তের কার্যকরী আস্বাদন রূপেই বরণ করিয়াছিলাম। নিত্যগোপালের পরে গান্ধীজী ছাড়া আর কোন পুরুষকে এতখানি আপন মনে করি নাই। তাঁহার জীবনে কোঠা-ভাঙ্গ ছিল না। উদ্বোধন ভারতের দ্বারী তিনি—তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই উদ্বোধন ভারতে প্রবেশ করিতে হইবে। রেণু ৪।০টায় রওয়ানা হইয়া ৬।০টায় কমলালয়ে যায়। সেখান হইতে ৭।০টায় পর ফেরে। ধীরেনবাবু আমাকে আফিস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যেন। যামিনী সোম্যানী ও ও নারায়ণ আসে। নারায়ণকে মিষ্টি খুব খাওয়ানো হয়।...চাকুরিয়া যাবার পর কাঁথির প্রথম স্যানার্থী ও বসন্ত দাস আসিয়াছিলেন পূজায় সেখানে যাবার কথা বলিতে।

২রা অক্টোবর

...আমি ৭টার পর রেণুর ওখানে যাই। প্রিমিয়ারে আজ যাইতে হইবে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। রেণুর মনে ছিল না। প্রমথবাবু ফোন করেন আমি তখন আফিসে। আমি ও রেণু একত্র হইয়া বাহির হই। সে যায় টালিগঞ্জে শক্তি উষধালয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে, পরে প্রেসে; আজও সে বাসায় যায় না। আমি আসিয়া প্রমথবাবুর কাছে ফোন করি ও জানাইয়া দিই যে এদিকের একটু স্থিতি না হইলে আবার এ স্থান ত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না। আমি ত কোনদিন না বলি নাই। এবারকার যাহিত্ব আমি কিছুতেই বর্জন করিতে পারিব না। পারিনা পর্যন্ত গেলাম না। রেণু আসিয়া আমার ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও প্রেসে যায় এবং ৬।০ টায় পরে আফিসে ফেরে। প্রতিভা আসে সোয়া৭টায় ...তি, পি, করিয়া ২টার পর। সে ও আমি ৪টার পর আফিসে যাই। সন্ধ্যার পর সৌম্যমোহন সাহা আসে। প্রতিভা আফিসে আসিয়া রামানুজের ব্রহ্মসূত্রখানি নিয়া রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউটে দেখতে দিয়া আসে...

৩রা অক্টোবর

...রেণু ৭টায় পরেশ বাবুর ওখানে হইয়া কীর্তায়, পরে বাসায় আসা, আবার কীর্তায়-পরে প্রেস প্রিমিয়ার আবার প্রেস হইয়া প্রায় ৭টায় ফেরে। প্রতিভা ২টায় এখানে আসিয়া আফিসে attend করে। পরে ১০-১০ ফি প্রেসে গিয়া প্রুফ দিয়া আসে। সে আবার আসে ৩টার পর। অধ্যাপক অতুল সেন ফোন করে ও ৪॥০ টায় আসে।...সে আশ্বিন হইতে উদ্বোধন ভারতের গ্রাহক হয়।...প্রায় ১০টায় আশ্রমে ফিরি। .. যে আসক্তি ব্যবধানকে অস্বীকার করিয়া একান্ত অব্যবধানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্থিতিলাভ করিতে চায়, তাহা নিছক কাম। প্রেম ঘুরেও ঠেলিয়া দেয়।

৪ঠা অক্টোবর

সকাল ৮টায় রেণুর ওখানে যাই। সুবোধ সে আসে।...সুধাংশু আমি ১১।০ টায় চলিয়া আসি।' রেণু

১২টায় প্রেস হইয়া প্রিন্সিয়ারে প্রুফ দেখাইয়া আবার প্রেসে ও আশুবাবুর ওখানে গিয়া ৫টায় বাসায় ফেরে…। সন্ধ্যার পর রবীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (চাকুরিয়া) আসে। সে প্রায় ২ ঘণ্টা থাকে। সে ৪টি গান গায়। একটি 'বহুদূর আসিছে ধূলায় আঁধিনায়' ইত্যাদি। ও বার গাহিতে বলিলাম। বেশ গান, গায়ও বেশ। ছেলেটির সঙ্গে কিছু কথাও হইল।…সে বলিল 'আমি পথের খোঁজ পাইলাম।'…রাত্রি ৯টায় পর আশ্রমে আসি।

৫ই অক্টোবর

…৯৷৷০ টায় পর রেণু সুবোধ সে-র সঙ্গে তাহাদের মহারাজজীর ওখানে যায়। একজন গ্রাহকের টাকা পায়, ১ জনের নামে ভি, পি করিতে হইবে।…সকালে ব্রহ্মমন্ত্রের ১৩শ বর্ষের প্রুফ দেখি। রেণুও ঘুপুরে দেখে।… প্রতিভা দো-টানায় পড়িয়া অবস্থিতি বোধ করিতেছে।…

৬ই অক্টোবর

রেণু…প্রেস ও আশুবাবুর ওখানে যায়। পরে বাসায় ফিরিয়া খাইয়া ২ কপি আশ্বিনের উজ্জলভারত লইয়া ১টায় আসে। এবারকার উজ্জলভারত প্রবন্ধ-গৌরবে সমুজ্জল হইয়াছে, বিজ্ঞাপনও যথেষ্ট। রেণুরই ইহা কৃতিত্ব।… রেণুকে বলিয়াছিলাম, মানুষের সঙ্গে কোনও বিষয়ে সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি হইলে উহাকে এড়াইয়া সামনে আগাইয়া গেলে ও উপরের স্তরে, ব্যাপকের স্তরে উঠিতে পারিলে সঙ্ঘর্ষ প্রীতিতে গড়িয়া উঠিতে পারে। মানুষের সঙ্গে নীচের স্তরে দাঁড়াইয়া হুড়োহুড়ি করিলে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়। অথচ সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা ছাড়া গতিও নাই। সে প্রতিপক্ষকে মুছিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। প্রতিভা প্রায় ৩টায় আসে।…৪টার পর উজ্জলভারত দিয়া যায়। আঠা তৈয়ার করিয়া প্রতিভা ব্যাপার লাগানো আরম্ভ করে। কিছু পরে রবীন আসে। তাহার পর কালিদাসবাবু, তাহার পর রাইহরণবাবু। মাখনবাবুও আসে।…রবীন আমার সঙ্গে ৯৷৷০টায় পর আশ্রম পর্যন্ত আসে। সে আফিসে বসিয়া 'শ্রীনিত্যগোপাল ও উপনিষদের প্রাণদর্শন' এবং 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি' আমাকে শুনাইয়া পাঠ করে।…

৭ই অক্টোবর

৬৷৷০টায় পর আফিসে যাই।…১২টার পূর্বে ফিরি।… ১৷৷০টায় পর নলিনীসহ আফিসে যাই। তখন রবীন্দ্র ও প্রতিভা আসিয়াছে। রবীন ব্যাপার লাগায়।…মালতী আসে, টিকেট লাগাইয়া যায়।… সন্ধ্যার কিছু পরে সন্তোষ আসে।…রবীন গ্রাহক হয়…

৮ই অক্টোবর

সকালে আফিসে যাই। রেণু ও প্রতিভা সোয়াফিসে উজ্জলভারত দিয়া আসে; উহারা আসিলেই আমি চলিয়া আসি।…সে (বীরেন ডাক্তার) ও আমি নন্দরাণীকে লইয়া ইন্সিওরেন্সে যাই ১২টায়।…রেণু কলেজ স্কোয়ারে ফিলগুলি দিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা আনিতে যায়। এখানে ফেরে ৪টায়। প্রতিভা ৩টায় জয়ার ওখানে, মহা-নির্ব্বাণ মঠ, সীতাভবনে কাগজ দিয়া প্রায়-৭টায় ফেরে। আমি সকালে হেমন্ত, হৃষীকেশ দাস ও বিধু দালের কাগজ দিয়া আসি। বেয়ারার হওয়া ছোট কাজ কিসে? আমি পত্রিকা দিতে গিয়াছি বলিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত।… সকালে সন্তোষ আফিসে আসিয়াছিল। তাহার অল্প অল্প অর্শ হয়, সাবধান হইতে বলি। আমি বলি, 'তোমার অশ্ব উষধি হই'। সে বলে, 'তবে আসিব না'। আমি বলিলাম, 'আসিবে, অসুখের কথা বলিবে; আমরা যাহা ভাল বুঝি বলিব, তুমি তদনুসারে চলিবে। না আসার অর্থ আরও বেদনা দেওয়া'। মানুষ যেন কেমন উল্টা করিয়া ভাবে।…

৯ই অক্টোবর

…প্রতিভা সকালে আসিয়া আফিসের কাছের পত্রিকা-গুলি বিলি করে, ১০টার পর ঘুমিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়ন-এর পত্রিকা ও সোয়াফিসে উজ্জলভারত দেয়। পরে ১২৷৷০ টার পর রেণু ও প্রতিভা বাহির হইয়া

তালহৌসীর পত্রিকাগুলি দেয়। প্রতিভা ৬টার মধ্যে ফেরে। রেণু···মেট্রোপলিটান, ইউনাইটেড্ প্রভিডিয়াল কোং প্রভৃতি ঘুরিয়া ৬।০টার পর আসে। এদিকে মৃণাংশু আসে।···মালতী আসে···।···রবীন আফিসে আসে।···

১০ই অক্টোবর

···আমি মন্মথবাবুকে উদ্বোধন দিয়া আসি···। রেণু ১টার পূর্বে · সুহৃৎবাবু, বীথির স্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া এখানে আসে। ২টার পর ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। সেদিনকার প্রসিডিংস-এর বাংলা অনুবাদ দেখাইতে। কিছুটা পরিবর্তন করিয়া দিলাম। প্রতিভা ২টায় আসে। জয়া তাহার মা-সহ ৪টার পর আসে। রাত্রি ৯টায় উহারা ট্যাক্সীতে যায়। আমি উহাদের সঙ্গে গিয়া অফিসে নামি। জয়ার মায়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়।···স্বামীর দেহত্যাগের সময় যে 'মন্ত্র' তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, সে সেই মন্ত্রকেই নিজ মন্ত্র মনে করিতেছে, ইহা ঠিক হইতেছে কিনা এবং একজন বাহিরের প্রত্যক্ষ গুরুর মুখ হইতে তাহা পুনরায় নিবার প্রয়োজন আছে কিনা, ইহাই ছিল তাহার জিজ্ঞাসা। ভিতরের মন্ত্রকে কার্য্যোন্মুখ করিতে হইলে প্রত্যক্ষ কোনও মানুষের স্নেহস্পর্শ দরকার এবং উহারই নাম 'মন্ত্র চৈতন্য'। সে আমার কাছে ইহাই চায়। আমি তাহারই পাওয়া মন্ত্রকে আবার দিয়া দেই। সে আমাকে গুরু বলিয়া বরণ করিল।···অর্দ্ধোদয় স্নানে যোগ না দেওয়া, মা কালীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা অনেক কিছু আলোচনা হয়।··· আগামী রবিবার রবীন্দ্র সংস্কৃতি পরিষদের উদ্বোধন বেলা ৫টায়। ভারতবর্ষের সম্পাদক ফণীবাবু প্রধান অতিথি হইবেন। আমাকে যাইতে হইবে, যাইব বলিয়াছিলাম।···

১১ই অক্টোবর

খুব ভোরে মন্মথ ওখানে যাই···। সেখান হইতে অফিসে আসি।···অনরঞ্জন রায়ের একটা পোষ্টকার্ড আসে, পূজাসংখ্যার গীতা তাহার খুব ভাল লাগিয়াছে। আমার দেহমনপ্রাণ নাকি পুরুষোত্তমতত্ত্বে উঠিয়াছে।···সন্ধ্যার পর রবীন আসে। তাহার কাছে ছোট একটা ক্যামেরা ছিল। তাহাকে রেণু আমার ফটো তুলিতে বলে। সে রাজি হয়। তাহার সঙ্গে অনেক কথা হয়। গীতার শেষ প্যারা পড়িয়া লয়। একটি গীতাজয়ন্তী নেয়। পড়িয়া পড়িয়া যায় খাওয়ার ধর্ম পুরুষোত্তমের নয়, প্রকৃতির ক্ষয়ধর্মী রূপকে জয় করিয়া কমলা মূর্ত্তিতে গড়িতে গড়িতে আগাইয়া যাইতে হইবে। সমস্ত যুক্তির তাৎপর্য গঠনে, সৃষ্টি করায়। তিতিক্ষার অর্থও তাহাই। শক্তির অব্যবহারে এ দেশ ক্লীব, অপব্যবহারে ও অতিব্যবহারে ও দেশ ক্লীব। চাই শক্তি-স্বাচ্ছন্দ্য। ইহাতে দেহপ্রাণমন স্বচ্ছন্দ হইবে, সুস্থ হইবে। অহঙ্কারীর কাছে প্রকৃতির কালীরূপ, শরণাগত ভক্তের কাছেই তাঁহারই কমলারূপ। কামুকের ভোগ্যা প্রকৃতি কখনই নয়। একমাত্র মদনমোহনই প্রকৃতি ভোগ করিতে পারেন। সেখানেই প্রকৃতি কেবলা ও স্বচ্ছন্দ। ৯টায় আশ্রমে আসি। অফিসে হেরম্ববাবু ও মাখনবাবু আসেন।···

১২ই অক্টোবর

···রেণু ৯।০টার পর বাহির হইয়া ১টায় আসে, আবার খাওয়ার পর বাহির হইয়া ৪টায় এখানে ফেরে। প্রতিভা বেলা ১০টায় এখানে আসে, পোষ্টাফিসে যায়।···হিন্দু মিউচুয়ালের ম্যানেজার রেণুর নিকট বলিয়াছেন যে, আপনার সৎ বলিয়া বাজারে সুনাম আছে। ব্যবসায়ী হইয়াও 'সৎ' হইতে পারে, ইহার জন্য আপনার প্রতিষ্ঠা আছে। যাহারা প্রতিটী ঘটনায়, প্রতিটী মানুষের, প্রতিটী কর্ম্মের স্বরূপমূল্য, ব্রহ্মমূল্য স্বীকার করে ও কার্য্যে তাহা আস্বাদন করে, তাহারা নিশ্চয়ই সৎ। এরূপ মানুষ বর্ত্তমানে দুর্লভ। নিজের হাতে উদ্বোধন বিলি করার অর্থও ইহাই। মায়ের হাতের রান্না, আর চাকরের হাতের রান্নাও যা, বেয়ারার দিয়া পত্রিকা বিলি করা আর নিজেদের হাতে বিলি করাও তা। তবে কাজ যখন ব্যাপক হইবে, তখন অবশ্য মানুষের সাহায্য নিতেই হইবে—ছোট কাজ বলিয়া নয়। সংসারে ছোট কিছু নাই, সব ব্রহ্ম।···

১৩ই অক্টোবর

গোবিন্দ সিংহের ইসলাম-নিরীক্ষা

॥ শ্রীযতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় ॥

কদা অহেন্ মুখেন্ অহা মগহা।

ঋগ্—৪৮—১০

আমি কবে এই মঘ (পার্সী-মংঘ) হইতে মুক্তি (মুক্তি-পূজা) দূর করিতে পারিব?

মহামুনি নানক ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের নিকটবর্তী তালবন্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে উহা একটি স্মরণীয় দিন। কারণ হিন্দু-পার্সী পুনর্মিলনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, সদ্-গুরু নানক আর্য্য জাতির হৃতগৌরব ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, তখন তিনি কতক-দিনের জন্য মুলতানপুরে, তাঁহার ভগ্নিপতি জয়রাম দাসের বাড়িতে বাস করিতে ছিলেন। একদিন তিনি নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, সন্তঘাট নামক ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময় তিনি ভাব সমাধিতে আবিষ্ট হইলেন। অধ্যাত্ম-রাজ্যের সকল রহস্যই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল, কিরূপে তাহা প্রচার করাই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই মহা-প্রেরণার তারিখ ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট।

যে ধর্মমত তিনি প্রচার করিলেন তাহার বৈশিষ্ট্য—একেশ্বরবাদ, নিরাকারোপাসনা আর জাতিভেদ রাহিত্য। বহু শতাব্দী পূর্বে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মেরও তিন হাজার বৎসর পূর্বে, ভগবান জরথুস্ত্র পারস্যদেশে যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাহার সহিত ইহার বিস্তর সাদৃশ্য রহিয়াছে, মূলতত্ত্বদ্বারা বিচার করিলে পার্থক্য খুবই কম। ভগবান জরথুস্ত্রের মতবাদকে পারস্যে নাম দেওয়া হইয়াছিল মজ্‌দা-ধর্ম, আর ভারতীয় ধর্মধারাকে তাঁহারা বলিতেন দেব-ধর্ম। ভারতবর্ষে ইহাদের নাম ছিল যথাক্রমে শিষ্যান আর দেবযান। স্বরূপের বিভিন্ন হইলেও মজ্‌দা-ধর্ম ও দেবযান, ইহারা উভয়েই এক বৈদিক সাধনারই দুইটি অঙ্গ। অথর্ববেদের ভার্গবশাখা মজ্‌দা-ধর্মের, আর আঙ্গিরস শাখা দেবযানের সমর্থক।

একেশ্বরবাদ, নিরাকারোপাসনা এবং জাতিভেদ রাহিত্য, ইহারা ইহুদি ধর্মেরও প্রধান লক্ষণ, কিন্তু খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে ইহুদি ধর্ম হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু গোড়াতে এই গুণগুলি ইহুদি ধর্মে ছিল না। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ইহুদিগণ 'বা-আল' 'এষ্টরথ' প্রভৃতি বিবিধ দেবতার পূজা করিত। এই সকল দেবতাদের আকৃতি কাহারও বা ছিল নাগের মতন, কাহারও বা গরুর মতন। এমন কি ইহুদি ধর্ম-প্রবর্তক মুসাও স্বয়ং গোমূর্তিতে ঈশ্বরের পূজা করিতেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে বাবিলনের অধিপতি সম্রাট নেবুকাদনেজ্জার পেলেস্তান জয় করেন, এবং নেতৃস্থানীয় সমস্ত ইহুদিগণকে বন্দি করিয়া বাবিলনে লইয়া যান। ৫৩৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে পারস্য সম্রাট মহারাজা কুরু (গ্রীকদিগের Cyrus) বাবিলন জয় করেন, এবং ইহুদি নেতাদিগকে পেলেস্তানে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দেন। জরথুস্ত্রপন্থী পারসিকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া ইহুদি নেতাগণ একেশ্বরবাদ ও নিরা-কারোপাসনার শিক্ষালাভ করে, কিরে দেশে ফিরিয়া গিয়া তাহারা এই নূতন মতবাদ ইহুদি সমাজে প্রচার করিতে থাকে। প্রসিদ্ধ নবী এজেকিয়েল এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায়ই ইহুদিগণ একেশ্বরবাদী ও নিরাকারোপাসকে পরিণত হয়। (Macdonell—Comparative Religion—P 128).

ইহুদি জাতির পুনর্গঠন বিষয়ে সম্রাট কুরুর এই সহায়তার কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার নাম বাইবেলে

কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। (ইসাহ—৪৪-১)। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টানপন্থা বা ইসলাম তো নহেই ইহুদি ধর্মও একেশ্বরবাদ এবং মূর্তি পূজা রাহিত্যের উৎপত্তিস্থল নহে। জেন্দ-আবেস্তা অর্থাৎ অথর্ববেদের ভার্গব শাখাই একেশ্বরবাদের মূল উৎস।

মহামুনি নানকও একেশ্বরবাদ, নিরাকারোপাসনা এবং জাতিভেদ রাহিত্য প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে এই তত্ত্বগুলি অথর্ববেদের অনুশাসন, এবং কলিযুগে অথর্ববেদই যুগোপযোগী শাস্ত্র। তাই তিনি বলিয়াছেন "কলিমহি বেদ অথর্বণু হুআ" (রাগ আশা-মহল্লা ১)। অর্থাৎ কলিযুগে অথর্ববেদই বেদ, এই বেদের অনুশাসনই কলিতে মানিয়া চলিতে হইবে। ইসলামও ইহুদিপন্থার মাধ্যমে এই রীতিগুলি জেন্দ-আবেস্তা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই নানক-প্রচারিত ধর্মমতের সহিত ইসলামের প্রচুর সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সাদৃশ্য এত প্রবল যে আহম্মদী (কাদিয়ানী) সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মির্জা গোলাম আহম্মদ তাহার 'সত্-বচন' নামক উর্দু পুস্তকে দাবী করিয়াছেন যে 'গুরুগ্রন্থ সাহিব' কোরাণশরিফের ভাষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু পাকিস্তানের জাতীয় কবি ইকবাল পর্যন্ত মহামুনি নানককে "পূর্ণ পুরুষ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কিস উঠী সদা তৌহিদকী পঞ্জাবসে
হিন্দকো এক মর্দ্-এ কামালনে জাগায়া খ্বাব সে।
(বাঙ্-এ দেরা)

পুনরায় অদ্বয়ত্বের ধ্বনি পঞ্জাব হইতে উঠিল, একজন "পূর্ণ-পুরুষ" ভারতকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিলেন।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য বলিয়া যাহা উল্লেখ করা হয়, একেশ্বরবাদ, মূর্তিপূজা পরিহার, জাতিভেদ রাহিত্য, গুরু নানকের ধর্মমতে তাহা সবই আছে, পরন্তু ঐ ধর্মমত গ্রহণ করিলে আর্যশাস্ত্রের প্রতি—বেদ বেদান্ত গীতার প্রতি—অহৈতুক বিদ্বেষ পোষণ করিতে হয় না, এই জন্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পঞ্চনদবাসীগণ দলে দলে আসিয়া নানকের ধর্মমত গ্রহণ করিতে লাগিল।

একশ্রেণীর মুসলমানের পক্ষে এই অবস্থা অসহনীয় বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা মনে করিলেন নানকের ধর্মমতদ্বারা ইসলামের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইতেছে। একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিলে, তাঁহারা মনে করিতে পারিতেন যে, ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে যে সমস্ত মূল-তত্ত্বগুলি জগতে প্রচার করাই ইসলামের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা, নানকপন্থাও সেই তত্ত্বগুলিই প্রচার করিতেছে। অতএব নানকপন্থার সহায়তা করাই তাহাদের পক্ষে সঙ্গত হয়। পরন্তু একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া তাঁহারা ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবন চরিতে লিখিয়াছেন "যেহেতু কেবল হিন্দুরা নয়, কতকগুলি নির্বোধ মুসলমানও নানকের ধর্মমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, অতএব এই সম্প্রদায়কে আর বাড়িতে দেওয়া চলে না"। তখন পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব শিখ সম্প্রদায়ের বিনায়ক। জাহাঙ্গীর হুকুম দিলেন তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। গুরু অর্জুনকে গরম বালুর উপর তপ্ত করা হইল, দগ্ধ করা হইল, এবং পরে রাভির জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে, ধর্মের জন্য আত্মত্যাগ করিয়া অর্জুন দেব শহীদ হইলেন।

কিন্তু এই নৃশংসতাদ্বারা শিখধর্মের প্রসার রোধ করা গেল না। গুরু অর্জুনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী গুরু হর-গোবিন্দ নির্দেশ দিলেন যে অতঃপর শিখদিগকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে হইবে।

গুরুর গোবিন্দ সিংহ এই শক্তি-সঞ্চয় যজ্ঞে পূর্ণ আহুতি দান করেন। ১৬২১ শকাব্দের ১লা বৈশাখ (এপ্রিল ১৬৯৯) তিনি "সিংহ-চক্র" অথবা খালসা-সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। এই দিনকে স্মরণ করিয়া শিখগণ বৈশাখী উৎসবের অনুষ্ঠান করে, তাহা শিখদিগের একটী প্রধান পর্ব। শিখ-সংঘ ক্রমে ক্রমে এত শক্তিশালী হইয়া উঠিল যে, পঞ্জাব হইতে মোগল প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইংরেজ যে পঞ্জাব জয় করেন, তাহা করেন শিখের নিকট হইতে, মুসলমানের নিকট হইতে নহে।

চক্রপাণি গোবিন্দ সিংহকে অনেকে কেবল যুদ্ধের

সেনাপতি বলিয়াই জানেন। তিনি যে সংস্কৃত, হিন্দি ও ফারসি ভাষায় বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন তাহা অনেকের নিকটই অপরিজ্ঞাত। গোবিন্দ সিংহ শ্রীমদ্-ভাগবত পুরাণের দশমস্কন্ধ আর দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী সংস্কৃত হইতে হিন্দি (গুরুমুখী) পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ দশমগ্রন্থ অর্থাৎ গুরুগ্রন্থ সাহেবের দ্বিতীয় ভাগে সংরক্ষিত আছে। আর ঔরংজেবের ধর্মান্ধতার যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া তিনি পারসিক পদ্যে যে পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন তাহার নাম জাফর-নামা (বিজয়-পত্র)। জাফর নামা একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হিন্দি ও ফারসি এই উভয় ভাষায়ই, তাহার রচনা পদ্যাত্মক, আর তাহা শুধু পদ্যই (verse) নহে, তাহা কবিতা (poetry)।

গোবিন্দ সিংহ একজন অনুপ্রেরিত অবতার পুরুষ ছিলেন, তাই হিন্দু ও পার্শী সাধনা তাঁহার ভিতর ওত-প্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল।

ভগবত্ প্রেরণার সহিত পাণ্ডিত্যের সম্পর্ক সুপ্রকট নহে। অনেক মহান্ ধর্মনেতা লেখা পড়ার চর্চা তেমন করেন নাই। পরমহংস দেবের কথা সকলেই জানেন। মহর্ষি কবীরও বিদ্যা-বিহীন ছিলেন। হজরত মহম্মদকে তো কোরাণে (সুরা ৭-১৫৬) "উম্মি" (নিরক্ষর) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু পাণ্ডিত্য অনুপ্রেরণার পরিপন্থী নহে, মহাপ্রভু চৈতন্যের জীবন হইতে ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

গুরু গোবিন্দসিংহ পারদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বলিয়াছেন যে, তন্ত্রের সমন্বয়কে এক হিসাবে গীতার সমন্বয় অপেক্ষাও অগ্রসর বলা চলে। গীতায় সাংখ্য ও যোগের (কর্মত্যাগ ও কর্মগ্রহণের) মধ্যে সামঞ্জস্যের দিকেই বেশী লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। আর বাধাকে যেমনে সহায়তায় পরিণত করা যায়—stumbling blockকে stepping stoneএ পরিণত করা যায়—তন্ত্র তাহার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এমন কি মদ্য ও মাংসাসক্তদিগকেও তন্ত্র একেবারে তাড়াইয়া দেন নাই। তাহাদিগকেও কালীমন্দিরে ডাকিয়া আনিয়া ক্রমশঃ সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। পশ্বাচার হইতে দিব্যাচারে উন্নীত করাই তন্ত্রের কামনা, কোনও ধাপাই তাহার পক্ষে অনতিক্রমণীয় নহে। তাই তন্ত্রের সাহায্যে রেজ্ঞ দিগকেও সহজে বেদের গণ্ডীভুক্ত করা যায়। সর্ববিধ বিরোধের অবসান তন্ত্রের লক্ষ্য ছিল। গোবিন্দ সিংহ তন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তাহা সুচিত করিবার জন্য, মূর্তিপূজার প্রবল বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি পাটনার পীঠের অন্তর্ভুক্ত নয়নাদেবীর মন্দিরে, একটী বিরাট শক্তিপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্জাবী ভাষার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "গুরু-প্রকাশ-সূর্য্য"-তে এই পূজার বিশদ বিবরণ বর্ণিত আছে। অবশ্য গীতাই ছিল গোবিন্দ সিংহের জীবনের মূল সূত্র। পাছে মূলের গাম্ভীর্য নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে তিনি গীতাকে পদ্যে অনূদিত করেন নাই, হিন্দি গদ্যে অনূদিত করিয়াছিলেন।

ইসলামের শক্তির মূল উৎস কোথায় তাহা তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। একেশ্বরবাদ মূর্তিপূজা পরিহার, জাতিভেদ রাহিত্য, ইহারা ইসলামের শক্তি-শালিতার হেতু নহে। কারণ এই লক্ষণগুলি ইহুদি ও খ্রীষ্টান ধর্মতন্ত্রেও তুল্যভাবেই বিদ্যমান। তথাপি এই দুইটী ধর্মপন্থা ইসলামের মতন প্রতাপশালী হইতে পারে নাই।

ইসলামের শক্তির মূল কারণ তাহার সংঘবদ্ধতা। আর সংঘ-বন্ধনের মূল কথা গুরু-গ্রন্থ নিষ্ঠা—একটীমাত্র গুরুগ্রন্থকে সর্বমান্য বলিয়া গ্রহণ করা। ইসলাম সেই বৃত্ত যাহার কেন্দ্র হইল কোরাণ। কোরাণকে যে গ্রহণ করে, সেই মুসলমান—সে সিয়াই হউক আর সুন্নীই হউক, হানিফীই হউক আর ওয়াবীই (Wahabi) হউক। কোরাণকে যে গ্রহণ করে না, সে মুসলমান নয়। ইসলাম-চক্রের কেন্দ্রস্থানীয় কোরাণের সহিত সংযোগ যাহাতে সাধিক হয় এবং অবিচ্ছিন্ন থাকে, এই অভিপ্রায়ে সাপ্তাহিক জুম্মা-নমাজের সময় আরবিক ভাষায় কোরাণের আবৃত্তি ইসলামে আবিশ্যিক (Compulsory) করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্রমশঃ

বিদ্যোৎসাহী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ ॥

যে সকল মনীষী মাতৃভূমি দেশের অপূর্ণ কল্যাণ সাধন করিয়া স্বদেশমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, বিদ্যোৎসাহী ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। বিদ্যানুরাগ তাঁহার ছিল অসাধারণ, জ্ঞানস্পৃহা তাঁহার ছিল অপরিসীম। জ্ঞান প্রচারে তাঁহার প্রাণ কৃতী সন্তান অতি অল্প দৃষ্ট হয়। বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জনে নিজে কৃতকার্য্য হইয়া অপরকে জ্ঞান-ব্রতী করিবার বাসনা ছিল তাঁহার জীবনের মাতার সেবা-ধর্ম্মের অন্যতম আদর্শ। চিরকাল পুস্তক পাঠে ও পুস্তক রচনায় তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা বিশেষ দুঃখ-পীড়িত, তাঁহার পাঠস্পৃহা প্রচারের আমরা সাধনা কামনা করি।

ভাগীরথীর উত্তর প্রদেশে পুণ্যসলিলা ভাগিরথী তীরে বিদ্যাপুর নগরী শিল্প-প্রধান স্থান। ইহা যেমন বাণিজ্যের কর্ম্মকোলাহলের বিস্তৃত নগর। কর্ম্মকুশলী অধ্যাপক প্রমথনাথ এই কর্ম্মময় স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে।

কলিকাতায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তিনি অনেক জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। শিক্ষালাভ করিবার কালে তাঁহার বুদ্ধি ছিল প্রখর। বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ তাঁহার গ্রহণশীল মন দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। যৌবনকালে তাঁহার স্বপরিসর ও উজ্জ্বল ছিল বলিয়া বিবিধ জটীল বিষয় আয়ত্ত করিতে কষ্ট হইত না।

ভবানীপুর মন দেখিয়া অভিভাবকগণ যেমন আশান্বিত হৃদয়ে মন সন্তানপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন, শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দও তাঁহার মানসিক শক্তি, সুস্থ বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার বুদ্ধির স্ফুরিতে কোন সংকীর্ণ ধারণার আভাস পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মধ্যে অতি-নৈতিকতা ছাত্র-জীবনে অনেকে লক্ষ করিয়াছিলেন বটে, তবে জ্ঞান-স্পৃহা তাঁহার সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল বাল্যকাল হইতে। নিশ্চয়তার মধ্যেই তিনি নৈপুণ্যের সাধনা করিয়াছেন তরুণ বয়স হইতে, তাই শাস্ত্রজ্ঞের বরমালা তিনি লাভ করিয়াছিলেন সকল বিষয়ে। অর্থ, অনৈপুণ্য, অস্বাভাবিক দীর্ঘ-সূত্রতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। যৌবন সমাগমে তিনি সন্দেহের দুর্বহ ভার ছিন্ন করিলেন তাঁহার কাঙ্ক্ষিত ও লক্ষিত জ্ঞানাস্ত্রের দ্বারা।

বিলাতে গিয়া পরিবেশের রমণীয়তা ও বিদেশী জাতির শিষ্টাচারে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। অধ্যয়নের কঠোর তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারে নাই বিবিধ প্রলোভন, সামাজিক আচার ব্যবহার ও লোভনীয় ক্রিয়াকলাপ প্রবৃত্তি। লিপ্সা তিনি জয় করিয়াছিলেন জ্ঞান-জ্যোতির প্রাখর্য্যে চিত্তের নিবিড় সংযম শক্তিদ্বারা। পাশ্চাত্যের সভ্যতা বা সংস্কৃতি শিক্ষা, সহজ-জ্ঞান, জাতিগত স্বভাব, তার ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, এবং কিঞ্চিৎ ব্যয় সংকোচ, অসময়ে বিনয় ও সমবায়প্রীতা তাঁহার মনের সাধনা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল, তথাপি প্রাচ্য দেশের ও জন্মভূমির উদারতা, আতিথ্য ধর্ম, গভীর জ্ঞান ও নিষ্ঠার প্রতি তিনি ছিলেন আকর্ষিত। মৃদুতা তাঁহার চরিত্র হইতে স্পষ্টবাদিতা হরণ করিতে পারে নাই, কোমল প্রকৃতি হইলেও তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা।

লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স হইতে অর্থনীতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিপুল সাধনা বলে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থশাস্ত্রে ডি, এস, সি উপাধি লাভ করেন। অর্থনীতি বিদ্যার সম্পূর্ণ অধ্যয়ন ও অধ্যয়ন গবেষণা, ইহার বিচার ও মতামতাদি, অপেক্ষক (Function) ও উপকারিতা, বৈজ্ঞানিকভাবে বিবৃতি (exposition)

বিভিন্ন সূচক-সূত্র (exponential theorem) ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনি মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার সুবিস্তৃত ও চিন্তাপূর্ণ thesis যে কোন উপপাদ্য (theorem) ও ব্যাখ্যান-বস্তুর বিশ্লেষণের মূল পদ্ধতিকে পরিপূর্ণ এবং যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। অর্থ নৈতিক দর্শন শাস্ত্র ও মেয়ীয় পদ্ধতিবিদ্যার সম্বন্ধে নিবিড় উপলব্ধিমূলক প্রভাব যেমন গবেষণা বিষয়ে উপযোগী, তেমনই ছাত্রজীবনের গ্রন্থপাঠ মনের অনুকূল।

প্রবন্ধকার অনেক অধ্যবসায়-গুণে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস, সি উপাধি লইয়া আসেন। অর্থনীতি ছিল তাঁহার প্রিয় আলোচ্য বিষয়। তাঁহার আগ্রহ লক্ষ্য করে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদের নিযুক্ত হন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিবার আগেই ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু আদালতের মোহ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। আইনের জটিলতার উপর তাঁহার আকর্ষণ জন্মে নাই। দেশ-সেবার আদর্শ তাঁহার মনে প্রবল ছিল বলিয়া অধ্যাপনা তাঁহার জীবনের ব্রত রূপে দেখা দেয়। ১৯২০ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রিডার পদের সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করিয়া বহু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীর জ্ঞান সাধনার সাহায্য প্রদান করেন। অর্থনীতি ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ডাঃ প্রবন্ধকার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও সমগ্র দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই ঐতিহ্য পরে সুপ্রতিষ্ঠিত হন অর্জন করিয়া গিয়াছেন ডাঃ রাধাকমল ও সুপ্রসিদ্ধ বে, পি, সিংহরায় প্রভৃতি মনীষীগণ। সুদক্ষিত সিংহরায় মহাশয় প্রবন্ধকার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত উত্তর সাধক রূপে বিভিন্নবিধ গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া আছেন, যেমন The Evolution of the Indian Income Tax, The Co-operative Movement in Bengal। দেশের অগ্রতম সুসন্তান বে, পি, সিংহরায় ১৯৩৫ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। পরে Public Service Commission-এর সভ্য ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Council of Post Graduate studies (Arts)-এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া যাবতীয় গুরুত্ব-পূর্ণ কার্য্য সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করেন।

আমাদের কৃতী সন্তান ডাঃ প্রবন্ধকার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়া আছেন, তাহা এই গ্রন্থ লেখকের অনুকরণীয় কীর্ত্তি: A Study of Indian Economics এবং Fiscal Policy of India তাঁহার প্রখর গবেষণা শক্তি ও বিচারবোধ প্রকাশ করে। তদুপরি Public Administration in Ancient India এবং Provincial finance in India তাঁহার অসীম ধীশক্তি, অধ্যবসায় ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁহার রচনা যেমন সাবলীল ও সহজবোধ্য, যুক্তিধারা রীতি ও নীতিতে সোষ্ঠব সুন্দর ও প্রশংসনীয়। প্রতিভাবান প্রবন্ধকারের লিখিত History of Indian Taxation, An Introduction to the story of Indian Economics, Indian finance in the days of the Company প্রভৃতি মূল্যবান পুস্তকগুলি যেমন জ্ঞান-গরিমায় উদ্ভাসিত, তথ্যসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সৌষ্ঠব সুন্দর। তাঁহার ন্যায় অর্থনীতিবিদ্ যেন সকলই বিরল।

বিদ্যোৎসাহী প্রবন্ধকার বিলাত হইতে ফিরিয়া সিটি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপক প্রবর তখন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের পুরাতন ভবনের লাইব্রেরীতে প্রায়ই আসিয়া গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন। সাহিত্য-প্রেমিক বহু পুস্তক অধ্যয়ন করিবার জন্য লইয়া যাইতেন, সিটি কলেজের প্রবাসীর তাঁহার জ্ঞান তৃষ্ণা মিটাইতে পারিত না। অচিরে ছাত্র সমাজে, সংঘের ও সমিতি অধিবেশনে তিনি সভাপতি হইয়া উপদেশ দানে সবার মনে।

অধ্যাপক প্রবন্ধকার নিরলস প্রবন্ধরচনে উৎসাহবান করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা ছিল এক-আধারের। পুস্তক পাঠে তিনি যে মন্তব্য করিতেন তাহা ছিল অভিনবত্বপূর্ণ। তাঁহার প্রবন্ধ

পরিষদের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন বহুকাল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইলে রবীন্দ্রনাথ সর্ব সম্মতি ক্রমে ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন। সহঃ সভাপতিগণের মধ্যে ছিলেন—

১। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে, এ, চ্যাপম্যান।

২। এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোহান ভ্যান ম্যানেন।

৩। হুগলী জেলা লাইব্রেরী সমিতির সভাপতি কুমার মনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়।

৪। বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর প্রতিনিধি রায় আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর।

৫। শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী এম্, এ, বার এট, ল।

ইহার পরে উক্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে নির্বাচিত হইয়াছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সভাপতি এবং নিম্নলিখিত মনীষীগণ সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হন।

১। ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি এল সি (লণ্ডন) এম, এল, সি [সভাপতি নিখিল ভারত লাইব্রেরী পরিষৎ]

২। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার এম, এ [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

৩। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী বি, এ [ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল]

৪। কুমার মনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় [সভাপতি, হুগলী জেলা লাইব্রেরী পরিষৎ]

বিদ্যানুরাগী প্রমথনাথ গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার বিচক্ষণতা ও প্রাজ্ঞমতবাদ উচ্চ আদর্শের অনুগামী ছিল। সমগ্র পাঠানুরাগবৃদ্ধি ও অকৃত্রিম জ্ঞানানুশীলন এই আন্দোলনের ভিত্তি ভূমি তিনি মনে করিতেন। বৃহত্তম গ্রন্থাগার অপেক্ষা ক্ষুদ্র লাইব্রেরীর সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষ উপকারী, এ কারণ পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। তিনি সেজন্য লাইব্রেরী পরিচালকদের পুস্তক সংগ্রহের পর বিজ্ঞানুশীলনের প্রতি বিশেষ যত্নবান হইতে বলিয়াছিলেন। লাইব্রেরী আন্দোলনের আদর্শ সফল হইয়া উঠিবে, তাঁহার মতে, যদি জ্ঞানচর্চা উন্নত হইয়াছে দেখা যায়।

মাদ্রাস মহানগরীতে বহুবার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম হইয়াছে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীবদরুদ্দিন তয়াবজীর সভাপতিত্বে, তৎপরে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার এ, ওয়েব (A. Wabb) সাহেবের পৌরোহিত্যে। চারিবৎসর পরে ১৮৯৮ সালে বাঙ্গলার গৌরব আনন্দ মোহন বসু জাতীয় মহাসভার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। অনন্তর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন বাঙ্গলার অন্যতম বাগ্মীনেতা লালমোহন ঘোষ। মাদ্রাস নগরীতে পরবর্তী অধিবেশন আহূত হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, তখন বঙ্গ গৌরব স্যার রাসবিহারী ঘোষ এই পদ অলংকৃত করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মহামান্য ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে সভাপতিত্ব করিতে দেখা যায়। অনন্তর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসে ডাঃ এম, এ, আনসারী যোগ্যতার সহিত সভাপতির কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। সেই বৎসর মাদ্রাসে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সভাপতির অভিভাষণে মনস্বী প্রমথনাথ বুঝাইয়াছিলেন পুস্তক সংগ্রহালয় দেবভূমি তুল্য; ইহা হইতে প্রচুর জ্ঞান ও পুণ্য আহরণ করা যায়। সে কারণে লাইব্রেরীকে বিদ্যামন্দির বলা বিশেষ সঙ্গত। তিনি লাইব্রেরী মহাসম্মিলনে সেই বিপুল জন সমাগমের সমক্ষে প্রকাশ করেন যে, লাইব্রেরী একটি পুণ্য প্রতিষ্ঠান, ইহা যেমন জ্ঞানের আকর, মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ইপ্সিত জ্ঞান সাধনার সেইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্র। ইংলণ্ডের অমর সাহিত্যিক ও কৃতবিদ্য মনীষী টমাস কার্লাইল এক সময়ে বলিয়াছিলেন The true University of our days is Collection of Books। তাঁহার মতে গ্রন্থ সংগ্রহের সার্থকতা মনুষ্যত্ব অর্জনে, জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করে, বিবিধ শাস্ত্রে অধ্যয়ন মানসে আহ্বান জানায়, লাইব্রেরীও তদনুরূপ বিবিধ বিদ্যা

অনুশীলনের ভাণ্ডার-গৃহ। কত লোক এই পবিত্র ক্ষেত্রে আসিয়া জ্ঞান সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। ইহার শক্তি ও প্রকাশ প্রচুর, বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা জ্ঞান বৃদ্ধি করে ইহার তুল্য উপযোগী ক্ষেত্র অতীব বিরল। বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ শাখার রস আস্বাদন এই স্থান হইতে সাধিত হইবে। বিদ্যোৎসাহী কার্লাইল সাহেবের মতে ইতিহাসের উপদেশ অমোঘ, ইতিহাস পাঠের শিক্ষনীয় দর্শন আমাদের অভিজ্ঞতা বিস্তারণাতে সাহায্য করে। ইহার দর্শন জ্ঞান বৃদ্ধি করে, ইহা মানবতার আদর্শ প্রচারের অনুকূল, ইহা নির্দেশ করে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার, সার্ব্বজনীন সাম্যভাব স্থাপন সম্বন্ধে এবং নানা প্রকার সামাজিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যের জন্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদকরূপে আমি নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক মহাশয় জানকী বেঙ্কটরামানাইয়ার নিকট হইতে একখানি পত্র ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের বেজওয়াদার অফিস হইতে পাই। উক্ত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের অতিরিক্ত সম্পাদকরূপে আমাকে তিনি গ্রন্থাগার সম্মিলনের সভাপতি নির্বাচন দেশ হইতে মনোনয়ন করিতে অনুরোধ জানান। সে বৎসর মাদ্রাজে নিখিল ভারত গ্রন্থসম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে অগণিত লোক সমাগম হইয়া থাকে। সে কারণ অধিকতর নর নারীর মনোযোগ আকর্ষণ উদ্দেশ্যে ঐ সময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া গণ্য হইত। সেই হেতু ঐ সময়ে ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনের অধিবেশন আহ্বান করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বেলগাঁও কংগ্রেস উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্র প্রদেশে বেলগাঁও সহরে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন স্বনামধন্য ভারত নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়। স্বয়ংগ্রাহী গঠন-মূলক উপদেশপূর্ণ মনোজ্ঞ অভিভাষণের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া মনীষী বাগ্মী রাজনীতিজ্ঞ তুলসী চরণ গোস্বামী মহাশয় সেই সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। সেই সম্মিলনে এই বর্ত্তমান লেখক প্রতি প্রদেশে একটি করিয়া গ্রন্থাগার পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব আনয়ন করিবার সুযোগ পান। তখনও কোন প্রদেশে ঐরূপ প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষৎ বিদ্যমান ছিল না। ঐ তৃতীয় অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অনন্তর মাদ্রাস অধিবেশনে ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক সুমনোহর অভিভাষণে, ভারতবাসীকে গ্রন্থাগার-প্রিয় করিয়া তুলিতে উৎসাহ দেন। পুস্তক প্রীতি প্রচার করিতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে তিনি আবেদন করেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মাদ্রাস অধিবেশনের পূর্ব্বদিন গ্রন্থাগারসেবী প্রমথনাথ মাদ্রাসে প্রতিনিধি-শিবিরে আমাদের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা তুলসী চরণ গোস্বামী মহাশয়। যদিও সভাপতি প্রমথনাথের জন্য একটি পৃথক কক্ষ সযত্নে রক্ষিত ছিল, তিনি সবিনয়ে প্রকাশ করিলেন তাঁহারা উভয়ে মাদ্রাজ নগরীর এক বিশেষ হোটেলে স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাহার পর আসনে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন "আমার মতে সর্ব্ব প্রকার সাধারণ পাঠাগারে বিজ্ঞান-সম্মত পুস্তক তালিকা প্রবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয়। সৎ পুস্তক ক্রয় করিবার পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে বর্গীকরণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। পাঠকের জন্য সুচারুরূপে গ্রন্থ-নির্ব্বাচন উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুবিজ্ঞ তালিকা বিশেষ হিতকর। বিজ্ঞান-সম্মত বর্গীকরণ পদ্ধতি উন্নত স্তরের গ্রন্থাগারের উজ্জ্বল লক্ষণ। আমি পাশ্চাত্য দেশে বহু সংখ্যক গ্রন্থ পরিপূর্ণ বিশাল গ্রন্থাগার সু-নিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হইতে দেখিয়াছি"। আমি বলিলাম, বেশ, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার সারগর্ভ মন্তব্যগুলি আগামী বর্ষ সাধারণ সম্মিলনে ব্যক্ত করিবেন, উচ্চ শিক্ষিত পাশ্চাত্য দেশের গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কে আপনার স্বকীয় অভিজ্ঞতা বিবৃত করিবেন, এবং

এ দেশের সকল প্রকার গ্রন্থাগার যাহাতে সম্বদ্ধ হইয়া ঐক্য বিধানে সর্বজন-গৃহীত পরিচালন-পন্থা অনুসরণ করে তাহার নির্দেশ দিবেন।

পরে নিবেদন করিলাম আমাদের দেশে প্রয়োজন (১) পুস্তকের প্রতি অধিকতর যত্নবান হওয়া, সাধারণ গ্রন্থাগারের দ্বারা বহু লোক ব্যবহার করিবে, সে কারণ পুস্তক ব্যবহারে সতর্ক ভাবে মনোযোগী হইবার আবশ্যক আছে। (২) দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির প্রতি সচেতন থাকা আবশ্যক। এগুলি বাহিরে যাইবে না, গ্রন্থাগার ভবনে বসিয়া পড়িতে হইবে। মূল্যবান বা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহও সময়ে রক্ষণ পরিচালকদের বিশেষ কর্তব্য।'

বলা বাহুল্য, মনস্বী প্রমথনাথ উক্ত মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতির জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণে গ্রন্থাগারের অতুলনীয় উপকারিতা জাতি গঠনের যে বিরাট উপযোগী তাহা বিবৃত করিয়া গভর্নমেণ্ট ও সাধারণ তহবিল যথা বিশ্ববিদ্যালয় বা পৌর প্রতিষ্ঠান বা জেলা বোর্ডকে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান।

স্মরণীয় ঐ গ্রন্থাগার সম্মিলনের আর একটি ঘটনা। সাধারণ অধিবেশনে যখন বক্তৃতা হইতেছিল তখন গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা জানকী বেঙ্কট রামানাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যিনি তেজোময়ী ভাষায়, প্রদীপ্ত কণ্ঠে, রবীন্দ্রনাথের মহামানবিকতার আদর্শ প্রকাশক গ্রন্থগুলি সংগ্রহের আবেদন জানান, তিনি কে? আমি বলিলাম, উনি কুমারী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, এম এ, সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী, শিক্ষাব্রতী, সিংহলের কোন কলেজের অধ্যক্ষ ও একাধিক কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন।

ক্রমশঃ

বন্ধুবরেষু

শ্রীসুগত

সেদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুঃখ করে বলছেন, দিন দিন মানুষের রুচি যে কোথায় নেমে যাচ্ছে···ইত্যাদি। কথাটা মিথ্যে নয়। পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে, ক্লাসে পাঠাগারে, বাড়ীর রোয়াকে রোয়াকে—সর্বত্র যেখানে মানুষ একাধিক জড়ো হয়, সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের আলোচনার বিষয়-বস্তুর মধ্যে রুচির বিকৃতির পরিচয়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। বেশ কিছুদিন ধরে নানা সাময়িক পত্রে পোষাক পরিচ্ছদের শালীনতা নিয়ে নানা রকমের আলোচনা নিন্দা তোমার নজরে পড়েছে। বক্তব্যের মধ্যে এ কথা পরিষ্কার যে আজকালকার ছেলেমেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে রুচিহীনতার পরিচয়ই বহন করে। যদিও দেখেছ আধুনিকতার নামে কোন কোন ব্যক্তি (নারী হয়েও) নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানে অশালীন ভঙ্গীকে আধুনিকতার নামে, শিল্পরীতির নামে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ধিক্কৃত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্র থেকেই।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা জীবনের, সমাজ-জীবনের, প্রচলিত রীতি-নীতির, ধর্মানুষ্ঠানের পরিবর্তন স্বাভাবিক। এবং তা প্রয়োজনীয়ও। স্থিতিশীলতা মৃত্যুর নামান্তর। পরিবর্তনশীলতা সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু পরিবর্তন মাত্রই যে শুভতর হবে, এ ধারণাটাও সত্য নয়।

পরিবর্তনকে আমরা সাদরে মেনে নেবো। কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখবো যে সেই পরিবর্তনের দ্বারা আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকছে কিনা, অথবা ব্যাহত হচ্ছে।

যদি পরিবর্তন অগ্রগতির সহায়ক হয়, তাহলে তাকে কল্যাণপ্রসূ বলে আদরে বরণ করে নেব। কিন্তু কেবলমাত্র

পরিবর্তনের ধাক্কায় পরিবর্তনকে মেনে নিতে রাজি নই। আর যদি সে পরিবর্তনের ফলে অন্তত প্রশ্রয় পায়, তা হলে তো কোন কথাই নয়।

আমাদের শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। স্বাধীনতা-লাভের পর আমাদের শিক্ষার হার অনেকখানি এগিয়ে গেছে। প্রতি বৎসর ছেলেরা দলে দলে ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাফল্যের স্বীকৃতি নিয়ে বেরিয়ে আসছে। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই, আপনাপন শক্তিতে তারাও কৃতিত্বের জয়-মালা লাভ করছে নানা দিক থেকে। নিঃসন্দেহে এ অগ্রগতি প্রশংসার্হ এবং গৌরব জনক।

ইস্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, সেই অনুপাতে ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপকের সংখ্যাও। শুধু শহরে নয়, শিক্ষার প্রসার সুদূর পল্লীগ্রামেও বিস্তার লাভ করেছে। আজ প্রায় পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়, কয়েকটি পল্লীর মাঝে মহাবিদ্যালয়ও খুঁজে পাওয়া যায়।

এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষার ফলে মানুষের প্রকৃত উন্নতি কতখানি হচ্ছে, তার দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। অঙ্কের হিসাবটাই জীবনে সব চেয়ে বড় হিসাব নয়।

শিক্ষার এত প্রসার সত্ত্বেও মানুষের রুচি বোধের আগমন হচ্ছে না কেন, একথা সত্যই ভাববার। শিক্ষা যদি রুচিকে উন্নত না করে, তাহলে সে শিক্ষা কতখানি সার্থক, তা ভাববার বিষয় নয় কি? তুমি হয়তো একটা পুরনো এবং অনস্বীকার্য উক্তি করে বলবে, দারিদ্র্য দোষেই সব অঘটন ঘটাচ্ছে। অস্বীকার করবো না যে দারিদ্র্য অনেক ক্ষেত্রেই নানা গুণ অপহরণ করে। বুভুক্ষিতের কাছে পাপ বলে কিছু নেই। এই যুক্তিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েও যদি আমি বলি (এবং তুমিও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে) যে, শিক্ষিত ও বিত্তশালী মানুষের জীবনেও এই রুচির বিকৃতি স্থান পেয়েছে, তার যুক্তি কোথায়? যে পোশাক পরিচ্ছদের অবাধীনতার কথা বাগজে আলোচিত হয়েছে; সে পোশাক পরিচ্ছদ পরিহিত ও পরিহিতারা বিত্তশালী ঘরের ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষিতরা। আমরা যারা গ্রাম ছিয়েছেন তারা উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষিতা। অভিনেতা অভিনেত্রীদের একবার চোখের দেখা দেখার জন্যে যারা অপরিসীম উৎসাহ প্রদর্শন করেন, তাঁরা সবলেই ধনিক এবং অশিক্ষিত নন। সিনেমা পত্রিকার গ্রাহকেরা, যাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, সবলেই অশিক্ষিত নয় এবং প্রতি মাসে মুদ্রা দিয়ে যখন ঐ সমস্ত মূল্যবান পত্রপত্রিকা কেনার সামর্থ্য রাখেন, তখন বিত্তহীনও নন। ট্রেনে ট্রামে বাসে নিশ্চয়ই তুমি চলাফেরা কর, প্রতিদিনের শিক্ষিত মানুষের আলাপ-আলোচনার বিষয় বস্তু নিশ্চয়ই তোমার কানে গেছে। তার মধ্যে কতটুকু এবং কত ক্ষেত্রে তুমি স্বাস্থ্যকর বিষয়ের আলোচনা শুনেছ? আমি গুরুগম্ভীর আধ্যাত্মিক কিংবা দার্শনিক আলোচনার কথা বলছি না, সাধারণ কথা বার্তার মধ্য দিয়েও রুচিহীনতার পরিচয় মেলে না কি?

জাতীয় জীবনে উৎসবাদির প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের চারিদিকে যে পরিমাণে উৎসবের আধিক্য, সেই আধিক্যের কতটুকু অংশ সংস্কৃত মনের ও রুচির পরিচয় বহন করে? যদিও আমরা গাড়ম্বরে এই সব অনুষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাম দিচ্ছি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে সব চেয়ে বেশী যে-গুণের পরিচয় আশা করি, এবং সব চেয়ে অভাব বোধ করি যে-গুণের, সেইটিই হল এই রুচিবোধ যাকে সংস্কৃতি বললে ভুল হবে না। অবশ্য সংস্কৃতি শব্দটি বহুব্যাপক অর্থবাহী।

সুতরাং একমাত্র দারিদ্র্য দোষকে অভিযুক্ত করলে ভুল হবে। যে-শিক্ষার অনুশীলনের দ্বারা আমাদের রুচি মার্জিত হতে পারে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তার স্থান বড় অল্প। এবং সে ব্যবস্থার অভাব বলতে শিক্ষার প্রসার অনেকখানি হলেও, রুচির মার্জনা হচ্ছে না। আর একটা কথা এ-প্রসঙ্গে বললে নিশ্চয়ই আমাকে খুব বেশী দোষী করবে না যে, এই রুচির বিকৃতির বাহক হচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের তথা-কথিত 'মাথা'রা। বড় (?)রা যে আচরণ করেন, ছোটরা তাই আচরণীয় বলে অনুকরণ করে। বড়রা যা করে, আমরা তাই (এবং তাই তো হওয়া উচিত) এই বোধ

থেকেও এই বিকৃতি অনেকখানি বিস্তার লাভ করছে। ছোটদের জিজ্ঞাসাও ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, বিস্তার লাভ করতে পারে না, ফলে অসম্পূর্ণতাও ঘটতে পারে। কিন্তু বড়দের জীবনের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে, সেই কারণে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয় সহজেই এবং বড় বলে তার প্রতি সাধারণের একটা আকর্ষণও স্বাভাবিক, এবং সম্ভ্রমবোধও তার সাথে যুক্ত হয়, তাই ধীরে ধীরে তা বিস্তার লাভ করে। এবং করছেও সেই কারণে। আসুন আমরা এইখানেই। প্রীতি নিন।

সাময়িকী

সজনীকান্ত দাস। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কবি ও সমালোচক সাহিত্যিক 'শনিবারের চিঠি'-সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের অনেকখানি স্থান তিনি জুড়িয়া ছিলেন। সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ সত্য শিব ও সুন্দরই ছিল তাঁহার সাহিত্যাদর্শ। বাস্তবধর্মী সাহিত্য-সেবীদের সহিত তাই তাঁহার সংগ্রাম ছিল অনবচ্ছিন্ন। তিনি আজীবন কঠোরভাবে সকল সাহিত্যের সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। কবি হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি কবিতা গ্রন্থের রচয়িতা। প্রবাসী, বঙ্গশ্রী বহুমতী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগেও তিনি প্রথম জীবনে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার সংযোগ দীর্ঘ-দিনের। গবেষণামূলক রচনাও তাঁহাকে প্রসিদ্ধি দান করিয়াছিল। প্রাচীন নবীন বহু সাহিত্যিকই তাঁহার সহ-যোগিতায় জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অপূরণীয় ক্ষতি।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাংলার প্রবীনতম খ্যাতিমান সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও রাজনীতিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর ব্যাপী কর্মজীবন সমাপ্ত করিয়া ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাকে 'জীবন্ত বিশ্বকোষ' বলা হইত এবং ইহাই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি সাহিত্য ও রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। যৌবনে তিনি সুরেন্দ্রনাথ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎকালীন 'আর্যাবর্ত' পত্রিকা তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। সেকালের বঙ্গবাসী, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখিতেন। পরবর্তী কালে নানা পত্রিকায় তিনি লেখক-[illegible] বন্ধুবর্তীর সহিত তিনি সুদীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবন দ্বারা তিনি নিয়লসভাবে কা[illegible] গিয়াছেন। অসাধারণ ছিল তাঁহার স্মৃতিশক্তি এবং আজীবনই তিনি লেখাপড়ার মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। ইংরাজী বাংলা সংস্কৃতের বহু বিষয় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। শুধু পুস্তক নহে, তাঁহার জীবনকালে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ তিনি যথাযথ দিতে পারিতেন। তাঁহার বাগ্মিতাও ছিল অসাধারণ। সমসাময়িক সমস্ত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন। কবি অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্'এর সম্পাদকীয় লেখকরূপে তিনি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় সাংবাদিকদের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মবহুল চিত্রিত জীবনের পরিচয় অল্প কথায় সম্ভব নহে। আমরা এই নিষ্কাম অমিত প্রতিভাধর কর্মযোগীর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অক্ষিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধুত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

বৈশাখ ১৮৮৩, ১৩৬৯ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম, এ পঞ্চদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র-ধর্মের ভেদ্রো কাটলে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটি স্বয়ংফুলা আস্বাদন—ধর্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম আস্বাদন করায় জীবনের অতিগ (transcendental) দিক্, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (immanent) দিক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুইই। তাইতো তিনি জীবন-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম বা একান্ত রাষ্ট্র অচল। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ' (ভোজপতি কংসের মৃত্যু) বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্মপতিরূপে 'তদ্বৃং পরং যোগিনাম্' (যোগিগণের পরতত্ত্ব কৈবল্য)।

শ্রীপুরুষোত্তমাবন্দ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	
শ্রীকৃষ্ণ	৫·০০	ছাত্রদের কর্মবাণী	
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	Sould of India Speaks	

সুলেখক শ্রীঅমিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাংলার কবি	
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	রাজর্ষি রামমোহন	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	আচার্য জগদীশ	
বাংলার বিদুষী	১·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
বাংলার মনীষী	১·২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	
জীবন গড়া	·৭৫	রবীন্দ্রনাথ	

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বিটি,

বিদ্যাসাগর	২·৫০	বঙ্কিমের গল্প	১·১৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ—সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

সূচীপত্র : বৈশাখ, ১৮৮৪, ১৩৬৯,

১। শ্রীশ্রীনিতাগোপাল
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। পরম প্রকাশ শ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীরেণু মিত্র
৩। রূপময় (কবিতা)
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য
৪। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (৯)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রভু
৫। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫০)
৬। জ্যোতির্ধর (কবিতা)
শ্রীবিষ্ণুপদ রায়
৭। গোবিন্দ সিংহের ইসলাম-নিরীক্ষা (২)
শ্রীবতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়
৮। কবি এলিয়টে ক্রমেতী চিন্তার প্রভাব
শ্রীসুধিকা মিত্র
৯। বন্ধুবরেষু
শ্রীসুগত
১০। সাময়িকী : রুচি

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না;
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

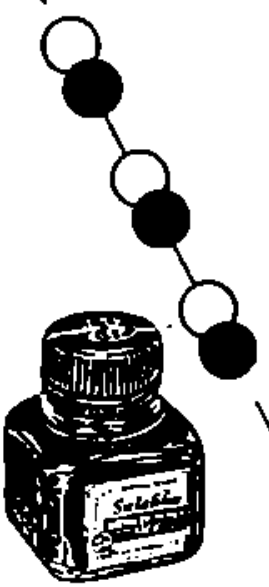

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

★

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২ ভূপেন বসু এভিনিউ

কলিকাতা ৪

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রণীত

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

অবধূত ভাষ্য

প্রকাশিত হইল।

মূল্য ২৸০

নরনারায়ণ আশ্রম।

উদ্বোধন

বৈশাখ, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(শ্রীনিত্যগোপালের ১০৮তম শুভ আবির্ভাব তিথিতে ১৯৬২ সালের ১২ই এপ্রিল মহানির্বাণ মঠে আহূত সভায় পঠিত)

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, পূজনীয়া মাতৃমণ্ডলী ও সমবেত সজ্জনবৃন্দ,

একশ সাত বৎসর পূর্বে এমনি এক বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে ২৪ পরগণার অন্তর্গত পাণিহাটি গ্রামে মাতুলালয়ে শ্রীনিত্যগোপাল আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পুণ্যময় পাঞ্চভৌতিক দেহ ঐ মৃন্ময় মন্দিরে সমাহিত। বহুকাল হ'ল তাঁর মর্মর মূর্তি ও মন্দিরে স্থাপিত হয়েছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য অদ্যকার সভায় মিলিত হয়েছি।

শ্রীনিত্যগোপালদেবের দিব্য জন্ম ও কর্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলেই আমার মনে পড়ে তাঁর আশ্রিত সন্তান শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের কথা। বছর চার পূর্বে এমনি এক সভায় শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-দর্শন আলোচনা কালে পুরুষোত্তমানন্দজী গুরুতরভাবে পীড়িত হন এবং একদিন পরেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। উদ্দেশে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে দুয়েকটী কথা আপনাদের সামনে উপস্থিত করবার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে এই মহানির্বাণ মঠের সঙ্গে আপনাদের যেমন সম্পর্ক আমারও তেমনি। প্রায় ১৪ বৎসর পূর্বে সংসারের এক নিদারুণ আঘাতে আমি মর্মাহত হই এবং পুরুষোত্তমানন্দজীর সহিত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার পরিচয় ঘটে। এই সময় আমি প্রথম স্বামীজীর মুখে শ্রীনিত্যগোপালের নাম শুনি এবং আরও শুনি যে তিনি যেসব কথা আমাকে বলেন এবং 'উদ্বোধন-ভারত' পত্রিকায় লেখেন, সে সবই শ্রীনিত্যগোপালের জ্ঞান। সাহিত্যের ছাত্র হলেও সনাতন ধর্মের মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বগুলি জানবার কৌতূহল আমার বরাবরই ছিল এবং তারই প্রেরণায় 'উদ্বোধন-ভারত' পত্রিকায় বিবৃতভাবে ব্যাখ্যাত শ্রীনিত্যগোপালের দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি পাঠ করি। তদবধি আমার দৃঢ় প্রতীতি হয় যে শ্রীনিত্যগোপাল প্রচারিত বেদান্ত ব্যাখ্যায় আশাহত মানুষের এবং বর্তমান যুগের পক্ষে অনেক আশ্বাসের কথা আছে এবং তারই দুয়েকটী বিশেষ কথা এখন আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

বর্তমান যুগ বিভিন্ন দিকে একটা পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ব্যবহারের জগতে নর-নারীর দ্বন্দ্ব, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের দ্বন্দ্ব, ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব, ছাত্র-শিক্ষকের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি এবং পারমার্থিক জগতে আদর্শ-বাস্তবের দ্বন্দ্ব, সংসার-সন্ন্যাসের দ্বন্দ্ব, ব্রহ্ম-মায়ার দ্বন্দ্ব। চারিদিকে এমনি সব বিপরীতধর্মী দুইটী অবস্থার দ্বন্দ্ব নিয়ে মানুষ শান্তি পাচ্ছে না।

বিশ্বজুড়ে আজ বিপরীত ভাবধারার সংঘর্ষ চলছে, ফলে এক মহাপ্রলয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। যদি আর

একটা যুদ্ধ বাধে তবে সেটা হবে total war অর্থাৎ বিশেষ কোন দেশ বা বিশেষ কোন জাতির সঙ্গে বিশেষ দেশ বা জাতির যুদ্ধ নয়, এবারের যুদ্ধ মানে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ এবং সামগ্রিক ধ্বংস। রাজনীতির ক্ষেত্রে এ সত্যকে আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারছি। পারমার্থিক ক্ষেত্রে, দর্শনের ক্ষেত্রে শ্রীনিত্যগোপাল আজ থেকে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে এ সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন এবং দার্শনিক যুক্তির দ্বারা তারই একটা সমাধান দিয়েছেন।

এতদিনের বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল এক তরফা —one way traffic। তখন পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর বিচার হতো, ব্রহ্মের দৃষ্টিকোণ থেকে মায়ার, সন্ন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সংসারের, পরলোকের দৃষ্টিকোণ থেকে ইহলোকের, আদর্শের থেকে বাস্তবের। কাল প্রবাহে এ চিন্তাধারা বদলে গেছে। এতদিন যারা অবহেলিত হয়েছে তারা আজ মাথা তুলে বিচারের দাবী জানিয়েছে। উভয় পক্ষই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে বসে আছে; তারা মিলতে চায় অথচ মিলতে পারছে না। যদি একজনকে অপরের মধ্যে নিঃশেষে মুছে ফেলা যেতো—তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই হোক বা পারমার্থিক ক্ষেত্রে হোক—তাহলে একটা সহজ সমাধান হতে পারত। কিন্তু তা তো হবার নয়। এমন কোন দিনই হবে না যেদিন জগৎ, মায়া, অবিদ্যা একেবারে নিঃশেষে মুছে যাবে, একমাত্র ব্রহ্মই থাকবেন। আলো থাকলেই ছায়া থাকে, স্থিতি থাকলেই গতি থাকে, নির্গুণ থাকলেই সগুণ থাকে, আদর্শ থাকলেই বাস্তব থাকে—এই তত্ত্বটীকে শ্রীনিত্যগোপাল মিলিয়েছেন প্রাণের স্তর থেকে। মন বুদ্ধি কেবলই ভেদ সৃষ্টি করে। প্রাণ পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় আনে, সব মূল্য ও প্রেমের পরশ দিয়ে শান্তিময় সহাবস্থানের ব্যবস্থা করে। দ্বন্দ্ব-বিভক্ত বিশ্বের কোন সমস্যারই সমাধান বুদ্ধির যুক্তির ঘারপ্যাঁচের diplomacy দ্বারা হবে না। দ্বন্দ্ব-ক্লান্ত মনের স্তর ছেড়ে বিশ্ব আজ প্রাণের স্নিগ্ধ শান্তি-ছায়ার জন্য ব্যাকুল। শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণতত্ত্বের মূর্ত-বিগ্রহ।

মানবজীবনের যতগুলি দিক আছে যেমন ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি—এদের দুভাগ করে বলা যেতে পারে আত্মার ক্ষেত্র ও অনাত্মার ক্ষেত্র। পারমার্থিক ক্ষেত্র, আত্মার ক্ষেত্র স্থিতিধর্মী, ব্যবহারিক ক্ষেত্র, অনাত্মার ক্ষেত্র গতিধর্মী। আত্মজ্ঞান প্রকাশ করে জীবনের অন্তর্মুখী দিক, স্থিতির দিক, মোক্ষের দিক; অনাত্মজ্ঞান প্রকাশ করে জীবনের বহির্মুখী দিক, গতির দিক, সংসারের উন্নতির দিক। আত্মা ও অনাত্মা, ব্রহ্ম ও জগৎ—এই দুই নিয়েই সমগ্র মানবজীবন। এদের একটীর উপর ঝোঁক দিলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই দুইয়ের মধ্যে ভেদ আছে অথচ দুইই বিধাতার সৃষ্টি এবং দুই মিলিয়াই সমগ্র সত্য।

ভারতবর্ষ এতদিন আত্মার ক্ষেত্রের সাধনাই করেছে, ব্রহ্মবস্তুকে জীবনের সমগ্র সত্য এবং একমাত্র লক্ষ্য ভেবে সংসারকে মিথ্যা মায়া বলে অবহেলা করেছে। পরাধীন হয়ে দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েও এদেশের নর-নারী পরপারের মুক্তির জন্য ব্যাকুল। ইহলোকে যারা মুক্ত নয়, পরপারের মুক্তি তাদের কেমন করে হবে? জগৎ সংসার যাদের কাছে এত হেয়, তারা পরপদদলিত হবে না তো হবে কে? আত্মজ্ঞানকে সমগ্রজ্ঞান ভেবেছিল বলেই তারা কালের হাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে। সংসারকে পারমার্থিকভাবে অস্বীকার করার ফলে ব্রহ্মই আজ মিথ্যা হয়ে উঠেছে। সমগ্রতাকে অস্বীকার করে একদেশদর্শী হওয়ার ইহাই পরিণাম। শ্রীনিত্যগোপাল বললেন—পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান।

সংসারে বিরক্তির কথা যারা বলে তারাই অজড়বাদী, মায়াবাদী; আর আসক্তির কথা যারা বলে তারা জড়বাদী, ভোগবাদী। শ্রীনিত্যগোপাল বললেন—অজড়-জড়, ত্যাগ-ভোগ, ব্রহ্ম-মায়া, সন্ন্যাস-সংসার—পারমার্থিকভাবে উভয়ই সত্য এবং এই সমন্বয়, সমমূল্য ও সমমর্যাদাযুক্ত উভয় দিক নিয়েই সমগ্র মানবজীবন। জীবনের এই দুই দিককে পৃথক করা যায় না; এরা পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। মাত্রার মধ্যে থাকলে উভয়ই সত্য। যে ভাবে আসক্ত হয়ে আমরা সংসার করি তা মিথ্যা।

জগৎকে সত্য বলার শক্তি শ্রীনিত্যগোপালের ছিল, কারণ তিনি সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েন নি। তিনি কোনটাতেই আটকে পড়েন নি—আস্থার ক্ষেত্রেও নয়, অনাস্থার ক্ষেত্রেও নয়। তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত অবধূত শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ দেব।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে যে দোটানার মধ্যে ভারতবর্ষ পড়েছে তাকে টেনে তোলবার জন্যই সেদিন শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর 'সিদ্ধান্ত দর্শন' গ্রন্থে জড়াজড় সমন্বয়-বার্তা বিবিধ যুক্তির দ্বারা দার্শনিকভাবে প্রস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, বিপরীতকে, বিরুদ্ধকে অস্বীকার করে পরিপাক করা যায় না, বিরুদ্ধকে পরিপাক করতে হলে প্রাণের প্রীতি দিয়ে তাদের ভালবাসতে হবে।

বিশ্বের অতীত ব্রহ্মসত্তা একমাত্র সত্য ও কাম্য বলে সনাতন ধর্ম ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনার কথা বলে, তাই তারা বলে ব্রহ্ম সাধনা করতে হবে মনে মনে বোধে। সনাতন ধর্ম আমাদের এইটেই শিখিয়েছে যে সংসারের কাজ যা করি তা নিরুত্তরের কথা। কাজ যত শীঘ্র হয় কমিয়ে এনে কাজ না-করার মধ্য দিয়ে মুক্তি সাধনা করতে হবে। এদেশের সাধক কখনও সংসারের মাঝে ভগবানের সঙ্গে পরিচিত হতে যায় নি, তার একমাত্র চেষ্টা সব ছেড়ে ছুড়ে অরণ্যে গিয়ে ব্রহ্ম-সাধনা। শ্রীনিত্যগোপাল-প্রবর্তিত সমন্বয় ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপন করতেই হবে এবং সমাজে মানুষে মানুষে প্রীতি থাকলেই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া সম্ভব।

পারস্পরিক প্রীতির অভাবেই আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারি না। হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ নয় তাই দুর্বল এবং সেই জন্যই সঙ্ঘবদ্ধ সবল জাতি সাত শত বৎসর ধরে তাকে পদদলিত করেছে। এখানেই প্রশ্ন জাগে সঙ্ঘবদ্ধ আমরা হতে পারি না কেন, জাতির সংহতি আমাদের নেই কেন? তার কারণ হল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার উচ্চনীচ ভেদবাদ।

সত্য বটে কালের প্রভাবে আমাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে—পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে—অনেক পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর সমাজের এই উচ্চ নীচ ভেদ উপাদেয়ের মূল প্রাচীর ভেঙে দেবার জন্য আইন পাশ হয়েছে। কিন্তু আইন পাশ করা যত সহজ, বাস্তব জীবনে তাকে কার্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। আইনের বলে বৈদ্যনাথের মন্দিরের দরজা খোলা যায় কিন্তু মানুষের হৃদয়-দুয়ার খোলা যায় না। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার এই উচ্চনীচ ভেদবাদের বিরুদ্ধে প্রচার শ্রীচৈতন্য থেকে মহাত্মাগান্ধী পর্যন্ত অনেক মহাপুরুষ করেছেন, অস্পৃশ্যতা বর্জন আইনও পাশ হয়েছে, কিন্তু তবুও আচার্য বিনোবা ভাবেকে বৈদ্যনাথ মন্দিরে লাঞ্ছিত হতে হয়।

কেন এমন হয়? অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ একটা যুগযুগান্তব্যাপী দৃঢ়মূল সংস্কার এবং এর পিছনে আছে একটা দার্শনিক চিন্তাধারা। দার্শনিক ভিত্তি অপরিবর্তিত রেখে উপরে জোড়াতালি দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না। এই দার্শনিক ভিত্তি বদলাবার কথা বলার জন্যই শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাব এবং এই জন্যই তিনি সার্থক যুগস্রষ্টা। শ্রীনিত্যগোপাল বলছেন—যে দার্শনিক ভিত্তির উপর আমাদের বর্ণাশ্রম গড়া তা হল গুণত্রয় বিভাগ। ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, রজঃগুণ তার পর এবং তমঃ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টের। ত্রিগুণের মধ্যে এই উচ্চনীচ ভেদ-ব্যবস্থা আছে বলে গুণের অধিকারীর মধ্যেও উচ্চনীচ ভেদ জাতির মেরুদণ্ডের প্রবিষ্ট। জপধ্যান, পূজাপাঠ ইত্যাদি সাত্ত্বিক কর্ম যাঁরা করেন তাঁরা বর্ণের শ্রেষ্ঠ। মুক্তি পেতে হলে তমোগুণ পার হয়ে রজোগুণে, রজোগুণ অতিক্রম করে সত্ত্বগুণে সম্পন্ন হতে হবে। শ্রীনিত্যগোপাল বললেন, এমন হতেই পারে না। মনুষ্য জীবনে সাত্ত্বিকতার স্থান যতখানি, রজোগুণের স্থান ততখানি এবং তমোগুণের স্থানও ততখানি। জীবনের উচ্চতম অবস্থা মুক্তির সঙ্গে প্রতি গুণের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, direct ও equal relation। ব্রাহ্মণ হয়ে বেদপাঠ করুন আর ব্যাধকুলে শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করে মাংস বিক্রয় করুন, ভগবানের সেবা বুদ্ধিতে কৃত যে কোন কর্মের দ্বারাই মানুষ উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছিতে পারে। মহাভারতের বনপর্বে দ্বিজ-ব্যাধ সংবাদে এই তত্ত্বটিই উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। গীতাও এই কথাই বলেছেন—স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই কবিতায় শ্রীনিত্যগোপাল স্বীকার করেন, কিন্তু কেহ বড় আর কেহ ছোট তা স্বীকার করেন না। "জাতিবর্ণ" নামক প্রবন্ধে তিনি লিখছেন—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, ক্ষত্রিয়ও ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, বৈশ্যও ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর, শূদ্রও ব্রহ্মার শরীরের অংশ ব্রহ্মার শরীর। তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে এত প্রভেদ কেন? প্রকৃত পক্ষে চারি জাতি নহে, প্রকৃত পক্ষে একই জাতি। যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই ক্ষত্রিয়, যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই বৈশ্য, যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই শূদ্র। কোন বৃক্ষের ঊর্ধ্বভাগের ফল যে জাতীয়, সেই বৃক্ষের নিম্নভাগের ফল সেই জাতীয়। ঐ প্রকারে ব্রহ্মার দেহরূপ বৃক্ষের সর্বভাগের ফল এক জাতীয়। সেই জন্যই পূর্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মার দেহজাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এক জাতীয়। ব্রাহ্মণও মনুষ্য, ক্ষত্রিয়ও মনুষ্য, বৈশ্যও মনুষ্য, শূদ্রও মনুষ্য। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এক মনুষ্য জাতি।

প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর আছেন। সংসারে থেকে যদি কোন সাধক সর্বভূতে ভগবৎ সত্তার অনুভূতি লাভ করেন, তবে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। মানুষকে ভালবাসার নামেই ঈশ্বরের অর্চনা। আর মানুষকে ভালবাসার অর্থই ছোট ও নীচ বলে কাহাকেও ঘৃণা না করা। যেহেতু আমরা ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য সাধনা করি, সেজন্য সঙ্ঘবদ্ধ সাধনা আমরা জানি না, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনবোধ আমাদের একটুও নেই। পারস্পরিক প্রীতিই সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের মূল। সঙ্ঘবদ্ধ নই বলে শত শত বৎসর ধরে আমরা পরাধীনতার জ্বালা সয়েছি। অথচ শ্রীকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই সঙ্ঘ-সাধনার কথা বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংবৃত। বুদ্ধের জীবন-মন্ত্র—সংঘং শরণং গচ্ছামি। সংঘবদ্ধ হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা পারস্পরিক প্রীতির ধর্ম প্রচারের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের বীজমন্ত্র—শিবজ্ঞানে জীব-সেবা। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণী—জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এই কথাই কাব্যের ললিত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

কেবেছিলাম বিজন ছায়ায়
নাই যেখানে আনাগোনা
সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায়
সেথায় হবে জানাশোনা।
অন্ধকারে একা একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা
তাকো তোমায় হাটের মাঝে
চলছে যেথায় বেচাকেনা।

অরণ্যের বিজন ছায়ায় যেখানে কেউ যাতায়াত করে না, ভেবেছিলাম, ভগবান, তোমাকে সেখানে পাব। কিন্তু অন্ধকারে এ দেখা স্বপ্ন দেখার মত। পরমেশ্বরকে পেতে হবে জাগ্রত সংসারের মাঝে যেখানে মানুষে মানুষে নানা ভাবের আদান প্রদান চলছে।

ভারতের নর-নারী যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয় অর্থাৎ জাতিভেদের মূঢ় প্রাচীর ভেঙে দিয়ে পরস্পরকে যদি প্রেমের চক্ষে দেখতে না পায় তবে তার স্বাধীন অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। শ্রীনিত্যগোপালের বাণীর এই সব বাস্তব প্রয়োজনীয়তার কথা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বলে গেলেন শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত এমনি এক সভায়, এমনি এক বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে। আসুন আমরা সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় আমি মুগ্ধচিত্তে শ্রীনিত্যগোপালকে আমার প্রাণের প্রণতি নিবেদন করি।

পরম প্রকাশ শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত-জনযতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়।

ওঁ আজানুলম্বিতভুজং কনকাবদাতম্ সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষম্। বিশ্বেশ্বরং জনন নরনারায়ণপ্রিয়ম্ বন্দে সমন্বয়গুরুং পুরুষোত্তমানন্দম্॥

পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালদেবের একশত অষ্টম আবির্ভাবের সামনে নিজেকে বার বার নোয়াইয়া দিয়া বলি, হে পরম প্রকাশ, হে তত্ত্বমূর্ত্তি, আবরণ উন্মোচন কর, তোমার সর্ব-সমন্বয়ের যুগধর্ম সূর্যের আলোর মত সর্ব দেশের সর্ব মানুষের জীবনের আনাচে কানাচে প্রবেশ লাভ করুক। সত্যের সামগ্রিক প্রকাশের দ্বারা বিভ্রান্ত মানুষ তোমার সামঞ্জস্যময় মূল্য দানের ছন্দের সুষমা লাভ করিয়া শান্ত হউক, স্নিগ্ধ হউক, বিকৃতির প্রলাপ হইতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন মুক্ত হউক।

শ্রীনিত্যগোপাল জনসাধারণের ঠাকুর। আমাদের মত যাহারা সাধারণ লোক, যাহারা নিজেদের ভাল মন্দ লইয়া দশজনের সঙ্গে বাস করিব, তাহাদের চলার পথের কথা কহিতে শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যগোপাল তেমন পথের কথা কহিতে আসেন নাই যে পথের প্রয়োজন মানুষের পরিণত বয়সে, পরিণত বুদ্ধিতে, পরিণত জীবনে। শ্রীনিত্যগোপাল পথের কথা কহিবেন শিশুর জন্মের পর হইতেই—কিংবা তাহারও আগে শিশুর পিতামাতাকেই। অর্থাৎ মানুষের সর্বাবস্থার তাহার নমনধর্মময় জীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ও তাহাকে উন্নততর জীবন-চেতনার গড়িয়া তুলিবার জন্য শ্রীনিত্য-গোপালের পথ-প্রদর্শনের বাণী। আমাদের চলার পথ কখন ঠিক হয়? শিশুর জীবনের চলার পথ তাহার জন্মের আগে তাহার পিতামাতা বংশধরের দ্বারা খানিকটা ঠিক করে, তাহার প্রথম পাঁচ বৎসরের শিক্ষাদীক্ষা আবেষ্টন খানিকটা ঠিক করে, তাহার বৈশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধিকালগুলি আরও খানিকটা ঠিক করে। শ্রীনিত্য-গোপাল যে-জীবন ও যে-জীবন দর্শন লইয়া মাত্র ছাপ্পান্নটী বৎসর জীবিত ছিলেন আজ হইতে একান্ন বৎসর আগে, সে জীবন ও সে জীবনদর্শন এই সবগুলি সময়ের জন্যই পথ-নির্দেশ দিবে। আমাদের চলার পথ কি হইবে? আমরা কি হইব? এ কথার উত্তর প্রাচীন কালে এক রকম করিয়া দিতাম—শ্রীনিত্যগোপালের আবির্ভাবের পরে আর এক রকম করিয়া দিব। শ্রীনিত্যগোপাল যখন জীবিত ছিলেন তখন আমরা ভারতবাসীরা যাহাকে জীবনের আদর্শ মনে করিতাম, আমরা যে রকমভাবে খাইতাম, পরিতাম, চলিতাম—আজকাল আমাদের জীবনের আদর্শও তেমন নাই, আমাদের খাওয়া দাওয়া চলাফেরাও তেমন নাই। অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্তনটা যে আসিবে শ্রীনিত্যগোপাল ঐ শত বৎসর আগেই সে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে। তিনি কেবল পরিবর্তনের কথাই বলেন নাই, এই অপরিহার্য পরিবর্তনকে কোন্ ছন্দে গাঁথিলে ভারতবর্ষের জীবনের ভিত্তি নষ্ট হয় না, পরিবর্তন শুধু বিশৃঙ্খলা আনিয়া জীবনকে ক্লেদপূর্ণ করিয়া তোলে না, তাহারও স্পষ্ট নির্দেশ তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন সেইদিনই। এই ভাবেই তিনি যুগ-চেতনাকে শাশ্বতিক রূপ দিয়া গিয়াছেন যুগের পূর্বেই।

...বহুর হাজার বৎসর আগে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ছিলেন, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। কী ইহার অর্থ, কী ইহার তাৎপর্য? মহামতি হেগেল ইতিহাসের চলার পথের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, মহামতি মার্কস দিয়াছেন তাহার বিপরীত ব্যাখ্যা। ব্যক্তি-জীবন কি নিজের পথ নিজে রচনা করে? সমষ্টির সাথে তাহার সম্পর্ক কি? 'সম্ভবামি যুগে যুগে'-র সঙ্গেই বা ইতিহাসের যুক্ততা ও প্রয়োজন কোথায়?

বিধাতার অবতরণ সম্ভাবনার কোনো ব্যাখ্যান পাশ্চাত্ত্য দিতে পারিবে কিনা জানি না—কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনন-শীলতাকে সম্বল করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সম্ভবামি সম্বন্ধে শ্রীযুত পুরুষোত্তমানন্দ লিখিতেছেন, 'অনে অনে তো ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সম্ভূত হইতেছেনই, কিন্তু একটা যুগের ধর্ম-গ্লানিকে গায়ে মাখিয়া এবং তাহার অর্ঘ আস্বাদন করিয়া ও আস্বাদন করাইয়া তিনি সমাজের বুকে প্রত্যক্ষ শরীর লইয়া সম্ভূত হন। না হইলে যুগ প্রবর্তনাই হইতে পারিত না। চাই একটা concrete আদর্শ, abstract ideal এ ব্যক্তি বা সমাজ গড়িয়া উঠে না। অবতারই impersonal person। তিনিই দেহপ্রাণমন আকর্ষণ করিতে পারেন; ব্রহ্ম-পরমাত্মার সে যোগ্যতা কই? পিতার স্তর হইতে একটী সহজ আকর্ষণ আছে বলিয়াই পুত্রদের সহজভাবে পিতার স্তরে উঠিবার সুযোগ থাকে। আমি কখনও আমিকে ডিঙাইয়া উপরের স্তরে উঠিতে পারে না, যদি না প্রত্যক্ষ একটী পরম 'আমি' তাহাকে আকর্ষণ করে।...তাঁহার জীবন দিয়াই তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে।'—ইহাই 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র তাৎপর্য, ইহাই যুগের চলার ইতিহাস। বর্তমান যুগের চলার ইতিহাসের পথ-রেখা রাখিয়া গিয়াছেন শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার সেই দিনের জীবন-যাপনে ও রচনায়। ইহাই শ্রীনিত্যগোপাল-প্রকাশের ইতিবৃত্ত।

পৃথিবীর চলার পথের পিছন দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই আজ যেমন পৃথিবীর প্রত্যেকটী দেশ অন্য প্রত্যেকটী দেশের সঙ্গে ভাবনায় চিন্তায় অর্থনীতিতে মিলিয়া মিলিয়া যাইতেছে, আগে ঠিক এমনটী ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অপরের সঙ্গে অল্প স্বল্প মুখ্যতঃ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ রাখিয়া যাহার যাহার মত নিজেদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছিল। কিন্তু আজ এক দেশ আর এক দেশের উপর কেবল অর্থনীতিতে বা রাষ্ট্রনীতিতে নির্ভর করে না, ভাবনা চিন্তা ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার উপরে অর্থাৎ প্রতি জাতির কৃষ্টিগত জীবনের উপরেও অপর জাতির প্রভাব উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে অপরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী কেননা দীর্ঘদিন এ জাতি অপরের শাসন করিয়াছে, তাই মনস্তত্ত্বের ছিদ্রপথে ভারতবাসীর স্বভাবমূলক অন্তর্মুখীনতাকে ঠেলিয়া বহির্মুখীন করিয়া দিয়াছে—আর মনস্তত্ত্বেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় সে বহির্মুখীনতা যে প্রথমে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইবে, ইহাতেও আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জাতি তাই আজ পর্যন্তও দিশেহারা। শ্রীনিত্যগোপাল এইখানে পথ-প্রদর্শক।

ভারতবর্ষের অন্তর্মুখীনতা বুদ্ধের গতিধর্মকে, ইসলামের স্বাভাবিক জন-জীবনকে কোনমতে ঠেকাইয়াছিল, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য যে তাহার প্রচণ্ড বেগধর্মের চোখ-ঝলসানো জীবন-বৈচিত্র্য সহ শাসকের শক্তি লইয়া একদিন হুড়মুড় করিয়া ভারতবাসীর জীবন-দুয়ারের নড়বড়ে কপাট ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহাকে বে-ইজ্জত করিবে, উদ্বুদ্ধ করিবে, মাত্রা ছাড়াইয়া তাহাকে বহির্মুখীনতার অভিসারে হাতছানি দিয়া ডাকিবে, নিত্যগোপাল তাহা জানিতেন বলিয়াই সত্তর বৎসর আগে হইতেই এ প্লাবনকে প্রতিরোধ বা অস্বীকারের বিরুদ্ধতাদ্বারা রোধ করিতে না চাহিয়া ইহাকে হজম করিয়া লইয়া যাহাতে ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্যকে কল্যাণকৃৎ করিয়া ভারতবাসীর স্থিতিধর্মমূলক অন্তর্মুখী জীবনের সঙ্গে গাঁথিয়া লওয়া যায়—তাহারই সূত্র দিয়া গেলেন। তিনি যে এই গাঁথিয়া লইবার সংযোগিনী চিন্তাধারা দিয়া গিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার জীবদ্দশাতে তো কেহ জানিতই না—তাঁহার চলিয়া যাইবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত এ সংবাদ প্রায় অগোচরেই ছিল। সত্য কালকে অপেক্ষা করিয়া প্রকাশিত হয়। তাই শ্রীনিত্য-গোপালের শতবর্ষ পূর্তি-বৎসরে এই সংবাদ একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়া এই কয় বৎসরে মানুষকে এ সম্বন্ধে একটুমাত্র অবহিত করিয়াছে। কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত চিত্ত এ সংযোগিনী বাণী আজও শুনিতেও চায় না, শুনিলেও বুঝিতে পারে না। অতএব চিত্ত স্থির করিয়া জীবনের সৌন্দর্যকে—ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের সৌন্দর্যকে—আজও সে বাহির করিয়া লইতে পারে নাই। তাই এ বাণীর প্রয়োজন আছে।

আমরা জানিতাম আত্মা ও অনাত্মা বিরুদ্ধ, জ্ঞান ও

অজ্ঞান বিরুদ্ধ, সাকার ও নিরাকার বিরুদ্ধ, জড় ও অজড় বিরুদ্ধ, চৈতন্য ও অচৈতন্য বিরুদ্ধ, সংসার ও সন্ন্যাস বিরুদ্ধ ভ্রম ও মায়া বিরুদ্ধ;—ইহাদের একজন থাকিলে অপরে থাকিতে পারে না—থাকা উচিত নয়—না থাকাই মুক্তি বা পরমার্থ। এ্যারিষ্টটলের নিকট হইতেও ইহাই আমরা শুনিয়াছিলাম—The law (the law of excluded middle) asserts that everything must be either A or not-A, whatever A may be'—(Jeans)। কিন্তু বস্তু-বিজ্ঞানের পরবর্তী সিদ্ধান্তকে সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল লিখিলেন সেই সত্তর বৎসর আগে—'নিত্য অনিত্য সমন্বয় বা আত্মা অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়। সাকার আকার নিরাকার সমন্বয়। জড় অজড় সমন্বয়। চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়। শ্রীনিত্যগোপাল আরও লিখিলেন, 'পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান'। তিনি আরও লিখিতেছেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। অল্প অগ্নিও অধিক অগ্নি হইতে পারে। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারেন'; 'সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসে শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ্য হেয়-বোধও বর্জন; 'মহা সিদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য সম বোধ হয়'—ইত্যাদি ইত্যাদি। নিত্যগোপালের এই সব সিদ্ধান্তকে বর্তমান বস্তু-বিজ্ঞান সমর্থন করিতেছে। স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ তাঁহার 'মীষ্টিরিয়স ইউনিভার্স' গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ ১৯৩২) এ্যারিষ্টটলের law of excluded middle সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করিয়া সেই সঙ্গেই লিখিতেছেন, 'The scientist, on the other hand, knowing that everything will generally possess some A-ness and some not-A-ness, is very little concerned as whether an object is classed as A or not-A; what he wants to know is how much A-ness it possesses'। যদিও মধ্যে সর্বত্র যে বিরুদ্ধতা ও অবিরুদ্ধতা ওতপ্রোত হইয়া আছে এ কথা জানাইয়া সুই ভি ব্রণনী তাঁহার 'ম্যাটার এণ্ড লাইট' (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭) নামক গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার 'উজ্জলসন্ধানে' লিখিতেছেন, 'বিশ্বের যাহা কিছু জীবনের মধ্যে antagonistic বলিয়া প্রতীয়মান, তাহা at once complementary ও—কিন্তু মানব-মন এতদিন এই দুই ধারাকে একান্ত পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। তাই মানুষের চিন্তাধারা কখনও continuity-কে আশ্রয় করিয়াছে, কখনও discontinuity-কে। কিন্তু কোন একটাই pushed to the extreme হইলে বাস্তবের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না। সেজন্য প্রয়োজন 'subtle and almost indefinable fusion of the two terms of this antimony'। উজ্জলসন্ধানে এই fusion-কেই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব-জীবনের মধ্যে কার্যান্বিতরূপে আস্বাদন করিতে চায়'। শ্রীনিত্যগোপাল এই fusion-কে এই সংযোগিনী সমন্বয়-বৃত্তিকে—বস্তুর যাহা স্বতঃসিদ্ধ-ধর্ম, জীবিত থাকিতে হইলে যাহা থাকিবেই, সেই বৃত্তিকে যথা স্থানে যথা মানে স্বীকার করিয়া লইয়া জীবনের ছন্দ ঠিক করিতে বলিলেন। যে যে ধর্ম জীবনের পক্ষে সহজ তাহাদের কাহাকেও অস্বীকার করিব না, অতি মূল্যও দিব না, কাহাকেও ঘাবাইয়াও রাখিব না, কাহাকেও মাত্রা ছাড়িয়া অসম্বয়ভাবে বাড়িয়া উঠিতেও দিব না—সকলকে এক সামঞ্জস্যের সুষমায় গাঁথিয়া লইয়া বিশ্বের সেবাবুদ্ধিতে জীবন যাপন করিব—ইহাই বর্তমান যুগের কাছে শ্রীনিত্যগোপালের পথ-নির্দেশ। এই পথ-নির্দেশ জাতি ধর্ম বেশ পাত্র নিরপেক্ষভাবে সত্য—কেননা যে যেখানে যে কর্মেই নিয়োজিত থাকুক না কেন—মানুষের অন্তর্নিহিত সমস্ত বৃত্তিকে মাত্রার মধ্যে স্পন্দিত করার এই ছন্দ-বোধ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। এই জন্যই শ্রীনিত্যগোপালের পক্ষেই বলা সার্থক, 'আমি বিশ্ব নাগরিক,' 'এই বিশ্বই আমার মহামঠ'।

শ্রীনিত্যগোপালের মতে ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ বিশ্রামস্থল মাটির পৃথিবী, মানুষের সেবা, সর্বভূতে আত্মপ্রেম। তিনি

লিখিতেছেন, 'অন্যের সুখে সুখ বোধ হইলে, অন্যের দুঃখে দয়া হইলে, অন্যের পুণ্যে হর্ষ হইলে এবং অন্যের পাপে উপেক্ষা করিলে চিত্তে যে এক অপূর্ব অমল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার তুলনা নাই। সে ভাব প্রফুল্লতাময় চিত্ত প্রসাদ। সেই ভাবময় চিত্ত প্রসাদই সমাধির জনক।' —সিদ্ধান্তদর্শন, পৃঃ ২০৪। তাঁহার শেষবাণী হিসাবে তিনি তাঁহার উইলে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও রহিয়াছে সর্বের সঙ্গে একাত্মানুভূতির কথা—পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাবে থাকা, পরের অনিষ্ট চেষ্টা না করা, অপরকে প্রয়োজনে সাহায্য করা, সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখা। এ উপদেশগুলি শুনিতে খুবই সহজ—আমরা শুনিয়াও আসিতেছি—কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এ গুলি পালন করিয়া চলিতে হইলে যে ঐতিহাসিক পুরুষোত্তমে ভ্রান্তী স্থিতি প্রয়োজন—নহিলে যে জটিল কুটিল ব্যবহার-জীবনে এগুলি পালন করার মত চিত্তের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না—ইহা অতি সত্য কথা। তাই পুরুষোত্তম-জ্ঞানী হইয়া ব্যবহারিক জীবনে প্রবেশ করিলেই সেই প্রফুল্লতাময় চিত্তপ্রসাদের অধিকারী হওয়া সম্ভব যাহার বলে অন্যের সুখে ঈর্ষা হয় না, অন্যের দুঃখে প্রাণ কাঁদে, অন্যের পুণ্যে হর্ষ হয়, অন্যের পাপকে উপেক্ষা করা যায়।

শ্রীনিত্যগোপাল-প্রদত্ত সাধনা পলায়ন নয়, নিবৃত্তি-মূলক নয়—ইহার জন্য চিত্তের গভীরতর যোগ্যতা প্রয়োজন—সমস্ত ঘটনার মধ্যে আছি, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে আসক্তি-বিদ্বেষহীন উন্নততর জীবন-চেতনায় উন্নীত করিয়া তুলিবার সংগঠনাত্মক সর্বচেষ্টায় যথাসাধ্য আছি অথচ কোন কিছুতে আটকাইয়া পড়িয়া আমার জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করিতেছি না—ইহা কঠিনতর জীবন সাধনা। সমস্ত রকম উপাধিকে হজম করিয়া তাহার অতীত হওয়াই মুক্তি—এ মুক্তির খবর শ্রীনিত্য গোপাল পৌঁছাইয়াছেন—এ যুগের সাধ্যও ইহাই। তাই তিনি যুগদেবতা। বিশ্ব-নাগরিকত্বের, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের, এক-ধর্মের যুগ এটা;—বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও যে একত্ব, আজ তাহাই শিখিবার দিন, জাতীয়তা বজায় রাখিয়া বিশ্বনাগরিকত্ব সম্ভব যে উপায়ে, আজ সেই উপায় অধিগত করার দিন, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, আজ সেই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব কাম্য—এই যুগধর্ম শিক্ষা দিতেই নিত্যগোপালের আবির্ভাব। এ বিশ্বটাকে মায়া মিথ্যা বলিয়া যাহারা ইহাকে ছাড়িয়া যাইতে চান, তাঁহারা তাহা যাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে সংসারটা কচিকর হইল না বলিয়াই সংসারটা মিথ্যা মায়া —এ মামুলী কথাটা আজকের দিনের জন্য নয়; এই বিশ্বে থাকিয়া কোন্ উপায়ে এই বিশ্বের মধু রূপের খোঁজ পাওয়া যায়, কেমন করিয়া শ্রীনিত্যগোপালের মত বলা যায়, 'এই বিশ্বই আমার মহা মঠ,' কেমন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মত বলা যায়, 'বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে, অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে। পরশ যারে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা...' কিংবা 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ। ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন'—সেই উপায় জানিয়া লওয়াই আমাদের প্রয়োজন। শ্রীনিত্যগোপাল সেই উপায় বলিতে পারেন —আমরা তাঁহার নিকট হইতে মধুময় বিশ্বের এই মধুত্ব জানিয়া লইব। বিশ্বজোড়া আজ অস্তিত্বের ভীতি—এ ভীতি ভোগাকাঙ্ক্ষা হইতে জাত—ভোগ করিতে চাই বলিয়াই, একান্ত নিজের করিয়া পাইতে চাই বলিয়াই অস্তিত্বের সর্বদা উপস্থিতিতে এত ভয়—কিন্তু যদি বিশ্বটাকে মধুময়ের আনন্দ-যজ্ঞ বলিয়া জানি, যদি ইহাকে নিজের মত করিয়া ভোগ করিতে না চাহিয়া বিশ্ব-নাগরিকত্ব, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বজনীন এক-ধর্ম আরাধনের ধর্মক্ষেত্র বলিয়া জানি তাহা হইলে অস্তিত্বের ভীতি থাকে না, একে অপরকে নস্যাৎ করিয়া ফেলিবার চিত্তবৃত্তি হইতেও মানুষ মুক্ত হয়। এ মুক্তির খবর শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্বে ও জীবনে আছে। এক শত সাত বৎসর আগে আবির্ভূত হইয়া তিনি যে আধুনিকতম ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা-পুষ্ট এক মুক্ত স্বচ্ছ ঝরঝরে জীবনচেতনার কথা বলিয়া গিয়াছেন, ব্যক্তি-জীবনের সাথে সাথে সমষ্টিগত সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বজনীন মুক্ত জীবনের উপায় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধ্যান করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত

হই, শতবার তাঁহার পায়ে মাথা নুইয়া আসে। আর তাঁহার অন্তরূপে আমার তাঁহাকে ধ্যান করি, তাঁহার জীবন ও বাণীকে নিজ জীবনে গ্রহণ করিতে যার যার সঙ্কল্পবদ্ধ হই—বিশ্বের বুকে তাঁহার উদ্ভূত স্বরূপকে সার্থক করিয়া যেন তুলিতে পারি—ইহাই আজিকার দিনে তাঁহার কাছে প্রার্থনা। মানুষের দেহ মন আত্মা স্বভাব কৃতি প্রত্যেককে তিনি কল্যাণকর করুন, বিশ্ব সুস্থ হউক। জয় শ্রীনিতাগোপাল, জয় শ্রীগুরুযোত্তমানন্দ! *

---

* মহানির্বাণ অষ্টে পঠিত।

রূপময়

॥ শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য ॥

প্রভু, এ কী অপরূপ রূপ দেখালে—
গগনে, পবনে, বনে, প্রান্তরে,
প্রদোষে, নিশীথে, সকালে।
যবে, ঘুম ভাঙা আঁখি
মেলে চেয়ে থাকি,
তোমার উদার আকাশে,
কী রূপ বিকাশি'
রবি ওঠে হাসি'
অরুণ দিনের আভাসে,
যেন, লক্ষ কিরণে হিরণ-কিরীট
নব প্রভাতের কপালে।
মোর, মুগ্ধ মন ভাবে সারাক্ষণ
কী মন্ত্রে তারে জাগালে।

যবে, সারা দিবসের ক্লান্তি বহিয়া
ফিরে আসি নীরে ঘরে গো,
হেরি, অস্ত রবির ম্লান আঁখি হতে
গোধূলি-অশ্রু ঝরে গো
প্রভু, এ কী বেশ তব নিশীথে,
কোন্, বিরহীর বেদনার সুর
বাজাও নীরব বাঁশীতে,
মোর, মর্ম গলারে কেন তারি ভাষা
নয়নে অকোর ঝরালে,
ওগো রূপময়, চির লীলাময়,
এ কী ভাবে মোরে ভরালে।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(৯)

নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, আমার জীবনধন, দিন যায়··তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই, আমার অহংকার দাও, মানুষের অহংকার দাও,···জগন্নাথ, নিত্যগোপাল, তোমারই কথা শুনাইতে, তোমারই আসন গড়িয়া তুলিতে আমার সকল প্রচেষ্টা···তোমার ঐ পাদপদ্ম বুকে লইয়া বসিব, তোমারই পাদপদ্ম মস্তকে ধরিব—একদিন তোমার ঐ পাদপদ্ম মাথায় রাখিয়াছিলে, বুকে রাখিয়াছিলে···সেই পাদপদ্ম আবার আস্বাদন করিতে চাই—দেখা দাও, আমার নিত্যগোপাল, কথা কও—আমার বুকে আমার মাথায় তোমার পাদপদ্ম স্থাপন কর, আমার ঠাকুর, আমার স্বামী—কতদিন তোমার স্নেহাদর পাই নাই—তোমার সান্নিধ্য, তোমার স্নেহ স্নান করি।—

সন্ধ্যা—একদিন ঠাকুর, নিত্যগোপাল নৌকাযোগে নবদ্বীপ যাচ্ছেন—নিজের নৌকা নয়—কলকলের খেয়া।—ঠাকুর বসে আছেন—কয়েকটী ভক্ত আছেন—যাত্রীরা কেউ কেউ নৌকায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে—এতে কারো পা ঠাকুরের গায়ে লাগছে, কারো ঠ্যাং ঠাকুরের ওপর দিয়ে উঠছে, কেউ বা ঠেলছে।···ঠাকুর তাদের ঘুম ভাঙাতে নিষেধ করলেন···ওরা আরামে ঘুমুচ্ছে।···আমার জীবনে অনুরূপ ঘটনার কথা বলি—রাঁচুড়া থেকে ফিরছি—ট্রেনে এক দল লোক ঘুমুচ্ছে—যিনি ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন বললেন, ওদের তুলে দি। আমি পারলাম না, বললাম থাক। মনে হল, বহুযাতনাম্ করি—যা কি সন্তানদের ঘুম ভাঙাতে পারতেন?···আমরা ঠাকুরের মত কষ্ট করতে পারি না—তিনি কাদা খেয়ে বেদনাতার রস খেয়ে কাটিয়েছেন—আমরা অত পারব না—তবু অন্যের অসুবিধা ঘটিয়ে কখনও নিজের সুবিধা চাই নি।··· পুনর্জন্মের বাদরের গল্প—মানুষের নিজের সাধ্যে মানুষ বাঁচে না,··আমি ভাল কি মন্দ তা আমার চতুর্দিকের লোক কি বলে তা দিয়েও বিচার করতে হবে।···

বিরাট পুরুষ—আমার স্নেহের হাতটা চোখের সঙ্গে, চোখটা কানের সঙ্গে, কানটা নাকের সঙ্গে···এমনি এক অন্য অপর অঙ্গের সঙ্গে একটা জালের মত গাঁথা। তেমনি আমি বিশ্বের প্রত্যেকের সঙ্গে জালের মত আটকা—এটাই নিত্যগোপালের 'আমি বিশ্বনাগরিক' তত্ত্ব। ···আমার কথা বলে আমি খালাস—তা হবে না—আর একজন সেটাকে কি ভাবে নিচ্ছে তা দেখতে হবে। তাই আমার একজনার সুখের জন্য সংসারে আসি নি—সর্বত্র একটা পারস্পরিকতা···। এতদিন মানুষ নিজ বোধ নিয়েই চলেছে কিন্তু আর তা চলবে না—তুমি কল ঘড়ি দিয়ে রেখে কলের জল নিয়ে গেলে, তারপর সমানে জল পড়ে যাচ্ছে—আর আর এ চলবে না, চলা উচিত নয়—তবু আমাদের তো আজও চৈতন্য হয় নি—তাই আজও এ আমাদের দেশের মানুষ চালাতে পারছে—একজন কল বেঁধে রাখতে পারছে, আর একজন জল পড়ে যাচ্ছে দেখেও তার প্রতীকার করছে না—সবাই বেশ আছে—দেখে আমার বুক ফেটে যায়।···অন্যের সব চেয়ে কম প্রয়োজন থাকবে···সম সুখদুঃখ হবে···।···একলা কে কি করতে পারে? চাই পারস্পরিকতা···আত্মা সর্বভূত—রাম অযোধ্যার কোটে রাজা হতে পারবে না—রাম শবরী, গুহক, হনুমান, রাবণ—সকলের ভোট সংগ্রহ করতেই বনে যান।···আমার সম্পর্কে আমি যে সার্টিফিকেট দেই, অন্যে তা দেয় কি না।—আজ হোক কাল হোক ধরা পড়তেই হবে।···নিন্দা করবে না, সমালোচনা করবে না—আমার সুখের সঙ্গে তোমার সুখ জড়িত—আমি প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণকে বজায় রেখে আমার স্নেহের মধ্যে

তাদের এনেছি—প্রাণপণ করে মানুষকে চেয়েছি—মানুষের ভাল করতে চেয়েছি—তোমাকে কে কি বলে সেইটে দেখতে হবে—নিজের ত্রুটির আলোচনা করবে—নিজের বাহাদুরী নিজে করো না—নিজের স্বীকৃতি এবং বিষের স্বীকৃতি সকল ঘটনার এই দুটো দিক।...সকল উপদেশের সেরা উপদেশ—মানুষকে ভালবাসা।

২. ৮. ৫৬। যার যেন মোর সকল ভালবাসা...ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি...পতির জন্য পতি ভাল লাগে না, সেখানে আত্মবস্তু আছেন বলে ভাল লাগে; পুত্রের জন্য পুত্র ভাল লাগে না—সেখানে আত্মবস্তু আছেন বলে পুত্র ভাল লাগে—ধনজনের মধ্যেও ভগবান আছেন—তাই তা ভাল লাগে—সবই তো আত্মা;...সব আবরণ দিয়ে তোমায় ভালবাসব।...মূর্তিমান ভক্তবাঞ্ছা তুমি, মথুরার কারাগারে তোমার জন্ম—সেখানে তোমার স্থান হল না—পিতা বসুদেব ঐ ভক্ত বৃষ্টির মধ্যে তোমায় নিয়ে এলেন—পড়ে গেলে তুমি যমুনার জলে—শিয়াল পথ দেখাল...এই তো তোমার জীবন।...নিতাগোপাল, যারা আমার সেবা করতে এত কষ্ট করছে তাদের ভাল রাখি, আরামে রাখি, আমার এমন কোন সামর্থ্যই নাই; তুমি তাদের কোলে করে রেখো, তাদের প্রেম দিও; জ্ঞান দিও, ভক্তি দিও, তাদের দেহ সুস্থ রেখো।...অবধূত সম্প্রদায়ের আদিগুরু শিব, মাতা কালী—আমি কালী-কুমার, নিতা-গোপাল কালীকুমার।...

সন্ধ্যা—ভগবানকে দুইরূপে পেতে হয়—এক ভগবান-রূপে, এক ভক্ত-রূপে। গৌড়ীয় মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের কৃষ্ণমন্ত্র ১৮ অক্ষরে—কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপিজন-বল্লভায়।...কৃষ্ণকে পেলাম কিন্তু কৃষ্ণের জনকে পেলাম না, তা চলবে না। কৃষ্ণের দুইরকম প্রকাশ—কৃষ্ণরূপে ও ভক্তরূপে—ভক্তের হৃদয়ে মোর নিয়ত বিশ্রাম...। অম্বরীষ রাজা খুব অতিথিবৎসল; একদিন দুর্বাসা পারণের পূর্বে উপস্থিত—দুর্বাসা স্নানে যাইয়া আর আসেন না—এদিকে পারণের সময় চলিয়া যায়—অতিথিকে ফেলিয়া জলগ্রহণও পাপ, সময়ের মধ্যে জলগ্রহণ না করিলেও প্রত্যবায় হয়।... অবশেষে সকলের পরামর্শে অম্বরীষ পিপিরিধু গ্রহণ করিলেন। তখন দুর্বাসা আসিয়া মহা ক্রুদ্ধ—অতিথিকে ফেলিয়া খাওয়ায় অম্বরীষকে তিনি জটা ছুড়িয়া মারিলে সে জটাগ্নি হইতে ভক্তকে রক্ষা করার জন্য নারায়ণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। নারায়ণের চক্র হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য দুর্বাসা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ঘুরিয়া অবশেষে নারায়ণের কাছে যাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে বলিলেন। নারায়ণ বলিলেন, দুর্বাসা, আমার ভক্ত অম্বরীষ—তার মত ভক্তের কাছে তুমি অপরাধী; অম্বরীষ ক্ষমা করিলে ক্ষমা আছে—সাধবো হৃদয় মহ্যম্—সাধুরা আমার হৃদয়...আমার প্রীতির জন্য যারা সাধু, তারা আমার কলিজার মাংস—আমাকে ছাড়া তারা জানে না, তাদের ছাড়া আমি জানি না—তুমি তার মধ্য দিয়ে আমার কাছে অপরাধী—তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ভগবান ও ভক্তত্ব। আমি কে?—তোমাদের দিয়ে আমি—তাই আমাকে পেতে হলে তোমাদের মধ্য দিয়েই আমাকে পেতে হবে।...বহিপালের অগদীশবাবু বলেছিলেন ভক্তত্ব হচ্ছে ভগবানের বাহুল্য—বাহুল্যকে নিলেই ভগবানকে পাওয়া যায়—ভক্ত ও ভগবান দুই-কেই ভালবাসতে হবে। আমাকে ভালবাসবে কিন্তু আমার ভক্তকে ভালবাসবে না—তা হয় না। আমাকে ভালবাসা অর্থ আমি যাদের ভালবাসি তাদেরও ভালবাসা।...দোষ করে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তের কাছে দোষ করে ভক্তের কাছে ক্ষমা চাওয়া যায়।...গোপীভাব ও মঞ্জরীভাব—মহাপ্রভু মঞ্জরীভাব প্রচার করে গেছেন—কেননা তাতে অহংকার থাকে না—লাভ থাকে না...দুর্গাপ্রসাদদাদার গান—

আমার প্রাণহরিকে যে ভালবাসে
তার মত আর বান্ধব কই...

...ভ্রাতৃসঙ্ঘের নাম পিতা—পিতা প্রতিষ্ঠিত পিতার সংসারে—ঘটাকে ভালবাসা ভাবুকতা, স্ত্রীকে ভাল না বাসলে...বুদ্ধও এই সাধনা দিয়ে গেছেন—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি... নিত্যগোপালের সেবাশ্রী স্মরণ রাখিও...। মধুর হও, মিষ্টি হও, সকলকে ভালবাস।...

৩. ৬. ৫৬।···ওগো দ্রষ্টা, এই বিশ্ব তোমার তপস্যায় গড়িয়া তোলা—সৃষ্টির আনন্দে এই বিশ্ব পাগল...সংযমে সৃষ্টি হয়...। আমায় কৃষ্ণগোপাল ঘনাকৃতি, তোমার সৃষ্টি-কৌশল আমায় শিখাইয়া দাও—কূর্মের মত সর্বংসহা জীবন যাপন করিতে—বেদ দাও, তোমার জ্ঞান দাও, যে জ্ঞানদ্বারা আগামী বিশ্বের পরিধায় সমাজ দাও গড়িয়া উঠিবে; সেই জীবন প্রদান কর যে চরিত্র লইয়া নবীন সৃষ্টির বুকে উন্নতোজ্জ্বল রূপে দাঁড়াইতে পারিব; সকল অত্যাচার, সকল অবিচার সহিবার মত শক্তি দাও—কচ্ছপের মত শক্ত পিঠ দিয়া এই আশ্রম মঠ মন্দির ধারণ করিব।···

তুমি যখন—তবু স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে তোমার বিক্রম প্রকাশিলে।··· কল্কিরূপে শোষণ হইতে মানুষকে বাঁচাইলে ত্রাসরূপে তুমি দিব্য কল্কির, হলধররূপে তুমি কৃষি সভ্যতার প্রচার করিলে, বুদ্ধরূপে শুভ্র সভ্যতা সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলে —বুদ্ধং-ধর্মং-সঙ্ঘং—সঙ্ঘশঠমে সকলের মত পরিণাম করিবার মত দুর্জয় চরিত্র চাই—চাই পারস্পরিক সহযোগিতা—সেবাবৃত্তি লইয়া পরস্পরের পায়ের কাঁটা পরস্পরের তুলিয়া ফেলা চাই...তুমি কল্কিরূপে অন্ধ সভ্যতার পরিণাম করিলে—নিত্যগোপাল, তুমি মহামৈত্রী মহাকরুণা, মহাপ্রেম— ···

সন্ধ্যা—কায়েনবাচামনসা ইন্দ্রিয়ৈর্বা...জাগ্রৎস্বপ্নে কাকে বলে?···কায় বাক্য মন ইন্দ্রিয় দিয়া তুমি যা কিছু কর নারায়ণায় বলিয়া সমর্পণ করিও, কায়মনবাক্যইন্দ্রিয় সব দিয়া ভগবৎসেবা করিও···নরনারায়ণ আশ্রম এই ভাবের হইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। আমি কখনও শোষণকারী বাক্য, অপ্রীতিকর বাক্য, অহংকারপূর্ণ বাক্য বলি না—তোমরাও বলিও না—আমার নির্দেশ তোমরা মানিয়া চলিও।...অর্জুন যতক্ষণ যুদ্ধকে নিজের ধর্ম বলে জানলেন, ততক্ষণ তাঁর কর্মের সঙ্গে টক্কর লাগে—যখন কৃষ্ণের ধর্ম তাঁর ধর্ম হল, তখনই অর্জুনের কর্ম সার্থক।···আমার মত করে করে তাহাদের সমর্পণ হয় না—তাঁর নির্দেশকে কর্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলব—এই হচ্ছে কথা।··· জীবনে একটা খোঁচা ছিল, সে খোঁচায় এসেছ—এখন পুরুষোত্তম-জীবনকে সামনে রেখে বিশ্বসেবাবুদ্ধিতে আমায় নির্দেশ মানতে হবে।···নরনারায়ণ আশ্রম এই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে।··· আমি শোষণ করলে নিজ করতে পারতাম—কিন্তু আমি শোষণ করব না—তাই আমি ভিখারী।···পারস্পরিক আলোচনা সব সময়ে করতে হবে—নেহরু পাকিস্থানের মত দেশের সঙ্গে পর্য্যন্ত সব সময় আলোচনা করে সমাধান করতে চাইছেন, যে পাকিস্থান এত এবড়ো, এত দুর্মুখ।···গোবিন্দলেবার যে কথা প্রযুক্ত হবে, সে কথায় কাঁজ থাকবে না, অপ্রীতি থাকবে না, থাকবে প্রেম, মাধুর্য···। মিষ্টি হও, মধুর হও, অহংশূন্য হও—পরম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এগুলি অভ্যাস কর— তা হইলে ধরার ধূলি হবে ব্রজ-ধূলি, ধরার মানুষ হবে বিশ্ব-মানুষ··· ।

৪. ৬. ৫৬—সকাল। গোরা] কৃষ্ণগৃহীতমানস ...। শ্রীরাধা বৃষভানুনন্দনপুত্তলী, তুমি গুর্বোর্পিতা গুরোস্নেহাঃ··· কৃষ্ণ-প্রেম উন্মাদিনী, তুমি জীবনের পরম প্রয়োজন আস্বাদিলে—জীবন লইয়া তুমি পুতুলখেলা খেল নাই, গন্ধোন্মাদিতষেণবা, তুমি যে পথে চলিয়া গিয়াছ, তাহারই গন্ধে বেণব উন্মাদ হইয়া ছুটিয়াছেন···প্রকৃতির তুমি সার্থক রূপ ··মরণ লইয়া তুমি খেলিয়া গিয়াছ...ব্রজের পথ ধরিয়া, বিশ্বের প্রাণ-পথ ধরিয়া তুমি চলিয়া গিয়াছ··· আমার প্রকৃতি তোমারই চরণে পরাপ্রকৃতিতে গড়িয়া উঠুক—কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণ-গরবিনী, কৃষ্ণ-আমোদিনী,...আত্ম-নিবেদনময়ী···আমার সকল তোমার চরণতলে নিঃশেষ করিয়া দিব—আমি শূন্য হইয়া যাইব। মানুষের—জীব জগতের—কাহার তুমি ঘনীভূতরূপ—দুঃখমোচনধন,··· দুর্যোগময়ী শ্রীরাধা আমার প্রাণবল্লভা—তোমারই চরণে আমার দেহমনপ্রাণ লুটাইয়া পড়ুক—আমি তোমারই।···

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(১৫)

সকাল ৭টার পর আফিস যাই।...প্রতিভা ব্যাঙ্ক ও পোস্টাফিসে যায়।...রেণু জেপুটি কোল কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে। রেণু এখানে আসে ২টার পর। ৪টার পর রবীন আসে।...নকুল ঘোষ আসিয়া বসিয়া আছেন। অতীনবাবুকে ১খানা উজ্জলভারত দেই। রবীন 'সম্ভবামি যুগে যুগে'-র অর্থ জিজ্ঞাসা করে। 'ক্ষণে ক্ষণে' তো ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সম্পূর্ণ হইতেছেনই, কিন্তু একটা যুগের ধর্ম-গ্লানিকে গায়ে মাখিয়া এবং তাহার অর্থ আস্বাদন করিয়া ও আস্বাদন করাইয়া তিনি সমাজের বুকে প্রত্যক্ষ শরীর লইয়া সম্ভূত হন। না হইলে যুগ ত্রাণাই হইতে পারিত না। চাই একটা concrete আদর্শ, abstract ideal-এ ব্যক্তি বা সমাজ গড়িয়া উঠে না। অবতারই impersonal person। তিনিই দেহপ্রাণমন আকর্ষণ করিতে পারেন; ব্রহ্ম-পরমাত্মার সে যোগ্যতা নাই। পিতার স্তর হইতে একটি আকর্ষণ আছে বলিয়াই পুত্রদের সহজভাবে পিতার স্তরে উঠিবার সুযোগ থাকে। আমি কখনও আমি-কে ডিঙাইয়া উপরের স্তরে উঠিতে পারে না, যদি না প্রত্যক্ষ একটী পরম 'আমি' তাহাকে আকর্ষণ করে। 'গৌর এলো হে'—ইহা ভগবদ্বিরোধ। তিনি তো আসিয়াই আছেন, আমরাই গরহাজির। আমার আঙিনায় দাঁড়ানো ভগবান্‌কে সহজ জীবনে বরণ করিয়া লওয়াই সাধনা। তাঁহার জীবন দিয়াই তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। রেণুর সঙ্গে অনেক কথা হয়। যত কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে, ততই 'মামেকং শরণং ব্রজ'-কে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নচেৎ বাহিরের প্রশংসা, বাহিরের আকর্ষণ ছোট আমিকে বাড়াইয়া তুলিবে।...

১৪ই অক্টোবর

...আমরা ঢাকুরিয়ার জন্য ৫টার পর রওনা হই।... ৫।০টার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন, আমি সভাপতিপদে বৃত হই। রবিবাসরের সম্পাদক, সুধীরা মজুমদার, ডাঃ প্রমোদ ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। উষা মজুমদার আবৃত্তি করে 'এবার ফিরাও মোরে'। ধীরেন মজুমদার সভাপতি বরণ করেন। ফণীবাবু আমার বরিশাল কলেজারেন্সের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেন, রবিবাসর সম্পাদকও। ফণীবাবু বলেন, আজিকার সভায় যোগ দিবার আকর্ষণ ছিল ৩০ বৎসর পরে শরৎবাবুর সঙ্গে পুনরায় পরিচিত হওয়া। আমি সর্বশেষে বলি। ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে কোন্ সংস্কৃতি বুঝিব? সহরের সংস্কৃতি না বুদ্ধের সংস্কৃতি? সর্ব সংস্কৃতির সমন্বয়-মূর্তি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্টিই বর্তমান যুগ-কৃষ্টি। প্রাণের কৃষ্টি বাদ দেওয়ার ফলেই এ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদ আসিয়াছে। আজ পরিপাক করিয়া আগাইয়া চলার যুগ। যে কৃষ্টি কেবল বাদ দেয়, পিছনে সরিয়া আসে, সে কৃষ্টি বর্তমান যুগের নয়।...

১৫ই অক্টোবর

...তাহাকে (ধীরেন ডাক্তারকে) একখানি খদ্দরের কাপড় দিব ইচ্ছা হইয়াছে। তুকারাম যে কাপড়খানি আমাকে দিয়াছে, সেইখানিই দিব। আজ আসিবে না, কাল দেখা হইবে। সকালে একবার রেণুর ওখানে যাই। সেখানে বিমলা কুমার দাশগুপ্ত আসে, তাহাকে লইয়া আশ্রমে আসি। তাহার সঙ্গে কথা হয়—উজ্জলভারতের সঙ্গে যুক্ত হইবার বিষয়ে। তাহার দীক্ষা হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল গুরুতরুর কাছ হইতে

গায়ত্রী মন্ত্র নিয়াছে। আমি বলিলাম, উহাতেই হইবে। তবে মন্ত্রচৈতন্য করার জন্য একটী মানুষ চাই, যাহার জীবন্ত স্পর্শে মন্ত্রশক্তি জাগ্রত হইবে। সে মহাষ্টমীর দিন আমাকেই উহা করিতে বলে। আমি বলিলাম, আমাকে ভালবাসিও। তাহার সঙ্গে আমার যে নিবিড় যোগ আছে, তাহার ভিতর দিয়াই ঠাকুর অবতরণ করিবেন। আমাকে প্রাণ দিয়া জড়াইয়া থাকিলে আমিও উদ্ধার পাইতাম, তাহারাও উদ্ধার পাইত।···কোন্ পথে কেমন করিয়া আমার কাছ হইতে দূরে সরিয়া পড়া সম্ভব, তাহা রেণুর সঙ্গে আলোচনা হয়। আমার কথা হয়েণ ভাল বলিতে পারিত না, কেননা আমি যে নিজ জন, নিজ জনের কথা বলা তো আত্মপ্রশংসাই। কেহ আমাকে নিয়া আত্মপ্রশংসা করিতে রাজী নয়। এখানেই থাকিয়া যায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এই পথ ধরিয়া মানুষ সরিয়া যায়। নিতাই গৌরের প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেই গৌর-নিতাই এক অদ্বৈত থাকিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। আমার ভিতর এমন কিছু ছিল, যাহারই ক্রমপরিণতি আমার বর্ত্তমান অবস্থা, ঠাকুর নিমিত্ত মাত্র ইহাও প্রকারান্তরে আত্মমহিমা প্রকাশ। যাহা বর্ত্তমানে দেখিতেছি, তাহাই বাস্তব সত্য। ১টার পর ফিরি।

১৬ই অক্টোবর

৮৷৷ টায় রেণু সহ চাকুরিয়া বিনোদবাবুকে দেখিতে যাই। সঙ্গে অগস্ত্যদেবের প্রসাদ নেই, বিনোদবাবুর মুখে দেই ও কিছু রাখিয়া আসি। পরে বীরেনবাবুর বাসায় যাই।···শৈলেনবাবু আসেন, পরে রবীন। উদ্বোধনের ১ম বর্ষের মহাপূজা রেণু পাঠ করে। ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে আমরা ঐকদেশিক কৃষ্টি বুঝিব না, সর্ব্ব-কৃষ্টিময়ী কৃষ্টিই ভারতীয় কৃষ্টি। ভক্টর ব্রজলীর লেখাটী যাহা ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের প্রথম সূত্রের নীচে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কথা বলি। শৈলেনবাবুরও ইহাই মত। বীরেনবাবু বলিলেন, কে বলিয়াছেন যে স্বামিজীর বক্তৃতার একটী লাইনই একদিনের বক্তৃতার বিষয় হওয়া উচিত। একত্র এত কথার সমাবেশ থাকে যে উহা ধরা খুব কঠিন। সত্যই। এখন সকলের সব বক্তৃতা থামিয়া গিয়া এই কথাটীরই প্রচার হওয়া উচিত ছিল। পরে বীরেনবাবুকে সঙ্গে করিয়া বিমলা দাসের বাসায় যাই।···

১৭ই অক্টোবর

···সর্ব্বসংহার-মূর্ত্তিস্বরূপা মহাকালী, সর্ব্বশক্তি মহালক্ষ্মী, অহঙ্কার-মূর্ত্তিস্বরূপা মহাসরস্বতী। তাহার পর বিজয়ার আবির্ভাব সর্ব্বপ্রতিবিরোধের আবাহন।···উচ্চস্তরে বিচরণ করিতে পারিলে নীচের সব বাধা কেমন করিয়া ডিঙ্গানো যায়, কেমন করিয়া পথ পরিষ্কার হয়, তাহা রেণুর সঙ্গে আলোচনা হয়।···

১৯শে অক্টোবর

···৬টার পর বিজয়ার 'যাত্রা' সভার অনুষ্ঠান হয়।··· রামচন্দ্র আজ রাবণ বধ করিয়া 'বিজয়' লাভ করিলেন— বিজয়ার মূলসূত্র এইখানে। জীবনের সকল স্তরে বিজয় লাভ হউক। 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে' বাণী সার্থক হউক, পথ শিব হউক, সকলের মরণ দূর হউক, ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-রেণু, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।···

২০শে অক্টোবর

সকালে বীরু-জিতু আসে, তাহার পর চিদানন্দ। গোলাপদিদি বিজয়ার দিন নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, চিদানন্দের কাছে শুনিলাম।···অবতার-জীবনে ফুটিয়া উঠে সেই যুগের গ্লানির একটি চিত্র, তাহার ব্যাখ্যান ও মীমাংসা; নিত্যগোপাল-জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন 'ধর্ম্মান্ কামিনাং হৈতুং প্রীণাতু দুরাত্মতাম্'। যত বড় অভিযোগই নিত্যগোপাল সম্বন্ধে করা হউক না কেন, আমি তাহা স্বীকার করিয়াই ওঁহাকে বেকসুর খালাস করিবার সাহস রাখি। শরৎবাবুর 'সাবিত্রী' তাহার সম্বন্ধে সব বিরূপ আলোচনাকে মানিয়া লইয়াই তাহা হইতে নিজ কার্য্যকৌশলদ্বারা মুক্ত হইয়াছিল। নিত্যগোপালও তাহা পারিবেন্। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, 'নিত্যগোপালের অধঃপাত অবস্থা'। অবস্থায় যিনি অবধূত,

তাঁহার সম্বন্ধে পরে বলা, 'দাদু সাবধান, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'—এই বাক্য নিতান্তই inconsistent। হয় তিনি ঠিক ঠিক নিত্যগোপালকে বুঝেন নাই, নয় তো তিনি বলিয়াছেন বলিয়া যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা ভুল।···কাহারও সঙ্গে জড়াইয়া পড়ার অধিকার মুক্তের নাই। মুক্ত সকলের, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বক্ষেত্রের, অথচ কোনটারই নয়। আমি আমার জীবনকে এমনই ভাবে চালাইয়া আসিয়াছি। কোনও অভিসন্ধি আমার নাই। নিত্যগোপাল জীবন ও দর্শনকে প্রকাশ করিয়া যাওয়াই আমার ব্রত। রামকৃষ্ণ হইতে বিবেকানন্দ যেমন কিছু বেশী আগাইয়া গিয়াছেন, আমিও নিত্যগোপাল জীবন ও দর্শনকে আরও বিস্তার করিয়াছি।···

২১শে অক্টোবর

সকালে রেণু আসে। ব্রহ্মসূত্রের যে পাণ্ডুলিপি প্রেসে ছিল সেইটুকু কম্পোজ করিয়া আজ সকালে দিয়া যায় রেণুর কাছে।···সকালে বরিশালের উকিল অক্ষয় কুমার সেন আসেন; আমি বর্ত্তমানে কি করিতেছি, তাহা তিনি জানিতে চান। বৃদ্ধ বয়সে কোন কর্ম না থাকাটা একটা বড় বিপদ। অক্ষয়বাবু আমার কাজ আছে শুনিয়া খুসী। জেলে লেখা ভাষ্যগুলি সব দেখাই। Harmonious development of all our faculties-ই মানুষের উদ্দেশ্য, তাহা তিনিও স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণই এই সামঞ্জস্যের ঘন বিগ্রহ। 'যন্নানাকলনিঃ' শ্লোকটী ব্যাখ্যা করি। পাশের বাড়ীর সেই বৃদ্ধ retired ডাক্তারটীও সেই সময় আসেন। কিন্তু মিষ্টি নেন না। রেণু 'তিমিতোর' পড়ে। ১১।টার পর যায়। শ্রীকল্পদের যদু দাস আসে জগদ্ধাত্রী পূজার পরের দিন রবিবার তাহাদের আশ্রমে বক্তৃতা দিবার জন্য। প্রথমে অস্বীকার করি। যাতায়াত নাই, শুধু একদিন বক্তৃতা দিয়া কি হইবে? ১৪ হইতে ১৫ হাজারের মধ্যে বক্তৃতা দিয়াছি। আর সাধ নাই। এখন ২।৩টী লোক পাইলেই বাঁচি, যাহারা এই তত্ত্বের জন্য সব-কিছু করিতে পারে। উজ্জলভারতের গত মাঘ হইতে গ্রাহক হয়, কার্ত্তিক সংখ্যা পর্য্যন্ত বই দিয়া দেই। ৪টার পূর্ব্বে রেণুকে গিয়া টাবাটা আনিতে বলে। রেণু নিয়া আসে। আসিয়া খবর দেয় যে বীরেন ডাক্তার অসুস্থ হইয়া ট্রপিক্যালে গিয়াছে। আমি ও রেণু যাই।...আসিয়া দেখি চারুবিকাশ বীরেন বাবুদের আসিয়াছেন। মা নীলিমা কিছু মিষ্টি পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিছু পরে রবীনও আসে। বীরেন ব্যানার্জী 'পূতনা' প্রবন্ধের পরের আমার আলোচনাটুকু পড়েন। ব্রজেনবাবু উহা পড়িয়া বলিয়াছেন, উজ্জলভারতের সেরা দুর্বোধ্য হইতেছে। র‍্যাঙ্কের 'exists in jumps' তিনি বোঝেন নাই। আমি ৯।টার পর আসি। 'তিমিতোর' প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে।

২২শে অক্টোবর

সকালে আফিসে যাইবার জন্য বাহির হইয়া সতীন চক্রবর্ত্তীর ওখানে যাই। সেখানে উজ্জলভারত, তাঁহার জীবনের ব্যর্থতা, যে-সময়টুকু আছে তাহাকে সার্থক করা, এই মরণের ভিতর বাঁচাকে সার্থক করার কথা হয়। সেখান হইতে রেণুর ওখানে যাই। রেণু ১০টার পর সোল্টাফিল্ড যাবে যায়, তাহার পরে এখানে আসে। নীলু···পানিহাটীর যতীন মজুমদার ও তাহার স্ত্রী রাণী, নলিনী, রাধাচরণবাবুর পত্র পাই। কুসুমের কোনও পত্র পাই না।···৬টার পর হরিদাসী ও অন্নার ওখানে আমি ও রেণু যাই।···কিছু পরে প্রতিভাও যায়।...প্রকৃতির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ হইলে যে প্রকৃতি বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপিণী হন, পথ শিব হয়, তাহার আলোচনা করি। প্রকৃতি বন্দিতে মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি। জীবনে মায়ের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি, স্ত্রীর করুণাও পাইয়াছি। বাকী পথটাও নিরাপদ হইবে যতখানি আমি প্রকৃতির দিক হইতে প্রাণঢালা স্পর্শ পাইব। যেখানে প্রকৃতি পুরুষ এক অদ্বৈত, সেখানেই বাধা তিরোহিত। সমস্ত বাধার উদ্ভব প্রকৃতি-পুরুষের সামঞ্জস্যের অভাবে।... ৬টার ট্রপিক্যালের জন্য রওনা হই। ৭টার কিছু পূর্বে বীরেনের ওখানে পৌঁছি।···৯টায় রওনা হই। ৭টায়

পৌঁছি। ধীরেন ব্যানার্জী আসিয়াছিলেন, কিছু আলোচনা হয়।···৯টায় আশ্রমে ফিরি।···

২৪শে অক্টোবর

মঠে একবার ঠাকুরকে দেখিয়া আসিবার জন্য খুব ইচ্ছা হইতেছিল। ঠাকুর জগন্নাথ ইহা আমার জীবনে নিশ্চিত সত্য। আমি যে তাঁহাকে 'স্বামী' ভাবে ভালবাসিতাম, তাহাও তো তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আমার আমার নিত্য বন্ধু, নিত্য স্বামী। অথচ আমি তাঁহার সঙ্গে একাত্ম হইয়াও তো সকল আবেষ্টনকে গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না। তবে কি আমি ভালবাসি না? কিন্তু 'ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে' তিনি ছাড়া আমার কেহ নাই। ভালবাসি কি না বাসি, তিনিই আমার গতি। মঠে ঘণ্টা দুই থাকিয়া, ঠাকুর ঘরে একটু দেখিয়া সেখানের লোকদের সঙ্গে দেখা করিয়া,···প্রসাদ পাইয়া অফিসে আসি। দুপুরের পর শিক্ষক দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি চণ্ডী সম্বন্ধে বই লিখিয়াছেন) আসেন। তাঁহার সঙ্গে আমার দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি বেশ আমাদের বই পড়েন। তাঁহার ভাল লাগে। ···অতীতের চিঠিগুলি ছাপাইয়া রাখিবার কথা হইতেছে।

২৫শে অক্টোবর

সকাল ৬টায় পর সাপুর বাসে বেহালা যাই, লোলের গোড়া হইতে হাঁটিয়া। ৮টায় পর হাঁটিয়া ও বাসে চলিয়া আসি। আসিবার সময় ভাইপো ছিতেন ঘোষ ও তাহার পুত্রবধূ সেখানে উপস্থিত হয়। দাদা হাজেরের একটী উক্তি বলিলেন—'বিপদের ঝটিকা যদি ঘর্ম মর্ত্যকে ছিন্নভিন্ন করে, তথাপি আমি সখার প্রতীক্ষায় নয়ন স্থাপন করিয়া রহিব।' বেশ লাগিল। উহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া আসিলাম। শান্তিপুর নগেনবাবুর ওখানে যাইবার কথা আলোচনা হয়। বেহালা যাইবার পূর্বে অফিসে গিয়া রেণুর কাছে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দিয়া আসি। উহা ৬টার পর উঠিয়া মুখ ধুইয়া দেখি, তাহার পর প্রার্থনা করি।···সকালে সত্যব্রতের কাছে এখানে নশ্বরাশীর X-Ray করার কথা, অর্থাভাবের কথা, বাড়ীভাড়ার কথা যাহা কিছু বলিলাম, কিছুই উত্তর করিল না। চুপ করিয়া রহিল। আমি সাধিয়া বোম্বেতে রং পাঠানর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। চিঠি দিয়াছে, উত্তর না আসিলে অধীরবাবু শনিবার বোম্বেতে যাইবে কথা আছে। রেণুর কাছে বলি—মাত্র একটি হাজার টাকা যদি উদ্বোধনকার্যে দিতে পারে, তবে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া আগাইয়া যাইতে পারিব। সকলেই দাঁড়াইতে পারি। আমি খোলা প্রাণে লোকদের কাছ হইতে নিতে পারি বলিয়াই পথ আমার সহজ। আমি তো বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা সর্বাবস্থায় আস্বাদন করিতে চাই। কে আমার রিক্ততাকে পূর্ণ করিবে? ২টার পর ফিরি।

২৬শে অক্টোবর

সকালে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি। রেণু ১২টায় আসে। তখন সকালে খাওয়া দাওয়া করিয়া ১২টায় আমি রেণু নশ্বরাশী ট্রপিক্যালে যাই। ট্যাক্সী যাতায়াত শুদ্ধ ৭৸০, liftman চারি আনা। X-Ray হইল। ক্যাপ্টেন এস, সি, বসু বরিশালের লক্ষণকাঠির লোক। বেশ ভাল ব্যবহার করিলেন। আমার পরিচয় ও বর্তমান কার্যপন্থা বলিলাম। lungs-এ সামান্য মাত্র দাগ (focus) আছে, আর ইনজেকসন করিতে হইবে না বলিল। ধীরেনের সঙ্গে কথা হইবে। কাল তিনটার সময় গিয়া রিপোর্ট আনিতে হইবে। তাহাকে 'উদ্বোধনকার্যে' দিব বলিয়া আসিয়াছি। সহকারীর সঙ্গেও সামান্য কথা হইল। সে নোয়াখালীর লোক। ট্রপিক্যালে যখন ছিলাম, খুব বৃষ্টি হইতেছিল: আজ বৃষ্টি থাকিতে আসি। বৃষ্টির জন্য রেণু আর কলিকাতা গেল না। আজ মনটা বেশ হালকা লাগিল। ঠাকুর বাঁচাইলেন। যে দায়িত্ব আমি লইয়াছিলাম! সকলেই দ্রষ্টা, উদাসীন। আমিই ছিলাম কর্মক্ষেত্রে।···৫টার পূর্বেই যাই। সন্ধ্যার পর হেরম্ববাবু আসেন। তাহার সঙ্গে বরিশালের আচার-ব্যবহার, পূজাপার্বণে যে নদীমাতৃক দেশের সহজ সরল হুলহুলে ব্যবহার ছুটিয়া উঠিত, তাহার বিষয় আলোচনা

হয়। নবাবে বীর বাঁশের নীচে বসিয়া সজলনয়নে সকল ঘরের বহু পদের যাত্রা খাওয়া, বাইচ খেলা, কীর্ত্তন-আরি ইত্যাদির প্রসঙ্গ হয়। সে প্রায় ১ঘণ্টা থাকে।...

২৭শে অক্টোবর

সকালে মধুর ওখানে X-Ray-র রিপোর্ট জানাইবার ও P. A. S কিনিবার কথা বলিবার জন্য যাই।... সেখান হইতে আসিলে যাই। কিছুকাল থাকিয়া আশ্রমে ফিরি। সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই দেখি বীরেন মজুমদার ও তাহার স্ত্রী (চারুবিয়া) আসিতেছেন। বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত বন্যা মারা গিয়াছেন, আজ ৬টায় একটি শোকসভা হইবে; তাহাতে যোগদানের কথা বলিলেন। রেণুর পা অসুখ; সম্ভব হইলে যাইব বলিয়া দিলাম। কিছু কথা হয়। রেণু আসে ২।০টায়। কাজেই যাওয়ার অবসর ছিল না, যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। বড় অসুবিধা।...প্রায় ৮টায় নারায়ণ গোস্বামী ও তাহার বাবা আসে।...পেখিক লবেলের মহাত্মা গান্ধী বই তাহাকে দেওয়া হয়।...কাহাকেও কাছ হইতে যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় না, যাওয়া যদি উচিতও হয়। কাহাকেও তো কাছ-ছাড়া করিতে ইচ্ছা হয় না। ছলালী-বুলু-বেণু-গল্টু প্রভৃতি গেলেও দুখ হয়। আমি মানুষের 'আমি' চাই, অন্য কিছুতেই আমার লোভ নাই। দেহও চাই না, ধনও চাই না। চাই গোটা মানুষ। তাই মানুষ ২।১ দিন আসে, তারপর চলিয়া যায়। হাতের পাঁচ কেহ ছাড়িতে রাজী নয়। অথচ আমি চাই একটী পুরুষোত্তম-আমি-র মাঝে সকল আমির সমন্বয়। ১টার পর আসি।...

২৯শে অক্টোবর

খুব ভোরে কড়া নাড়িয়া নগেন্দ্র চন্দ্র মুখার্জী এম, এ (ময়মনসিংহের অধ্যাপক, বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান) দেখা করে। আমি দুয়ার খুলিয়া দেই। প্রণাম করে। অনেক দিন পর দেখা হওয়ায় প্রথমে চিনিতে পারি নাই। উপরে আসে। আধ ঘণ্টা থাকে। প্রায়ক হইবে বলিল। বৈশাখ ও তার ব্যতীত উজ্জলভারতের সব সংখ্যা দেওয়া হয়। তারপর রেণুর ওখানে যাই। রেণু ১০।০টায় সব তালপে ও কলেজ স্ট্রীটে যায়। ২টার সময় ফেরে।... ব্রহ্মসূত্রের কিছুটা প্রুফ দেই। প্রতিভা ১০ম বর্ষের ফাইল কপি নিয়া আসে। নগেন মুখার্জী Law of uncertainty বা তাহার ভাষায় approximation-এর খবর রাখে। কোথায়ও আর Law-এর প্রভাব নাই, ইহাই সে বলে। 'The ruler and the ruled will be ruled by the same rule'—ইহার মধ্যের rule-এ তাহার আপত্তি। কিন্তু এই rule-এর মধ্যে determinateness নাই, কেননা ruler বা ruled দুইয়েরই সমবক্ষতা আছে।

৩০শে অক্টোবর

.. ৮।০ টার পর রেণু আসে। সে ৯।০ টার পর যায়। আজ সে ১২-২০-র যোগে এয়ারপ্লেনে রাণীগঞ্জ গেল। তাহার কিছু পরেই চিদানন্দ আসে। তাহার সঙ্গে ঠাকুর সম্বন্ধীয় আলোচনা হয়। ব্রহ্মসূত্রের 'যোনিশ্চ গীয়তে' সূত্রটী পড়িয়া শুনানো হয়। কিছু পরেই সুশীল বসু আসেন। আগামী ৭ই নভেম্বর অশ্বিনীবাবুর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে টালিগঞ্জ অশ্বিনীনগরে সভা হইবে, আমাকে যাইতে হইবে। ৯ই নভেম্বর কেওড়াতলা শ্মশানে ও দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে সভা হইবে, সেখানেও যাওয়ার কথা বলিলেন। যাইতে বসিয়াছি এমন সময় অধ্যাপক নগেন মুখোপাধ্যায় আসে। তাহার সঙ্গে ২টা পর্য্যন্ত কথা হয়। পুরুষোত্তম-কৃষ্টি ও সনাতন কৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা হয়। হিন্দু নিবৃত্তি-প্রধান, মুসলমান প্রবৃত্তি-প্রধান; সত্ত্বগুণে দল হয় না, রজোগুণে সহজেই দল হয়, ইত্যাদি আলোচনা।

৩১শে অক্টোবর

ঠাকুর ঘরে প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি, ইহার পর বেণু আসিয়া খবর দেয় যে প্রথম রায় গত রাত্রিতে মারা গিয়াছে। আমি প্রুফ দেখিয়া ৮।০ টায় একবার যাই।

কিছু সময় থাকিয়া চলিয়া আসি।...প্রতিভা প্রেসে ব্রহ্মসূত্রের ১৩শ ও ১৭শ বর্ষের প্রিন্ট অর্ডার দিয়া, যাহাতে টাকা জমা দিয়া বাসায় যায়, ২টার পর ১৫নং।...স্নেহু এখানে নাই, কলিকাতাটাই যেন ফাঁকা লাগে। আমি ও প্রতিভা ৫টার আগেই আফিসে যাই। কিছু পরে ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। তিনি অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'দুই পাখী' ও 'ভারতীয় প্রবন্ধের পটভূমিকা' পড়েন। তখন বৃষ্টি নামে। তাড়াতাড়ি চলিয়া যান।—প্রতিভা প্রেস হইতে উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের ব্লক নিয়া আসে। সতীন সেন বিজয়ার প্রণাম জানাইয়া একটা পোস্টকার্ড দেয়।

১লা নভেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্র ও উদ্বোধনের ব্লক দেখি।... আমি ও প্রতিভা ৫টার আগেই আফিসে যাই। দিনটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইয়াছে। সন্ধ্যার পর ত্রিপুরাশঙ্করবাবু আফিসে আসিয়া ছিলেন, একটু মাত্র থাকেন। 'জয়ী' কেরত দিয়া যান।...আমি ছাড়িয়া দিয়া রাখিব। ঠাকুরের অনন্ত রূপ, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেমের খোঁজ পাইয়াছি, খোঁজ দিয়াও দিতে পারিব। ইহা ফেলিয়া যদি কেহ এখান হইতে চলিয়া যায়, তাহার আমি কি করিব? শুধু চোখের জলে তাহার প্রতীক্ষায় নয়ন স্থাপন করিয়া থাকা ছাড়া আমার আর কি গত্যন্তর থাকিবে? তাড়াতাড়ি আমি করিতে পারিব না—উহা পুরুষোত্তম-দর্শনে নাই। পুরুষোত্তম-জীবনের টানে যে আসে, সে-ই থাকিতে পারিবে। বাহিরের কোনও আসক্তি আমার কাছে নাই। তাই মানুষ আসে আর যায়। আমি বুঝি কেন মানুষ এখানে আসার পর বেশীদিন থাকিতে পারে না। যাহার বিশ্বরূপের আকর্ষণ আছে, সে-ই শুধু আমার কাছে থাকিতে পারিবে। ৫টার আগেই আফিস হইতে চলিয়া আসি। কাল স্নেহু আসিবে। হল কাছে নাই, তাল-আসে না।

২রা নভেম্বর

সকালে সাময়িকী (অগ্রহায়ণ মাসের) 'অকল্পিত আসায়' আরম্ভ করি, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতাটি আনন্দবাজার হইতে খুঁজিয়া বাহির করি, Idea of God হইতে nature-এর brute act অংশটি খুঁজি। প্রতিভা প্রায় ১টায় আসিয়া উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের ব্লক ও ব্রহ্মসূত্রের ১৯শ ও ২০শ বর্ষের ব্লক দিয়া আসে ও ব্যাঙ্ক হইতে জমা পাশ বই নিয়া আসিয়া জয়াদের বাড়ী দুপুরে নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। সমস্ত দিনই মেঘাচ্ছন্ন। দুপুরের পর টিপটিপ বৃষ্টি ও মাঝে মাঝে মেঘগর্জন হইতেছিল। প্রতিভা খাইয়া ফেরে ২৷৷০ টায়। ৪টার পর আমি-প্রতিভা বাহির হইয়া আফিসে যাই, স্নেহু যদি আসিয়া থাকে...কিছু পরে বৃষ্টির মধ্যে স্নেহু রিক্সায় গিয়া উপস্থিত।...যাদবদা আসিয়া ৯নীষ মেকানিক্যাল নিউজপ্রিন্ট-এর টাকাটা চেকে দিয়া যান। এবার ৯০০ ছাপা হইবে বলিয়া কম করিয়া আনা হইল। আমি ৯টার পর চলিয়া আসি, তখন বৃষ্টি ছিল না। ব্রহ্মসূত্রের ১৯শ ২০শ বর্ষের কপি প্রতিভা দিয়া আসে।

৩রা নভেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্রের ব্লক মেলি। ১০টার পূর্বে সুশীল দত্ত আসেন 'অশ্বিনী কলোনী'-র একটি মেম্বারশিপের সন্ধে। ৭ই ঐখানে ৫।০ টায় সভা। ৯টায় দেশবন্ধু বালিকা কলেজে ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত ডাঃ কাটজুর সভাপতিত্বে আমার বক্তৃতা। তৎপরে ৬।০ টায় কেওড়াতলা শ্মশানে আলোচনা। তখনই শিশির আসে।...

৪ঠা নভেম্বর

সকালে নন্দবাবার গত কল্যকার যাত্রির অবস্থা জানাইবার জন্য স্নেহু ওখানে যাই। কিছু পরেই শিশির এখান হইয়া আফিসে যায়। অনেক আলোচনা হয়। 'ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিলে তো ধীরে ধীরে মানুষ টুঁটো হইয়াই যাইবে। সতীশ দাশগুপ্ত এটা করিও না, ওটা করিও বলিয়াছিলেন ইত্যাদি।' আমি গীতার 'অনুবন্ধ

ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করি। কেহ দিনের পর দিন যাতুক—ইহা আমি চাই, কিন্তু নিজের শক্তি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শুধু তাহা সার্থক। যাহা ক্রম পরিণতির মধ্য দিয়া ভবিষ্যতে সম্ভব হইতে পারে, তাহা আজই অনুষ্ঠান করিতে গেলে বিপদ অনিবার্য। তখন সরোজবাসিনীর মত সেবার সাধ মিটাইবার জন্য রাস্তার গরু-কুকুরকে খাওয়াইবার জন্য বাড়ী বাড়ী কেন সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে হইবে। সব কিছুই মানুষ পারে না; শক্তির একটা সীমা আছে।...মাখনবাবু আসেন।...ত্রিপুরাবাবু আসেন এবং রেণুর একটা বই নিয়া যান। কিছু পরেই অমূল্য (পাগলা) যায়।...

৫ই নভেম্বর

...আমি সংসারের বুকে, আমার আবেষ্টনের বুকে ঠাকুরের স্থান রচনা করিব, এই প্রতীক্ষায় আছি বলিয়াই না ইহা সহ্য করিয়া যাইতেছি?...আজ হইতে প্রতিজ্ঞা আফিসেই থাকিবে। আমি প্রায় ১০টায় ফিরি।... প্রতিভা অনেকদিন আগের চিঠিগুলি সকালে ২।৩ খানি পুড়ে। একখানি মহানন্দ অবধূতের চিঠি, অপর একখানি উষাঙ্গিনীর বাবার, আর একখানি উষাঙ্গিনীর নিকট লেখা আমার চিঠি। আগের চিঠি বেশ উপভোগ্য! অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্রটী কত মিষ্টি! একই জীবনধারার দুইটী স্বয়ংসুষমাবান প্রকাশ।...

৬ই নভেম্বর

সকালে সাময়িকী অগ্রহায়ণ মাসের 'মুক্তপক্ষিধ্বনি আদায়' লিখি।...তখন টালিগঞ্জ অশ্বিনীনগর হইতে লোক আসে।...সেখানে গিয়া দেখি সুরেন দত্ত, সুশীল দত্ত, জিতেন গুহ, যোগেশ পাল (গায়ক), উপেন বসু (গায়ক) উপস্থিত। ৪৷৷০টার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। আমি সভাপতি এবং সুরেন দত্ত প্রধান অতিথি। প্রথমে আমি অশ্বিনীকুমারের ফটোতে মাল্যদান করি। তৎপর ২ জনের ২টী সঙ্গীতের পর সুরেন দত্ত বলেন, তৎপরে জিতেন, তৎপর কল্যাণকুমারি চক্রবর্তী (মনোমোহন চক্রবর্তীর পুত্র), পরে সেখানকার এক ভদ্রলোক বলেন। তারপর আমি বলি। এক হাজার বৎসরের ধাপার মধ্যে হিন্দুর করণীয় বিষয় বলি। অশ্বিনীকুমারের Little Brothers of the poor, Friendly union, শনিবার আলোচনা সভা ইত্যাদি স্থাপন করিতে বলি। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ব্যবধান যেন এখানে না থাকে। বেদ-জিয়ামের পলাতক রাজা যেমন নিজ রাজ্য ছাড়িয়াছিল পুনরায় স্বস্থানে স্বগৌরবে যাইবার জন্য তেমন অবস্থা পূর্ববঙ্গবাসীদেরও হউক। নয়া বরিশাল অশ্বিনী কুমারের সাধনা নিলে সে কলিকাতাকেও ধাক্কা দিতে পারিবে।... আফিসেই প্রতিভা যায় ও থাকে।

৭ই নভেম্বর

সকালে রেণুর ওখানে যাই। রেণু ৭৷৷টায় লেক হাসপাতালে ডাক্তার সুবোধ চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করে। ...শিশির আসে। শিশিরের সঙ্গে কর্ম যে প্রসারিত হয় না, কতদূর গিয়া শুরু হয় যদি না জানাও, কর্মারম্ভের দিক তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকে, ইহা আলোচনা হয়। শুরুর সঙ্গে অন্ত যোগ করিয়া অনন্ত হয় না, অনন্ত রহিয়াছে প্রতি অন্তের মধ্যে। যে ছাত্র জানুয়ারী মাসের মধ্যে ডিসেম্বর মাস না দেখে, জানুয়ারী মাস হইতে ডিসেম্বর মাসকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা না করে, ডিসেম্বর মাস তাহার কাছে কাল বা যম। যে ছাত্র জানুয়ারী মাস হইতেই ডিসেম্বরের যাত্রা সুরু করে, তাহার পক্ষে ডিসেম্বর মাস আনন্দক্ষণ, কেননা সে পরীক্ষায় প্রথম হইবে, পুরস্কার পাইবে। সমগ্রের দেশে ডিসেম্বর মাস জানুয়ারীর মধ্যে থাকে।...ইতিমধ্যে সতীনাথ আসে।... motor nerve-এর সঞ্চালনশক্তি যদি sensory nerve-এর সঙ্গে সহযোগিতা না করে, কোন স্পর্শ-অনুভূতিই মানুষের হয় না। আমরা মোটর-এর সঙ্গে sensory nerve-এর সমন্বয়ের তত্ত্বই আলোচনা করি। ইহার পরই বিমলা কুমার দাস (বরিশাল) আসে। ...রেণু সকালে হাসপাতাল ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছিল। ধীরেন বাবু আসিয়াছিলেন সন্ধ্যার পর অফিসে। তাঁহার লেখা

'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' পাঠ করেন।...১টার পর চলিয়া আসি।

৮ই নভেম্বর

শিবরাত্রের তিরোভাব দিবস

সকালে মালতী আসে। ...৪॥ টার পর বেলুড় মহিলা কলেজে যাই। রেণু প্রভিডাও যায়। ডাঃ কাটজু সভাপতি ছিল। আমি বক্তৃতা দেই। পুরুষোত্তম ক্রাইস্ট যাহারা অন্তরঙ্গ অশ্বিনীকুমার মহাত্মাজী। পুরুষোত্তম ক্রাইস্ট মধ্যে রহিয়াছে আর্য্য অনার্য্য, হিন্দু-ইসলাম-বৌদ্ধ, পাশ্চাত্য ক্রাইস্ট সমন্বয়। সমগ্র জীবনেরই ফল বিগ্রহ পুরুষোত্তম জীবন। এই জীবন যাহাদের, তাহারা স্রষ্টা হয়। অশ্বিনীকুমারও স্রষ্টা ছিলেন—ভোগক্ষেত্রের, মোক্ষক্ষেত্রের। ব্রতে ব্রাস করিয়াও ঐক্য ব্রত, বলিশালে থাকিতে চাহিয়াও অশ্বিনীকুমার ছিলেন সার্ব্বজনীন, 'ব্রহ্মাত্তি ভোগঃ ন চ তত্র মোক্ষঃ' ইত্যাদি। ৭টার সময় কেওড়াতলা শ্মশানে পৌঁছি। প্রথমে কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী, পরে হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, পরে আমি অশ্বিনীকুমারের 'প্রাণ' সাধনার কথা বলি। কেমন করিয়া তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত, সৎ-অসৎ, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ সম্মেলন হইয়াছিল তাহার আলোচনা চোখের জলের সঙ্গে করি। রেণু প্রভিডাও ছিল।

৯ই নভেম্বর

খুব সকালে বাসে চাপিয়া হাঁড়ির মোড়ে নামিয়া হাঁটিয়া চলিয়া আসি। পায়ে একটু বেদনা হয়।...রেণু সকালে বাহির হইয়া শক্তি ঔষধালয়, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া ১২ টার পর বাসায় আসিয়া খাইয়া ২টায় আগে এখানে আসে। প্রভিডা আসে কিছু পরে। ...কোনও সর্পাঘাতে মৃত মানুষের সম্বন্ধে বলিয়াছে কপালের রেখা। আমি বলিলাম কপালের উপরে গোপাল, গোপালের ইচ্ছায় কপালের রেখাও মুছিয়া যায়। বাইবেলের সেই রেকর্ডিং এঞ্জেলের কথা বলি। পাড়ার লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পাড়া সাফ না করিলে কেন্দ্রের অন্তরায় বলিয়া থাকা সব দিক দিয়া ব্যর্থতা আনিবে। পাড়া যদি স্বায়ত্তশাসনের দায়ীত্ব না বোঝে, কিসের স্বাধীনতা? মানুষ চায় সেই আগের পরবশতা।...

১১ই নভেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি।...রেণু সকালে সুহৃৎবাবু, হরিদাসবাবু ও নলিনী ঘোষের ওখানে যায়। হরিদাসবাবুকে পায় না। কেশব গাঙ্গুলী পূজার পর আজ আসে।...সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শিলচরের লক্ষ্মীকান্তবাবু, সুরেশবাবু (উভয়েই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্য্যে লিপ্ত) আসেন। তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আফিসে যাই। কিছুকাল কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা যান। পূজাসংখ্যা 'উদ্বোধন' কিনিয়া নেন। ইহার পর মাখনবাবু টেক্সট বুক কমিটীর অনুমোদনের জন্য দেওয়া কিছু বই নিয়া আসেন। দশগ্রামের ঈশ্বর ২জন ভদ্রলোক সঙ্গে আসে। ঈশ্বরের সমস্যা:...সরকারী চাকুরী না-করার পরামর্শ দিলাম। সরকার ও জনসাধারণের স্বার্থ কোনও দিনই এক হইবে না। জনসাধারণের সঙ্গেই জনসেবক থাকিবে। দশগ্রামের কোন ক্ষতি না হইলে বালিকা বিদ্যালয়ের ভার নিতে পারে। উহারা ২জন গ্রাহক হন। ৪৲ টাকা দুইজনে দিয়া যান। আগামী মাসে ঐ স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষে যাওয়ার কথা বলিলেন। গল্পরা ১০টায় আসে। পরিচিত হইতে বেশী সময় লাগে নাই। ২ মাস পরে যে আবার পূর্ব্বের অবস্থায় আসা গেল, ইহা ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ।

১২ই নভেম্বর

ক্রমশঃ

জ্যোতির্ময়

॥ শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ॥

আমাদের সমাহিত করো—
তোমার আলোর বন্যায় পৃথ্বী
আলোকিত করো।
আলোহীন অন্ধকারে
হে জ্যোতির্ময়,
আলো দাও—পথ দেখাও—
যে আলোতে পথ খুঁজে পাব
জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত যে পথ!

সব আলো নিভে গেছে
বাস্তবের রূঢ় রুক্ষ বর্বর সংঘাতে,
যেমন বৈদ্যুতিক বাতি নিভে যায়
অকস্মাৎ কোন যান্ত্রিক গোলযোগে।

এ পৃথিবী অন্ধকার
অসীম—অসীম অন্ধকার।
কেহ খুঁজে পায় নাকো পথ—
কেহ খুঁজে পায় নাকো
জীবনের মানে!

পথ দেখাও হে জ্যোতির্ময়
এই অন্ধকার পৃথিবীর তটে;
অভিমান দূর করো
দিকে দিকে ঐ শোন মানবের
ক্রন্দন—কলরোল।

ঐশ্বর্যের বিদ্যুৎ বিভায়
মাধুর্যের দীর্ঘ বনবাস;
দিনে দিনে কোথায় যে চলিয়াছি প্রভু
ভাবিবার নাই অবকাশ।
বারবার শুধু মনে হয়
কি যেন কি যেন ভুল হতেছে নিশ্চয়।

তুমি যে দেবতা বলে
নিজেকে ঘোষণা করেছ;
তোমার অসাধ্য কিছু যে নাই
এ কথা লিখে গেছ আপনার
অব্যর্থ অমোঘ স্বর্ণ-লিপিকায়—
তবে কেন ভয়,
তবে কেন সংশয় মনে
হে জ্যোতির্ময়!

সব বিপরীত সমন্বিত তব
অপার মাধুর্যময় ওই জীবনের চারিদিকে
গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস এক হয়ে গেছে
নাই কোন ভেদ—নাই গরমিল
বাস্তবের রক্ত তটে ভাব-লোকের
খেলায়েছ খেল
যথা রুক্ষ বাজীকর, হে জ্যোতির্ময়!

আমাদের পথ দাও
আলো দাও এই অন্ধকারে,
যে আলোতে পথ খুঁজে পাব
যে আলোর সমুদ্রে স্নান করে
স্নিগ্ধ শান্ত সমাহিত হবে দেহ মন
এ-জীবনের সব ক্লেদ মুছে যাবে চলে—
সেই আলো দাও প্রভু, দাও বরাভয়
তোমার এ-জন্মদিনে
হে জ্যোতির্ময়।

[মহানির্বাণ মঠে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ১০৮তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে পঠিত]

গোবিন্দসিংহের ইসলাম-নিরীক্ষা

(২)

॥ শ্রীবভীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥

বৈদিক ধর্ম-পৌর্ণমাসী-যজ্ঞ প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, গোবিন্দ সিংহও প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যৌথ উপাসনার (congregational worship) জন্য ধর্ম-সভার অনুষ্ঠানকে আবশ্যিক করিয়া দিলেন; আর তাহাতে গুরু-গ্রন্থের আবৃত্তি আবশ্যিক বলিয়া নির্ধারিত করিয়া দিলেন।

আজা তহী অকালকী
তব হি চলাও পন্থ।
সব শিখোঁকা হুকুম হ্যায়
গুরু মানিযো গ্রন্থ॥

নান্দের নগরে মহম্মদশাহের প্রেরিত গুপ্তঘাতকের খঞ্জরে আহত হইবার পর, মুমূর্ষু গোবিন্দসিংহের ইহাই অন্তিম উপদেশ। 'সব শিখের প্রতিই এই আদেশ যে, গুরু-গ্রন্থকেই গুরুর স্বরূপ বলিয়া মনে করিবে।'

ইসলামের মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বে কোনও অনন্য-সুলভ বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, গোবিন্দ সিংহ তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার যাহা সিদ্ধান্ত, তাহার পরিচয় আমরা পাই দশম গ্রন্থে। তথায় তিনি লিখিয়াছেন,

(১) যে কোয় যায় তুরকোঁমে
মহীদীনকে দীন ভিযে গহি ল্যাবৈ।
আপহি বিচ গণৈ করতা
করতারকা ভেদ ন কোউ বতাবৈ॥
দশম গ্রন্থ—ভোডিয় সবৈয়া (২৭)

যে কেহ তুরকদের মধ্যে গিয়া পড়ে, তাহাকেই তাহারা মহম্মদের দীন (ধর্মতত্ত্ব) গ্রহণ করায়। তাহারা মনে করে যে কেবল তাহাদের মধ্যেই কর্তা (পরমেশ্বর) আছেন, কিন্তু পরমেশ্বর বলিতে কী বুঝা যায় সেই তত্ত্ব কেহ খুলিয়া বলে না।

(২) মহাদীন প্রভু তবহি উপরাজা।
আরবদেশকো কীনো রাজা;
তিন হি এক পন্থ উপজাযা।
লিঙ্গ বিনা কীনো সভ রাজা॥
সভতে আপনা নাম জপায়ে।
সত্য নাম কাহন ছপায়ে॥
দশম গ্রন্থ—বিচিত্র নাটক (৬-২৪)

তারপর পরমেশ্বর মহাম্মদকে উৎপন্ন করিলেন, কিন্তু তাহাকে আরবদেশের অধিপতি করিলেন। তিনিও একটি নূতন সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাহাতে খৎনার প্রথা প্রচলিত, আর সকলেই সমরক্ষম বেশ। কাহারও অধীন নয়। তিনি সকলকে নিজের নাম জপাইলেন। কিন্তু কাহারই ঈশ্বর-নিষ্ঠা দৃঢ়তর করিতে পারিলেন না।

অর্থাৎ গোবিন্দ সিংহের মতে, ঈশ্বর কী, জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধ কী, ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ, ঈশ্বর যদি করুণাময় হইয়া থাকেন তবে এত দুঃখ দৈন্য জগতে কোথা হইতে আসিল, ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা কোরাণে নাই, অন্ততঃ এমন কোনও আলোচনা নাই, যাহা প্রাচীন বৈদিক পন্থায় পাওয়া না যায়। তাই হিন্দু-পার্শীর পক্ষে ইসলাম-গ্রহণের কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। যাহারা ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের কথা অবশ্য পৃথক্। তাহাদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,

আপা ও অলেখ সোই পুরাণ ও কোরাণ ওই
একহি সরূপসবৈ একহি বনাব হৈ।
অকালস্তুতি—৮৯

যিনি (অলেখ নিরঞ্জন), তিনিই আত্মা। যাহা

পুরাণ, তাহাই কোরাণ (উভয়ে এক কথাই বলে)। সকল মানুষই একরূপ, একই উপাদানে গঠিত।

কিন্তু হিন্দু ও পার্শীর মধ্যে কেহ নূতন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে ইহার কোনও হেতু তিনি দেখিতে পাইতেন না। তাই তিনি বলিয়াছেন,

নীলবর্ণ কাপড় ফাড়ে তুরুক-পাঠানী আমল গিয়া। (মুসলমানদের প্রিয়) নীলবর্ণ পোষাক ফাঁড়িয়া আমিত্রয় ফেলিতেছি। তুরুক ও পাঠানের দিন চলিয়া গিয়াছে।

কোরাণে দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ তেমন নাই। সুতরাং কোরাণ হইতে বাণী উদ্ধৃত করিয়া গোবিন্দসিংহের মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা দুরূহ। পরন্তু ভ্রান্তই হউক আর অভ্রান্তই হউক, সপ্তদশ শতাব্দীর যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু, ইসলাম সম্বন্ধে তাহার মন্তব্যের একটা ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে।

এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু চৈতন্য কর্তৃক ইসলামের সমালোচনার যে বিবরণ আমরা পাই, তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। চৈতন্য চরিতামৃতে দুই স্থলে ইসলাম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর মন্তব্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আদিলীলার সপ্তদশ অধ্যায়ে, যখন কীর্তন করিতে করিতে মহাপ্রভু চাঁদকাজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মধ্যলীলার অষ্টাদশ অধ্যায়ে, যখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মহাপ্রভু "কাল বস্ত্র পরে যেই, লোক কহে পীর" এমন একজন পাঠানের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রথম স্থানে ইসলামের তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও আলাপ হয় নাই। কেবল গোহত্যা রূপ আচারটী যে অসঙ্গত মহাপ্রভু কাজীকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় আলোচনা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে।

> চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
> নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বপক্ষ উঠাইয়া॥
> অতএব ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
> তাহাই শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥

এস্থলে লক্ষ্যের বিষয় এই যে তাহাদের আলাপে যে ইসলামের কথা উঠিয়াছিল, তাহা আরবিক ইসলাম নহে, পারসিক ইসলাম। কোরাণে ব্রহ্মবাদের নাম গন্ধও নাই। পারস্য জয় করিবার পরই ইসলাম ব্রহ্মবাদের সংস্পর্শে আসে। প্রথম দিকে ব্রহ্মবাদ ইসলামের পক্ষে এত অসহনীয় ছিল যে, পুরাতন (পারসিক) ব্রহ্মবাদ যিনি প্রথম প্রকাশ্যে পুনঃ প্রচার করেন, পারস্যের গৌরব সেই মহর্ষি মনসুরকে "আন আল হক—আমি ব্রহ্ম," বলিবার অপরাধে শূলে চড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছিল। ক্রমশঃ ব্রহ্মবাদ ইসলামে সহিয়া গেল। পারস্য ইসলামকে এক নূতন রূপ দান করিল, তাহার নাম সূফী পন্থা। ব্রহ্মবাদই ইহার ভিত্তি। ইসলামের ধর্ম বেশ পরিচ্ছিন্ন থাকিলেও, কোরাণিক ইসলাম আর সূফী পন্থার আকাশ-পাতাল ভেদ। সূফীবাদকে আরণ্যক পন্থার নব অভ্যুদয় বলা যাইতে পারে।

মহাপ্রভুর লক্ষ্যের বিষয় ছিল এই পারসিক ইসলাম বা সূফী পন্থা। আর গোবিন্দসিংহের লক্ষ্যের বিষয় ছিল আরবিক অর্থাৎ কোরাণিক ইসলাম।

তবে ইহাও এখানে উল্লেখযোগ্য যে জ্ঞানযোগই (অর্থাৎ সোহহংবাদই) সূফীপন্থার সর্বস্ব নহে। বরং ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেমের দ্বারা (মাধুর্য্য রসের সাধনের দ্বারা) ভগবৎ মিলনের অনুজ্ঞাই সূফীপন্থার বৈশিষ্ট্য। এই হিসাবে একজন সূফীকে "পারসিক বৈষ্ণব" এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মধুর রসের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও কোরাণে নাই। মধুর রসে ভগবদারাধনার প্রথা সূফীদের অবদান। ভাগবত্ পুরাণে যেমন ব্রহ্মবাদকে ভিত্তি করিয়া ভক্তিযোগ স্থাপন করা হইয়াছে—ব্রহ্মবাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নহে—সূফী পন্থায়ও তাহাই করা হইয়াছে। সূফীদের জন্য এই অসম্ভব কার্য করিয়াছেন পারস্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান মহর্ষি জালাল, তাঁহার সুবিখ্যাত মসনবী গ্রন্থে। মসনবীর আবেষ্টন এত মনোহর, তাহাতে এমন একটা অপূর্ব উন্মাদনা আছে, যে কট্টর মুসলমানগণও ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই, ইহাকে দ্বিতীয় কোরাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

মসনবী-এ মৌলভী-এ মানবী।
হস্ত্ কোরাণ দর জবান-এ পহলবী॥

মৌলভীর (মৌলভী জালালের) আধ্যাত্মিক মসনবী, পহলবী (পার্শী) ভাষার কোরাণ বটে।* মসনবী গ্রন্থ, আত্মবিক সাধনার উপর, পাওসিক সাধনার বিষয় কেতন।

সুফীবাদের এই অভিযোগ মহাপ্রভুর সমালোচনার বিষয় ছিল না। কারণ যে পীরের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল সেই পীরটী ছিলেন জ্ঞানপন্থী সুফী। আর ইহা সোত্রিঅসিজমেরও আলোচনার বিষয় ছিল না, কারণ মধুর রসের সাধনাকে ইসলামের অঙ্গ মনে না করিয়া তিনি পুরুষপ্রধান অঙ্গ বলিয়াই মনে করিতেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন,

প্রীত করে প্রভু পায়ত যৈ।
কৃপাল ন জিনত লাভ কাটায়ে।
বিচিত্র নাটক—১-১০০

প্রেমদ্বারাই প্রভুকে পাওয়া যায়, কেবল শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা প্রভুর চিত্ত আর্দ্র হয় না।

---

* Masnavi is regarded by Persian Mystics as their Bible—Persia—E. D. Ross—P. 132

কবি এলিয়টে ফ্রয়েডী চিন্তার প্রভাব

॥ শ্রীযুথিকা মিত্র ॥

বিংশ শতকের মহাকবি টি, এস্ এলিয়টের কবি-প্রতিভা অভিনব ও অনন্য। তাঁর রূপদী বলাশৈলীতে অপরূপ বলবৈচিত্র্যের মধ্যে মনস্তত্ত্ব সমাজের শিরোমণি সিগমণ্ড ফ্রয়েডের বিশ্লেষনবিকা ছায়া পড়েছে।

এলিয়টের কাব্যজীবনের প্রথম অধ্যায়ে Oedipus motif-এর প্রভাব লক্ষণীয়। Sweeny Among The Nightingales কবিতাটি থেকে আলোচনা সুরু করা ভালো।

The nightingales are singing near
The convent of the Sacred Heart
And sang within the bloody wood
Where Agamemnon cried aloud.

Sacred Heart সম্বন্ধে সম্প্রতি গ্রীক উপকথার প্রসিদ্ধ চরিত্র Agamemnon ও Clytemnestra-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। Agamemnon ছিলেন Tantalos-এর বংশধর যিনি নিজের পুত্র Pelopsকে হত্যা করেন—দেবপূজার অনুহাতে; গ্রীসের বিশ্বাস এই বিখ্যাত বংশটিতে পাপ ও অনাচারের দেবী Ate-র বিশেষ অনুগ্রহ ছিলো। Electra এ বংশের একজন নারীচরিত্র ফ্রয়েড যাকে তাঁর বিশ্লেষণে কাজে লাগিয়েছেন। যে কোন পুরুষ শিশু অবস্থায় তার মায়ের প্রতি অস্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট থাকে এবং নারী তার পিতার প্রতি। ফ্রয়েডী বিশ্লেষণে এ দুটি মনোভাবের নাম যথাক্রমে Oedipus Complex in men ও Electra Complex in women.

প্রচলিত ধারণায় প্রেম ও মৃত্যুর সঙ্গে কিছুটা রোমাটিকতার যোগ বিদ্যমান। এই রহস্যচেতনার উৎসমূলে রয়েছে এক প্রচণ্ড ভয়। Sweeny Erect

কবিতাটিতে মানুষের মধ্যেকার পাশবিক চেতনার একটি ভাবরূপ বলা যেতে পারে। এখানে কবি বলেছেন জীবন মানেই মৃত্যু। প্রেম ও মৃত্যু অভিন্ন। এর কারণ আর কিছু নয় মানুষের মধ্যেকার তীব্র castration ভীতি। সমালোচকদের মতে 'The Freudians consider that castration-fear is but a specific form of a rooted fear of division of the organism,...castration equals copulation—equals death.' ফ্রয়েডী মনস্তত্ত্বের এ সিদ্ধান্ত এলিয়টকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিলো যে তার প্রমাণ পাওয়া যায় Sweeny Agonistes-এ। প্রেম মৃত্যুর কারণ এবং বাহক—Waste Land-এ কবি এ সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছে দিচ্ছেন। 'Those are pearls that were his eyes,—অথবা 'Pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door'—এই মৃত্যুভয়ের উল্লেখ। এ তো গেল বন্ধ সর্গের কথা—৩য় সর্গে The nymphs are departed এবং 'The rattle of the bones' Tereus-এর অনাচারের কথা উল্লেখ করছে।

Songs of Prufrock এবং Portrait of a Lady-তে প্রেম ও মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ যোগের কথা উচ্চারিত হয়ে উঠলেও কয়েকটি কবিতায় অর্থাৎ Sweeny Among The Nightingales, Whispers of Immortality এবং Burbank with a Baedeker বা Bleistein with a Cigar-এ প্রেম মৃত্যুর অনিবার্য পরিণতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাব্যের রসপুষ্টি ঘটিয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন seduction এখানেও স্থান পেয়েছে। Burbank অ্যান্টনী ও ক্লিওপাট্রাকে স্মরণ করেছে একাধিকবার—

The God Hercules,
Had left him, that had loved him well.

পণ্ডিতদের মতে পাপাচারের ফলে দৈবী শক্তি অন্তর্হিত হয়েছে তার মধ্যে থেকে। বস্তুতঃ এ কবিতা কটিতে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যেকার পশুসত্তার প্রতিই এলিয়ট বেশী নজর দিয়েছেন। এলিয়টের অনেক কবিতায় ইহুদী অনেক চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ইহুদীদের সম্পর্কে এক ধরণের ভয় বা ঘৃণা Rachel Nee বা Bleistein-এ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে; মনস্তাত্ত্বিকদের মতে এর মূলেও ফ্রয়েডী castration fear-এর ধারণা কাজ করছে।

যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত ইউরোপীয় সমাজের পংগুতা এলিয়টের চেতনায় সংবেদনার স্রোত এনেছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের খণ্ডাংশগুলোর মধ্যে এলিয়ট নৈরাশ্যের ছবি আঁকছেন Waste Land-এ। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে a revolution overthrowing a King is felt in the unconscious as a communal self-castration and calls forth the appropriate emotions of exaltation and guilt.

ব্যক্তি যতই স্বাধীন হোক না—গোষ্ঠী বা গোত্রের প্রভাব ব্যক্তির উপরে অপরিসীম। এলিয়ট পিউরিটান গোত্রীয়; অতএব পিউরিটান রক্তের ধারা অনুযায়ী পিতা-পুত্রের মধ্যেকার oedipus-এর দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যেও কিছু পরিমাণে এসেছে। জন্মভূমির প্রতি অনাকর্ষণ ক্রমশঃ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে মাত্র বৃত্রিশ বছর বয়েসেই তাঁকে দেশ ছাড়তে হলো। বর্তমান জীবন সম্বন্ধে গভীর বিতৃষ্ণা এবং অন্য এক কল্পিত জীবনের আকাংক্ষা প্রাধান্য হয়ে দেখা দিলো Prufrock এ। নিজের গোত্রের কোন বস্তুকে সে ভালবাসতে পারে না; পিতৃকুলের কোন tradition, কোন রীতিনীতিকেই মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। Prufrock-এর জীবনে স্বাভাবিক প্রেমের পূর্ণতার ছায়ামাত্র নেই। জরা-বার্ধক্য, পংগুতা তার oedipus complex-এর চরম প্রকাশ। তার অবচেতন মনে হ্যামলেট সম্বন্ধে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে—যদিও কোনখানে সে নিজেকে Polonius বলে বর্ণনা করছে। হ্যামলেট সম্বন্ধে এই দুর্বলতার কারণ অস্পষ্ট নয়। বৈজ্ঞানিকরা বলেন—হ্যামলেটের দীর্ঘসূত্রতার জন্যে দায়ী Claudius-এর প্রতি তার অবচেতন মনের সহানুভূতি। পিতা এবং পিতৃকুলের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রবল-

তম হয়ে ওঠা সত্ত্বেও জন্মের মতে পিতার মানসিক বা অবচেতন একটি সম্মোহনী শক্তি আছে। পুত্রের জীবনে তার প্রভাব অনস্বীকার্য। Prufrock-এর জীবনে তাই প্রতিবার ব্যর্থিত হয়ে উঠলেও শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতে হয়েছে। Gerontion-এ এলিয়টের অবচেতন বিকল্পনায় সেই প্রাক্তিকর সংস্কারের ছবি ফুটে উঠেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়েও সে অবচেতন, নিষ্ঠুর এক পিতার চিত্তায় বিবশ:

My house is a decayed house
And the jew squats on the window sill/.
the owner...

কোন বিশ্লেষকের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: The castrating father is surely recognisable in the Jew। গভীর হতাশা এবং শূন্যতায় কবি বলেছেন:

--Vacant shuttles weave the wind...

অবশেষে The Hollow Men-এ এই আতঙ্ক কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। পিতার প্রতিমা মুছে গেছে, সেই সম্মোহনী শক্তির প্রভাব অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তার এক বেদনার্ত স্মৃতির রেশ রয়েছে:

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream kingdom
These do not appear
There, the eyes are
Sunlight on a broken column...

বেদনায় কবির চিত্ত ভারি হয়ে উঠেছে। হারিয়ে যাওয়া কোন সমৃদ্ধ যুগ থেকে উঠে তাঁর চোখের সামনে যখন টেবিলের উপর মুক্তগুলি থেকে তিনি অনেক দূরে সরে এসেছেন:

At the hour when we are
Trembling with tenderness
Lips that would kiss
Form prayers to broken stone.

সাগরের আগে পর্যন্ত কবির প্রেম সফল হয়েছে বলেই এই পিতা-মূর্তি আবার স্পষ্ট প্রকাশ পেয়ে যায়। Oedipus complex-এর অপর দিক অর্থাৎ মাতা-পুত্রের অবচেতনিক আকর্ষণবোধের দ্বারা Ash Wednesday-র সংশ্লিষ্টদের সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

Lady of Silences
Calm and distressed
Torn and most whole
Rose of memory...
The single Rose
Is now the Garden
Where all loves end...
Grace to the Mother
For the Garden
Where all love ends.

মাতৃক্রোড়ে; মাতৃগর্ভে ফিরে যাবার এই আদিম বাসনাই তাকে অভিভূত করে দিচ্ছে। The return to the infantile fixation upon the mother is a dead end, satisfying to the lower nature but stifling the higher. খুশী জাগছে তখন প্রাণের মধ্যে, উদ্দীপনা জাগছে প্রতিটি অস্থিতে মজ্জায়: Under a juniper tree the bones sang
Scattered and shining

কারণ তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত Mother Earth-এ তারা ফিরে আসতে পেরেছে।

Ash Wednesday-র এই সর্গে কবি-কল্পনা যে ভিন্ন জগতের সন্ধান করেছে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাকে fantasy or the return to the womb বলে ভুল হবে না। এই আদিম আকর্ষণকে এলিয়ট কটি সংকেতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন:

At the first turning of the third stair
Was a slotted window bellied like a
fig's fruit.

বলা নিষ্প্রয়োজন এই 'fig's fruit' কথাটি কেমনতরো ইঙ্গিতময়। Ash Wednesday-র দ্বিতীয়তা From

Quartets-এ সার্থক হয়ে উঠলো। Ash Wednesday-র কয়েকটি লাইন যেমন :

Still is the unspoken word
the word unheard
The word without a word, the word within
The world and for the world ;...
And the light shone in darkness and
Against the world the unstilled world
still whirled
About the centre of the silent world

The word is the Logos—which by a non-sexual process becomes Christ. The passage seems to mean that Christ when silent in the womb was nevertheless the centre of the world. এই still centre-এর সংকেত Burnt Norton-এ নৃত্যরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। East Coker-এ আবার সেই নৃত্য বিবাহের চিত্রে আত্মপ্রকাশ করলো। এই ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে still centre রূপ নানা চেহারায় নানা রচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে খণ্ড ও অখণ্ড কালের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ হিসেবে।

এই ঐক্যসূত্র প্রতিফলিত হয়ে Family Reunion কে এক শ্রেণীর ক্লাসিক কৌলীন্যে ভূষিত করেছে যার মর্মমূলেও সেই oedipus complex কাজ করছে। Henry-র সংসের গোপন অভিশাপে মাতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক কোনমতেই সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারলো না। Confidential clerk বা The Elder Statesman নাটক দুটিও সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্ক নিয়ে জটিল সমস্যার অবতারণা। সবখানেই দেখতে পাচ্ছি সেই চিরন্তন পাপবুদ্ধির নির্মম আত্মপ্রকাশ এলিয়টীয় চরিত্রগুলিতে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। কবি নিজেই বলছেন :

...The past experience revived in the
meaning
Is not the experience of the life only
...The backward half-look
Over the shoulder, towards the primitive
terror
Now we come to discover that the
moments of agony are likewise
permanent.

বন্ধুবরেষু

শ্রীসুরগত

গত চিঠিতে আমাদের রুচির বৈকল্যের কথা বলেছিলাম : আমরা দিন দিন সুস্থ সুন্দর রুচিবোধ হারিয়ে ফেলছি। এবং এ হারানোর জন্য আমরা বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত বা দুঃখিত নই। অর্থাৎ এ হারানোটা যে আমাদের লোকসান, একথা আমাদের মনে জাগছে না। এবং জাগছে না বলেই, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। দিনে দিনে এ বোধ অপসারিত হচ্ছে। বড়দের কাছ থেকে ছোটরা শিখছে, এবং এই ছোটরা যখন বড় হবে, তখন তারাও পরবর্তী কালের হাতে এই বিকৃত রুচির দান রেখে যাবে।

সেদিন নববর্ষ উপলক্ষ্যে একটি সভার উৎসবে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন একজন খ্যাতিমান প্রবীণ শিশু সাহিত্যিক। তিনি আমারই মতন অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন।

ছটায় সভা আরম্ভ হবার কথা: বললাম তাঁকে, ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে ফিরে আসা যাবে, কী বলেন। তিনি হাসলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তো পঔনে ছটা, পৌঁছতে ম'ছটা হয়ে যাবে। তারপর গিয়ে দেখবেন কী জানেন? দেখবেন তখনও প্যাণ্ডেল সাজানো হয়নি: তারপর তো আছে মাইক, হারমনিয়ম, ফুলের মালা, এবং ঘণ্টা ঘণ্টা বক্তা এবং 'আর্টিষ্ট', সুতরাং বুঝতেই পারছেন, যদি সভা আটটাতে সুরু হয় (এবং তাই হওয়াই স্বাভাবিক, তিনি বললেন হেসে) তাহলে কখন ফিরতে পারবেন, বুঝতেই পারছেন।

আমার সেই শ্রদ্ধেয় এবং অভিজ্ঞ বন্ধুটি ভুল বলেননি। গিয়ে দেখলাম, গুটি কয়েক ছেলেমেয়ে (সংখ্যায় বড় জোর কুড়ি হবে) এবং কর্তৃপক্ষের কয়েকজন মাত্র উপস্থিত। আর বয়স্ক শ্রোতা বা অতিথি জন পাঁচ সাত। বন্ধু বললেন, দেখলেন তো, আপনাকে যা বলেছি, ঠিক কি না।

সময়ের মূল্য সম্বন্ধে আমরা কতটুকু সচেতন, এই তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোন কাজ আমরা ঠিক সময়ে করতে পারি না। এবং করতে চাইও না বোধ হয়। একমাত্র সেখানেই সময়নিষ্ঠ আমরা, যেখানে শাসনের ভীতি আছে। অর্থাৎ সময়নিষ্ঠ না হলে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে কিংবা শাস্তি পাবার আশঙ্কা আছে।

এ ছাড়া আমরা কিছুতেই সময়ের মূল্য দিই না। ছটায় সভা আটটায় আরম্ভ করি, পাঁচটায় সময়ে দেবা করবো কথা দিলে, সাড়ে ছটায় গিয়ে উপস্থিত হই। যে-কাজ করতে তিন ঘণ্টার প্রয়োজন, সেই কাজটা তিন দিনে শেষ করি। অফিসে যাবার দিন সাড়ে আটটার মধ্যে স্নান খাওয়া সেরে ছুট লাগাই, কিন্তু ছুটি পেলেই আটটা পর্যন্ত বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকি। অফিসে হাজিরা খাতায় লাল কালির দাগ পড়ার ভয় না থাকলে, হেলতে দুলতে এগারটায় গিয়ে সাড়ে নটার সই করি··· ইত্যাদি অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় আমাদের প্রতিদিনের জীবনের পানে তাকিয়ে। সময় অ-মূল্য ধন—সুতরাং মূল্য দিয়ে যাকে কিনতে হয় না, তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করাই তো উচিত। যে টাকা উপায় করতে পরিশ্রম হয় না, আপনি আসে, (সাধু ভাষায় যাকে 'উপরি' বলা হয়, আসলে যা···) সেই টাকা অপব্যয় করতে মনে একটুও দ্বিধা আসে না। তেমনি সময়ও যখন অ-মূল্য, তখন অপব্যয় করতে আপত্তি কি।

কিন্তু 'সময় পাই না', 'সময়ের অভাব' প্রভৃতি বলে প্রতিদিনই আমরা অভিযোগ করি না কি? আমাদের মুখে লেগেই আছে 'এত কাজ কখন যে করবো', 'মরবার সময় নেই, দম্মাই', 'একটু নিঃশ্বাস ফেলবারও অবকাশ নেই' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে আমরা প্রতিদিনই হা হুতাশ করি।

অপব্যয় করলেই অভাব হবে। অর্থেরও যেমন, সময়েরও তেমনি। আমরা যারা সময়ের অভাব বলে অভিযোগ করি, একবারও কি আত্মবিশ্লেষণ করে দেখি যে সত্যই আমাদের সময়ের অভাব হয় কি না। এবং যে সময়টা প্রতিদিনই আমরা অপব্যয় করি নানা ভাবে, সেই সময়টুকুর পরিমাণ কতখানি।

অত ধৈর্য আমাদের নেই। সময়ের অপব্যবহার করবোই আমরা, সকাল থেকে সুরু করে রাত্রি পর্যন্ত। এবং অভিযোগও করবো 'সময়ের অভাব' বলে। অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা এই জীবনে। এর কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়।

সম্ভব হয়, যদি কোন রকম শাস্তির ব্যবস্থা হয় অথবা অরিমানা। আগেই বলেছি একথা। যে অফিসের বড়বাবু কড়াধাতের লোক, ঠিক সময়ে হাজিরা-খাতা তাঁর ঘরে চলে যায়, সেখানকার কর্মচারীরা সময়নিষ্ঠ। তাঁদের সময় মত উপস্থিত হতে একটুও অসুবিধা হয় না।

অর্থাৎ যেক্ষেত্রে আমরা সময়নিষ্ঠ হব না, যতক্ষণ না আমাদের ওপর কোন শাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে শাসনের শৃঙ্খল দিয়ে কি সুস্থ ও সংহত

জীবন গড়া যায়, যদি অন্তর থেকে প্রেরণা না আসে তাহলে হবার, জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার, শুভ কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সময়ের যথাযথ মূল্য দিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করার ?

এমনি করেই আমাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে নানা দুর্বলতা, নানা ত্রুটি। তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোন চেষ্টা নেই, আগ্রহ নেই : এমনকি বোধও নেই।

মানুষের জীবন একেবারে ত্রুটিহীন হবে, এ আশা করা যায় না। সম্ভবও নয় হয়তো। কিন্তু যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মধ্যে বাসা বেঁধে আমাদের ব্যক্তি-জীবন তথা সমাজ-জীবনের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, এবং পরবর্তী কালের কাছে অশুভ দৃষ্টান্ত স্বরূপ থেকে যাচ্ছে, সেগুলো দূর করার মত সুস্থ মনোভাব আমাদের কবে গড়ে উঠবে ? নব বর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও।

সাময়িকী

রুচি : চারিদিকে তাকিয়ে আজকের দিনের মানুষগুলির সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই লাইনটাই কেবল কানে বাজে, এদের 'রূপ ছিল, রুচি ছিল না।' রূপ আছে, গুণও গুণও অনেক আছে, কিন্তু রুচি নেই। কোন্ জিনিষটা কোন্ জায়গায় খাপ খায়, কোন্ বেসুরো কাকে কেমন মানায়, কোন্ কথা কোন্খানে বললে অসুন্দর হয় না, কোন্ গান কোন্খানে গাইলে তা গান পদবাচ্যই থাকে, অর্থাৎ তা মানুষের আনন্দদায়ক হয়, কোন্ আচরণ কোন্ খানে করলে তা অশোভন হয় না—এ সব রুচির কথা আজকাল মানুষের মনেই পড়ে না। এগুলি সবই প্রতিফ্রিয়ার ব্যাপার। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বর্ণাশ্রম শাসিত ভারতবর্ষ হাঁচি কাশি, কথাবলা, পা ফেলা সব ব্যাপারে পত্রিকা দেখে করে করে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ঠেলায় যখন মুক্তি পেল, তখন আজ এমন বিশ্রী ভাবে চলাফেরা আচার আচরণ আরম্ভ করল, যা পীড়িত করে, উৎপীড়িত করে, লজ্জিত করে।

বহু বহু ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা বলি—গ্রাম মেলে থাকি—গ্রাম বলতে অনেক ব্যাপারে 'অজ পাড়াগাঁ' হলেও রেডিও আর মাইক-এর ব্যাপারে মোটেই তা নয়। ইলেকট্রিসিটি না থাকলেও আশ পাশে তাইনে বাঁয়ে পাঁচ সাতটা বাড়ীতে রেডিও চলে থাকে। তা চলুক, সে খুব অসহ্য করে তুলছে না—কিন্তু মাইকের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যে কোন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তিনদিন পর্যন্ত দিনে রাতে সমানে মাইক বাজিয়ে যে দুঃসহ শব্দদ্বারা পাড়ার লোক ক্ষতবিক্ষত করা—এ মানুষের কোন্ রুচি ? কি জাতীয় চিত্তবৃত্তি এর পেছনে কাজ করে ? কর্কশ শব্দ দীর্ঘ সময় ধরে শোনা কেবল মনের মধ্যে দাহ সৃষ্টি করে না, দেহের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আর রুগ্ন বা মুমূর্ষুর পক্ষে যে কী দুঃসহ হয়, তা আর বলার কি আছে ? কিন্তু কোনো বিচারই এরা করে না কেন ? শুনেছি, বিস্তৃত জলে —সমুদ্র বা বড় নদীতে যেখানে মাছ ধরা অপেক্ষাকৃত অসুবিধাজনক, সেখানে জলের মধ্যে খুব বড় বড় ড্রাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়ে গেলেই দেখা যায় মাছেরা অনেক তেলে উঠেছে। অর্থাৎ ওদের ইন্দ্রিয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দুঃসহ মাইকের শব্দে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উৎপীড়িত হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ও বড় কষ্ট বোধ করছে। যা প্রতিসুখকর যা দেহ-ইন্দ্রিয়কে পীড়িত করে না, মন বুদ্ধি ও হৃদয়ের পক্ষেও মধুর, তা অনেকটা সময় ধরে মানুষ শুনতে পারে —যদিও সেই অনেকটা সময়েরও একটা পরিমাপ অবশ্যই আছে।

কর্কশ শব্দকে বিরামহীন শুনতে বাধ্য হওয়া এ তো মাইক বাজানর এক দিক, এর অপর দিক হচ্ছে সেই তিন দিন ধরে এমন সব গান, বাদ্যরচনা শোনা, যা সুস্থ ও শুভ্র রুচির পক্ষে বীভৎস যন্ত্রণা। বিরামহীন কর্কশ শব্দ যেমন

দেহমনের ক্ষতি করছে, তেমনি অরুচিকর ও অস্বাস্থ্যকর আলাপ ও প্রলাপে যে সমাজের পক্ষে দুর্ঘটনা, তার বিষময় ফল থেকেই বা ব্যক্তি ও সমষ্টিকে রক্ষা করছে কে? যে গুলি সাধারণতঃ বাজান হয়ে থাকে তা যে-কোন ব্যক্তির একক শ্রুতিতেই পীড়াদায়ক, আবার তা যদি অভিভাবক ও সন্তানের সঙ্গে একত্র বসে শোনাতে বা শুনতে হয়, তা যে আরও বীভৎস হয়ে ওঠে, এ কথাটাও কি সমাজের লোক ভুলে গেল? তারও পরের কথা হচ্ছে—সব ক্ষেত্রেই কি একই গান বা একই ভাষা ব্যবহার চলে? আমোদ প্রমোদের দিনে যতটা তরলতাকে মেনে নেওয়া যায়, শিক্ষার সময়েও কি সেই তরলতা চলতে পারে?—খুবেই বলি খুব সাম্প্রতিক কালের একটা অভিজ্ঞতা। দিন কয় আগে এক ব্রাহ্মণ ছেলের পৈতে দেওয়া হল। সে ঘটনা কেন্দ্র করে তিন দিন দিনে রাতে এমন সব গান ও বাদ্য রচনা বেজে চলল যাতে তিন রকমে পীড়িত হতে থাকলাম। প্রথম: কর্কশ শব্দের বিরামহীন অভিঘাত; দ্বিতীয়: অরুচিকর ও অস্বাস্থ্যকর গান ইত্যাদি শুনতে বাধ্য হওয়া; তৃতীয়: যে ছেলেটির পৈতে হচ্ছে, যে দ্বিজত্ব অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ করতে যাচ্ছে, সে ঐ তিন দিনে বিরামহীনভাবে যা শুনল, তা তার চিত্তের কোন্ উন্নয়ন ঘটাল? রুচিহীনতা আজ এমনই গাত্রসহ হয়ে গেছে যে, বহু মানুষের পক্ষেই এ সব যে আবার একটা কথা, এ কথা মনেই পড়ে না। কিন্তু অভিভাবকেরও কি একবারও মনে পড়ল না এমন একটি পবিত্র অনুষ্ঠানে সন্তানের ভিতরে তারা কি ঢুকিয়ে দিচ্ছে? শুনেছি, যে বাড়ীতে মাইকটা বাজান হয় সে বাড়ীতে সেটা এমন ভাবে স্থাপন করা হয় যাতে শব্দটা সেখানে তেমন অসহ্য হয় না, যেমন হয় পাশের বাড়ী গুলিতে। অন্যের সুখদুঃখ সম্বন্ধে দেশের লোকের মাথাব্যথা কত কম, সেটা তো দেখতেই পেলাম, কিন্তু নিজের সন্তানকে তার নূতন জীবনে প্রবেশের পথে কি পাথেয় দিয়ে দিচ্ছি, এ নিয়েও কি সমাজের লোকের ভাবনা গেল? জাতিটা কি তাহলে বেঁচে আছে? কোন্ জায়গায় নাড়ী ধরে স্থির করব যে জাতি বেঁচে আছে? আসক্তি আর বিদ্বেষের টানা-পোড়েনটাই শুধু জীবন, সব কিছুকে হয় প্রাণপণে আঁকড়ে ধরব, আমার করে পেতে চাইব, নয় তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করব—জড়-সভ্যতার শিক্ষাদীক্ষার বিকৃতিতে এই যেখানে আমাদেরও আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে প্রতিবেশীর ঘরে কি না হয় তাতেও যেমন আমাদের খেয়াল নেই, নিজ সন্তানের নূতন জীবন পথে কি ভাবে তাকে পরিচালনা করা যেতে পারে, তা নিয়েও আমাদের কোন ভাবনা নেই। কী এর সমাধান? আইন করে রাত দশটা কিংবা এগারটার পরে মাইক বাজান নিষিদ্ধ হয়েছে শহরে, তা-ও সর্বত্র প্রতিপালিত হয় কি না সঠিক জানি না, গ্রামে সে সুবিধাটুকু নেই। কিন্তু পুলিশ ছাড়া নিজেরা এর কি কিছু করতে পারি না? দরকার তো পুলিশী আইনের নয়—দরকার রুচির পরিবর্তন করা। অথচ রুচিটা যে এক জায়গায় বিকৃত হয়েছে, তা নয়—গোটা জীবন সম্বন্ধেই চিন্তাধারার বিকৃতি ঘটার ফলে বিকৃত রুচি জীবনের স্তরে স্তরে অসহনীয় হয়ে উঠেছে—সে বিকৃতি শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ—সব বয়সের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তাই গোড়া থেকে সুরু করা দরকার যেমন, তেমনি নিজ নিজ জীবনে এ সব বিকৃতির স্থান যাতে না হয়, সে সম্বন্ধেও সচেতন হব, আবার অপরে যেখানে অন্যায় করছে, সেখানে তা প্রতিবাদ করব, অপরকেও এই ভাবে চলতে অনুরোধ জানাব।

গোড়া থেকে সুরু করা মানে সংক্ষেপে এই যে এতদিন পর্যন্ত আমাদের যে রকম আদর্শের ফলে আমাদের আচার আচরণ যে রকম ছিল, আজ আচার আচরণ যে এমন করে পালটে গেল, তার মানে ভিতরে ভিতরে আদর্শটাও পালটে গেছে—অথচ সে সম্বন্ধে আমরা খুব অবহিত নই, খানিকটা বুঝি বটে। আমাদের আজকের আদর্শ হবে ভারতীয় স্থিতিধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্যের গতি-ধর্মের সমন্বয়ের আদর্শ। সেটার কোন একটা রূপ আমাদের জীবনে এসে গেছে, কিন্তু দুটোর কোন্ রকম মিশ্রণ কি মাত্রায় কি ভাবে হলে তা কল্যাণধর্মী হয়, সেইটে আজও আমরা জানি না। রুচির বিকৃতিটা তাই এত প্রবল ও বীভৎস রূপ নিয়েছে। উভয় সভ্যতার এই মিশ্রণ স্বভাবধর্মী হয়ে পরস্পরকে আকর্ষণও করছে, আবার পরস্পরকে প্রতিহতও করছে। এ মিশ্রণ ভারতীয় সমাজ-জীবনে কি ভাবে করা যায় তারই পথ দেখিয়েছেন শ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ। নরনারায়ণ আশ্রম তার সমস্ত কাজকর্ম, আচার-আচরণ দিয়ে এবং তার উজ্জয়ন্তভারতের পাতায় পাতায় এই কথাটাই প্রকাশ করে আসছে। সমাজ-জোড়া বিকৃত রুচির পরিবর্তন আনতে পারবে দুই সভ্যতার যা চিন্তাধারার যে রকম মিশ্রণ এঁরা দেখিয়েছেন, সেই মিশ্রণ।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৩, ১৩৬৯ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম, এ পঞ্চদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র-ধর্ম্মের ভেদের কাটলে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটি স্বয়ম্মূল্য আস্বাদন – ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম আস্বাদন করায় জীবনের অতিগ (transcendental) দিক, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (immanent) দিক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুইই। তাইতো তিনি জীবন-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম্ম বা একান্ত রাষ্ট্র অচল। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ' (ভোজপতি কংসের মৃত্যু) বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্ম্মপতিরূপে 'তদ্বং পরং যোগিনাম্' (যোগিগণের পরতত্ত্ব কৈবল্য)।

শ্রীপুরুষোত্তম নাগ

হাল্কা ও ভারী ফেরাস্ কাস্টিং ও রোলড্ ষ্টীল লাইট সেকশান ও রেলের পারমানেণ্ট ওয়ে মেটিরীয়ালের জন্য সংযোগ স্থাপন করুন—

শ্রীহনুমান কাউণ্ড্রীজ লিঃ

গভর্ণমেণ্ট ও রেল কণ্ট্রাক্টারস্, ইঞ্জিনীয়ারস্, ষ্টীল রী রোলারস ও ষ্ট্রাকচারারাস্ ক্যাবরিকেটার্স।

আমাদের উপর যে কার্য অর্পণ করা হয় তাহা অতি বিশ্বস্ততার সহিত ও শ্রেষ্ঠ উপাদানের দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়া থাকি।

অব্যবহার্য পুরাতন রেল লাইন হইতে টাইবার প্রস্তুত করিবার এদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

ভারত গভর্ণমেণ্ট ও রেলের উচ্চতন কর্ম্মচারীগণ আমাদের কার্য্য, প্রস্তুত-প্রণালী ও বহুবিধ পরীক্ষা পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

টেলিফোন—৩৩—৬৪২২ হেড অফিস টেলিগ্রাম—ব্যাকমিল

আগরওয়ালা ম্যান্সনস্

৩৭০ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

১নং ফ্যাক্টরী

১৫, বেলুর রোড, লিলুয়া ইষ্টার্ণ রেলওয়ে

ফোন— ৬৬—২৮৩০
৬৬—৩৩৮৪
৬৬—১২৩৬

২নং ফ্যাক্টরী

রোলিং মিলস্ ৬৬—২৪৬৯ ১৫, ডাঃ হেমন্তকুমার চাটার্জ্জি লেন, ঘুসুড়ী, হাওড়া।
ফোন—৬৬—২০৫৬

৩নং ফ্যাক্টরী

বৈষ্ণবাটি শ্রীরামপুর ২৬—১৩৮ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	
শ্রীকৃষ্ণ	৫·০০	ছাত্রদের কর্মবাণী	
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	Sould of India Speaks	

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাংলার ঋষি	
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	রাজর্ষি রামমোহন	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	আচার্য জগদীশ	
বাংলার বিদুষী	১·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
বাংলার মনীষী	১·২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	
জীবন গড়া	·৭৫	রবীন্দ্রনাথ	

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বিটি,

বিদ্যাসাগর	২·৫০	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ—সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

সূচীপত্র : জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৪, ১৩৬১,

১। প্রার্থনাকালীন ভাবণ (১০)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

২। একজাতীয়তা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

৩। আমি বিশ্বনাগরিক (কবিতা)
শ্রীকালী কিঙ্কর সেনগুপ্ত

৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫০)

৫। বিদ্রোৎসাহী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২)
শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ

৬। আমাদের সময়কার শান্তিনিকেতন
শ্রীযমুনানাথ ধর

৭। রামায়ণ কি মহাকাব্য ?
শ্রীবিভা সরকার

৮। সমকালীন সাহিত্য
শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী

৯। সাময়িকী : ভক্টর সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র

উদ্বোধন

জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

১৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১০)

...জাতি-কুলের বাঁধন ছিঁড়িয়া তুমি উন্মাদিনী···ভাব-সোহাগিনী, আমার আহ্লাদিনী হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা, ধৈর্যাণী, ধৈর্যশী—আমার সকল প্রাণ নিংড়াইয়া তোমায় আদর করিব, আমার সকল আদর দিয়া, বিশ্বের সকল দুর্বা দিয়া, সকল গন্ধপুষ্প দিয়া তোমায় আরতি করিব—আমার বুকের রক্ত হউক তোমার চরণের অলক্ত···শ্রীরাধা, শ্রীরাধা! রমণীত্বের দিব্য ব্রহ্মরূপ। নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, রাধার মহিমা তুমি আমার জীবনে প্রকাশিলে, নিত্যগোপাল, আমার গুরু, আমার জীবনবল্লভ, আমার অসাধনার ধন—আমার বুকের সকল রক্ত দিয়া তোমার প্রতিষ্ঠা করিব। তোমার নির্দেশ সকলকে ভ্রাতৃভাবে দেখিবে, সকলকে একপ্রাণ বলিয়া দেখিবে।—সকল ভেদ, সকল বিচ্ছিন্নতা, সকল মিলনের অন্তরায় তোমার চরণে বলি দিব—একপ্রাণতায় নিত্য হইব, এক-হৃদয়ে তোমার আসন রচনা করিব; ওগো সন্ন্যাসী, মানুষকে সংহত কর, কায়ব্যূহ রচনা কর; কায়ব্যূহ সৃষ্টি না করলে কৃষ্ণসেবা হবে না।

৩. ৬. ৫৬—সন্ধ্যা—নরনারায়ণ আশ্রম জীবনের কথা বলিবার অছিলা। মানুষ জীবন লইয়া সব পুতুল খেলে—কোনো সম্পর্ককে গভীরভাবে আস্বাদন করে না। সংকল্পের আধার জীবনটা ব্যবহারিক সত্তা—মানুষও তাই একটা ব্যবহার-মূল্য দিয়া চলে—কাজ চালাতে গেলে যতটুকু শ্রদ্ধা ইত্যাদি দরকার। কিন্তু ভগবান তো জীবনকে এত স্বল্প মূল্য যেন নি...শিব পাগল, কৃষ্ণ পাগল, গৌর পাগল,..। মতে মতে মিলল না, ব্যস্, সম্পর্ক ছিঁড়ে গেল? এত সোজা? প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে ব্রহ্ম-সূত্রে গ্রথিত। কে চায় এই ব্রহ্মসূত্রের খোঁজ করতে?··· রাধা চেয়েছিলেন নারীত্বকে ব্রহ্মমূল্যে আস্বাদন করতে —কৃষ্ণ পুরুষত্বের ব্রহ্মমূল্য আস্বাদন করে গেছেন।··· তোমাদের কাছে আমার—নির্দেশ বলতে সাহস হয় না—অনুরোধ বলব—জীবনকে অত হাল্কা করে দেখো না—গভীরভাবে দেখ।...আমি স্বামী হিসাবে, পিতা হিসাবে, পুত্র হিসাবে...প্রত্যেক সম্পর্ককে গভীরভাবে দেখেছি ফাঁকি দেই নি—ফাঁকি দেওয়া যায় না।...প্রণামে বলি—মানুষের পাঁচটা স্তর—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় তুরীয়াতীত। কয়টার খবর রাখি?—শুধু জাগ্রতেরটুকু—স্বপ্নে কি দেখবে তা তুমি জান না—পরেরগুলি তো জানই না। তুরীয় অর্থ চতুর্থ—তিনটে স্তর যেখানে নেই; এটা ব্রহ্মস্তর—তুরীয়াতীত হচ্ছে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয়কে সমানভাবে যিনি বিচরণ করতে পারেন, তিনি তুরীয়াতীত। এতখানি করে আস্বাদন করতে না পারলে জীবন তো প্রহসন।...রাধাকৃষ্ণ—ঐ দুটি ছেড়ে মেয়ে আমার জীবনের সবটুকুতে ঘিরে আছে। যারা সার্থক হতে চায় তারা যেন এই রকম নারী পুরুষ হয়—ঐ দৃষ্টান্ত দুইটী আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে—আমার চিত্ত-দর্পণে ঐ একটি মেয়ে, ঐ একটি পুরুষ দর্পণে ছটোর মতো আটকে গেছে।...সংসারী মানুষের কার ধার পড়েছে ঐ রকম নারী-পুরুষ হতে?...আমি আকাশে

রাধাকৃষ্ণ খুঁজি নি—প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে ঐ রাধাকৃষ্ণ খুঁজেছি—যে নারী-পুরুষ কাঁকি দেয় না—সেই খাঁটি সার্থক। সংসার যে ভাবে চলছে, সে সংসার শংকরের মতাদর্শবাদী মিথ্যাই—কিন্তু ব্রহ্মমূলে প্রতিষ্ঠিত সংসার মিথ্যা নয়।...অমুকের সঙ্গে মেলা যায় না—এ ভাবনাটা বৈষয়িকতা।...তোমায় হাতটা ছিঁড়ে ফেলব? হাতটা ছিঁড়ে ফেলতে পার না, আর তাইকে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে?...এটা মিলনের সংসার—শত্রুকে পর্যন্ত কোলে তুলে নিতে হবে। গোবিন্দের সংসারে এসেছ—তিনি যেমন ১০১-টা অপরাধ ক্ষমা করে গেছেন—তোমরাও তেমনি করে গোবিন্দের সংসার কর। তোমরা ছেড়ে যেতে পার, কিন্তু পুত্র, মনে রেখো, মৃত্যুর সময়ও চোখ বুজিয়ে তোমাকে দেখবার চেষ্টা করব। মানুষের কাছ থেকে যে ব্যবহার আমি পেয়েছি তাতে ছাড়তে হলে কবেই ছেড়ে দিতে হতো কত জনকে, কিন্তু ছাড়বার সম্পর্ক তো আমার সাথে কারো নয়।...ভাইয়ে সঙ্গে ভাইয়ে, পিতার সঙ্গে পুত্রের, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর, গুরুভাইয়ে সঙ্গে গুরুভাইয়ে, গুরুভগ্নীর সঙ্গে গুরুভগ্নীর, গুরুভাইয়ে সঙ্গে গুরুভগ্নীর সম্পর্ক ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত—এ যেন কোনদিন কোন অবস্থাতেই ছিঁড়ে না যায়।...।

৫. ৬. ১৯৪৩ ··নিতাই যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি, আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর হরি। নিতাই গৌরাঙ্গ—জয় গৌরাঙ্গ, জয় গৌরাঙ্গ, জয় গৌরাঙ্গের নাম রে—নিতাই গৌর—পুরুষ প্রকৃতি একাধারে—৪৫০ বৎসর পূর্বের শচীদুলাল গৌর আজ গৌরীদুলাল নিত্যগোপাল—আমি দেখেছি—আমায় দেখিয়েছে, বুঝিয়েছে—সর্বধর্ম-সমন্বয়মূর্তি—অদ্বয়ত্ব, নিত্যানিত্য...সমন্বয় মূরতি... মায়া-ব্রহ্ম, এক-বহু সমন্বয়মূর্তি তুমি।..আমার জীবনের সকল কল্পনা, সকল স্বপ্ন, সকল আকাশ-পাতাল, আমার জাগ্রত জীবন, আমার স্বপ্নের জীবন তোমারই মাঝে সার্থক হউক, বাস্তব হউক—আমার সুষুপ্তি...যোগনিদ্রা তোমারই মাঝে হউক—তোমারই মাঝে ঘুমাইব—তোমারই সত্তায় সকল সত্তা বিলাইয়া তোমারই মাঝে ঘুমাইব—তুরীয় তোমারই মাঝে আমি আমারই মাঝে থাকিব—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়াতীত স্তরে—মায়া-ব্রহ্মে—আমায় সমভাবে বিচরণ করিবার যোগ্য করিয়া লও।...আমি ব্রহ্মভাবে জাগিব, আমি ব্রহ্ম-চেতনার কল্পনা করিব—তোমার ভাগবতী লীলায় আমি অবগাহন করিব, আমার দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি-অহংকার লইয়া আমি তোমার লীলা-সমুদ্রে ডুবিব, ভাসিব, খেলিব। ওগো তুরীয়াতীত নিত্যগোপাল, বহুর মাঝে এক দেখিব, একের মাঝে বহু দেখিব—তোমায় নমস্কার—আমার সকল সত্তা দিয়া তোমায় নমস্কার; ওগো স্বরূপ, ওগো বিশ্বরূপ, তোমায় নমস্কার—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই শ্রুতিমন্ত্র আমার জীবনে রূপবান হউক, অর্থবান হউক—আমার স্বামী নিত্যগোপাল, আমার সখাবন্ধুগণগুরু, তুমি আমি, আমি তুমি নিত্যগোপাল। ধরার ধূলি হউক সিন্ধু-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ; জগন্নাথ নিত্যগোপাল জগন্নাথ...প্রাণনাথ নিত্যগোপাল, আমার বুক-জুড়ানো ধন, আমার সাগর-সেচা মানিক...আমার অন্ধের যষ্টি, আমার মান-রাখোয়র, আমার ভিখারী ঠাকুর, আমার হৃদয়ের রাজা নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল...।

৬, ৬, ৪৩—গোরা আপনা লাগিয়া আপনি কাঁদে ...কৃষ্ণসাগর সমুদ্রের অভিসারী শ্রীরাধা একা চলিয়াছে ...কেবলা, নিঃসঙ্গ শ্রীরাধা—নির্বাসের পথিক...তুমি অনন্ত আমি অনন্ত...নিত্যগোপাল, আমার তুমি আছ, আমার অবলম্বন তুমি—আমার সকল দেহ মন প্রাণের তুমি অবলম্বন—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—আমার আমির বোঝা তুমি লও—আমার আমি তোমার আমির মাঝে নির্বাণ লভুক—ওগো আমার আমি, স্বামী, তোমার বুদ্ধির মাঝে আমার বুদ্ধি লয় হউক। অনন্ত ভক্তির মাঝে তোমার বুদ্ধি আমার হউক। নিত্যগোপাল, অন্যের মন আকর্ষণ, মহি মুগ্ধি নিবেদন—তোমার এই বাণী সার্থক হউক—নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত আমার এই দেহ-প্রাণ-মন তোমার চরণে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই; আমায় স্বীকার কর, আমায় অঙ্গীকার কর, আমায় তোমারই করিয়া লও—আমি তোমার মাঝে হারাইয়া গিয়া তোমায় স্নেহের দায় হইতে মুক্ত হইব—আমার বিদ্বিয় আমি তুমি

লও। পথে সারা জীবন ঘুরিয়া তোমায় বুকে লইয়া চলিয়াছি—আমার কিছু নাই, আমি অনন্ত হইব—তোমায় অন্ত হইয়া রহিব না—আমার স্বামী নিত্যগোপাল, আমার হৃদয়ের রাজা—আমার রাজাধিরাজ, আমার নিত্যগোপাল ...ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ .।

সন্ধ্যা—কায়েনবাচামনসৈন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনাবকাশৈঃ... করোতি যৎ যৎ সকলপরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ।—এই ভাগবতধর্ম নিমিরাজাকে ঋষভদেবের পুত্রেরা শুনিয়েছিলেন। তুমি যা কিছু কর—শরীর দিয়ে বাক্য দিয়ে মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ইত্যাদি দিয়ে যা কিছু কর নারায়ণায় যাহা বলে সমর্পণ করো। নিত্যগোপালের আশীর্বাদে আমার বুদ্ধির মধ্যে শংকর ও রামানুজের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছি। এই সাধনা করলে, নারায়ণকে বুকে নিয়ে সাধনা আরম্ভ করলে বৈষয়িক লোকদের সঙ্গে প্রথমে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। পরে আবার ভগবানকে নিয়ে ভগবানের সংসারে প্রবেশ করতে হবে, ভগবানের ছন্দ নিয়ে সংসারে ঢুকতে হবে। যাঁর সংসার—সংসার তো তুমি তৈরী কর নাই—তাঁর কাছ থেকেই সংসারে চলবার কৌশল শিখতে হবে। তারপরে সংসারে প্রবেশ করবার আগে এই প্রণাম-মন্ত্র—যৎ বায়ুরগ্নিং শরীরং মহীং চ জ্যোতীং সত্তাং দৃশঃ ক্ষমাধিং নদীং সাগরং হরেঃ শরীরম্...। সেখানে আকাশ আছে, বায়ু আছে, মাটি আছে—সমাজ আছে—এর মধ্যে যে ঢুকব, প্রণাম করে আরম্ভ করব না? এ সংসারের প্রত্যেকটি বস্তুই যে হরির শরীর—সকালে উঠে এর প্রত্যেকটিকে প্রণাম করতে হবে।...জলকে অনন্ত মনে করব, সেইজন্য জলকে প্রণাম করব...এমনি প্রতি বস্তুকে। সেবা বুদ্ধিতে পূজা করলে তোমার জল গঙ্গা জল হবে...আশ্রমকে যদি আমি নিত্যগোপালের সেবাবুদ্ধিতে সাজাই—গাছগুলিকে যদি ঠাকুরের সেবাবুদ্ধিতে যত্ন করি—গাছগুলিও তাহলে নিত্যগোপালের হয়ে ফল দেবে—কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে যেন গাছের যত্ন না করি—গাছের সেবা করছি একমাত্র এই বুদ্ধিতেই গাছের যত্ন করতে হবে...।

৭, ৬, ৪৬—সকাল।...নিত্যগোপাল, তুমি সর্ব্বধর্ম-সমন্বয়, সর্ব্বদর্শ-সমন্বয়, সর্ব্বআশ্রম-সমন্বয়—তুমি প্রাণ, তুমি মহাপ্রাণ—তুমি সকলকে ভরণ কর, সকলের সব মর্য্যাদা দাও—আমি হৃদয় দিয়া তোমার ঐ চরণে যুক্ত হইব—সকল মন দিয়া, প্রাণ দিয়া যুক্ত রহিব—ঐ চরণে লাগিয়া রহিব—আমায় তোমার করিয়া লও। যেমন হইলে তোমার হইয়া থাকা যায় আমায় তেমন করিয়া লও। তোমার মত আমায় গড়িয়া তোল। তোমার সেবা সকল দেহ-মন প্রাণ-বুদ্ধি দিয়া করিব; আমার অহংকার দিয়া তোমার সেবা করিব। আমাকে তোমার কাছে কাছে রাখ। রাঙ্গা বলে কেহ শুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে? আমার এ কুলে ও কুলে কেহ নাই, সকল হারাইয়া সকল খোয়াইয়া...তোমার হইব; আমার সাথী তুমি, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ—এই দুর্য্যোগময় পথে তুমি আমার সঙ্গী, অত্যাগসহনসঙ্গ—আমার ত্যাগ তুমি সইতে পার না, তাই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।...তোমার এই বিরাট সংসারের রহস্য কিছু বুঝি না—বুঝিবার দাম্ভিকতা চুকাইয়া আমি তোমারই চরণতলে আসিয়াছি! যাহা হয় তুমি কর—আমার ভালমন্দ আমি জানি না... তুমি যাহা হয় কর... ওগো আমার স্বামী নিত্যগোপাল... তোমার চরণ পরশে ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি...হৃদয়রঞ্জন নিত্যগোপাল...।

সন্ধ্যা—পুরুষোত্তমের সাধনা যারা করেন, তাদের বিশেষ যোগ্যতা এই লাভ হয় যে, তাঁরা সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে চলবার মত জীবন ও বোধ লাভ করেন। নর-নারায়ণ আশ্রম পুরুষোত্তম-কেন্দ্র রচনা করে চলেছে... সে দীর্ঘকাল ছিল কলকাতায়। শহরের অভ্যাস পল্লীর অভ্যাস আলাদা। দৈনন্দিন সুযোগ সুবিধা সব দিক দিয়ে রয়েছে শহরে—জল পায়খানা বাজার ডাক্তার...; সেখানে লোকাও নেই, সাপও নেই...শহর থেকে গ্রামে আসা খুব কষ্ট—কিন্তু পুরুষোত্তম-সেবার্থীরা সব অবস্থায় সোয়াস্তি অনুভব করবে—এরই নাম পুরুষোত্তম-জীবন।

ক্রমশঃ

একজাতীয়তা *

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

ভাগবত ২।৪।১৮

—'কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুম্ভ, যবন ও খসাদি, এবং মূর্তিমান 'পাপ' বলিয়া অভিহিত, সমাজ হইতে দূরে বহিষ্কৃত মানুষগণ যে-ভগবানের আশ্রিত মহাত্মাগণের আশ্রয় করিয়া শুদ্ধিলাভ করেন, সকলের প্রভবনের মূর্ত বিগ্রহ সেই বিষ্ণুকে আমরা নমস্কার করিতেছি।'

ভাগবত এমন একটি যুগের খবর আমাদের কাছে পৌঁছাইয়াছেন, যে-যুগের মানুষেরা কিরাত-হূণ প্রভৃতি জাতিসমূহকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া হৃদয়ের মাঝে একাত্ম করিয়া লইবার জন্য বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ-সাধনার প্রবর্তন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগের সমাজের ছবি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে যে, সে চেষ্টা বেশী দূর এবং বেশী দিন অগ্রসর হইতে পারে নাই। শত শতাব্দীতেই সে চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র; জাতীয়ভাবে কিছুই হয় নাই। যে 'প্রজাবাদে'র নিন্দা শ্রীকৃষ্ণ গীতায় করিয়াছিলেন, সেই প্রজাবাদের ছাঁচে-গড়া প্রচলিত বর্ণাশ্রমী ভারতবর্ষ এতদিন এ দেশের বর্ণাশ্রমাচার বহির্ভূতদের বুকে সরাইয়া দিয়াছে, বুকে সরাইবার উপযোগী শাস্ত্রও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বিশের প্রাণ-সাধনা তো নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। এই প্রাণ-সাধনাকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম-ধর্ম ও পাশ্চাত্য-ধর্ম ইহাদিগকে তাহাদের সমাজজীবনে আত্মসাৎ করিবার জন্য ইহাদের মাঝে কার্যাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দলে দলে হিন্দুস্থান বর্ণাশ্রমের বেড়াজাল ভাঙিয়া এই সব সভ্যতা বরণ করিয়া লইয়াছে। এ-দেশের বর্ণাশ্রম এই সবই চোখের উপর দেখিয়াছে, তবুও উপরি-উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকটির তাৎপর্য অবধারণ করে নাই, প্রজাবাদের নেশায়, 'শুচিতা'র মন্ত্রে অবধারণ করিতে চেষ্টাও করে নাই। 'পাপ' ধুয়ে গিয়াছে বলিয়া ইহারা মনে মনে যেন আত্মপ্রসাদও লাভ করিয়াছে। এই আত্মহত্যা একদিন এ-জাতি করিয়াছে। মানুষকে দূরে সরাইয়া দিয়া আমরা অমানুষই হইয়াছি। তাই পাকিস্তান গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। 'মানুষ কৃষ্ণে'র পূজা আমরা করি নাই। তাঁহাকে 'দেবতা' খাড়া করিয়া সর্বসম্মিলনে তাঁহার খুব আরতিই করিয়াছি। অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার স্পষ্ট ভাষায় শুনাইয়াছিলেন, 'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা।' কোটি কোটি মানুষকে 'পাপ' বলিয়া সরাইয়া দিয়া মানুষের ঠাকুরকে আমরা অবমাননা করিয়াছি। এই অবমাননার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।

কেন এ-দেশের কোটি কোটি মানুষ বর্ণাশ্রমের অনুশাসন পদদলিত করিয়া নিজেদের ঘর ছাড়িল? আদীবাসীরাই বা কেন দূরে রহিল? মোল্লা-মৌলভীদের উপর গালিবর্ষণে লাভ নাই, খৃষ্টান মিশনারীদের লইয়া টানাটানিতেই বা কি ফল হইবে? নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা এমন একটা প্রবলতা হিন্দুর নিয়তির মধ্যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল, যাহার ফলে বাহির হইতে আগত ইহারা সেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিল। বসন্তের বীজ আকাশে বিচরণ করে, সকলের অসুখ হয় না কেন? যাহার pre-disposition আছে সে-ই আক্রান্ত হয়। হিন্দু কেন মুসলমান হয়, আদিবাসীরা কেন এ-দেশের মানুষ হইয়াও খৃষ্টান হয়, হিন্দু কেন বৌদ্ধ হয়?

* ৫ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫৯-এর উদ্বোধন হইতে পুনর্মুদ্রিত।

সাধারণতঃ কোনও মুসলমানকে বা কোনও খৃষ্টানকে বা কোনও বৌদ্ধকে তো হিন্দু হইতে দেখি না। ইহার নিছনে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। কি সেই রহস্য? হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা সংযমের নামে, শুচিতার নামে এমন শত শত বিধিনিষেধ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, যাহার মধ্যে মানুষের সহজ জীবন মোটেই বাড়িতে পারে না, মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনই ক্লেশসাধ্য হয়; হিন্দুর বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এত আচারবহুল, যাহা বর্তমান যুগের সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের পক্ষে যথাযথভাবে মানিয়া চলা অসম্ভব। মুসলমান-খৃষ্টানের সামাজিক আচার-ব্যবহার সহজ সরল বলিয়াই উহা সমাজের নিম্নস্তরের মানুষকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সমাজে যাহারা উচ্চশ্রেণীর, তাহাদের হাতে এত সুযোগ আছে, যাহা থাকার ফলে বহু নিষেধ অমান্য করিলেও তাহার ধাক্কা তাহারা সামলাইয়া লইতে পারিতেছে। কিন্তু বিধি লঙ্ঘন করিয়া ধরা পড়িতেছে ছোটর দল, যাহারা একপ্রকার কোন সুযোগেরই অধিকারী নয়। বড়রা যাহা করিয়া যাইতে পারে, ছোটরা তাহার অনেক কম করিয়াও ধরা পড়ে। ব্রাহ্মণ সবচেয়ে সুযোগের অধিকারী। তাই বর্তমানের ব্রাহ্মণগণ যতই স্মৃতির বিধান লঙ্ঘন করিয়া চলুন না কেন, তাঁহারা সমাজে আজও বুক ফুলাইয়া চলিতে পারিতেছেন। কিন্তু বিধি লঙ্ঘনের শাস্তি পুরাদমে ভোগ করিতে হইতেছে নিম্নবর্ণীয়দের, আদিবাসীদের। তাই তাহারা সামাজিক নির্যাতনে জর্জরিত। যখন খৃষ্টান মিশনারী বা মোল্লা-মৌলভীর দল ঘর ছাড়িবার জন্য তাহাদিগকে ডাক দেন, তখন অনায়াসেই তাহারা তাঁহাদের কবলে পতিত হয়। ইহারা তাই আজ মূর্তিমান 'পাপ' বলিয়া সমাজে নিন্দিত। এই সব 'পাপ'দেরও যে বিস্তৃত করিয়া সমাজশরীরে গ্রহণ করা যায়, তাহার সাধনাই মহাপ্রভু গিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে-সাধনা এ-দেশের বুদ্ধিমানেরা গ্রহণ করে নাই।

মনে পড়িতেছে সেই সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বের মুরারি রায়ের মুখে যবন হরেন শা কর্তৃক 'কয়োয়ার পানি' খাওয়ার কাহিনী এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তপ্তঘৃত খাইয়া প্রাণ ছাড়িবার ব্যবস্থার কথা।

'স্ত্রী কহে জাতি নষ্ট যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে।
স্ত্রী মরিতে চায় রাজা সঙ্কটে পড়িল।
কয়োয়ার পানি তাহার মুখে দেওয়াইল।
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ক্ষয় পাইয়া।
বারাণসী আইল সব বিষয় ছাড়িয়া।
প্রায়শ্চিত্ত পুঁছিল তিঁহো পণ্ডিতের স্থানে
তাঁরা কহেন তপ্তঘৃত খাইঞা ছাড় প্রাণে।'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

যে সমাজে মুসলমানের কয়োয়ার জল হিন্দুদের মুখে পড়িলে তাহার শুদ্ধির ব্যবস্থা হয় তপ্তঘৃত খাইয়া মৃত্যুবরণ, সে সমাজে কি জীবনের মূল্য এতটুকুও আছে? এই নিষ্ঠুর সমাজে আচারের সামনে মানুষ বলি হইয়া গিয়াছে। এই সমাজে যে হিন্দু আজিও আছে ইহাই আশ্চর্য! উচ্চবর্ণীয়দের মধ্যে একদল, যাহারা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন অথচ ইস্পাত-কাঠামো এই সমাজ-ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া চুরিয়া গড়িয়া তুলিতে অক্ষম হইলেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজ হইতে বাহির হইলেন, মুসলমান হইলেন বা খৃষ্টান হইলেন। আর নিম্নবর্ণীয়দের কথা? তাঁহারা তো সর্ব-সুযোগ হইতে বঞ্চিত। তাঁহারা দলে দলে খৃষ্টান মুসলমান হইলেন। যাঁহারা সনাতন ধর্মের নেশায় জোর করিয়াই এরূপ সমাজের নিম্নস্তরে পরমলজ্জিত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন, তাঁহারা 'সিডিউল্ড কাস্ট' বলিয়া ইংরেজ-বিধানে উচ্চবর্ণীয়দের হইতে বিভিন্ন, উচ্চবর্ণীয়দের প্রতি বিদ্বিষ্ট। তাঁহারা হিন্দুসমাজ ছাড়িবার জন্য এক পা' বাড়াইয়াই রহিয়াছেন।

আদিবাসীদের নিয়া তো মাথা ঘামাইবার অবসর উচ্চবর্ণীয়দের ছিলই না। তাঁহারা ঘুমেই পড়িয়া রহিলেন। মিশনারীরা সেখানে সোনা ফলাইলেন প্রাণ-সাধনা লইয়া গিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া। আর হিন্দু 'কমলের লোম' বাছিতে বাছিতে উজার হইয়া চলিল; 'সে বেশ আছি' বলিয়া নিশ্চিন্তে পাশ ফিরিয়া শুইল। 'হিন্দু-মিশন' কিছুটা কাজ এই আদিবাসীদের মধ্যে করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা কতটুকু? হিন্দু-মিশন যে-সব

খৃষ্টান পরিবারকে হিন্দুধর্মে পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, হিন্দু-সমাজ কি তাহাদের যথাযোগ্য স্থান দিতে পারিয়াছিল? পারে নাই। পারিবেও না, যতদিন না হিন্দু-সমাজের মূল কাঠামোর মধ্যে হৃদয়কে সঞ্চারিত করা যায়, বুদ্ধিপ্রধান বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার মধ্যে প্রাণ-সাধনার প্রবর্তন করা যায়। যতদিন এ জাতি 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' (consciousness) বলিয়া চীৎকার করিবে, চৈতন্যের চরণতলে 'জড়'কে (অচৈতন্যকে) স্থান দিবে, ততদিন কিছুতেই আদিবাসীদিগকে, যবন-ম্লেচ্ছ প্রভৃতিকে আপন ঘরে সসম্মানে স্বীকার করা সম্ভব হইবে না। আজ চৈতন্যের সঙ্গে জড়ের, প্রজ্ঞার সঙ্গে প্রাণের সমন্বয় করিবার দিন আসিয়াছে। তাই শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ আসিয়াছেন চৈতন্য-অচৈতন্যের সমন্বয়ের বারতা লইয়া। চৈতন্যের উপাসনা করেন বর্ণাশ্রমের উচ্চবর্ণ, আর অচৈতন্যের অর্থাৎ জড়ের পূজা করিতেছে নিম্নবর্ণীয়েরা। আজ একান্ত চৈতন্য বা একান্ত জড় কোন একটির সাধনা-দ্বারা 'একজাতীয়তা' স্ফুরিত হইবে না। আজ সমগ্র মানুষের ডাক পড়িয়াছে। আজ প্রজ্ঞাপ্রধান উচ্চবর্ণ ও প্রাণ-প্রধান নিম্নবর্ণ একই হৃদয়ের সাধনায় ভারতে এক জাতিরূপে গড়িয়া উঠিবে। তাহারই সূচনা দিকে দিকে।

গত ৭ই জুন বিভিন্ন খণ্ডজাতি তথা আদিবাসীগোষ্ঠীর দুই কোটি মানুষের বিশেষ সমস্যা আলোচনার জন্য ভারত সরকার এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। নয়াদিল্লীতে সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সভাপতিত্ব করেন মহারাষ্ট্র-মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু। সম্মেলনে দুই শত প্রতিনিধি যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচিত খণ্ডজাতীয় সদস্যগণ, কতিপয় সমাজকর্মী, নৃতত্ত্ববিৎ ও সংসদ সদস্য, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত সেই সব কর্মচারী, যাঁহারা খণ্ডজাতীয় জনসমাজের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব লইয়া কাজ চালাইতেছেন। সম্মেলনের প্রথম দিনে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী ভাষণ দান করেন। যতদিন হইতে এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূতি হইতেছিল। এইরূপ সম্মেলন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল।

ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারত সরকার বিভিন্ন খণ্ডজাতির মধ্যে যে-নীতির অনুসরণ করিতেন, তাহাতে ভারতীয় জাতীয়তা ও খণ্ডজাতিদের মনোভাবের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রিটিশদাহায্যপুষ্ট খৃষ্টান মিশনারীরা ইহাকে আরও শক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, তাই তাহার পক্ষে ইহার সমাধান সম্ভব হইয়াছে। যতদিন ভারতবর্ষ এই দুই কোটি মানুষকে মানুষের মর্যাদাদান করিয়া ভারতীয় জাতীয়তায় অঙ্গীভূত না করিতেছে, ততদিন ভারতের কল্যাণ নাই। খণ্ডজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ ও আংশিক 'বহিষ্কৃত অঞ্চলে' পরিণত করিয়া ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার বস্তুতঃ দুই কোটি সন্তানকে নিজ বাসভূমে প্রবাসী করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষ তাই কত দুর্বল! প্রাণবান, সরল, নিষ্ঠিক, বীর্য এই জাতিসমূহকে কোলে টানিয়া লইলে ভারতবর্ষ কি শক্তিরই না অধিকারী হইত! এতদিন যাহা হয় নাই, আজ তাহা হইবে। প্রাণ আজ প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হইবে।

ভারত ইতিহাসের পৌরাণিক যুগে আর্যগণ তাহাদের অনার্য প্রতিবেশীকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সোহার্দ্যের মধ্যে টানিয়া আনিতে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। এ যেন আর্য-অনার্যের সমন্বয়ের যেন। পূর্ববোক্ত শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এই সমন্বয় আমরা দেখিয়াছি। এমন কি তাঁহার জীবনে ও তাঁহার অনুযায়ীদের জীবনে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ছবিও দেখিয়াছি। আজ বিশ্বের বুকে ভারতবর্ষকে তাহার ঐতিহ্য লইয়া সগৌরবে দাঁড়াইতে হইবে, সর্বক্ষেত্রে এক হইতে হইবে, 'একজাতীয়তা' বোধে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। এই অগ্নিপরীক্ষায় তাহাকে উত্তীর্ণ হইতেই হইবে।

কিন্তু এই একত্ব স্থাপনের পক্ষে যহা অন্তরায় স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এ দেশের মামলাবাজ। যে-মহাপ্রভু 'তদবিধিকিৎ বাহিত ধন' এই প্রেমধর্ম জগতের বুকে

আপামরের মধ্যে চালিয়া দিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভু এই মায়াবাদের বিরুদ্ধে গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন,

'মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য বলে নিরবধি।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

যাহারা অচৈতন্য জড় অপেক্ষা অমৃত চৈতন্যের উপর জোর বেশী দেন, চৈতন্যের মূল্যে জড়ের মূল্য স্বীকার করেন, জড়ের কোনও নিজস্ব মূল্য নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারাই 'মায়াবাদী'। এই মায়াবাদেরই বিপরীত প্রান্ত হিসাবে বিশ্বে আসিয়াছে মার্কস্‌বাদ, যাহা জড়ের মূল্যে চৈতন্যের মূল্য স্বীকার করিয়াছে, বিশ্বের বুকে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। চৈতন্য-সর্বস্ব মায়াবাদ তাই প্রজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়াছে, প্রাণকে অশুচি বোধে বর্জন করিয়াছে। মায়াবাদ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া জগৎকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। জগৎকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার প্রয়োজনে মায়াবাদ সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণের পারস্পরিক সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে। যে জগতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পারস্পরিক সম্বন্ধে লিপ্ত, সে জগৎ যে মিথ্যা হইবে, তাহা বুঝিতে দেরী হয় না। এই পারস্পরিক সম্বন্ধকে বাঁচাইবার জন্য মায়াবাদ একটি সিঁড়িতন্ত্রের (ladder system) প্রবর্তন করিয়াছে, যাহার সর্বোচ্চ ধাপ হইতেছে সত্ত্বগুণ এবং সর্বনিম্ন ধাপ হইতেছে তমোগুণ। গুণত্রয়ের মধ্যে উচ্চ-নীচের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় উহাদের মধ্যে সম্বন্ধ অনিবার্য। সত্ত্বগুণ চায় রজস্তমকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা—'রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত'। রজস্তমই বা বসিয়া থাকিবে কেন? তাহারাও সত্ত্বগুণকে চাপিয়া রাখিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ যে জীবনে সম্বন্ধে লিপ্ত, সে জীবন যে শ্রৈব্যে ব্যর্থ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। চৈতন্যের উপাসক, অতএব সত্ত্বগুণের উপাসক এই ভারতবর্ষ তাই সাত্ত্বিকতার ছাঁচে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছে। রাজস কর্মকে দাবাইয়া রাখিয়া সাত্ত্বিক কর্মের জন্যই জনসাধারণকে মায়াবাদ প্রেরণা দান করিয়াছে। কিন্তু সকল মানুষের পক্ষে সত্ত্বগুণ তো স্বধর্ম নয়। যাহারা রজোগুণী, তাহারাও মায়াবাদের আদর্শ মানিয়া লইয়া স্বধর্ম ঐ রজোধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম সত্ত্বগুণের জন্য ব্যাকুল। একটি জাতি আজ পরধর্মের যাজন করিয়া কাহার মৃত্যুর সন্ধানে।

মায়াবাদ চৈতন্যের নেশায় জড়কে পদদলিত করিয়াছে। জড়বাদীরা তাই কোনও অবস্থায়ই নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পায় নাই; অজড়বাদীদের পিছনে ফেলিয়া তাহাদের নেতৃত্ব করিবার অধিকার জড়বাদীদের মিলে নাই। অথচ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবন অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে, ক্ষেত্রবিশেষে যখন সত্ত্বগুণ নেতা হইবার অধিকারী তখন রজোগুণ থাকিবে সত্ত্বের পশ্চাতে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে যখন রজোগুণ নেতা হইবার সুযোগ লাভ করে, তখন সত্ত্ব ও তমঃ থাকিবে রজোগুণের পশ্চাতে রজোগুণকে পুষ্ট করিবার জন্যই। আজ এই আর্ষ-অনার্য সমন্বিত পুরুষোত্তম-জীবন সামনে রাখিয়াই হৃদয়ের আলোকে খুঁজিতে হইবে কোন্ ক্ষেত্রে আদিবাসীরা হইতে পারেন চৈতন্য-উপাসক উচ্চবর্ণেরও নেতা। সেই ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্বয়ংমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে এবং উচ্চবর্ণীয়েরা সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিলেই সম্ভব হইবে 'একজাতীয়তার' সৃষ্টি। অনুকম্পা প্রদর্শনের ভিতর দিয়া তাঁহাদিগকে কিছুতেই আপনার করা যাইবে না।

এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইতে চাই যে, ততদিন না এই বৈপ্লবিক দর্শন এবং তদনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী দেশের সর্বত্রে প্রবর্তিত হইতেছে, ততদিন খণ্ডজাতি সম্মেলনের উদ্দেশ্য আশানুরূপভাবে কিছুতেই ফলপ্রসূ হইবে না। এ সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত হউন। পুরুষোত্তম অনুকূল হউন। বন্দেমাতরম্।

আমি বিশ্বনাগরিক

(শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের বাণী)

। শ্রীকালী কিঙ্কর সেন গুপ্ত ।

আমি বিশ্ব নাগরিক
অঙ্গুল অতিগ দিক
শুধু দিগ দর্শনের তেরে,—
রাষ্ট্র তেরে ধর্ম তেরে
রেখা দিয়ে জন্মছেদ
তেরে হীন এক ব্রহ্ম বেদ।
জীবনের আস্বাদন
বহু রসে বর্ণাঙ্কন
রসে রূপে এক পরিণাম,—
সর্ব ধর্ম সমন্বয়
ভিন্ন যানে যাত্রা হয়
একতীর্থে করিতে প্রণাম।
নিত্যানিত্য আত্মানাত্মা
প্রতিমুখে সে উদাত্ত
এক তত্ত্ব যাত্র পরকাশ,—
চিদচিৎ জ্ঞানাজ্ঞান
দ্বৈতাদ্বৈত নানা তান
এক অর্থে সর্বানর্থবাস।
সাকার কি নিরাকার
উভয়েই একাধার
একারি আকার-কারিগরি,—
বোধ চিত্ত অপ্রমত্ত
সমন্বয় এক তত্ত্ব
নিত্যগোপালের পন্থা ধরি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(১৬)

সকাল ৭টার কিছু আগেই রেণু-প্রতিভা আসে, তাহার পরেই ঈশ্বর প্রামাণিক তাহার ছোট ক্যামেরাটী নিয়া আসে। ছাদের উপর আমার ২ বার ও রেণু-প্রতিভার একত্রে ১ বার ফটো নেওয়া হয়। নীচের ঘরে আমার ১ বার ফটো নেওয়া হয়।…রেণু ১১টার পর আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টী বই ফেরত দিবার জন্য নিয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে ব্রজেন্দ্র শীলের উদ্ধৃত একটা রেফা মিলাইবার জন্য Positive sciences of the Hindus দেখিয়া আসে। অনেক জায়গায় ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর ৬৷৷০ টায় ফেরে।…শশীবাবুর সঙ্গে রেণুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা। সে বলিল, 'এবারকার পূজাসংখ্যা খুবই ভাল হইয়াছে'। সকালে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি।… আমাদের ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কবিতা ও গল্প লিখিবার লোক পাইয়া উঠিতেছি না। ধীরে ধীরে হয়তঃ সৃষ্টি হইবে—ইহাই আমাদের তৃপ্তি। ৯টার সময়ই আসি।…

১৩ই নভেম্বর

সকালে সতীন সেন ও রাধাচরণবাবুর কাছে দুইটী পোস্টকার্ড লেই। ১০ টায় মনোরঞ্জন গুপ্ত আসে তাহার রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধীয় বইখানা পড়া হইয়াছে কিনা এবং রিভিউ কবে হইবে, তাহা জানিতে। বরিশালের অনেক কথা হয়। অনেকে শংকর মঠের সমাধি তুলিয়া আনিবার কথা বলিলেও মনোরঞ্জন গুপ্ত তাহার তীব্র প্রতিবাদ করে। আমি গোবর্দ্ধনের 'গোপালে'র প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলাম যে, একদিন মুসলমানের ভয়ে গোপালকে ফেলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই গোপাল একদিন নিজের উদ্যম নিজে আনয়ন করিয়াছিলেন। পড়িয়া থাকিতে দেও, একদিন সে কথা কহিবে। তবুও স্থানভ্রষ্ট করিও না, স্থানের জিনিষ সেই স্থানেই পড়িয়া থাকুক। বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট ফাঙ্কী গত দাঙ্গায় জড়িত ছিল না বলিয়া মনোরঞ্জন গুপ্ত, শরৎ গুহ, সরল দত্ত, অবনী গুহ ও সুরেশ গুপ্ত যে লেখাটুকু চারুবিশ্বাসের কাছে দিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত খবর শুনিলাম। সুরেশের পথ-চলার নীতিকে সতীনের লোকেরা 'তোষণ' বলিয়া মনে করে ও প্রচার করে। মনোরঞ্জন একখানা চিঠির একটু অংশও আমাকে পড়িয়া শুনাইল। প্রায় ২ ঘণ্টা থাকে। প্রতিভা ১১টায় আসিয়া ছানা দিয়া ব্যাঙ্কে চেক জমা দিতে যায়। রেণু ১৷৷০ টায় বাহির হইয়া ১২টায় বাসায় যায়, আবার ২টায় বাহির হইয়া ৩টার পর আসে। প্রতিভা তাহার আগে আসে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা আফিসে যাই।…মাখনবাবু আসেন।… যে তত্ত্ব ঠাকুরের কৃপায় আসিয়াছে, তাহার ভিতরে তো ভবিষ্যতের fore-seeing আছে, তবে কত দিন আর লীলিবে ইহার প্রকাশ হইতে? আমার 'সহজভাব' কি বাধা জন্মাইতেছে? ৯টায় আমি চলিয়া আসি।…

১৪ই নভেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপি রিভাইস করি। প্রায় ১০টায় রেণু আসে প্রুফ এখান হইতে নিয়া দিয়া আসিবার জন্য। প্রতিভা আজ আর আসে না…রেণু আবার আসে ২টার পর। আমরা ৩টার পর আফিসে যাই। মালতী…আফিসে যায়। মাখনবাবু আসেন।… উপেন ধর তাহার এক বন্ধুসহ আসে। তাহার বন্ধুটীর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। ধ্যেন কাল আবেষ্টনে 'satisfaction'-এর রূপ বদলায়। …বর্ত্তমান যুগে থাকিয়া

অতীতকে আঁকড়াইয়া থাকিলেও মানুষের অন্তরাত্মা satisfied হয় না, কেননা সেখানে আছে সন্ধর্ব। ইহার পর রাধাচরণবাবুর পুত্র পরিতোষ আসে।...

১৪ই নভেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। ১টার পর রেণু ছানা দিয়া যায়। ১১টার পর ..ইণ্ডাষ্ট্রী, দীপ্তি লণ্ডন, প্রেসে যায়।...সুধাংশুর এনভেলাপ আসে।...প্রফুল্লসুধাংশু বসু রায়...'দেবলে'র পক্ষ হইতে আসেন, আগামী শনিবার সেখানে ৩৪০ টার সময় অশ্বিনীবাবু সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিবার জন্য। সে গুণদাচরণ সেন মহাশয়ের, সুশীল দত্ত দিতেন গুহের ওখানে আমার কথা শুনিয়াছে, পত্রিকায় দেখিয়াছে। তাহার সঙ্গে উজ্জয়িনীতের কথা বলিতে বলিতে আশ্রম পর্য্যন্ত আসি। দেবালয়কে গ্রাহক করিয়া দিবে বলিল। যাইব বলিয়া নেই। একজন লোক পাঠাইতেও বলি। প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়। ঠাকুরকে অধিকাংশ সময়ই স্মরণ করি, জড়াইয়া ধরি সমস্ত আবেষ্টনকে পরিপাক করিয়া আগাইয়া যাইবার জন্য। আবেষ্টনের অতীত না হইলে তো আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া আবেষ্টনকে হজম করিতে পারিব না। সুধাংশুর কোনও চিঠি আসিল না। রেণু বলিল,...বই দিলে হইত, অথচ সে সময়ে তাহা স্মরণ হয় নাই। কাজ করিতে হইলে আরও বেশী হুঁস রাখার দরকার হইবে। সুরেন ব্যানার্জী (সভাপতি) ও প্রফুল্ল ঘোষ (সম্পাদক) কয়েক মজদুর দল করিয়াছেন কংগ্রেসের বাহিরে: কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্যও নাকি তাঁহারা থাকিবেন না। এইরূপ বিদ্রোহ বিকৃত বিজাতীয় মনোবৃত্তির লক্ষণ। মুসলীম লীগ মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি লইয়াই হিন্দু বৌদ্ধ হইয়াছিল, মুসলমান হইয়াছিল, খ্রীষ্টান হইয়াছিল। কি শোচনীয় পরিণতি!

১৬ই নভেম্বর

সকালে প্রতিভার জন্য N. S. 200× +C,P, 200× এক মাত্রা দিয়া আসি। তখন প্রতিভা বাজারে গিয়াছিল। আমি আসিতেছি, এমন সময় সে বাজার হইতে ফেরে। ছানা নিয়া আসি। আসিয়া ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের 'পৃথগুপদেশাৎ' (২।৩।২৮) সূত্র পর্য্যন্ত। আফিস হইতে আসার পরই পাবনার কীরেন্দ্র সরকার আসে..। রেণু ২টার পর আসে। 'দীপ্তি'-র বিজ্ঞাপন পায় ২ মাসের জন্য। বার্ষাপেল লোধবার দিবে। এ মাসের কাগজ দেরী হইল। প্রতিভা পোষ্টাফিস ও বাজারে যায়। এখানে আর আসা হয় না। শরীর বিশ্রীটা যায়। আমি ও রেণু বৃষ্টির মধ্যে আফিসে যাই।...ছোটদাদা হরপ্রসন্ন ঘোষ গত ১৮ই নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৭-১৫ মিঃ মারা গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠতাত-খুড়তাত পাঁচ ভাই ছিলাম, তখন বিদায় নিলেন। বাকী ২ জনও দিনের প্রতীক্ষায় থাকিব। বাকী সময়টুকু ঠাকুরের আসন প্রতিষ্ঠায় যদি ব্যয়িত হয়, ধন্য হইব। ছোটদাদার উৎসবাদিতে খুব আনন্দ ছিল, খাওয়ানে খুব উৎসাহ।

মানুষ 'বড়' হইতে চায়—ইহা তাহার স্বরূপ। মানুষের রহিয়াছে ভিতর ও বাহির। যাহাদের কাছে ভিতরে বড় (ব্রহ্ম) হওয়ার পথ রুদ্ধ, তাহারা বাহিরে বড় হইতে চায় —দেহে, বিলাসবাসনে, আয়না-ঘড়িতে। আর যাহারা ভিতরে 'বড়' হওয়ার পথের খোঁজ পাইয়াছেন, তাঁহারা বাহির সম্বন্ধে উদাসীন। প্রথম দল অজ্ঞবাদী, দ্বিতীয় দল অজ্ঞবাদী. দুই-ই ঐবরেশিক। পুরুষোত্তমই সার্ব্বভৌম ব্রহ্ম—বড়—তিনিই বর্ত্তমান যুগের ইষ্ট। ৯টার আগেই আশ্রমে ফিরি; জয়াকে ট্রামে তুলিয়া দেই। স্নান্তি মাখায় আসি।

১৭ই নভেম্বর

কাল বৈকাল হইতেই দুর্য্যোগ। আজ ২টা পর্য্যন্ত বেশ বৃষ্টি হাওয়া চলে। বেশ শীত। ১১ টার পর গিয়া বহুনন্দন ছানা নিয়া আসে। রেণু-প্রতিভা কেহ আসে নাই। প্রতিভা ২টার পর যমুনার প্রতীক্ষায় বাসায় যায়। সে রাত্রিতে আফিসে শোয় নাই। দেবালয় হইতে কেহ নিতে আসে নাই। আসিলেও যেমন বাতাস শীত, যাওয়া

হইত না। ৩৷০ টার পর আফিসে যাই। তখন বৃষ্টি থামিয়াছিল। রেণুর পেটের বেদনাটা তখনও বেশ আছে।··· যতীশ ছাপগুপ্রেস্ড্'বেদনা-নিগ্রহ' গল্পটা ও ৩টা কবিতা রেণু পড়িয়া শুনায়। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' কিছুটা পড়া হয়।···ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপি রিডাইস করি। 'সমাধ্যভাবাচ্চ' (৩।৩.৩৯) সূত্র পর্যন্ত।···

১৮ই নভেম্বর

·· মঠে যাই। আজ গোলাপঝিলির তিরোভাব উৎসব। সেখানে বাল্যভোগের প্রসাদ পাই।...ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রিডাইস করি।...শ্রীগুরুসঙ্গ হইতে ৩৷০ টায় নিতে আসে। ৪৷০ টার পূর্ব্বেই ট্যাক্সীতে সেখানে রেণু সহ পৌঁছাই; গুরুসঙ্গে বক্তৃতা আরম্ভ হয় ৪-৫০-এ, শেষ হয় ৬৷০ টায়। বিষয় ছিল 'ভাগবতধর্ম'। ভগবান আজিনায় দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে পাইয়াছি। এখন সাধনা আরম্ভ হইবে। 'কামেন তাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা'—ইত্যাদি। ভগবানের সাধনায় ভক্তের হৃদয় বদল হইবে। তখন ভগবানের জগৎ বলিয়া এই জগৎ প্রিয় হইবে। তখন 'ন কামমেহ-প্রতিমীশ্বরাৎ পরম্' ইত্যাদি। ভগবানকে পাওয়ার ঘনীকৃত রূপ এই বিশ্বকে পাওয়া। ৬৷০ টার সময় বিদায় রেণু সহ আফিসে চলিয়া আসি।...

১৯শে নভেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিডাইস করি।...রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া ২টার পূর্ব্বে আসে। কিছু পরে প্রতিভা আসে। শেষের কবিতা পাঠ করে। রেণু আবার বাহির হইয়া যায়, প্রেসে প্রিন্ট অর্ডার দিয়া আসিবে। প্রেস হইতে আশুবাবুর ওখানে যায়। সেখান হইতে জয়ার জন্য চশমার দোকানে...জয়ার বাসায় যায়। সেখান হইতে ইনভেস্টাবল্ কার্টেলে যায়। কীর্তিকে পায় না। কাল ১১টায় যাইবে। ৭.৪৮-এ ফেরে। আমি ও প্রতিভা ৫টার কিছু আগে আফিসে যাই। ৬টায় ঘরে আসিয়া ফিরি।

২০শে নভেম্বর

ব্রহ্মসূত্র রিডাইস করি। প্রতিভা সকালে আসে। ঔষধ দিয়া যায়। রেণু ১১টায় সময় বাহির হইয়া ফেরে ৫টার কিছু পূর্ব্বে। পায়ের সন্ধিতে আবার বেদনা হইয়াছে। এমন করিয়া খুন হইয়া মরিলে কাজ হইবে কি করিয়া?...কুসুমের নিকট ও গোসাঁইর নিকট দুইটি পোস্টকার্ড দেই। 'জানকী, বিরূপ সতৃষ্ণ নয়নে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় তোমাদের দিকে তাকাইয়া থাকি। তোমাদের জীবনে আমি আমার স্থিতি খুঁজি' ইত্যাদি। সন্ধ্যা প্রায় ৮টায় অগ্রহায়ণের ১০০ উজ্জলতারক আসে। এই মাসেই প্রথম ১০০ ছাপানো হইল। ২২ ও ২৩ কর্মার দ্বিতীয় প্রুফ আসে।

২১শে নভেম্বর

সকালে ৮৷০ টার পর জল খাইয়া আফিসে যাই।·· প্রতিভা ১১টার পর রওয়ানা হয় বাসে (বাঁশবেড়িয়া); আমি সেই সঙ্গে চলিয়া আসি, বাসে তুলিয়া দেই।... ২টার সময় আবার আফিসে যাই।·· মানকী বাকি পত্রিকাগুলি দিয়ার পোস্টাফিসে দিয়া আসে ৫টার কিছু পূর্ব্বে। ধীরেনবাবুর সঙ্গে আমার গীতাব্যাখ্যার সম্যক আলোচনা হয়। তাহার আফিসে অনেক গীতাপাঠক জুটিয়াছে, তাহাদের কাছে আমাদের ব্যাখ্যার আভাস দেওয়া হয়। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি কখনও দুঃখকে এড়াইয়া সম্ভব নয়। দুঃখের ভিতর দিয়াই তাহা অর্জিত হইবে—তাই যুদ্ধের মধ্যে দুঃখ-নিবৃত্তির কথা গীতাতে উঠিয়াছে। জড়ের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইলে জড়-ও অজড়ের equation করা দরকার। কিন্তু জড়া প্রকৃতি তো অংশ প্রসবিনী। অংশ কি করিয়া অংশীর সহিত coincide করিবে, যদি না অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের এবং সব অংশগুলির সঙ্গে আমার যুক্ততা না থাকে? 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'—জীবের প্রতি-অঙ্গই কাঁদে বিশ্বের সব বস্তুর সব অংশের জন্য। এই অঙ্গের এই কান্নার ভিতর দিয়াই অঙ্গ-অঙ্গী coincide করিবে। মানুষের দেহ বিশ্বমানবের দেহ, বিশ্বদেবতার দেহ, ত্রিলোকপক্ষীর দেহের জন্য কাঁদে। তাই সকলকেই সে

বুঝে লইতে চায়।...আমি ৯টার পর চলিয়া আসি। কি চাপই না রেণুর উপর পড়িতেছে! ঠাকুর কি পথ সুগম করিয়া দিবেন না? পরিমল বৈদ্য আসে...

২২শে নভেম্বর

সকালে বুদ্ধকে সঙ্গে লইয়া নিয়া আফিসে যাই। তখনই রেণু বাহির হইতেছিল। আমাদের সঙ্গে আসিয়া 'Analysis of Matter' renew করিয়া আনিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়।...রেণু এখানে আসার আগে প্রায় ২টায়।...সন্ধ্যার পর দেবালয় হইতে প্রফুল্ল কুমার বসু যায় আগামী শনিবার অশ্বিনীবাবুর স্মৃতিসভায় যোগদানের কথা জানাইতে আসেন। শরীর ভাল থাকিলে যাইব, লোক পাঠাইতে হইবে না বলিয়া দিলাম। কিন্তু পরে সন্তোষ অধিকারী আসে।...

আজ নরনারায়ণ আশ্রমের জন্মদিন। কত উৎসব হইয়াছে, কত লোক খাইয়াছে। আজ আর লোক ডাকিতে উৎসাহ নাই। মানুষ আসে আর যায়। কোন কিছু ধরিয়া রাখিয়া জীবন গড়িবার তাগিদ আছে, এমন লোক তো পাইলাম না। 'লাগি রহরে ভাই'—ইহা যাহাদের মূলমন্ত্র, তেমন লোক তো বেশী পাইলাম না। সঙ্ঘের উৎসব করিতেই মানুষ জানে। জীবনের উৎসব কই? সে যে রক্তারক্তি ব্যাপার। তাহার জন্য কোনও উৎসাহ মানুষের নাই। তবু নামকের জন্মদিনও আজই। নরনারায়ণ আশ্রম কি তাহার কথা বলিয়া যাইতে পারিবে না? কোনই দিনই তো 'সঙ্ঘ' করি নাই, আশ্রমের 'সঙ্ঘও' নয়। যাহা কিছু করিয়াছি, জীবন দিয়াই করিয়াছি। তাই আজ একরূপ একা। সঙ্গে রেণু, প্রতিভা নীলু, সুহৃদ, সুধাংশু, অন্না প্রভৃতি। ইহাদের দিয়া কি ঠাকুর কিছু করাইবেন? আজ সকলের কথাই মনে মনে হইতেছে। ঠাকুর ইহাদের শক্তি দিন, বুদ্ধি দিন, যোগ্যতা দিন, স্বাস্থ্য দিন। রেণু কাল ভোরে ঠাকুরের জন্য মালা ও মিষ্টি আনিবে। আজ রাসযাত্রা। রাসলীলার মর্ম্ম নরনারায়ণ আশ্রম প্রচার করিবার জন্যই তো বাহির হইয়াছিল। তাহার এই জন্মযাত্রা সফল হউক, নিষ্কণ্টক হউক। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি।...

২৩শে নভেম্বর

সকাল ৭৸০টা কেওড়াতলা মহাশ্মশান বীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় যাই। সাতকড়িপতিবাবুর সঙ্গে দেখা। ডাঃ কাটজু আসেন ৮৸০ টার পর। সভায় হেমন্তবাবু, নিরুপম মাইতি, প্রফুল্ল সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। আমি আমার নাম দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। মন্মথ দাস আসেন নাই। ইতিমধ্যে রেণু প্রায় ৯টায় আসে, অপেক্ষা করে; সে যাইবার জন্য উদ্যত, তখন ১০টায় আমি আসি। সে ঠাকুরের জন্য বড় একটী মালা, ছোট ২টী মালা, জিলাপী ও অমৃতী আনে।...রেণু ঘণ্টা দুই পর আবার আসে বাসায় খাইয়া। সুধাংশু আসে। তাহাকে ও রেণুকে আমার খাওয়ার সময় বিচুরী প্রসাদ দেই। সুধাংশু ৪টার সময় যায়। রেণু গ্রুপ দেখে ব্রহ্মসূত্রের। নরনারায়ণ আশ্রমের 'নরনারায়ণ' নাম পাইয়াছিলাম সদানন্দ ঘোষে দিপীন ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে আমি, দিপীন বাবু ও সত্যব্রতের পরস্পরের আলোচনার ভিতর। নরনারায়ণ যেন অযাচিতভাবে, সহজে আমার জীবনদ্বারে আসিয়া উপস্থিত। একা নারায়ণদ্বারা যে বিশ্ব ও কোনও ব্যক্তিবিশেষের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান হয় না, নরের সঙ্গে এক দেহ, একপ্রাণ না হইয়া যে নারায়ণ পশু, তাহা যেন মূর্ত্ত হইবার জন্য আসিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া বিশ্বের বুকে ইহা ছড়াইয়া দিব? নরনারায়ণে ব্রাহ্মণভাব, ক্ষত্রিয়ভাব, বৈশ্যভাব ও শূদ্রভাব সমন্বিত। তাই তো নরনারায়ণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ স্থাপন করা হইয়াছিল। আশা ছিল নরনারায়ণের বৈশ্যরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্রের সেবায় অর্থ যোগাইবে। আজিও তো তাহা চাই, আদর্শ রক্ষার জন্যই চাই।...আমি ও রেণু ৫টার পর আফিসে যাই। এখানে সন্ধ্যায় ভট্টাচার্য্যের 'তিনজন আধুনিক কবি' বইটীর 'জীবনানন্দ দাশ' পাঠ করা হয়। আফিসে গিয়া প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু পাঠ করা হয়। যাহারা একান্ত বাস্তববাদী হইতে চান, তাহাদেরও দেখে আদর্শ-

বাধা হইয়া পড়িতে হয়। বুদ্ধদেব বসুর 'পাপ-পুণ্য' ও 'বন্দীর বন্দনা' মিলাইয়া পড়িলে তাহাই মনে হয়। এ সম্বন্ধে রেণুর সঙ্গে আলোচনা হয়। ১টার পর চলিয়া আসি।...

২৪শে নভেম্বর

সকালে একবার অফিসে যাই...। রেণু, নীলু ও হরিদাসীর নিকট আগামী বুধবার ২৯শে আমার জন্মোৎসব, তাহা জানাইয়া দেয় পোষ্ট কার্ড দ্বারা। রেণু পোষ্টাফিস ও ব্যাঙ্কে গিয়া ২টার মধ্যে এখানে আসে। ২॥০টার পর দেবালয়ের (২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে) জন্য রওয়ানা হইয়া ৩৸০টায় পৌঁছি। তখন কেহ আসেন নাই। পথে ফুটপাতে ললিত সিংহ (তমলুকের কর্মী) মহাশয়ের সঙ্গে দেখা।...সুরেন দত্ত, সুশীল দত্ত, জিতেশ গুহ, দেবপ্রসাদ, সুধীর দাশ, দেবব্রতবাবু (সেক্রেটারী), কুঞ্জনাথ নাগের পুত্র, প্রফুল্ল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। প্রফুল্ল একটী প্রবন্ধ পাঠ করে। সকলেই কিছু কিছু বলেন। আমিও বলি। বিশ্বমানব আজ কোন্ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার মধ্যে অশ্বিনীকুমারের স্থান কোথায়, প্রাণ এবং বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও প্রাণের ঝগড়া এবং শেষে প্রাণের কাছে তাহাদের আত্মসমর্পণের উল্লেখ করিয়া বলি যে, অশ্বিনীকুমার এই প্রাণস্পর্শ পাইয়াই একটী সামগ্রিক জীবন লাভ করিয়াছিলেন। প্রাণের আঁচ তাঁহার ছিল বলিয়াই তিনি সঙ্ঘ গঠনে সফল হইয়াছিলেন। ৭॥০টায় অধিবেশন শেষ হয়। আমি, সুশীল দত্ত ও জিতেশ বাসে আসি। সুশীলবাবু ভবানীপুরে নামিয়া যায়। জিতেশ আমাকে আফিস পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।" পাবনা হইতে বুদ্ধদেবের চিঠি...লইয়া মাখন আসিয়াছিল। দেখা হয় নাই, ঠিকানা রাখিয়া গিয়াছে।...রেণু পৌষের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' নামে একটী ছোট গল্পের উপর লেখে। সুরেন দত্ত M O-তে ৫৲ টাকা পাঠাইয়াছে।

২৫শে নভেম্বর

সকালে বুদ্ধদেব রেণুর ওখানে যাই...। নীহার ব্রহ্মসূত্রের ছাপা খরচ বাবদ ২৫০৲ টাকা দেয়।...সকালে বর্দ্ধমানের নগেন মুখার্জী প্রফেসার, তাহার পুত্র সত্য-সাচী...আসে। কিছু কথাবার্ত্তা হয়। পূর্ব্ব বঙ্গ সম্বন্ধেই বেশী।...আমার দর্শন তাহাদের কাছে বলা হয়। অমলকে পত্রিকার কথা বলা হয়। সে টাকা সতীশ ওখানে রাখিয়া যাইবে বলিল। ২টার পর রেণু আসে, সঙ্গে সঙ্গেই মালতী। কিছু পরেই মাখনবাবু আসে।...বৈকালে বীরেন ব্যানার্জী আসেন। ভারতবর্ষে রবীন্দ্র সংস্কৃতি পরিষদের ঢাকুরিয়া প্রথম অধিবেশনের সংবাদ বাহির হইয়াছে। তাহাকে পুরুষোত্তম-দর্শন আরম্ভ করিতে উৎসাহপূর্ণ আবেদন করা হইল।...রেণু P. E. N-এর সভায় যোগদানের জন্য যায় এবং ৮টার সময় ফেরে।..

২৬শে নভেম্বর

সকালে একবার অফিসে যাই। ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দুইটীর প্রিন্ট অর্ডার দিবার জন্য রেণু ১০টার পূর্বে বাহির হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Tryne-এর 'In tune with the Infinite'-এর খোঁজে যায়, সেখান হইতে মেট্রোপলিটানে যায়। দুপুরে এখানে আর আসে না। আমি ৭টায় সময় যখন বাহির হইয়া শীতলাতলার মোড় পর্য্যন্ত গিয়াছি, তখন রেণু এদিকে আসিতেছে।...আমার এক পাটি জুতা পাওয়া যায় না, বোধহয় গরুই ফেলিয়া দিয়াছে।...উপর প্রীমাণিক এক পোস্টকার্ড দিয়াছে। অতিবৃষ্টিতে ধানের খুব ক্ষতি হইয়াছে। কটো ডেভেলপ করা হয় নাই। কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি সবই পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত। উহার মধ্যে এক পক্ষ যদি প্রাণ খুলিয়া যুক্ত না হয়, তখন তাহা ব্যর্থ। কামের ক্ষেত্রে তখন উহা rape। ক্রোধও তাহাই। যে রাগ করিল, তাহার রাগ যদি অপরে হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ বা প্রেমেরই চিহ্ন বলিয়া মানিয়া না লয়, তখন ক্রোধকারীর ক্রোধকরা, জুলুম মাত্র। সকালে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রিভাইস করি। যুক্তিতে জীবন চলে না, যদি না বিশ্বাস তাহার সঙ্গে যুক্ত হয়। বুদ্ধি যতদূর মর্ম্মধাম দিতে পারে তাহার বাহিরেও এত বড় ব্যাপক

ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, যাহার সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা না থাকিলে বুদ্ধি ঠাঁই পায় না, অতলে ডুবিয়া যায়। অনুকূল ধারণাই বিশ্বাসের ফল। 'অবিমৃশ্যতদনাদৃতঃ ব্যাপারঃ ভাবনা।' 'নিরপেক্ষঃ হি প্রবৃত্তি।' 'নাদৃতং ফলমিতি কর্তৃঃ'।

২৭শে নভেম্বর

···বাসি ৭টার পর একাই আফিসে যাই। ৬৷৷০টায় রেণু বেলেঘাটা হইতে ফেরে।···সকালে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রিডাইস করি।···আজ আমার ৬৭ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। গত বৎসর এই সময় পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ছিলাম। আমার জীবনে পুরুষোত্তম অবতীর্ণ হউন, আমার দেহ অবলম্বনে তিনি তাঁহার পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী দর্শন প্রচার করুন, আজ তাহাই প্রার্থনা। আমার আদেশের বিরুদ্ধে সঙ্ঘে পড়িয়া উঠুক। উদ্বোধনতাপত্র নূতন পথ কাটিয়া অগ্রসর হউক। যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের পুরুষোত্তমজীবন লাভ হউক। ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ। ৯টার পর আফিস হইতে ফিরি।···সকালে সেই সন্ন্যাসী অবস্থানের ব্যবস্থার খোঁজে আসিয়াছিলেন, যাহার সঙ্গে পুরী সাগর সৈকতে দেখা হইত এবং যিনি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আধঘণ্টার উপর তাঁহার সঙ্গে আলোচনা হয়।

২৮শে নভেম্বর

কৃষ্ণা পক্ষমী। আমার জন্মদিন। আমার সকল জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, বিশ্বে পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল অবতরণ করুন, সবটুকু মন্থন করিয়া প্রকাশিত হউন, তাঁহার প্রকাশের ভিতর দিয়া আমার প্রকাশ ধন্য হইয়া উঠুক, এবং সেই প্রকাশে সামনের ব্রহ্মপথ উদ্ভাসিত হউক—ইহাই আমার আজিকার প্রার্থনা তাঁহার শ্রীচরণে রহিল। আমি সেই পথের মাঝে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র রচনা করিব—ইহাই আমার স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতে যাহারা প্রয়াসী হইবে, তাহাদের জন্য অনেক আমার চোখের জলের আশীর্বাদ রহিল। তাঁহারা ঠাকুরের স্নেহে অভিসিঞ্চিত হউন।

রেণু সকালে ৮টার মধ্যেই আসে ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা লইয়া।···এই সময়ে চিন্তানন্দ আসিয়া মঠের সঙ্গে তাহার ছোটখাট সম্বন্ধের কথা বলে। আমি তাহাকে কোনও কিছুর সঙ্গে জড়াইয়া না পড়িয়া, পাশ কাটাইয়া গিয়া ঠাকুরের দর্শন লইয়া আগাইয়া যাইতে বলি। একদিন তো স্বাভাবিক নিয়মেই মঠ তাহাদের হাতে আসিবে। সেদিন তাহারা কি এই মতই মঠ চালাইবে না কি? আদর্শ কোথায়? ইহার মধ্যে জিতেন মুখার্জী (কমানডেন্ট দুর্বুলিয়া ক্যাম্প) আসে। তাহার সঙ্গে সেখানের কথা-বার্তা হয়। প্রায় ১১টায় সে যায়। তাহাকে এইবার উদ্বোধনতাপত্রের টাকা দিতে বলি। রেণুও বাসায় যায়। আবার ২টার মধ্যেই আসে। আমার জন্মদিন সম্বন্ধে প্রবন্ধটা শেষ করে ও শোনায়। প্রতিভা ১২টার পর আসে। এখানেই প্রসাদ পায়। ৪৷৷০টার পর মালতী ঠাকুরের জন্য মালা, ফুলের তোড়া ও সন্দেশ দুই টাকার আনে। আমরা একত্র হইয়া আফিসে যাই। জিতেন মুখার্জী যখন ছিল, তখন সুধাংশু আসে। কিছুক্ষণ থাকিয়াই যায়। আফিসে মাখনবাবু আসে, গৌরমোহন আসে। আজ দুপুরে ঠাকুরের লেখা 'ভক্তিযোগ দর্শন' অনেকখানি পাঠ করা হয়। আফিসে প্রতিভা তাহার লেখা 'পুরুষোত্তমানন্দ ও শিব নিত্যগোপাল' প্রবন্ধ এবং 'সুধা'-র প্রবন্ধ পাঠ করে। নিত্যগোপাল ও সুধার জন্য হলদটা বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

২৯শে নভেম্বর

রেণু সকাল ৮টার পর আসে, ১২টার কিছু পর যায়। আবার ২টার পরে আসে। রেণু তাহার 'একরাত্রি' (রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প) প্রবন্ধটা পড়িয়া শোনায়। পৌষ মাসের প্রবন্ধগুলি ভাল। প্রতিভা দুপুরে ব্রহ্মসূত্রের ২৪শ কর্মার দ্বিতীয় প্রুফ প্রেসে দিয়া আসে। গত কাল ২২শ ও ২৩শ কর্মার ফাইল কপি দিয়া যায়।·· মানুষ নিজের বুদ্ধিবলে সব-কিছু মীমাংসা করিয়া ফেলিবে, ইহা

অসম্ভব। তাহার বুদ্ধির বাহিরে যে বিরাট আবেষ্টন রহিয়াছে, তাহার জন্ত তাঁহার উপর 'বিশ্বাস' রাখিতেই হইবে। সেইজন্তই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, সব বুঝিয়া কেহ ভগবানকে পায় না। পাইয়াই বরং অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। ইহাই 'বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ' প্রভৃতিবাক্যের তাৎপর্য্য। 'বিশ্বাস' যদি না থাকে মানুষ কতখানি বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইবে? আমি কি সত্যই তাঁহাকে ভালবাসি? বিশ্বাস করি? বুদ্ধির ওপারের রাজ্যের উপর কি আমার বিশ্বাস আছে? আমার বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল হউক—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। রাত্রি ৯টার পর আফিস হইতে ফিরি। সত্যজিৎ রায়ের নিকট 'প্রহ্লাদ'-এর design কিরূপ হইবে, তাহার দিক নির্ণয় করিয়া এক পত্র রেণু দেয়।...

৩০শে নভেম্বর

৭টায় আমি ও রেণু দেশপ্রিয় পার্ক হইতে বাসে বীরেনের বাসায় যাই। সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা থাকি। নলবরাণীর সম্বন্ধে আলোচনা করি।...শতকরা ৫০৲ টাকা দানে ব্যয় করিত। ইহার ফল আদৌ ভাল হয় নাই।... 'সর্ব্বং অত্যন্তং গর্হিতম্'। ইহা পুরুষোত্তম ধর্ম্ম নয়। 'উদারতাও বন্ধন।' শেষকালে মানুষ misanthrop হয়, যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়। ১০% শতকরা বাহিরের মানুষের জন্ত রাখিবে। তোমার স্ত্রীপুত্রকন্যার তার কেহ লইবে না। বিপর্য্যয় আসিবেই, তাহার জন্ত যথেষ্ট provision রাখা প্রয়োজন—যেমন বর্ত্তমানের বিপর্য্যয়। ...মঠের ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী এখান হইয়া আফিসে যায়। মঠে ২ সপ্তাহ হইতে কোন্ এক পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করেন। তিনি কাল আসিতে পারিবেন না। আমাকে যাইতে হইবে। ৪টার সময় আসিব। আমি রাজী হইলাম।...প্রায় ৯টায় সন্তোষ আসে।...

১লা ডিসেম্বর

সকালে ছানা আনিবার জন্ত রেণুর ওখানে যাই, কিন্তু ইতি পূর্ব্বেই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।...রেণু আশ্রমে আসে। কলিকাতা যায়, ফেরে ১টার মধ্যে। তাহার পর ২টায় এখানে আসে। প্রতিভা আসে ২৷৷০ টার পর। আমরা ৩-৩৫-এ এখান হইতে মঠের জন্ত রওয়ানা হই। ৪টার ২মিনিট পূর্ব্বে পৌঁছি। ৪-১৫তে ভাগবতের আলোচনা আরম্ভ করি। ভাগবত কেমন করিয়া যে শ্রীনিত্যগোপালের নিজস্ব সম্পদ, ধ্রুবদেবের একশত পুত্রের মধ্যে ৯জন সন্ন্যাসী, ৮১জন সংসারী ব্রাহ্মণ এবং ১০জন ক্ষত্রিয়; ধ্রুবদেব কেমন করিয়া জৈনদের তীর্থঙ্কর এবং বাসুদেবের অংশ, বেদান্তের ঠাকুর ধ্রুবদেবে কেমন করিয়া শিবধারা ও বিষ্ণুধারা সমন্বিত এবং শ্রীনিত্যগোপালে কেমন করিয়া সব পরস্পর বিবদমান ধারাসমূহ সমন্বিত, তাহাই মুখবন্ধরূপে আজ প্রথমে আলোচিত হয়। আগামী শনিবারও কথা আছে, পরে ঠিক হইবে।...আফিসে আসি।...ষতীশ দাশগুপ্তের 'জীবন সংগ্রাম' বই রেণু কিছুটা পাঠ করিয়া শুনায়। রামগোপাল আসে।...৯টার পর ফিরি।...

২রা ডিসেম্বর

সকালে আফিসে যাই; প্রাতে ও বৈকালে অক্ষর লেনের সঙ্গে পথে দেখা। আফিসে চিদানন্দ আসে। জীবনে যদি ঠাকুরকে আবাহন করিতে হয়, যদি মঠের কোন স্থায়ী সেবা করার ইচ্ছা থাকে, তবে মঠেই 'উদাসীন' হইয়া পড়িয়া থাকিয়া ঠাকুরের দর্শন আলোচনা করা উচিত। বর্ত্তমান যুগে ধনতন্ত্রের কোথায় ঠাকুরের স্থান, তাহা না বুঝিলে কি কর্ম্ম করা দরকার, তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। আমার সঙ্গে ঠাকুরের ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করি, আমার টীকি দেখিয়া যাহা বলিয়া ছিলেন, আমাকে 'ঘোষালী' ডাকিতেন, আমি পায়ে আছিল দেই নাই, সাধিয়া খাইতে না চাহিলে খাওয়াই নাই—ইত্যাদির জন্ত মনে পীড়া দিতেছে। রেণু ২৪০ টার পর আসে। ধ্রুবতত্ত্বের প্রুফ দেখে। ছোটবাবার ছেলে বিনয় ও তাহার কনিষ্ঠ ভাই আসে।...মানস রক্ষিত স্কুলে প্রাইজের বইগুলি নিবার জন্ত উদয়নারায়ণপুর

হইতে। ষতীশ দাশগুপ্ত আসে। তিনি ১টার পর যান। 'উদ্বোধন' যে বর্তমান যুগের কথা কহিতেছে এবং এরূপ পত্রিকা যে আর নাই, ইহার প্রচার যে অন্ততঃ ৫ হাজার হওয়া উচিত, ইহা বলেন।...কালীবাসবাবু আজ বাসা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। নগেন মুখোপাধ্যায় কাহাকেও দিয়া তাহার 'বাঙ্গালীর কালীপূজা' প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছে।

৩রা ডিসেম্বর

খুব সকালে বেহালা যাই, পুলের গোড়া হইতে হাঁটিয়া; পায়ে বেশ কাঁকড়ের খোঁচা লাগিতেছিল। ...রেণু প্রেসে পৌষ মাসের কপি পৌঁছাইয়া দেয়। পরে আবার খাওয়া দাওয়ার পর কলিকাতা বাহির হয়। প্রতিভা ২টার পূর্বে আসে। সে এখানে বসিয়া র‍্যাপার লেখে।...কিছু পরেই উপেন ধর (ঢাকুরিয়া) কমলা ও গোস্বামীসব আসে।..

৪ঠা ডিসেম্বর

সকালে সামরিকী 'ধরিত্রীতে বিজয়া-সম্মেলন' লিখি। ১টার মধ্যে রেণু আসে রিকসায়। প্রতিভা আসে ২টার পর। আমি ব্রহ্মসূত্রের ২৫শ কর্মার গ্যালী প্রুফ দেখি। ৩টার পর জয়া আসে...।...জয়া হরিদাসীর বন্ধু একজনের চাঁদার টাকা ৪৲ আনিয়াছে।.. সকালে বালিগঞ্জের একটী লোক উদ্বোধনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা এখান হইতে কিনিয়া নেয়। ভিতরে ভিতরে উদ্বোধন নিজের পথ নিজে করিয়া লইতেছে বোঝা যায়। কালোশশী নন্দর একটী চিঠি দিয়াছে মুর্শিদাবাদ হইতে রেণুর কাছে ২।১ দিন পূর্বে। সে গ্রাহক থাকিবে।

৫ই ডিসেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্রের ২৫শ কর্মা-এর গ্যালী প্রুফ দেখি। রেণু আজও বাহির হয় না। সে ১২টার পর স্নানে গিয়া আসে। 'শিক্ষা' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লেখে। সুধাংশু ১২টার পর আসে। ৪টার পূর্বে যায়। রেণু ৪টার পর নন্দরাণীর চশমার কাঁচটা ঠিক করিয়া লাগাইয়া আনিবার জন্য মঠের চশমার দোকানে যায়। ফেরে ৬টার পূর্বে।...চিন্তানন্দ আসে, প্রায় ৯টা পর্যন্ত থাকে। শনিবার মঠে পাঠ হইবে বলিয়া দিলাম। ঠাকুরের সামনে পাঠ হইবে—এই তৃপ্তি। উহারা যে তেমন কিছু লোকজনকে খবর দিবে, তাহা মনে হয় না। আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে বলিলাম। সুহৃৎবাবুর 'অনিচ্ছাকৃত' বই হইতে 'স্বপ্ন', 'ভয়', 'ধাম' প্রভৃতি প্রবন্ধ রেণু পড়িয়া শোনায়। দুপুরে সুধাংশু আনন্দবাজার হইতে 'শ্রীঅরবিন্দ' প্রবন্ধ পড়িয়া শুনায়। আদর্শগত সমতা আমাদের সঙ্গে অরবিন্দের আছে, কিন্তু পন্থাগত সাম্য নাই। পন্থা পুরাতন। অন্তর্মুখী গতিতে গিয়া আবার নামিয়া আসিয়া এই জগৎকে ভাগবতরূপে গড়িয়া তোলা। ইহা মায়াবাদ হইতে অনেকটা departure হইলেও ইহা সূক্ষ্মভাবে মায়াবাদই। এই পথে এই জগৎ ভাগবত হইবে না। জগৎটাকে ভাগবতরূপে গড়িতে হইলে জগৎ সম্বন্ধে আমাদের antiquated ধারণাই বদলাইতে হইবে। বর্তমান যুগের বিজ্ঞান তাহার সাহায্য করিবে—atom এবং ইহার associated wave, quantum theory। ৯টার পর আশ্রমে ফিরি।...

৬ই ডিসেম্বর

৭টার মধ্যে বাসায় যাই।...রেণু ১১।টার পর আসে, ১২॥ টায় হাওড়া চলিয়া যায়, ১-৪০-এ তাহার গাড়ী। দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আগামী বৎসরের চাঁদা ২৲ টাকা... পাঠাইয়া দেয়। প্রতিভা র‍্যাপার লেখে। আমি ৯টায় একটু পূর্বে চলিয়া আসি।...সন্ধ্যা ৬টার পর হরিদাসবাবুর বাসায় অতীনবাবুর বিশ্বরূপের সভা।...প্রতি মানুষ যদি জ্ঞানপূর্বক dialectic-এর পথ অনুসরণ করিত, একবার আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া, একবার বিকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া সংসারে চলিতে পারে, তবে সংসারও থাকে, সন্ন্যাসও থাকে। সে ধরা দিয়াও অধরা থাকে। এজন্য চাই অপ্রমত্ত হইয়া আবেষ্টনটীকে বিচার করিবার রাগদ্বেষহীন শুদ্ধ মনোবৃত্তি। রেণুকে এইজন্যই আজ শ্রীনিকেতন যাইতে বলিয়াছি।...

৭ই ডিসেম্বর

ক্রমশঃ

বিদ্যোৎসাহী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

॥ শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ॥

তাঁহার সমুজ্জ্বল কর্মজীবনের আদর্শে বিবিধ লোক-সেবার দৃষ্টান্ত প্রতিভাত। বিচার বুদ্ধি প্রণোদিত অভিমত প্রকাশ উদ্দেশ্যে তিনি একাধিক সমিতির সদস্য ও পরিচালক মনোনীত হইয়াছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় মিশ্রো অধ্যাপক প্রমথনাথের স্থান ছিল সর্ব্বাগ্রে। তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মিলনের সভাপতির প্রধানপদ আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মনীষী প্রমথনাথ ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক বিজ্ঞান সম্মিলনের সভাপতির পদ সমুজ্জ্বল করেন। ১৯২৯ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Arts-এর অধিকর্ত্তা (Dean) হইয়াছিলেন। বিখ্যাত বঙ্গীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভাপতির সম্মানিত আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিষয়ক স্নাতকোত্তর পরিষদের অধিপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন ১৯২৯-১৯৩০ খৃষ্টাব্দে।

তপস্বী প্রমথনাথ রাজনৈতিক কর্মসাধনেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি সহ-সভাপতির কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন কংগ্রেস ন্যাশনালিষ্ট পার্টির। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলো বা অতিরিক্ত সম্মানিত সদস্যরূপে তাঁহার গঠনমূলক অবদানের মূল্যও স্বল্প ছিল না। এ কারণ শিক্ষানীতিজ্ঞ, অর্থশাস্ত্রবিদ্ এবং রাজনৈতিক নেতারূপে তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়। তাহারই প্রভাব প্রমথনাথ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়াভেলের ভারতের বড়লাটের সিমলা সম্মিলনে আহূত হন।

কলিকাতায় ভারত-সভা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে একদাকালে ব্যবহারিক রাজনীতির অনুশীলন ও তাঁহার নেতৃত্বে রাজনৈতিক দর্শন ও দেশসেবার কার্য্য পদ্ধতি বিবেচিত ও বিশ্লেষিত হইত। রাষ্ট্রগুরুর শিষ্য হিসাবে হিতকামী স্বদেশসেবক প্রমথনাথ ভারত-সভার সুযোগ্য সভাপতিরূপে কিছু কাল কার্য করিয়াছিলেন (১৯৪৪-৪৯)। রামমোহন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিরূপে তিনি যোগ্যতার সহিত উহার সভাপতির দুর্বহ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বহুকাল অবধি (১৯৪৪-৫০) মূকবধির বিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অনেক উন্নতিমূলক সংস্থার সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি রূপে ও নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে (১৮২৮ খৃঃ) অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদকরূপে তাঁহার কৃতিত্ব প্রভূত যশ অর্জন করে। ডাঃ আনি বেশান্ত সুবাসী ও সমাজসেবীর সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিবার কথা ছিল, কংগ্রেসের অধিবেশন কার্য্যে অভাবিত কার্য্য উপলক্ষ্যে অপারগ হওয়ায় উপরাষ্ট্রপতি অনামধন্য সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন যোগ্যতার সহিত সম্মিলনের কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ সুললিত অভিভাষণ পাঠ করেন প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়। প্রমথনাথ, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অমূল্য বিদ্যাভূষণের সম্পাদিকতায় বিপুল উৎসাহে ঐ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

Federation Hall Societyরও তিনি অন্যতম সভাপতি ছিলেন। ইহার সংশ্লিষ্ট Indian Economic Society, The Indian Institute of political Science প্রভৃতির সভাপতি পদে তিনি সমাসীন ছিলেন। Indian Cultural Institute-এর ডিরেক্টর হিসাবে তাঁহার অবদানও স্মরণযোগ্য।

অর্থশাস্ত্রবিদ্ প্রমথনাথ Indian Statistical Institute-এর সহ সভাপতির কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। Indian Economic Association-এর চতুর্দ্দশ সভাপতি তিনি নির্ব্বাচিত হন, লাহোরের দ্বিতীয় সভাপতি হইয়াছিলেন Indian Political Science Conference-এ ১৯৪২-৫০ খৃষ্টাব্দে। মনস্বী চিন্তাশীল পণ্ডিত প্রমথনাথ সংযুক্ত আতিপুরের গ্রন্থিবৎ সম্মিলনের কার্য্যকরী সভাপতি নিযুক্ত হইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

দেশকর্ম্মী প্রমথনাথ আজন্ম কংগ্রেস-কার্য্যে সেবার ও পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দেশসেবার আদর্শ ছিল অনাবিল, উৎসাহপূর্ণ ও গঠনমূলক। উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন সুযোগ্য পরামর্শদাতা। প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন সদস্য ছিলেন। নির্ব্বাচন-মনোনয়ন কমিটিতেও তিনি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (অধুনা রাজা সুবোধ মল্লিক উদ্যানের) বিশিষ্ট কংগ্রেসের বিরাট অধিবেশনে তিনি অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য তিনি বহু জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রূপে তিনি নানা কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন (১৯২৩-১৯৩০ খৃঃ)। কাশ্যপজী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি Indian Legislative Assembly-র Nationalist Party-র অন্যতম সুযোগ্য নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৩৫-১৯৪৬ খৃঃ)।

পারিবারিক জীবনে দ্বিতীয় প্রমথনাথ স্নেহ মমতা, ভালবাসা অহর্নিশের বিশাল স্নেহ দান করিতে পারেন নাই। তিনি বিধাতৃ-বিধানে অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা পুলিন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত অপার স্নেহ পাশে আবদ্ধ ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাঁহার পুত্রস্থানীয়, স্নেহ বিগলিত হৃদয়ে তাঁহাদের জড়াইয়া রাখিয়া ছিলেন।

বিগত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া বিধির আহ্বানে অনন্তধামে চলিয়া যান। তদবধি সচ্চরিত্র প্রমথনাথ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার নবলব্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রগভীরতার উদ্ভাসে তথাইয়া গিয়াছিল, তিনি মানব সেবার মহান আহ্বানে আত্মনিবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। এইরূপ শোকাহত হইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখবেত্ত শোকারণ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনীষার চিন্তায় ক্ষেত্র প্লাবিত ছিল, তিনি জটিল ও দুরূহ দর্শন শাস্ত্রের আশ্রয়ে শান্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন। তত্ত্বদগ্ধ অন্তরে তিনি উত্তর কালে লিখিয়া ছিলেন একস্থলে, "ওরে হতভাগা, একবার জগতের সমুখে দাঁড়িয়ে সমস্তের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ না। সেখানে যুগ-যুগান্তের মহামেলায় লক্ষকোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী! কাকে বল তোমার স্ত্রী? ওই শব্দটাকে নিজের ঘুঁয়ে ঘুলিয়ে তুলে দিন রাত্রি সামলে বেড়াচ্ছ—আচ্ছা, বাইরে থেকে একটা শিস দিলেই এক মুহূর্ত্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপসে যাবে?

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই। ও যদি বলতে চায়, না, আমি আমিই—তখনই আমি বলব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি, ওটা কি একটা সত্য? ওই কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালাবন্ধ করে রাখা যায়?' (ঘরে বাইরে) তবু ইহা স্ত্রী-বিয়োগের চিন্ত হইতে উৎকলিত নহে।

দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর প্রমথনাথ দুর্নিরীক্ষ্য অমানার নির্দ্দেশে বিপত্নীকের বিস্তৃত জীবন যাপন করিয়া যুঝিয়া ছিলেন এ সংসারে যাত্রা-পথ কুসুমাকীর্ণ নহে। তথাপি দুস্তর শোক-পারাবার অতিক্রম করিয়া লোক-সেবার শান্তি-শীতল উদ্যম-বিহীন শান্তি-সায়রে বিশ্রাম ও তৃপ্তি খুঁজিয়াছিলেন। কর্ম্মময় জগতে কর্ম্ম ভিন্ন গতি নাই—আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া তিনি স্বদেশ সেবায় মগ্ন হইতেন।

মনের যত দুঃখ ঘরে বাহিরে ছড়াইয়া আছে তাহার প্রভাব চিত্তাকুল হৃদয়ে তিনি ছায়ার মত উড়াইয়া দিতে পারিয়াছিলেন—সেই স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, কর্ত্তব্য

পালনের অমর শিখায় আত্মশোক আহুতি দিয়াছিলেন—অধিক দিন তাহা পরম সত্য বলিয়া ঝাঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন নাই। সমাজ-সেবার পুণ্য আহ্বানে, লোকশিক্ষার পবিত্র কর্তব্য-পালনে তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন কিংবা অধ্যয়ন রত বাণীবন্দনায় নিযুক্ত থাকিতেন।

জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বহুবিধ ব্যবসা ক্ষেত্রের সহিত তাঁহার বিবিধ প্রকার সম্পর্কের অন্ত ছিল না। বহু কোম্পানীর পরামর্শ দাতা, 'ভাগ্যলক্ষ্মী' প্রভৃতি বহু বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টর, শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্থানের পরিচালক তিনি ছিলেন, প্রত্যুৎপন্নমতি ও অমূল্য অর্থনৈতিক উপদেশ-দান শক্তির প্রভাবে।

জাতীয় শিল্প বৃদ্ধি ছিল তাঁহার কামনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে ইহার উৎপাদন পদ্ধতির আলোচনা গবেষণা ছিল তাঁহার সাধনা। জাতীয়তার মন্ত্র তিনি বহুকাল হইতে জপ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে কার্যক্ষেত্রে তাহার ব্যবহারিক রূপের তিনি ছিলেন আধার, আশ্রয়—সে কারণ কল কারখানার মালিক, ব্যবসায়ী শিল্পানুরাগী সদুদ্দেশ্যের জন্ত তাঁহার নিকট আসিতেন—তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। তাঁহাকে ডিরেকটার হইতে হইত বহু শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য বা কর্ণধাররূপে তিনি বহুকাল স্থির প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন।

স্বদেশী যুগে "বন্দে মাতরম্" সম্প্রদায় একটি রুচিসম্মত শিক্ষিত প্রতিষ্ঠান ছিল। অধ্যাপক প্রমথনাথ দেশভক্ত ও স্বদেশ-সেবাপরায়ণ ছিলেন বলিয়া এই সম্প্রদায়ের একজন অনুরাগী সদস্য ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়, রাজা সুবোধ মল্লিক, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেঠ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ললিতচন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, সরলা দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি স্বদেশী মন্ত্র সাধনা ও জাতীয়তাবোধ দেশমধ্যে জাগ্রত করিতেন। তাঁহারা স্বদেশ সঙ্গীত গাহিয়া দেশ-মাতৃকার বন্দনা করিতেন, শোভাযাত্রা করিয়া সকলকে আগ্রহিত ও বক্তৃতাদ্বারা ও পুস্তক বা প্রবন্ধ রচনা দ্বারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। এই "বন্দে মাতরম্" সম্প্রদায় স্বাধীনতালাভের ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা আমাদের উন্নতিলাভের গতি পথের এক আবর্ষণ বস্তু,—পথ-নির্দেশ। এই নির্দেশ-প্রস্তর বহু পথিকে পরিত্রাণ করিয়াছে, পথহারাকে পথের সন্ধান দিয়াছে। স্বদেশ-সেবক পাইয়াছে প্রেরণা, উপদেশ, কর্ম পদ্ধতির উপায়, জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির প্রয়োজনা। কত তরুণ হৃদয়ে ইহা চালিয়াছে স্বদেশ-সেবার উৎসাহ-প্রবাহ, স্বজাতির প্রতি অনুরাগ-স্রোত, বিদ্যা-বুদ্ধি সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রপূজা অর্চনার বিবিধ উপকরণ-আহরণ। এই সম্প্রদায়ে শিক্ষাব্রতীদল জাতি গঠনের আদর্শে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, জাতীয় শিল্প নির্মাণ ও প্রচার ও মাতৃপূজার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, ব্যবসা বিস্তারের পবিত্র চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। স্বদেশ প্রেম তাঁহাদের ছিল মন্ত্র, দীক্ষা ও সাধনার ধন।

উত্তর কলিকাতায় ইণ্ডিনিং ক্লাব ছিল তৎকালে এক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। ইহাতে বহু জ্ঞানী, মনীষী, সঙ্গীতজ্ঞ, ব্যবসায়ী, শিল্পানুরাগী, কবি-সাহিত্যিক সম্মিলিত হইতেন। দেশসেবক ও অধ্যাপক প্রমথনাথ ইহাতে অন্তরের সহিত যোগদান করিতেন। তাঁহার অমায়িক স্বভাব মিষ্ট ভাষণ সকলকে আকৃষ্ট করিত। এই প্রকার অনুরাগী সদস্য আরও কয়েক জন ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিদ্বজ্জনকে পাইয়া সকলে পরম সুখী জ্ঞান করিতেন। সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে কেন্দ্র করিয়া ইহা গঠিত হয়। সদস্যদের মিলন কেন্দ্র ছিল চির প্রসিদ্ধ ও চির সুন্দর পূর্ণিমা-মিলন। ইহা বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক সদস্যদের ভবনে বৎসরে একবার আহূত হইত। প্রথমে হইত প্রতি পূর্ণিমায়।

এ সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কবি হুসদয় লাহা, ললিত চন্দ্র মিত্র, কবি প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (সত্যেন), প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিত চন্দ্র মিত্র, হরনাথ বসু, যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এচ বসু, সিসিল কর্ণা, অমর নাথ দত্ত, বিজয় চন্দ্র মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ছিলেন। 'দুর্গাদাস' নাটকের ভূমিকায় প্রতিভাবান কবি ও

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিয়া গিয়াছেন : আমার প্রথমে বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে রাঠোর বীর দুর্গাদাসের বিষয়ে নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি তাহার পরে রাজস্থানে বর্ণিত দুর্গাদাসের জীবনী পুনরায় পাঠ করি। পাঠ করিয়া দেখিলাম যে সে দেবদুর্লভ চরিত্র স্বর্ণপটে আঁকিয়া রাখিবার জিনিষ। আমি সেই মুহূর্তেই দুর্গাদাস চরিত্র লিখিবার সঙ্কল্প করিলাম।" ১৩১১ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) দ্বিজেন্দ্রলাল 'পূর্ণিমা মিলনে'র প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য সেবকগণকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরিচয়, ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপন করা পূর্ণিমামিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য, সাহিত্য-চর্চা কাব্যরসের অনুশীলন এই বৈঠকে হইত। প্রথম অধিবেশন বসে ১৩১১ সালে।

ফাল্গুন পূর্ণিমায় দিন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাসাবাটী, ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীটে ঐ উপলক্ষ্যে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি সমাগত হন। ঐ সভায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হইয়া স্বরচিত সঙ্গীত "সে যে আমার জননী" গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। মিলন সভায় ভক্তিরসে সকলের চোখমুখ রক্তিমাভ হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৩১২ সালে "ফাল্গুনে" শুক্ল পূর্ণিমায়। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রথমে ললিত চন্দ্র মিত্র এম এ মহাশয়ের আহ্বানে তদীয় ভবনে বহু বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল। মিলন সভায় সাহিত্য রথী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" আবৃত্তি করিয়া সকলকে তৃপ্তি দেন। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ চন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় অধিবেশন মহা সমারোহে মাধবী পূর্ণিমা রাত্রে ১৩১২ সালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ১নং সুকিয়া ষ্ট্রীট ডাঃ কৈলাস চন্দ্র বসুর ভবনে। মহারাজা মণীন্দ্রযোহন ঠাকুর, জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক খগেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বহু লোক। যতীন্দ্রনাথ বসু দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত একটি গান সুমধুর কণ্ঠে গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। 'এটা নয় কলার মোচার নিমন্ত্রণ' ইত্যাদি গানটি ললিতচন্দ্র মিত্রের অনুরোধে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক সেই দিন সকালে রচিত।

চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ১৩১২ সালে, উপন্যাসিক হারাণচন্দ্র রাহার মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে। প্রমথনাথ, রসময় লাহা, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চম অধিবেশনের স্থান নিরূপিত হইয়াছিল স্টার থিয়েটারে রাখী পূর্ণিমা রাত্রে (১৩১২)। সকলের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিবার আয়োজন ছিল।

ষষ্ঠ অধিবেশন সম্পাদিত হয় ভাদ্র পূর্ণিমায় ১৩১২ সালে আর্টিস সারদা মিত্রের গ্রে ষ্ট্রীটের আলয়ে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মিলনস্থানে কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন স্বরচিত গান গাহিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির গান গাহিয়াছিলেন 'সাধে কি বাবা বলি'…ইত্যাদি।

ঐ সালের লক্ষ্মী পূর্ণিমায় রজনীতে সপ্তম অধিবেশন আহ্বান করেন বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়। ঐ মহতী সভায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ'—'বঙ্গ আমার জননী আমার'…প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সমক্ষে প্রথম উদ্গীত হয়।

অষ্টম অধিবেশনের মিলনস্থান রাস পূর্ণিমায় কবির শ্যালক ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসভবনে।

পরবর্তী পূর্ণিমা মিলন আহ্বান করেন কবির অন্তরঙ্গ সুহৃৎ দেবকুমার রায় চৌধুরী—সাহিত্যিক, কবি ও বজ্রিশালের জমিদারের সুকিয়া ষ্ট্রীটের গৃহে। মহারাজা মণীন্দ্রযোহন ঠাকুর, প্রমথনাথ, জলধর সেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের তরুণ পুত্র দ্বয় (দিলীপ কুমার রায়) ও কন্যা মায়াদেবী অন্তরালে সহকারে 'ইরাণ দেশের কাফি' ও 'সাধে কি বাবা বলি' প্রভৃতি গীত গাহিয়া সমবেত অন্তরঙ্গদিগকে খুশী করেন।

পরবর্তী অধিবেশন সংঘটিত হয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক যোগেশ মুস্তফীর আলয়ে রসময় লাহা স্বরচিত হাসির কবিতা 'অনুতাপ'

আবৃত্তি করিয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন [পৌষ পূর্ণিমায়]।

বাদশ অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় মাঘী পূর্ণিমায় স্বনামখ্যাত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের গৃহে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 'বিভোরে বিহারে চন্দ্রিকা এসো' গাহিলেন ডেপুটি গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত এবং গোপালচন্দ্র সিংহ হাস্যরসাত্মক অভিনয়দ্বারা আনন্দ-প্রবাহ বহাইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী দোল পূর্ণিমায় ১৩১২ বঙ্গাব্দে পূর্ণিমা মিলনের আসর বসে শোভাবাজার ষ্ট্রীটে নন্দলাল দে মহাশয়ের আবাস ভবনে। আবীর খেলায় সাহিত্যিকগণ আনন্দ লাভ করেন। সাহিত্যরথী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রাণ ভরিয়া ফাগ খেলিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ 'পূর্ণিমা-মিলন' সভার উৎসব কৈলাসচন্দ্র বসুর বাটীতে উদ্‌যাপিত হয়,—কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল। প্রমথনাথ, ললিতচন্দ্র মিত্র, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নিয়মিত ভাবে পূর্ণিমা মিলন ব্রতের এই ধারাবাহিক ইতিহাস। পরে, দ্বিজেন্দ্রলাল বিভিন্নধিক দুই বর্ষ কাল কলিকাতায় ছিলেন না, তাই প্রতি পূর্ণিমায় নিয়মিত পূর্ণিমা মিলনের অনুষ্ঠান ঘটে নাই। মধ্যে মধ্যে আসর বসিত, যেমন কলিকাতা ইন্ডিনিং ক্লাবে, এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনে, মিনার্ভা থিয়াটারে, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতার পটলডাঙ্গার গৃহে, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব, রমেশ লাহা প্রভৃতির আবাস গৃহে।

এই প্রকার বিরতি বা অনিয়মের পর মাসিক পূর্ণিমা মিলন উৎসবের বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। বাৎসরিক 'পূর্ণিমা মিলনে'র অনুষ্ঠান ইহার স্থান অধিকার করিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, 'সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পটলডাঙ্গার প্রতাপ চাটুর্য্যের গলির বসত বাটীতে এই ফাল্গুন (খ্রীঃ ১৯০৪) যে পূর্ণিমা মিলন হয় সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমার দেশ সঙ্গীতটী গান করেন।'

'রমণবাবুর বাটীতে মিলনের অনুষ্ঠান ১৩১৪ সালের ফাল্গুন পূর্ণিমার দিন হয়। ঐ দিবস দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে একটি হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ 'গবেষণা' পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী দ্বিজেন্দ্রের মামামহাশয় ঐ প্রবন্ধের একটি হাস্যরসপূর্ণ 'প্রতিবাদ' পাঠ করেন।' [নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সাহিত্যরসিক ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রতি বৎসর স্বকীয় বাস ভবন 'দীনধামে' রাস পূর্ণিমার দিন পূর্ণিমা মিলন আহ্বান করিয়া আসিয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 'দীনধামে' হাস্যরসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী মিলন বাসরে স্বকীয় গুণপনা প্রদর্শন করেন। পরবৎসর মাষ্টার মদন তরুণ বয়স সঙ্গীতজ্ঞ সুমধুর কণ্ঠস্বরে সাধারণকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এই 'দীনধামে' ভবনে এতদ্ব্যতীত বাৎসরিক পূর্ণিমা মিলন উৎসবে দ্বিজেন্দ্রলাল কবি Longfellow-র Psalm of Life Evening club-এর কয়েকজন সভ্যের সহিত গান করেন। কীর্ত্তনের সুরে হাস্যরসাত্মক ভাবের দ্বিয়া উহা গীত হয় বলিয়া সঙ্গীতটি সর্ব্বজন-মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল।

[১৯১২ খ্রীঃ অর্থাৎ ১৩১৯ বঙ্গাব্দের রাস পূর্ণিমায় মিলনোৎসবে দ্বিজেন্দ্রলাল 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' নামক অপূর্ব্ব সঙ্গীতটি গাইয়া জনসাধারণকে মোহিত করেন। কথা বাহুল্য সাহিত্যরসিক প্রমথনাথ সকল অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাস পূর্ণিমার দিন 'দীনধামে' এই সাহিত্যিক আসরে দ্বিজেন্দ্রলাল আর ইহলোকে ছিলেন না, সুলেখক বাগ্মী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অমিয় চরিত্র, রসগ্রাহিতা ও সাহিত্য সেবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, সকলেই অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

ইহা স্মরণযোগ্য যে, বাৎসরিক পূর্ণিমা মিলন সাহিত্যিক অঙ্কের ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় তদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে 'দীনধামে' বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত করিতেন। অমর সাহিত্যিকের বার্ষিক শ্রাদ্ধ সভার কার্য্য প্রতিবৎসর সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকদের লইয়া উদ্‌যাপিত হইত।

তথায় স্বরচিত মৌলিক প্রবন্ধ ও স্বরচিত কবিতা পাঠ, গবেষণা প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা, ভ্রমণ, বাঙ্গ সাহিত্য, গ্রন্থ রচনা, জটিল তত্ত্ব মীমাংসা, দুরূহ আলোচনা, সাহিত্যরস সৃষ্টি কাহিনী, গল্প, আবৃত্তি, সঙ্গীত হাস্যকৌতুক এবং ভূরিভোজন। অধ্যাপক ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরস প্রবন্ধ 'গুরুপ্রসাদ' এই স্থানে পঠিত হয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিমলচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তারাকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি মনীষীরা আসিয়া আসর শোভিত করিতেন ও উপদেশ বর্ষণ করিতেন। সাহিত্যাচার্য্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যবিদ্যাভূষণ, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শিশির কুমার ভাদুড়ী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, হেমেন্দ্র কুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সহযোগিতা করিতেন। সাহিত্যচর্চ্চা অধ্যাপক প্রমথনাথের নীরবে নিভৃতে সম্পন্ন হইত, কাব্য-অনুবাদ, সাহিত্য-প্রীতি ও অনুশীলন প্রমথনাথ সমস্ত জীবন ধরিয়া সাধন করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ ললিত বাবুর ভবনে বার্ষিক পূর্ণিমা মিলন অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায় তুমিষ্ঠ গায়ক ও গুণী জনপ্রিয় মিত্রের আকস্মিক পরলোক গমনের পর বৎসর।

নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ফুরাইলে, জনপ্রিয় কর্ম্মবীর প্রমথনাথ সর্ব্বনিয়ন্তার আহ্বানে স্বল্প রোগ ভোগের পর এই নভেম্বর ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের অপরাহ্ণ কালে অনন্তধামে চলিয়া যান। সর্ব্বলোক সমাদৃত উপাধ্যায় প্রমথনাথ বহিও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন স্বকীয় বাসভবন ৪।১ এ বিডনস্কোয়ার ষ্ট্রীটে, তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধের দিন আচার্য প্রমথনাথের শোক প্রকাশার্থ সভাধিবেশনের পুণ্য কার্য্য তাঁহার সেবাজীবনের প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্র কেডারেশনের হলের সভাগৃহে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বহু গুণী, বিদ্বজ্জন, সাধারণ ও গুণগ্রাহী তথায় উপস্থিত হইয়া সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

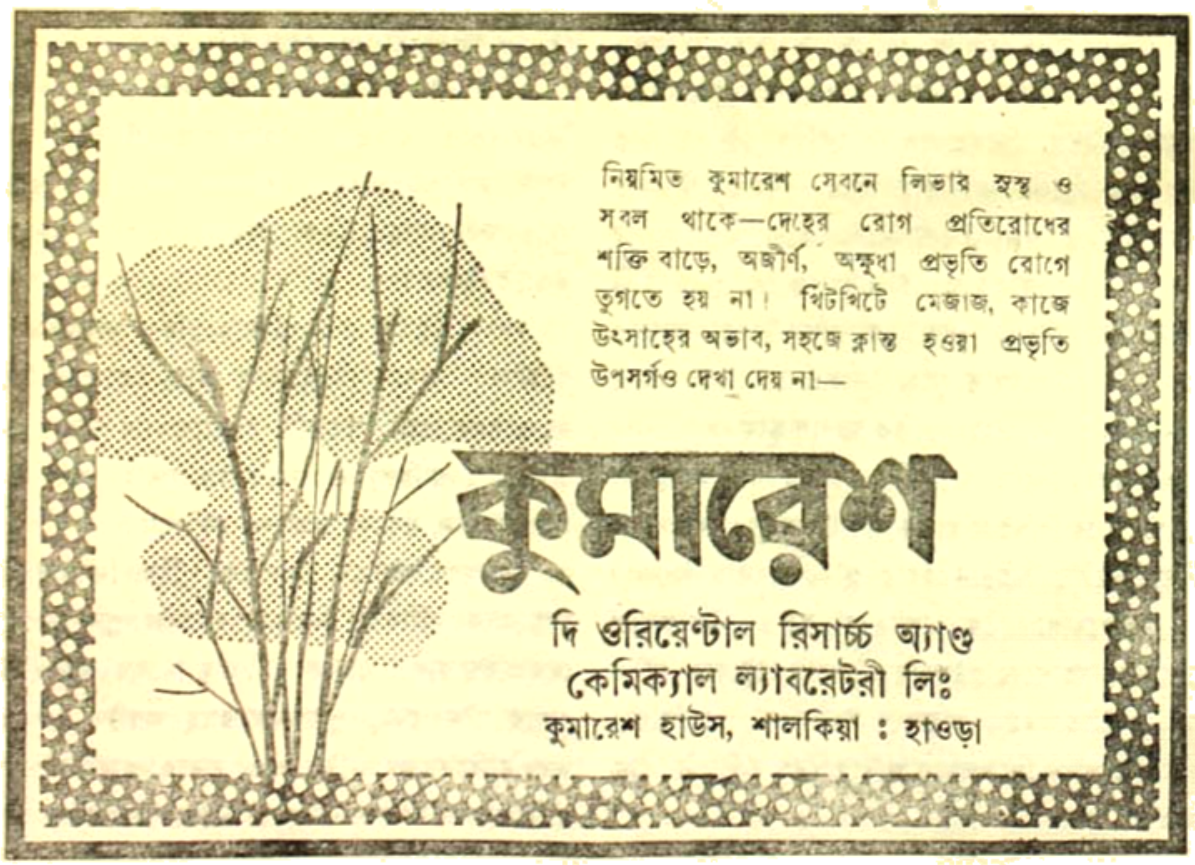

আমাদের সময়কার শান্তিনিকেতন

॥ শ্রীঅবনীনাথ রায় ॥

ঠিক পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। ১৯১১ সালে আমি শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসাবে যাই। তখন আমার বয়স ষোল বছরেরও একটু কম হবে।

কি করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমি শান্তিনিকেতনে গেলাম তার ইতিহাস নানা পত্র পত্রিকায় এবং আমার বইয়ের পাতায়* ইতিপূর্বে লিখেছি। সুতরাং সে প্রসঙ্গ এখানে বাদ দেব।

আমরা যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়তাম, তখন আশ্রম এত বড় হয় নি, ছাত্র সংখ্যা আশ্রমে দুই শত ছিল, বিশ্বভারতী ত হয়ই নি। এই ছাত্রেরা পড়ার মান অনুসারে তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল—শিশু বিভাগ মধ্য বিভাগ এবং আদ্য বিভাগ। আমি আদ্য বিভাগে গিয়ে স্থান পেলাম। তখন থেকেই আমাদের হাতে লেখা কাগজ ছিল, আদ্য বিভাগ থেকে দু'খানি কাগজ বেরুতো —বাংলায় 'শান্তি' এবং ইংরেজীতে The Gardener। যতদূর মনে আছে প্রথম খানির সম্পাদক ছিলেন অতুলেন্দু সেন গুপ্ত এবং দ্বিতীয় খানির শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নন্দী। এই কাগজে হাতে আঁকা ছবিও থাকতো। কাগজ বেরুলে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হত এবং তিনি সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন।

এই সময় শিক্ষকদের সংখ্যাও কিছু কম ছিল। তার ফলে রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে ক্লাস নিতে হত। আমরা বিনা কারণে বিনা দ্বিধায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ লাভ করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছি। কবিতা লিখে তাঁকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিয়েছি।

আজ সে কথা মনে করলে নিজেরই হাসি পায়। কিন্তু তাঁর প্রকৃত রূপটি এর থেকে ধরা পড়ে। প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হত—বয়স্ক ছাত্রদের জন্য, আর বৃহস্পতিবার অল্প বয়সের ছেলেদের জন্য। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে উপস্থিত থাকলে তিনিই উপাসনার কাজ দিতেন; তিনি কলকাতায় বা অন্য কোথাও গেলে অজিতবাবু বা ক্ষিতিমোহনবাবু দিতেন। এ ছাড়া সপ্তাহে দু'দিন রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে গল্প বলতে আসতেন। একটা হল সমবেত সন্ধ্যা উপাসনার পর এবং খেতে যাওয়ার আগে। কথা ছিল একদিন বড় ছেলেদের গল্প শোনাবেন, আর একদিন ছোটদের। কিন্তু দু দিনই সকলে সমানভাবে যেত।

রবিবারের বদলে আমাদের বন্ধ থাকতো বুধবারে। সেই দিন পোশাকে কাপড় দেওয়া, চুল দাড়ি কামানো ইত্যাদি করতে হত। আমাদের সময় মাছ মাংস ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। দিনের বেলা ঘোল এবং রাত্রে দুধ দেওয়া হত। জলখাবারও দু'বার দেওয়া হত। কি শীত, কি গ্রীষ্ম রাত্রি ৮টার সময় শয্যাত্যাগ করতে হত। জুতা পায়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল না। শাল গাছে একটা পেটা ঘণ্টা (gong) ঝুলানো থাকতো—তারি ঘণ্টা অনুসারে শয্যাত্যাগ, ঘর ঝাঁট দেওয়া, মাঠে মলত্যাগ করতে যাওয়া, স্নান, প্রাতঃকালীন উপাসনা, সমবেত উপাসনা, জলখাবার খাওয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হত। এই সব পর্ব চুকিয়ে সকাল সাতটার সময় আমাদের পড়ার ক্লাস সুরু হয়ে যেত। যিনি যখন মনিটার (বাংলায় যা বলা হত ভুলোভোহি) থাকতেন তিনি ঐ ঘণ্টি নিজের হাতে বাজাতেন।

আমাদের ইংরাজি পড়াতেন অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং নেপাল চন্দ্র রায়। গণিত এবং বিজ্ঞান জগদানন্দ রায়। বাংলা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিশচন্দ্র সেন এবং সংস্কৃত বিধুশেখর শাস্ত্রী। ইতিহাস কে পড়াতেন

*লেখকের বই 'পাঁচ দিনেলি' দ্রষ্টব্য।

মনে পড়েছে না—যোগেন্দ্র ক্ষিতিমোহন সেন। আর ভূপেন্দ্র নগেন্দ্রনাথ আইচ।

ডাঃ সুধীরঞ্জন দাশ, যিনি এখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়েছেন তিনি আমাদের চেয়ে এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। সোমেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্মা (কর্নেল মহিম ঠাকুরের ছেলে), যিনি পরে ত্রিপুরা স্টেটের কমাণ্ডার-ইন্-চিফ্ হয়েছিলেন, তিনিও এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। আমাদের ব্যাচের মধ্যে প্রফুল্ল সেন (ক্ষিতিমোহন সেনের ভাগনে) এবং ব্যারিষ্টার ও সুলেখক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

এর পরে একেবারে ১৯০৮ সালে চলে আসছি যখন আমি এলাহাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম। এই যাওয়ার মূলে ছিল এলাহাবাদের রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রাঘবানন্দের আগ্রহ। স্বামীজীর সঙ্গে আমার বিশেষ সখ্যতা হয়েছিল। তাঁর ছাত্র-জীবনের নাম ছিল সীতাপতি চট্টোপাধ্যায়—ইনি ভবানীপুরের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান ছিলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন এম. এ ক্লাসে পড়েন তখন ইনি পড়া ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এঁর বাবা সেজন্য রামকৃষ্ণ মিশনের নামে মোকর্দ্দমা এনেছিলেন; কিন্তু ছেলে তখন সাবালক—তিনি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বলায় মোকর্দ্দমায় কিছু হয় নি। ইনি রবীন্দ্রনাথের কাছে একবার তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বারে বারে আমাকে অনুরোধ করছিলেন। আমি সাধ্যমত এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছিলাম। বলাম, আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, একটা মঠের অধ্যক্ষ, আপনি দেখা করতে যাবেন তাতে সঙ্গে একজন লোক নিয়ে যাওয়ার দরকার কি? তিনি তার উত্তরে বল্লেন, না, সে কি হয়? আপনারা তাঁর কাছে যেকেছেন, তাঁর কথাবার্তা শোনার আপনাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, আপনারা কেউ সঙ্গে থাকলে যেমন সুবিধা, তেমন আর কিছুতেই নয়। আমরা যাব আর একদিন থেকে চলে আসবো। আপনি আপিস থেকে এক দিনের ছুটি নিয়ে একবার চলুন। আমিও তখন এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথকে আর একবার দেখতে পাব বলে সানন্দে রাজি হলাম।

রবীন্দ্রকে আমাদের যাওয়ার সংবাদ আগে থাকতে জানানো হয়েছিল। টাটার গেস্ট হাউসে আমাদের জন্য থাকার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল।

বর্ধমানে গাড়ি বদল করে আমরা বেলা ১০।১১টার সময় শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম। জলখাবার সেরে কবির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া এখন উচিত কিনা ভাবছি, এমন সময় কবির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন লোক (সচ্চিদানন্দ রায়) এলেন। আমাদের ইতস্তত করার কারণ তখন বেলা ২টা হবে—গরমের সময়—শান্তিনিকেতনের দিগন্তবিস্তারি প্রান্তরের উপর দিয়ে ধূ ধূ করে গরম হাওয়া বইছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭৭ বছর—মধ্যাহ্ন আহারের পর তিনি হয়ত তখন বিশ্রাম করছেন, এই ছিল আমাদের ইতস্তত করার কারণ। কিন্তু কবি নিজেই ডেকে পাঠিয়েছেন দেখে আমাদের মনে আর দ্বিধা রইল না। একতলার একটি ঘরে গিয়ে দেখি কবি একটা লম্বা টেবিলের মাঝখানে চেয়ারে বসে কি লিখছেন—সামনের জানালা খোলা রয়েছে—সেখান দিয়ে হু হু করে গরম হাওয়া ঢুকছে। সচ্চিদানন্দ আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়েই চলে গেলেন।

স্বামীজী নমস্কার করে বল্লেন, অবনীবাবুর সঙ্গে আপনাকে দেখতে এলাম।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে বল্লেন, অবনীই আপনার সঙ্গে এসেছে বলুন, আপনি অবনীর সঙ্গে আসবেন কেন?

স্বামীজী মৃদু হেসে বল্লেন, সে ঐ এক কথাই হল।

তারপর স্বামীজী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্বন্ধে সাধারণভাবে অনেক আলোচনা করলেন, ধর্মের প্রসঙ্গও বাদ গেল না। এই কথাবার্তার খুঁটিনাটি বিবরণ আজ আমার মনে নেই। কোন ডায়েরিও আমি রাখি নি।

কেবল যখন আমরা চলে আসি তখনকার ঘটনাটি আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে। গাত্রোত্থান করে স্বামীজী রবীন্দ্রনাথকে বল্লেন, আপনার কাছে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আপনি আঙুল দিয়ে আমার বুকের মাঝখানটা একবার ছুঁয়ে দিন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এরকম একটা অনুরোধ বোধহয় প্রত্যাশা করেন নি। তিনি একটু আশ্চর্য বোধ করলেন, সেটা তাঁর মুখের ভাব দেখেই বোঝা গেল। তারপর উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের ডান আঙুল দিয়ে স্বামী রাঘবানন্দের বুকের মাঝখানটা স্পর্শ করলেন।

স্বামীজী খুব তৃপ্তি বোধ করলেন দেখতে পেলাম। তারপর স্বামীজী নমস্কার করলেন এবং আমি প্রণাম করলাম। তারপর আমরা চলে এলাম।

রামায়ণ কি মহাকাব্য ?

□ শ্রীবিভা সরকার □

আজ এই শুভ সন্ধ্যায়—কেন যেন মায়াজাল মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সারাদিনের প্রখর তাপে গাছ পালা সব ঝিমিয়ে, মানুষের মনও বুঝি তাই। এমন সময় চরাচর ঢেকে দিয়ে নেমে এল বর্ষণের ঘনঘটা। মলিনা ধরিত্রী পৃথিবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। সে বুঝি এরই জন্য প্রতিক্ষীতা ছিল। ধারাস্নান অবসানে বসুন্ধরা এই গোধূলির আলোয় যেন স্বপ্ন-বন্যা।

ছেলে এসে বায়না ধরে শোনাও রূপকথা। রূপকথা শোনারই সময় বটে! আজ এই বিষণ্ণ লগ্নে মানুষের ধরিত্রীও বুঝি স্বপ্নময়ী হয়ে রূপকথায় ফুটে উঠতে চায়।

রূপকথার আধো আলোছায়ায়, আধো প্রকাশিত, আধোগোপন স্বপ্নমায়া মনে মনে অনুভব করছি সত্যি। তাই বলে তাকে ভাষাও দিতে পারি না। ঘুরঘুর আমারই মনের ছোঁয়া ছেলেরও মনে। সে ছোঁয়াকে সে ভাষার স্পষ্ট বরে নিতে চায়, বাস্তবের ছাঁচে দেখতে চায়। কিন্তু দেখাই কেমন করে; এ ত দেখানো যায় না—অন্তত আমার ত সে যোগ্যতা নেই।

নিস্তার ত দিতে হবে—তাই বলি, শোন তবে রামসীতার কথা। আমায় স্তম্ভিত করে হঠাৎ বালক বলে, শুনবো না অমন রামের কথা। বীর না ছাই! লুকিয়ে লুকিয়ে বালি মারেন, তার আবার বীরত্ব।

অবাক হয়ে শুধাই, সে কিরে? শুনিসনি—সময় বদল রাবণ রাজা রাবণ বদল রাম।

বলে—ওসব বাজে কথা; সুগ্রীবে বালীতে যুদ্ধ হচ্ছে—একে ত আড়ে আড়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া, তার ওপর আবার যে সত্যি বীর তাকে গোপনে থেকে মরা মেরে ছলের লোককে জিতিয়ে দিয়ে বাহাদুরি নেওয়া।

তাই ত! অন্ধ ভক্তির মোহে আমরা ত এমন করে সত্যকে সন্ধান করিনি—সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিনি। বিস্ময়ে শুব্ধ হয়ে রইলুম ছেলের মুখের দিকে। মন কিন্তু আত্মচেতনায় কিসের বোঝা ঝাড়ায় ছটফট করছে। ছেলে আপন মনেই বকে চলেছে নানা কথা—কিছু তার কানে যায়, কিছু যায় না। তার একটা কথাই যে আমার মনের বিশ্বাসের ভীত নড়িয়ে দিয়েছে। আমায় সচকিত করে দিয়েছে।

আমাদের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণ—সেই কাব্যের নায়ক আদর্শ পুত্র, আদর্শ রাজা রামচন্দ্র। সেই রাজা রামের কথা আবার আদ্যোপান্ত মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করি। গৌরবের রাজসজ্জা উড়িয়ে রাম চলেছেন পিতৃ সত্য পালনে বনবাসে। চলেছেন সঙ্গিনী সীতা সহচারী ছায়ার মত—আর চলেছেন ধনুর্ধারী লক্ষ্মণ ভাই—কিন্তু ঊর্মিলা কই? তার ত কোথাও উল্লেখ দেখি না, কোথাও সন্ধান পাই না। কোথায় রইল পড়ে সেই কাব্যে উপেক্ষিতা মেয়ে? কোথায় বা রইলেন নীরবে রাজ অন্তঃপুরের অন্তরালে লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রা?

রামসীতার মহিমায়, রামসীতার ত্যাগে চরাচর মুখরিত হয়ে উঠল। কিন্তু চতুর্দশ বর্ষ ধরে জীবনের অমূল্য মুহূর্তগুলি ত্যাগ করল কারা? তারপর দ্বিতীয় যুদ্ধে কি দেখি—রাজকার্য থেকে দূরে বিশ্বের কলকোলাহলের অন্তরালে শ্যামল ছায়াঘন বনশ্রীর শান্তিময়ী আবেষ্টনে রামসীতার একান্ত কাম্য মধুময় যুগল জীবন।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে একান্ত একা, ভ্রাতৃভক্ত রামের দাদাদাস, ধনুর্ধারী, যৌবনে যোগী লক্ষ্মণ-ভায়ের ছবি। লক্ষ্মণ সে ত চির-ছায়া; তার ত্যাগ, তার নিষ্ঠা, তার সেবা সে ত রাম-গৌরবে একান্ত ম্লান। কোথাও তার উল্লেখের আড়ম্বর দেখিনা—সে ত দিন রাত্রির মতই সহজ স্বাভাবিক।

এরপর দেখি রাক্ষস দুহিতা শূর্পণখার নির্লজ্জ নির্মম

লাঞ্ছনা দুই ভায়ের হাতে। শূর্পণখা যত হীনই হ'ক রাম লক্ষ্মণের সৌন্দর্য কোথায় শূর্পণখার লাঞ্ছনায়। অরক্ষিতা অসহায় নারীকে যে সাধারণ মানুষও কিছু বলে না। বৃদ্ধা নারী আপন রূপ যৌবন এঁদের পায় দিতে এসে কি উপহার নিয়ে গেল—তার আকাঙ্ক্ষা যতই অন্যায় হ'ক না কেন, তাকে কি অন্য উপায়ে অন্য ভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যেত না? আজ কেন হঠাৎ পদে পদে এ মহাকাব্যের দুর্বলতাই চোখে পড়ছে। এর পরই দেখি সীতা-হারা রামকে। সে কি অধীরতা! কেঁদে কেঁদেই সারা হচ্ছেন। তাঁকে দেখি দুঃখে দুঃখে সমস্ত-হারা একান্তই সাধারণ মানুষ। সময়োচিত বুদ্ধি দিচ্ছেন লক্ষ্মণ, সান্ত্বনা দিচ্ছেন লক্ষ্মণ!

তারপরই সীতা অন্বেষণে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও এই একান্ত কাপুরুষোচিত ব্যবহার। সমস্ত কাব্যে রামের সৌন্দর্য যে বড় আজ চোখে লাগছে না—সে যেন তাঁর জীবনে একান্তই বিরল। বালীবধ উপাখ্যানে মন ধিক্কার দিয়ে ওঠে লজ্জায়। এ কাপুরুষতার বিরুদ্ধে মাথা আপনি নত হয়।

এরপর বিভীষণের সঙ্গে মিত্রতাচরণে এবং সুরক্ষার সহায়তায় ভায়েদের স্নেহনীড়ে চির কলঙ্কলেপন। সৌন্দর্য কোথায় লভ্য হয়? বিভীষণ যদি না থাকত হত কি লঙ্কা বিজয়? ইন্দ্রজিৎ-বধ শুধুই কি কাপুরুষোচিত, শুধুই কি অন্যায়? আমার ত মনে হয় তার ধর্মের এত বড় অপমান পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই কম ঘটেছে। সৌন্দর্যের এত বড় অবমাননা আর কোনও কাব্যে পড়েছি বলে মনে পড়ছে না।

সমস্ত রামায়ণে বীর বলতে যা বোঝায়, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বলতে যা বোঝায় সে সব গুণ ত ইন্দ্রজিতের মধ্যেই বিকশিত দেখি।

তারপর রাবণের মৃত্যুবাণ হরণে কি কাপুরুষোচিত পন্থাই না নেওয়া হয়েছে। নারী-হৃদয়ের কোমলতম স্থানে আঘাত হেনে নির্মম শঠতা ঘটেছে রাম-অনুজের হনুমানের আচরণে। এর পর আরও আছে—এত কাণ্ড করে যে সীতা উদ্ধার করলেন, সম্পূর্ণ সতী সাধ্বী জেনেও রামচন্দ্র লোকাপবাদের আবরণে নিজেকে আবৃত করে তাঁর অগ্নিপরীক্ষা চাইলেন। অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সীতা সে বারের মত নিষ্কৃতি পেলেন বটে কিন্তু লাঞ্ছনার তাঁর সেই শেষ নয়।

অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে সিংহাসনে বসলেন রামরাম। এইখানে আর এক কাব্যে উপেক্ষিতকে আমরা দেখতে পাই। তিনি হলেন ভরত। সংসারে ভরত কয়জন? কিন্তু তিনিও ছায়ামাত্র। রামের মত হও সবাই বলে, ভরতের মত হও কই কেউ ত বলে না। পূর্ণ ক্ষমতা হাতে পেয়েও সে ক্ষমতার কণামাত্র অপব্যয় করেনি—সে ত রামমহিমার অন্তরালে অন্তর্মিত। রামরাজত্বের প্রথম অপকর্ম শূদ্ররাজা শম্বুককে বধ। এক রকম বিনা অপরাধে বিনা বিচারে নিরস্ত্র শম্বুক রামকর্তৃক হত হলেন ব্রাহ্মণগণের কুপরামর্শে। ধর্মাচরণেও বাদর? সেখানেও শূদ্রের ও বিধানের বাধা আর সে বিধান থেকে বিচ্যুতির ত্রুটি এতই বড় অন্যায় যার জন্য নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হরণেই সৌন্দর্য?

রামচন্দ্রের শেষ এবং চরম কাপুরুষতা সীতা পরিত্যাগে; তার চেয়েও বড় কাপুরুষতা সীতার বারম্বার অগ্নিপরীক্ষা চাওয়ায়। কোন্ ধর্মে রামরাম আপন সন্তানবতী ধর্মপত্নীকে সর্বান্তঃকরণে চির পবিত্রা সতী-সাধ্বী জেনেও পরিত্যাগ করার মত এত বড় অন্যায়, এত-খানি অধর্মাচরণ করতে পারলেন? সীতা পরিত্যাগের জবাব কোথায়? লোকতুষ্টির জন্য আপন মানবতা ধর্ম, সত্যনিষ্ঠা কর্তব্য সবই জলাঞ্জলি দিতে হবে? লোকতুষ্টি কি এতই বড়? সীতা-পরিত্যাগে—কোথায় তাঁর রাজধর্ম, পতিধর্ম, পিতৃধর্ম? সীতাও যে তাঁর প্রজা। মানবতা কি আর কোনও নায়কের হাতে এত বড় পদাঘাত পেয়েছে? যে কাব্যের নায়ক এমন ভীরু, এমন কাপুরুষ, এমন নীতি-ভ্রষ্ট সে কাব্য মহাকাব্যই হতে পারে না।

সমকালীন সাহিত্য

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ॥

সার্থক বাংলা ছোটগল্পের সূচনা একদা রবীন্দ্রনাথের হাতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকদের এবং বিশেষভাবে লেখকের সঙ্গে তুলনার আসন পান। বস্তুতঃ লেখক ও চরিত্রের মধ্যে মানবতার প্রতি যে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা ছিল রবীন্দ্রনাথেও সেই সহানুভূতি ও প্রত্যয় নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে এই ধারা নিয়ে যাঁরা অগ্রসর হলেন, তাঁদের মধ্যে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অতি আধুনিককালের লেখকগণ কিন্তু তুলনায় অনেক বিজ্ঞ ও মননশীল। অথচ আশ্চর্য এই যে, সমকালীন বাংলা গল্প লেখকগণ মানুষের গভীর হৃদয়-বোধকে সাহিত্যের সামগ্রী করেন নি, তাঁরা সমগ্রভাবে মানুষকে বিচার করবার চেষ্টা করেন নি; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আদিম বন্যতা (animality) বর্তমান, তারই প্রকাশের বিচিত্রতাকে নিপুণ দক্ষতায় রূপায়িত করাকেই ব্রত রূপে গ্রহণ করেছেন। ফলে মানুষের প্রতি যে গভীর বিশ্বাস পূর্বতন কথাশিল্পীদের মনকে অভিভূত করেছিল, তা' আধুনিককালে অনুপস্থিত বলা চলে।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বনতুলসী' গল্পগ্রন্থটী পড়ে আমাদের মনে হ'লো, গল্প-লেখক তাঁর রচনায় পূর্বসূরীদের ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। বস্তুতঃ আধুনিকতারূপ নগ্নতা, দীনতা, বর্বরতা ইত্যাদির প্রকাশকে প্রকট করে তুলবার কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। লেখক মানুষের অন্তর্নিহিত প্রেম, বেদনা ও আত্মত্যাগের আকাংক্ষাকে সহানুভূতি দিয়ে দেখেছেন, ও আন্তরিক শ্রদ্ধা দিয়ে বিচার করেছেন। তাই তাঁর গল্পগুলির মধ্যে সাঁওতাল যুবতী রমণী মহুয়ার মধ্যে মাতৃত্বের অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। কাহিনীপ্রধান গল্পে রাধারাণীর প্রেমনিষ্ঠা এবং পুষ্টিহারার শিবের গৃহত্যাগ প্রেমের জন্য ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত। "বোবা" গল্পের মধ্যে চারুর সদ্যজাত মাতৃত্বকে ছাপিয়ে উঠেছে খোকার মনের অকৃত্রিম সত্যনিষ্ঠা। 'বিনি'র চরিত্রে যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দেখা যায়, কুলির জন্য তার মনের হাহাকার আধুনিককালের সাহিত্যে তার প্রকাশ পাওয়া যায় না বললেও চলে।

গল্পগুলির মধ্যে নিখুঁত গল্প হিসেবেও কতকগুলি উল্লেখের দাবি রাখে। 'কবরাপালক' 'কীর্তিনাশা' 'ছিপির সাথে আড়ি' 'পলাতকা' প্রভৃতি গল্প রসোত্তীর্ণ ও আঙ্গিকের দিক থেকেও নিখুঁত। 'অবিশ্বাসী' গল্পটিকে আধুনিক রুচির দিক থেকে বিচার ক'রেও ভালো বলতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, লেখক এই গল্পগুলি লিখেছেন দশ থেকে পনেরো বছর আগে।

আমরা যাঁকে বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও সমালোচক ব'লে জানি সেই অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের হাতে এই ধরণের এতগুলি গল্প পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। তিনি কথাসাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সরে এসে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি করেছেন কিনা বলবার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু তাঁর গল্পগুলি আধুনিক পাঠকদের অনেক দেবে এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

* * *

কথাসাহিত্যের দরবারে বাংলা এখনও অনেক পেছনে প'ড়ে আছে এ কথা স্বীকার করার মধ্যে কোন লজ্জা আছে বলে আমি মনে করি না। বিদেশী সাহিত্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডার থেকে বহু রত্ন আহরণ করে এনে আমরা বাংলা সাহিত্যের দীনতা পূর্ণ করবার চেষ্টা করছি। আমাদের

সাহিত্যিকেরা যে অনুবাদের কাজে অগ্রসর হয়েছেন এটা নিঃসন্দেহে আশার কথা। জিকি বাম'এর বিখ্যাত উপন্যাস 'মেন নেভার নো'র (Men never know) একটি অনুবাদ 'আমায় আঙিনা দিয়া' এই নামে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক শ্রীসরিৎ শেখর মজুমদার-এর সাহিত্যিক খ্যাতি আছে এবং অনুবাদের কাজে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় গল্পটি যে ভাবে তিনি বর্ণনা করে গিয়েছেন তাতে অনুবাদ পড়ছি বলে মনে হয় না। জিকি বামের এই গল্পটি বড় মধুর ও করুণ। বিচারক কুর্ত ব্রত্তে ব্যক্তিগত জীবনে অত্র নিরীহ ও পত্নীগত-প্রাণ। তাঁর উদারতার সুযোগ নিয়ে তাঁর স্ত্রী ঈভলীন একটি বিদেশী ব্যবসায়ী ক্লাড্ ডেভিসের সঙ্গে প্যারিসে রাত্রি যাপন করে ফিরবার পথে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো। স্ত্রী বিয়োগের ব্যথায় অভিভূত ও ঘটনা প্রবাহের আকস্মিকতায় স্তম্ভিত কুর্তের পাশে এসে দাঁড়ালেন কুর্তের প্রথম জীবনের প্রণয়িনী মেরীয়ানে।

অনুবাদক বইটির নামকরণে কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। আমার মনে হয় ঘটনার গতি ও কুর্তের হৃদয় যন্ত্রণা বিচার করে 'আমায় আঙিনা দিয়া' নামকরণ ব্যর্থ হয়নি।

প্রচ্ছদপটের ছবিটি সুন্দর।

সাময়িকী

পরলোকে ডক্টর সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র : বিগত ২০শে বৈশাখ, ১৩৬৯ (ইংরাজী ৩রা মে ১৯৬২) ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র পরলোক গমন করেন। তিনি যে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন ইহা বুঝিতে না পারিয়া বেদনা পাইতেছি। তিনি অসুস্থ জানিতাম, কিন্তু উহা এরূপ গুরুতর তাহা জানিতে পারি নাই। সুহৃৎবাবু অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ কেবল নন, তিনি মস্তবড় পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী—তাঁহার সঙ্গে তুলনায় আমরা সব রকমেই নিতান্ত সাধারণ মানুষ; তবু তাঁহার চলিয়া যাইবার সংবাদে হৃদয়ে বেদনা বোধ করিতেছি কেন তাহাই বলি। প্রথম কবে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল সে তারিখ মনে নাই—তবে সেটা বোধহয় ১৯৪৪।৪৫-এ হইবে। সেই হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যকে ধরিতে পারিবার বুদ্ধি আমার না থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ-স্পর্শ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল—যেমন হইয়াছিল অনেকেরই। পাণ্ডিত্য তাঁহার হৃদয়কে—সকল মানুষকে ভালবাসিবার চিত্তবৃত্তিকে—বিনষ্ট করিতে তো পারেই নাই—উজ্জ্বলতর করিয়াছিল। স্বভাবতই (এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যদ্বারা তাঁহার সেই স্বভাবই দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল) সকল মানুষকে তিনি ভালবাসিতে পারিতেন—তাহার একটা সহজ কারণ এই ছিল যে, মানুষ যে তাহার সকল দোষ ত্রুটি লইয়াও মানুষ, এ কথা তিনি কখনও ভুলিয়া যাইতেন না। তাই মানুষের দোষ ত্রুটি লইয়া তাঁহার ঠিক মাথাব্যথা ছিল না। মানুষ শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, ধনী না দরিদ্র—এ সবও তাঁহার নিকট নিতান্তই অবান্তর ছিল—কেবল স্নেহ জানিতে চায়, বুঝিতে চায়, শিখিতে চায় এ রকম মনোবৃত্তির মানুষ পাইলে তিনি গলিয়া যাইতেন, আর সকল মানুষকেই তিনি ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার সেই হৃদয়ের স্নেহস্পর্শ পাইয়াছিলাম—তাই তাঁহার সঙ্গে গত ৭।৮ বৎসরে ৪।৫ বারের বেশী দেখা না হইলেও সে স্নেহ অম্লান ছিল—তাহা বোধ করিতাম, করিতেছি। তাই তাঁহার যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না অথচ দেহে শৌছ রাখিতে পারি নাই বলিয়া, সেই মৃত্যুর সম্মুখে বিশেষ বেদনা পাইতেছি। ব্যক্তিগত স্বার্থলেশমুক্ত, অভিসন্ধিহীন অকৃত্রিম স্নেহ সংসারে খুব সহজলভ্য নহে, তাঁহার নিকট তাহা পাইয়াছিলাম। তাই আজ দুঃখ পাইতেছি।

দুঃখ পাইবার, বেদনা বোধ করিবার আরও একটা গভীর কারণ এই যে, আমাদিগকে তিনি বুঝিতেন। শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতকে তিনি কেবল গভীরভাবে শ্রদ্ধা করিতেন না, স্বামিজী যাহা বলিতেন তাহার প্রতিও সুহৃৎবাবুর গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তাই আমাদের কথাবার্তার সহিত আমাদের কাজকর্মকে তিনি পছন্দ করিতেন, ভালবাসিতেন। 'উজ্জলভারত' পত্রিকার প্রথম বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যাতেই সুহৃৎবাবুর লেখা আমরা পাইয়াছিলাম এবং ইহার পরেও বৎসরখানেক আগে পর্যন্ত তাঁহার লেখা উজ্জলভারতে পাইয়াছি। ১৯৪৮ সনের ২৮শে অক্টোবর পূজাসংখ্যা উজ্জলভারতের সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "...পূজা সংখ্যা 'উজ্জলভারত' খুব ভাল হয়েছে। সব প্রবন্ধগুলিই সারগর্ভ, আনন্দদায়ক, উচ্চস্তরের। Spinoza-র একটা কথা আমার পাঠ্যাবস্থায় খুব প্রাণে লেগেছিল—'intellectual love of God'। তোমাদের লেখা পড়লে আমার সেই কথাটাই মনে পড়ে। আমার বেশ মনে আছে প্রথম যখন সেই বয়সে সেই কথাটা একটু উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলুম—তখন বেশ একটা বোধহয় একটু বিশেষ ধরণের আনন্দের অনুভূতি হয়েছিল। Thrilled যাকে বলে। সে অনুভূতির ক্ষমতা এখন আর নেই।..." আমাদের তিনি

বুঝিতেন বলিয়াই তাঁহাকে নিতান্ত আপন জন বলিয়া বোধ হইত। পরবর্তী কালে উত্তরায়ণ সম্বন্ধে তিনি আরও বলিতেছেন, "...তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে, 'উত্তরায়ণ'-কে আমি ভালবাসি। এর অনেক গুণ আছে যা অন্য পত্রিকায় সাধারণতঃ থাকে না। সমস্ত প্রবন্ধ এবং আলোচনার ভেতর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি—একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি—ফুটিয়ে তোলবার ঐকান্তিক চেষ্টা 'উত্তরায়ণে' দেখতে পাই। যিনি যে ধর্ম বিশ্বাস করেন সেটা যে ভুল নয়—এ মনে করে সকলেই শান্তি পান। আবার তাঁর বিশ্বাসটাই যে একমাত্র সত্য তা-ও নয়, সেটা দেখিয়ে দিয়ে, গোঁড়ামির প্রশ্রয় 'উত্তরায়ণ' দেয় না। দুটো antithesis যে synthesis করা যায় এবং করা একান্ত প্রয়োজন, উত্তরায়ণের সেই জিনিষটাই আমি সব চেয়ে মূল্যবান বলে মনে করি।..." শ্রীযুৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার সামগ্রিক জীবন-তত্ত্ব দীর্ঘদিন ধরিয়া মানুষের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু খুব বেশী মানুষকে বুঝাইয়া যাইতে পারেন নাই—সুহৃৎবাবু এমন একজন ছিলেন যিনি ঐ সামগ্রিক জীবনতত্ত্বের গোড়ার কথাটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তাই সুহৃৎবাবুর চলিয়া যাওয়ায় আমরা আমাদের একজন অতি আপন জনকে হারাইলাম। তাই আজ দুঃখ পাইতেছি। মেহ করিবার, আমাদিগকে বুঝিবার লোক একজন একজন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন!

একজন নিজেদের ক্ষতির কথাই বলিলাম, কিন্তু সুহৃৎবাবুর প্রয়াণে মনস্তত্ত্বের জগতে যে-ক্ষতি হইল, তাহাও শীঘ্র পূরণ হইবে না। এই ক্ষতিও সুদূর-বিসারিত। মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আমাদের দেশে এক রকম তাঁহারাই আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনে ইহার প্রয়োগের উপযোগিতা জনসাধারণ ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট উপস্থিত করিতে সুহৃৎবাবু একজন ছিলেন অগ্রণী—তাঁহার অনুপস্থিতির এই ক্ষতি কত দিনে পূরণ হইবে, কে জানে?

তার আশুতোষের ইচ্ছায় ১৯২০-তে সুহৃৎবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন স্থায়ী সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া। তাহার পর এই মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁহার সন্ধান ও অবদান সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে তিনি স্বহস্তে লিখিয়াছেন, "It was Sir Ashutosh again who took the initiative in sending me over to Germany to visit the first Psychological Laboratory of the University of Leipzig. I went there in 1924. Wundt had died a few years ago. Prof. F. Krenger was then the Director of the Laboratory where I was privileged to work under the direct supervision of Prof. Kirschmann. Prof. Sander, one of the modern leaders in Psychology, now at Bonn University was at that time in Leipzig and so also was W. Wirth who enriched psychoanalysis with his valuable contributions. I had an opportunity of meeting J. M. Cattell who for a short time had been revisiting the University where he had previously worked for so many years with Wundt though often deffering from the latter, carrying out successfully an experiment on monocullar and binocular perception of brightness. I was admitted to the Doctorate of Degree of that University in 1926. Among my examiners, apart from those of the Psychological Department, were Prof. Hans Driesch who introduced the idea of vitalism and Theoder Litt whose contributions to pedagogy were rich and varied. I was the first Indian student who got an opportunity of working in the Pioneer Psychological Laboratory of the world and perhaps still continue to be the only one.

I shall refrain from describing other aspects of life there besides the academic, partly be-

cause it will be completely out of date and would not be of any interest to modern students and also because it would unnecessarily lengthen the article. What struck me most was the extremely cordial and sincere way in which I was taken in there by the Professors and my fellow students as one of them. On my return I took up my duties at the Department and devoted myself to the task of teaching and spreading the knowledge of psychology amongst the educated and the laity. I joined the Indian Psychological Association which had just been started and tried to serve it to the best of my ability in varies capacities, as Secretary, as the Editor of its Journal, The Indian Journal of Psychology, and till lately as its president.

As it would be apparent to any one who has cared to read some of the articles that I had published both in the English and Bengali languages and the papers that I read at different Congresses and conferences, Laboratory experiments in Psychology never satisfied me wholly. While the experimental methods is certainly one of the most fruitful methods of exploring the capacities and aptitudes, trends and tendencies of individuals and groups, one should not limit his studies to these topics alone for understanding the ways of the mind's functioning. There is more in the mind than laboratory experiments can discover. Dr. G. Bose, a medical man by profession, an ardent student of psychology and of Indian philosophy, the foremost psychoanalyst of India, pointed out to us another way of aproach which promised a deeper understanding of the subtle and intricate workings of the mind. That path was the path of psychoanalysis. I had myself analysed by Dr. Bose and that experience was an unique one for me for I found in it the real foundations of all that was taught theoretically in the class rooms and preached through the medium of the text books. I became an active member of the Indian psychoanalytical society founded by Dr. Bose in 1922 and have since written much on the subject. One of the articles I am happy to mention, attracted the notice of Freud himself who communicated his appreciation to Dr. Bose. I was elected fellow of the National Institute of Sciences of India in 1943. The department of psychology had been in the meantime steadily growing. Not only was the member of students increasing but the syllabus also was being modified from time to time. I had my share in bringing about these modifications and was responsible for introducing Indian psychology as an optional paper in the postgraduate course. Late M. N. Banerjee, the first M. Sc. in Experimental psychology in India, teacher of mine and later one of my senior collegues had in his presidental address to the Section of psychology in the Indian Science Congress and myself too in a similar presidential address in 1938 tried to draw the attention of all concerned to the fact that the knowledge derived from the study of the new subject was being wasted for want of an organization

and suitable opportunities to utilise it in the practical fields of life. At the Jubilee session of the Indian Science Congress, we had the good fortune of having Prof. C. Spearman, Prof. C. Myers and others admidst us and Dr. G. Bose, the then Head of the Psychology Department, lost no time in drawing up in consultation with them, a scheme for starting an Applied Section of the Department where Educational and vocational guidance would be given. The section became very popular and soon educational and vocational guidance became one of the regular activities of the Department. Individuals and factories approached us for advice and guidance. A certificate course in Applied Psychology, a one year Post-graduate course, was started soon after where students received their theoretical and practical training in the various branches of Applied Psychology. In 1953, a scheme for further expansion on the basis of the recommendations of a Committee formed by the syndicate of the University during Late Dr. J. C. Ghosh's Vice-Chancellorship, was submitted to the University Grants' Commission through the University, the final out come of which is still being awaited. * * *

On the death of Prof. G. Bose, who had been the first to occupy the chair of professorship in Psychology in the University of Calcutta,.I was appointed in his place in 1949. I served to the best of my limited capacities as a teacher of Psychology for about 40 years and finally retired from the University in 1959. * * *

One word more. After I retired from the University service, I was requested to take-up the post of professorship of psycholgy in the Indian Institute of social welfare and Business Management, Calcutta, with which I had been connected since its foundation in 1942. So I am serving now as an Honorary Professor of Psychology and Head of the Department of General Social welfare at that Institute."

মোটামুটিভাবে সুহৃৎবাবুর এই ইতিহাস অনেকখানিই বাঙ্গলাদেশ তথা ভারতবর্ষের মনস্তত্ত্বজগতের ইতিহাস। সুহৃৎবাবুর মূল স্থান কতদিনে পূরণ হইবে জানি না। তবু তাহা হইতেও বেশী অভাব হইল পাণ্ডিত্যের সাথে এতখানি সোহার্দ্য। আমরা আজ তাঁহাকে বারবার স্মরণ করি।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পো: অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধুত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

আষাঢ় ১৮৮৩, ১৩৬৯ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম, এ পঞ্চদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

নিম-এর তুলনা নেই

মুহ মাটী ও মুক্তোর মত উজ্জ্বল দাঁত ওঁর সৌন্দর্যে এনেছে দীপ্তি।

কেন-না উনিও জানেন যে নিমের অনন্য-সাধারণ ভেষজ গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞানের সকল হিতকর ঔষধাদির এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে 'নিম টুথ পেষ্ট'-এ। মাটীর পক্ষে অস্বস্তিকর 'টার্টার' নিরোধক এবং দন্তক্ষয়কারী জীবাণু-ধ্বংসে অধিকতর সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন এই টুথ পেষ্ট মুখের দুর্গন্ধও নিঃশেষে দূর করে।

পত্র লিখলে
'হাসিতে মুক্তা ঝরে'
পুস্তিকা পাঠানো হয়।

নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

NTP-1959

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	
শ্রীকৃষ্ণ	৫·০০	ছাত্রদের কর্মবাণী	
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	Sould of India Speaks	

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম্. এ.

বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাংলার কবি	
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	রাজর্ষি রামমোহন	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	আচার্য জগদীশ	
বাংলার বিপ্লবী	১·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
বাংলার মনীষী	১·২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	
জীবন গড়া	·৭৫	রবীন্দ্রনাথ	

শ্রীশীলিমা ঘোষ এম. এ, বিটি,

বিদ্যাসাগর	২·৫০	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ—সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ঃঃ ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

সূচীপত্র ঃ আষাঢ়, ১৮৮৪, ১৩৬৮,

১। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (১০)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রণত

২। চলতি-পথ
শ্রীহাসিরাশি দেবী

৩। আঁখি জল মুছিবার (কবিতা)
শ্রীরঞ্জিত বিকাশ মুখোপাধ্যায়

৪। আর্মেই হেমিংওয়ে
শ্রীকেশব কুমার ভট্টাচার্য্য

৫। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৪০) ১৫৫

৬। শান্তি ও সমন্বয় ১৬৩
শ্রীকণিকা তালুকদার

৭। মহাকাল
শ্রীবিশ্বনাথ সাহা

৮। বিশ্বকবির বর্ণচ্ছটা
শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়

৯। সাময়িকী : নরনারায়ণ আশ্রম সংবাদ

"পুরুষোত্তম cult-এ প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র—কি কথাই না তোমার গোপাল বলিয়া গিয়াছেন? 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ।' এতদিন অল্পের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক অধিকের মধ্যে নিভিয়া গিয়া—এই হাইপথেসিসের—অনুমানের—উপর সব সমাজ গড়া। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু সেই মানুষও যে বৃন্দাবনে গিয়া তরুগুল্মলতাজন্ম কামনা করিবে, তাহা কে জানিত বা বিশ্বাস করিত? কৃষ্ণসখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একটা hierarchy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উর্দ্ধ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ স্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও মুচির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটা কুলীন হইবে এবং অপরটা অকুলীন হইবে? ঘর কাঁটি না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর কাঁটি দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন?.....যদি কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সব হইতেও পুরুষোত্তম যতদূর, রজস্তম হইতেও পুরুষোত্তম ততদূর।.....এতদিনের সাধনা সব minus-এর সাধনা, নেতি নেতি। কৃষ্ণের সাধনা positive। সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।..... ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম, একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে।..... তাই আজ নোতুন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New Social Order, New Religious Order সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম মিলিবে?....."

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উদ্বোধন

আষাঢ়, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১১)

To be at home everywhere in nature ইহাই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব।...মথুরা থেকে জরাসন্ধের আক্রমণের ভয়ে কৃষ্ণ পালিয়ে গেলেন...বৃন্দাবনে যখন ছিলেন তিনি বেশ ছিলেন। পুরুষোত্তম-সাধককে সব অবস্থাতেই বেশ আছি এই কথা বলতে পারতে হবে। বেশ আছি —বেশ আছি।...এখানে থাকতে হলে অধিকতর সংযম, অধিকতর শৃঙ্খলা, অধিকতর দৃষ্টি—সবই দরকার—তা না হলে এখানে থাকা সম্ভব হবে না।...কেউ আমাদের আসা সমর্থন করে নি।...এখানে চারদিকে বিপদ—সব সময় দৃষ্টি রাখতে হবে।...গৃহস্থালিতে এখানে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে—এখানে অধিকতর প্রীতির দরকার, অধিকতর সহযোগিতার দরকার...আমরা নূতন করে গড়তে এসেছি—সতর্কতা, দৃষ্টি, শৃঙ্খলা, এক-প্রাণতা দরকার—দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে যে জিততে পারল না, সে কি একটা পুরুষ?...বেশ আছি মনে করতে হবে—যুধিষ্ঠিরাদি যার বৎসর কত শত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিলেন।...কলকাতার তৃপ্তি আর এখানকার তৃপ্তি আলাদা—কলকাতার চালচলন এখান থেকে আলাদা—প্রাচীন সভ্যতাকে আমরা নূতন করে আস্বাদন করব—নিত্যগোপাল আমাদের সহায় হউন। কলকাতার সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টি থাকলে গ্রামে থাকা কিছুতেই সম্ভব হবে না...। (রোজ সান্ধ্য ভাষণের পর নিত্য-গোপালের শেষ বাণী পাঠ হয়)

৮. ৬. ১৯৫৬—রাধা-ভাবকান্তি গায়ে মাখিয়া...আমার প্রাণ-গৌর, সোনার গৌর, রাধার রূপ শোষিবারে আমার কৃষ্ণ রাধার মাঝে হারাইয়া, রাধা বনিয়া গিয়া গৌররূপে আসিলেন। তুমি ভোগ কর না, সেবাব্রত লইয়া যুগে যুগে আস...। সকল আবেষ্টনে চলিবার মত আমার মনের প্রকাশ দাও—সকল দুর্যোগের মধ্যে চলিবার মত আমার শক্তি দাও'''নিত্যগোপাল, সকল আবেষ্টনকে তুমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মেখিলে—মাথের শিশু হলে তুমিয়া, অনায়াসে থাকিয়া তুমি সকল আবেষ্টনকে হজম করিতে অভ্যাস করিয়াছ, সকল অবস্থাকে স্বীকার করিয়া নিজ জীবনে পরিপাক করিয়াছ...নিত্যগোপাল, আমাকে সহজ অনাড়ম্বর জীবন দান কর, আমার নমনধর্মশীল কর...আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলির পরে'''। নিত্যগোপাল, নারায়ণ, নারায়ণ...সকল আবেষ্টনের মধ্যে ধীর স্থির থাকিয়া চলিবার শক্তি দাও,—আমার বুদ্ধি নাই, আমি তোমার বুদ্ধিমত চলিব—তুমি যে পথে চলিয়া গিয়াছ, হে আমার ভগবত, সেই প্রাণের পথ ধরিয়া আমি চলিব... তোমার অবতরণ, তোমার স্নেহ আদর যেন ব্যর্থ না হয়—তোমার আদরের যেন অপমান না করি, অপব্যবহার না করি...যেন আমি তোমার পায়ের কাছে পড়িয়া রহিতে পারি...। তোমার আদরের মাঝে, তোমার স্নেহের মাঝে আমি বিকাইয়া যাইব...আমি আমার রহিব না... নিত্যগোপাল, আমার হৃদয়ের রাজা...আমার সকল স্নেহ-মনপ্রাণ লইয়া আমি তোমার মাঝে ডুবিব...তোমার আদরের মাঝে আমার মহানির্বাণ হউক ; তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ—জগন্নাথ, নিত্যগোপাল, আমার স্বীকার কর, আমার আত্মসাৎ কর, তোমার আমার মাঝে ভেদ বিচ্ছেদ

ঘুচাইয়া দেন···তোমার স্থান আমার হউক, তোমার বিশ্ব আমার হউক, তোমার কর্ম আমার হউক,—নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল···।

সন্ধ্যা—···। সারা জীবন সঙ্ঘ গড়ার জন্য ছুটে বেড়িয়েছি—মানুষের এই দেহ একটী সঙ্ঘ—যা ভগবান তৈরী করেছেন। সঙ্ঘ মানে সংহতি—হাত পা নাক চোখ মুখ—এদের পরস্পরের মধ্যে সংহতি আছে—এদের পরস্পর মিলে মিশে কাজ করবার প্রবণতা রয়েছে। প্রথম সঙ্ঘের প্রবর্তন ভগবান করেছেন এই দেহে।···মস্তিষ্কের বৃত্তি হল প্রজ্ঞা, হৃদয়ের প্রাণ—প্রজ্ঞার সঙ্গে প্রাণ, কর্মের সঙ্গে জ্ঞান যখন মিলে মিশে চলে—তখন দেহ রক্ষা পায়। হাত পায়ের কোন পরিকল্পনা নেই—পরিকল্পনাটী মস্তিষ্কের, প্রেরণা দেয় হৃদয়। এখন হাত পা চোখ যদি মস্তিষ্কের পরিকল্পনা ছেড়ে নিজেরা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে আরম্ভ করে, তখন সংঘ ব্যাহত হয়। সমস্ত দেহ সুস্থ থাকলে যে কোন স্থানে চিমটী কাটলে ব্যথা বোধ হয়, কোন অংশ বাতগ্রস্ত হলে সেটায় বোধ থাকে না, সেখানে চিমটী কাটলে লাগে না। সঙ্ঘবোধ থাকলে সঙ্ঘের কারো গায়ে আচড় লাগলেই অন্যের ব্যথা বোধ হবে, কিন্তু সঙ্ঘ-চেতনা বাতগ্রস্ত হলে সে বোধ নষ্ট হয়ে যায়।··· নিত্যগোপাল একটী পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন, একটী হৃদয় নিয়ে এসেছিলেন—মস্তিষ্ক পিতা, হৃদয় মাতা। হৃদয়ের কাজ মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।···তোমাদের পরিকল্পনা তো নেই—তাহলে তো তোমরা একটা কিছু করতে পারতে। পরিকল্পনা আমার আছে, সারা-জীবন তাকেই রূপ দিতে ছুটলাম। আমার এ পরিকল্পনাকে রূপ দেবার লোক আজও আসে নি—লোক আছে, পাই নি—তা নয়।···প্রথমে knowing জ্ঞান, তারপর feeling হৃদয় দিয়ে বোধ, তারপর willing কর্মপ্রেরণা ···যাদের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাধ বাবে বোধ হয়ে তা হল—তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ালাম। knowing ও feeling সংযুক্ত হওয়ার পর willing অর্থাৎ কর্ম রূপ গ্রহণ করে। তাই পরিকল্পনাটা আগে knowing-এর,—মস্তিষ্কের, পিতার—; তারপরে যুক্ত হল feeling—হৃদয়—মাতা—তারপর হাত পায়ের কর্ম।··· তোমরা নিজেরা করতে যাও—পারবে না।···প্রভুর বাণী পূরণ করতে পারতেন একমাত্র রাধিকা—কেননা তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে শরণাগত···। কৃষ্ণের বাণী পূরণ করতে হবে—রাধাটা কৃষ্ণের—তোমার নয়। নিত্য-গোপাল বীর্য দিয়ে গেছেন—আমার গর্ভে একটা পরি-কল্পনা দিয়ে গেছেন—আমার কাজ স্ত্রীর কাজ—সেই পরি-কল্পনাকে মূর্তি দেওয়া।···আত্মনিবেদন না করলে কিছুতেই কোন পরিকল্পনাকে রূপ দিতে পারবে না।···, ছোট কাজে বাধা দিয়ে হয়তো কেউ নিজের খেয়াল চালিয়ে যেতে পারতে পার, কিন্তু বড়র বেলায় আত্ম-নিবেদন ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না—কোন বড় জিনিষ পাবে না।···পরিকল্পনা আমারও ছিল না—ঐ শ্রীপাদপদ্মে মাথা স্পর্শ করার একটা বিদ্যুতের মত আমার দেহে প্রবেশ করেছে, আমাকে প্রবুদ্ধ করেছে।···আমার কোলের মধ্যে এসে আমার মাতাপুরণই তোমাদের আদর্শ হোক, ইচ্ছা হোক। পরিকল্পনা ভগবান দেন, কিন্তু তার কার্য্যাত্মক রূপ দেবে মানুষেরা—কৃষ্ণের পরি-কল্পনাকে অর্জুন রূপ দেন। আমার পরিকল্পনাকে তোমাদের দিয়ে রূপ দিতে চাই—আমি হাসিখেলার জীবন নিয়ে আসি নি—আমার জীবন রক্তাক্তির ব্যাপার। যারা খুব নূতন এসেছ, আর যারা কিছুদিন ধরে আছ সকলের প্রতিই আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে, শান্ত হও, অন্তর্গত হও, আত্মনিবেদনময় হও।·· এখানেই শুধু আমার চেষ্টা নয়—এখানে না হয় আমি যুগে যুগে অনন্ত কাল আসব তাঁর সঙ্গে—তাঁর কাজ করাই আমার কাজ—এ ছাড়া আমার মুক্তি নেই···।

৯।৬।১৯৫৩—শনিবার।···নিত্যগোপাল, তুমি ব্রজ-গোপাল, ব্রজগোপাল, গৌরগোপাল···। তুমি এক নবীন সৃষ্টির পরিকল্পনা লইয়া আসিয়াছ। মস্তিষ্ক রূপে তুমি পিতা, হৃদয় রূপে তুমি মাতা।···চৈতন্য অচৈতন্যের সমন্বয়ের তোমারই এই যুগসৃষ্টির পরিকল্পনা লইয়া নরনারায়ণ আসর চলিয়াছে—আমি তাহাকে সকল ইন্দ্রিয় দিয়া রূপ দিব··· বিভিন্ন ব্যক্তিগত অহংকার লইয়া কেহ সেই পরিকল্পনার

খোঁজ পায় না—আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়া, শরণাগতির ভিতর দিয়া পরিকল্পনার খোঁজ পাইতে হয়।···নিত্যগোপাল,···আমার মূল্য কি? যতটুকু আমি অনুগত, ততটুকু আমি তোমার পরিকল্পনা, তোমার প্রেরণার অধিকারী হইব।···তোমার বাহা আমার জীবনে, আমার দেহ মন প্রাণে ঘন হইয়া উঠুক—তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক কৃষ্ণময় স্বামী। তোমার ইচ্ছা বুকে লইয়া এখানে বসিয়াছি—আমার হৃদয় দাও, বুদ্ধি দাও—আমার অহংকার তোমার পায়ে ডালি দিব।···যেমন বৃন্দাবনে গোপীরা তোমার ছায়ার মত থাকিয়া এক নূতন সৃষ্টির কথা বলিয়া গিয়াছে, আমি তেমনি তোমার ছায়ার মত—ছায়াতন হইব—তোমার পরিকল্পনাকে রূপ দিব। জ্ঞানী পরিকল্পনা করে—ভক্ত ও কর্মী তাহাকে রূপ দেয়। নিত্যগোপাল জ্ঞানী ভক্ত কর্মী···। আমি শাস্ত্রাস্তোর কর্ম করিব না—সে তো অসুরের কর্ম—আমি জ্ঞানীর কর্ম করিব—কর্ম হইতে জ্ঞান ও আনন্দের প্রকাশ—নিত্যগোপাল তাই তুমি জ্ঞানানন্দ।·· জীবের কোন ইচ্ছা নাই—ইচ্ছা শিবের—তুমি এ সংসার পেতেছ, আমি তাহাই চালাইয়া যাইব। তুমি অপ্রকাশ, আমি অপ্রকাশ। জীবন সায়াহ্নে এখনও প্রার্থনা করি।···সারা জীবন তোমার পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্ত ২৫ বৎসর পথে পথে চলিয়াছি—তোমার সঙ্ঘ রূপের সেবা করিবার জন্তই চলিতেছি—শ্রীনিত্যগোপালং শরণং গচ্ছামি, শ্রীনিত্যগোপাল-ধর্মং শরণং গচ্ছামি, শ্রীনিত্যগোপাল-সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।···এই বিশ্ব-গৃহ গুছাইব, বিশ্ব-গৃহে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিব—আমি মায়ের মত যার যা প্রয়োজন মাপিয়া দিয়া তোমার বিশ্বরূপের সেবা করিব। যেদিন বিশ্বরূপের কাজ ফুরাইবে, সেদিন তোমার কোলে চলিয়া পড়িব—সেদিন তুমি আর আমি, আমি আর তুমি। স্বরূপের সেবা, বিশ্বরূপের সেবা—এই ভাবে চিরদিন তোমার সঙ্গে চলিব। পা টলে, দিন সমাগত; নিত্যগোপাল, জাগ্রত হও···।

সন্ধ্যা—পুরুষোত্তম কৃষ্ণ নিজ জীবন দিয়ে শিখিয়ে গিয়েছেন কি রকম করে সংসারে চললে এই সংসারের মাঝেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করা যায়। এতদিন ছিল এ সংসার ছেড়ে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভের কথা···। ছেড়ে যে যাবে, তার আর এখানে তেমন কিছু শিখবার নাই। কিন্তু আজকের কথা ছাড়ুন—অথচ মাটি জল আগুন, বাবা-মা সবারই সাথে সম্পর্ক রেখে চলা সোজা কথা নয়।···সংসারী হয়েও কৃষ্ণ নিত্য সন্ন্যাসী।···আমি শাক্ত ঘরের ছেলে; নিত্যগোপাল-জীবনের মধ্য দিয়ে গৌর এসেছেন, কৃষ্ণ এসেছেন—বই পড়ে আমি কিছুই পাই নি—তাই একটু একটু জানি কেমন করে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া যায় বৃন্দাবন থেকে ২৫০ বছর পরে ফিরবার পর রাজনীতি করেছি সন্ন্যাসী হয়েই। এই পথের একটী কৌশল বলল গৌরের জীবন অবলম্বনে। নিমাই সন্ন্যাসী হবেন শচী মা এটা শুনে ফেলেছেন। শচী মায়ের বুক ব্যথার ভরে উঠেছে—তিনি গদাধাস পণ্ডিতকে (তাঁর স্বামীর বন্ধু) বললেন, শুনছি নিমাই সন্ন্যাসী হবে। কিন্তু কেন? তার কৃষ্ণ-কথায় তো আমি বাধা দেই নি—তবে সে যখন আঙ্গিনার পড়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে বুক চাপড়ায়, তখন বুকটায় লাগে। নিমাইকে বলুন—কেন সে সন্ন্যাসী হবে? গদাধাস নিমাইয়ের সঙ্গে কোমর বেঁধে তর্ক করতে গেলেন কেন সে সন্ন্যাসী হবে—কি তার যুক্তি? নিমাই যুক্তিতর্কের পথে গেলেন না, কেননা গদাধাস গুরুজন, তাঁর সাথে তর্ক করার অধিকার নাই—মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ভগবান স্বীকার করেন না। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন গুরু ক্ষমা করেন, ভগবান ক্ষমা করেন না। প্রহ্লাদ বাপকে ক্ষমা করেছিলেন। নরসিংহ করেন নি।···মহাপ্রভু গদাধাসের দৃষ্টিকোণ মেনে নিলেন—কিন্তু জীবনের চাপ দিয়ে গদাধাসকে বশীভূত করলেন। পরকে স্ব মতে আনবার এই তো পথ—তর্ক করে কিছুই হবে না। গদাধাসকে নিমাই বললেন, সব সত্য—তবু প্রাণ টানে, কি করি, কি করি।

ক্রমশঃ

চলতি-পথ

॥ শ্রীহাসিরাশি দেবী ॥

সাহিত্যিকের লেখনী যে সাহিত্যকে সৃষ্টি করে, তাতে প্রতিফলিত হয় সেই যুগেরই প্রতিচ্ছবি। এই ছবি এক বা একাধিক নরনারীকে ঘিরে দেশ ও কাল ভেদে ফুটিয়ে তোলে তখনকার ব্যক্তি-জীবন এবং সমাজ-জীবন। এর মধ্যে কিছুকে বাদ দিয়ে কিছুকে প্রকাশ করতে গেলে পাঠকের রসবোধে ব্যাঘাত জন্মে, অসম্পূর্ণ মনে হয় সব রচনা। কিন্তু, সম্পূর্ণতা দিয়া অসম্পূর্ণতার মধ্যে দিয়েও লেখকের যে সহানুভূতি রচনার প্রত্যেক চরিত্রটিকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে, তার দৃষ্টান্ত আমরা এর আগের-ও অনেক রচনায় পেয়েছি।

আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে সব সাহিত্যিকদের রচনার নাম করা যায়, তাঁদের লেখার কোথাও প্রাণ-ধর্মের অপ্রাচুর্য্য আছে ব'লে মনে হয় না। বরঞ্চ বলা যায় সাহিত্যে তাঁরা নতুন রূপ দিয়েছিলেন তার আগের চাইতে। কিন্তু যে যুগেরই লেখক হ'ন না কেন, সে যুগের পাঠকের মনের রসতৃষ্ণা তিনিই মিটিয়েছেন। কাজেই সে যুগের রচয়িতা হিসাবে তিনি সার্থক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য পড়েও পাঠক হেসেছে, কেঁদেওছে; এবং এখনও 'বাবুরাম বাবু'র কাহিনী কিম্বা 'মেঘনাদ বধের' দৃশ্য যে আমাদের মনকে অভিভূত করে না তাও নয়—কিন্তু বর্ত্তমানের সমাজ, সংসার ও ব্যক্তি-জীবনের সমস্যা আমাদের সামনে এমনি জটিল রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে যে, সেকালো ছুশো বছর আগের বাঙালী সমাজ, কি সৌরাণিক কাহিনীকে ভাবতে ব'সে, আমাদের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। সেই সময় এখন আমাদের কাছে কম হ'য়ে এসেছে নানা কারণে। ঊনবিংশ শতাব্দী বা তারও আগের যে সব সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা ক'রেছেন, হৃদয়াবেগ প্রকাশ পেয়েছে সে সাহিত্যেও প্রচুর, কিন্তু মানবতাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে।

এও দেখা গেছে যে, সামাজিক শাসনের নামে ব্যক্তিত্বকে দেওয়া হ'য়েছে নির্ব্বাসন। তারপরেও আছে দেবতের দোহাই। কথায় কথায় দেবতার দান রূপে কল্পনা করে মানুষ নিজেই নিজের শাস্তি নিয়েছে মাথা পেতে। অবাস্তব আদর্শকে সামনে রেখে চোখ বুজে চ'লতে চেয়েছে সে। পারিপার্শ্বিকের প্রতি এই অবহেলা যখন ঘটনাচক্রের গতি পরিবর্ত্তন করেছে, তখনই সে দেখিয়েছে দৈবের নজীর। পাপ-পুণ্যের জয়-পরাজয়ের পতাকা উড়িয়েছে সগৌরবে আর মুখে ব্যক্ত ক'রেছে আদর্শের অমলিনি।

কিন্তু, আজকের এই সময়ে বিংশশতাব্দীর মাঝামাঝি এসে আমরা আর সে জয়ধ্বনি তেমন স্পষ্ট ভাবে শুনতে পাইনা কেন? যদিও বুঝি যে, সেদিনের লেখকের মনে এই মানবতাকে হনন করবার বেদনা যতই গভীর হোক, তাকে স্বীকার করার শক্তি কি সাহস ছিল কম, তাই নিজেকে সান্ত্বনাই দিয়ে এসেছেন বরাবর, বিদ্রোহ করেননি সে দলনের বিরুদ্ধে, কিন্তু আজকের লেখক তা করেছেন।

কেন ক'রেছেন, তার কারণও অনেক।

আজকের এই সময়ে অতীতের জীবনাদর্শ নিয়ে যে জয়ধ্বনি লেখক করতে পারেন না তার প্রথম কারণ আজ সমস্ত জগতের জীবনেই আলোড়ন চলেছে মহাযুদ্ধের। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় সে বিজ্ঞানের হাতে দান করেছে মারণাস্ত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে আলোড়নটা আর একদিন বাংলা সাহিত্য রচনায় নতুন প্রেরণা যুগিয়েছিল কয়েকজন সাহিত্যিকের হাতে, আবার সেই ভাবে আর এক প্রেরণা যুগিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

মানুষের বাঁচা-মরার তাগাদায়, কাটাকাটি আর মারামারিতে ধুলো উঠছে চারিদিকে। মেঁায়ার অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে ভবিষ্যৎ! কিন্তু কিছু দূরে তার চোখের ওপর ভাসছে বৈকি। মনের ওপর পড়ছে ছায়া, অনুভবশক্তি হ'য়ে উঠছে বিদ্রোহী, জাগাচ্ছে বিপ্লব। এই বিপ্লবের উত্তেজনায় মানুষ ক্ষেপে উঠছে; সময় সময় বোধশক্তিও আচ্ছন্ন হ'চ্ছে তার, বিক্ষিপ্ত হ'চ্ছে মন। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগেও যে মানুষের মনের এ দুর্দশা ঘটেনি, তা নয়, কিন্তু সাহিত্যিকের লেখনী তাকে রূপ দিয়েছে যৎসামান্য। সেই যৎসামান্যকে চিত্রাভাষ বলা চলে, চিত্ররূপ বলা যায় না। তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ কোনও দিন আত্মসর্ব্বস্ব হ'য়ে বাঁচেনি, বাঁচেও না। মানুষকে নিয়েই সে পরিবার সৃষ্টি করে, বাড়ায়, সমাজ, আর তৈরী করে রাষ্ট্র। আবার, রাষ্ট্রের আওতায় বিস্তৃতি লাভ করে ব্যক্তি-জীবন, পুষ্ট হয় সমাজ।

বাংলার মানুষ কিন্তু সে হিসাবে চিরদিনই দুর্ভাগা, কারণ, এক হাত থেকে আর এক হাতের আশ্রয় নিতে নিতে যে বিপর্য্যয় তার ভাগ্যে ঘটেছে, তাতেই ছিঁড় খেয়েছে তার জীবনের আদর্শ, সাহিত্যে ঘটেছে রূপান্তর, এবং পরিবর্ত্তিত রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল এক যুদ্ধের পরে আর এক যুদ্ধ পর্য্যন্ত।

তারপর থেকে চলেছে এই বুদ্ধি এবং যুক্তিবাদের মহড়া, লেখকের হৃদয়াবেগ সেখানে আগের চেয়ে সংযত, এবং চিন্তাশীলতার পথে প্রকাশিত। আত্মনির্য্যাতনের যে অবহেলিত মূর্ত্তিটা এতদিন অপমানে লজ্জায় মুখ গুঁজে কাঁদছিল জনসমাজের এক-পাশে,—তাকে গ্লানির চাকনা খুলে নিয়ে আসা হ'লো সকলের মাঝখানে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে আজ নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করলে—"এই আমার ধর্ম্ম, আর এ ধর্ম্ম সমস্ত মানুষের; এতে ভুলও যেমন আছে, তেমনি আছে তাকে সংশোধন করার উপায়, তাই নিষ্পাপের মত আক্ষেপ করা অন্ততঃ মানুষের পক্ষে শোভা পায় না।"

কথাগুলো এত স্পষ্ট যে, ধর্ম্মের নামে বিচারের নামে যারা এতদিন অস্পষ্টতার আড়ালে নিজেদের ঢেকে ঢেকে বেড়িয়েছে তাদের দিকে তাকাতেও লজ্জাবোধ হয়।

বুদ্ধি এবং যুক্তিবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছে আজকের মানুষ। যদিও এর আগেও তারা শুনেছিল—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

কিন্তু এই স্বীকারোক্তির কি পুরস্কার দিয়েছিল সেদিনকার জনসমাজ? যাও বা দিয়েছিল, তারও যথাযথ বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। সেই জন্যই হয়তো শেষ পর্য্যন্ত লেখককে দেবত্বের রূপে সেব করতে হয়েছে মানবতার রূপকে।

তবু মনে হয়—মানুষের দুর্ব্বলতা, সেদিনও যেমন ছিল, আজও হয়তো তেমনি আছে—কিন্তু সাহস বেড়েছে স্বীকারের, সেদিন যা ছিল না। সেদিনের জোড়াতালি মারা জীবন আর ঘুণধরা সমাজ যে আজই হঠাৎ নতুন হ'য়ে উঠেছে—এ আশা করাও বৃথা, কিন্তু চোখ চেয়ে দেখবার সাহস তার হ'য়েছে এবং এই যে দেখা—এরও ছায়া পড়ছে মনের ওপর; পরিবর্ত্তনের জন্য সেই দেখাটাও দায়ী।

এই সমস্ত মিলিয়ে মিশিয়ে আমাদের সাহিত্যিক রুচি-বোধেরও তারতম্য ঘটেছে যেমন, তেমনি পরিবর্ত্তিত হয়েছে পাঠকের পছন্দ। কোন সময়ের সাহিত্য পড়তে তাঁদের ভালো লাগে কি ভালো লাগে না, কেবল আলমারীতে সাজিয়েই পাঠ্য-তালিকার গৌরব ও শোভা বর্দ্ধন করেন, সেকথা প্রকাশ করতে ইতঃস্তত করলেও আলমারী খুঁজলেই দেখা যাবে। এখনকার সাহিত্য রচনা যাঁরা করছেন, তাঁদের লেখনী সবল কি দুর্ব্বল—সে বিচার করবেন সমালোচকেরা, আর সমাদর করবে পাঠকেরা; তবে একটা প্রশ্ন তাঁরাও করতে পারেন লেখককে; প্রশ্নটা—বর্ত্তমানের সাহিত্য আগামী দিনের মানুষের পক্ষে কল্যাণের হবে, না অবল্যাণের হবে! সে জবাব দেওয়া কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায়—একই খাদ্য সকলের সব সময়ে দেহ গঠনে উপযোগী হয় না। তবে আত্ম-বিশ্বাস সব সময়ই দ্বাথা দরকার, তার পরিপূরক হিসাবে শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক তাকে সাহায্য করবে।

তবে, আরও একটা কথা মনে পড়ছে এই সঙ্গে। কথাটা এই যে, বড় রাস্টার আঘাত সইতে না পেরে সাহিত্যের সেই বুড়ো অশ্বত্থটা যদি উল্টে পড়েই মাটির ওপর মুখ থুবড়ে, তা পড়ুক না, অনেক কাল ধরেই তো সে মাটির রস তবে খেয়েছে,—আজ যদি কোপ্‌ড়া হ'য়ে যৌবন-মুড়ে পড়ে,—তাহ'লে এক জায়গা না হোক—আর এক জায়গাতেও খাদপ্রাণ মিলবে তার। মরা কাঠের গুঁড়িতে জাগবে জীবনের নবাঙ্কুর; আবার সে এক নির্মেঘ সকালে ওপরের দিকে তাকিয়ে চাইবে আকাশের আশীর্বাদ।

আঁখি জল মুছিবার

॥ শ্রীরঞ্জিত বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

আমার জন্ম সার্থক করো মাগো
তোমার চরণে এ মিনতি শুধু করি :
বিনা অর্থের জীবন তরণী খানি—
অর্থ দুরমা দিয়ে তাহা তোল ভরি।

বিষয় বাসনা কিছুই করিনা আমি
তোমার ও রাঙা চরণ দু'খানি শুধু
মস্তকে এ বুকে স্থাপনা করো মা নিজে
শান্তির বারি নহিলে এ মন ধূ-ধূ।

সাধনা দাও তুমি মা আসিয়া নিজে,—
মম পাশে থাকো অচলা অরূপারূপে :
তব নাম গানে চিত্ত এ মম ভরো
আর তো পারি না থাকিতে অন্ধ কূপে!

দাও মা মুক্তি তব নবালোকে আজ
তরুক চিত্ত সত্যের সন্ধানে।
ভারত পথিক আমি যাযাবর, খুঁজি :
জননী আমার, কোথা আছো কোনখানে?

শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে মাগো
এক ধ্যেয় খানি সতত আমার জাগে!
তোমার করুণা জিয়-কে পারে দিতে,—
সেই সুর গান ভাষা নব অনুরাগে?

চিত্তের তরী তুফানে ফেলোনা আর,—
দাও সে সুমতি আঁখি জল মুছিবার।

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

॥ শ্রীকেশব কুমার ভট্টাচার্য্য ॥

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের আকস্মিক মৃত্যু—এ যেন বিনা মেঘেই বজ্রপাত। আমরা ভাবতেই পারি নি, এতো তাড়াতাড়ি তিনি মৃত্যু বরণ করবেন। সংবাদপত্র যোগে যে সংবাদ আমরা পেলুম, তাতে বিস্ময়ে নির্বাক হ'লেও কোনো উপায়ই রইলো না। যে ছোট্ট খবরটি আমাদের চোখের সামনে এসে হাজির—তাতে লেখা—বন্দুক পরিষ্কার ক'রতে গিয়েই হঠাৎ কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে গুলি-বিদ্ধ হ'য়ে তাঁর জীবনের চিরতরেই অবসান হ'য়েছে। সংবাদটি কত অল্প কথায়ই যেন শেষ হ'য়েছে। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে আরও অনেকদিনই বাঁচতে পারতেন এবং এই পৃথিবী তাঁর নব নব মহৎ রচনায় শুভপথেই চালিত হ'তো। আজ দেখি, বিজ্ঞান-সর্ব্বস্ব, আত্মগর্বী, অহংকারী হ'য়ে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রশক্তি যুদ্ধের হুঙ্কারেই গগন বিদীর্ণ ক'রছে। পারস্পরিক বোঝাপড়া না ক'রেই শুধু ভেতরে ভেতরে মন কষাকষি, সন্দেহ, বিদ্বেষ, হানাহানি, ঈর্ষা আর অহংকার প্রমত্ততা। পৃথিবী আজ দুটি শিবিরেই পরিণত। কখন্ যে তিল পরিমাণ ছিদ্র থেকে বার হ'য়ে প'ড়বে তুমুল বিশ্বধ্বংসী বহ্নি, তার কিছুই ঠিক নেই। সেই মান্ধাতা আমলের উপনিবেশবাদের শেকড় সেঁধিয়ে আছে আজও পশ্চিমীদের ভেতর।

এই পৃথিবীতেই অতীতে পর পর দু দুটো বিশ্ব-যুদ্ধ হ'য়ে গেছে। এর সংঘর্ষেও পরিণামে কত যে লোকক্ষয়, সম্পত্তি হানি, শুদ্ধ মানবতার অপমৃত্যু ঘটেছে তার আর কিছুই সীমা পরিসীমা নেই। মানব সভ্যতার অগ্রগতি অস্বাভাবিক পরিমাণেই ব্যাহত হ'য়েছে। বার্টাণ্ড রাসেল প্রমুখ চিন্তা-নায়কেরা এইজন্যে বহুবারই পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীর কাছে সতর্ক বাণী উচ্চারণ ক'রেছেন। মানুষ যদি এই পৃথিবীতে তার নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়, তবে অবিলম্বেই সমরোপকরণ, যুদ্ধচিন্তা এবং অস্ত্রবিদ্বেষ বন্ধ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, বিজ্ঞানকে মারণ যজ্ঞে উপাদান হিসেবে ব্যবহার না ক'রে তাকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে এবং সর্ব্বোপরি মানব কল্যাণেই ব্যবহার করতে হবে। অতীতে বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর 'সভ্যতার সংকটে' সীমাহীন দুঃদৃষ্টির প্রখর আলোকেই মানব জাতিকে বাঁচার ও মুক্তির পথই নির্দ্দেশ ক'রে গিয়েছেন। আজ সেই বিশ্ব-কবির বাণী অক্ষরে অক্ষরেই সত্য হ'তে চলেছে। সারা বিশ্ব তথা মানবজাতি যে কোনো একটা পথই বেছে নেবে। হয় যুদ্ধ নয় শান্তি।

হেমিংওয়ে তাঁর লেখায় যুদ্ধ সম্বন্ধে বারম্বারই নিজস্ব মতামত ব্যক্ত ক'রে গেছেন। আমেরিকার জন্মলাভ ক'রেও তিনি যুদ্ধকে বরাবরই ঘৃণা ক'রেছেন। যুদ্ধ শুধু মানব জাতিকে সীমাহীন ক্ষয় ক্ষতি, দুর্গতি, অশেষ দুঃখ বেদনা, মৃত্যুর অপ্রতিরোধ করাল গ্রাসের দিকেই নিয়ে গেছে। যুদ্ধ বিষয়ে যে একটা পরমোল্লাস এবং সুপ্রচুর লাভ থাকতে পারে, সেই বিষয়ে হেমিংওয়ের বিরুদ্ধ মত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি নিজেই যে একদা যোগদান ক'রেছিলেন। এই রণাঙ্গনের কর্মীরূপেই তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। যুদ্ধে যে কোনো আনন্দ, শান্তি অথবা মঙ্গল থাকতে পারে—মুক্তকণ্ঠেই তিনি তা অস্বীকার করেছেন। তাঁর For Whom The Bell Tolls-এ একথা খুব সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা ক'রে গিয়েছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের একদিকে শুধু পাপ, পঙ্কিলতা, ঈর্ষাবহ্নি, চরম চক্রান্ত, জীবন বিনষ্টি আর মানবতার কদর্য্য নিরপরাধিতা। মানুষ অতল লোক ক্ষয়কারী যুদ্ধের মধ্যে যে কত অবনতির অতল তলেই তলাতে পারে, তার জাজ্বল্যমান চিত্রটি তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। যখনই এই সমস্ত দৃশ্য ও ঘটনা সমষ্টির মধ্যে পাঠক একেবারেই ডুব দেন, তখন তাঁর মনে শুধু এই কথাই অনুরণিত হয়, সভ্যতা মানুষকে এতটুকুও ঊর্দ্ধগামী করেনি, তাকে চরমতম বীভৎসতায় নামিয়ে নিয়েই গেছে। তখন মন্থ মনের সমস্তটুকু হারিয়ে এসে দাঁড়াবে একটি বিকৃত, অসুস্থ মনোবিকার আর সম্পূর্ণ পশু বলেই মনে মনে শুধু ভাবতে

হবে এই মানুষকে। সমস্ত ভবিষ্যৎ একেবারেই একটা যেন ঘনীভূত অন্ধকারেই দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ ক'রবে। এই সমস্ত দৃশ্যপট ও ঘটনা সন্নিবেশনের মধ্যে দিয়েই যুদ্ধ সম্বন্ধে নির্ভীক চিত্তেই তাঁর মৃঢ় বিরুদ্ধ মত ও সতর্ক বাণীই উচ্চারণ ক'রে গেছেন হেমিংওয়ে। The Sun Also Rises উপন্যাসেও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর সম্পূর্ণ নিজ আদর্শ ও মনোভঙ্গীটি। তাঁর অতি আধুনিক A Farewell to Arms-এ তাঁর সাহিত্য-জীবনের নির্বাচন ও নির্ভীক মূল সুরটিই প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে। যুদ্ধ যে কী ভীষণ, মর্মান্তিক পরিণতি আনে—তার সকলতম চিত্রটিই সাহিত্যক্ষেত্রে তুলে ধ'রেছেন। সমগ্র বিশ্বের বহু বহু ভাষায় এই মূল্যবান রচনাটি প্রকাশিত হ'য়েছে। এই লেখাটিই হেমিংওয়েকে বিশ্ব-সাহিত্যে অতি সুপরিচিত ক'রে তুলেছে। এই রচনাটি বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠায় অনেকখানি প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। স্পষ্টই আমরা দেখতে পেলুম, হেমিংওয়ের জীবনাদর্শ ক্রমে ক্রমেই একটি বিস্তারিত ঘনীবদ্ধ রূপায়নেই রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছে। মানব জীবন ও তার অপার রহস্যময়তার অবগুণ্ঠন উন্মোচনে একটি বিরাট মুক্তভাব ও পবিত্র অধ্যাত্ম অনুভূতি পূর্ণায়ত রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে। The Old Man And The Sea-তে যা শান্তি, সমাহিত ও বিশ্লেষণ একটি পরমতম দর্শন-স্তরে ঘনীভূত ও অভিনন্দিত। মানব জীবনের সমগ্রন্থিকের তাৎপর্য ও তার অন্তে ব্যাখ্যা (analysis) একটা পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত রূপকৌশলে অতি সুন্দর ভাবেই বর্ণিত। Nobel Prize পেলেন এই মহান্ উপন্যাস রচনায়। বিশ্বসাহিত্যে এই গ্রন্থটি চিরদিন ভাস্বর হয়েই থাকবে।

আমরা জানতুম, ব্যক্তি জীবনে তাঁর যে একটি সব প্রধান উগ্র নেশা ছিল—সেটি শিকার। এর জন্যে তাঁর শিকারী বন্ধুও কিছু কম ছিল না। এই শিকারের নেশায় আফ্রিকার গহন অরণ্যেও যেতে হ'য়েছে তাঁকে বহুবার। কি কি শিকার তিনি করেছেন তা এখন আর জানতে ইচ্ছে করে না, অত্যন্ত বেদনাপ্লুত চিত্তেই শুধু এই কথা ভেবেই হতবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি যে, অনেক শত প্রাণী তাঁর হাতের বন্দুকে নিহত হ'য়েছিল ব'লেই কি তারা এমনি ভাবেই তার শোধ নিলো। না ঈশ্বরই তাঁর অভিশপ্ত শিকার জীবনের সঞ্চিত পাপাচারের জন্যে তাঁকে এমনি আকস্মিকভাবেই বহুদিনের বন্দুকের অসতর্ক ছুটে যাওয়া গুলীতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগে বাধ্য করালেন! মৃত্যুর মুখ থেকে তিনি বহুবারই প্রত্যাবর্তন করেছেন। রণক্ষেত্রে, গহন অরণ্যে কিম্বা বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কিন্তু অঙ্গ হানি, রক্তপাত অথবা যন্ত্রণা—যতই তিনি পান না কেন, মৃত্যু তাকে কাবু করতে পারেনি অতি সহজেই। জীবন-প্রেমিক হেমিংওয়ে নির্ভীক, নির্বাচিত, বলিষ্ঠ ক্ষমতারই অধিকারী। আমেরিকার জন্ম। কিন্তু জীবনের বেশীর ভাগই কাটিয়েছেন বাইরে। স্পেন এবং ইতালীতে কাটিয়েছেন অনেক বছর, অনেক দিনই। স্পেনে থাকতেই তিনি দেখেছিলেন স্পেনীয় সমাজকে, সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর নরনারীকে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্পেনের বিখ্যাত ষণ্ডযুদ্ধ তাঁকে অতি মাত্রায়ই মুগ্ধ ক'রেছিল। ইতালীর অন্তর্যুদ্ধও তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। এ ছাড়া অরণ্যে শিকার ও অরণ্যের রহস্যও তিনি প্রাণ মন দিয়েই উপভোগ ক'রেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যে, গল্প-উপন্যাসে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিগুলি অতি সুন্দরভাবেই ফুটে উঠেছে। Death in the Afternoon, The snow of Kilimarrzaro ইত্যাদি রচনায় লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ছবি যথেষ্টই আছে।

বিশ্বসাহিত্যে হেমিংওয়ের দান স্মরণীয় হ'য়েই থাকবে। তাঁর সহজ, সরল লেখনী ভঙ্গী, তাঁর দৃঢ়, বলিষ্ঠ, অনমনীয় ব্যক্তি-প্রতিভা, তাঁর উচ্চ গ্রামে বাঁধা মহৎ দীপ্ত শিল্প রূপ সৃষ্টি—আধুনিক পৃথিবীতে অমূল্য স্বাক্ষর বহন ক'রে এনেছে। শুধু আমেরিকার নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে তিনি যে মৌলিক এবং সম্পূর্ণ অভিনব, মুক্ত সাহিত্য রসের বাণী উদাত্ত কণ্ঠেই প্রচার ক'রে গেছেন, তা মানব জাতির অতিত্ব ও সুমহান্ অগ্রগতিকে সম্পূর্ণ সার্থক জয় যাত্রায় যে অভিষিক্ত ক'রে তুলবে এ বিষয়ে আমাদের কোনও দ্বিমত নেই।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(১৭)

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিকাইস করি, ২য় অধ্যায় শেষ করি। প্রতিভা হরিদাসীর বাসায় গিয়া...হরিদাসী ও অন্য আসে। ঠাকুরের কথা হয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমার যে সব অনুভূতি হইয়াছে, তাহারও কিছুটা বলি। ৩টায় আসি। আসিয়া দেখি রেণু আসিয়াছে। শ্রীনিকেতনের কথা তাহার নিকট শুনি। কিছু পরেই অতীনবাবু আসেন, চলিয়া যান। আমি রেণু প্রতিভা ৫টার পর অফিসে যাই।... আমি গীতাভবনে যাই।...৬।০টায় সভার কাজ আরম্ভ হয়। সনৎকুমার রায়চৌধুরী সভাপতি হন। প্রথমে দেবেন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত বিশ্বরূপ সেবাশ্রমের অতীত বিবরণ পাঠ করেন। পরে আমি কিছু বলি। 'Spiritual life is at the same time a self life and a cosmic life'—cosmic life-ই বিশ্বরূপ। যোগেশ ব্রহ্মচারী, অমলবন্ধু ভট্টাচার্য, পরে সভাপতি বলেন। একটী কর্ম-পরিষদ্ গঠিত হয়। দেবেন্দ্রবাবু তাহার সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ। ৮টার পূর্বে অফিসে আসি। সঙ্গে সঙ্গে অতীনবাবু দেবেনবাবুরাও আসেন।...গীতাভবনের ধীরেনবাবু ও শ্রীশ দাস আমাকে হরিদাস বাবুর পানিহাটির বাসায় যাইবার জন্য অনুরোধ জানায়।

৮ই ডিসেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্রের ২৫শ কর্মের গ্যালী প্রুফ এবং প্রথম কর্মার প্রুফ দেখি।...আমি, অতীনবাবু, সেই সন্ন্যাসী, রেণু প্রতিভা ট্রামে মঠে যাই ৩-৫৮-তে।...৪টা হইতে ৪-১০ পর্য্যন্ত আলোচনা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পদের অর্থ। সেখান হইতে হাঁটিয়া আমরা সকলেই অফিসে আসি।...ঠাকুরের সামনে পাঠ—ইহাই তৃপ্তি। যাহার জিনিষ, তাঁহাকে তাহা দিয়া সেবা—ইহাই আমার পরম লাভ। লোকও ২।৪টী নূতন হইয়াছে। কিতীশ, চিদানন্দ, অমৃতানন্দ, কালীপদানন্দ, রেণু, প্রতিভা, অতীনবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা আমার ভাল লাগিয়াছে। অতীনবাবু ৪টার পর ২ বার আসিয়া আমাদিগকে না পাইয়া একটু কাগজে তাহা জানাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কাল আবার আসার কথা। আজ সন্ধ্যার পর ঈশ্বর প্রামাণিকের আসার কথা...আসে নাই। রেণু শ'-এর 'বিরল নাটক' কিনিয়া আনে ও অনেকটা পড়িয়া শুনায়।...

৯ই ডিসেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্রের ৩য় অধ্যায় রিকাইস করা আরম্ভ করি।...রেণু ১২টার পর আসে।...সন্ধ্যার পর ছাত্রার ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক আসেন। তাহাকে উজ্জলভারতের দেওয়া হয়, সহমপত্রাও দেওয়া হয়। প্রায় ১ঘণ্টা থাকেন। ৮টার পূর্বে অতীনবাবু আসেন। তিনি উজ্জলভারতের 'সাইজ' হয় প্রবাসীর মত করিতে বলেন, নয় যেমন আছে তেমনই রাখিতে বলেন। তখন ডিমাইয় উপযোগী কাগজ নাকি বাজারে তেমন পাওয়া যায় না।...সকালে রেণু প্রিয়রঞ্জনবাবু সুহৃৎবাবুদের কাছে গিয়াছিল। সুহৃৎবাবু বলিয়াছেন—সত্যি, তোমাদের পত্রিকা আমার ভাল লাগে। পত্রিকাটী বেশ ভাল ইত্যাদি। রেণু অদ্যকার আনন্দবাজার হইতে 'ভারত-আত্মা শ্রীঅরবিন্দ' প্রবন্ধটী অফিসে পড়ে। আমি উহার মধ্যে কোথায় আমাদের সঙ্গে পার্থক্য, তাহার আলোচনা করি। তাঁহার ভাগবত-বিশ্ব ঠিক বাস্তবিকতায় গড়িয়া উঠিবে না, যদি না দুঃখকে মূল্য হিসাবে সুখের সঙ্গে সমমর্য্যাদা দেওয়া হয়, যদি না অসত্যকে সত্যের সমান মূল্য দেওয়া হয়, যদি না প্রথম

হইতেই অন্তর বাহিরের ভেদ অপনীত হয়, যদি না পরমাগতিযোগে প্রথমেই বুদ্ধিনাশ হইতে সাধনা সুরু করা হয়। অন্তর বাহিরের ভেদ হইতে যাত্রা করিলে, অন্তর্মুখী গতিতে সাধনা সুরু করিলে কিছুতেই কিন্তু বাহিরে আসিবে না, অন্তর্জগৎ বাহিরের জগতে মূর্ত্ত হইবে না। তবে ইহা ধরু-অধরু সম্বন্ধের দিকে one step forward বটে। এবং এই হিসাবে ইহার সার্থকতা কিছু আছে। তবে ইহা দ্বারা বিশ্বাস হওয়ার ভয়ও আছে। এতদিন তো অন্তর্মুখী গতিতেই ভারতবর্ষ এই জগৎকে বাদ দিয়াছে। আবার সেই অন্তর-বাহিরের ভেদ?

১০ই ডিসেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্র ৩য় অধ্যায় রিভাইস করি। রোজে খবর পাওয়া গেল যে, ভাদুড়ী বিশ্বাস গত রাত্রিতে ৪টায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।...প্রতিভা সোজাসিসে ও ব্যাঙ্কে যায়। প্রতিভা আর আসে না। রেণু ১টার পর বাহির হইয়া ১টার পর ফেরে। এখানে আসে প্রায় ২টায়। ...৪৷৷টার পর আফিসে যাই। এখানে আর বৈকালের খাওয়া খাই না।...

১১ই ডিসেম্বর

খুব সকালে বুলুকে লইয়া বিমলার মহল বাড়ী যাই... আসিয়া ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি। রেণু ৯টার সময় আসে। সে সকালে ও দুপুরে বাহির হয়। E. I. R.-এর টাকা আনে, ব্যাঙ্কে যায়। প্রতিভা দুপুরে আর আসে না। আমি ও রেণু ৯টার পর আফিসে যাই। মালতী আফিসে আসে। কিছু পরেই যতীন ব্যানার্জী আসেন। ২ ঘণ্টা থাকেন। আগামী ২২শে একবার চাদুড়িয়া গীতাজয়ন্তী (অগ্রহায়ণ শুক্লা একাদশী) পালন করিবেন। তদুপলক্ষে একটী 'গীতা-চয়নিকা' বিতরণ করা হইবে। ছাপানোর খরচ দিবেন ভারকদাস চট্টোপাধ্যায়। লেখাটি মোটামুটি পড়িয়া শুনাইলেন। আমাকে ২৪০টার গীতা প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবার কথা বলেন। সভাপতি হইবেন ৩টার সময় ডক্টর যতীন্দ্রবিমল। ইহার পরই আসেন যতীন হালদার। তাহাকে গীতার ভাষ্য প্রথম হইতে 'যে যেই আমায়' অংশটী পড়িয়া শোনান হয়। উদ্বোধনাবতের চিন্তাধারার উপর তিনি অনেকটা অনুরক্ত হইয়াছেন বোধহয়। তিনি জোর করিয়া ভাষ্য-প্রথম নিতে চান, এতই উহা তাহার ভাল লাগিয়াছে। তাহাকে 'নারী প্রগতির অন্তরকথা', 'গীতা-জয়ন্তী' ও 'ধরাতলের পূর্ণচন্দ্র' দেওয়া হয়। ১টার পর তিনি চলিয়া যান। তাহার সঙ্গে উদ্বোধনাবতের সাইজ সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। কাগজ পাওয়া যাইবে—বীরেনবাবু বলেন।...যতীনবাবুও মনে করেন আমাদের অন্ততঃ উচিত। অনেকেই মনে করেন আমাদের পত্রিকা ধর্ম্মপত্রিকা। ইহাতে তাহাদের চিন্তাদৈন্য বুদ্ধিদৈন্যই সূচিত হয়। কেমন করিয়া পত্রিকায় শ্রীকৃষ্ণ ও চরিত্রহীন স্থান পাওয়া সম্ভব, যদি না একটা বিরাট synthesis উহাদের মধ্যে থাকে? 'সাহিত্যের উপাদান' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিতে রেণুকে বলিব।

১২ই ডিসেম্বর

সকালে একবার আফিসে যাই...। ৮টার পর... আসে। 'কি করিব' জিজ্ঞাসা করে। আগে নিজের লক্ষ্য ঠিক কর, পরে সব ঠিক হইবে। যদি এ পথে থাকা সম্ভব না হয়, অন্য পথ ধরাই সঙ্গত। কিন্তু সে বয়স তো আর নাই। যে কামিনী-কাঞ্চন আজ সকল ঘরছাড়াদের কবলিত করিয়াছে, অথচ যাহাকে স্বীকার করার মত দর্শন এ দেশে নাই, সেই জন্যেই নিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন একটী পথের ইঙ্গিত দিতে। ইহার সুযোগ নেওয়া কাহারও উচিত নয়। মদনকে মোহন করা যায়—যদি কেহ বিশ্ব-রূপের সাধন গ্রহণ করে। সামগ্রিক জীবন যাপন করার মধ্যেই মদন মোহিত। এই মদনমোহনের জন্যই আমি নিজ স্ত্রীকে লইয়া পথে বিশ্বসেবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। অন্তরকে বাহির, বাহিরকে অন্তর করিলেই মদন মোহিত হয়। মদন মোহন হওয়ার জন্য সকলের সঙ্গে মিলিতেও হয়, আবার সকলের সঙ্গে মিলিতে গেলেও জড়াইয়া পড়ার ভয়।...তাহার জীবনে ইহার experiment করিতেছে।

ছন্দে ভুল হইলে সব পণ্ড হইবে। বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরকে মাঝখানে রাখিয়া মিলিলে সেখানে কাম শুদ্ধ হয়। Individually চলিলে কামিনী-কাঞ্চন বর্জন করিতেই হইবে। 'যে ব্রতের যে কথা'।···আমি শ্রাদ্ধবাসরে যাই। ১২টায় পর আসি।···

১৩ই ডিসেম্বর

···যতীশ দাশগুপ্তের একটী চিঠি আসে। চিঠি পড়িয়া মনে হয় আমাদের বক্তব্য বিষয়টী তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার কাছে ইহা কিছুটা ধরা দিয়াছে। তাহার দ্বারা কাজ হইতে পারে। সে অন্ততঃ মানুষের কাছে প্রচার করিবেও। রেণু সকালে শশীবাবুর ওখানে যায়। ১১টায় পর বাহির হইয়া ৪টার পর ফেরে।···

১৪ই ডিসেম্বর

সকালে যতীশ দাশগুপ্তের 'মাটির মায়া' ও 'নির্ণয়' পত্রিকা হইতে রাসেলের লেখা 'সাম্যবাদের গোড়ার গলদ' প্রবন্ধের অনুবাদ পড়ি। ৮৪০টার পর রেণু···ইন্‌ভেস্‌ টারস্‌ কার্টেল হইয়া পরে প্রেসে প্রুফগুলি দিয়া আসে। স্যার এদ্‌ এন্‌ রায়ের সঙ্গেও দেখা করে। ···১৪০টার পর আসে। ৩টায় গুরুগৌরবানন্দ আসেন।···মঠে পৌঁছি ৪টায়, তখনই পাঠ আরম্ভ করি। 'ধনুর্ভঙ্গ', 'সেনরোকড়-বোর্শখো', 'Life-instinct'-এ 'death-instinct'-এর আশ্রিত করিয়া তোলা, শুক্রভাব ও শুক্রভাবের উদ্বোধন প্রভৃতি বিষয়ে আজ আলোচনা হয়। Critical study বা cross-examination-এর জন্য উত্তর দেবার মধ্যে রথযাপনা। শ্রোতা ১৫ জন হইবে। ঠাকুরের সামনে পড়িতেছি, ইহা প্রথম তৃপ্তি, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার মঠে যাওয়া, ঠাকুরের সঙ্গে একটী যোগস্থাপনা—এইগুলি আমাকে তৃপ্তিদান করে।···মঠে যাইতে যাইতে ভাবিতে-ছিলাম, যাহা সার্ব্বজনীন, তাহা কখনও ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে না। সার্ব্বজনীন রেল, ষ্টীমার, ট্রাম, বাস কখনও সকল বাড়ীর দুয়ার দিয়া যাইতে পারে না। সকলকেই বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া কিছু দূরে সার্ব্বজনীন স্থানে আসিয়া ইহাদিগকে ব্যবহার করিতে হয়। কেন্দ্র সার্ব্বজনীন, তাই পরিধি হইতে দূরে। কেন্দ্র পরিধির অব্যবহার্য। একমাত্র পুরুষোত্তম-তত্ত্বেই ব্যবহার ও অব্যবহারের সামঞ্জস্য, দূর ও নিকটের সামঞ্জস্য। ইহা প্রত্যেকের আঙ্গিনা দিয়া গেলেই সার্ব্বজনীন থাকিয়া যাইতে পারেন। এইখানেই বর্ত্তমান যুগের মীমাংসা।

১৬ই ডিসেম্বর

রেণু সকালে এখানে আসে···। আমি ৪-৪৫-এর পর অতীন্দ্রবাবুর বিষয়ক সেবাশ্রমে যাই। ৫টার অনেক পর হেরেনবাবু আসেন। একজন পণ্ডিত ছিলেন। সেখানে রাধার 'ছিত্রকুম্ভে জল আনা'-র কথা, বেদান্তসূত্রে ভাষ্য-কারদের বিরোধ, এবং তাহার ফলে তাঁহাদের উপর সাধারণের শ্রদ্ধাহীনতা, ঋষির বর্ণাশ্রম ও কৃষ্ণের বর্ণাশ্রমের পার্থক্য, প্রহ্লাদের বিষমিশ্রিত অন্ন নিবেদন করা বা না-করার দ্বন্দ্ব, ভাগবত ধর্ম্মে পূর্ব্বে জীবনের প্রশ্ন, পরে বিধির প্রশ্ন, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করি।···আমিও আমাদের দর্শন আলোচনা করি। সাহিত্যিকগণ আজ অর্থের তাগিদে সাহিত্য-সেবা পরিত্যাগ করিয়া সিনেমার আশ্রয় নিয়াছে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ-ভঞ্জনই পুরুষোত্তম-দর্শনের মূল কথা। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ ···লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিরোধ নিষ্পত্তি। উজ্জ্বলতায়ত সাহিত্যিকদের ঘরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পথের খোঁজ দিবে, সে সাহিত্যের যুগোপযোগী উপাদান যোগাইবে। কেন আমি 'পরৎকুমার ঘোষ' না লিখিয়া পুরুষোত্তমানন্দ লিখি, ইহাতে পত্রিকাটিকে ধার্ম্মিক পত্রিকা মনে করে—ইত্যাদি আলোচনার আমি উত্তর দেই। ৯৪০টারও পর চলিয়া আসি।···

১৭ই ডিসেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্র ৩২-এর 'কৃতাত্যয়' সূত্র রিকাইস করি। রেণু আসে ৮টার পর, যায় ১০টায়।···জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত আসে।···জ্ঞানবাবু বলিতেছিল আমার বৈঠকী কথাগুলিকে···ধরিয়া রাখিতে। উহাদ্বারা জনসাধারণ inspiration পাইত। লেখার মধ্যে যে বাঁধন আছে,

উহা পড়িতে সাধারণের কষ্ট হয়। মাখনবাবুর সঙ্গেও এ কথা হইয়াছে।...কুচবিহার হইতে একজন হাইস্কুলের হেডমাষ্টার উদ্বোধনের গ্রাহক হইয়া ৪৲ টাকা মনি অর্ডার করিয়াছেন। প্রায় ১০টায় আশ্রমে ফিরি।...

১২শে ডিসেম্বর

'গীতা'-র জন্মদিন—অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী।... সন্ধ্যার পর ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। আগামী শুক্রবার গীতা-জয়ন্তী উৎসব। ৩টার সময় আরম্ভ। সকালে অতীনবাবু আসিয়াছিলেন। তাঁহার ঠাকুর অভিষেকের দিনও শুক্রবার। সম্ভব হইলে চাকুরিয়া হইতে সেখানে যাইব।...চন্দ্রকান্ত ইনষ্টিটিউশনের নগেন চক্রবর্তী আসে প্রায় ৯টায়। ২রা জানুয়ারী তাহার স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস, সেদিন যাওয়ার জন্য। আর একদিন ইহার মধ্যে আসিতে বলিলাম আফিসের ঠিকানায়।

২০শে ডিসেম্বর

...প্রতিভা... আনন্দবাজার হইতে কলিকাতা দর্শন-কনফ্রেন্সে গাধারুফনের বক্তৃতাটা পড়িয়া শুনায়।...হেরম্ববাবু আসেন।...রেণু বার্ণার্ড শ-এর মিসেস্ ওয়ারেন ও ভিঙি (মিস্ ওয়ারেন)-র নাটিকাটা পড়িয়া শুনায়। যে-কোনও তথাকথিত 'পাপ' কর্মের আশ্রয়ে জীবনে অগ্রগতি আসিলে তাহা অন্তেই বরণ করা পুরুষোত্তম-দর্শনে অনুমোদিত বটে, কিন্তু একবার অগ্রগতির সুযোগ লাভ হইয়া গেলে আর তো সে পথে চলা সমুচিত নয়—ইহা মিস্ ওয়ারেনের তাহার মা হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ানোর ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'সেরে অন্ত সর্বে পাপ্যাণি প্রণবেন প্লবেন হি তাঃ'। জীবনে যাহার অগ্রগমন আছে, তাহার কি বা পাপ, কি বা পুণ্য! বিশ্বচিন্তাধারার কোন্ মহিমময় ও গুরুতর স্থানে ঠাকুর টানিয়া আনিয়া আমাদিগকে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে 'কেবে মরি লাজে গরবে'।...

২১শে ডিসেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্র রিভাইস করি।...রেণু তাহার 'শেষের কবিতা'র আরম্ভ পড়িয়া শুনায়।...বাসে বালিগঞ্জ হইয়া চাকুরিয়া যাই। ২-৪০-এ পৌঁছি। ধীরেনবাবুর বন্ধু খগেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে প্রথম দেখা। নকুলবাবুও ছিলেন। ৩টার পর সভাস্থলে যাই। সভার কার্য্য আরম্ভ হয় ৩৷৷ টারও পর।...আমি 'গীতা প্রদর্শনী'র উদ্বোধন ছোট একটী ভাষণদ্বারা আরম্ভ করি। গীতার আত্মজ্ঞান বক্তব্য নয়, উহা creative। সর্ব্ব ভূতের মধ্যে আত্মাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেমন যুদ্ধ বোঝাই তাহার 'চরণ'কে সব শিশুদের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। ৬টার যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সভাপতি হন।...তারকদাসবাবুর গাড়ীতে বিশ্বরূপ সেবাশ্রমে পৌঁছি।...প্রায় ৮টায় এখানের আলোচনা আরম্ভ করি। ৮-২০-তে আলোচনা শেষ করি।

২২শে ডিসেম্বর

সকালে মাঘ মাসের জন্য গীতার অবতৃত তার 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং' অংশ রিভাইস করি।...২টায় অফিসে যাই। কিন্তু তখন (উদ্বোধন তারত) আসে না। আমরা ৩-৩৫-এ ট্রামে রওয়ানা হই। ৪-১০-এ গীতা পাঠ আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব দিনের কথা সংক্ষেপে বলার পর অর্জ্জুনের বিষাদের psychology এবং ভগবানের অন্তঃপ্রবেশে অর্জ্জুনের যেন প্রাণ মনের তাবান্তরের, অই সাত্ত্বিক ভাবের কথা আলোচনা হয়। ২০।২৪ জন লোক হইয়াছিল।...আসিয়া মেথি পত্রিকা আসিয়াছে।... উহারা ব্যাপার লাগাইতে থাকে।...জ্ঞানেন্দ্রবাবু আসিয়াছিল। সবার জন্য spirit চাকুষ প্রত্যক্ষ হয় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করে রেণুর সঙ্গে।...খেসারীর শাক আমার প্রিয় খাদ্য...।

২৩শে ডিসেম্বর

...সন্ধ্যার পূর্ব্বে খগেন ঘোষ আসিয়াছিলেন। তিনি গীতার অনুক্রমনিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেন—মনের ও প্রাণের তত্ত্ব, আগে 'ভ্রষ্টব্যঃ' কেন ইত্যাদি বিষয়ে।

…কিছু পরেই নগেন চক্রবর্তী (চন্দ্রকান্ত ইন্‌স্টিটিউটের) আসে।…মানুষ বুদ্ধিতে ভুল করিলে কেমন করিয়া সারা আবেষ্টনকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে,…ইহারই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

২৪শে ডিসেম্বর

…আমি সত্যব্রত ও সিমলাইবাবু…১১টায় শান্তিপুর লোকাল ট্রেনে প্রায় ২৪ টার পর শান্তিপুর পৌঁছি… ডাক্তারদ্বয় বলিল, (দাদার) অবস্থা মন্দের ভাল।… আমি ৬৷৷ টায় বিদায় হইয়া আসি। …১০-৩৫-এ শিয়ালদহ পৌঁছি…(আশ্রমে) প্রায় রাত্রি ১১টায় পৌঁছি…।

২৫শে ডিসেম্বর

…আফিসে যাই।… ১০ টায় পর চলিয়া আসি। রেণু কলিকাতা-ঘুরিয়া প্রায় ৩টায় আসে। ইহার পূর্ব্বেই ব্রজেন্দ্র ব্যানার্জী আসেন। তিনি 'পূতনা'র কথা আলোচনা করেন, আমি উহার ব্যাখ্যা করি। রথতলাই ও সাকোর ঘাটে যে ব্যাপার হইতেছে, তাহা ভাবিলে হতভম্ব হইতে হয়। মিস্টিসিজিমের শোচনীয় পরিণতি ইহাই। জড়ের ক্ষেত্রে এইরূপ মিস্টিসিজম আসিলেই যদি মিষ্টিসিজিমকেই একমাত্র সত্য স্বীকার করা হয় বিজ্ঞানকে একেবারে বাদ দিয়া। এ দেশের বিগত শুভদের প্রাচীনেরা তো মিষ্টিসিজিমের পথই বাছিয়া লইয়া ছিলেন। এ দেশের চার্ব্বাক অবশ্য সে পথ নেন নাই। কণাদ গৌতম নিতে না চাহিলেও অপবর্গের সাধনা তাহাদিগকে শেষে মিষ্টিক করিয়াই তুলিয়াছিল। বিজ্ঞানের বুকে meta-physics-এর অবতরণ হইলে এই অজ্ঞতা মানুষের দূর হইত।…ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠানের আলোচনা হয়। চাকুরিয়ার কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে, ইহা বিশ্বাস নহে। চাকুরিয়ার কাজ আরও intensive করিতে হইবে। বাহিরে সভায় নিজকে ছড়াইয়া দেওয়া সহজ। নিজ আবেষ্টনের মধ্যে প্রতিষ্ঠাই পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠা। সেজন্যই প্রস্তুত হইতে হইবে। From within without—ইহাই জীবনের গতি।

২৬শে ডিসেম্বর

সকালে আফিসে যাই, তখনই প্রতিভা বিভেশ গুহের বাসায় যায়। সেখানে ১টা হইয়া যায়। বিভেশ প্রথমে পরিচয়, পরে আমাদের পত্রিকার বিষয়বস্তু, নিত্য-গোপালের মতবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। পরমহংসদেব হইতে নিত্যগোপালের পার্থক্য, অরবিন্দ হইতে পার্থক্য, সাত্ত্বিকতা কি—এ সব সম্বন্ধে আলোচনা প্রতিভা ভালই করিয়াছে। শুনিয়া আনন্দ হইল।…রেণু সুহৃৎবাবুর বাসায় যায়, আমি চলিয়া আসি। রেণু ১১টায় ফিরিয়া খাইয়া আবার কলিকাতা যায়। সে এখানে আসে ৩টায়। প্রতিভা… আসে ২টার পর। ৪টার পূর্ব্বে ধীরেন ব্যানার্জী আসেন …চৈতন্যচরিতামৃত হইতে মহাপ্রভু-রামানন্দ কথা—'ইহ বাহ্য আগে কহ আর' আলোচনা করেন। ঠাকুরের (শ্রীনিত্যগোপাল) সামনে একদিন এই স্থান পাঠ হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'এ বিষয়ে আমি চৈতন্য-চরিতামৃতকারের সঙ্গে একমত নই। তথাপি আমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারকে বার বার বন্দনা করিতেছি। ইহা বলিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। সমস্ত শুভের সঙ্গেই ভগবানের সব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই জীবন্ত বিশ্বে hierarchy, ladder system বলিয়া যে কিছু নাই, পল্লীকরণের বিধানানুযায়ী মাটির মধ্যে মাটি আট আনা, অন্যান্য চারিটী ৵৹ আনা করিয়া আট আনা—ইত্যাদি আলোচনা আমি ধীরেনবাবুর সঙ্গে করি। আমরা একত্র হইয়া আফিসে যাই। সেখানে উপেন হয়…আসে।… ব্রজেনবাবুর সঙ্গে আমার যে আলোচনা হইয়াছিল রবীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাহা ধীরেনবাবুকে বলি। চাকুরিয়ার আরও intensive work চালাইবার কথা বলি।…

২৭শে ডিসেম্বর

…ঈশ্বর প্রামাণিক সকালে আফিসে গিয়াছিল। এখানেও আসে ১টায়। আরও তিনটী যুবক সঙ্গে আসে। ১ঘণ্টার উপর ছিল। মধ্যবর্ত্তী বুদ্ধিমান লোকদিগকে তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে না পারিলে জনসাধারণের কাছে কিছুতেই কোনও তত্ত্ব পৌঁছানো সম্ভবপর নয়, কেননা

মধ্যবর্ত্তীরাই সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া জনসাধারণ সহজভাবে হৃদয়দ্বারা তত্ত্বকে বেশ পাকা করিয়া গ্রহণ করে। সৃষ্টির ভার মধ্যবর্ত্তীরা না নিলে জনসাধারণ কোনও দিনই গড়িয়া উঠিবে না। মধ্যবর্ত্তীরা যেন পুরুষ, জনসাধারণ যেন তাহাদের 'প্রকৃতি'। 'উজ্জয়ন্তভারত' এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আগামী ২০শে জানুয়ারী তাহাদের বালিকাস্কুলের প্রতিষ্ঠা উৎসব। ২২শে সোমবার আমাকে যাইতে হইবে। তাহারা আসিয়া নিয়া যাইবে। পত্রিকার গ্রাহকের কথা বলিলাম। রেণু চুপুরের পরই আসে। ২॥০ টার পর বিশ্ববিদ্যালয়, এ মুখার্জী প্রভৃতিতে যায়।...আমি ৫টার পর আফিসে যাই।...সকালে গীতার রিগ্রিটের প্রুফ দেখি, ব্রহ্মসূত্রের ২৭শ কর্ম্মের শেষ প্রুফ দেখি।

২৯শে ডিসেম্বর

সকালে সত্যরঞ্জন ঘোষের বাসায় গত বৎসরের (১৯৪০) চাঁদার জন্য যাই। ওরা জানুয়ারী দিবে বলিল। সেখান হইতে আসিয়া 'Chief Currents' পড়ি। ১২টায় পর রেণু আসে। তাহার ওখানে সকালে শমীন বসু ও শেখর দাস আসিয়াছিল; রেণু 'শেষের কবিতা' লেখে। ৩-৪৫-এ মঠের জন্য রওয়ানা হই। মঠে ৪-১০-এ পাঠ আরম্ভ হয়। ৫॥০ টায় শেষ হয়।...কিছু পরেই ধীরেন ডাক্তার আসে।...পরিমল মৈত্র আসে। ইহার পরেই উপেন ধর ৪টী কমলা লেবু আসে। তাহার বাসায় আগামী সোমবার ৬টার পর যাইব ও কিছু আলোচনা করিব কথা হইল। মঠে ঠাকুর কেমন আমাদের আদরে রাখিতেন, সর্ব্বদা আমাদের মুখে থাকিতেন, অথচ আমরা তাঁহাকে আদর করি নাই, কেমন করিয়া তিনি তাহাকেও imperative mood-এ কথা কহেন নাই, তিনি ছিলেন 'absolute freedom' তাহাই কাহার মধ্য দিয়া আলোচনা করি। রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ করি। তিনি প্রত্যেককে তাহার স্বকর্ম্ম, স্বগোত্র হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছাইবার পথ ও কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন।... সকালে সত্য ডাক্তারের বাসা হইতে আসিবার পথে অতীনবাবুর আশ্রমে যাই, কিছু আলোচনা করি। এই যুগে বিশ্বরূপকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে চলিতে হইবে। কিছু কথা তো চাই। আমি 'উজ্জয়ন্তভারত'কে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট ক্ষেত্রের খোঁজ পাইয়াছি।...

৩০শে ডিসেম্বর

সকালে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি, পরে ত্রিপুরাশঙ্করের 'সাহিত্যের নবজন্ম'র পুস্তকপরিচয় লিখিতে আরম্ভ করি। সেই সময় শৈলেশ সেনগুপ্ত (মেদিনীপুরের পাবলিসিটি অফিসার। আমার ছাত্র) দেখা করিতে আসে। সে এখানে বদলী হইয়াছে। তাহার সঙ্গে বরিশালের আদর্শগত আবেষ্টনের কথা আলোচনা হয়। তাহাকে অগ্রহায়ণ ও পৌষের উজ্জয়ন্তভারত দেওয়া হয়।...১২টার পর রেণু আসে। ৩টার পর আমরা হরিদাসীর ওখানের জন্য রওয়ানা হই।...ঠাকুর আমার জীবনে কেমন করিয়া আগাইয়া আসিয়াছেন, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি, বরিশাল কনফারেন্স ইত্যাদির ভিতর দিয়া তাহার বর্ণনা করি। একটু স্নান করার কথাও বলি যাহাতে রেণু প্রতিভা প্রভৃতিকে কলিকাতার বুকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া আমাকে মরিতে না হয়।...'হাত ধরে আমায় নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনি না'—ইহাই হরিদাসীর ওখানে গাহিতেছিলাম। ৯টায় পর আশ্রমে ফিরি। ঠাকুর জয়যুক্ত হউন।

৩১শে ডিসেম্বর

—১৯৪১—

৺পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল

শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীচরণপ্রান্তে আমার যাহারা তাহাদের দ্বারা পরিবৃত মনে করিয়া স্তবপাঠ ও প্রার্থনাদি করি। 'হাত ধরে আমায় নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনি না'। যিনি আগাইয়া আসিয়া আমার পথ করিয়া দিয়াছিলেন, আজও তিনিই সঙ্গে আছেন। পরে রেণুর

ওখানে যাই। সে ও আমি আশ্রমে আসি। রেণু গ্রুপ নিয়া প্রেসে যায় ও বাসন্তী যাইতিং-এ যায়। ১টার পর আসে।...উপেন ধর...আসে ...৩-৫৫ মিনিটে চারুবিয়া পৌঁছি। ৪টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। বিষয় ছিল গীতার বীজ, শক্তি ও কীলক। সব পঠনের মধ্য নব জীবনের বার্ত্তা পৌঁছানোই 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' এই বীজের তাৎপর্য্য। শরণাগতিদ্বারা শক্তিলাভ করাই 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'-রূপ শক্তির উদ্দেশ্য এবং 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' এই কীলকের তাৎপর্য্য হইতেছে দৃষ্টিমান সমাধান শ্রীগুরু-জীবনরূপ খুঁটার সঙ্গে যুক্ত করানো। একদিকে push from without (negative), অপর দিকে pull from within (positive)। ৫৮ টায় শেষ হয়। ব্রজেনবাবু, তারকবাবু, হরবিলাস, বীরেনবাবুদ্বয়, রবির বাবা ইত্যাদি এবং বহু মেয়ে উপস্থিত ছিল। আলোচনা বেশ লাগিয়াছিল। 'এসেছে আদেশ বন্ধনের কাল হল শেষ'—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ধরণী, দেব, পিতৃ, সাধু, বর্ণ, আশ্রম, সতীত্ব, মানব সব আজ পঠিয়াছে। নব জীবন আসিতেছে।

১লা জানুয়ারী

...নিষ্ঠার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, একান্ত নিষ্ঠার ফলে জীবন যাইতে পারে শুখাইয়া, আবার নিষ্ঠার অভাবে আসিতে পারে উচ্ছৃঙ্খলতা, অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা-মন্দোদরীর নিষ্ঠা কোন্ স্তরের, তাঁহারাও প্রাতঃস্মরণীয়া কেন ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা করি, বাহির ও ভিতরের দুই দল ব্রজগোপীর উল্লেখ করি।...যে স্থিতির সঙ্গে অগ্রগমন অব্যাহত থাকে, তাহাই নারীর সতীত্ব; যেমন তেমন করিয়া যার তার সঙ্গে আটকাইয়া থাকিলেই তাহা সতীত্ব নয়। যাথাই নারী-প্রগতির মূর্ত্ত বিগ্রহ। পুরুষোত্তম-যোগ ছাড়া সতীত্ব অসম্ভব।

২রা জানুয়ারী

সকালে ডি, এম, দত্ত-র 'Chief Currents', কে, সি, ভট্টাচার্য্যের 'Studies in Vedantism' পাঠ করি। ডি, এম, দত্তর 'Chief Currents'-এর অন্তর্গত কে, সি, ভট্টাচার্যের 'Indefinite in Logic and Negation' অংশটী প্রণিধানযোগ্য। উহা পুরুষোত্তম-দর্শন স্থাপনের অনুকূল। ১২টায় পরই রেণু আসে... 'শেষের কবিতা' লেখে, পড়িয়াও শুনায়। ৪টার পর বীরেন ব্যানার্জী আসেন। বীরেনবাবু গীতার 'এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রম্'এর 'চক্র' কি এই প্রশ্ন করেন। অন্ন সৃষ্টি করে ভূতকে, ভূত সৃষ্টি করে অন্নকে, পর্জ্জন্য সৃষ্টি করে অন্নকে, অন্ন সৃষ্টি করে পর্জ্জন্যকে, যজ্ঞ সৃষ্টি করে পর্জ্জন্যকে, পর্জ্জন্য সৃষ্টি করে যজ্ঞকে, কর্ম্ম সৃষ্টি করে যজ্ঞকে, যজ্ঞ সৃষ্টি করে কর্ম্মকে, ব্রহ্ম সৃষ্টি করে কর্ম্মকে, কর্ম্ম সৃষ্টি করে ব্রহ্মকে, অক্ষর সৃষ্টি করে ব্রহ্মকে, ব্রহ্ম সৃষ্টি করে অক্ষরকে—ইহাই 'চক্র'। এই ভাবে ভূত ও অক্ষর পরস্পরকে সৃষ্টি করিলে সেই চক্রই হয় বর্ত্তমান যুগের জগন্নাথ-চক্র। গীতার 'শক্তি' কি তাহাও জিজ্ঞাসা করেন। শরণাগতিই গীতার 'শক্তি'।...আগামী রবিবার ৪টায় 'দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারে' গীতা পাঠ হইবে স্থির হইল। বীরেনবাবু ২॥ টায় আসিবেন।

৩রা জানুয়ারী

সকালে সাময়িকী 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে'-র অনেকটা লিখি। ২টায় রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া আসে।...যতীন মজুমদার আসে। পানিহাটীতে তাহারা ঠাকুরের আসন পাতিয়াছে, কেমন করিয়া দেবীদের 'ভর' হয়, বাঁশীর উপরও একদিন হইয়াছিল, তাহার মৃতা স্ত্রীর আসন পাতার ইতিহাস ইত্যাদি বর্ণনা করে! আমি ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনের ও তাঁহার করুণার কথা বলি। বাহিরের মন্ত্র হউক বা না হউক, আমি তাহাদের থাকিব, তাহারাও আমার থাকিবে—ইহা বলিয়া দেই। মন্ত্র বাহিরের নয়, উহা ভিতরের একটী জীবনগত ব্যাপার। আজ তাহারই দিকে দৃষ্টি দিবার দিন আসিয়াছে। তাহারা ৪টায় চলিয়া যায়।...বীরেন চৌধুরী ও সুবোধ চ্যাটার্জী আসে।...এই শক্তির ক্ষেত্রে—যেখানে স্বামীর

কাছ হইতে স্ত্রীর পর্যন্ত অধিকার পাওয়ার সাধনা করিতে হয়, যোগ্য হইতে হয়, সেখানে সরকার আমাদের সবকিছু করিয়া দিবে, কিংবা করিতে পারে ইহা কুসংস্কার মাত্র। এই কুসংস্কারে আজ যারা বেশ আচ্ছন্ন। তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর দিকে লক্ষ্য না করিয়া সকলেই সরকারের মোসাহেবী। তাহারও গঠনমূলক মনোবৃত্তি নাই। ইহারই সুযোগ লইয়া এ দেশে কম্যুনিজম প্রসার চাহিতেছে। ১৮ টার আগেই ফিরি।...

৩রা জানুয়ারী

রেণু সকালে আসে, তাহার লেখা 'শেষের কবিতা' পড়িয়া শুনায় ও আলোচনা করে।...১১৫ টার পূর্বে ধীরেনদের নূতন ডিস্‌পেন্‌সারীতে যাই।...সত্যজিৎ রায় প্রচ্ছদপটের একটা নমুনা দিয়াছে।

৪ই জানুয়ারী

...রেণু ১১টার পর কলিকাতা যায়, ৩-৩০-এ ফেরে। আমরা ট্রামে ৩-৪৭তে পৌঁছি। ৪-১৫-তে পাঠ আরম্ভ করি।...প্রভৃতি ২৫ জন ছেলে মেয়ে উপস্থিত ছিল। আজ 'মূর্ধ্নি মান্ মথনান্ কৃষ্ণ মুদ্বংস্থন্' শ্লোক হইতে ব্যাখ্যা আরম্ভ করি। ইহার মধ্যে 'অশিতেন কিরেত, ন তু কৃতা সতী অর্পোত'—ভক্তিবাদের এই প্রাণকথা আলোচনা হয়।...আমি ও মালতী হাঁটিয়া আকিসে আসি। অন্না একটি কমলা দিয়াছিল, সেটী দুইজনে খাইতে খাইতে আসি। আফিসে কিছু পরেই নীহার আসে। সে এই সপ্তাহে ব্রহ্মসূত্রের টাকা দিতে পারিবে, আশা করে।... যখনবাবু আসেন।...অঠের একটা গোলমালে...পুলিশ আনিয়াছিল।...মীমাংসায় পথ কি পুলিশ ডাকিয়া?

৬ই জানুয়ারী

সকালে ঘুম ভাঙিতেই দেখি কোমরের ব্যথাটা বেশ বাড়িয়াছে। ৪-১৫-তে আলোচনা সুরু হয়—শ্রীমদ্ভগবত-গীতা। খগেন্দ্রবাবু, চন্দ্রশেখরবাবু, ধীরেন মজুমদার, আরও ৫।৬ জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা ভাল হইয়াছে। দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার হইতে গত তিন বৎসরের উজ্জ্বলতারত নিবে

৭ই জানুয়ারী

আমি কেমন আছি জানিবার জন্য রেণু সকালে আসে।...৩টায় পর বিভা সরকার ও প্রতিভা আসে। বিভা সরকারের সঙ্গে ধর্ষিতা নারীদের কেন ঘরে নেওয়া সম্ভবপর হইবে না, কেমন করিয়া রামের বারবার অগ্নি পরীক্ষার প্রতিবাদে সীতা পাতাল প্রবেশ করিলেন তাহার আলোচনা হয়। সে তাহার লেখা 'রামের ব্যথা' শীর্ষক কবিতা পড়িয়া শুনায়। আবার আসিবে, বলিয়া গেল।... রেণু ১টার পর কলিকাতা যায়। মোহিত মজুমদারের বক্তৃতা শোনে। জসিমুদ্দিনের সঙ্গে পরিচিত হয় সুধাংশু-বাবুর মারফত। কাল ভোরে ৭॥ টায় তাহার নিকট সুধাংশুবাবু সহ গিয়া কবিতা নিয়া আসিবে। হেরম্ববাবু আসে; সে সিটি কলেজের সরস্বতী পূজার গোলমালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরোধ হইয়াছিল তাহার কাহিনী বলে। শান্তিনিকেতনে যে টাকা খরচ হয়, তাহাদ্বারা ২টী জিলায় জনশিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারে বলিল।...

৮ই জানুয়ারী

ক্রমশঃ

শান্তি ও সমন্বয়

॥ শ্রীক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী ॥

"ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবা শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তি, সা মা শান্তিরেধি॥" আমাদের বিশ্ব শান্তিদায়িনী হোক। দ্যুলোক অন্তরীক্ষ ও পৃথ্বীলোক শান্তিপূর্ণ হোক। বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক, এবং সেই শান্তি আমাদের সবার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হোক। এই বেদ বাক্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে সর্ব মানবের শান্তি ও কল্যাণের শাশ্বত বাণী, সমন্বয় সাধনের বীজ মন্ত্র।

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশোর্ধ পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আজ প্রাচ্য ভূখণ্ডবাসীর আত্মা অন্বেষণ করছে সেই শান্তি, সেই সমন্বয় যে বস্তু মানুষকে আজ রক্ষা করবে মৃত্যু ও ধ্বংসের উদ্যত আক্রমণ থেকে, মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবে সাম্য মৈত্রী ও প্রেম।

কিন্তু কোথায় আজ সেই সাম্য, মৈত্রী ও প্রেম? শান্তি ও সমন্বয় সাধনের মহৎ প্রচেষ্টা? কোথায় সেই যুগ-শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম যিনি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য ও রামকৃষ্ণদেবের মত নেমে আসবেন মানুষের মধ্যে, পঙ্কা লোভ গ্লানি ও অপমৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য? আপন অন্তরের পবিত্রতায় নির্মল, শুচিস্নিগ্ধ ও প্রেমময় করে তুলবেন সমস্ত মানুষের মন? ভ্রাতৃত্বের মধুর মমত্ব ডোরে আবদ্ধ হবে সমস্ত বিশ্ববাসী। কোথায় সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ যার বজ্র নিনাদে মানুষের আসুরী অসূয়ার মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হবে চিরতরে। আদর্শ আজ মানুষের কাছে ইতিহাস পুরাতত্ত্বের ফসিল, অথবা নিশীথের স্বপ্ন রূপে পরিণত। তাই আজ তার জীবনে নেমে এসেছে এই দুর্যোগের ঘনঘটা, ধ্বংসের ধূম্রাকীর্ণ অন্ধকার, পারস্পরিক বিদ্বেষ অশান্তি। ইজ্জা, অনিজ্জা, নীতি দুর্নীতির কোনও প্রশ্ন নেই এখানে। সকলেই অসহায় ভাবে ভেসে চলেছে সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণ-প্রবাহে। বর্তমানের এই জীবন-চর্য্যায় প্রমত্ততায় সবই আছে—শক্তি, ঐশ্বর্য, অহঙ্কার, কিন্তু নেই শুধু মানবিকতা, নেই প্রেম, সমন্বয় আর শান্তি; নেই ধী, শ্রী, আর সহিষ্ণুতা বোধ।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল, পরপর দুইটি বিশ্ব-যুদ্ধ মানুষের সমস্ত নীতির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ অধিক মাত্রায় ক্ষমতাগর্বী ও ঐশ্বর্যবান হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তার ফলে সমস্ত পৃথিবীকে তারা মানসিকতার অধঃপতনের মধ্যে দিয়ে তিক্ততে পরিণত করেছে। আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের জন্য পৃথিবীর ক্ষমতা-গর্বী রাষ্ট্রনায়করা রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্বাদে স্ফীত বক্ষে তারা পরস্পর পরস্পরকে শক্তি-যুদ্ধে আহ্বান করছেন। প্রবীণ বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কদের কি স্মৃতি-বিভ্রম ঘটেছে? বিজ্ঞান কি তাঁদের হাতের ক্রীড়নক? পরস্পর দুটি মহাযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস সত্যই কি তাঁদের স্মৃতি-বহির্ভূত হয়েছে? বিশেষতঃ নাগাসাকী ও হিরোসিমার সর্বনাশা বিধ্বংসী লীলা, মনুষ্যত্বের চরম অধঃপতন, এ কি সত্য মুছে মানুষ কোনও দিন বিস্মৃত হতে পারবে? কখনও নয়। যুগে যুগে ইতিহাস বয়ে বেড়াবে তার রক্তাক্ত সাক্ষ্য।—আশ্চর্য, এখনও তাঁদের সমর-তৃষ্ণার অপনোদন ঘটেনি। অথচ বিশ্ব-শান্তি আন্দোলনে এঁরাই এসে দাঁড়ান সকলের পুরোভাগে। প্রহসন পৃথিবীতে আর কতদিন চলবে?

পশ্চিমী জনসমাজ সকলেই যে যুদ্ধ পছন্দ করেন একথা মোটেই সত্য নয়। বরং বেশীর ভাগ মানুষই বিশেষতঃ সাধারণ মানুষরা কেউই যুদ্ধ চান না। প্রখ্যাত দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেল এই যুদ্ধ ও আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করণের কথা বলার জন্য লণ্ডনে কারাবরণ

পর্যন্ত করেছেন। বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে নিয়োগ না করে কল্যাণের কর্মে নিয়োগ করার জন্য আবেদন করেছিলেন। এখনও অনেকে প্রত্যহ গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন—যুদ্ধের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য। এ প্রার্থনা সমস্ত মানুষের প্রাণের প্রার্থনা, সর্ব দেশীয় শান্তির প্রার্থনা, সামাজিক সমন্বয়তার প্রার্থনা।

শক্তি-গর্বী সভ্য মানুষ আজ স্বধর্মচ্যুত, তাই আজ তার চতুষ্পার্শ্বে এত অশান্তি। মনে পড়ে মহাভারতের কথা—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্যোধন যখন জননীকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্ব ভিক্ষা করেছিলেন তখন রাজমাতা গান্ধারী বলেছিলেন, "যথা ধর্ম, তথা জয়, তত দুর্যোধন।" বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "ধর্ম আত্মপীড়ন নহে, আপনার উন্নতি সাধন, আপনার আনন্দ বর্ধনই ধর্ম; ঈশ্বরে ভক্তি মস্তকে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম"।

বাস্তবিক, আজকের মানুষ পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করে না, ভালোবাসে না। উপরন্তু প্রতিবেশীর প্রতি মনে বিদ্বেষ পোষণ করে। এই বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, ও মায়া-মমতা শূন্যতা ধীরে ধীরে মানুষকে পরিণত করছে যন্ত্রে। যার ফলে তার চিত্তের সমস্ত সুকোমল বৃত্তিগুলি অকালে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই বিনষ্টির হাত হতে রক্ষা পেতে হলে সমস্ত সভ্য জগৎকে আজ মুহূর্তের জন্য অন্তর্দৃষ্টিনতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বর চিন্তাকে আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে নিজের জীবনের সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে তাঁকে রূপ দিতে হবে। মুহূর্তের উপলব্ধি-বোধ চিত্তের সমস্ত জড়তা ও তমসা নাশক, অন্তরে শুভ বুদ্ধির উদ্বোধক। বিশেষ করে ভগবান পরম প্রেমিক। তিনি যার অন্তরে বিরাজমান, তার দুনিয়ায় কোনও শত্রু নেই। আপন পর তার প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। প্রেমই ধর্মের আত্মা। মঠে মন্দিরে না গিয়েও মানুষ যদি পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিদ্বেষ ভুলে আন্তরিকতার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অন্তরের বাণী বিনিময় করে, তাহলে প্রাণে প্রাণে সেই মিলনের মধ্যেই এসে মিলিত হবে আত্মার মহৎ সত্তা। সেখানেই হবে সত্যের পরম প্রকাশ। এই পারস্পরিক সহৃদয়তার মধ্যেই স্থাপী হবে মনের মিল। মানসিক ও মানবিক শান্তির পরিধি বিস্তৃত হয়ে সামাজিক সমন্বয় সাধনে সফল হবে। আজকের মানুষ একটু ক্ষণের জন্যও যদি নিজের অন্তরের গভীরের বাণী শুনতে চায় তবে শুনবে সেখানে এই সত্যই ধ্বনিত হচ্ছে। মানুষ তার বুদ্ধিকে যদি হৃদয়-ধর্মের সঙ্গে সমন্বিত করতে পারে তবে তার সাফল্য সুনিশ্চিত। আজকের দিনে এই শান্তি ও সমন্বয় সাধনের প্রার্থনাই সকলের জীবনের শ্রেষ্ঠ ও মহৎ প্রার্থনা হোক।

'...এতদিনের ব্যবস্থায় মেয়েদের সব determination-এর ভার পুরুষের উপর ছিল। কোনও self-determination মেয়েদের ছিল না। প্রকৃতির সব কিছুর নিয়ামক পুরুষ, পুরুষের কোনও নিয়ামক নাই—ইহাই প্রচলিত শাস্ত্র-ব্যবস্থা। ইহার ফলে পুরুষ খুব privileged class—মেয়েরা unprivileged। তাই সুরু হইয়াছে দুইদলে class-war। দার্শনিক চতুরতার ফলে মেয়েরা বুঝিতেই পারে নাই যে তাহারা unprivileged। এই দেখনা ব্রাহ্মণের স্ত্রীরা পর্যন্ত নারায়ণ সেবার অধিকারিণী নন। পুরুষের সমকক্ষায় নারীকে রাখিয়া সমাজ গড়িয়া তুলিবার সাহস এতদিন কোনও পুরুষের ছিল না। প্রকৃতিকে কোণঠেসা করিয়া রাখিয়া, পুরুষের সত্তায় মেয়েদের merge করিয়াই এতদিন সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে। মেয়েরাও ইহা হাসিমুখে শাস্ত্রব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লইয়া 'বেশ' চলিয়াছেন।...'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

মহাকাল

॥ শ্রীবিশ্বনাথ সাহা ॥

মরণকে আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ওগো মৃত্যু! সেই লগ্নে নির্জন শয়ন প্রান্তে এসো ঘর বেঁধে, আমার পরাণ বঁধু ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া—বহু ভালবেসে।" এই আহ্বান যেন প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমিকার মিলিবার আনন্দ। তিনি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পথ চেয়ে বসে আছেন। মৃত্যুর সহজ সরল রূপকে ভাষার অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুলে তিনি বলেছেন, সে যেন বীরবেশে বরের সাজে এগিয়ে আসছে, আর তিনি যেন নব বঁধুবেশে তার প্রতীক্ষায় কালগুণে বসে আছেন। এই মহামিলনটি দেখার জন্যে উন্মনা পৃথিবী উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে। একদিন যে ধরিত্রী তাকে প্রথম আলো দেখাল, তারই বুকে আবার একদিন তার সমস্ত বোধসত্তা নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাবে। থেমে যাবে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা। সেই অশান্ত সমুদ্রে ঝড় আর উঠবে না। নিভে যাবে পৃথিবীর আলো।

মৃত্যু সম্বন্ধে মাধুর্যপূর্ণ সংজ্ঞা বোধহয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। কবির হৃদয়ে কত সুন্দর আর কত নির্মল আনন্দ প্রাণবীণায় তারে তারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে, কেননা তিনি সেই ডাক শুনতে পেয়েছিলেন। সেই ডাক যেন তরীতে পারে যাবার ডাক। আর এই যে প্রতীক্ষা—যেন প্রেমাস্পদের আগমন প্রতীক্ষা। হৃদয়ের তানপুরায় তার যেন আগমন সুর ধ্বনিত হচ্ছে। পায়ে যেন তার নূপুর নিক্কন বেজে উঠছে।

আবার কখনও মৃত্যুর সেই কালো ভয়ানকরূপ যেন আমাদের সামনে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে। মানুষ মরণশীল বটে, কিন্তু কালের নিরব কালোরূপ মানুষের মনে গভীর ত্রাসের সঞ্চার করে বলেই মানুষ মরতে ভয় পায়। তবে জন্মান্তরবাদ যদি সত্য হয় আর মানুষ যদি অবিনশ্বর হয়, তাহলে মৃত্যু নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর, বিভীষণ ও ভয়াল। মৃত্যু ভয়াল না হয়ে যদি সুন্দর হত, তাহলে মানুষ মরতে ভয় পেত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"। রবীন্দ্রনাথ মরণকে সুন্দর রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এ কথা বলতে পেরেছেন। সুন্দরের কবি না হলে তিনি একথা বলতে পারতেন না। তিনি বলছেন; "অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই, নিভে যাই, মরে যাই অসীম সুদূরে—বিন্দু হতে সিন্ধু হয়ে মিলায়ে মিলায়ে যাই, অনন্তের সুদূর সুদূরে।" কিন্তু মহাকাল কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। আমরা সকলে যেন তার শিকার। কখন যে এসে সে নিয়ে যাবে; মানুষ থেকে ক্ষুদ্র জীবজন্তু পর্যন্তও জানে না। প্রতিটি পল, মাস, বর্ষ কালের করতলগত। সমস্ত মানুষ ও জীবজন্তু তার পিছনে ছুটে চলেছে। কালবৈশাখীর কালঝড়ের আবর্তে পড়ে কেউ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, কেউ পঙ্গু, কেউ বা অর্ধমৃত। কালের এই লীলারঙ্গ লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন; "পলকে আলোকে তুলিছ—পলকে আঁধারে নিতেছ টানি।"

সেই কাল যেন একটা কালকেউটে সাপের মত ফণা বিস্তার করে এগিয়ে আসছে। কখন যে মানুষ তার 'কাল' বিষে জর্জরিত হবে, সেই ভয়ে সকলে চমকে উঠছে। কিন্তু তার পথরোধ করার সাহস কারও নেই। "কালের কবলেই জীবন—কালের কবলেই মৃত্যু। অতএব তাকে বাদ দিয়ে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করা যায় না। কাল ডাকে। মানুষ ও জীব সেই ডাকে ছুটে যায়।

আবার কাল যেন একটা ছোট সাম্পান তরী। নানা রকম সুখ-দুঃখের পণ্য সম্ভারে তরীখানি সাজিয়ে নিয়ে চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। যুগ যুগ ধরে ভর্ ভর্ করে বেয়ে চলে। বিকিকিনির হাটে বিকিয়ে দিয়ে যায় তার দুঃখ সুখের

পথসম্বল। তাই বিরাম বিহীন অনন্তকালের যাত্রা। এই বিরামহীন মহাকাল মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে উর্নাভের জাল বোনে। কেউ ফেলে আসা জীবনের কতগুলি গাঁথা স্মৃতি রোমন্থন করে আনন্দ পায়, কেউ বা দুঃখবোধ ক'রে হারানো দিনে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সেই অনন্তকাল আর থামে না। তাই বলেছেন, "কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও? তারি রথ নিত্যই উধাও"। কাল আলোকবর্তিকা, আর আমরা যেন অন্ধ পথিক। কাল পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ সেই পথ লক্ষ্য করে চলে। কাল শন্ শন্ শব্দে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার তরী। সে পিছন ফিরেও তাকায় না। কেউ নামে, কেউ উঠে, আবার কেউ বা অপেক্ষা করে। কাল তাই দেখে মিশ-মিশে কালো দাঁত বের করে হাসে। "কালের করাল হাসি, ভয়কে হাসিনী রাশি"।

সেই দানবরূপী কালকে দেখে মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠে। কাল তখন যাত্রীকে অভয় দেয়। বলে, এখানে প্রেম ও শান্তি আছে। তাই সে কারও কথা না শুনে তাল মেপে সকলের কাছে ছুটে যায়। এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে তার সাজান তরীখানি ভাসিয়ে দেয় সুরে, বহু দূরে।

'ঋষিদের বর্ণাশ্রম ও কৃষ্ণের বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নোতুন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যে অর্থ ঋষিরা দিয়াছেন, কৃষ্ণের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। কৃষ্ণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকে আবার পূর্বের খাতে প্রবাহিত করাইয়া তাঁহার সমস্ত কার্য্যকে পণ্ড করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইবার পুরুষোত্তম নিত্যগোপাল আসিয়াছেন সেই লুপ্ত পুরুষোত্তমবাদকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে।... মহামুনি পতঞ্জলির অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য, যাহার উপর বর্ত্তমান যুগের চিন্তাপ্রণালী, সমাজ-ব্যবস্থা দাঁড়াইয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে ভিন্ন অর্থে অহিংসা সত্যাদির রূপ দিয়াছেন। বর্ত্তমান materialistic age না আসিলে শ্রীকৃষ্ণের কথা কেহ বুঝিত না। এতদিনের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সব ছিল static, সকল ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া জীবনকে uniform করার দিকে ছিল তাহার লক্ষ্য; পতঞ্জলি যেখানে যোগের অর্থ দিলেন চিত্তবৃত্তিনিরোধ, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দিলেন 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'—কর্ম্মের কৌশলই যোগ—দুয়ের অর্থে কি তফাৎ। নিউরালজিয়াতে এ্যাসপিরিন খাওয়াইয়া শান্তি দেওয়ার মত, অসহ্য বেদনায় মরফিয়া খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখার মত সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে একটা ক্লোরাফরম্-এর সাধনায় এতদিন চলিয়াছে সব কিছু আধ্যাত্মিক যোগ্যতা। সব ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সজ্ঞান, জীবন্ত রাখিয়া সংযমের উপদেশ আমার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যগোপাল ছাড়া কেউ দেন নাই, কেউ দেন নাই...।'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

বিশ্বকবির বর্ণচ্ছটা

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

আমরা ভারতীয়েরা বিশেষতঃ হিন্দুরা বিশ্বাস করি যে মানুষ মাত্রেই জন্ম হতে ঋণবদ্ধ। কতগুলি ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েই যেন আমাদের জীবনের যাত্রা সুরু হয়, আর সারা জীবনের কর্তব্য সাধনও হচ্ছে সেই ঋণ পরিশোধের প্রয়াস। দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃঋণ—এই ঋণত্রয়ের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। এই ঋণ পরিশোধ না হউক,—কারণ এ ঋণ অপরিশোধ্য—এর স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই জীবনের সুগভীর অর্থের অনুধাবন সম্ভব এবং জীবনকে সার্থক ও সফল করে তোলবার প্রকৃষ্ট উপায়! তাই ত মনীষী হেগেল বলেন Every great man condemns his next generation to the task of understanding and explaining him. হেগেল ঋষি-ঋণের কথাই উল্লেখ করেছেন। আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ ঋষিকবির কথা যখন স্মরণ করি তখন এই স্মরণের মধ্য দিয়ে আমরা চেষ্টা করতে পারি এই কথাটুকুই বুঝতে যে, এই মহামানব, মহাকবি ও মহাশিল্পী—যিনি আমাদের অনেকেরই জীবদ্দশায়—রক্তমাংসের দেহে কিন্তু এক লোকোত্তর প্রতিভা নিয়ে এবং এক অপূর্ব ভাস্বর মহিমায় আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন—তিনি কতভাবে আমাদিগকে ঋণজালে জড়িয়ে রেখে গিয়েছেন। এই ঋণের পরিমাণ অপ্রমেয়, কিন্তু তার সম্যক্ স্বীকৃতি দ্বারাই আমরা সেই বিরাট ও মহান্ উত্তরাধিকার উপভোগের যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। এখন চলেছে রবীন্দ্রনাথের যুগ। আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রতিভার প্রভাব। কিন্তু বিশ্বকর বহুমুখী প্রতিভা সত্ত্বেও কবি হিসেবেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয়। বাল্মীকি, বেদব্যাস, হোমর, ভার্জিল, কালিদাস, সেক্সপীয়র, গোটে প্রমুখ পূর্ব সূরিদের কথা বাদ দিলে বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথই এশিয়া বা প্রাচ্য ভূখণ্ডের একমাত্র কবি যাঁর উদার সৃষ্টি-ভঙ্গীতে সারা পৃথিবী, সব মানুষ এবং এমন কি এই বিশ্ব-চরাচরের মূলগত ঐক্য এমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। অন্য সকলেই খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড। রবীন্দ্রনাথের বাণীর আকৃতি বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন। অন্য সকলেই কিছু না কিছু স্থান কাল দেশ ইত্যাদির প্রভাবে সীমিত। রবীন্দ্রনাথই দেশ-কাল-জাতি নির্বিশেষে বিশ্বাকৃতিময়। তাঁর সৃষ্টি ও অনুভূতির গভীরতা এবং বিস্তার মহাকাশের মতই সীমাহীন—ছোট ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বহু ঊর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর ঘরে জন্মেছিলেন—বাঙালী মাত্রেই তাই সৌভাগ্যবান। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা যত সহজে রবীন্দ্র-কাব্যের অমৃতসাগরে সন্তরণ করতে পারি অন্যের পক্ষে ততটা সহজ নয়। এ যেন আমাদের জন্মগত, সহজাত অধিকার। অন্য ভাষাভাষীরা যে সাগরের উপকূলে দু'চারটা উপলখণ্ড মাত্র কুড়িয়ে বেড়ায়, আমরা সহজেই সে সাগরে অবগাহন ও সন্তরণে অধিকারী। ইংরেজ জাতের কাছে সেক্সপীয়রের কাব্য তাঁদের নিজস্ব সম্পদ, ফরাসী জাতির জন্য তোলা আছে ভিক্টর হুগোর সাহিত্যিক অবদান, জার্মান জাতি দাবী করেছে মহাকবি গোটের উত্তরাধিকার। তেমনি রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম সম্পদ, গর্বের ধন।

"মহাকবি দান্তে ইতালীর একটা নগণ্য প্রাদেশিক ভাষাকে (ল্যাটিন) বিশ্বভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভারতের প্রান্তদেশীয় বাংলাভাষাকেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সমাসীন করালেন মহিমার আসনে। এ কত বড়ো কৃতিত্ব! সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নেই যা রবীন্দ্রনাথের রচনায় সমৃদ্ধ হয় নাই। এমন সর্বতোমুখী কৃতিত্বের তুলনা কোথাও নেই। তবে একথাও সত্য যে, তাঁর যে কোন রচনা মূল্যবান

হলেও তাঁর অতুলনীয়তা হচ্ছে গীতিকাব্যে।

"আমি নাহয় মহাকাব্য সংরচনে
ছিল মনে,
হঠাৎ টেকি তোমার তাঁতন তিতীনীতে
কল্পনাটি গেল কাটি হাজার গীতে"।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চাইতে অধিকতর মনোজ্ঞ উপন্যাস বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় আছে—নাটক কোটি গল্প এবং প্রবন্ধে তাঁর সমকক্ষ এমন কি শ্রেষ্ঠতর লেখকের কথাও আমাদের অজানা নেই। কিন্তু তিনি বিশেষ গীতি-কবিদের অবিসম্বাদী রাজা। এক্ষেত্রে তিনি অনন্য ও অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতাসংখ্যা এক হাজার। সেক্সপীয়রের নাটক সম্বন্ধে উক্তি আছে: Quantity of Quality—উৎকর্ষের পরিমাণ, অর্থাৎ এতগুলি উৎকৃষ্ট নাটক একজনের লেখনী হতে উদ্ভূত হয়েছে! রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য সম্বন্ধেও ঐ কথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। কাব্যের যে প্রধান ধর্ম বা গুণ রসসৃষ্টি—তা মূর্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের রচনার ছত্রে ছত্রে। আর কবিকে বুঝতে হলে এবং উপভোগ করতে হলে Wordsworth-এর কথায়—

"You must love him ere to you
He will seem worthy of your love."
It murders to dissect.

"আজ কোন কাজ নয় আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে শুধু নীরবে ভূঞ্জন।"

এই ভাব নিয়ে কবিকে উপভোগ করবার চেষ্টা করলে সেই অমৃতের আস্বাদন লাভ করা যায়। বুদ্ধি দিয়ে রসের বিচার হয় না।

কথা, ধ্বনি ও ভাব-ব্যঞ্জনার অপূর্ব সম্মেলন ঘটেছে রবীন্দ্র-কাব্যে। যেন মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি। ইংরাজী কাব্যে যাঁরা রোমান্টিক বা গীতি-কবি নামে সর্বাধিক খ্যাত—Byron, Shelley, Keats—এঁদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যই একীভূত হয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যে। বায়রণের আবেগ-প্রবণতা, শেলীর ভাব-বিহ্বলতা এবং কীটসের স্নিগ্ধ, নিবিড় সৌন্দর্যানুভূতি যুক্ত হয়েছে যেন এক ত্রিবেণী সঙ্গমে। প্রাচীন ঋষি কবির উদাত্ত মন্ত্র, মধ্যযুগীয় মরমী কবিকুলের মর্মবাণী, বৈষ্ণব পদকর্তাগণের দেহাতীত প্রেম-ভক্তি, এবং আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের রস সব কিছুর মহাসম্মেলন ঘটেছে রবীন্দ্র-কাব্যে। শ্রেষ্ঠ কাব্যের যে মন্ত্রশক্তি—অর্থাৎ যা শ্রবণে বা উচ্চারণে চিত্তকে মোহিত করে—যার মানে বুঝবার পূর্বেই হৃদয়ের দুয়ারে ঘা দিয়ে তাকে মুগ্ধ করে দেয়, যেখানে কথা, অর্থ এবং ছন্দের নিবিড় মিলন ঘটেছে—সেই অপূর্ব, অনুকরণীয় সৃষ্টি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতা। দু' একটি অতি সাধারণ নমুনা:—উপমাহীন অনলঙ্কার অথচ কী সুন্দর কথার মালা—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।

সহজ, সরল অনাড়ম্বর ভাষায় যেন পরাকাষ্ঠা। এরই সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়—

স্নিগ্ধ সজল মেঘ-কজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।

অন্ত্যপ্রাসের ধ্বনিময়তার এক অনবদ্য নিদর্শন! রবীন্দ্র-কাব্যের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি আকীর্ণ হয়ে আছে অসংখ্য মণি মুক্তায়। এ মণিহার রবীন্দ্রনাথকেই শুধু সাজে।

গীতিকাব্য ও গান—রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান, যার সম্যক্ মূল্যায়ন আজ হচ্ছে এবং শত শত বৎসর ধরেও চলতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান কীর্তি দু' হাজার গান। আর শুধু গান রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। প্রতিটি গানের তিনিই সুরকার। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার মূল কারণ সুর ও কথার ঐকতানে। কথা ও সুর, ভাব ও ছন্দ, ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার এমন অপরূপ মিলন কুত্রাপি দেখা যায় না। ইংরাজী ভাষায় অনেক সঙ্গীত-রচয়িতার (composer) রেকর্ড হচ্ছে ৬০০টি গান। কিন্তু রচয়িতা সে গানের সুর বেঁধে যেন নি—গান রচনা করেই তাঁর কাজ সমাপ্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সে রেকর্ডকে ম্লান করেছেন ২০০০ হাজার গান রচনা করে, এবং তার প্রতিটির সুর দিয়ে। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গীত-জীবন প্রবন্ধে সুরপ্রধান ভারতীয় ক্লাসিক্যাল

সঙ্গীতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ওস্তাদি কালোয়াতি গানে কথা ও সুরের মধ্যে সম্পর্কটা অতীব গৌণ। কথা সেখানে গানের আধেয়র মাত্র। ছিন্ন চার ঘণ্টা কিম্বা তারও অধিক সময় সুরের নানা খেলা চলল। জটিল সুরের জাল বুনা হচ্ছে—কণ্ঠে খেলিছে সাতটি সুর সাতটি যেন সোনা পাখী। কিন্তু যে কয়টি কথাকে অবলম্বন করে সুরের এই জটিলতা ও কেরামতি দেখান হল—তা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর ও প্রায় অর্থবিহীন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা ও সুর পরস্পরের বাহক, পোষক ও সম্পূরক। কথাকে ছেড়ে সুরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তেমি ঐ কথায় ঐ সুর ছাড়া অন্য সুর হবে অচল। তাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর অন্য গানে যোজনা করা অপপ্রয়াস মাত্র। আবার রবীন্দ্র-সঙ্গীত অন্য সুরে গাওয়ার চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কথা ও সুরের হরগৌরী মিলন হচ্ছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

দু' হাজার গানের উপজীব্য ভাব ও অর্থের বৈচিত্র্য অভাবনীয়রূপে বিস্ময়কর। মানুষের প্রতিটি ভাব, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও আকুতির মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। আমরা আনন্দের দিনে, শুভানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করি, শোকে দুঃখে সান্ত্বনা খুঁজি রবীন্দ্রনাথের গানে, জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠে রবীন্দ্রনাথের গানের অনুপ্রেরণায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতর দিয়া সসীম মানুষ অসীমের সন্ধানে ব্যাকুল হয়। মানুষের চিত্ত কখনো আশা-আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হয়ে উঠে, কখনো আবার বেদনাময় রিক্ততায় হাহাকার জেগে উঠে। জগতের সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাসে এত বড় বিস্ময়কর অবদান আর দ্বিতীয়টি নেই। বড়ঋতু নিয়ে আসে তার নানা রূপময় গন্ধস্পর্শের সম্ভার। সোনালী সূর্যোদয় ও রক্তরাঙা সূর্যাস্ত, রৌদ্রদগ্ধ মধ্যদিন, জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী, এই সমুদ্র ধ্বনিত পৃথ্বী, ঐ নিস্তব্ধ গিরিবর—প্রকৃতির প্রতিটি রূপ ও মূড (খেয়াল) বিধৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে। এই যে এই মুহূর্তে আমরা এই আনন্দানুষ্ঠানে সমবেত আছি—এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ কেমন সুন্দর ভাবেই না রবীন্দ্রনাথের কথায় বর্ণিত হতে পারে—

> রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়
> তরুমর্মর ছায়ার খেলায়,
> কী মূরতি তব নীলাকাশপায়ী
> নয়নে উঠে গো আভাসি।

কথার যেন মায়াজাল। কী অনুপম সৃষ্টি, কি সুন্দর ভাব-ব্যঞ্জনা!

মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নাকি পাণ্ডিত্যের দিক্‌পাল কবি ছিলেন দিঙ্‌নাগাচার্য। শুধু কাঠং ভিত্তিত্যাগ্রে—বলেছিলেন এই গুরুগম্ভীর পণ্ডিত। আর কথার যাদুকর কালিদাস এই কথাটাই বহুগুণে সুন্দর করে বলেছিলেন: নীরসঃ তরুবরঃ পুরত ভাতি। রবীন্দ্রনাথ সেই কথার যাদুকর। যেন কোন্ মন্ত্রবলে বাক্ সরস্বতী নিজে এসে ধরা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের রচনায়, বিশেষ করে তাঁর কবিতায় ও গানে।

তরুণ বয়সে কবিকে থাকতে হয়েছিল নাগরিক কোলাহল ও জনতার ভীড়ের বহু দূরে শান্ত, নির্জন পল্লী পরিবেশে। এই সময়টাকে বলা যায় রবীন্দ্র-কাব্য জীবনের সব চাইতে বড় ফলন্ত কাল। এই সময়টাতেই পদ্মার তীরে কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য ও গল্প গ্রন্থগুলি লিখিত হয়। স্নিগ্ধ প্রকৃতির কোলে, সুকোমল পল্লী পরিবেশে, নিরুদ্বেগ মন্দাক্রান্তা তালে জীবন-তরী ভাসিয়ে দেওয়ার বাধা কি?—এই ত আদর্শ কবি-জীবন! কবি প্রকৃতির উপাসক, কিন্তু তাই বলে নিশ্চল স্থাণুত্ব তাঁর স্বভাবের বাইরে। কবি যে চিরচঞ্চল। বারংবার তাই নিজেকে কোন একটা নির্দিষ্ট অবস্থার পরিসীমায় আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। অন্তরের তাগিদে নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন নূতন নব নব ক্ষেত্রে নূতন অভিজ্ঞতার মাঝে। সার্থকতার সন্ধান করেছেন নূতন নূতন পথে। নূতনের অভিযান অব্যাহত চলেছে সারা জীবন ভোর। তাইতো দেখি সত্তর বৎসরে কবি নূতন করে চিত্রশিল্পীর সাধনায় মগ্ন হলেন। আর জন্মসিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় অনায়াসেই লাভ করলেন অভাবনীয় সাফল্য।

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী"—এই একটি পঙ্‌ক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্র চরিত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। অন্তরে অন্তরে তিনি অহরহ অনুভব করতেন নানা কাজের আহ্বান, আর সেই আহ্বানে সাড়া দেওয়াই ছিল তাঁর স্বভাব। কবি-চিত্তের এই চিরচঞ্চলতা তাঁকে প্রবৃত্ত করেছে নব নব কর্ম সাধনায়। তাইত তাঁর জীবন এত বিস্তৃত, বিচিত্র এবং বর্ণাঢ্য।

একদিন পল্লীজীবনের স্বপ্নময় শ্যামচ্ছায়া দিনগুলিকে পিছনে ফেলে কবি চলে এলেন শান্তিনিকেতনের রুক্ষ, উষর কঙ্করময় প্রান্তে। শুরু হল নূতন জীবন, নূতন পরীক্ষা। নিজের স্কুল জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আর নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের সমস্যা কবিকে প্রবৃত্ত করল ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়—যার ফলশ্রুতি হচ্ছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। যে মামুলী স্কুল-ব্যবস্থা বালক রবীন্দ্রনাথকে স্কুল-বিমুখ করেছিল, সে স্কুল বা শিক্ষা ব্যবস্থার নবরূপায়ণেই তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন পরবর্তী জীবনে। স্কুলের প্রাণহীন যান্ত্রিক নিয়মশৃঙ্খলা এবং নিরানন্দময় পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণ চিত্তকে গভীর ভাবে ব্যথিত করেছিল।

"The backward boy in the School is often the forward member of the Society, because the School very often stands with its back to the Society. এই কথা কয়টি অক্ষরে অক্ষরে সত্য রবীন্দ্রনাথের বেলায়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাকে যে আমাদের মামুলী স্কুল আকর্ষণ করতে পারে নি—সেটা স্কুলের অক্ষমতা বা ব্যর্থতা। কোন সৃজনধর্মী, অনুভূতিশীল বালকই স্কুলের প্রাণহীন একঘেঁয়েমিতে আনন্দ পায় না। রবীন্দ্রনাথও পান নি। নিজের স্কুল-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার থেকে তিনি মর্মে মর্মে আমাদের গতানুগতিক পুঁথি-প্রধান, পরীক্ষা-সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি উপলব্ধি করেছিলেন, এবং তাই তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের মধ্য দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তুলতে। বই পড়া বিদ্যাটাই শিক্ষার সব চাইতে বড় কথা নয়। সঙ্গীত, নাটকাভিনয়, চিত্র-বিদ্যা, প্রকৃতি-পরিচয়, পল্লীসেবা এবং সর্বোপরি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ছাত্রের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়ে উঠবে, এই ছিল তাঁর শিক্ষা-ধারার মূল উদ্দেশ্য। তত্ত্বের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সার্থকতা নির্দেশ করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতার মধ্যে। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য নিহিত আছে উপনিষদের বাণীতে—

"শান্তং শিবং অদ্বৈতম্"।

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

শিক্ষা-দার্শনিক ও শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অবদান বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। শিক্ষা যদি মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ প্রস্ফুরণের সাহায্যই না করল তবে সে শিক্ষার মূল্য কতটুকু? তাইত রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্যাভিনয় ইত্যাদির সঙ্গে সামাজিক-শিক্ষণ এবং প্রতিবেশী পল্লী-সমাজের সেবাকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

'মানুষের কাছে যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।'

—রবীন্দ্রনাথ

সাময়িকী

নয়নারায়ণ আশ্রম সংবাদ ঃ নয়নারায়ণ আশ্রম তথা উচ্চলতারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন প্রত্যেকে জানেন যে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিন নয়নারায়ণ আশ্রমে নয়নারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ কর্তৃক একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। স্কুলটী অবৈতনিক। বর্ত্তমান বৎসরের ভর্ত্তির সময় পার হইয়া গেলে আমাদের ইস্কুল খোলার সিদ্ধান্ত হয় এবং ইস্কুল খোলা হয়। সেইজন্য ছাত্রসংখ্যা একটু কম হইলেও মার্চের শেষে ৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি হইয়াছে। আশ্রমের ছেলেমেয়েরাই বুনিয়াদীর নিয়মকানুন সাধ্যমত অনুসরণ করিয়া ইস্কুলের কাজ চালাইয়া যাইতে ছিলেন। স্কুলটী ২০শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। সরকার বিদ্যালয় গৃহের জন্য ১২,৮১৪৲ টাকা এবং শিক্ষকদের আবাস গৃহের জন্য ৬,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। স্কুল ঘরের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু সরকারী আইন অনুযায়ী বুনিয়ার বেসিক ট্রেণিং প্রাপ্ত না হইলে মাহিয়ানা পাওয়া যায় না, সেইজন্য আশ্রমের ছেলেমেয়েরা মাহিয়ানা পায় নাই। গ্রীষ্মের ছুটির পরে বাহিরের দুইজন ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষিকা (একজন ১৯. ৬. ৬২ আর একজন ১. ৭. ৬২-তে) ইস্কুলে যোগ দিয়াছেন এবং জুলাই হইতে আশ্রমের দুইজন শিক্ষককে এক বৎসরের জন্য ট্রেনিং-এ পাঠানো হইতেছে। এই দুইজনের বদলে আর দুইজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে অস্থায়ীভাবে রাখিয়া কাজ চালাইতে হইবে। সরকারী সাহায্য আমরা এক বৎসর পর্যন্ত পুরাপুরি লইতে সক্ষম হইলাম না বলিয়া আরও এক বৎসর পর্যন্ত স্কুলটী চালাইয়া যাইতে আমাদের বেশ খিছুটা খেসা পাইতে হইবে। এজন্য নয়নারায়ণ আশ্রম ও উচ্চলতারতের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রত্যেকের নিকট আমাদের বিশেষ আবেদন এই যে, তাঁহারা যে যাহা পারেন এককালীন বা মাসিক আমাদের কিছু সাহায্য করিলে আমরা এক বৎসরের এই বিপর্য্যয়টা উৎরাইতে পারিতাম। একটা শিশু-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিতে ও বাড়াইয়া তুলিতে আমরা সকলের নিকট হইতেই সাহায্য পাইব, এই ভরসা লইয়াই আমরা এই দুর্যোগের পথে চলিতেছি। বেসিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকায় আমরা স্কুলের কোন কনষ্টিটিউয়েন্সীর খরচও সরকার হইতে এ পর্যন্ত পাই নাই। তাই সকলের সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বিগত ছয় বৎসর হয় নয়নারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ পরি-চালিত মহিলা শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রটীর পাঠ্যসূচী পরিবর্ত্তিত করিয়া সম্প্রতি সম্প্রসারিত করা হইয়াছে এবং দুই বৎসরান্তে পরীক্ষা প্রদানের পর শিক্ষা সমাপ্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিভাগে এই জুন মাসে ১৮ জন ছাত্রী আছে। গত বৎসর লেডী ব্র্যাবোর্ণ ডিপ্লোমা কোর্সের প্রাথমিক পরীক্ষা দুইজন পাশ করিয়াছে। এবৎসর প্রাথমিক বিভাগে ৭ জন, মাধ্যমিকে ২ জন ছাত্রী রহিয়াছে।

নয়নারায়ণ গ্রন্থাগারের কাজও মোটামুটি সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে। মে মাসের শেষে পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৯৯০, বাড়ীতে বই লইয়া যায় এমন সভ্য সংখ্যা ছিল ৯৭, সাপ্তাহিক মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা সংখ্যা ছিল ৩৮, দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ৩, গ্রন্থাগারে বসিয়া পড়িয়া যায় এমন দৈনিক পাঠকের সংখ্যা মে মাসে গড়ে ১৬'৩১, সারা মে মাসে গল্প উপন্যাস বই সভ্যরা নিয়াছে ১৪০ খানা, আর গল্প উপন্যাস ছাড়া অন্য বই নিয়াছে ২২৯ খানা। নয়নারায়ণ গ্রন্থাগার মোটামুটি ভালই কাজ করিতেছে। তবে একথা সঙ্গে সঙ্গে সত্য এবং সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকিলেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, আরও ভাল কাজ করা উচিত। আমরা সকলের সহযোগিতায় আরও খানিকটা দ্রুত

অগ্রগতি যাহাতে করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব।

নয়নারায়ণ বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীসংখ্যা রিফিউজী ক্যাম্পগুলি উঠিয়া যাইবার পর কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে ছাত্রীসংখ্যা ২১।

এই সেল আশ্রমের সমাজসেবামূলক কাজগুলির কথা। ইহার অপর দিক আশ্রম-দেবতা শ্রীনিতাগোপালদেবের সেবাপূজা প্রতিদিন নিয়মিত হইতেছে। সেই সঙ্গে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সেবাপূজাও নিয়মিত হইতেছে। আশ্রমের মুখপত্র উদ্বোধন প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু উদ্বোধনের বিজ্ঞাপন ও গ্রাহক সংখ্যা বাড়ান বিশেষ প্রয়োজন। লোকাভাবে ইহা সম্ভব হইতেছে না, অথচ আশ্রমের খরচ ও প্রতিষ্ঠা অনেকখানিই নির্ভর করে ইহার উপর। আমরা সকলের আরও বেশী সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের তিরোধানের পর ৪ বৎসরে তাঁহার লিখিত ৪ খানা শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ-ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে—এখনও ৫ খানা উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য এবং তাহা ছাড়াও তাঁহার অন্যান্য রচনা রহিয়া গিয়াছে। এ বৎসরে তাঁহার আর একখানি পুস্তক ছাপাইবার কোন সুযোগই আজ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। পুরুষোত্তমানন্দ-প্রবর্তিত জীবন-দর্শনের প্রতি যাহাদের আগ্রহ আছে, তাঁহারা এ বিষয়ে আরও সচেতন হইবেন, তাঁহাদের প্রতি এই নিবেদন। আশ্রমে সপ্তাহে তিনদিন—রবিবার বিকেল ৫টা, এবং বুধ ও শনিবার সন্ধ্যারতির পর—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের রচনাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। আশ্রমে কর্মীগণ ছাড়াও ৭টী ছেলে মেয়ে আছে যাহাদের লেখাপড়া খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, এবং তিনজন কর্মী আছেন যাহারা কাজের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনা বা শিল্প শিক্ষাও করিয়া থাকেন। এই ভাবে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের সমাধিস্থানকে ঘিরিয়া তাঁহার জীবনদর্শন আচরিত ও প্রচারিত হইতেছে। আমরা সকলের নিকট আরও অধিক সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীঅমূল্য মিত্র কর্তৃক নয়নারায়ণ আশ্রম পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র-ধর্ম্মের ভেদের ফাটলে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটি স্বয়ংমূল্য আস্বাদন - ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম আস্বাদন করায় জীবনের অতিগ (transcendental) দিক, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (immanent) দিক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুইই। তাইতো তিনি জীবন-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম্ম বা একান্ত রাষ্ট্র অচল। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ' (ভোজপতি কংসের মৃত্যু) বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্ম্মপতিরূপে 'তত্ত্বং পরং যোগিনাম্' (যোগিগণের পরতত্ত্ব কৈবল্য)।

শ্রীপুরুষোত্তমলাল

নিয়মিত কুমারেশ সেবনে লিভার সুস্থ ও সবল থাকে—দেহের রোগ প্রতিরোধের শক্তি বাড়ে, অজীর্ণ, অম্বল প্রভৃতি রোগে ভুগতে হয় না। মিটমিটে মেজাজ, কাজে উৎসাহের অভাব, সহজে ক্লান্ত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয় না—

কুমারেশ

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যাণ্ড
কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ
কুমারেশ হাউস, শালকিয়া : হাওড়া

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না;
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের সৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	
শ্রীকৃষ্ণ	৪·০০	ছাত্রদের কর্মবাণী	
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	Sould of India Speaks	

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাংলার ঋষি	
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	রাজর্ষি রামমোহন	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	আচার্য জগদীশ	
বাংলার বিদুষী	১·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
বাংলার মনীষী	১·২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	
জীবন গড়া	·৭৫	রবীন্দ্রনাথ	

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বিটি,

বিদ্যাসাগর	২·৫০	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ—সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

সূচীপত্র ॥ শ্রাবণ, ১৮৮৪, ১৩৬২,

১। প্রার্থনাকালীন ভাবণ (১১)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রভৃত

২। আমাদের ইংরেজী শেখা ও শেখানো
অধ্যাপক তারাপদ ভৌমিক

৩। সুযোগ ও দুর্যোগ (গল্প)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫০)

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রকৃতি
শ্রীশঙ্কর দাশগুপ্ত

৬। মৃত্যোর্মামৃতং গময় (কবিতা)
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

৭। "মাসী" ১৯৩
মৃন্ময়ী শিপ্রা রায়

৮। বন্ধুবরেষু
শ্রীমৃগত

৯। সাময়িকী : ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

উদ্বোধন

শ্রাবণ, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

১৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১২)

—আর একটা বাঁশী যে বাজে! নিমাই-র পক্ষে সন্ন্যাসই বড় কথা ছিল না—কিন্তু সেদিনের আবেষ্টনে তাঁর বেরিয়ে পড়বার প্রয়োজন ছিল।...তাই তিনি বলেছিলেন পরবর্তী কালে 'কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজধন। যবে সন্ন্যাস কৈল দুঃখ হইল মন'। কিন্তু সেদিন নবদ্বীপের সে আবেষ্টন জয় করতে বেরিয়ে পড়তে হবে।...সেই বেরিয়ে পড়বার কৌশল নিমাইর জীবন দেখে শিখতে হবে। আর একজনকে জয় করতে হলে তর্ক করে হয় না—তর্কে ভেদবুদ্ধি বাড়ে।...সব মানুষের সাথে মিশতে একদিন হবেই কেননা সকলেই আত্মা।...ব্যাপকতর জীবন যাপন করতে হলে মিলবার শেষ চেষ্টা করতে হবে, তারপর না হলে কি আর করবে।...মাকে নিমাই বললেন, তুমি যখন যা দেবে আমি গ্রহণ করব—কি বিনয়, কি সৌন্দর্য—।...বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ গেলেন, কিন্তু বৃন্দাবনকে ছাড়েন নি।...

ঝগড়ার জন্য ঝগড়া করো না, এ পথ ভারতের পথ নয়। ভারতের পথ মিলনের, প্রীতির, বিনয়ের, মর্য্যাদা দানের। মানুষের সঙ্গে মত-বিরোধ হয়—কিন্তু মেলবার জন্য ঝগড়া করো।...নিজের জীবনের ঘটনা বলি—বৈষয়িক কোন ব্যাপারে বাবা মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে বললেন—আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে বললাম মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে পারব না। বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমার স্বার্থ যখন তুমি দেখলে না, বের হয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।...নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম—দুর্বিনীত হই নি—চোখের জল ফেলতে ফেলতে বেরিয়েছি। বাড়ী থেকে কিছু দূরে গাছতলায় বসে আছি—সন্ধ্যে হয়ে গেছে—পরিচিত স্নেহশীলা মহিলা দেখ শুনে বললেন, এস, আমাদের বাড়ী এস। বললাম, না, কাকিমার থাকলে বাবার ঘরেই থাকব—বাবার ঘরে স্থান না হলে এ গ্রামে আর থাকব না। পরের ঘরে উঠে বাবাকে অপমান করি নি। সে ভুল করি নি। এর পরে ডেকে পাঠালেন মা—নিশ্চয়ই বাবার তাতে মত ছিল। নিঃশব্দে বাড়ী গিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লাম।...আমার মত পরের কথাকে মেনে নেবার মত লোক পাবে না।...বড় কাজ কখনও বিনয়ের মধ্য দিয়ে ছাড়া হয় না—ভারতবর্ষ মেনে নিয়ে অপরকে হজম করেছে—তাকে বিরোধী পক্ষ করে বিদ্বেষের সৃষ্টি করে নয়। এ ইংল্যাণ্ড নয়, পাশ্চাত্য নয়...এখানে প্রীতি বড়, মন বড়, হৃদয় বড় কর্মের থেকে, তর্কের থেকে; কর্মের মধ্যে মতদ্বৈত হলেও প্রীতি নষ্ট হতে দিও না।

নিত্যগোপালকে তাঁর দিদিমা শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। নিত্যগোপাল দিদিমার কথা শুনলেন কেন? না শুনলেও পারতেন। আগে শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা না থাকলে, মানতে না পারলে ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সম্ভাবনা নাই। আলোচনা করে নিতে পার, কিন্তু মেনে নিয়ে, এক হয়ে নিয়ে তারপর আলোচনা করবে।...নিত্যগোপাল জন্মমুক্ত হউন।...বৃন্দাবন থেকে এলাম। বাবা আমার দুঃখ পাচ্ছিলেন বলে ঠাকুর বললেন, পরং বাড়ী যাও...সংসারের প্রত্যেক সম্বন্ধ ব্রহ্মময় এটাই

তিনি বিধিয়েছেন, বলে গেছেন…তাই সংসার করতে বলেছিলেন।…বিনয়ের মূর্তি গৌর, বিনয়ের মূর্তি নিত্যগোপাল…স্বীকার করে জয় করবার পথ ভারতের, এই পথ ব্রহ্ম পথ—অস্বীকার করে জয় করা যায় না।…

১০, ৬, ১৯৪৬—রবিবার, সকাল।…বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা…বিরহব্যথী…পরাপ্রকৃতি …গ্রেক-উন্মাদিনী……চম্পকবরণী রাধা নিত্যগোপাল সেজেছে …তুমি অনুমান ও প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণ-রাধারূপে আমার জীবনের দুয়ারে দাঁড়ালে।…তুমি ব্রহ্ম-হরি, কৃষ্ণ-হরি, গৌর-হরি নিত্যগোপাল …ব্রহ্ম-গোপাল, কৃষ্ণ-গোপাল, গৌর গোপাল নিত্যগোপাল…যুগে যুগে তুমি গোপাল, গর্বপাল, বিশ্বপাল —সকল ইন্দ্রিয়ের মাঝে ব্রহ্মবৃত্তি ফুটাইয়া তুমি 'গোপাল'। গো—ইন্দ্রিয়—ব্রহ্মভাবে ইন্দ্রিয়গণকে পালন কর…প্রেম পুরাৎ, প্রেম বিত্তাৎ, প্রেম সর্বস্বাৎ অন্তরাৎ—সকলের নিত্যতা প্রদান করিয়া তুমি নিত্য—বিশ্বের সকল সম্পর্ক নিত্য, অচ্ছেদ্য, ব্রহ্মসূত্রে গাঁথা—সূত্র ছিন্ন করা যায় না—তুমি ব্রহ্মসূত্র—এ সূত্র ছিন্ন করিতে গেলে রক্তারক্তি হয়—সকল বিশ্ব তোমার সূত্রে গাঁথা—তোমার সূত্র ধরিয়া আমি সকল বিশ্বকে আপন করিব—বুকে করিয়া আপন করিব।…নিত্যগোপাল, আমার আমি-কে আমি ভুলিয়া যাইব—আমি ছায়া, তুমি কায়া…প্রাণ-নিত্যগোপাল, আমি তোমারই সঙ্গে রহিব—যেদিন সকলে ছাড়িয়া যাইবে, তোমায় লইয়া থাকিব। যেদিন সকলে নিদ্রিত, সেদিন তুমি আর আমি জাগিব—যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী …তোমাতে আমি, আমাতে তুমি —তুমি আর আমি যোগ-নিদ্রায় নিদ্রিত।…তোমারি লাগিয়া আমি সকল ছাড়িয়াছি।…এই দুর্যোগের মাঝে তুমি আর আমি—নিত্যগোপাল, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, আমার প্রাণনাথ, স্বামী—ধরায় ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম মানুষ। হরিবোল হরিবোল—

সন্ধ্যা—প্রথম যে কথাটা আমার সারা জীবনে আমি কইতে চাই সেটা হল সংসারে আমরা অভিনয় করতে আসি নি—এ বিশ্বে প্রত্যেক সত্য ব্রহ্মসত্য। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই বাক্যের অর্থ নিত্যগোপাল এই ভাবেই করেছেন—পিতা ব্রহ্ম, মাতা ব্রহ্ম, স্বামী পুত্র ব্রহ্ম…ভোক্তা ভোগ্য সব ব্রহ্ম। নরনারায়ণ আশ্রম এইটেই বলতে চায়। স্বামী হিসেবে সার্থক স্বামী—দৃষ্টান্ত শিব, রাম—তাঁরা সার্থক পতি—গীতাপতিকেই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্ম বলেছেন—তাহলে এটা তো অভিনয় নয়। নশ্বর নশ্বর বলে তিনি তো অব্রহ্ম নন। সমস্ত spirit-হীন হয়েছে—আকৃতির form রয়েছে, তার spirit নাই।…আকাশের মধ্যে নিরাকারত্ব যায় পড়ে গেছে। সমস্ত সম্পর্কের revaluation করতে হবে—ব্রহ্ম-পরিবার, ব্রহ্ম-রাষ্ট্র…ইহাই ভবিষ্যৎ সভ্যতার বিধান। … নিত্যগোপালকে রেখেছি কেননা তাঁকে আমি জগৎগুরু বলে জানতে পেরেছি। তাঁর সামাজিক রূপ, পারিবারিক রূপ কোথায় সেইটে বলতে পারি।…এইটী কাহিনী—আমার বাবা অবতারবাদী ছিলেন না—আমার দীক্ষার কথা তিনি জানতেন না, কেননা তিনি গৌরকেই ভগবান বলতেন না—আর নিত্যগোপাল! শেষ কালে সেই নিত্যগোপাল কেমন করে তাঁকে পেয়ে বসলেন তার কথা বলি।

এগারদিনের কথা—তখন আমি ব্রহ্মমোহন স্কুলের মাষ্টার —বহিসালে থাকি। খেতে বসার আগে বাবা কালী করুণাময়ী ও কালাচাঁদের নাম জপ করতেন। সেদিন ভাতের থালার সামনে বসে এই যে জপ করতে লাগলেন আর খেতেই পারলেন না। কালী করুণাময়ী ও কালাচাঁদ নামের সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে নিত্যগোপাল নামও বের হতে লাগল। এই ভাবে জপ চলতে লাগল—খাওয়া হল না; দুপুর উৎরে গেলে তাঁকে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেওয়া হল—প্রায় সারারাত ধরে এই রকম আবিষ্ট ভাবে জপ করে প্রায় ভোরের দিকে তাঁর আবেশ কাটে। সেই থেকে তিনি নিত্যগোপাল নাম জপ করতেন—কখনও কখনও বলতেন—কে যায় রে, নিত্যগোপাল নাকি? বাড়ীর মেয়েদের বলে দিয়েছিলেন, নিত্যগোপাল আমার প্রত্যক্ষ দেবতা—তাঁকে না দিয়ে যেন কোন জিনিষ খাওয়া না হয়।

ঠাকুরকে একদিন আমি বলেছিলাম, আমাকে আপনি আশ্রয় দিলেন, আমার বাবা মাকে—। তিনি উত্তর

দিয়েছিলেন, তোমার বাবা-মার কথা আমার স্মরণ হইল। সেই স্মরণ থাকার ফল এই যে, যে বাবা গৌরাঙ্গকেই ভগবান বলে মানতে ঠিক রাজী ছিলেন না, তিনি শেষ পর্যন্ত নিত্যগোপালকেও ভগবান বলে বার বার ঘোষণা করে গেছেন।...আমার মত মানুষকে দিয়ে তিনি বেদান্ত লিখিয়েছেন—কোথায় শংকর রামানুজ, কোথায় আমি!... মনীষী হীরেন দত্তকে এ বেদান্ত শুনিয়েছি...'অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ'—এই মন্ত্রের অর্থ শুনে হীরেন দত্ত তৃপ্ত হয়েছিলেন।...জীবন নিয়ে অভিনয় আমি করিনি—যারা তোমরা আশ্রমে এসেছ তারা অভিনয় করো না—স্টেজে দাঁড়িয়ে গৌর এলো রে, গৌর এলো হে করে লুটিয়ে পড়ে তার পরেই গ্রীনরুমে নিয়ে তামাক তামাক পাওয়া যেমন অভিনয়—তোমরা জীবনটাকে নিয়ে তেমন করে অভিনয় করো না।...

১০. ৬. ৫৬—সকাল। নিত্যগোপাল,.....সমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠার লাগিয়া তুমি মূর্তিমান সমাজ...তাই দিব্য ব্রাহ্মণ, দিব্য ক্ষত্রিয়, দিব্য বৈশ্য, দিব্য শূদ্রের কথা শুনাইয়া গেলে। সেই সমাজই সুস্থ সমাজ যেখায় ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক, ক্ষত্রিয় হৃদয়, বৈশ্য উরু, শূদ্র পদ—এদের মধ্যে এমন জীবন্ত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে পায়ে কাঁটা ফুটিলে মাথা উহু করিয়া উঠে—সেটাই সুস্থ সমাজ যেখানে পরস্পরের বেদনায় পরস্পর পীড়িত—ব্রাহ্মণের পরিকল্পনা অপর তিনজনে রূপ দান করিবে—ধনও সমাজের সম্পদ—ব্রাহ্মণের প্রতিভা সমাজের, ক্ষত্রিয়ের শৌর্যও সমাজের...ভবিষ্যৎ বিশ্বে যে দিব্য ব্রাহ্মণ গড়িবে, সে করিবে অপরদের সেবা—এমনি প্রত্যেকে অপরদের সেবা করিবে। প্রত্যেকে স্বাধীন, আবার প্রত্যেকে অধীন। নিত্যগোপাল, তোমার দিব্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র গড়িয়া উঠুক—সেখানে শক্তি লইয়া মাতামাতি নাই। যে যাহার কাজ করিয়া যাইবে—সকলে ফল ভোগ করিবে। নিত্যগোপাল, তুমিই সমাজ—ব্রাহ্মণ তোমারই মস্তক, ক্ষত্রিয় তোমারই হৃদয়, বৈশ্য তোমারই উরু, শূদ্র তোমারই পা। কলিতে শূদ্র গুরু—কলিতে তোমারই পাদপদ্মের মহিমা আবাহিত হইবে। নিত্যগোপাল, আমি সর্ববর্ণী হইব:—ব্রাহ্মণ হইয়া বেদান্ত লিখিয়াছি, ক্ষত্রিয় হইয়া রাজনীতি করিয়াছি, বৈশ্য হইয়া নরনারায়ণ ভাই স্টাকের মারফতে তোমার সেবা করিতে চাহিয়াছিলাম—চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই, শূদ্র হইয়া সেবা বুদ্ধিতে সকলের সঙ্গে মিশিয়াছি। তুমি শূদ্র হইয়া পা দোয়াইয়া দিলে।...প্রণাম...তোমায় প্রণাম। এই শূদ্র ধরার বুকে তোমার অবতরণ সার্থক হউক, এই ধরা হউক বৃন্দাবন ...।

সত্তা—সচ্চিদানন্দ থেকে যে জীব-সৃষ্টি হয়েছে, উপনিষৎ নানা ভাবে এর বর্ণনা করেছেন...ব্রহ্ম-সচ্চিদানন্দ আকাশ থেকে জীব ছিটকে পড়েছে—ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ার পরই তার একটা 'আমি' জন্মাল—শিব থেকে জীব একটা আমি নিয়ে জন্মায়—এই আমির কিছু যোগ্যতা থাকে—কিন্তু সচ্চিদানন্দের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে এ আমি শুকিয়ে যাবে। গাছ জন্মাল হল নিয়ে—তাই মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও কিছুদিন তার জীবন থাকে—কিন্তু অমৃত ধারা তো সে পাবে না। মাটির থেকে অমৃতময় রস নেবার যোগ্যতায় সাধনা করতে হবে। ফুরিয়ে যেতে যদি না চাও, তাহলে যুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু শুক্র-রাবণ-কংস এরা মূল আমির সঙ্গে যুক্ততা হারিয়ে তাদের ব্যক্তিগত আমির পুষ্টির জন্য মানুষকে শোষণ করে বেড়ায়—এরই নাম dictatorship, এরই নাম কর্তৃত্ব, এরই নাম জীবত্ব।...চারদিকের মানুষের উপর শোষণ করেও সে তৃপ্ত হয় না—তখন ভগবানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাই এই 'আমি' সম্বন্ধে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে।...শরণাগতি একমাত্র উপায়—...এর আবার স্তরভেদ আছে—যিনি মুক্ত শরণাগত, তাঁর মধ্যে তত্ত্ব সচ্চিদানন্দ স্ফুরিত হয়—জ্ঞানবান মতে জ্ঞানম্—উদ্ধবের শরণাগতি, অর্জুনের শরণাগতি, রাধার শরণাগতিতে পার্থক্য আছে—রাধার শরণাগতি সর্বোৎকৃষ্ট। এই দেহকে যে পুরুষোত্তমের বলে মনে করে, তার থেকে বড় শরণাগত নেই।...

ক্রমশঃ

আমাদের ইংরেজী শেখা ও শেখানো।

॥ অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভৌমিক ॥

ইংরেজী নিয়ে আজ সারা দেশে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলছেন—ইংরেজীকে একেবারে বাদ দিতে হবে-(লোহিয়া), কেউ বলছেন—প্রাক-বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সব কিছু মাতৃভাষায় (আঞ্চলিক ভাষায়) পড়াতে হ'বে (শ্রীমানী), আবার অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বলছেন সর্বস্তরের শিক্ষা মাতৃভাষায় দিতে হ'বে। অনেকের মতে ইংরেজী এখন বিশ্বভাষার পর্য্যায়ে এসে গেছে এবং এটি-ই একমাত্র বিদেশী ভাষা যা আমরা ভারতবাসীরা কিছুটা জানি (কৃষ্ণমাচারী), সুতরাং একে বিদায় দিলে বিদেশের সাথে ভাবের আদান প্রদানে এবং বৈদেশিক জ্ঞান আহরণে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হ'বে। অন্য আরেক দলের মতে ভারতের সংহতি বিধানে ইংরেজী ভাষার অবদানের কথা স্মরণ করে ইংরেজী পঠন-পাঠনে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ইংরেজীকে বাদ দিলে ভারতীয় সংহতি ব্যাহত হতে পারে। ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করতে পারে এমন কোন সর্বভারতীয় ভাষা নাই; হিন্দী রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেলেও সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে সর্বজন-গৃহীত হয় নাই। জোর করে হিন্দী চাপানোর বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতীয় মত সোচ্চার এবং অন্যান্য কতকগুলি রাষ্ট্র কিছুটা বিষাগ্রস্ত।

১৯৬৫ সালে ইংরেজীকে শিক্ষার সর্বস্তর কিংবা প্রশাসনিক ব্যাপার থেকে বিতাড়িত করা সম্ভব হবে না বলেই অনেকে মনে করেন। প্রধান মন্ত্রী জওহরলালজী ইংরেজী বিতাড়নের কোন সময়-রেখা টেনে দিতে চান্ নি।

পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজী পঠন পাঠন চলছে এবং আরও বহুদিন ধরে চলবে বলে মনে হয়। মনে হওয়ার কারণ স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চমশ্রেণী থেকে ইংরেজী পাঠ যেখানে সুরু হ'ত আজ আবার তৃতীয় শ্রেণী থেকে তার সুরু হবার নির্দেশ পাওয়া গেছে। মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষায় ইংরেজীর নম্বর কমেছে; ২৫০ থেকে ২০০ নম্বর হয়েছে; বাঁধা ধরা পুস্তক উঠে গেছে সত্য কিন্তু তাতে করে পরীক্ষার ফলের কিংবা শিক্ষার মানের কোনটিরই উন্নতি হয় নি। কারণ পুস্তক থাক বা না থাক, নম্বর কমুক কিংবা বাড়ুক, স্কুল ইংরেজী শিখলেও ছাত্রকে পুরো নম্বর দিতে হবে, মাধ্যমিক বোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এমন নির্দেশ দেন না। ফলে ছাত্রেরা ইংরেজীতে ফেল করছে বেশী—অনাবশ্যকরকম বেশী, ভয়ানক ভাবে বেশী—এবং কৃপাঙ্ক দ্বারা তাদের পাশ করাতে হচ্ছে। অন্যান্য সব বিষয়ে পাশ করেও শুধু ইংরেজীর জন্যই ফেল করা ছাত্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এর কারণ কি, প্রতিকারই বা কোথায়?

কারণ খুঁজতে হলে একটু পশ্চাদ্দর্শন হওয়া দরকার অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলের ইংরেজী পঠন পাঠন এবং বর্তমান দিনের পঠন পাঠনের একটু তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন। ১৯০৫ এর পূর্ব পর্যন্ত—আমরা সকলেই জানি—সব বিষয়ই ইংরেজীতে পড়ান হত; ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক বিজ্ঞান ইত্যাদি সব বিষয়। বাংলা সর্বোচ্চস্তরে পাঠ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় স্যার আশুতোষের আমলে। সুধীন্দ্রনাথ দুঃখ করে একে বললেন—'বিলেতী যন্ত্রের সাথে একটা দিশী হাতল'। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় অধ্যয়ন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করলেন আশুতোষ আর সর্বস্তরে বাংলার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করলেন ডাঃ প্রসাদ। বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতি পিতা পুত্র উভয়ের নিকটেই সমান ঋণী।

বাংলাকে এই গুরুত্ব দানের পশ্চাতে সাহিত্যিক-রাজনীতিক-শিক্ষকবিদ্‌গণের যে সংযুক্ত প্রচেষ্টা ছিল সে কথা সর্বজনবিদিত। 'শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষার বেরকের'

প্রভৃতি প্রবন্ধে, নানা বক্তৃতায় এবং বিশ্বভারতীর শিক্ষায় বাংলাকে সর্বোত্তম মর্যাদা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে এবং বাঙালীকে ভাষা-গর্বী করে তুললেন। তাই ভাষার ব্যাপারে আমাদের আত্ম-সচেতনতা কতখানি বেশী, তা পাকিস্তানী বাঙালীদের ভাষা-আন্দোলন, পুরুলিয়ার ভাষা আন্দোলন, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, সারা বিশ্বে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের ঘটাই প্রমাণিত হয়।

অর্থাৎ আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে মাতৃ-ভাষায়—একটি সমৃদ্ধ ভাষায়—শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করব বলে দৃঢ় সঙ্কল্প নিলাম। স্বদেশী যুগে বিদেশী পণ্যের সাথে সাথে বিদেশী ভাষাও সর্বত্র বর্জনীয় ছিল। বিদেশী শাসনের অবসানের সাথে সাথে সাধারণভাবে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে এই কথাই সকলের মনে হয়েছিল যে ইংরেজ ও ইংরেজী দুই-ই 'ইণ্ডিয়া কুইট' করল।

এই চিন্তাধারার মূলে 'জাতীয় শিক্ষা', 'গোলামী শিক্ষা', 'কেরাণীগিরির শিক্ষা', 'দাস মনোবৃত্তি' প্রভৃতি কথা বহুজন-প্রচারিত, বহু সভা সমিতি-নিনাদিত, বহু পত্র-পত্রিকা বিজ্ঞাপিত হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংরেজ ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি একটা বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীজী (যাঁর নিজের ইংরেজী বাইবেলীয় সরলতা এবং সুস্পষ্টতার জন্য বিখ্যাত) স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেই নূতন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন চাইলেন—যেখানে ইংরেজীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। সর্বভারতীয় ভাষার সন্ধান সুরু হল এবং হিন্দীকে সেই মর্যাদা দেওয়া হল। এদিকে প্রাদেশিক ভাষা অনুযায়ী রাষ্ট্রের পুনর্গঠন হ'ল। আঞ্চলিক ভাষাগুলি (১৪টি) নিজ নিজ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করতে সুরু করল এবং হিন্দী-বিরোধী একটি মনোভাবেরও সৃষ্টি হ'ল। এ সবই অত্যাধুনিক ব্যাপার।

ফলে আজ রাইনায়কেরা বাইবেল বর্ণিত ব্যাবেল সহরের কর্মীদের অবস্থায় এসে পড়েছেন। দেবতার অভিশাপে তারা নাকি কেউ কারো কথা বুঝতে না পেরে স্বর্গের সিঁড়ি আর শেষ করতে পারল না। আজ জাতির অট্টালিকার কী-সিঁড়ি ভাষার বহুলতার জন্যই কি শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যাবে?

যা হোক্, ইংরেজীটা সব প্রদেশের মানুষই কিছু কিছু বুঝত; এখনও তার পঠন-পাঠন চলছে; প্রশাসনিক ব্যাপারে, লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা, বিধান পরিষদে আজও ইংরেজীই চালু। ইংরেজী বিজ্ঞানের ভাষা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা, পাশ্চাত্য ভাবধারার বাহন, একমাত্র এই একটি ভাষা জেনে-বুঝে আয়ত্ত করতে পারলে—লক্ষ্মী-সরস্বতীর অনেক কৃপার দ্বার খুলে যায়। সুতরাং আজকে আমার চিন্তা করতে হচ্ছে—'ইংরেজীটা থাকলে মন্দ হ'ত না; তবে আগের মত অত উঁচু স্তরের ইংরেজী না হলেও চলবে, মোটামুটি কাজ চালানো গোছের ইংরেজীটা জানা চাই'।

মনে হয় আমাদের ইংরেজী শিক্ষার আজকের লক্ষ্য—এবং সেটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই—তাই হওয়া উচিত। সাহিত্যের ইংরেজী নয়, বিজ্ঞানের ইংরেজী; বলার জন্য ততটা নয়, যতটা পড়ে অর্থোপলব্ধির জন্য ইংরেজী; ইংরেজের মত ইংরেজী লেখার জন্য নয়, ইংরেজী লেখা মোটামুটি ভাবে বুঝবার জন্য ইংরেজী। এটাই হওয়া উচিত সাধারণভাবে ইংরেজী শেখার লক্ষ্য; যাঁরা আরও ভাল করে শিখতে চান, তাদের জন্য অবশ্য অন্য ব্যবস্থা। তাঁদের জন্য মিশনারী স্কুল, গভর্ণেস, পাবলিক স্কুল, ভূনিয়ার কেম্ব্রিজ ইত্যাদি থাকুক; পয়সা যাঁরা বেশী খরচ করতে পারবেন, তাঁদের জন্য মাছের বাজার থেকে শিক্ষার বাজার সর্বত্রই তো আলাদা ব্যবস্থা।

আজকের স্কুল-কলেজের দিকে দৃষ্টি দিলে, সাধারণ-ভাবে ইংরেজী শেখানো ছাড়া অসাধারণ একটা কিছু করার কথাও চিন্তা করা যায় না। প্রাথমিক স্তর থেকেই যদি ইংরেজী শেখানো সুরু করতে হয়, তবে সে ইংরেজী পড়ানোর লোকই বা কোথায় পাওয়া যাবে? ভাল করে পড়ানোর কথা, একটা শক্ত বুনিয়াদ গড়ার কথাই এখানে চিন্তা করতে হবে। সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষকের ইংরেজী বিদ্যার বুনিয়াদ নিজেরই ততটা শক্ত নয়, যেটুকু পড়াবেন, সেটুকুও অত্যন্ত মামুলি ধরনের পড়ানোই হবে; তাঁদের ইংরেজী শেখানোর জন্য পর্যাপ্ত সময়ও পাওয়া যাবে না। ইংরেজীর জন্য বেশী সময় দিতে গেলে, বহু বিষয়

তারাক্রান্ত পাঠ্যতালিকার অনেকটাই বাদ পড়ে যাবে। সেটাও কাম্য নয়।

দ্বিতীয় কথা—ইস্কুলে ভাল করে পড়ানো না হলে বাড়িতে যে ইংরেজী পড়িয়ে ছেলেকে তৈরী করে নেওয়া যাবে, এমন পরিবেশও নয়। আজ সর্বস্তর থেকে ইস্কুলে ছেলেমেয়েরা আসছে। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হলে আরও বেশী আসবে। ইস্কুলের পড়ানোর ঘাটতি পূরণ করার মতো অভিভাবক, সময় কিংবা সঙ্গতি কোথায়?

প্রাথমিক স্তরেই ইংরেজী শিক্ষা যদি এমি নমো-নমো গোছের হয়, তবে তার ফল উপরে উঠে ছেলেকে ভুগতেই হবে। মাধ্যমিক স্তরেও ইংরেজীর মান নীচু করতে হবে (হয়েছে); বিশ্ববিদ্যালয়েও তথৈবচ। কিন্তু আমাদের আরেকটি লক্ষ্য এই হওয়া উচিত বলে মনে হয়—"কম শেখ, কিন্তু ভাল করে শেখ।"

আজ ইংরেজী পড়ানোর ব্যাপারে প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় হওয়া উচিত, এই কম শেখাটাই কি ভাবে, ভাল শেখা হতে পারে। সময় কম, তেমন উপযুক্ত শিক্ষক নেই, উপযুক্ত পরিবেশেরও অভাব, অথচ ইংরেজী পড়াতে হবে। তা যদি হয়, তবে শেখানোর পদ্ধতির উপর জোর দিতে হয়। অর্থাৎ এমন কিছু পদ্ধতির কথা চিন্তা করা উচিত যেটা যে কোন প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষক সহজে আয়ত্ত করতে পারেন এবং সেই অনুসারে পড়ালে কিছুটা ফললাভ করতে পারেন।

এখানে আরেকটি কথা মনে রাখলে আমরা আশা-ভঙ্গের দুঃখ পাব না। সব ছেলেরই ভাষা-অর্জনের ক্ষমতা সমান থাকে না; সে ভাষা মাতৃভাষাই হোক, কিংবা বিদেশী ভাষাই হোক্। খেলাধূলার ব্যাপারে যেমন দেখা যায় একই খেলোয়াড় বিভিন্ন খেলাতে পারদর্শী হতে পারে, তেমি ভাষা শিক্ষার যাদের আগ্রহ আছে, তারা একাধিক ভাষা সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। অনেকের পক্ষে একটি ভাষাই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশী ভাষা তাদের পক্ষে বোঝার উপর শাকের আঁটি না হয়ে বোঝাই হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে ইংরেজ যেমন তার সাম্রাজ্য হারিয়েছে, অন্যদিকে সেটা সে পুষিয়ে চেষ্টা করছে তার বাণিজ্যিক প্রসারের বিস্তর দিয়ে, তার ভাষাকে পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারিত করার চেষ্টা দ্বারা। অমন যে রাশিয়া, সেখানেও ০·১% ছেলেমেয়ে ইস্কুল কলেজে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী পড়ে, অথচ রাশিয়া-ইংরেজের সম্পর্কটা সেদিক দিয়ে যে খুব মধুর সেটা কি জোর করে বলা যায়? এই ইংরেজী ভাষার প্রসারে ইংরেজের সাথে আমেরিকাও হাত মিলিয়েছে এবং তাদের গণনায় সারা পৃথিবীতে কুড়ি কোটি লোকেরও বেশী ইংরেজী পড়ে। তাই ইংরেজীটা যাতে বিদেশীরা আরও সহজে আয়ত্ত করতে পারে, তার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। একথা স্বীকার করতেই হবে যে ইংরেজী ভাষার জোরেই ইংরেজ বিশ্বের সাংস্কৃতিক সভায় মর্যাদা পাবে, সুতরাং এ ভাষা যাতে আরও বহুল প্রচারিত হয়, তার জন্য তাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ নানা ভাবে চেষ্টা করে আসছেন। বেতার মারফত নিয়মিত ভাবে বিদেশীদের জন্য ইংরেজী-শিক্ষার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়; বিদেশে ইংরেজ পরিচালিত বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী প্রচারে প্রচুর পয়সা ও পরিশ্রম ব্যয় করে আসছে, বিদেশে ইংরেজী শিক্ষার জন্য শিক্ষক পাঠাচ্ছে।

আজ ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউসিস (U. S. I. S) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ইংরেজী শেখানোর জন্য শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। ভারতবর্ষে এলাহাবাদে এবং হায়দ্রাবাদে ইংরেজী শেখানোর প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। সেখানে শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষকদের জন্য সহজ ভাষায় ইংরেজী শেখানোর শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। অল্প সময়ে, সাধারণ শিক্ষকও কি ভাবে ইংরেজী শিক্ষা দিতে পারেন তারই পরীক্ষানিরীক্ষা হচ্ছে ঐ সকল স্থানে।

[চলবে]

সুযোগ ও দুর্য্যোগ

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ॥

(২৭ বৎসর আগে শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায়কে লিখিত পত্র)

২৬. ৬. ১৩৪২

নারায়ণেষু

তোমার ও —র পত্র পাইলাম। বর্ত্তমান যুগে অন্ন বস্ত্র সমস্যা বলিয়া যে রব উঠিয়াছে তাহা বিপদের কারণই হইতেছে দেখিতেছি। কি কংগ্রেসে কি কুম্ভমেলায় সর্ব্বত্রই নাকি এক সমস্যা—অন্ন সমস্যা। অন্ন কি কোন সমস্যাই নাই অন্ন সমস্যা ছাড়া যাহার জন্য মানুষের সব পণ্ড হইতেছে! অন্ন সমস্যা এক সমস্যার অংশ বটে, সবখানি নয়। 'অবধূত ভাত আগাগোড়া না পড়িলে এই বিপদ তো হইবেই জানি আসল ব্যাপারটা কোথায়, মানুষের বিপদ কোথায় তাহা জানা না থাকিলে প্রতীকার করিবে কি করিয়া? বাহিরে যেমন সমস্যা আছে, ভিতরেও তেমনি সমস্যা আছে। এখনও বাহিরে যে সুযোগ আছে তাহাতেও মানুষ আগাইয়া যাইতে পারে, যদি ভিতরের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা সে অন্ন সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে করিত। আগে অন্ন বস্ত্রের সমস্যার সমাধান, পরে জীবন যাপনের জন্য 'পুরুষোত্তমবাদ', ইহা যেমন সত্যের একদিক, তেমনি আগে জীবন যাপন করা, পরে অন্ন বস্ত্র সংস্থান ইহাও তেমনি সত্যের অপর দিক। পৌর্ব্বাপর্য্য করাতেই তো সব বিপদ হইতেছে। অন্ন না হইলে যেমন স্বরাজ সাধনায় লোক পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি কি ইহাও খুব সমীচীন নয় যে, স্বরাজ না হইলেও অন্ন সমস্যার সমাধান হইবে না? জাতীয় গভর্ণমেণ্ট না হইলে জাতীয় শিক্ষা হয় না, ইহাও কি সত্য নয়? 'মোটাভাত মোটা কাপড়ের যোগাড় না হইলে মানুষ কি করিয়া জীবন গড়িবে' ইহা লিখিয়াছ। কিন্তু তাহারও কি ভারতবর্ষে মোটা ভাত মোটা কাপড় নাই? তাহারা জীবন গড়িতেছে না কেন? তোমরা পুরুষোত্তমকে কোন একটি অবস্থায় সত্য করিতে চাহিতেছ অথচ সে অবস্থাটী লাভ করার জন্যও পুরুষোত্তম-বাদের প্রয়োজন। ইহাকেই বলে গোলক-ধাঁধা। তাই অন্ন না হইলে জীবন লাভ হয় না, জীবন লাভ না হইলেও অন্ন লাভ হয় না। কোনও একটী পথে চলার বিপদ হইতেই জাতিকে রক্ষা করিতে হইবে। একটী পথ বাছিয়া লইলে বিপদ বাড়িবেই শুধু। বিপদ অন্তরে বাহিরে দুই জায়গায় যুগপৎ। সমাধান দুই জায়গায় যুগপৎ চাই। পৌর্ব্বাপর্য্য স্থাপন করাই 'আমি'। এই আমিকে সমর্পণ করিলেই দুইটি যুগপৎ চলিবে। বিশ্বের প্রতি ঘটনার কারণ একটী নয়, দুইটী। প্রতি কারণ অন্য সবগুলির কারণ সমন্বয়েই কারণ। অবধূত ভাতের ৩২৩ পৃষ্ঠা খুব ভাল করিয়া পড়িও। লিখিত আছে "কোন একটীকে সৃষ্টির একমাত্র কারণ স্বীকার করিলে কতগুলি ঘটনার ব্যাখ্যা মিলিতে পারে, কিন্তু সবগুলির ব্যাখ্যা কোনোও একটী 'কারণ' দ্বারা পারে না, এতদিন পারে নাই। সমস্যাও বহু, সমাধানও চাই বহুর সমন্বয়ে। ঠিক ঠিক সংসারীকে বুঝিতে চেষ্টা কর। দুর্য্যোগের ভিতরও যে পুরুষোত্তমের ইঙ্গিত রহিয়াছে সেই ইঙ্গিতকে যদি ধরাইতে না পার, তবে দুর্য্যোগের মধ্য হইতে সরাইয়া আনিয়া সুযোগের মধ্যে রাখিলে সে নিজেই সেই সুযোগকে দুর্য্যোগে পরিণত করিবে। দুর্য্যোগ ও সুযোগের মধ্যে যে যোগেশ্বরের যোগশক্তি রহিয়াছে তাহাকে চিনিলে দুর্য্যোগেও মানুষ আটকায় না। দুর্য্যোগের মধ্য হইতে যখন তখন সরাইবার চেষ্টা বাতুলতা;

উহার ভিতর রহিয়াছে সংস্কারকের একটা মিথ্যা অহঙ্কারময় প্রচেষ্টা। দুর্যোগের ভিতর দিয়াও যে কেমন করিয়া ভগবান আসেন, তাহা বলিতে না পারিলে সুযোগেও তাঁহাকে চিনিবে না। আর সুযোগ দুর্যোগে বেশই বা কি? মানুষ তো সবের দুঃখই পায় ১৪ আনা। যাহারা 'জীবন চাহিতেছে' বলিয়া মনে কর উহা ভুল। উহাও বর্তমান যুগের একটা ফ্যাশান; উহা না জানিলে না বলিলে এ যুগের জন্য সমাজে সাধু সমাজে চলা যায় না। জীবন কে চায়? লিখিয়াছ 'আহারের আশা ছাড়া উপায় নাই তাহাদের জন্য "বরনারায়ণ" লইবে কি না'? আমার প্রতিশ্রুতির ভরসায় যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের আশা ছাড়া উপায় নাই ইহার কি কোন অর্থ আছে? আশা ছাড়া যদি উপায়ই নাই, তবে আসে নাই কেন? কেউ আসিবার জন্য ব্যাকুল নয়, আমার কাছ হইতে শুনিয়া রাখ। যাহারা সত্য সত্য 'আসে' তাহারা দুর্যোগ সুযোগ বাছে না। আত্মহত্যার আবার শীত গ্রীষ্ম ঝড় বাদল কি? ঝড় বাদলই বড় তাহার সুযোগ। যাহারা যোগেশ্বরকে চায়, তাহাদের দুর্যোগই তো ভাল, কেননা কেহ সেদিন দেখিবে না, শুনিবে না, জানিবে না, নিরাপদ। তোমরা যদি পুরুষোত্তমবাদ প্রচার করিতেই চাও, তবে দুর্যোগে চলিতে সাহসী এমন প্রাণের খোঁজ কর, তোমরাও দুর্যোগের পুরুষোত্তম চাও। দুর্যোগ ছাড়া পুরুষোত্তম আসেন নাই। দুর্যোগের কারাগারে বসুদেব দেবকীর পর বৎস আটকাইতে পারে নাই। কি বলিতেছ সুযোগের কথা? কোথায় সুযোগ? যাহারা বর্তমানে সুযোগ সুযোগ করিয়া চেঁচাইবে তাহারা লক্ষ বৎসরে দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে চাই দুর্যোগকে বরণ করা। অনুভূত ভাষে আছে—'সকল প্রতিকূলকে প্রতিকূল রাখিয়াও অনুকূলে গড়িয়া তুলিতে পারেন যিনি তিনিই পুরুষোত্তম'। বেকার সমস্যার সমাধান করিতে জাতি যায়। কিন্তু কর্ম করিবে কে? জাতি চায় কাঁকি দিয়া রাতারাতি বড় হইতে। কলিকাতার ট্রাম্‌গুলি ট্রাম খোলা নাপিত—সব বাঙ্গালীর হাত ছাড়া কেন? কর্মে অনিচ্ছা, অনাস্থা কি বেকার সমস্যার প্রধান কারণ নয়? বাহিরকে দোষ দিয়া নিজেদের সাফাই গাহিও না। সাধনা না থাকিলে অন্ন আসে না, অন্ন না আসিলেও সাধনা হয় না। দুইই দুইয়ের সাপেক্ষ। সেই জন্যই বলি দুইয়ের উপরে ওঠ, অন্ন ও সাধনা দুইই মিলিবে। কোন এক পথে ছুটিলে সামনে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার। দুইয়ের উপরে ওঠ, উদাসীন হও। আত্মসমর্পণ ছাড়া উদাসীন হওয়া যায় না। আবার বলি বারবার, সহস্রবার অনুভূত ভাষ পড়। প্রাণ পাইবে। যাহাদের চাহিতেছ তাহাদিগকে ঝড় বাদলের ভিতরে চলিবার কথাই শুনাইও—ইহাই পুরুষোত্তম-জীবন। যে দুর্যোগে আমি নিজে জীবন চালাইয়া আসিয়াছি, তাহা আমিই জানি। আজও যে ভাবে দিন যায় তোমরা কল্পনাও করিতে পার না। তাহাতেও তো পুরুষোত্তম দমিয়া দাঁড়ান নাই। আমাদের সঙ্গে যাহারা থাকিবে তাহাদের বুকের পাটা শক্ত করিতে হইবে। নচেৎ লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্যোগের ইতিহাস শুনিবে কি করিয়া, বুঝিবে কি করিয়া? প্রচারক দলের পক্ষে সুযোগের আশা করা মূর্খতা। মহাপ্রভু লোকনাথকে বলিয়াছিলেন, 'লোকনাথ, তুমি আমি সংসারে সুখ ভোগ করিতে আসি নাই'। ওগো দুঃখ পথের যাত্রী, যে কোথায় আছ, সকল দুর্যোগের মাঝে সকল দুর্যোগময় হইয়া যোগেশ্বরের আহ্বানে বরণ লাভ করিতে ছোট। ভয় নাই। ভয় নাই।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(১৮)

…অসিমুদ্দিন দুইটী কবিতা দিয়াছেন। জগন্নাথ দাস …আসেন। বিজলীর টাকাটা দিয়া যান। তাহার সঙ্গে প্রায় ২ ঘণ্টা আলোচনা হয়। রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর কথাবার্ত্তা, শ্রীকৃষ্ণ সজাতীয় বিজাতীয় গোপীদের মিলাইয়া রাস করিয়াছেন কোন্ কৌশলে, 'না সো রমণ না হাম রমণী'-র ব্যাখ্যা, ধর্ষিতা মেয়েদের ঘরে নিতে না পারার কারণ সতীত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান static ধারণা, রাধাই বর্ত্তমান যুগের সতীত্বের ঘন বিগ্রহ, ঋষির বর্ণাশ্রম, ও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাশ্রম, কামের ভাগবতরূপ সভ্যতার মধ্যে স্থাপন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম, ইত্যাদির হৃদয়াবেগপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া জগন্নাথ দাস বলেন, অনেক ব্যাখ্যা পড়িয়াছি, এরূপ সহজ হৃদয়গ্রাহী যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই। ব্যাখ্যার মধ্যে গিরীন্দ্র রায় (মাদারীপুর) আসিয়া উপস্থিত হন। রেণুকে বলিলাম, 'সত্যই আমি যাহা বলি, নূতনই বলি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সাক্ষাৎভাবে শিখাইয়াছেন, শিখাইতেছেন। কিন্তু একদিন এমন করিয়া ছাপাছাপি করিয়া বলা তো বন্ধ হইবেই। তোমরা বলিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। যাহা তাঁহারা দিলেন, তাহা কি আমার জন্যই, না নিজের জন্যও? সব কথা বলিয়া যাইতে পারিলাম না।'…

৯ই জানুয়ারী

…যতটুকু পারিলাম মানুষের কাছে ধরা না পড়িয়া সেবা করিয়া গেলাম।…

১০ই জানুয়ারী

…রেণু ১১টার পর আসিয়াই রমলার ও অন্যান্য স্থানে যায়, ফেরে ৫টায়।…কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়া যতটুকু সাধ্য আমি করিয়াছি। উদ্বাস্তীর সঙ্গে বর্ত্তমান দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে আলোচনা হয়। যেহেতু আমি তাহারও কাছে ধরা পড়িলাম না, সেই হেতুই কেহ আমার জন্য কিছু করিতে পারিল না, পারিবেও না। মানুষ 'কৃপা' করিতেই চায়, সেবা করিতে চায় না। সেবার মধ্যে আছে পারস্পরিক মর্য্যাদাদান।…হিন্দু মিউচুয়ালের অনিল রায় রেণুকে বলিয়াছিলেন যে, আপনাদের পত্রিকার একটী বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই তাহার জোরে উহা চলিবে। মনে আছি কালকার দিনে পত্রিকা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব।

১১ই জানুয়ারী

সকালে উদ্বাস্তুসমাজের প্রুফ দেখি। রেণু আসে ৮টার পর…১১টার পর যায়। খাইয়া কলিকাতা যায়। এক সরকারের সঙ্গে দেখা করে; ২ মাসের চেক আনে, গ্রাহকের টাকাও আনে। প্রতিভা পোস্টাফিস ব্যাঙ্ক ছানিমান ঘুরিয়া ২টার পর আসে।…আজ বারবার আশ্রমে আবার পাঠ আরম্ভ করার ইচ্ছা হয়। দিন যে যায়, আর তো বেশী সময় পাওয়া যাইবে না। যতটা পারা যায়, তাঁহার দর্শন ও জীবন শুনাইয়া যাইতে লালসা হয়। ছাদের উপর আসন ও আচ্ছাদন কত করিয়া রোদ ভাড়া পাওয়া যায়, তাহা জানিতে হইবে। একটা খোল দরকার হইবে, তাহারও দাম জানা দরকার। রাধা সেদিন ধীরেন ডাক্তারকে বলিলেন, 'আমাকে একটু দাঁড় করাইয়া দিন'। সত্যই, মানুষের বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা অনন্ত। কিন্তু এই বাঁচিবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা যে পুরুষোত্তম হইয়া বাঁচার মধ্যেই অনন্ত হইতে পারে, পুরুষোত্তমের

বাইরে একান্ত কালের মধ্যে নয়, তাহাও তো তুলাভাবে সত্য।...

১২ই জানুয়ারী

সকালে 'Chief Currents of Contemporary Philosophy'—বীরেন দত্ত—পড়ি।...আমরা সবলে মঠে পৌঁছি ৩-৫৪ মিনিটে। পাঠ আরম্ভ করি ৪-৫-৪। আজ প্রথম অধ্যায় শেষ করি।...

১৩ই জানুয়ারী

ঠাকুর ঘরে প্রার্থনায় থাকিবার মধ্যেই বেহালা হইতে খবর আসে যে, মায়ার নাড়ী পাওয়া যাইতেছে না। তাড়াতাড়ী প্রার্থনা সারিয়া রেণুর ওখানে যাইয়া তাহাকে মহুর বাসায় এই খবর ও চিদানন্দকে মঠে থাকিবার কথা বলিয়া আসিতে বলি।...আমি ও সেবানন্দ ঠাকুরের নাম ও 'জয়কালী শিবকালী' গাহিতে থাকিলে হাত জোড় করেন। ১০-১০ মিনিটে নিত্যধাম প্রাপ্ত হন।...দেহ মঠের বারান্দায় রাখা হয়। পরে নরনারায়ণ আশ্রমের দুয়ারে রাখা হয়।...অগ্নি ও জল একটী টীনের কৌটা করিয়া ঠাকুরের আসনের নীচে রাখা হয়।

১৪ই জানুয়ারী

সকালে আফিসে যাই; রেণুর শরীর ভাল নয়।... চিদানন্দ হাদের ধৈর্য্য ও প্রেমের মাপ নেয়।...সেবানন্দ আমার কাছে আসে ও আমায় বল বুদ্ধি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। সে অর্থ কিংবা অন্য বাহিরের কোনও সাহায্য চায় না। সারাজীবন কিভাবে মায়ার সেবা আমি করিয়াছি, তাহার খোল পূরণ করিতে পারি নাই বলিয়া তিনি আমা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, আমাকে আড়াল করিয়া চলিতে লাগিলেন ইত্যাদি বলায় পর আমি সাধ্যমতারে বুদ্ধি দিবার আশা দেই। যদি কখনও আসন করি মায়ার চিহ্ন সেখানে বর্ত্তমান থাকিবে, তুমিও সেখানে থাকিতে পারিবে ইত্যাদি বলি। আমি সংঘের আশ্রয় করিব না। মানুষকে বাদ দিয়া কালী, নারায়ণ কেহই চলিবে না। আমি তাই নর-নারায়ণের কথা বলি। বর্ত্তমান যুগ-মানবের সেবা করা যায় যে রূপে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই আশ্রয় করিতে হয়।

১৫ই জানুয়ারী

সকালে ফাল্গুন মাসের জন্য 'রাজা' খুলুন', প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। একবার আফিসে যাই রেণু কেমন আছে জানিবার জন্য। উপেনবাবু আমায় শেষ (পঞ্চম) ইনজেকশান দিয়া যান।...রেণু আজও আসে না, বিশ্রাম করে। ক্লান্তি ও বুকের বেদনাটা এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই।...সকালে আফিসে বসিয়া সংসারের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কোন্ কৌশলে চলা প্রয়োজন, তাহার আলোচনা হয়। পিতা-পুত্র বিরোধ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ সর্ব্বত্র। এতদিন পিতারা, স্বামীরা চাহিয়াছে পুত্রকে স্ত্রীকে মুঠার ভিতর রাখিতে, আজ তাহারই প্রতিক্রিয়ায় পুত্রেরা, স্ত্রীরা চাহিয়াছে পিতাদের স্বামীদের গ্রাস করিতে। পুত্রকে, স্ত্রীকে আজ 'মুক্তি' দিতেই হইবে। কিন্তু তাহাতেও তাহারা ছাড়িবে না। মুক্ত হইয়া তাহারা চাহিবে পিতা বা স্বামীদের কাছ হইতে অধিকতর সুবিধা আদায় করিতে। তাহা যেমন দেওয়া চলিবে না, আবার এমন আঘাতও করিতে হইবে না যাহাতে সম্পর্কই ছিন্ন হয়। ধরা দিয়া অথচ ধরা না পড়িয়া এমন একটী বৃহত্তর গণ্ডীর ভিতর উহাদের রাখিতে হইবে যাহাতে লড়াই করিবার সাধই থামিয়া আসিবে, একদিন আসিয়া পায়ের কাছে লুটাইবে। নিজের ক্ষেত্রে স্থিত থাকিয়া অপরকে মুক্তি দিয়া অথচ প্রেমের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে রাখিয়া মর্য্যাদা দিয়া চলিতে হইবে, তবেই কোনও দিন মানুষকে পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। পৃথগন্ন করিয়া দিয়া, নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সকল সুবিধা দিয়া অথচ অতিমাত্রায় তোয়াজ না করিয়া চলিতে থাকিলে পাকিস্তানও একদিন দোষ মানিবে। মনস্তত্ত্বকে ডিঙাইয়া কেহ চলিতে পারে না। সকালে আফিসে যাইতে যাইতে খানকী ব্যানার্জীর সঙ্গে এবং প্রতিভাদের কাছে আফিসে উপরোক্ত আলোচনা হয়। ২৪০ টার পর আশ্রমে ফিরি।

১৬ই জানুয়ারী

সকালে একবার আফিসে যাই। আমরা সকলেই বাহির হই। রেণু যায় প্রশান্তর বাসায়, প্রতিভা রেশন আনিতে তাহার বাসায়, আমি গিরি আশ্রমে। রেণু খাওয়ার পর আবার কলিকাতা যায়, ফেরে ৬ টায় কিছু পূর্ব্বে।...দীতন (মেদিনীপুর) হইতে চারু মহান্তি ২৬শে জানুয়ারী সেখানে যাইতে পারিল কিনা তাহা জানিবার জন্য আফিসের ঠিকানায় এক ইনভেলাপ দেন। ২৩।২৪শে আমি খাকিস বেরিয়া (কাঁথি)। সেখান হইতে যদি সম্ভব হয়, যাইব ইচ্ছা আছে।

১৭ই জানুয়ারী

ভোর ৪টায় পরা 'রাজ্যং কুরু' প্রবন্ধ লেখা একরূপ শেষ করি।...সকালে সতীন সেন ফোন করে যে সে, সুরেশ গুপ্ত ও অপর কেহ কেহ ৫-৩০-এর পর ৬ টার মধ্যে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে।...শুভেচ্ছা মিশনের আরও ২টী সদস্য সামসের আলি ও অপর একটী মোক্তার (হিন্দু) আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আফিসে যায়। সামসের আলিই পূর্ব্বে এক চিঠি দিয়াছিল। তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি কম; হিন্দুদের ত্রুটি অনন্ত, তিনা হিন্দু মুসলমানের unity-র জন্যই পাকিস্থান করিয়াছেন, পাকিস্থানে হিন্দু হিন্দু থাকিবে না, মুসলমান মুসলমান থাকিবে না, থাকিবে পাকিস্থানী—ইহাই জিন্নার অভিমত, ইত্যাদি কথা সামসের বলে। কিছু পরে তাহারা চলিয়া যায়। মনোরঞ্জন বসু আসে আফিসে। শুভেচ্ছা মিশনের সম্বন্ধে তাহার আস্থা নাই। পাকিস্থান কিছুতেই টিকিবে না। ইহা তো একরূপ এখনই ভাঙিয়া পড়িয়াছে—ইহাই তাহার মত। ৯।০ টায় পর চলিয়া আসি।

১৮ই জানুয়ারী

সকালে 'Chief Currents of Contemporary Philosophy' হইতে Pragmatism পড়া আরম্ভ করি। চারু মহান্তির (দীঘার) কাছে একটা পোষ্টকার্ড দেই ঈশ্বর. প্রামাণিকের ওখানে আমার ২৬শে যাওয়ার কথা ঠিক করিতে।...রেণু এখানে আসে প্রায় ২টায়, প্রতিভা আসে ৩টায়। প্রতিভা 'রাজ্যং কুরু' প্রবন্ধটী লিখিতে থাকে। ইতিমধ্যে নীলু, সুবোধ, সুব্রত ও সুরভি আসিয়া উপস্থিত।...ঈশ্বর প্রামাণিক ও আর একটী যুবক আফিসে আসে। উহারা নিকুঞ্জ মাইতির ওখানে গিয়াছিল। আগামী সোমবার ৮৷০ টায় সেই যুবকটী আসিয়া লইয়া যাইবে। ৯৷০টায় গাড়ী, পৌঁছিতে প্রায় ৬টা লাগিবে। নিমন্ত্রণ চিঠি ও প্রোগ্রাম দিয়া যায়। ২৬শে ওখানেই থাকিতে হইবে। আমি চারুপ্রভুকে চিঠি দিতে বলিলাম।...সকালে অতীন চক্রবর্ত্তী আসেন আগামী ২৩শে তাঁহার বিবরূপ সেবাশ্রমের উৎসবের নিমন্ত্রণ জানাইতে।...

১৯শে জানুয়ারী

...আমি একবার আফিসে যাই। আমি ও প্রতিভা বাহির হই, প্রতিভা প্রুফ নিয়া প্রেসে যায়। রেণু পরে শক্তি ঔষধালয় ও অন্যান্য অনেক স্থানে যায়। আমি 'Pragmatism'-এর অধ্যায় পড়ি ধীরেন মন্ত্রের বই হইতে।...মঠে ৪-৫-এ পাঠ আরম্ভ করি। 'তং ত্বা কৃপয়াবিষ্টং', 'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং' শ্লোক দুইটী ব্যাখ্যা করি। অমা, অমার মা ধরিত্রীদী, যতীনবাবু, চিদানন্দ, কিতীশ, অবধূতানন্দ, অন্যান্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন।... মাখনবাবু ৩ জন গ্রাহকের, অমা ২ জনের, পরিমল মৈত্র ২ জনের এবং রেণু ২ জনের টাকা আনে।...

২০শে জানুয়ারী

সকালে Pragmatism পড়ি। রেণু আসে ৮টার পর।...১১টায় মঠে যাই।...আরতির মধ্যে আমি মায়ার সম্বন্ধে ঠাকুরের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করি। প্রার্থনা করি। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলি যে, মৃত্যু মানুষের আনন্দ-প্রয়াণ; উহার মধ্যে প্রেত হওয়ার কল্পনা স্থান নয়। ইহা নিত্য শুদ্ধ মানবাত্মার প্রতি অবিচার।

২১শে জানুয়ারী

খুব ভোরে উঠিয়া প্রার্থনা করি, Pragmatism ও গীতা পঞ্চদশী (সতীনবাবুর) দেখি। ৬।০ টার পরই বেরু, একটু পরে প্রতিভা আসে।...৮-২৬-এ ধরণীবাবু গাড়ী নিয়া আসেন। ৮-৩০-এ রওয়ানা হইয়া হাওড়া আসি। নাগপুর প্যাসেঞ্জার ১-১৫মিঃ ছাড়ে। পাশফুকা হইয়া বাসে তমলুক ১২ মাইল, নয়ঘাট ১৬ মাইল আসি। রেয়ার নদী পার হইতে গিয়া নৌকা মাঝদরিয়ায় চড়ায় ঠেকে। যে ভদ্রলোকটি নিয়া আসেন, তিনি জলে নামিয়া আগে চলিয়া যান। আমি কি করিয়া নামিব? লাফ দিয়া জলে পড়িতে সাহস হইল না। আবার খেয়ায় উঠিলাম। পারে পৌঁছিলাম। কাঠের গুদামের কর্মচারী সতীশ মাইতী মহাশয়ের গুদামে উঠিলাম। সঙ্গীয় লোকটী খাইতে গেলেন, আমি বসিয়া রহিলাম। আমার খাওয়ার কোনও কথা তিনি বলেন না। সতীশবাবু নিমকি, রসগোল্লা ও পান্তুয়া আনেন। রসগোল্লা পান্তুয়া খাওয়ার নয়। সঙ্গীয় লোককে (শরৎবাবু) বলিলাম, আপনি তো বেশ, আমাকে ফেলিয়া আপনি খাইয়া আসিলেন। সতীশবাবুর কাঠের গুদামে রাষ্ট্রীয় একটী খদ্দর কর্মী ও সতীশবাবুর সঙ্গে আলোচনা হয়। ৫।০ টার মোটর আসে। সঙ্গীয় লোকটী আমায় ফেলিয়া আগেই গিয়া মোটরে বসে। সতীশবাবু ফ্রন্ট সীটের কথা বলেন ও আমার বিছানাটী নিয়া দিয়া আসেন। জীবন জাদুনির ভিতর দিয়া ১৬ মাইল চলিয়া বাসে হেঁড়িয়া যাই। কোনও লোক নাই। বাস জয়রামনগর আসিতে চাহিল না—। পাকী ৩ মাইল দূরে। পাকী আনার জন্য অতটা সময় অপেক্ষা না করিয়া ১ মাইল হাঁটিয়াই আসিলাম। প্রাণটা ভাল লাগিতেছিল না। কেবল মনে হইতেছিল, ঈশ্বর ঈশ্বর হইলেই তবে তাহার মর্য্যাদা আমরা দিতে পারি, অনীশ্বর হওয়ায় সহস্র মানুষ কৃষ্ণকেও ব্রহ্ম মানেন না, অথচ আজ তো প্রাণেরই মর্য্যাদা পাওয়া উচিত ছিল। আমি তো চাই প্রাণস্পর্শ। প্রাণের মানুষ কাছে না পাইলে প্রাণ সঙ্কুচিত হয়। ঈশ্বরের বাটিতে আসি; এখানে বেহনার সহিত পথের অবস্থা বর্ণনা করি। --জিতেন দাস বলিয়া একটি ছেলে আমার কাছে শোয়।...

২২শে জানুয়ারী

সকালের দিকে হৃষীকেশ গায়েন, অতুলচন্দ্র মেইকাপ, ভীমবাবুর বক্তৃতা আসে। ভীমবাবুর বক্তৃতা ১খানা বেনোপনিষৎ ও নারী প্রগতি নেয়। হৃষীকেশ ঈশ বেদ নারীপ্রগতি নেয়। মুরারী পাসমল আসে। সে পত্রিকার ৪৲ টাকা ও নারী প্রগতির ১।০ ঈশ্বরের কাছে দেয়।... জিতেন কাছে কাছেই থাকে।...আলোচনা হয়। বর্ত্তমানে যখন মেয়েরা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে, তখন ব্রহ্মচর্য্যের কি রূপ হইবে, বর্ত্তমান হিন্দু constitution-এ থাকিয়া মেয়েদের কি করে নেওয়া সম্ভব, হিন্দু-শাস্ত্র ও সমাজ-ব্যবস্থার re-orientation না হইলে কম্যুনিজমকে পরিপাক করা সম্ভব হইবে না ইত্যাদি কথা হয়। ৪টায় পতাকা উত্তোলন করি। প্রায় ৬টায় সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি সুবোধ মাইতি। প্রথমে সুবোধবাবু বলেন, পরে আমি। গিরিধারী প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পল্লীব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠার কথা বলি। দিল্লীকে আকাশ হইতে টানিয়া নামাইবার দায়িত্ব পল্লীর সজ্ঞবদ্ধ জনসাধারণের। 'ভবব্রহ্ম' আসিবেন আমার দুয়ারে।' পল্লী ব্রহ্ম হইলে সহরের সব ঐশ্বর্য্য পল্লীতে আসিবে। লোকরুচিকে ভদ্ররুচির সঙ্গে সমন্বিত করিবার প্রাণ লইয়া রাখালরাজ গোষ্ঠবিহারী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পল্লীর সহজ সরল মেয়েদের ব্রহ্মবিদ্যার ঘনীভূত রূপে গড়িয়া তুলিবার মহান ব্রত লইয়া শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। সভায় তিন দিকের বহু শিক্ষিত লোক ছিলেন।

২৩শে জানুয়ারী

সকালের দিকে মুরারী আসে, ২৬শে তাহার ওখানে সকালে যাইব কথা হয়। সুবোধ মাইতী ভোরে যখন ইসচড়া যান, তাহার ওখানে আমাকে কোনও সময়ে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া যান। জিতেন সঙ্গে সঙ্গে থাকে। বহু বৎসর পূর্বে কাঁথিতে সরযূবালাদের বাসায় ৺রাখাল দাস উকীলের স্ত্রী সাধনা দাসের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাহাকে দীক্ষাও দেওয়া হয়। সে ঐ সময় তাবুকতায় উন্মত্ত হয়। দীর্ঘ দিন কোনও দেখা ছিল না। সে আজ বিধবা, জয়রামনগরে স্বামী বাড়ী করিয়াছে। সে গত

মঙ্গলবার এখানে আর পরিবেশন করিয়াছিল। তখন তাহাকে চিনি নাই। সে-ই প্রথম আত্মপরিচয় দেয়। কিন্তু চেহারা এমন বদলাইয়া গিয়াছে যে চিনিতে পারি নাই। কতদিন তাহাকে মনে মনে এবং লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া খুঁজিয়াছি। সে একরূপ হারাইয়া গিয়াছিল। আজ যেন তাহাকে নূতন করিয়া পাইলাম। হারানো ধন পাইলাম। দুপুরে ১৪০টায় সে আসে। আমি ৩টার পর ঠাকুরনগর সমাজ মহিলা বিদ্যাপীঠে বক্তৃতার জন্য পাল্কীতে রওয়ানা হই।...বালিকাদের পুষ্পবর্ষণ ও শঙ্খধ্বনির মাঝে বিদ্যাপীঠে প্রবেশ করি। ঈশ্বর নরঘাট হইতে সরকারী পাবলিসিটি ভ্যান পাঠাইয়া ঠাকুর-নগর আসে। ঠাকুর নগরে আভা মাইতি (নিবুজবাবুর কন্যা) উপস্থিত ছিল। ৫ টার পর সভা আরম্ভ হয়। আভা প্রথমে বলে। সে দুটি কথা বলে। ছেলেরা যাহাতে স্কুলে পড়িয়া ঘরের কাজ, ক্ষেতের কাজ পরিত্যাগ না করে, অভিভাবকদের অবাধ্য না হয় এবং শিক্ষয়িত্রী গণ যাহাতে গ্রামের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে, তাহার উপর জোর দেয়। আমি বলি 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' আজ অচল। নরনারী একই অখণ্ড সমাজের দুই সমান অঙ্গ। এতদিন নারী-অঙ্গ পক্ষপাতরোগদুষ্ট ছিল। সমস্ত সমাজই পঙ্গু ছিল। রাজনৈতিক দিক হইতেও পুরুষ আজ নারী রক্ষায় অসমর্থ। নারীর ভার আজ নারীকে নিতেই হইবে। গত দাঙ্গায় পুরুষ মেয়েদের রক্ষা করে নাই। বক্তৃতা জমিয়াছিল। বক্তৃতার পর হাঁটিয়া কেদার গুড়্যার বাড়ী যাই।...

২৩শে জানুয়ারী

সকালে খেজুরের রস খাই। কাঁথির পাবলিসিটি অফিসর আনন্দগোপাল বসুর সঙ্গে কথা হয়, সে পত্রিকার গ্রাহক হইবে বলে। ১খানি কেনোপনিষদ্-ও নেয়।... সকালে সাধনা আসে, আজই তাহার ওখানে খাওয়ার কথা। ৯টার পর সেখানে যাই জিতেনের সঙ্গে কাপড় ও কৌপীন লইয়া। সেখানে সাধনার সঙ্গে আমার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি এবং আমার সঙ্গে তাহাকে যুক্ত থাকিতে বলি। জিতেন ও ধীরেনবাবুরও সেখানে নিমন্ত্রণ।... অতুলের সঙ্গে ও কৃতনাথ নামে একটি লোকের সঙ্গে আলোচনা হয়। এখানে আসার পর ঐ কৃতনাথবাবু আবার আসেন এবং শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।...

২৪শে জানুয়ারী

প্রায় বেলা দশটায় সভাকক্ষ উত্তোলন করি। 'অন্নাদ্ভব-ন্তোঽন্নাৎ' শ্লোকদ্বারা আরম্ভ করি। স্বরাজসুন্দর আজ রঙ্গে জানুয়ারী ভারতকে উজ্জ্বল ভারতে গড়িয়া বিশ্বকে দিয়া রঙ্গে গড়িবার জন্য অবতীর্ণ। তিনি বিশ্বের সঙ্গে অন্বয়ে (immanence) এবং ব্যতিরেকে (transcendence) যুক্ত। তাঁহা হইতেই বিশ্বের জন্মাদি। তিনিই আদি স্রষ্টা ব্রহ্মাকে হৃদয় দিয়া বেদ দিয়াছিলেন। সেই হৃদয় প্রকাশিত হয় বিনিময়, আদানপ্রদানের ভিতর দিয়া। তখনই বিশ্ব সত্য। স্বরাজসুন্দর 'যেন যাহা' কুহক নিরস্ত করেন। তিনিই পরমসত্য। ভাবের বিহ্বলতায় অনেকক্ষণ সভাকক্ষে দণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইয়া দণ্ডে মাথা ঠেকাইয়া কাঁদি ও ভক্তমূলে প্রণত হই।...২টার পর সাধনা আসে, বসন্ত দাসও আসে। বসন্তবাবুর সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠি হয়, আমার মতবাদ আলোচনা হয়। শশী ভুঁইয়া আসেন। ১ জন গ্রাহকের টাকা দেন। পরে আমরা স্নানে বেলার যাই। সেখানে লাইব্রেরীর সামনে আমার, ডাঃ অনিল বেরা ও তাহার স্ত্রী কৃষ্ণা বেরা ও মাতা এবং শশীবাবুর ফটো তোলা হয়। পরে আমরা স্টলগুলি দেখি। সভা আরম্ভ হয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পর। বসন্তবাবু সভাপতি হন। অনিল বেরা, কৃষ্ণ বেরা, বসন্তবাবু ও আমি বলি। কর্ম্ম-নিয়মকে হৃদয় করিতে হইলে যে হিন্দুসংবিধানকে নূতন রূপ দান করিতে হইবে, এই নূতন রূপ দানের জন্য যে রাশিনিক বিপ্লব দরকার হইবে, অন্যথা পূর্ব্বের মত এবারও যে 'ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, পুরুষোত্তম ঔদ্ধত্য-জীবনই যে হইবে একমাত্র সমাধান, তাহাই বলা হয়। সভার পর চলিয়া আসি। ১৯৩২-এর কাঁথি ভ্রমণের বর্ণনা রসাল করিয়া করেন বসন্তবাবু। আমি তাহা লিপি বদ্ধ করিয়া দিতে বলি। সভায় ৩ হাজার লোক অন্ততঃ

হইয়াছিল। এ দিকের প্রায় সব বাড়ীই আত্মীয় স্বজনে ভরা এই বেলার জন্য। ইহাদের জীবন আছে। কলিকাতা হইতে অর্থব্যয় করিয়াও লোক আসিয়াছে। কর্মীরা প্রাণ দিয়া খাটিতেছে।

২৬শে জানুয়ারী

খুব ভোরে উঠি। ঈশ্বরের পরিবারবর্গ, আমি ও সাধনার ফটো তোলা হয়। সাধনা সকালেই আসে। পরে কিছু জলযোগ করিয়া পাল্‌কীতে বেরিয়া আসিয়া বাস করি। সঙ্গে সঙ্গে জিতেন আসিয়াছিল। ঈশ্বর পূর্ব্বেই বাইসাইকেলে আসিয়াছিল। সাথে কাঁকরা খাদিকেন্দ্রের পীতাম্বরবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। সে চণ্ডীপুরে নামিয়া যায়। তাহার সঙ্গে static ব্রহ্মচর্য্য কেমন করিয়া বর্ত্তমানে dynamic হইতে চাহিতেছে, তাহার আলোচনা হয়। নরঘাটে সতীশ মাইতিকে পাইলাম না। সে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১৪ আনা হাঁটিয়া হলদী নদী পার হই। আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন বঙ্কিম বেরা। পাশকুড়া আসিয়া লোকালটা পাই। সেটা ছাড়ে ১-২৭ মি-এ। পৌঁছে ৪-১০-এ। ট্যাক্সীতে আশ্রমে বঙ্কিমবাবু পৌঁছাইয়া দেয়। মেচোদার জলখাবার খাই।...আজ সকালে ও ১০টায় উদ্বোধন মাঘ সংখ্যা ডাকে দেওয়া হইয়াছে। আগামী মাসের কাগজের জন্য দুশ্চিন্তা। কোনও গ্রাহক কোনও টাকা পাঠায় নাই। অয়ানগর (কাঁথি) হইতে ৪জন নূতন গ্রাহকের বাবদ ২০৲ টাকা আজ ঈশ্বর দিয়াছে। বসন্ত দাস, অধিকাভূষণ বেরা, মুরারি পালমল, দীননাথ নন্দ, গৌরাঙ্গ তরফদার নূতন গ্রাহক হইয়াছে।...

২৭শে জানুয়ারী

ভোরে একবার অফিসে যাই। প্রতিভা আসে ৯টার কিছু পরে, রেণু আসে প্রায় ১১টায়।...সকালে ব্রহ্মসূত্রের কিছুটা প্রুফ দেখি। 'নৌকাবিলাস' পত্রকীর্ত্তন হয়। মাতৃপূজায় আমি শ্রাদ্ধতত্ত্ব এবং দাদার সম্বন্ধে আলোচনা করি। ইহার মধ্যে 'আমি জলের মধ্যে থাকি, তোমরা স্থল বাড়াও', 'বাবা বইতে আমার বাবা নাই' ইত্যাদি আবরণগুলি খুবই মনস্তত্ত্বমূলক। ব্রজলীলা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন জীবনের একটী পারমার্থিক আস্বাদন। মানবাত্মার সকল স্নেহের কান্নার একটী সমাধান। মানুষ তাই ইহা শুনিতে এত উন্মাদ। ৪টার পর খাওয়া সুরু হয়।...

২৮শে জানুয়ারী

আজ সকালে ধীরেন ঘরের Chief Current's হইতে Pragmatism পড়ি।...যোগবাণী হইতে সিন্ধুর একটী পোস্টকার্ড আসে। তাহার কাশী যাওয়া সম্বন্ধে আমার মত কি, তাহা জানাইতে আবার লিখিয়াছে।... প্রারব্ধকর্ম্মবাদী ব্যক্তিগত, সমাজগত constitution-টাকে না ভাঙ্গিয়া চরম মুক্তি স্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু পুরুষোত্তম-জীবনবাদী এই constitution-কেই trans-form করিয়া এখানে মুক্তির আস্বাদন করিতে চান। কর্ম্ম যখন পুরুষোত্তমার্পিত, কর্ম্ম যখন বিশ্বজনীন, তখন কর্ম্ম কর্ম্ম থাকিয়াও অকর্ম্ম সমন্বিত। তখন সারা দেহমনপ্রাণ নব কলেবর ধারণ করে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই সন্তোমুক্তি সম্ভব। এই মহা সত্যের খোঁজ ঠাকুর শ্রীনিত্যগোপাল দিয়াছেন। আমি ধন্য হইয়াছি। আমি চলিয়া গেলে কি ভাবে আমার আনন্দ-প্রয়াণের উৎসব করিতে হইবে, তাহার আলোচনা রেণুর সঙ্গে করি। আমি আমার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব লইয়া চিরদিন অগ্রসর হইব। আমি জন্ম-জন্মান্তর - যুগ-যুগান্তর বাঁচিয়া থাকিব। প্রতিভা আজ রাত্রিতে বাসায় যায়। দশটায় আমি চলিয়া আসি।

২৯শে জানুয়ারী

খুব সকালে মন্থর ওখানে যাই।...অফিসে যাই। সেখান হইতে সিধা অন্নদাবাবুর বাসায় যাই। পত্রিকা দিয়া আসি। অন্নদাবাবু তমলুক গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে ৫৲ টাকা নিয়া আসি; বিশ্বরূপ সেবাশ্রমে অতীনবাবুকে পত্রিকা দিয়া আসি।...আমি কিছুটা Pragmatism পড়ি ও ব্রহ্মসূত্রের ২৯-শ বর্ণের শেষ প্রুফ

মেথি।··· চিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত এম-এ বি-টি তাহার নিজের লেখা 'ভারত ও যুগ সঙ্কট' বই উচ্চপ্রাথমিকে রিভিউ-র জন্ত দিয়া যায়। তাহার সঙ্গে কিছুটা আলাপ হয়।···

৩০শে জানুয়ারী

৭টার পর ১০৩ হরিশ মুখার্জি রোডে পরেশগুরু পালের বাসায় যাই। তাহাকে পাই না। সে বাস্ পরিবর্তন করিতে ভূপতেশ্বর গিয়াছে। সেখান হইতে মহিম হালদার ষ্ট্রীটে যাই।···সেখান হইতে অফিসে যাই। ···Emergent Evolution পড়ি 'Chief currents' হইতে। ২টার পর রেণু সহ কবিরাজ প্রমথ রায় (শিবাজগঞ্জ) আসে। সে 'কঙ্কাবতী' কবিতাটী দেয়। তাহার লিখিত ২টী বাঙ্গলা নাটকের অংশ ও সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা শুনায়। প্রায় ৫টায় যায়। শরীর ভাল নয় বলিয়া রেণু আজিও বাহির হয় নাই। পরেশগুরু আফিসে আসিয়াছিল। সে সকালে ১০৩ হরিশ মুখার্জি রোডে গিয়া শোনে যে কে একজন সন্ন্যাসী কালীঘাট হইতে সেখানে গিয়াছিল। আমাকেই অনুমান করিয়া সে দেখা করিতে আসে ও প্রতিভার কাছে একটু পত্র রাখিয়া যায়। পত্রটুকু ভাল লাগিল। আমি লিখিয়াছিলাম —এই মর্ত্যাধামান বেশ মিষ্টি।···সমগ্রের সাধনা না-থাকায় জন্ত মানুষ কেবল সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়াই চলিয়াছে, ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে।

৩১শে জানুয়ারী

সকালে 'The Chief Current's হইতে Emergent Evolution চ্যাপ্টার পড়ি।···রেণু আজ ১১·টায় কলিকাতা যায়, ১১·টায় ফেরে।···প্রতিভা সকালে প্রেসে যায়, প্রুফসূত্রের প্রুফ দিয়া আসে।

১লা ফেব্রুয়ারী

সকালে 'Whitehead' চ্যাপ্টার পড়ি। 'It is as true to say that God··is parmanent and the world fluent, as that world is permanent and God is fluent. It is as true to say that God is one and the world many, as that the world is one and God many. It is as true to say that in comparison with the world, God is actual eminently, as that is comparison with God, the world is actual eminently. It is as true to say that the world is immanent in God, as that God is immanent in the world. It is as true to say that God transcends the world, as that world transcends God. It is as true to say that God creates the world, as that world creates God.'—Process and Reality—P 492। রেণু সকালে একবার কলিকাতা যায়। ১১··টায় সময় খাইয়া আবার কলিকাতা যায়, ফেরে আমরা আমরা আফিসে যাওয়ার পর প্রায় ৬টায়। প্রতিভা এখানে আসে প্রায় ৩টায়। · Neither God, nor the world. reaches stable completion. Both are in the grip of the ultimate metaphysical ground, the creative advance into novelty. Either of them God, and the world, is the instrument of novelty for the other.—Process and Relily, P 493-4···

২রা ফেব্রুয়ারী

সকালে 'The Chief Currents' হইতে Marxism ও তাহার পরের অধ্যায় পড়ি।···আমরা মহানির্বাণ মঠে পৌঁছি ৯-৩ মিঃ। ট্রাম স্ট্যাণ্ডে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। বাই বাসে। ত্রিবিধ কল্মল ও তাহা দূর করিবার পন্থা, ঐক্য ও হৃদয়দৌর্বল্য, কার্পণ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'নিত্যত্বেঽহং নাস্মি মাং ত্বাং প্রপদ্যম্' শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া আলোচনা শেষ করি। ২৫ জনের উপর লোক হইয়াছিল।···আমরা হাঁটিয়া আসি।···চিদানন্দ, তাহার

পর যতীনবাবু সর্বশেষ উপেন ঘর আসে।...একদিন দুর্বার সাহস লইয়া তো আশ্রম করিয়াছিলাম সাহানগরে। কিন্তু সেদিন আমার উপর ছিল সম্পূর্ণ নির্ভর। রেণুরা যদি সাহস পায়, তবেই রাখা সম্ভব।...

৩রা ফেব্রুয়ারী

সকালে 'Pragmatism' পড়ি।—সন্ধ্যার পর সুরেশ গুপ্ত ও তাহার ভাগিনেয় আসে। বরিশালে দাদার সময়ের কথা—কেমন করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সহরে তাহার বাসায় অধিক রাত্রিতে গিয়াছিল ইত্যাদি আলোচনা হয়। সুদূর ভবিষ্যতে সেখানে দাদা হইবে বলিয়া সে মনে করে না। সুরেশ ও তাহার ভাগিনা ২জন গ্রাহকের নাম দিয়া গেল।...জীবনভরা আমি প্রত্যেককে তার তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি। তাই যাহারা তাহাদিগকে নিজ প্রয়োজনে লাগাইতে পারে নাই, তাহারা আমার উপর বিরূপ হইয়াছে।...মর্যাদা দিয়া মানুষকে পাইতে হয়। ১১টায় বিজ সরকার আসে, সঙ্গে তাহার দুইটী পুত্র। কবিতা ও প্রবন্ধ শুনায়।...

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

সকালে ব্রহ্মসূত্রের ৩০-শ কর্মের দ্বিতীয় প্রুফ ও ৩১-শ কর্মের প্যালি প্রুফ দেখি। 'ভারতী' দেখিতে হইবে। বৈদ্য দর্শন চলিতেছে। সুরেশ গুপ্ত আসে ৯টার পর। তাহার সঙ্গে কথা হয়। তাহার কর্মকে যে আমারই কর্ম বলিয়া মনে করি, তাহার উপর যে আমার দাবী আছে, সে-ই যে একদিন আমাকে 'গুরু, বন্ধু, নাথ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, ইত্যাদি প্রসঙ্গ হয়। তাহাকে ব্রহ্মসূত্রের ছাপানো ভার দেওয়া হয়। সে একবার বরিশাল হইতে বলে। যাইতে ইচ্ছাও হয়। টাকার অসুবিধাটাই এখন বড় অসুবিধা। বাড়ী ভাড়া আজও দেওয়া হইল না। এখানের বাজার খরচ অচল। এমন প্রতিকূল আবেষ্টনের মধ্যে যে কতদিন চলিব ভাবিয়া উঠিতে পারি না। ঠেলাঠেলি চলিল সারাজীবন। বন্ধুরা যে ২৫৲ টাকা প্রতিভার নিকট পাঠাইয়াছে, তাহার মূলধন খালি। ইহাতেই প্রতিভার খুব দুঃখ হইয়াছে। ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া সব সহিতে হইবে। তিনি যে জীবনের পুরুষোত্তম-সত্তাকে সম্মান দান করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার সুযোগ দিয়াছেন, সাধারণ সংসারী লোক হইলে যে হাতের মুঠার ভিতর পড়িয়া অন্তরাত্মার 'অবমান'ই করিতে হইত, ইহা ভাবিয়া বেদনা ভুলিতে হইবে। জয়, তাঁহারই জয়। রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া আসে প্রায় ৩টায়। প্রতিভা আসে ২টার পর। বিনুর একটা পোষ্টকার্ড আসে।...

৫ই ফেব্রুয়ারী

ভোর ৬টায় ট্রাম ধরিয়া হাটিয়া (মুতাপারে) বেহালা যাই।...আমাদের ভাগে যে ১০ মন চাউল পাওয়া যায়, তাহা কাঁকরবাগ ঘর দুয়ার রক্ষা, খরচের কাজ রক্ষা প্রভৃতি কাজেই বাহিত হওয়া ভাল। এতদিন উহার সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ ছিল না, আজ উহার উপর দাবী সোজা পায় না। ঘর দুয়ার, বাগান ঠিক থাকিলে একদিন যাওয়া সম্ভব হইবে। অনন্তকে পূর্বের চেয়ে আরও নিবিড়ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত হইতে বলিলাম। রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া ১১টার পর আসে। আমার পা'টা ধুইয়া দিয়া যায়। ১টার পর যায়। প্রতিভা আসে ৩টার পর। অতীনবাবু ১টার পর আসিয়া সরস্বতী পূজার জন্য রেণুকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া যায়। নীলুর জন্য অপেক্ষা করি, আসে না। আমার কাছে থাকিবার অবসর কই! সোকুলপুর ২দিন কম থাকিলে ক্ষতি হইত কি? যাক্। ধীরেন বানার্জী আসে। খগেন্দ্র ঘোষ ১খানা ব্রহ্মসূত্র কিনিয়া নেন ধীরেনবাবু মারফত। চিদানন্দ দফাওয়ারি গত বৎসরের হিসাবটা নোট করে। সুধাংশু ১১টায় আসিয়া ২খানা উদ্বোধনের জন্য ৷৵০ দিয়া যায়। ২টার পর আশ্রমে ফিরি। সতীশ গুহ এবারকার প্রচ্ছদপট, সাময়িকী ঔষধালয়ের সুখ্যাতি করিয়া পত্র দিয়াছে। সে 'বরিশাল বিজয়া সম্মেলন' প্রবন্ধটি (পৌষের) দেখিবার জন্য ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে পাঠাইয়াছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রকৃতি

॥ শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত ॥

কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক প্রবন্ধে বলেছেন—'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটি জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহাদের সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, আমাদের ভয় বিস্ময়, আমাদের সুখ দুঃখ জড়িত। তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়-বৃত্তির রসে ভাসিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগতকে আপনার করিয়া লই।"—সাহিত্যের তাৎপর্য।

মানবমনের উপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না, কারণ সৌন্দর্য প্রীতিই মানুষের সহজাত বৃত্তি আর এই সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়েই কবি বলেছেন—'সৌন্দর্য মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্তি আর মঙ্গল মূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বরূপ।" এই সৌন্দর্য শুধু মাত্র মানবদেহেই সীমাবদ্ধ নেই, বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত। বিশ্ব প্রকৃতির আলোয় ছায়ায়, অনলে সলিলে, পর্বতে প্রান্তরে, ফুলে ফুটিতে—সব খানেই বিচিত্র রূপের খেলা। মানুষের দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য সমস্তই প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। বেদের ঋষি হতে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ তথা তরুণতম প্রত্যেক কবিরই রচনায় প্রকৃতির রূপমাধুর্যের অবগান। এ রূপ তো আর পুরানো হবার নয়।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতারই সৃষ্টি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধের ভিত্তিতে। এবং কবিগুরুর এই সকল নিঃসর্গমূলক কবিতা অন্যান্য কবিদের নিঃসর্গমূলক কবিতা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। প্রশান্ত মহলানবীশের কথায় :- "বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে এটি যেমন কালিদাসের কাব্যের মূল সুর তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও মূল সুর। বালক কালের লেখার মধ্যেও সে সুর বাজিয়াছে এবং এখনও বাজিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবমনের মিলন যেখানে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই, সেখানেই বিরোধ, সেখানেই দ্বন্দ্ব।'''মানুষের সুখদুঃখের পিছনে যে বিশ্বপ্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, বনফুলের গন্ধের (কাব্য-নাটক) ফাঁকে ফাঁকে আমরা তাহার আভাস পাই।" প্রকৃতির সহিত মানবমনের মিলনের সুরই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রকাশিত। তাই প্রকৃতির বিরহবেদনা বনফুল, পূরবীর লীলাসঙ্গিনী রক্ত-করবীর রক্ত-বেদনায় সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট।

"এ সাত মহলা ভবনে আমার
চিরজনমের ভিটাতে,
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।"

কবিগুরু নিজেই তাঁর কাব্য প্রকৃতির প্রাণপ্রবাহের সুরটি ব্যক্ত করেছেন তাঁর আত্মপরিচয়ে। "এই জীবন যাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভ মুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া পূর্বরৌদ্রদীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া মনে হয় নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গিয়াছে। তখনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি—

হই যদি মাটি, হই যদি জল
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল

কিছুতেই নাই ভাবনা,
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

তখনি এ কথা বলিয়াছি—

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে—
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অতলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী—
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই
দিগ্বিদিকে আপনাকে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

আমার আত্মাগর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

মানব আত্মার দ্বন্দ্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্নিগ্ধ শ্যাম মাতৃমুখ-পানে,
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।

আশা করি পাঠকেরা ইহা হইতে এ কথা বুঝিবেন, আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।"

এই মাটির পৃথিবীর সাথে নিবিড় আত্মীয়তা—এ শুধু কেবল রবীন্দ্রনাথের একার। তালহোসী পাহাড়েই কবির তৃষ্ণা-পীড়িত অন্তঃপুরবদ্ধ জীবনের সাথে প্রকৃতির প্রথম পরিচয়। আদিম মানুষের বিশুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সাথে দুর্লভ এক দিব্যচেতনা নিয়ে সদর ষ্ট্রীটের বাড়িতে তিনি সূর্যোদয় দেখছেন আর সেই নূতন প্রভাতের বিকাশ দর্শনে কবির মনে হ'ল—'আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন।···সেই দিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটী যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।' আর সেই দিনই সুপ্ত সৌন্দর্যচেতনারও স্বপ্নভঙ্গ, কবি-মনের নবজন্ম। বিশ্বপ্রকৃতি তার অকৃত্রিম সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে কবির দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি একটি অপূর্ব অনির্বচনীয় মহিমায় উপলব্ধিতে লিখলেন—

—"হৃদয় মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

সেই সমস্ত চেতনা দিয়ে বিশ্বরূপ-দর্শন, সেই প্রথম দেখার মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-ব্যাপী কাব্য সৃষ্টির মূলে এই নিরুদ্যম। অজিত চক্রবর্তী লিখলেন—"প্রভাত সঙ্গীতেই কবির সমস্ত জীবনের ভাষ্যটির ভূমিকা নিহিত আছে।"

কবি-হৃদয়ের সাথে নিখিল বিশ্বাত্মার যে শুভ মিলন—রবীন্দ্রকাব্যেই বারে বারে তার পুনরাবৃত্তি। কবির কাব্যাত্মার সঙ্গে বিশ্বলক্ষ্মীর পরিণয়ে তাঁর সমগ্র কাব্যে যেন মিলনোৎসবের বিচিত্রতর ছন্দের নৃত্য।

ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রকৃতি রূপ পাল্টায়, তার সাথে কবির প্রকাশভঙ্গীরও চং বদলায়। এই অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতি বিচিত্র বেশে বারে বারে এসেছে। কখনো বা শৈত্যের বিষাদী বেশে—তখন,

'শীতের হাওয়ায় লাগল কাঁপন
আমলকির এই ডালে ডালে
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে—
করিয়ে দিল তালে তালে।

কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতির আগমন বসন্তের প্রাণ-মাতানো সৌন্দর্যে, অলির গুঞ্জনে, পুষ্প কলির সৌরভে, কন্দর্পরে নিত্য নবায়মান প্রাণের সঞ্জীবনীতে। যদিও 'যৌবনকথা এ বসন্ত', তবু কবির চিত্ত দুঃখময়ী আনন্দে উতরোল—

"মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে—
যেন মঞ্জরি দীপ শিখা
নীল অম্বরে রাখে ধরি।"

বসন্তের পরে আসে গ্রীষ্ম, বুকভরা তৃষ্ণার সাথে, আর—

"রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ বহু দিন
আমার নাহি যে জানে—
শুষ্ক কানন শাখে, ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে।"

সেই তৃষ্ণায়, সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সাধনা নিয়ে আসে শ্যাম-গম্ভীর সরসা বরষা তার কোমল শীতলতা নিয়ে আর কবি তাকে আগত জানিয়ে আহ্বান করেন—

"নীল-অঞ্জন-ঘন-পুঞ্জ ছায়ায় সম্বিত অম্বর,
হে গভীর! হে গভীর।"

কোমলে-কঠোরে মিলিয়ে প্রকৃতির রূপ। তাই এক দিকে যেমন গ্রীষ্মের অনির্বাণ তৃষ্ণা, কালবৈশাখীর ঘূর্ণিত আষাঢ়ের ভৈরব নৃত্য, অন্যদিকে শরতের অরুণালোকে নীল আকাশে সাদা মেঘের খেলায়, ফসল-ভরা-মাঠে, শেফালী বনের মনের কামনা আর শুভ্র কাশের বৈরাগ্যে আষাঢ়ের প্রশান্তি। প্রকৃতির এই পরিপূর্ণতার স্নিগ্ধ রূপ হেমন্তের মধ্যেও সার্থক—

"হিমের রাতের ঐ গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা কয়লো গোপন আঁচল ঘিরে···।"

আর তাই বিশ্বপ্রকৃতি—

"ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো
দীপালিকার জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো
সাজাও আলোর ধরিত্রীরে।"

প্রকৃতির সুবিপুল আয়োজনে কবির সৃষ্টির সার্থকতা বার্দ্ধক্যের শেষ প্রান্তে কবির মন ও জীবন যখন নাগরিক ঘন সভ্যতার আঘাতে জর্জ্জর, তখন শান্তিনিকেতনের মুক্তছায়ার চৈত্রের শালবনে কবি শান্ত। "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও ফিরে এ নগর···" বলে প্রার্থনা জানালেন।

অন্ধকারে তমিস্রার বন্যায়, সূর্যের মৃদু আহ্বানে, আলোর গানে, সুজলা-সুফলা প্রকৃতির শ্যামলিমায়, ধূসর উষর মরুর তপ্ত বালু প্রান্তরে, গহন অরণ্যে আর সুবিশাল প্রান্তরে, বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে বিচিত্রতর রূপের সাধনায়, কবির মৌন ভাষা বাঙ্ময়।

"তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে—
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।

সত্যিই প্রকৃতির সাথে এমন গভীর বন্ধন কোন দেশের কোন কবিই কোন কালেই করেন নি। ইংরেজ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী ও কীট্‌স্‌-এর কবিতায় প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশী। শেলী বলতেন প্রিয়জনের অনুপস্থিতিতে আমি এত সৌন্দর্য নিয়ে কি করব?.. 'Oh! to whom?' কীট্‌স্‌ এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির মাঝেই জীবনের পরম সান্ত্বনা আর আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বর্ণনা বিহারীলালের মত সিন্ধু-শৈল-আকাশের বাহ্য সৌন্দর্যের বর্ণনা নয়, মানুষের দৈনন্দিন সুখদুঃখের সাথে যুক্ত করে, প্রকৃতির উদার পটভূমিকায় মানুষের ভাগ্যের চিত্রাঙ্কন, প্রকৃতির সাথে মানুষকে একাত্মীকৃত করেছে। আবার যুগান্তরঞ্জন, সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রানুসারী কবি হলেও, তাঁদের প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন ধরণের। নির্জ্জনতার কবি জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতি-বর্ণনা আবার সম্পূর্ণ আত্ম-সচেতনমূলক। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রকৃতির সংযোগ অতি নিবিড়, সুগভীর সূক্ষ্ম বন্ধনে। "সুন্দরের মৌতাে সেই প্রকৃতি ও কবি-প্রাণের যে পরিচয় সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহার কবিতাগুলি যেন সেই মিলনোৎসবের বাঁশরীর গানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে।" আর রোমান্টিক ভাব-চেতনার সাথে এই প্রকৃতির রূপ বর্ণনার বিচিত্র সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখতে পাই।"

"···একদিন ফাল্গুন মাসের দিন শেষে অতি সামান্য যে একটা গ্রামের পথ দিয়া চলিয়াছিলাম, বিকশিত সর্ষের ক্ষেত হইতে সেই বাঁকা রাস্তা, সেই পুকুরের পার, সেই ঝিলিমিলি বিকেল বেলাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিনের করিয়া দিয়াছে।···সৌন্দর্যে আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর সমস্তকেই দেখি। মধুর গান সমস্ত জল-স্থল-আকাশকে, অতিক্ষুদ্রকেই মর্যাদা দান করে! সেই মহৎ ব্রতের উদ্‌ঘাটনের জন্যই—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রকৃতির সমস্ত অঙ্গনেই তাঁর কবি মনের

অবাধ যাতায়াত। ইন্দ্রিয়ানুভবময় এই মর্ত্যের সমস্ত সৌন্দর্যই তাঁর কাব্য-প্রেরণার উৎস।

"...এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন।...আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্র-স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম।...

প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি মন, তাহার স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে।...জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন, আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই প্রাকৃতিক রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুক্ত, সেই বোধেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন :—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ-গন্ধময়।" —আত্মপরিচয়

তাই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রকৃতির মধ্যেই মূর্ত। রবীন্দ্রনাথ ও প্রকৃতি যেন অবিচ্ছেদ্য অংশ—ইহাদের আলাদাভাবে দেখিবার কোনই উপায় নাই।

মৃত্যোর্মামৃতং গময়

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ॥

ওপারে সূর্যের দীপ্তি, এপারে আঁধার ;
ওপারে অনন্ত আশা, অমৃত জীবন-সম্ভাবনা
অথচ এপারে ছায়া শুধু হতাশার।

দুরন্ত ছন্দ নিয়ে অন্ধকার পথে আনাগোনা
দূর সূর্যলক্ষ্যে স্থির। ক্ষুব্ধ তুঙ্গতার
সুগন্ধ বৃত্তিকা ভ'রে আলোকিত আকাশ সাধনা

আমরা এনেছি কেড়ে ;—তবু যে আকাশে
যন্ত্রণায় প্রেতাত্মারা কুয়াশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
সেচক হিংসার ছায়া ছুটে ছুটে আসে !

হারাই পলকে প্রাণ—যে প্রাণ সুদীর্ঘ সাধনাতে
অগণ্য আত্মার ত্যাগে জলেছে আঁধারে ;
যে প্রাণ উদীপ্ত জ্বলে, গুলির আঘাতে।

অরণ্যবর্বর আজও পৃথিবীর বিকৃত হৃদয়
আদিম আঁধারে মোর জীবনের প্রত্যাশা হারাই।
ব্যর্থতার তীক্ষ্ণতায় অন্তহীন জীবনের জয়,
দুর্লভ অমৃত প্রাণ বলো, আজ কোথা খুঁজে পাই ?

"মামী"

॥ কুমারী শিপ্রা রায় ॥

মধুসূদনবাবু বেশ শান্তিতেই ছিলেন। তিনি তাঁর বোনের ছেলে মেয়েদের নিয়েই বেশ আনন্দে কাটাতেন। তাদের নিজের ছেলে মেয়ের মতই স্নেহ করতেন। প্রতিমা দেবীও হয়ত ও ভাবে থাকতে পারতেন, কিন্তু তাঁর নিজের ছেলে-পিলে নেই বলে বড় দুঃখ। মধুসূদন বাবু যে তাঁর ভাগ্নেদের নিয়েই মত্ত থাকেন, এতে প্রতিমা দেবীর একটু ঈর্ষাই হয়। কারণ তারা সামনে এসে তাঁর এ দুঃখটা আরও বাড়িয়ে দেয়।

মধুসূদন বাবুর হৃদয়ের অনেকটা অংশ জুড়ে বসেছিল তাঁর ছোট ভাগ্নে বাপি। তিনি ওকে নিয়েই বেশী সময় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর নিজের ছেলে মেয়ে নেই, এ অভাবটা তিনি বেশী করে অনুভব করতেন না। কিন্তু প্রতিমা দেবী বাপিকে এই অত্যধিক আদর দেওয়ার জন্যই জ্বালাতন বোধ করতেন।

একদিন বাপি ধরেছে মামাকে খেলনা কিনে দিতে হবে বলে।

বাপি—"মামা আমাকে সেই দম দেওয়া জাহাজটা কিনে দাও।"

মামা—"হ্যাঁ বাবা কিনে দেব। কিন্তু ওতে চড়ে তুমি কোথায় যাবে?"

বাপি—"অ···নে···ক দূরে।"

মামা—"কাকে কাকে জাহাজে করে নিয়ে যাবে?"

বাপি—তোমাকে, মা'কে, বাবাকে। কাছেই বসে মামী প্রতিমা দেবী তরকারি কুটছিলেন গম্ভীর মুখে। মামা তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—"আর তোর মামীকে নিয়ে যাবি না"। বাপি কিছুক্ষণ মামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। সেখানে একটা কঠিন ভাব। ছোট হলেও বাপি ঠিক বুঝতে পারে মামী তাকে ততটা ভাল বাসেন না। তার মামীর অপ্রসন্ন মুখ ভাল লাগল না। অতএব বিনা দ্বিধায় সে বলল—"যাদ্, আর কাউকে নিয়ে যাব না"। বলা বাহুল্য মামী এতে মোটেই খুশী হলেন না, এবং ঝাঁঝের সুরে বললেন—"থাক্ আমাকে দয়া কর। তোর মামাকে নিয়ে যা' তাহলেই হবে। আমি তোর জাহাজে চড়তে চাই না।'

বাপি তাঁর কাছ থেকে আর একটু দূরে সরে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে মামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখল একবার।

এরকম ব্যবহারে মধুসূদনবাবু কষ্ট পেলেন। তিনি প্রতিমা দেবীকে বললেন "তুমি ছোট বাচ্চাকে এত রাগ করে কথা বল কেন বুঝতে পারি না"। তারপর আবার চেষ্টা করতে লাগলেন যদি বাপি তার মামীকেও নিয়ে যেতে রাজি হয়।

মামা—"আচ্ছা বাপি, তুই মামীকে কেন নিয়ে যাবি না?"

বাপি—"মামী আমাকে ভাল বাসে না তাই।"

এ কথায় মামী আবার চটে যাবেন ভেবে মধুসূদনবাবু বাপিকে বললেন—"ওকথা বলতে নেই বাবা"; বলে ওকে নিয়ে উঠে চলে গেলেন।

প্রতিমা দেবী মনে মনে কিন্তু চটে রইলেন। এইটুকু ছেলেটা তাঁর পারিবারিক শান্তি নষ্ট করেছে। ওর জন্যই তিনি বকুনি খান। এরকম একবার নয় অনেকবার হয়েছে। মধুসূদনবাবু তাঁকে তিরস্কার করেছেন বাপির সঙ্গে কড়া ব্যবহার করার জন্য।

কিন্তু যতই রাগ থাকুক না কেন, প্রতিমা দেবী আবার বাপিকে মনে মনে ভালও বাসতেন। তাঁর মনের এক কোণে ওর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল, কিন্তু লুকানো। খেলতে খেলতে হঠাৎ বাপি মামীকে এসে জড়িয়ে ধরত। ছোট বোন মিতা যখন তাকে ধরতে দৌড়াত, তখন বাপি ছুটে এসে মামীর আঁচলের তলায় লুকাত। মামীও

তাকে কোলে তুলে নিতেন ও খুব আদর করতেন। তিনি মা না হলেও মায়ের মতন মমতা তথা হৃদয় পেতে ছিলেন। কিন্তু সে আদর এতলা; কেউ দেখে ফেলে এ তাঁর ইচ্ছা ছিল না। মধুসূদনবাবুর সামনে ত তিনি একে বারেই অন্যরূপ ব্যবহার কোরতেন। সেজন্য বাপি তার মামীকে ঠিক বুঝতে পারত না। মধুসূদনবাবুও ভাবতেন প্রতিমা দেবী ওকে একে বারেই ভাল বাসেন না।

একদিন এরকম সময় যখন প্রতিমা দেবী বাপিকে কোলে নিয়ে আদর কোরছেন আর নানান কথা বলছেন, বাপিও তার উত্তর দিচ্ছে হেসে লাফিয়ে, হঠাৎ স্বামীকে দেখতে পেয়ে তিনি বাপিকে কোল থেকে ধপাস করে নামিয়ে দিলেন। মধুসূদন বাবু সেটা দেখতে পান নি।

বাপি অবাক হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে মামীর মুখের দিকে চেয়ে। তার মুখে একটা দুঃখের ভাব হঠাৎ কোল থেকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য। মধুসূদনবাবু মনে করলেন হয়ত মামী ওকে কিছু কটু কথা বলেছেন। তিনি ওকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

প্রতিমা দেবীও অনেক সময় বাপিকে নিয়ে তুলে থাকতেন। কিন্তু যেই তাঁর মনে পড়ত বাপি তাঁর নিজের ছেলে নয় অমনি মন বিরূপ হয়ে উঠত।

মধুসূদনবাবু একদিন ওঁকে একান্তে অনেক করে বোঝালেন। বললেন যে, বাপিকে তাঁদের নিজের ছেলের মতই স্নেহ করা উচিত। তাতেই শান্তি আছে। এই সব কথা নিয়ে অনেক সময় অবধি কথা কাটাকাটি চলল। শেষ পর্য্যন্ত মধুসূদনবাবু রাগ করে উঠে চলে গেলেন।

প্রতিমা দেবীর মনটা খুব খারাপ ছিল। পরের দিন বিকালে ছাদে চুপ করে দাঁড়িয়ে তিনি কি ভাবছিলেন। বাপি আপন মনে বল নিয়ে খেলা কোরছিল। হঠাৎ বলটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে চলে গেল। বাপিও বলের পিছন পিছন দৌড়াল। প্রতিমা দেবী সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ বাপির পা ফস্‌কে গেল এবং সে কয়েকটা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং চীৎকার করে মামীকে ডাকতে লাগল। "মামী, ও মামী, শিগ্‌গির আমাকে ধর।" কিন্তু প্রতিমা দেবী কোনো সাড়া দিলেন না। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। খানিক পরে তাঁর হুঁস হল। তিনি বাপিকে ধরতে দৌড়ালেন। কিন্তু ততক্ষণে বাপি সবগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করে একেবারে সিঁড়ির তলায়। তার মাথা কেটে রক্ত বরছে। প্রতিমা দেবীর মাথাটাও হঠাৎ ঘুরে গেল এবং তিনি ধপাস করে পড়ে গেলেন।

সকলে দৌড়ে এসে বাপিকে তুলল। ডাক্তার ডাকা হোল। অনেক পরে যখন প্রতিমা দেবীর জ্ঞান হোল তখন তাঁর ঘরে শোওয়ানো হয়েছে তাঁকে। তিনি নিজের মনেই বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন। মাঝে মাঝে চীৎকার "বাপি···ওরে আমি তোকে বকলাম না··· বাঁচালাম না···"। তিনি যেন থেকে থেকে বাপির পড়ে যাওয়ার দৃশ্য চোখের সামুখে দেখতে লাগলেন। অনেক কষ্টে বাপি আস্তে আস্তে ভাল হতে লাগল। এবং ডাক্তার বলল আর কোন ভয় নেই। কিন্তু প্রতিমা দেবীর মাথার গোলমাল ঠিক হোল না। তিনি ভীষণ শক্ পেয়েছিলেন। নিজেকে ভীষণ অপরাধী বোধ কোর-ছিলেন। ডাক্তার বললেন অত্যধিক মানসিক শক্ পেয়ে এঁর এরকম হয়েছে। কিছুদিন চিকিৎসা চললে হয়ত বা পরে আবার সুস্থ হতে পারেন।

মধুসূদনবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তিনিও গিন্নিকে কম কথা শোনান নি। মনে মনে তিনিও নিজেকে এর জন্য দায়ী মনে করছিলেন। তাঁকেও প্রতিমা দেবী বুঝতে পারলেন না এই তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখ রইল।...

বন্ধুবরেষু

॥ শ্রীসুগত ॥

এবারেও পঁচিশে বৈশাখকে স্মরণ করার জন্ত অনেক-গুলো স্থান থেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। গিয়েছিলামও কয়েক জায়গায়। কিন্তু খুশি হতে পারিনি।

প্রথম থেকেই বলি: নিমন্ত্রণ পত্র যে ক'খানি পেয়েছিলাম, বেশ মূল্যবান কাগজে ছাপা। খামের মধ্যে ভরে যথাযথ বিলি হয়েছে। কিন্তু অনেকগুলির মধ্যেই দেখলাম বানান ভুল। সামান্য কয়েকটি কথা লেখা, তাও নির্ভুল নয়। অনেক লেখা হলে না হয় মুদ্রা-প্রমাদ মনে করা যেত, কিন্তু এ তো তা নয়। তাঁদের প্রতি এ অনাদর কেন! আমন্ত্রণকারী হিসাবে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা বেশ উচ্চ শিক্ষিত। তথাপি এই অবহেলার কারণ কি?

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্ত যাঁরা আগ্রহান্বিত, তাঁদের কর্মের প্রাথমিক এই ত্রুটি কি ক্ষমার্হ! যিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্বসভায় উন্নীত করলেন সুদীর্ঘ জীবনের একনিষ্ঠ সাধনায়, তাঁরই পূজায় ভক্তদের এ দৈন্য কেন?

তারপর অনুষ্ঠানের কথায় আসা যাক: সময়ের কথাটাই প্রথমে ধরি, সাড়ে ছ'টায় সময় দেওয়া যেখানে সেখানকার সভা সুরু হল আটটায়। এক জায়গায় আরও দেরি হল। সুরু হল সাড়ে নটায়। ভেবে দেখ তো অবস্থাটা।

প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল টাঙানো, স্টেজও তার মধ্যে। অনেক মানুষ উপস্থিত। ছোটদের সংখ্যাও কম নয়। তারাও জমতে সুরু করেছে ওই সাতটা থেকে। কী অপরিসীম ধৈর্য নিয়েই না তারা অপেক্ষা করছে। অবশ্য অপেক্ষা করার কারণ হয়ত না কবির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন, তার অনেক বেশি গান শোনা, নাচ দেখা ও অভিনয় দেখা।

হৈ চৈ গোলমালের মধ্যে দিয়ে স্টেজের পর্দা উঠলো। সভাপতি ও প্রধান অতিথি একজন করে রাখতেই হয়। ওটা একটা সভার অলঙ্কার বিশেষ। তাঁদের অবশ্য নির্দেশ দেওয়া হয়, দেখুন স্যার, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিলুম। কিন্তু কি করবো বলুন, ওই প্যাণ্ডেল-ওলা ঠিক সময় প্যাণ্ডেল তৈরী করতে না পারায় দেরি হয়ে গেল, যাই হোক, আপনারা স্যার, সংক্ষেপে কিছু বলবেন, এই দু'চার মিনিট; আমাদের আবার অনেক আর্টিস্ট (?) এসে বসে আছে সেই থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার পরের ঘটনা তুমি অনায়াসে কল্পনা করে নিতে পার।

এ জাতীয় উৎসবের সার্থকতা কতখানি বলতে পার? বিশ্লেষণ করে যদি দেখি তো কয়েকটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় এই সব অনুষ্ঠান করার মনোভাবের পিছনে।

প্রথম কারণ, অনেকে করছে অতএব আমাদেরও করা উচিত, এই মনোভাব। দ্বিতীয়, একটা উপলক্ষ পেয়ে খানিকটা রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা। যজমানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিটা এখানে একেবারে গৌণ। মুখ্য হচ্ছে, একটা কিছু করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের কর্মক্ষমতায় (অনেক-ক্ষেত্রেই তা অনিয়ন্ত্রিত) কিছুটা প্রকাশ করা। (অবশ্য এর মধ্যে থেকেও দেখেছি বিস্ময়কর কর্মক্ষমতা তথা শিল্প-নৈপুণ্য যা প্রকাশ করার সুযোগ হয়তো কোনদিন মিলবে না, উৎসাহ পাওয়া তো দূরের কথা।) আর একটা কারণ হয়তো এই যে প্রতিদিনের অত্যন্ত ক্লান্তিকর জীবন ধারার হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্ত অথবা কয়েকটা দিনের জন্তও রেহাই পাওয়া যায় উৎসবে মাতলে। এ কারণটাও কম নয়।

যাই হোক, আসল উদ্দেশ্যটা কিন্তু গৌণ। এবং গৌণ বলেই, এ জাতীয় উৎসব সফল হয় না।

বিরাট, বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের কত ধারা কত দিকে প্রবাহিত। তার যে কোন একটি ধারাকে গ্রহণ করে আমরা দিনের পর দিন অনুশীলন করতে পারি। সেই অনুশীলনের দ্বারা আমরা উপকৃতও হই।

কিন্তু সেদিকে তো আমাদের দৃষ্টি নেই। রবীন্দ্রনাথ অনেক বড়, তিনি গীতাঞ্জলি রচনা করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। গল্প, উপন্যাস নাটক রচনা করেছেন। শান্তি-নিকেতন গড়েছেন···ব্যস এইটুকু জেনে, আর বছরে বছরে নানা সভা সমিতিতে এই কথা উচ্চারণ করে আমরা খুশি হয়ে আছি।

আর একটা বড় আবর্ষণ পঁচিশে বৈশাখের যে এই উপলক্ষে একটা নাচ-গানের জলসা বসান যায়। যেটি আর কোন মহাপুরুষদের স্মরণ-সভায় সম্ভব নয়। (এবং সেই কারণেই অন্যান্য বহু মহাপুরুষদেরই আমরা ভুলতে বসেছি অথবা কোন মতে নিয়মরক্ষা করার মত তাঁদের একটুখানি স্মরণ করি।)

তাই পঁচিশে বৈশাখের উৎসবে গিয়ে প্রতি বৎসরই একই দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। কবির ছবি সামিয়ে তার সামনে দুচারটে কবিতার আবৃত্তি, (সে আবৃত্তিও অত্যন্ত বিরক্তিকর, এবং পর পর একই কবিতা শুনে মনে হয় যেন কবি ওই কটি কবিতাই রচনা করে গেছেন) আর বেসুরো গলায় (অনেক ক্ষেত্রেই) গান।

এই শুনে কি মনে হয় যে আমরা কবির প্রতি সত্যই শ্রদ্ধাসম্পন্ন অথবা তাঁর অমিত ঐশ্বর্যের কিছুমাত্রও গ্রহণ করেছি!

'রবীন্দ্রনাথ আমাদের', এ অভিমান আমাদের কম নয়, কিন্তু 'আমাদের' বলার অধিকার অর্জন না করলে তো 'আমাদের' বলা শোভা পায় না। 'আমাদের' বলা সার্থক হবে, যখন সত্য সত্যই আমরা তাঁকে গ্রহণ করে 'আমাদের' করে নিতে পারবো।

অবশ্য তাঁকে গ্রহণ করার কাজ সহজসাধ্য নয়। বিস্তর সাধনাসাপেক্ষ। কিন্তু কিছু কিছু করেও যদি আমরা নিতে চেষ্টা করি আপন আপন সামর্থ্য মত, তাহলেও তো আমরা সার্থক হই। তা না হলে কেবল মাত্র স্মরণের দ্বারা আমরা কতটুকু লাভবান হতে পারি?

রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে সর্বস্তরের মানুষের উপযোগী খাদ্য আছে। তিনি কাউকেই বঞ্চিত করেন নি। প্রয়োজন কেবল সেগুলি বেছে গ্রহণ করা। তাই যদি আমরা করি, তাহলেই সত্যিকারের রবীন্দ্র-উৎসব আমাদের সার্থক হবে। আমরা গ্রহণ করেই প্রমাণ করবো যে রবীন্দ্রনাথ 'আমাদের' এবং আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রীতি নিও।

সাময়িকী

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ঃ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আর ইহলোকে নাই। গত ১লা জুলাই ১৯৬২ তাঁহার একাশীতম জন্মদিনে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। যখন জন্মদিনের অভ্যর্থনার জন্য উৎসবের আয়োজন হইতেছিল, তখনই মৃত্যুর বিদায় বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সমগ্র বাংলা দেশ গভীর বিস্ময়ে শুনিল বিধানচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। তাঁহার মৃত্যুতে মানুষ এত বিস্মিত হইয়াছিল, এত অধিক সংখ্যক লোক তাঁহাকে শেষ দেখিবার জন্য রবিবার ১২টা হইতে সোমবার ২টা পর্যন্ত কলিকাতার রাস্তায় হাঁটিয়াছে যাহা দেখিয়া মনে হইল বিধানবাবুকে মানুষ এতটা ভালবাসিয়াছিল, এ কথা তো আগে এমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বিধানবাবু প্রতিভাবান —প্রতিভার একটা সহজ শক্তি আছে মানুষকে আকর্ষণ করিবার—তদুপরি একটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরূপ ঐশ্বর্যও একদল লোককে আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহাহউক, আমাদের মত সহস্র সহস্র মানুষের সাথে তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও যে আমরা বেদনা বোধ করিয়াছি, তাঁহার প্রতিভা ও মুখ্যমন্ত্রীরূপ কারণ দুইটী ছাড়া আরও একটী কারণ এই যে সর্ব সাধারণের জন্য তাঁহার একটী দরদী হৃদয়ও ছিল। তাই তাঁহার মৃত্যুতে এমন একটী স্বতঃস্ফূর্ত বেদনা প্রকাশ পাইয়াছিল।

বিধানবাবুর প্রতিভা কেবল চিকিৎসাবিদ্যায় প্রকাশিত হয় নাই, শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহার অনন্য প্রতিভা বাঙ্গালাদেশকে অনেক আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। অবশ্য আমরা তাঁহার নিকট আরও বেশী আশা করিতাম—তিনি চোরাকারবারীদের আরও দৃঢ় হস্তে দমন করিবেন, তিনি ধনীর ধনবৃদ্ধির প্রবৃত্তিকে বাড়িবার সুযোগ দেওয়া দুরস্থান দৃঢ়ভাবে সংযত করিয়া দরিদ্রের ঘরে যাহাতে ভাত কাপড় পৌঁছে, তাহার জন্য আরও সচেতন হইবেন, তাঁহার সকল পরিকল্পনার পেছনে তিনি বাঙ্গালাদেশের স্বার্থরক্ষার দিকে আরও অধিক দৃষ্টি দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক কিছু আমরা তাঁহার নিকট আশা করিতাম। কিন্তু আশা করিলেই তো হয় না—একে তো একজন মানুষের সমস্ত রকম গুণই থাকে না, দ্বিতীয়তঃ আমরা যে কেবল আশা করি আর দাবী করি, আমাদের নিজস্ব যোগ্যতা কতটুকু? আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা এত বেশী দাবী করিবার যোগ্যই নই। রাজা ভাল হইলে প্রজা ভাল হয়, এও যেমন সত্য কথা, আজ গণতন্ত্রের যুগে সজ্ঞান প্রজার ভালত্বের শক্তি রাজাকেও ভাল করিয়া তুলিবে, এও তো সত্যি কথা। তাই আমরা যদি আরও ভাল হইতাম, আমরা নিজেরা যদি চোর না হইয়া চোরাকারবার বন্ধের দিকে দৃষ্টি দিতাম তাহা হইলে বিধানবাবুও আরও ভাল হইতে বাধ্য হইতেন। আমরা জনসাধারণ যদি আরও ভাল না হই, তাহা হইলে নেতৃত্বকে আরও ভাল হইবার দাবী যেন আমরা না করি। আমাদের মত ক্ষুদ্র চিত্ত ও ক্ষুদ্র শক্তি মানুষগুলির মধ্যে বিধানবাবু কেবল দেহেতেই বৃহৎ ছিলেন না, সব দিক দিয়াই বৃহৎ ছিলেন। সেই বিধানবাবু বাঙ্গালাদেশ ও সমস্ত ভারতের কল্যাণব্রতে আর উপস্থিত থাকিবেন না—জনসাধারণকে আজ সে দায়িত্ব লইতে হইবে; জনসাধারণের ভালত্বের টানে কর্তৃপক্ষকে অধিকতর ভাল হইতে হইবে, গণতন্ত্রের ইহাই আহ্বান।

বিধানবাবু প্রতিভার বরপুত্র ছিলেন—প্রতিভা আমার আপনার করায়ত্ত নহে—ইহা ভগবানের দান—ইহা চেষ্টা করিয়া বিশেষ কিছু বাড়ান যায় না, কিন্তু বিধানবাবুর জীবন হইতে যেটা আমি আপনি সর্বসাধারণ চেষ্টা করিয়া গ্রহণ করিতে পারি—সেটা হইল তাঁহার কর্মশক্তি। অলসতায় প্রসিদ্ধ, কর্মকুণ্ঠ বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি যে কর্মশক্তি লইয়া সারাদিন কাজ করিতেন, মৃত্যুর একদিন আগে যাত্র যিনি শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বিধানবাবুর জীবন

হইতে আমরা জাতীয় জীবনে কর্মশক্তি লাভ করিবার জন্য সাধনা যদি করি, যদি তাঁহার জীবন দেখিয়া আমরা আরও একটু কর্মী হইতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহার আত্মার শান্তি হয়, তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হয়—বাঙালীও জাতি হিসাবে আর একটু গৌরব লাভের অধিকারী হয়। নেতাকে শ্রদ্ধা জানাইতে আমরা প্রত্যেককে এইখানে আহ্বান করি—স্কুলে স্কুলে, কলেজে ক্লাবে ময়দানে পার্কে বিধানবাবুর জন্য যে সভা হইতেছে, হইবেও—শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধের হৃদয়ের মধ্যে অন্ততঃ এই কথাটী যদি প্রবেশ করাইয়া দিতে পারি যে, বিধানবাবুর কর্মশক্তি যেন আমরা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা একটা মস্ত কাজ করিলাম। সিনেমা আর্টিস্টদের দেখিয়া দেশের যুবক-যুবতীরা কথাবার্তা চলা-ফেরা সাজ-পোষাক নকল করিয়া থাকে, নেতার জীবন দেখিয়া তাঁহার কর্মশক্তি কয়জন নকল করিবার চেষ্টা করিবে? আমরা যাহারা অভিভাবক তাহারা যেন বিধানবাবুর এই কর্মশক্তি ছোটদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাইবার চেষ্টা করি—তাহা হইলেই বিধানবাবু জাতীয় জীবনে অমর হইয়া রহিলেন। বিধানবাবু তাঁহার বহু-মুখীন প্রতিভা দ্বারা তাদের মধ্যে একটা গতিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন—আমরা তেমন গতি বা বহুমুখীন প্রতিভা চেষ্টা করিয়া পাইব না, কিন্তু তাঁহার কর্মশক্তি চেষ্টা করিয়া অন্ততঃ অনেকটা পাইতে পারি। বিধান বাবুকে স্মরণ করিতে বসিয়া আমরা জাতির জীবনে জীবনে স্মরণে তিনি কি কি দিয়াছেন তাহা চিন্তা করার সাথে তাঁহার এই অসাধারণ কর্মশক্তিকে যেন ধ্যান করি—সীমাহীন বলে বলিয়া তাঁহাকে এই ভাবে আয়ত্ত করিতে সাধনা করি।

'যা-কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে
যে মণি ছলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে॥'

—রবীন্দ্রনাথ

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে স্বামী নরনারায়ণানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

UNIVERSITY LIBRARY

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

—শ্রীগোপাল মিত্র এম.এ. পঞ্চদশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র-ধর্ম্মের ভেদের কাটালে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটি স্বয়ংমূল্য আস্বাদন—ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম আস্বাদন করায় জীবনের অতিগ (transcendental) দিক, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (immanent) দিক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুইই। তাইতো তিনি জীবন-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম্ম বা একান্ত রাষ্ট্র অচল। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ' (ভোজপতি কংসের মৃত্যু) বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্ম্মপতিরূপে 'তত্ত্বং পরং যোগিনাম্' (যোগিগণের পরতত্ত্ব কৈবল্য)।

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

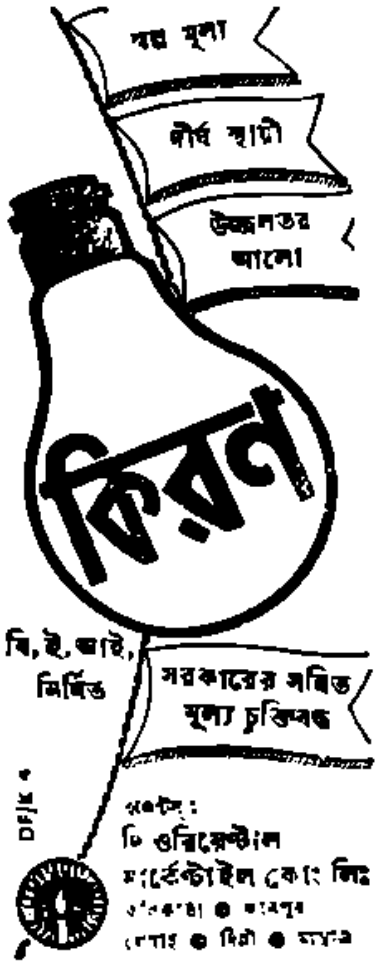

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

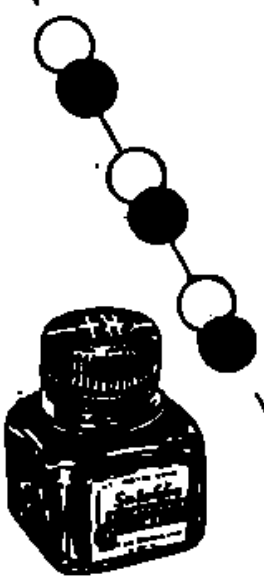

নিবে কালি শুকায় না;
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী	
শ্রীকৃষ্ণ	৫·০০	ছাত্রদের কর্মবাণী	
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০	Soul of India Speaks	

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	বাংলার ঋষি	
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	রাজর্ষি রামমোহন	
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	আচার্য জগদীশ	
বাংলার বিদুষী	১·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	
বাংলার মনীষী	১·২৫	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	
জীবন গড়া	·৭৫	রবীন্দ্রনাথ	

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বিটি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০	বঙ্কিমের গল্প	১·২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ—সংশোধিত পরিবর্ধিত সংস্করণ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী :: ১৫, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

সূচীপত্র : ভাদ্র, ১৮৮৪, ১৩৬১,

১। সহজ মানুষ
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

২। পরম আহ্বান (কবিতা)
শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য

৩। প্রার্থনাকালীন ভাষণ (১৩)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত

৪। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫০)

৫। আমাদের ইংরেজী শেখা ও শেখানো
অধ্যাপক তারাপদ ভৌমিক

৬। পুস্তক সমালোচনা

৭। রামায়ণ কি মহাকাব্য
শ্রীজনার্দন বেদজ্ঞ, সাহিত্য-বিশারদ

৮। সাময়িকী : পনেরই আগষ্ট

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.

উদ্বোধন

ভাদ্র, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

১৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

সহজ মানুষ *

।। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ।।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।

ভাগবত ১০।৩৩।৩৬

—ভূতসমূহের অনুগ্রহের নিমিত্ত ভগবান মানব-দেহ আশ্রয় করিয়া এমন সব ক্রীড়ার ভজনা করেন, যাহা শুনিয়া ভূতসমূহ তৎপর হইবে।

যাহার জীবনে সকল সহজ, স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ, সকল স্পন্দনসমূহ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ব্রহ্মমূল্যে সফল সার্থক, কোনও বৃত্তিই যাহার জীবনে নিপীড়িত, নিগৃহীত ও অবদমিত হইয়া অবচেতন মনে জটিলতার, গ্রন্থির (complex) সৃষ্টি করিতে পারে নাই, সেই জীবনই সহজ জীবন। শ্রীকৃষ্ণই এই সহজ জীবনঘন মানুষ। 'সহজ মানুষ' এই শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই ভাগবত এমন একটি অভিনব সভ্যতা প্রবর্তনের পরিকল্পনা রাখিয়া গিয়াছেন, যাহার মধ্যে মূলতঃ অধ্যাত্মবাদী ভারত ও মূলতঃ জড়বাদী পাশ্চাত্য অঙ্গোঙ্গিভাবে সমন্বিত হইয়া বিশ্ব হইতে শোষণের জ্বালা দূর করিতে সক্ষম হইবে। শ্রীকৃষ্ণ শোষণমুক্তি। তাঁহার জীবন অন্তরক্ষেত্র ও জড়-ক্ষেত্রের শোষণকে শুষিয়া লইয়াছে। তাঁহার জীবনে অন্তর জড়কে শোষণ করে নাই, তাঁহার জীবনে জড়ও অন্তরকে শোষণ করে নাই। আগামী বিশ্বসভ্যতার জনক তাই শ্রীকৃষ্ণ।

সহজ মানুষ গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণই একদিন অর্জুনকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—'মন্মনা ভব'—'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'···তোমার মন আমিতে স্থাপন কর, তোমার মন তোমার আমি-কে প্রতিপন্ন না করিয়া আমার 'পুরুষোত্তম আমি'কে প্রতিপন্ন করুক'...'তোমার মন আমার আমি-তে আধান কর'···'আমার আমির মধ্যে তোমার বুদ্ধি নিবিষ্ট কর'। কেন মানুষের মন বুদ্ধি লইয়া পুরুষোত্তমের এত কাড়াকাড়ি? বলিতেছি। মন 'পুরুষোত্তম-আমি'-গত না হইলে কিছুতেই যে মানুষ সহজ হইতে পারে না! মন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত অবরহঃ দুই প্রান্তে দুলিতেছে—ইহার একপ্রান্ত হইতেছে 'আত্মা', অপর প্রান্ত 'সর্বভূত'। জীবের মন যখন জৈব আমি-গত, তখন সে তখনও আত্মা ও সর্বভূতের সমন্বয় বিধান করিতে পারে না। অথচ শ্রুতি

যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে। ১

এই মন্ত্রদ্বারা কি আত্মা ও সর্বভূতকে আধার-আধেয়রূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্থাপন করিয়া এই সমন্বয় বার্তাই পৌঁছাইয়া যান নাই? যাহার জীবনে আত্মা ও সর্বভূত স্ব স্ব বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া সমন্বিত, সেই জীবনে লুক্কায়িত বলিয়া কিছুই থাকে না, গোপন করিবারও কিছু থাকে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ 'নবনীতচৌরং ব্রহ্ম', 'গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম।'

কিন্তু জৈব 'মন' ইহা ধারণ করিতে অক্ষম। মনের ভাষা হইতেছে Either—or-এর ভাষা, 'হয় এটা না হয় ওটা'র ভাষা। হয় সে আত্মার দিকে একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িবে, আত্মারই স্বরূপতা স্বীকার করিবে এবং

* উদ্বোধনের পঞ্চম বর্ষ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

সর্বভূতকে রাখিবে আত্মসিদ্ধির প্রয়োজনে আত্মার সহায়ক-রূপে, নয় তো সে ঝুঁকিয়া পড়িবে একান্ত সর্বভূতেরই দিকে এবং তাহারই মূল্যে আত্মাকে ব্যবহার করিবে চোরের (surreptiously) মত; এইখানে আত্মা সর্বভূতের সহায়ক ছাড়া বেশী আর কিছুই নয়। ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহারা কেহই কিন্তু একান্তভাবে আত্মা বা সর্বভূত কাহাকেও লইয়াই ঘর সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন না। কখনও আত্মা হইতেছে সর্বভূতের আধার, এবং সর্বভূত সেখানে থাকে বাস্তবের ইপ্সিত বস্তুরূপে; পক্ষান্তরে আধার সর্বভূতই হয় আধার এবং আত্মা হয় সেখানে ইপ্সিততম বস্তু। আত্মা-সর্বভূতের দ্বৈতরূপ বজায় না রাখিয়া কেহ চিন্তারাজ্যে বা বাহিরের জগতে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবেন না। অথচ সিদ্ধান্তের বেলায় ইহারা আত্মা বা সর্বভূতকে 'একান্ত' বলিয়া স্থাপন করিতেছেন। আত্মা ও সর্বভূত তো কখনই একান্ত নিরপেক্ষ নয়। আত্মার অপেক্ষা না করিয়া কি কেহ সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারিয়াছে, না সর্বভূতের অপেক্ষা না করিয়াই আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে? চিন্তায় ও ব্যবহারে যাহারা নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত, সিদ্ধান্তে তাহারা একে অপরের মধ্যে মুছিয়া যাইবে, একই থাকিবে—ইহা অসম্ভব। বুদ্ধির এক প্রান্ত ঐ 'আত্মা' যদি পারমার্থিক, বুদ্ধির অপর প্রান্ত সেই আত্মারই আপেক্ষিক 'সর্বভূতই' বা পারমার্থিক হইবে না কেন? কিম্বা বুদ্ধির এক প্রান্ত ক্ষর সর্বভূত যদি মিথ্যা তবে সেই সর্বভূতেরই আপেক্ষিক অক্ষর কূটস্থ 'আত্মা'ই বা মিথ্যা হইবে না কেন? হয় সেতুনাথের দুই প্রান্তই সমভাবে সত্য, নয় দুই-ই মিথ্যা। একান্ত আত্মা বা একান্ত সর্বভূত দুই-ই বিমূর্ত প্রত্যয় (abstract concept), উহারা ব্র্যাড্‌লির ভাষায় bloodless categories মাত্র (রক্তহীন সংজ্ঞা)। মনকে 'পুরুষোত্তম-আর্বি'র স্তরে উন্নীত না করিতে পারিলে আত্মা ও সর্বভূত রক্তহীন সংজ্ঞারূপে পরিণত হইবেই। 'পুরুষোত্তম-আর্বি'র স্তরেই আত্মা ও সর্বভূত দুই দুই থাকিয়া, দুইয়ের স্বরূপ-ধর্ম বজায় রাখিয়াই এক। এই একই জীবন্ত এক। বৈষ্ণব 'আর্বি'র স্তরে একান্ত আত্মার একত্ব বা একান্ত সর্বভূতের বহুত্ব মুক্ত।

নিত্যবর্তমান পুরুষোত্তম নিজ জীবনের টানে জীবের মন-বুদ্ধিকে আত্মসাৎ করিয়া, মনবুদ্ধির পরাক্রম ছুটাইয়া তুলিয়া এক জীবন্ত ঐক্য (living unity) স্থাপনের কৌশল দেখাইয়া দিয়াছেন। মনবুদ্ধি পুরুষোত্তমাপিত হইলেই স্ফুরিত হয় প্রাণসাধনা, হৃদয়ের সাধনা। মনবুদ্ধি পরস্পর-বিরুদ্ধের মাঝে যে সমন্বয় করিতে পারে নাই, প্রাণসাধনা তাহাই করিয়াছে। এই প্রাণ পজিটিভ; পক্ষান্তরে মনের অতীত যে অতিমানস, তাহা নেগেটিভ। মন নিজেকে পুরুষোত্তম-জীবনে পলাইয়া যখন অতিমানস হয়, তখনই তাহার নাম হয় 'প্রাণ'। নির্বৈধ এই প্রাণ-সাধনার স্তরেই বিশ্ব অতীতের দ্বন্দ্বপরিষ্কৃত মনসাধনার স্তর ডিঙাইয়া স্থিত হইবার জন্য আজ আকুলি-বিকুলি করিতেছে। একমাত্র প্রাণসাধনাই পজিটিভ (বাস্তব) বস্তুর খোঁজ দিতে পারে। বাস্তব বস্তু হইতেই প্রাণ-সাধনার যাত্রা শুরু হয়। অন্যান্য সব সাধনার যাত্রারম্ভ মনঃকল্পিত বিমূর্ত প্রত্যয় হইতে—হয় 'ক্ষর' হইতে, নয় তো 'অক্ষর' হইতে। 'অপুরুষ পুরুষ' (Impersonal Person) হইতে সাধনার আরম্ভ না হইলে কিছুতেই বিবর্তের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। প্রচলিত অক্ষরও বিবর্ত, ক্ষরও বিবর্ত। ক্ষর-অক্ষর সমন্বিত, ক্ষর-অক্ষর অতীত, চোখের সামনে বর্তমান পুরুষোত্তমই নির্বিকল্প। ইনিই বিশ্বের 'দৃষ্টান্ত'। 'মন' জড় ও অজড়ের দ্বারী কিছুতেই সমমূল্যে স্বীকার করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না। 'যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসঃ লিঙ্গম্'—যুগপৎ-জ্ঞানের অনুৎপত্তিই মনের চিহ্ন। মনের সাধ্য নাই যে, সে ক্ষর-অক্ষরের যুগপৎ-জ্ঞান উৎপন্ন করে। প্রাণই ক্ষর-অক্ষরের যৌগপদ্য জ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম। তাই শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের প্রাণবল্লভ, গোপীগণের পরাণবঁধু।

আদর্শবাদীর 'মন' অক্ষরের দ্বারী পুরুষ করিয়া ক্ষরের দ্বারী পদদলিত করিয়াছে, ক্ষরের ক্ষণ-ধর্মকে আত্মার শত্রু করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষর স্বীকৃত হইলেও সে

তো তাহার দাবী ছাড়ে নাই, জীবন-যন্ত্র হইতে নিষ্ক্রিয় হয় নাই। শরৎচন্দ্রের ভাষায় তাহার দাবী যে প্রকৃতির পাকা দলিলে স্বাক্ষর করা হইয়াছে। 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'। প্রতি অঙ্গের কান্না কি কেহ থামাইতে পারিয়াছেন? লৌকাক্ষি, পরাশর, ভৃগুমুনি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহান্ মহান্ পুরুষগণও কি অঙ্গের এই 'সনাতন' কান্নাকে অস্বীকার করিতে পারিয়াছেন? 'অঙ্গে'র কান্নার অবমাননা করিয়া তাঁহারা 'অনঙ্গে'র আক্রমণকেই ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। অঙ্গের ভাগবত-রূপ আস্বাদন না করা পর্যন্ত, প্রতি অঙ্গের কান্নাকে দিব্য কান্নায় গড়িয়া না তোলা পর্যন্ত অনঙ্গের হাত হইতে কাহারও যে রেহাই নাই, ভাগবতের মনঃসমীক্ষণ ইহা ভারতের পুরাণ-প্রসিদ্ধ মহাশক্তিধরদের জীবনচরিত দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছে। যেখানে দেহ-দেহীর ভেদ বর্তমান, যেখানে দেহের দাবী ও দেহী আত্মার দাবী সমমূল্যে স্বীকৃত হয় নাই, সেখানে অনঙ্গদেবের আবির্ভাব অনিবার্য। অনঙ্গের প্রয়োজন হইতেছে 'মদনমোহন' বস্তুকেই প্রকট করা। অনঙ্গকে কে নিরোধ করিবে? তাই কাম 'অনিরুদ্ধ'। এই অনিরুদ্ধকে নিরোধ করিতে গিয়া বানরাজার রাজ্য রক্তপ্লাবিতই হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন, প্রদ্যুম্ন বিশ্বকাম (cosmic libido), আর অনিরুদ্ধ ব্যষ্টিকাম। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে অকাম-সর্বকাম-মোক্ষকাম। অনিরুদ্ধের প্রকাশের মূল রহস্য হইতেছে প্রতি ব্যষ্টি-জীবনের ব্যষ্টি-কামকে বিশ্ব-কামের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া প্রতি জীবনকে মদনমোহন বস্তুতে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এ সংসারে কোন কিছুই 'চক্রান্ত' করিয়া জীবকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ভগবতী মায়া, পরব্রহ্মমহিষী মায়া কাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবেন? জীবের বিরুদ্ধে? জীব কি এমনই শক্তিমান যে, বিশ্বপ্রকৃতিও তাহার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করিবার প্রয়োজন বোধ করে? কোন্ পাষাণী মা দুর্বল শিশুসন্তানকে বিপন্ন করিবার জন্য মায়াজাল বিস্তার করেন, জটিলতার সৃষ্টি করেন? এই বিশ্বের সব-কিছুরই একটি পরিষ্কার অর্থ রহিয়াছে। তাই ভগবানে বিশ্বাস, ভগবতী-শক্তির উপর বিশ্বাস, বিশ্বের উপর বিশ্বাস যাহার নাই, সে কি করিয়া প্রাণের স্তরের, অতিমানস স্তরের সন্ধান পাইবে? প্রকৃতিকে সন্দেহ করিয়া কেহ প্রকৃতির হাত হইতে মুক্তি পাইবে না, যত শক্তিধরই তিনি হউন না কেন। প্রকৃতি-অবিশ্বাসীর কাছে অতিমানস বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইবে, তাহাও মনের সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র। তাহা আর 'অতি' হইল না। যে মানুষ মনকে বিশ্বাস করিল না, মনই বা তাহাকে ফাঁকি দিবে না কেন? মন তখন সব-কিছুর মধ্যে পাকের সৃষ্টি করিবেই। প্রকৃতিতে যাহার অবিশ্বাস, প্রকৃতি তাহার কাছেই ছলনাময়ী; তাহার মন তাহাকে ছলনা দ্বারা বিপন্ন করিবেই। তাই গীতায় মনকে বাস্তব জ্ঞানবস্তুর কাছে সমর্পণ করিবার প্রসঙ্গ উঠিয়াছে।

জৈব মনই হউক বা জৈব বুদ্ধিই হউক, একটু প্রণিধান-পূর্বক লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, কেহই ফাঁকাভূমির জন্য বসিয়া নাই; দুইয়েরই সহজ গতি পুরুষোত্তমাভি-মুখিনী। মনবুদ্ধির অন্তর্নিহিত এই পুরুষোত্তমমুখিনী গতিকে সর্বক্ষেত্রে চিনিবার জন্য, ধরিবার জন্যই প্রয়োজন হয় পুরুষোত্তম-জীবনলাভে ধন্য কোনও সহজ মানুষের শরণাগত হওয়া। যাহাকে চোখে দেখা যায়, সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা যাহাকে সেবা করা যায়, এমন কোন মানুষ-ভগবানের পদাশ্রয় ব্যতীত কে কবে অঙ্গের কান্নাকে আত্মার কান্নার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া দিব্য ভাগবতজীবন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে? একমাত্র রক্তমাংসে গড়া একটি বাস্তব-জীবনের মধ্যেই পরস্পরবিরোধী formal truth ও material truth, induction ও deduction সমন্বিত হইতে পারে। 'দৃষ্টান্ত'স্বরূপ এই পুরুষোত্তমের বাহিরে কোনও মনে কোনও বুদ্ধিতেই এই সমন্বয় সম্ভব নয়। একান্ত নির্বাক্তিক সাধনায় অঙ্গবোধ কিছুতেই কাটিবে না।

চিত্তবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষিতিবৃত্তি পর্যন্ত জীবনের সকল বৃত্তি, জীবের প্রতি অঙ্গের কান্না কোন্ কৌশলে দিব্যভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহারই একটি

চিত্র আমরা ভাগবত গ্রন্থ হইতে আঁকিতে চেষ্টা করিব। শিশুপাল সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দা করিয়াও উত্তম গতি লাভ করিয়াছিলেন। আপাতপ্রতীয়মান এই বিরুদ্ধতার হেতু অবগত হইবার জন্য যুধিষ্ঠির ভক্ত-চূড়ামণি নারদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

শপতোরসকৃদ্বিষ্ণুং যদ্ব্রহ্ম পরমব্যয়ম্।
দ্বিজো ন জাতো জিহ্বায়াং নাঙ্গং বিবিশতুস্তমঃ।
কথং তস্মিন্ ভগবতি দুরবগ্রাহ্যধামনি।
পশ্যতাং সর্বলোকানাং লয়মীয়তুরঞ্জসা।

ভাগবত ৭।১।১৬-১৭

—শিশুপালাদি সব অবতার ব্রহ্ম বিষ্ণুর প্রতি বার বার কটূক্তি করিলেও ইহাদের জিহ্বায় কুষ্ঠরোগ হইল না, এবং ঘোর নরকেও প্রবেশ করিল না, ইহা কি আশ্চর্য! সর্বলোকের চোখের সামনে ইহারা কিরূপে দুর্লভস্বরূপ এই বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিলেন?

ইহার মীমাংসা করিতে গিয়া শ্রীনারদ বলিতেছেন—

তথা ন বস্ত কৈবল্যপ্রতিমানোঽবিদাত্মনঃ।
পরস্য হি ময়স্তুহি হিংসা দেনাস্ত কল্পতে।
তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্॥

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।

—কৃতঘ্নসমূহ যেমন বৈষম্যবশতঃ 'আমি' ও 'আমার' অভিমান করিয়া পরস্পরের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে, অবিদ্যাত্মা কেবল ভগবানের তো সেইরূপ অভিমান নাই। সেইজন্য বৈরভাবে, নির্বৈর ভক্তিযোগে, স্নেহ-ভয়ে বা কামদ্বারা শ্রীভগবানে যুক্ত হইবে। এই উপায় গুলির মধ্যে কোন প্রকারের পার্থক্য ভগবান দেখেন না।... সেইজন্য যে কোনও উপায়ে মন কৃষ্ণে নিবিষ্ট করিবে।'

শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায়ও বলিয়াছেন—'সমোঽহম্ সর্বভূতেষু'। তিনি সর্বক্ষেত্রে সম—সত্ত্ব রজঃ তমে সম; সাত্ত্বিক কর্ম, রাজস কর্ম, তামস কর্মে সম; সাত্ত্বিকী বৃত্তি, রাজসী বৃত্তি, তামসী বৃত্তিতেও তিনি সম। গুণগত বৈষম্য এবং গুণ-কৌলীন্য তাঁহাতে নাই। কর্মগত বৈষম্য এবং কর্ম-কৌলীন্য তাঁহাতে নাই; বৃত্তি বৈষম্য এবং বৃত্তি কৌলীন্যও তাঁহাতে নাই। প্রতি গুণ-কর্ম-বৃত্তির সঙ্গে রহিয়াছে তাঁহার সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। গুণগত, কর্মগত ও বৃত্তিগত উচ্চ-অবচ কল্পনা তাঁহাতে অচল। শ্রীভগবান যদি নির্গুণ, তবে তাঁহার কাছে সত্ত্ব-গুণেরও যে মূল্য, রজস্তমোগুণেরও কি সেই একই মূল্য নয়? 'নির্গুণ' অর্থ যদি 'কোনও গুণ না-থাকাই', তবে সত্ত্বও তাঁহাতে নাই, রজস্তমও নাই। না থাকার মধ্যে আবার উচ্চ-অবচ কল্পনা কেন? অথচ সাধনার ক্ষেত্রে আমরা এতদিন তাহাই করিয়া আসিয়াছি। রজস্তমকে পরিহার করিয়া, সাত্ত্বিক হইয়াই আমরা নির্গুণ হইতে চাহিয়াছি। কিন্তু রজস্তমের কাজ ও চক্রান্ত সত্ত্বগুণকে পথভ্রষ্ট করিয়া আপন অধিকার স্থাপন করিয়াছে। বস্তুতঃ নির্গুণ পুরুষোত্তমের শ্রীক্ষেত্রে সত্ত্ব রজঃ ও তমের টানাটানি, নেতৃত্ব নিয়া কাড়াকাড়ি ছিল না। এই কাড়াকাড়ির প্রবর্তন করিয়াছে জৈব মন ও বুদ্ধি। সেখানে গুণত্রয়, কর্মত্রয় ও বৃত্তিত্রয় স্ব স্ব বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজকে সামনে রাখিয়া এবং অপর দুইটী দ্বারা সমর্থিত ও পুষ্ট হইয়া জীবনকে গড়িয়া চলিয়াছে, সেই ক্ষেত্রই নির্গুণের ক্ষেত্র, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র। অহঙ্কার হইতে সাধনা সুরু হইলে গুণ-বৈষম্য ও গুণ-কৌলীন্য আসিবেই। জৈব 'আমি'র সর্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম-আত্মতে তত্ত্বের সাধনা আরম্ভ হইলেই এই জগৎ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠে।

এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই বৈরভাব দ্বারা সেবা করা চলে, এই শ্রীক্ষেত্রেই নির্বৈর ভক্তিযোগ দ্বারা সেবা চলে, ভয় স্নেহ ও কামদ্বারাও পুরুষোত্তমের সেবা চলে। এই স্তরে নির্গুণ হইতেছে গুণত্রয়ের একটী চং মাত্র, কৌশল মাত্র। এই কৌশলে গুণত্রয় ভুলানো হইলে সত্ত্বগুণ সত্ত্বগুণ থাকিয়াই নির্গুণ হয়, রজোগুণ এবং তমোগুণ স্ব স্ব রূপ পরিত্যাগ না করিয়াই পুরুষোত্তমত্ব প্রাপ্ত হয়।

'কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং যেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্।' ভাগবত

—কীট (তেলা পোকা) যেমন পেশস্কৃত (কাঁচ পোকা)

যাবা কুতীতে (ত্রিস্তিমুমিস্থিত বিবরে) প্রবেশিত হইয়া কাঁচ পোকার ধ্যান করিতে করিতে কাঁচ-পোকার দেহই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সাধকও শরণাগতি-সাধনাদ্বারা পুরুষোত্তমে প্রবেশিত হইয়া তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তমরূপতাই প্রাপ্ত হন।

শরণাগত ভক্তের দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ সবকিছুই পুরুষোত্তম রসে আপ্লুত হইয়া পুরুষোত্তম-দেহ, পুরুষোত্তম-প্রাণ, পুরুষোত্তম-মন, পুরুষোত্তম-বিজ্ঞান ও পুরুষোত্তম-আনন্দে গড়িয়া উঠে। ভক্তের দেহ 'চিদানন্দময়'। আত্মাই শুধু অমর নয়, দেহও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অমর। দেহ যে অনন্তকাল ধরিয়া পরিণত হইতে পারিতেছে, তাহা স্বরূপতঃ অমৃত বলিয়াই তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এই দৈব দেহ ভাগবতী তনুতে গড়িয়া উঠিবার জন্যই তো তাহার দেবযান ও পিতৃযান পথে বিশ্বময় যাতায়াত বিচরণ। বিশ্বদেহের মধু আহরণ করিয়া 'সবার' পুরুষের জন্যই জীবের ব্যষ্টিদেহ দেহ-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দে গড়া মধুচক্র সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ভগবানের দেহ নিত্য, ভক্তের দেহও নিত্য। ভগবানের যাবতীয় বৃত্তি সনাতন, ভক্তের সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তিও সনাতনী। 'হৃষীকেশ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিঃ'। জীবের সর্বেন্দ্রিয় আজ হৃষীকেশের নিত্যসেবার জন্য উন্মেষ হইয়াছে।

সহজ-মানুষ পুরুষোত্তমের সেবায় ভক্ত সহজ মানুষ রূপে গড়িয়া উঠিবে। জীবন সহজ পথে সহজের দেশে সহজ ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহজ সেবায় সার্থক হইবে, জীবনের সকল প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পুরুষোত্তমময়ী বৃত্তিতে রূপায়িত হইবে, পুরুষোত্তমের 'অবতরণ' ধরার বুকে সার্থক হইবে। বন্দেমাতরম্।

পরম আহ্বান

॥ শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য ॥

হে নাথ—
আমায় তুমি ডাকলে আজি
এ কোন্ ছলে,
যে ডাক এসে লাগলো আমার
বুকের তলে।
আমায়, গাইতে বলো সে গানখানি
তারার পাখা যাহার বাণী,
উছলে যায় সহস্রতান
সাগর জলে।

তুমি, শুনলেনা মোর নীরব কথা
বুঝলেনা মোর কোথায় ব্যথা।
হঠাৎ, আঁধার ঢাকা গহন থেকে
উজল সভায় আনলে ডেকে,
লক্ষ তারার কণ্ঠে যেথায়
বাণিক জ্বলে।

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১৩)

…'আমি' ছিল না বলেই কৃষ্ণ-রাম এদের ব্রহ্ম-আমি লাভ হয়েছে। ৭৩ বৎসর পর্যন্ত এইটাই বুঝেছি যে যারা গুরুর কথাশুনোনা, পিতার কথা শোনে না, তারাই ব্যভিচারী হয় বা উচ্চ জীবন লাভে বঞ্চিত হয়।…উপনিষদে গুরু বলে দিলেন গরু চরাও -তাই ঠিক -দীর্ঘ দিন পর্যন্ত গরু চরাচ্ছে। কেমন করে হল? ঐ যে কথা শুনল তারই মধ্য দিয়ে তার আমিত্ব গলে পড়েছে—তখন বিশ্বের চারদিক থেকে যে জ্ঞান-প্রবাহ আসতে চায়, তা আর বাধা পায় না—তাই তখন শিব আশুন, বাঘ, বাঁচ প্রভৃতির কাছ থেকে এক কথা করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।…মূল যে সাগর তার থেকে অনন্ত প্রবাহে রস পেতে হলে শরণাগত হতে হবে—'আমি'কে ছাড়তে হবে—'আমি' যতটুকু শরণাগত ততটুকুই আমার যোগ্যতা …সকলের সঙ্গে মিলন হলেই তবে তাঁর সেবা করতে পারব—আমার একলার সেবায় তো তাঁর সবটুকু সেবা হবে না। এর মধ্যে ঈর্ষার স্থান নেই ··। যাদের অহং ত্যাগ হয়ে গেছে, তাদেরই অহং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।…অর্জুনের অহংকার টিকেছে, কর্ণের অহংকার টেকে নি।…হেমন্তবাবু বলেছিলেন, মায়ের চরণধূলি নিয়ে গেছি, কোথাও আমি হারি নি। নিজে শূন্য হও, শিবসাগরে লয় হও, তাহলেই তোমার প্রতিষ্ঠা।…জগন্নাথ নিত্যগোপাল—ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ।

১২. ৩. ৫৩।…পঞ্চ ক্লেশে ক্লিষ্ট মানুষ—অবিদ্যা অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ; প্রণত হইলে এই সকল ক্লেশ তুমি নিবারণ কর, তোমার জীবনধারা তাহার জীবনে অনুপ্রবিষ্ট কর।…সকলের আমিই আমার আমি এই জ্ঞান প্রদান কর—তোমার অনুপ্রবেশে জীবের সকল জন্ম ক্লেশ দূর হয়।…আমার জীবনে তোমার আসন গ্রহণ —আমার আমির বাঁধ ভাঙিয়া তোমার প্রবেশ করিতে দিব। তুমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। আত্মা হইতে অন্ত-বুদ্ধি অবিদ্যা…আমার জীবন হইবে বিশ্বনাথের সেবাময়। …আমি বিশ্বময় হইব—তোমার মাঝে ডুবিয়া গিয়া বিশ্বময় হইব। সকলের ক্লেশ আমার ক্লেশ, ইহা বুঝিয়া আমি অবিদ্যার হাত হইতে মুক্ত হইব—আমার জীবন নিত্যগোপাল-ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ হইবে—আমি প্রণত। এস আমার জীবনে, আমি শূন্য হইয়া রহিব—তুমি পূর্ণ করিবে—আমার আমি থাকিতে তুমি আসিবে না—আমি অনহংকারী হইব—তোমার অহংকার আমার অহংকে গুষিয়া হইবে।…আমি নাই, তুমি আছ—তাহারও আমির উপরে আমার আমির বোঝা চাপাইব না; আমার আমি তুমি লও—তোমার আমি লইয়া পুরুষোত্তম-আমি হইব ·· নিত্যগোপাল, আমার জীবনের চরম সার্থকতা তুমি। তোমার আমির মাঝে আমার আমির নিঃশেষ লয় আমার জীবনের পরম সার্থকতা। নিত্যগোপাল, স্বামী সখা বন্ধু-সুহৃৎশরণ…তোমার সেবার অধিকার লভিব…তোমার কাছে রহিবার যোগ্যতা লভিব…আমায় আত্মসাৎ কর—আমায় তোমার করিয়া লও—দেহে মনে প্রাণে আনন্দে আমায় তোমার করিয়া লও—ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্মমানুষ।…

সঞ্চিত-প্রারব্ধ-ক্রিয়মান—এই তিন রকমের কর্ম—শাস্ত্রাদি বলে প্রারব্ধ কাটে না, তা ভোগ করতেই হয়; কিন্তু ভক্তিবলে প্রারব্ধ কাটে। কাটে যে তার আমিই দৃষ্টান্ত। আমি কি ছিলাম? নিত্যগোপাল-স্পর্শের পূর্বের শরৎ ঘোষ আর তার পরের শরৎ ঘোষ—এ কি আকাশ পাতাল তফাৎ নয়? ৪০৲ টাকা মাইনের শরৎ ঘোষ, ব্রজমোহন স্কুলের মাস্টার শরৎ ঘোষ যেমন

লেখে? শ্রীনিত্যগোপাল-স্পর্শে একেবারে আমূল পরিবর্তন—প্রারব্ধ নিশ্চয়ই কেটেছে—তোমরা যারা এখানে এসেছ—প্রতিভা-বেণু-মিনু, তোমরা কোথায় কেমন ছিলে, এখন কোথায় এসেছ? যে যতটুকু শরণাগত হতে পেরেছ, ততটুকু পরিবর্তন এসেছে।...

১৩. ৬. ৪৬।...শ্রীরাধা পরাগতি, তুমি শৃঙ্খলা—সংযমনমূর্তি—গতি ক্ষেত্রে তুমি মূর্তিমতী সংযম—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে, যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ সুরে—আমার প্রাণবল্লভ ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধা—আমার কালী, ধরার ধূলিতে লীলা-সাবণ্যসিন্ধু, করুণাসিন্ধু, মাধুর্যসিন্ধু...। আমি তোমায় চাহি নাই, তুমি আমায় চাহিয়াছ..এই দুর্যোগময় যাত্রাপথে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ—তোমার কৃষ্ণ-অভিসারে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিব। যোগিনী, তুমি দুর্যোগ ঠেলিয়া চলিয়াছ। আমার বাঁধন-ছেঁড়া শ্রীরাধা...মূর্তিমতী জীবন-স্রোত—উন্মাদিনী, কৃষ্ণ-সাগর সঙ্গম লাগি পাগলিনী...তুমি যেদিন জীবনের আদিনায় দাঁড়াইলে...আমি পথ বহিয়া চলিয়াছি...কেউ নাই এই দুর্যোগময় পথে—তুমি আর আমি—সহায় নাই, সম্বল নাই—ছুটিয়াছি—জীবন-সায়াহ্নে আজিও ছুটিতেছি—তোমার প্রেম সহারে..আমার নিত্যগোপাল, আমার সকল কর্ম, সকল জ্ঞান তজনে গড়িয়া উঠুক।... সকাল হইতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত সকল কর্ম তজনে গড়িয়া উঠুক—সকল কর্মে আমি তোমারই। নিত্যগোপাল, আমার সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম তোমার দেবারূপে গড়িয়া উঠুক, আমার প্রারব্ধ তোমার প্রেমে গলিয়া যাক্, আমার সকল বর্তমান, সকল ভবিষ্যৎ তোমার সেবা হউক। নিত্যগোপাল,...আমার দুঃখময়ন-ধন—আমার বুকের রক্ত দিয়া তোমার সেবা করিব। নিত্য-গোপাল, জগন্নাথ, ধরার ধূলি হউক ব্রজধূলি।..

সন্ধ্যা—নিত্যগোপাল এক নূতন কথা কইতে এসেছেন—এটা এখানের সকলকে বুঝতে হবে। ভারতবর্ষে বাংলাদেশে আশ্রমের অভাব নেই—কিন্তু সে সমস্ত আমার ঠিক মনঃপূত নয়। সমন্বয়ের তত্ত্বমূর্তি শ্রীনিত্য-গোপাল। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে সমন্বয় দেখিয়েছেন—সমন্বয়ের এটা প্রথম পর্যায়। শ্রীনিত্যগোপাল জড় ও অজড়ের—পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয় দেখিয়েছেন—সমন্বয়ের এটা দ্বিতীয় পর্যায়। তাই রামকৃষ্ণদেব ওঁর সম্বন্ধে বললেন, চ্যাঁকে চাঁকা ও সমাধি একমাত্র নিত্য-গোপালেই সম্ভব। হাত বেকলে আর চলে না।... মামুলী কথা কোনদিন আমি বলি নি—আমি বিপ্লবী—সংসারে সন্ন্যাসে।...(ঋগ্বেদ মন্ত্রপাঠ)

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং
বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥ ২॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ ৩
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ৪॥

—তোমরা সম্মিলিত হও, এক কথা বল, একমত হও, যেমন পূর্ববর্তী দেবগণ একমত হইয়া (হবির) ভাগ লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মন্ত্র সমান, সমিতি সমান, চিত্ত ও মন সমান। তোমাদের সমান মন্ত্র লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি, তোমাদের সমান হবির দ্বারা আমি হোম করিতেছি। তোমাদের সঙ্কল্প সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের সুসখ্য সাধিত্য (অর্থাৎ মিল) হইতে পারে।...প্রত্যেকের মনের খবর তোমরা রেখো।... এখানে থেকে এক কথা না বলা, সম্মিলিত না হওয়া—এ তো হতে পারে না—তাহলে আমি খুন হয়ে যাব।...

১৩. ৬. ৪৬ ('তোমারেই প্রাণের আশা কহিব' গানটী করেন।) নিত্যগোপাল, তোমার আসন বিশ্বের বুকে রহিবে—এই প্রাণের আশা পথে পথে কহিতেছি।...তুমি ভরসা—সুখেদুঃখে আঁধারে আলোকে তোমার দিকে চাহিয়া রহিব—আর কোন দিকে চাহিব না—তোমারই পাদপদ্মে আমার সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা—আমার ইহকাল পরকাল, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তোমার ঐ পাদপদ্ম—কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে ভুবাবে বলিয়া—আমি

তো ছাড়িয়াছিলাম, ছাড়িয়া গিয়াছিলাম—তুমি বলিলে 'যা এখানার যা, কাজ আছে'...যাহা দিবে সুখদুঃখ পাইনা অপমান—তা সহিতে আমায় অনন্ত ধৈর্য্য দাও, অনন্ত সহনশীলতা দাও। তুমি বলিয়াছ, শরৎ ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য আমি ধরিব, তুমি যখন বলিয়া গিয়াছ—কিন্তু আর যেন পারি না—তবু পারিব—সকল বিহ্বলতা সকল ব্যাকুলতা দূর কর—সকল ব্যাপারে তুমি ধীর স্থির—যেন প্রশান্ত মহাসাগর—তোমার ধৈর্য্যের এক কণা আমায় দান কর··· বজ্রপাত সহিব—ধৈর্য্য দাও, অনন্ত ধৈর্য্য দাও।··· নিত্যগোপাল নাম লইয়া জাগিব—যদি এ জীবনে পথ হারাই কভু তোমায়ই নাম লইয়া জাগিব—যদি ধৈর্য্য হারাই তোমারই নাম লইয়া জাগিব—তোমার চরণ আমার এই বুকের মাঝে রাখিব। স্বামী, পথ চলিতে চলিতে সংসারের শত আঘাতে অনাদরে অবজ্ঞায়, মুখ ফিরাইয়া লওয়ায় যখন এলাইয়া পড়ি, তখন তোমার ঐ চরণ বুকে রাখিব নিত্যগোপাল।···এক তরফা, কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া মানুষকে ভালবাসিয়াছি—তোমার প্রেম তো এমনই।···তুমি তো আমাদের কাছে কিছু চাও নাই, কিছু পাও নাই—পাইয়াছ অবজ্ঞা অনাদর—তবু তুমি স্নেহ করিয়াছ। তোমারই কার্য্য সাধিব ··আমি তোমারই সংসার করিব, তোমার ঘরের গৃহিণী হইব—আমার ব্যক্তিগত কর্ম্ম ঘুচিয়া যাক, তোমার কর্ম্ম আমি করিব, বিশ্বকর্ম্মা, তোমার কর্ম্ম আমি করিব—এই তো আমার সাধনা—আমার আর কোন সাধনা নাই। আমার সকল সত্তা, সকল কর্তৃত্ব মুছিয়া ফেলিব—আমার স্বাতন্ত্র্য আমায় বেদনা দান করে।··শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিও কোলে—শেষ হওয়ার মুখে এসে পড়েছি—বেদনা-জর্জ্জরিত—বিরাম আর তোমার লভিব। দুঃখ আর কিছু নাই—যাহা গড়িতে চাহিয়া ছিলাম তাহা যেন ভূতের নৃত্যে পরিণত না হয় এই আবেদন—শিবের নৃত্য হউক—ভূতের নৃত্য বন্ধ হইয়া যাক্।···শিবসুন্দর নিত্যগোপাল—যদি কেহ আসে আমার পরিকল্পনায় তাহারা যেন শিব হইয়া যায়.. ভূতের তাণ্ডবে তোমার নয়নারায়ণ আসন যেন খণ্ডিত না হয়। নিত্যগোপাল, উমাপতি, বিশ্বনাথ, শিব—তোমারই আশ্রম, তোমারই ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ—এই তো প্রাণের আশা। ধৈর্য্য ধরিতে প্রাণপণ করিব। নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল···।

সন্ধ্যা—ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত-ভগবতে নিত্য-গোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায় নমো নমঃ·····শ্রীনিত্য-গোপালকে বুকে করে আজ ৩১ বৎসর পথে পথে ঘুরে এইখানে এসে পৌঁছেছি—কি খেলা তিনি খেলবেন, তিনি জানেন। তবে তিনি বলে গেছেন, শরৎ, যখন যেখানে আছ সঙ্গে সঙ্গে আছি।···আমাদের লক্ষ্য করতে হবে কি তাঁর ইচ্ছা, কোন্ দিকে গতি প্রবাহিত।···আজ বিকেলে নিগমানন্দ সরস্বতীর শিষ্য কলকাতার নারায়ণবাবু আশুবাবুর গুরুভাই এসেছিলেন—এরা উদ্বোধনের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেন।···এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার আলোচনা শোনেন। এদের এইজন্য বলি যে শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে আলোচনা এতই নূতন যে মানুষকে মুগ্ধ করে।···নিগমানন্দ সরস্বতীর শিষ্যরা খুব অসাম্প্রদায়িক।···আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। হয়তো এখনও নিত্যগোপালের কাজ কিছু হতে পারে—কিন্তু আমার একলার দ্বারা তো হবে না, তোমাদেরও প্রস্তুত হতে হবে।...কেউ যদি বল বা মনে কর যে বুঝে ফেলেছি, তবে তা ভুল—এ এমনই নূতন সমন্বয়ের কথা যে এ বুঝতে পারা সহজ নয়···হরিনাম ছিল, তবু নিমাইর মুখে নূতন শুনি—(বৈশাখের উদ্বোধন দ্রষ্টব্য)···অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদকে, বৌদ্ধ শাংকরকে স্বীকার না করে তারা নিজেদের মতবাদীই হতে পারে না।···উদ্বোধন পড়তে হবে, বাইরের লোক পড়ে।···যারা সব না বোঝ, তারা হৃদয়ের দিক দিয়ে বুঝ থাক—তাহলেও ক্রমে ক্রমে বিদ্যা মেলা যায়।···তেনে ব্রহ্ম হৃদা—বুদ্ধিতে বোঝ না—হৃদয় দিয়ে বোঝ। হৃদয় দিয়েও বুঝবে না?

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(১৯)

আজ সকালে বাড়ীভাড়ার চেক নিয়া যায়। ফাল্গুন মাসের প্রবন্ধগুলি ঠিক করি। দুপুরের পর সুধাংশু আসে নীলুর সঙ্গে দেখা করিতে,...নীলু ও মায়ের ৮৲ টাকা দেয়। মিনু স্বাধীনভাবে নিজেদের ভার নিজেরা বহিতে পারে, ইহা নীলুর মায়েরও ইচ্ছা। নীলুর তো ইচ্ছা আছেই; আমার কাছে থাকিলে নীলুর আনন্দ। গিরিজাবাবুর সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহা নীলুকে বলি।...মিনু প্রতিভার ওখান হইতে কোনও স্থানে সেলাই ইত্যাদি শিখিতে পারে। রেণু খবর লইতেছে। আমি প্রাণের পূজারী। বর্ত্তমান বিশ্বও গড়িয়া উঠিতে চায় প্রাণের উপর। আমাদের ভবিষ্যৎ তাই উজ্জ্বল। পি, সি, ঘোষের সঙ্গে রেণুর কথাবার্ত্তা। সে ৪ বৎসরের পত্রিকাই রাখিয়াছে, ১৮৲ টাকায় চেক দিয়াছে। পত্রিকা ভাল লাগিয়াছে। পত্রিকা প্রাণের ভিতর দিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে, যেমন প্রাণ মাতৃগর্ভে মায়ের রক্ত আহরণ করিয়া বাড়িয়া ওঠে। আমি organic growth চাই।...সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতে চাই।...

৭ই ফেব্রুয়ারী

সকালে রেণুর ওখানে ফাল্গুনের জন্য গীতার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়া আসি। ১০।০ টায় পর প্রতিভার ওখানে যাই। নীলুকে কেনোপনিষদের ভূমিকাটা পড়াইয়া দেই।...কিছুটা বিশ্রাম করিয়া ৩টার আগে আমরা বাসে আসি। আমি আশ্রমে ফিরি। উহারা আফিসে যায়। আসিয়া দেখি মমা আসিয়া বসিয়া আছে। ২টী নূতন গ্রাহক ও ২টী পুরাতন গ্রাহকের ১৬৲ টাকা এবং আমার বইয়ের বাবদ ১০৶০ ও প্রতিভার বইয়ের বাবদ ২৷০, মোট ২৮৷৶০ লইয়া আসিয়াছে। গ্রাহকের টাকা পাইলে আমি আনন্দ পাইব, সেই আনন্দ উপভোগ সে অন্তকে করিতে দিবে না, নিজেই করিবে, তাই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আসিয়াছে।...আগামী রবিবার সরস্বতী পূজার দিন রেণুর হাতে ঘড়ি। আমাকেই তাহা দিতে হইবে।...বরিশালের গায়ক সুরেন দাসের ছেলে সুধাংশু আসিয়াছিল।

৮ই ফেব্রুয়ারী

প্রায় ৮টায় প্রতিভাসহ নীলু প্রতিভার বাসা হইতে এখানে আসে।...রেণু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া যায়, ১২টায় ফিরিয়া আবার ১টায় বাহির হয়। এখানে ফেরে প্রায় ৩টায়। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। তাঁহার নিকট আমার স্কুল ছাড়া, কলিকাতা আসা, নিতাইবাবুর আমাকে বেদান্ত লিখিবার অনুপ্রেরণা দান, দানীবাবুদের নিকট হইতে ৬০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি দান, এক বৎসর বরিশালে বসিয়া ভাষ্যলেখা, কলিকাতা কৃষ্ণধন মল্লিক লেনে রাখালবাবুর বাসায় সাপ্তাহিক সভায় অধিবেশন, ওটিয়া যতীন সেনের সঙ্গে পরিচয়, হীরেনবাবুর বাসায় যাওয়া, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি হলে একাদিক্রমে ১৪ রবিবার বক্তৃতা দেওয়া, তখন কাঁদিতে যাওয়া, পূজার পূর্ব্বে বরিশালে যাওয়া ও কংগ্রেসে যোগদান, কনফারেন্সে বক্তৃতা, Heart of Aryabarta গ্রন্থে তাহার উল্লেখ ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করি। ঠাকুর অযাচিত করুণায় এই তত্ত্ব আমার জীবনে স্ফুরিত করিয়াছেন। যতীনবাবুর সঙ্গে একত্র হইয়া বাহির হই।...যতীনবাবু চলিয়া যান। চিন্তানন্দ আসিয়া হিসাব দেখে। প্রেমের আচরণ সম্বন্ধে রেণুর সঙ্গে আলোচনা হয়। নীলুদের ট্রাম পর্য্যন্ত

আসাইয়া দিতে আমার প্রাণ চাহিয়াছিল। কত দিন পর দেখা হইবে, দেখা আর হইবে কিনা একবার তাহার ...বাসায় গিয়া দেখিয়া আসিতেও ইচ্ছা হইয়াছিল। আমার পক্ষে তাহা তো সোজন হইত না। ১০টার পর আশ্রমে ফিরি। সাধনার ১টী পোস্টকার্ড ও ঈশ্বরের একটী ইনভেলাপ আসে। ঈশ্বরের চিঠিতে ঠিকানাগুলি আছে।

৯ই ফেব্রুয়ারী

...৪টায় আশ্রম মঠে পৌঁছি। আজ 'অশোচানন্বশোচস্ত্বং' শ্লোকটি আস্বাদন হয়, শেষ হয় নাই। জন ২০ লোক হয়। একজন অভ্রলোক গ্রাহক হইবেন বলিলেন, মাঘ মাসের পত্রিকা দেওয়া হয়। তিনি মঠে আসেন। ইহা অতি অভিনব, বর্ত্তমান যুগের একান্ত উপযোগী—এরূপ আলোচনা তিনি আর শোনেন নাই বলিলেন।...

১০ই ফেব্রুয়ারী

...সভাকবির সরস্বতীপূজা এখানেই হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যা আরাধিত করণায় আমার জীবনের দুয়ারে আসিয়াছেন, এখন তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে পারিলেই সার্থক হইব। আমার কপালে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যরচনা-দ্বারা বাস্তব সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে।... বেণু-ভাই-এর আজ হাতে খড়ি; আমাকেই দিতে হইবে। তাহাকে ঈশোপনিষৎ ও কেন দেই—তাহাতে লেখা, 'বেণু-ভাই, আমার আদরিণী ব্রহ্মবিদ্যা তোমার জীবনকে ভরিয়া তুলুক, তুমি পুরুষোত্তম হও, তোমার 'হাতে খড়ি' দিনে তোমার দাদুর এই আশীর্বাদ রহিল'।—তোমার দাদু। শ্রীপঞ্চমী, রবিবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৪৭। আর একখানিতে আছে, 'বেণু-ভাই, আমার আদরিণী ব্রহ্মবিদ্যা তোমার জীবনে অবতরণ করুক, তুমি পুরুষোত্তম হও ইহা তোমার 'হাতে খড়ি' দিনে তোমার দাদুর আশীর্বাদ—তোমার দাদু। শ্রীপঞ্চমী, রবিবার ২৮ মাঘ ১৩৪৭।...সরস্বতীমূর্ত্তির সামনে প্রার্থনা করিয়া হাতে খড়ি দেওয়া হয়। 'বেণু-ভাই, তোমার মা যখন তাহার মাতৃগর্ভে, তখন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করি, তাই তাহার নাম বেদান্ত-প্রকাশনী। তোমার জীবনে সেই বেদান্ত মূর্ত্ত হইয়া উঠুক, তোমার 'হাতে খড়ি' সার্থক হউক।'...আদি-বেণু-প্রতিভা প্রায় ৬টায় আফিসে যাই। সেখানে বীরেন ব্যানার্জী আসে। সে 'অনন্যতা' নামে একটী প্রবন্ধ লেখে। ভাল হইয়াছে।..

১১ই ফেব্রুয়ারী

...শরীরটা ভাল নয় বলিয়া বেণু যাহির হয় না। এখানে ১২টায় আসে। প্রতিভা ব্যাঙ্ক ও স্থানিমান হইতে সাইলেনিয়া ২·০৫ লইয়া এখানে আসে ২টায়। 'নির্ঝর' পত্রিকা হইতে বারীন্দ্রের নিকট অরবিন্দের পত্র, অরবিন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্র বেণু পড়িয়া শুনায়। সরস্বতী বিসর্জনে বেশ ভিড় জমিয়াছিল, প্রতিমাও অনেক। রাত্রি ৯টায়ও পর। 'চিন্তা-phobia' বাঙ্গালীর সত্যিই রোগ-বিশেষ। কোনও কিছুকেই সে তলাইয়া দেখিবার জন্য উৎসুক নয়। তাই এত হৈচৈ সম্ভব।...যেদিন (৯-২-১৯১৯) ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পরিত্যাগ করি, পথের ঠাকুর সেদিন পথে বাহির করিলেন। আজ ঘরেও নাই, পারেও নাই। ইহাই কি কূলত্যাগিনী রাধার সাধনা? যতদূর পারিয়াছি জীবনে প্রতিটী পদক্ষেপও যথোচিত মর্য্যাদা দিয়া চলিয়াছি। আজও পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠার অনুকূল আবেষ্টন গড়িয়া উঠিল না। কাল খুব ভোরে বেণু নীলুর ওখানে নীলুকে দেখিয়া আসিবে, কথা হইল। একত্র খাওয়া, একত্র শোওয়ার ভিতর দিয়া মানুষের একত্ব-অনুভূতি স্পষ্টতর হয়। তার রক্তের টানের ভিতর জমিয়া উঠে। দুর্গা চাহিয়াছিল আমার পুরুষোত্তম-দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে। ২টার পর আশ্রমে ফিরি।...

১২ই ফেব্রুয়ারী

ভোরে ৬টায় বেণু নীলুর কাছে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হইয়া যায়।...৪টায় প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী যাই...সেখান

হইতে চাকেশ্বরীতে কলার পেপারের কথা বার্তা বলিয়া প্রায় ৭টায় আসে। আমি সকালে সাময়িকী—'পরীক্ষা-স্থলে ১৪৪ ধারা' লিখি।...আমরা ৭।০ টার পর অফিসের দিকে রওয়ানা হই। পথে সুরেশ গুপ্ত ও চিত্তাহরণের সঙ্গে দেখা।...ইতিমধ্যে ধীরেন ব্যানার্জী আসে। তাহার পর রেণু আসে। ধীরেনবাবু 'ধনুকভঙ্গ' প্রবন্ধ শেষ করিয়া শুনান ও রাখিয়া যান, ৪৲ টাকার চেক দিয়া যান।...

১৩ই ফেব্রুয়ারী

সকালে আর কিছু সময়ের জন্ত অফিসে যাই। প্রুফ দেখি। ১২টার পর চিত্তাহরণ আসে।...ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়নে উদ্বাস্তুদের এ্যাকাউন্ট খুলিবার জন্ত কর্মে আমার হস্তক্ষেপ করিয়া দেই।...চিন্তানন্দ সকালে ও সন্ধ্যার পর আসে, গত বৎসরের হিসাব দেখে।...

১৪ই ফেব্রুয়ারী

সকালে ব্রহ্মসূত্র ও উদ্বাস্তুদের প্রুফ দেখি। 'তুই এসেছিস? আমিও এসেছি'—ইহার উপর শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিবার মনস্থ করি।...'সোভিয়েট অভিধানে'র উপর সাময়িকী লিখিব ঠিক করি। রেণু সকালে একবার কলিকাতা যায়, পরে আবার খাওয়ার পর যায়।...

১৫ই ফেব্রুয়ারী

...বুঝিয়া সুঝিয়া নিজের দায়িত্ব নিজে লইয়া আসাই ভাল। টানা-টানি করিয়া আনিলে সমস্ত ভার আমার উপরেই পড়িবে। সংসারের প্রতি একটা শক্ত বিদ্বেষের পটভূমিকা থাকিলে মানুষকে সহজে পাওয়া যায়, কিন্তু 'দিলাম করিবি কেশ না ভিজাবি'-র সাধনায় মানুষ পাওয়া খুব শক্ত। 'অধর' থাকা খুব কষ্ট। অথচ ইহাই তো পথ চলার কৌশল। প্রত্যেকের প্রতি আমার যাহা করণীয় করিব, অথচ আটকাইয়া পড়িব না, আমার আদর্শের টানে সামনে আগাইয়া চলিব—চলাচলি বা গালাগালি কিছুই করিব না, আগাইয়া চলিব—ইহাই আমার পথ। আগাইয়া না গেলে হয় চলাচলি নয় তো গালাগালি করিতেই হইবে। 'এগিয়ে যাওয়াতেই' সবকিছু পরিষ্কার হয়। আজ আর প্রতিভা আফিসে নাই সন্ধ্যায়।...

১৬ই ফেব্রুয়ারী

সকালে ঈশ্বর প্রামানিকের পাঠানো 'সুকান্ত বেদা ও প্রদর্শনী'র উপর আমার লেখা লিখি। রেণু আসে ১০টায়। কিছু পরে ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়নে গিয়া রেণুরও টাকা তুলিবার উপযোগী আমার ও তাহার হস্তাক্ষরওয়ালা ফর্ম দিয়া আসে, পরে খাওয়া শেষ করিয়া ১টায় আবার কলিকাতা প্রেসে যায়। আসে প্রায় ২।০ টায়। ৪টায় পর আমরা ট্রামে মঠে যাই। যতীনবাবু পূর্বেই মঠে আসিয়া ছিলেন। ৪।০ টায় পাঠ আরম্ভ হয়। আজ বিশেষভাবে 'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে'র প্রজ্ঞাবাদ কি তাহাই আলোচিত হয় উল্লাস ও ভাবুকতার সঙ্গে। এক ভদ্রলোক নোট ধরিয়া শুনিবার জন্ত গীতা লইয়া আসেন। তাহার খুব ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু সব নাকি গুলাইয়া গিয়াছে। ঠিক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারেন নাই।...কারখানার এক কর্মচারের বসন্ত (জ্বর ও মূর্ছারিয়া) হইয়াছে। আমি K.M 3× +NS 3× এবং FP 3× × C.P 3× alternatively ৪ বার করিয়া মনিলালের কাছে দিয়া দেই।...

১৭ই ফেব্রুয়ারী

সকালে মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্র চিত্রকলা' পুস্তক পাঠ করি। বেশ মনোরম হইয়াছে, ভাল লাগিল। 'I have come to know that rhythm gives reality to that which is disultory, which is in-significant in itself. And, therefore, when scratches in my manuscript cried like sinners and assailed my eyes with the ugliness of their irrelevance, I often took more time in rescuing them into a merciful finality of rhythm than in carrying on what was my obvious task'—

Rabindranath—চিত্রকলা পৃ ১০। এই scratches হইতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন শিল্পের সৃষ্টি। রেণু ৭॥টার পূর্বেই পি, সি, বেরের বাসায় (তাহার প্রাথমিক রোডে) পৌঁছায়। ৮টা হইতে ৯-১০ পর্যন্ত কথাবার্তা হয়। তিনি আগামী কল্য সন্ধ্যায় আফিসে আমার সহিত দেখা করিবেন। পড়াশুনা করেন।...রেণু আসে ২॥০টার পর।—আমি ও রেণু ৫॥০ টায় পর আফিসে যাই। গত বৎসরের একটা হুণ্ডা খরচ টিফানস্ খাড়া করিয়াছে। তাহাতে জমা হইতে খরচ বেশী। কিন্তু তাহা তো ঠিক না। আবার দেখা যাইতেছে। ৯ টায় পর আশ্রমে ফিরি।

১৮ই ফেব্রুয়ারী

সকালে একবার আফিসে যাই। পরে আসিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি ও 'ভারত ও যুদ্ধসংকট' বই পড়ি। রেণু আসে, কিছু পরেই চলিয়া যায়। প্রেস হইতে আসিয়া প্রুফগুলি নিয়া যায়। রেণু বাসায় যাইয়া কলিকাতা প্রেস, বাসন্তী বাইণ্ডিং-এ যায়। প্রতিভা ১১টায় আসে। এখানে আসে ২৪০টায়।...জীবনে বহুবার পারিয়াছি মানুষের সঙ্গে তাহাদের সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে একাত্ম হইয়া তাহাদের সব কিছুর মীমাংসা চাহিয়াছি। আমি আর কি করিতে পারি? আমার যতটুকু ক্ষুদ্র সাধ্য তাহা আমি করিয়াছি—এই যা তৃপ্তি। তমুও সেবা আমাদ্বারা হয় নাই।...পি, সি ঘোষ আসেন নাই। বীরেন ব্যানার্জী আসেন।...প্রায় ১০টায় আশ্রমে ফিরি।...

১৯শে ফেব্রুয়ারী

সকালে চৈত্রমাসের জন্য এবং পরে ব্রহ্মসূত্রের জন্য 'ব্রহ্মসূত্রের অবমুক্ত ভাষ্য' প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। রেণু বাজারে চাকুরিয়া গিয়া নির্মলবাবুর টাকা ৯৲ টাকা নিয়া এখানে আসে। প্রেসে ফোন করা হয়।...রেণু ২॥০ টায় মধ্যে হিন্দুস্থান হইয়া প্রেসে যায়।...ব্রহ্মসূত্রের পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পাওয়া গেল ২৩শে পৌষ ১৩২৬ অবমুক্ত ভাষ্য লেখা শেষ হয়। আরম্ভের তারিখটা বোধহয় লেখা নাই। খুঁজিতে হইবে। বর্তমানে চলিতেছে ৯৩ নিত্যাব্দ। আর ৩ বৎসর বাকী নিত্যগোপাল শতবার্ষিকীর। এই সময়ে সাধ্য থেকেই নিত্যগোপালের জীবন ও বাণী ছড়াইয়া দিবার লোভ আমার প্রবাসের ছিল, আজিও আছে। তাই আজ আফিসে সে জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলাম। ২ হাজার টাকা হইলে কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে আমি tour করিয়া প্রচারে বাহির হইব। কিন্তু সম্প্রদায়ের সব তো নীরব, নিস্পন্দ। এত বড় জীবন ও দর্শন আত্মগোপন করিয়া থাকিবে, অথচ দুনিয়ার প্রয়োজন আছে। ইহা হইতে পারে না। হইতে দিব না। এজন্য চাই মরণপণ। আমি কিসের জন্য বাঁচিয়া থাকিব, কিসের জন্য অমরত্ব গ্রহণ করিব যদি আমার শেষ রক্তবিন্দু শেষ নিঃশ্বাস তাঁহাকে প্রকাশ করিতে ব্যয় না করিতে পারিলাম! এখন হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে। materials সংগ্রহ করিতে হইবে, আবেষ্টন গড়িয়া তুলিবার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, আলোচনা সুরু করিতে হইবে, যাহাতে ৩ বৎসর পরে বিরাট করিয়া অনুষ্ঠান করা যায়। প্রায় ১০টায় আশ্রমে ফিরি।...

২০শে ফেব্রুয়ারী

সকালে চৈত্রের জন্য 'ব্রহ্মসূত্রের অবমুক্ত ভাষ্য' লেখা একরূপ শেষ করি। রেণু আসিয়া কবুতরের পালক দিয়া চন্দ্রোদয় বটী তাহার পায়ে জু দিয়া বসিয়া চোখে দেয়। তৎপরে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০॥০টায় পর চলিয়া যায়। সেখান হইতে Process & Reality by Whitehead লইয়া যাওয়া শেষ করিয়া ২টার পূর্বে এখানে আসে।... টিফানসের সঙ্গে ব্যাপার মিলায় ৩টার পর। এখানে আসিয়া 'ব্রহ্মসূত্রের অবমুক্ত-ভাষ্য' নকল করে।...বীরেন ব্যানার্জী আসেন। তাহার সঙ্গে হোয়াইটহেডের 'It is as true to say' ইত্যাদির সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ঈশ্বর প্রাথমিকের আজ আসিবার কথা ছিল অপেক্ষা

করিলাম, আসিল না। বীরেনবাবু পত্রিকা আসার অপেক্ষা করিয়া ৮টার পর চলিয়া গেলেন। প্রায় ৯টার সময় পত্রিকা আসে, তখন চিদানন্দ সবে বাজ বাহির হইয়া গেল। প্রতিভা ব্যাপার লাগাইতে সুরু করে। আমি প্রায় ১০ টায় ফিরি।...

২১শে ফেব্রুয়ারী

সকালে...আফিসে যাই, সঙ্গে লইয়া যাই Process & Reality by Whitehead। সেখানে কিছুটা পড়ি। রেণু এখানে আসিয়া প্রথমে সুবোধ দের সঙ্গে দেখা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২খানি বই ফেরত দিবার জন্য যায়। আমি তাহার পর আফিসে যাই। কিছু পরে চিদানন্দ আসে। আমি ১২টায় পর ফিরি...আমি ২টায় পর আবার আফিসে যাই। তখন রেণু পত্রিকাগুলি পোস্টাফিসে ফিরতা করিয়া দিয়া আসে। কিছু পরে আমি প্রতিভা সহ হরিদাসীর বাড়ী যাই।...প্রতিভা 'রাজাঃ ভূজঙ্গ' প্রবন্ধটী পড়িয়া শুনায়। বইগাড়ীর ভগবান গাঙ্গুলী আসেন যাদবনবাবুর চিঠি লইয়া।...প্রায় ১০টায় ফিরি। চিদানন্দ বিলগুলি ও জিনি কর্মগুলি লেখে।

২২শে ফেব্রুয়ারী

সকালে Process & Reality পড়ি। 'Under the influence of mathematics deduction has been foisted into philosophy as the standard method, instead of taking its true place as an essential auxiliary mode of verification whereby to test the scope of generalisation.—পৃঃ ১৪। 'Progress is always a transcendence of what is obvious'—পৃঃ ১২। 'Rationalism is an adventure in the clarification of thought, progressive and never final.—পৃঃ ১২। রেণু আসে। চোখে ওষুধ দেয়। প্রতিভা পত্রিকা বিলি করে। প্রতিভা আসে ২৷৷০টার পর। 'প্রকরণ ও অবধৃত ভাস্ত' নকল করে।...'Process & Reality' খুব ভাল লাগিতেছে। আমার চিন্তাধারার হুবহু ছবি দেখিতেছি। এই চিন্তাধারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশ্ব নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিবে। 'The truth itself is nothing else than how the composite natures organic actualities of the world would obtain adequate representation in the divine nature'—পৃঃ ১৬। ...৯৷০টায় ফিরি।

২৩শে ফেব্রুয়ারী

রেণু সকালে আসে, চোখে ওষুধ দেয়। আমি ৭টার পর সদানন্দ রোডের মোড় হইতে রিক্সায় মহর গাঙ্গায় যাই।...৪টার পর ফিরে যাই। 'নবেরাহং', 'হেহিনোহস্মিন্' ও 'যাত্রাস্পর্শান্ত' শ্লোক কয়টীর আস্বাদন হয়। জয়া খাবার নিয়া আসিয়াছিল। শ্লোক শেষ হয় নাই।...সুরেশ গুপ্ত তাহার ভাগিনের ও কন্যাসহ আসে।...রাইহরণবাবু আসিয়া চলিয়া যান। ঈশ্বর প্রাথমিক আসে...। ১০৷৷ টায় পর ফিরি।...

২৪শে ফেব্রুয়ারী

পাবনায় আগমন

৮৷৷০টায় পর ট্যাক্সীতে রওয়ানা হই, শিয়ালদহ পৌঁছি।...যাদবনবাবু উপস্থিত ছিলেন।...৮টার পূর্বে পাবনা পৌঁছি...যাদব উপস্থিত ছিল। কিছু পরে যতীনবাবু আসেন।...এখানের যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনি।...

২৫শে ফেব্রুয়ারী

ভোরে প্রার্থনা হয়...। সকালে রাধাচরণবাবু আসেন, কিছুক্ষণ থাকেন।...সন্ধ্যার পূর্বে জানবাবু, বসন্তঅধিকারী, পূর্ণ রায় ও অপর এক ভদ্রলোক আসেন। হোয়াইটহেডের 'It is as true to say' অংশটী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'রাজাঃ ভূজঙ্গ' প্রবন্ধ জানবাবু ও বসন্তবাবু পড়িয়াছেন। বসন্তবাবু page-filler৷ Neither

God nor the world reaches static completion' পড়িয়াছেন। ১ ঘণ্টা পর চলিয়া যান।··· কম্যুনিজম স্বয় করিতে না পারিলে মুসলমানদের কাছে যে পাকিস্তান হইয়াছে তাহার চেয়েও অধিকতর দুর্গতি এ দেশের হইবে। অথচ শ্রীকৃষ্ণ-জীবন ও গীতা ছাড়া কম্যুনিজমকে পরিপাক করা সম্ভব হইবে না—ইহাই জ্ঞানবাবুদের সঙ্গে আলোচনা হয়।

২৬শে ফেব্রুয়ারী

—এখানে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রায় পাঁচ সের দুধ দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিয়া তাহা ও দইয়ের সরবত খাওয়ান হয়। দুধের দাম সের ।১০ ।··· শুচি অশুচি সম্বন্ধে কুসুমের সঙ্গে আলোচনা হয়। মুসলমানদের শুচি-অশুচি জ্ঞান নাই, কিন্তু তাহা নিত্য দরকার। হিন্দুকে গণ্ডির ভিতর ঢুকাইয়া পুরুষোত্তম ভয়ে শুচি-অশুচি সম্বন্ধে সচেতন করিতে হইবে। হিন্দুরা কি করিয়া পাকিস্থানে আত্মরক্ষা করিবে, তাহা খুব সমস্যাসঙ্কুল। অথচ হিন্দুরাষ্ট্র বিশ্বে প্রলয় করিবে, ইহাই একান্ত সম্ভব বলিয়া মনে হয়। যাহারা 'শেষ পরপর' ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা তো কাল-হস্ত। জ্ঞানবাবুদের সঙ্গে ইহাই আলোচনা হয়। পাকিস্থানকে স্বীকার করিয়াই বিরাট মানবতার মধ্যে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। যে হিন্দু একদিন মুসলমানদের ঘরের বাহিরে রাখিয়াছিল, আজ তাহারাই হিন্দুদের ঘরের বাহির করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের হিন্দু বিশ্বে থাকিবে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী

...এখানের মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে সামাজিকভাবে খাওয়াদাওয়ার ভিতর দিয়া মিলিতে চায়। কিছুদিন পূর্বে নদীর ওপারের একটী মুসলমান পরিবার কুসুমের এখানে পিঠা রান্না করিয়া পাঠাইয়াছিল। বাসনগুলি ফেরত যাইয়াছে। মুসলমানদের পিঠা ফেলিয়া দিবে বলিয়া সন্দেহ করায় নদীর পারে যাইয়া উহাদিগকে দেখাইয়া আসিয়াছে। শুচিতা-অশুচিতার প্রশ্ন থাকিবে না, অথচ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখিতে হইবে। চলা খুব শক্ত। পরাজিতের মনোবৃত্তি লইয়া শুচি-অশুচির বিচার তুলিয়া দিলে মুসলমান হইতে বেশীদিন লাগিবে না। ঋষিরা শুচিতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদিগকে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া মুসলমানের সঙ্গে মিলিতে হইবে—পূর্ণবঙ্গে হিন্দুদের ইহাই হইবে সাধনা।···

২৮শে ফেব্রুয়ারী

···টার পর বাথনের সঙ্গে বাজার ও ঘাটাবাটের বর্তমান অবস্থা দেখিবার জন্য যাই। বাজারের মধ্যেও যাই, যেখানে বাহু চাউল বিক্রয় হয়। বাথনের গুরু-ভাইয়ের মুদী দোকানে একটু বসি। পরে যোগেশ দাস মহাশয়ের বাসা অফিসে যাই। সেখানে বজলুর রহমানের (বাসে সিভিকেটের সেক্রেটারী) সঙ্গে দেখা। কিছুটা সময় আফিসে বসিয়া যোগেশবাবুর ঠিক করা রিক্সায় চলিয়া আসি।·· ৪টার আগে ছুটাই, যোগবায়া, ভাইয়েরা এক গুরুতরী আসে। বাথনের ভগিনী শরৎকামিনীও আসে। তাহাদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানের হিন্দুদের করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়।···সন্ধ্যার পর কিতীশবাবু আসেন। তাঁহার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি বলেন—নক নুনের তারতম্য পরিপাক করিয়াছিল। কিন্তু মহম্মদ ঘোরী আসার পর হিন্দুগণ যে বয়কট নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, সেই কুলের ফল হিন্দুরা চরম যাতনা ভোগ করিয়াছে। আমি বলিলাম, এমন সর্বগ্রাসী হিন্দুত্ব লইয়া হিন্দুদের আজ থাকিতে হইবে যাহাতে তাহারা হিন্দুদের গ্রাস করিতে আসিয়া নিজেরাই গ্রাস হইতে পারে। আমার খবর পাইয়া যতীনবাবু সন্ধ্যার পর আসে।

১লা মার্চ

সকালে প্রার্থনা করি। রেণু ১০টার সময়ে পাবনা ফিরিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অনিলবাবুর সঙ্গে দেখা করে। তিনি ও মহেন্দ্রবাবু গ্রাহক হইবেন। কাল টাকা দিবেন। ৪টার পূর্বে অঞ্জলি ও তাহার দিদি গীতা আসে। পুরুষোত্তমকে সামনে রাখিয়া নিজের গায়ে নিজে

দাঁড়াইবার কথা সাধারণভাবে আলোচনা হয়।...কিশোর সঙ্ঘের পক্ষ হইতে 'feats' দেখানো হয়—weight lifting, muscle controlling, parallel bar ইত্যাদি। একটি ছেলে ২ মণ ১৭।০ সের তুলিতে পারিল। যে ছেলেটি muscle-controlling দেখাইয়াছে, তাহাকে একটী রৌপ্যপদক রাধাচরণবাবু দিলেন। আমি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা দেই। 'মন্ত্রানামনলি' ইত্যাদি শ্লোক বলা হয়। মানুষের দেহ flexible এবং organic, দেহ মন ও আত্মার সমন্বয়ই মানুষ, মানুষ নমনশীল দেহ ও আত্মা লইয়া আগাইয়া যাইবে, ইহাই মানুষের সাধনা। পরে রাধাচরণবাবুর বাসায় একটী বৈঠক হয়। বসন্ত অধিকারী, পূর্ণবাবু, যতীনবাবু, মাখন, রেণু, সুহৃদ আরও কয়েকজন ছিলেন। All engrossing ঐক্য-কৃষ্টী লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে মুসলমানও হজম হইয়া যাইবে। 'Both are in the grip of each other'। তাহারা মনে করিতেছেন রাষ্ট্র যখন তাহাদের হাতে, তাহারাই হিন্দুদের হজম করিতে পারিবে, কিন্তু উল্টাটাও তো হইতে পারে। কালের বিধানে দুই-ই দুইয়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।...কখনও কখনও ঠাকুর পূজা করিতে বলে। যাহাদের কোনও সংস্কার নাই, তাহাদিগকে এই অধিকার দেওয়া সঙ্গত নয়। উপাস্ত-উপাসনা-উপাসক একই মহাসত্যের তিন দিক। যাকে তাকে দিয়া যেমন তেমন করিয়া উপাসনা হয় না।

২রা মার্চ

সকালে প্রার্থনা করি। ৮টায় যীশুন সরকার আসে। রাধারমণবাবু...আসেন। ৪টায় অঞ্জলি ও গীতা আসে। ...মহিলাবাবু আসেন।...কিছু পরে জ্ঞানবাবু ও বসন্ত-বাবু আসেন, কিতীশবাবুও আসেন। আর কিছুকাল পরে অনিলবাবু (ভূমিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক) ও তাহার বন্ধু মহেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস আসেন।...অ্যাপার্টমেন্ট জন্য থাকিব না; আর একদিন এখানে থাকিব বলিয়াই থাকিব। অনিলবাবু ৩ জনের চাঁদার টাকা দিয়া যান। ইহারা চলিয়া গেলে মাখন ও যতীনবাবু আসে। গোপাল সরকার.....আসে। 'শিখাসঙ্ঘে'র হাতে-লেখা পত্রিকা দিয়া গেল '...

৩রা মার্চ

সকালে প্রার্থনা হয়।...১২।০টায় স্কুল ছুটি হয়। প্রায় ৩।০টায় জ্ঞানবাবুর স্কুলক ও তাহার স্ত্রী আসেন, ৫টায় পর যান। টাউন হলের পাশের ময়দানের সেই বক্তৃতার কথা জ্ঞানবাবুর স্ত্রী বলেন। কালী রূপের অর্থ, উষাদিদীকে ও আমাকে একটি একটি কমলা দিয়াছিলেন আমার জেঠীমাতা, সেই কমলা আমি খাই, কিন্তু উষাদিদী রাখিয়া দেয় তাহার পুত্রের জন্য—ইহাই উল্লেখ করিয়া নারীর সেবাপ্রবৃত্তির উল্লেখ সেই সভায় করিয়াছিলাম। হিন্দুদের static মনোবৃত্তির ফলেই যে লাঞ্ছনা তাহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে, ইহার আলোচনা হয়। সুচারু ও যোগ-মায়া আসে, তাহারাও এই সময় উপস্থিত ছিল। কিতীশ বাবু আসেন। তখন শিখাসঙ্ঘের ২টী যুবক আসে। হিন্দুর dynamic culture জাগাইয়া রাখার কথা হয়। Dynamic হিন্দু সব অনাচার, আবর্জনা ঊর্দ্ধে ভাসা হজম করিতে পারিবে। বৈকালে অঞ্জলি ও গীতা বেণুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে।...

৪ঠা মার্চ

সকালে প্রার্থনা করি। রাধাচরণবাবু আসেন...। সুচারু, যোগমায়া, তাহাদের গুরুভগিনী, অঞ্জলি ও গীতা আসে। কিছু পরে প্রায় ৬টায় জ্ঞানবাবু ও পরে বসন্ত অধিকারী আসেন। শিখাসঙ্ঘের যুবকদল ও ছেলেমেয়েরা প্রায় ৭টার সময় অনুষ্ঠান আরম্ভ করে। বসন্তবাবুকে সভাপতি করা হয়। আবৃত্তি, নাচ। 'জয় অজানার জয়' কবিতাটী বেশ ভাল লাগিল।

'কেন রে ঐ দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়,
জয় অজানার জয়।
এ দিকে তোর আনাগোনা, ঐ দিকে তোর জয়—
জয় অজানার জয়।

মরণকে ছুই পর করেছিস ভাই,
জীবন যে তোর শূন্য হল ভাই…
ভাঙাগোলার বাসা বেঁধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে
…চিরদিনের আবাসখানা, সেও কি সুদূর—
অন্য অজানার ঘর।'

অনুষ্ঠানান্তে আমি উপনিষদের প্রাক্-উপাসনা আলোচনা করি। 'ন…অনন্তমতি'; প্রাণ শুধু কাঠের উপর ছড়াইয়া দিলে তত তত ছড়াইত হয়। বেশ অনেক ছেলেমেয়ে, পুরুষ রায় প্রভৃতি এবং অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই দুর্যোগের মাঝে ইহা খুবই শুভ লক্ষণ। …শিখাসঙ্ঘের ছেলেরা খুব খুশী।

৫ই মার্চ

সকালে প্রার্থনা করি। পেটের অসুখ চলিতে থাকে। …কুসুমের দিকে চাহিয়া না-যাওয়াই স্থির হইল।… শিব চরিত্র আলোচনা করি।…মন্ত্র, শুদ্ধকরণ ও দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বলি।…আমার শরীর দুর্বল বলিয়া রেণু রাত্রিতে ২টী টুল পাতিয়া শোয়। কাছেই থাকে। প্রতিদিন চিঠি আসে।…

৬ই মার্চ

পাবনা হইতে ৬-৫০-এ প্রত্যাবর্তন।

প্রার্থনা করি।…বাল স্ট্যাণ্ডে যোগেশবাবু, যাদবচরণ বাবু, অমরেন্দ্র মৈত্র উপস্থিত ছিলেন। যোগেশবাবুর অনুরোধে অমরেন্দ্রবাবু গ্রাহক হইবেন বলিলেন।…… ৬-৫০-এ পৌঁছি…

৭ই মার্চ

সকালে কিছু না খাইয়াই দুর্গামোহনবাবুর স্থানে (নলিয়ার বাসা) হইয়া তাহাকে না পাইয়া আফিসে যাই। দুর্গামোহনবাবু কয়েকদিন পূর্বে এখানে আসিয়াছিলেন, দেখা হয় নাই।…চৈত্র মাসের জন্য 'ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্য'টী আবার সেবাশ্রমের জন্য দেখি।…… দুর্গামোহনবাবুর স্থানে যাই, তাহার সঙ্গে ৪৫০টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হয়। তাঁহার ছেলে থাকা, বরিশালের বর্ত্তমান পরিস্থিতি, সুরেশ দের সঙ্গে তাহার চলিবার পথ সম্বন্ধে মতভেদ, সতীনের দিকে তাঁহার ঝোঁক, আমার পত্রিকা, বরিশালহিতৈষীতে 'বঙ্গেমাতরম্'-এর ব্লক না ছাপাইবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দ্দেশ, তাঃ কাটজুর সহিত দেখা হওয়ার পর ব্লক ছাপানো সম্বন্ধে আলোচনা, ব্লক ছাপা না-হওয়ার পর তাঁহার স্থলে তাহার পুত্রের সম্পাদক হওয়া, তাহার লেখা একটী প্রবন্ধ পাঠ—ইত্যাদিতে প্রায় ৩টা লাগে। হোয়াইটহেডের 'It is as true to say' অংশটী শুনাই। সেখান হইতে আফিসে যাই। গিয়া দেখি মালতী সেখানে।… নীলু আজ একজন গ্রাহক করিয়া টাকাটা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়াছে।…… যতীশ বাগচীর একটী পুত্র মারা গিয়াছে…একটা চিঠি দিয়াছেন হৃদয়ের বেদনা জানাইয়া। ১১০টায় ফিরিয়া মঙ্গলবার পেটের অসুখের জন্য ঔষধটা শুধাইয়া যাইতেছিল। রেণু ২টা কম্বল কিনিয়া নিয়াছিল, আফিসে তাহা খাই।…

৮ই মার্চ

সকালে ব্রহ্মসূত্রের ৩২-শ বর্ষার দ্বিতীয় প্রুফ দেখি। …৫টায় পর দুর্গামোহনবাবুর স্থানে যাই।…রেণু 'রাজ্যং সুদুর্লভং' পড়িয়া শোনায়।…সকালে চৈত্রের জন্য উদ্বোধনের 'গীতা'র অংশ রিভাইস করিয়া দেই।…

৯ই মার্চ

ক্রমশঃ

আমাদের ইংরেজী শেখা ও শেখানো।

(ইংরেজী আরম্ভ)

॥ অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভৌমিক ॥

(২)

ইংরেজীর প্রথম পাঠ কবে, কি ভাবে সুরু হবে, এ নিয়েও মতদ্বৈধ আছে। আমাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে, অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রে ৪র্থ শ্রেণী থেকে ইংরেজী সুরু করার কথা, একটি রাষ্ট্রে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হচ্ছে অষ্টম শ্রেণী থেকে। প্রথম প্রথম নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী পড়ানোর কথা ছিল না। গান্ধীজী বলেছিলেন ৮ বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষার শেষে একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাশ ছেলের সমকক্ষ হবে, একমাত্র ইংরেজী ছাড়া (minus English)। আজ কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতেও ইংরেজী পড়ানো হচ্ছে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মতই। সুতরাং ইংরেজীর ব্যাপারে আর বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে দোষারোপ করা চলে না।

বিদেশী ভাষা কোন্ বয়স থেকে সুরু করা উচিত এ বিষয়ে আগেই বলেছি মতবিরোধ আছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই আমরা মনে করতে পারি যে নিজের মাতৃভাষায় উপর কিছুটা অধিকার অর্জন করার আগেই ইংরেজী কিম্বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা শেখা উচিত নয়। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (স্যাডলার কমিশন) ১৯১৯ সালে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করে বলেছিলেন—"a severe training in the mother tongue is not rival, but the necessary priliminary to training in the use of English." অর্থাৎ মাতৃভাষায় বেশ ভাল রকমের গোড়াপত্তন করে দিলে সেটা ইংরেজী শেখার অন্তরায় না হয়ে বরং সহায়ক হয়।

কিন্তু মাতৃভাষায় বেশ ভালরকমের গোড়াপত্তন বলতে আমরা কোন্ শ্রেণী পর্যন্ত বুঝব? পঞ্চমশ্রেণী (বর্তমানের) হলে নিশ্চয়ই গোড়াপত্তন তৃতীয় শ্রেণী অপেক্ষা ভাল হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে অর্থাৎ বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে, কেউ কেউ বলেন, ছোট বয়স থেকে আরম্ভ করাই ভাল। 'Catch them youug'; বুলি শেখাতে হলে ছানা ধরাই ভাল, খাড়ি ধরে লাভ নেই। একজন বিলেতী বিশেষজ্ঞের (শরীরবিদ্যা-বিশারদ) মতে মস্তিষ্কের যে কোষগুলি ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করে, বড় হওয়ার সাথে সাথে সেগুলি নাকি atrophied অর্থাৎ অব্যবহারে অকেজো হয়ে যায়। তাই এবংশ্রেণীর বিশেষজ্ঞের মতে ইংরেজীটা যদি শেখাতেই হয়, তবে যত তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা যায় ততই ভাল। গত ১০ই আগষ্ট ১৯৬২-র আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। "বিশেষজ্ঞেরা সম্প্রতি হামবুর্গে এক সম্মেলনে তাঁহাদের অভিমত ঘোষণা করিয়াছেন। বহু গবেষণার ও তথ্যের সমর্থন এই অভিমতের পিছনে আছে। ইহারা বলিতেছেন যে না, ভয় করিবার কিছু নাই। কিণ্ডারগার্টেনের শিশুকেও দ্বিতীয় একটি ভাষা শিখাইলে তাহার মাতৃভাষা শিক্ষা করিবার ক্ষমতা সুর হইবে না; তাহার প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশের উপরেও কোন চাপ পড়িবে না।" ইহাদের ধারণা কিশোর বয়সের তুলনায় নিতান্ত শিশুরই বরং নূতন ভাষা শিখিবার ভাল কান আছে।

বিশেষজ্ঞেরা এই প্রসঙ্গে ব্যাকরণ-বিভীষিকার কথাও বলিয়াছেন। শিশুর ভাষা শিক্ষায়,—তাহা মাতৃভাষা হউক অথবা দ্বিতীয় ভাষা হউক, ব্যাকরণের সাহায্যের কোন

প্রয়োজন নাই। এ ক্ষেত্রে ব্যাকরণ বরং বিপরীত ফল সৃষ্টি করিবে, ব্যাকরণই শিশুর ভাষা শিক্ষার অন্তরায় হইবে।

বর্তমানের তৃতীয় শ্রেণী থেকে আরম্ভ করার মূলে ঐ যুক্তি রয়েছে। কিন্তু এই পর্যায়ের প্রাথমিক ইংরেজী পুঁথির ইংরেজী নয়, মৌখিক ইংরেজী হতে হবে। তৃতীয় শ্রেণীর একটি শিশুকে ইংরেজী বই পড়ার কায়দা শেখাতে গেলে তার চাই অক্ষর পরিচয়, শব্দ-পরিচিতি ও উচ্চারণ সামর্থ্য, অর্থবোধ এবং সমগ্র বাক্যের অর্থগ্রহ। একটা বিদেশী ভাষাকে এমন বিশ্লেষণ করে শেখাতে গেলে তার আর কোন রস থাকে না। অথচ মুখে মুখে দরকারী ইংরেজী শেখাতে পারলে তা শিক্ষার্থীর কাছে সরস হয়, অর্থপূর্ণ হয়। এর পর যদি তার হাতে এমন একখানা বই দেওয়া যায় যাতে তার জানা কথা, জানা বাক্য (যেগুলি সে মুখে মুখে শিখেছে) থাকে, তা হলে সে পড়াটা তার কাছে পীড়াদায়ক না হয়ে আনন্দদায়ক হওয়ার সম্ভাবনা।

যে কোন ভাষার প্রথম রূপ কথা রূপ। মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা এবং সে ভাষা মুখের ভাষা। পুঁথির ভাষা, লেখার ভাষা অনেক পরের। সুতরাং ভাষার এই সক্রিয় দিক (active aspect) অর্থাৎ মৌখিক প্রয়োগ তার নিষ্ক্রিয় দিক (passive aspect) অর্থাৎ লিখিত প্রয়োগ থেকে বেশী প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ ভাষার ব্যবহারিক রূপের সাথে পরিচিত হ'লে অর্থাৎ ভাষাকে ব্যবহার করতে পারলে, তবেই প্রথম শিক্ষার্থী আনন্দ পায়, এ আনন্দ সহজ কথা প্রাপ্তির আনন্দ। 'Shut up' মন্ত্রে যদি এক জনের মুখ বন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে তাতে আছে আনন্দ, আর বানান করে অর্থ বুঝে করে ঐ কথা দুটির লিখিত রূপের সাথে পরিচিত হলেও তারও মুখ তাতে বন্ধ করা যায় না। তৃতীয়তঃ ভাষাকে প্রয়োগ করতে পারলে তাতে করে নূতন একটা শক্তির সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায়। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য তো মাতৃভাষা রয়েছেই, সেই ভাবটা আমি অন্য প্রকারেও প্রকাশ করতে পারি, এই মনোভাব শুধু ছোটদের খেলায় কেন, বড়দের খেলাতেও হামেশাই দেখা যায়।

একটা উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটা আরেকটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক। কলিকাতার কোন একটি মিশনারী পরিচালিত স্কুলে ইংরেজীর মাধ্যমে পড়ানো হয়। নার্শারী বিভাগ থেকেই এই ব্যবস্থা। ঐ বিভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়ে রয়েছে, Anglo Indian, চীনা ছেলেমেয়েরও আছে। সকলেরই বয়স ৩ থেকে ৫।৬ এর মধ্যে। বলা বাহুল্য এদের সকলের ভাষা এক নয়। শিক্ষয়িত্রীরা কিন্তু ইংরেজী জানেন। নার্শারী স্তরে—সকলেই জানেন—পড়াশুনার বিশেষ একটা বালাই নেই। খেলাধূলা করা, কিছু গল্পগুজব গঠন করা, ছড়া মুখস্থ করা ইত্যাদির মধ্যেই এদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ। কিন্তু পড়তে না হলেও, খেলতে তো হবে এবং তার জন্যও ভাষার প্রয়োজন আছে। শিক্ষয়িত্রীদের সাথে কথা বলতে বলতে এরা ইংরেজীতে মোটামুটি ভাবে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখে। খেলার সাথীদের সাথেও ধীরে ধীরে ইংরেজীতে কথাবলার অভ্যাস গড়ে ওঠে। ছড়া বলার মধ্যে দিয়ে উচ্চারণ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হয়ে আসে। এদের তাদের পড়তে শেখানো হয়, লিখতে শেখানো হয়।

এই ভাবে অর্থাৎ ইংরেজী-পরিবেশে ইংরেজী শেখানো প্রাথমিক স্তরে খুবই সম্ভব যে সেটা পরীক্ষিত। কিন্তু সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এইরূপ স্বাভাবিক পদ্ধতি (Natural method)-তে ইংরেজী শেখানোর অনেক বাধা। প্রথমতঃ ইংরেজী-পরিবেশ পাওয়া সম্ভব নয়, দ্বিতীয়তঃ অনর্গল স্বাভাবিক ভাবে ইংরেজী বলতে পারবেন এমন শিক্ষকও দুর্লভ, তৃতীয়তঃ সময়েরও অভাব। যেমন ঘরে শিশু মাতৃভাষা শেখে, তেমি করে সে বিদেশী ভাষাও শিখতে পারে যদি তাকে ঐ বিদেশী পরিবেশে মানুষ করা যায়। কিন্তু গোটা দেশের সবগুলি স্কুলে এইরূপ পরিবেশ গড়ে তোলার কথা চিন্তাও করা যায় না, সুতরাং ঐরূপ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সাধারণ বিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা শেখানোর চিন্তা আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

পুরানো First Book-এর সাথে যারা পরিচিত তাঁরা যে ভাবে ইংরেজী শিখেছেন সেটা মনে করলে

দেখবেন যে সেখানে ইংরেজী অক্ষর পরিচয়ের পরেই কতকগুলো সমোচ্চারিত শব্দ (অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন) পড়ানো হ'ত—যেমন—Bly, Fly, Sly ইত্যাদি। এই ভাবে পড়ার যে সুবিধে নেই, তা নয়। মোটামুটি ভাবে একই জাতীয় কতকগুলি শব্দের উচ্চারণের সাথে পরিচিত হলে পরে নিজে নিজে পড়াটা কিছু সহজ হয়। কিন্তু এই ভাবে পড়ার অসুবিধে হ'ল।

(১) ইংরেজী উচ্চারণের নিয়মভঙ্গ হয় যে সব স্থানে সে সব জায়গায় ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে ; যথা—put, but।

(২) সব কথা বানান করে পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) পড়ার উপরে এবং মুখস্থ করার উপরেই বেশী জোর দেওয়ার ফলে ভাষার ব্যবহারিক দিক উপেক্ষিত হয়।

(৪) শুধু কতকগুলি শব্দ মুখস্থ করলেই ভাষা শিক্ষার বুনিয়াদ গড়া হয়না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই শব্দগুলিকে যথাযথভাবে বাক্যে প্রয়োগ করা যায়।

ধরুন কয়েকটি সহজ শব্দ The, Killed, Ram, Tiger, এগুলিকে সাজিয়ে Ram killed the tiger, The tiger killed Ram দুটি বাক্যই রচনা করা যায় ; অথচ শব্দগুলির স্থানপরিবর্তনের ফলে অর্থের কি অদ্ভুত পার্থক্য হয়ে যায়। সুতরাং কতকগুলি শব্দ শেখাই প্রধান কথা নয় (তা হলে word-book মুখস্থ করতে পারলেই একটা ভাষা শেখা যেত)। শব্দগুলিকে ঠিক মত সাজিয়ে না নিতে পারলে তার অর্থ-সঙ্গতি হয় না। 'He is going to school'-এর অর্থ আর ঐ শব্দগুলিকেই একটু বদলে নিয়ে 'Is he going to school'-এর অর্থ সম্পূর্ণ অন্য রকম অর্থ হয়ে যায়। বাক্যের এই রূপের সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থী পরিচিত না হচ্ছে, ততক্ষণ তার পক্ষে শুধু ভাবে কোন কিছু বলা বা লেখা সম্ভব নয়।

ইংরেজী ভাষাকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তার structure বা গঠনরীতি সীমাবদ্ধ ; ২৭০টির মত এর মূলগঠনরীতি (structure) আছে। খুব সহজ থেকে খুব কঠিন অর্থাৎ জটিল বাক্যও এই সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধীরে ধীরে, এক একটি বাক্যের গঠনরীতির সাথে পরিচিত হওয়া, পুনঃ পুনঃ অনুরূপ বাক্য গঠন করা, মুখে বলা এবং লেখার মধ্য দিয়ে ঐ structureটি আয়ত্ত করতে হবে। বার বার আবৃত্তি, লেখা এবং পড়ার অভ্যাসের ফলে শুদ্ধ রীতিটি অধিগত হয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে বলে আশা করা যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

May I go out, Sir ? এই বাক্যটিতে শিক্ষকের কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এরূপ অনুমতি চাওয়া প্রয়োজন হ'তে পারে ; সেক্ষেত্রে অনুরূপ structure হতে পারে যথা—

May we go out, Sir ?

May he go out, Sir ?

May I write on this paper, Sir ?

May I do this sum, Sir ?

May I take this pencil, Sir ?

এই ভাবে একই রীতির অনেকগুলি বাক্যের অনুশীলন করলে ছাত্রেরা ঐ বাক্যগুলির গঠনরীতির সাথে পরিচিত হবে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ অর্থবোধও হবে।

এখানে বিশেষ করে যে কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে, ছাত্রকে একটি সম্পূর্ণ বাক্যের সঙ্গে পরিচিত করা। শব্দ ছাড়া বাক্য গঠন করা সম্ভব নয়, একথা নিশ্চয়ই সত্য, কিন্তু বিচ্ছিন্ন শব্দ দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে আদেশ করা (Go, Come, Ready, Stop, Go out ইত্যাদি), মনের ভাব প্রকাশ করা (Hurrah, alas, oh ইত্যাদি), বিশেষ ক্ষেত্রে কোন বস্তুকেও বুঝানো (Ram ! rat ! when ? what ? ইত্যাদি) গেলেও এভাবে কোন ভাষাতেই সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এই বাক্-রীতির সাথে পরিচিত করাতে গেলে ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে বুঝানো সম্ভব নয়, উচিতও নয়। অভ্যাস এবং প্রয়োগ দ্বারাই এটা সম্ভব।

শ্রেণীতে প্রথম শিক্ষার্থীকে প্রথমেই কতকগুলি বাক্যের সাথে পরিচিত করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু অনুবাদের সাহায্য নেওয়া চলবে না। ইসারা, অঙ্গভঙ্গি, কাজে করে দেখানোর ভিতর দিয়ে ইংরেজী বাক্যটির অর্থ স্পষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে। যেখানে বুঝানো নিতান্তই অসম্ভব মনে হবে, সেখানেই কেবল ইংরেজীর বাংলা প্রতিশব্দের প্রয়োজন হবে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটি স্পষ্টতর করার চেষ্টা করা যাক্।

শ্রেণীতে প্রবেশ করেই শিক্ষক, ছাত্রদের উদ্দেশ করে Good morning, boys, Good afternoon, boys বলে wish করতে পারেন এবং ছাত্রদেরও Good morning, Sir/Madam, Good afternoon, Sir/Madam বলতে শেখাবেন। দু'চার দিন অভ্যাস করলেই এটি অভ্যাস হয়ে যাবে। (এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ইংরেজী কায়দায় দুরস্ত করার উদ্দেশ্যেই Good morning, Good afternoon, শেখানো হচ্ছে, এমন কথা নয়। শ্রেণীর বাইরে ইংরেজী শিক্ষকের সাথে দিনের প্রথম ভাগে দেখা হলে তারা জাতীয় কায়দায় নমস্কারই করবে, কিন্তু Good morning, Sir কিংবা Good afternoon, Sir বললেও ইংরেজী শিক্ষক হিসাবে আমি আপত্তি করব না।) ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় শিক্ষক 'Good-bye' বলবেন, ছাত্রেরাও বলবে।

ছেলেরা শিক্ষককে প্রবেশ করতে দেখলেই দাঁড়াতে অভ্যস্ত। শিক্ষক তাদের 'wish' করার পর Boys, Sit down বলবেন এবং হস্ত সঞ্চালন দ্বারা কি করতে হবে, বুঝিয়ে দেবেন। ছেলেরা বসবে। এইবার শিক্ষক ইচ্ছা করেই ছেলেদের আবার বলবেন—Boys, Stand up এবং কি করতে হবে হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তাদের বুঝিয়ে দেবেন। ছেলেরা দাঁড়ালে আবার তাদের বলবেন, Boys, Sit down। এই ভাবে দুই একবার Stand up, Sit down করালেই ঐ বাক্য দুটির অর্থ তাদের হৃদয়ঙ্গম হবে। এরপর শিক্ষক কোন একটি ছেলেকে বলতে পারেন—"Naren, stand up", "Jiten, stand up", এবং আবার তাদের "Naren, sit down", "Jiten, sit down" বলে তাদের বসতে বলবেন।

এখানে লক্ষণীয়, ছেলেরা শুধু নীরবে শিক্ষকের আদেশ পালন করে যাচ্ছে, তারা কিছু বলছে না, কিংবা পড়ছে না। তারা শিক্ষায় এরূপ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী হিসাবে আনন্দ পেতে পারে না। তাদের দিয়েও সক্রিয়ভাবে কিছু করানো প্রয়োজন।

শিক্ষক এইবারে কোন একটি ছাত্রকে বলতে পারেন—'Come here' এবং সে কাছে এলে (না বুঝলে সব সময়েই ইসারার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে) তাকে বলতে পারেন—Say, Boys stand up; শিক্ষকের কথা ছাত্রটি যদি বুঝতে না পারে তবে তাকে এই বলতেই হবে হবে, "বল, Boys, stand up, এবং সে বলামাত্রই ছাত্রেরা উঠে দাঁড়াবে এবং তারপর ছেলেটি আবার আদেশ দেবে "Boys, sit down" এই ভাবে কয়েকটি ছেলেকে কাছে ডেকে এনে তাদের দিয়ে গোটা শ্রেণীকে কিংবা ব্যক্তি বিশেষকে আদেশ দেওয়ানে শ্রেণীর সাড়া পাওয়া যাবে এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় বাক্যের সাথে এই ভাবে পরিচয় হবে।

শুধু stand up, কিংবা sit down এর মধ্যেই ছাত্রদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে না নিশ্চয়ই। এ ক্ষেত্রে নীতিটি হওয়া উচিত এই যে, যে সকল কাজ ছেলেদের দিয়ে শ্রেণীর মধ্যেই করানো সম্ভব সেই সকল কাজ তাদের দিয়ে ইংরেজী আদেশের মধ্য দিয়ে (Grammar এর Imperative Mood) করানো এবং আদেশগুলি আবার তাদের দিয়ে বলান। 'Come here, Go to your seat, Open the door, Shut the door, Come to the black board, Open the window, Shut the window, Open your eyes, Shut your eyes, Go out, Come in, Give me your book, Take your book ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রথম দুই একদিন কাজ চালানো যেতে পারে।

সাথে সাথে 'Whats' your name, please' এই বলে ছেলেটির নাম বলতে তাকে শেখানো যেতে পারে—

'My name is Nabin, Sir। এ ক্ষেত্রে উত্তরটিও প্রথম শিক্ষার্থীকে শিখিয়ে দিলে তবেই সে উত্তর দিতে পারবে এবং শিক্ষক প্রত্যেকটি ছাত্রকে তার নাম এই ভাবে জিজ্ঞাসা করবেন এবং জেনে নেবেন। শিক্ষক ছাত্রদের কয়েকজনকে দিয়েও শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের ঐ প্রশ্নই করাতে পারেন—"What's your name, please" এবং অন্যেরা তাদের সেই প্রশ্নের যথারীতি উত্তর দেবে। What Class do you read in ? I read in Class III এই প্রশ্ন এবং উত্তরও পূর্বোক্ত প্রকারে শেখানো যেতে পারে।

প্রথম কিছু দিন লেখা কিংবা পড়ার দিকে শিক্ষক ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন না। কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গুটিকয়েক বাক্যাংশ তাদের শেখাবেন এবং বলাবেন। এই ভাবে ইংরেজীর আরম্ভ করা যেতে পারবে।

পুস্তক সমালোচনা

লহ প্রণাম ঃ বিভা সরকার। প্রকাশক : এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১।

রবীন্দ্র শত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বহু কবি সাহিত্যিক আপনাপন সামর্থ্যমত কবিগুরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এই নিবেদনের মধ্যে শ্রদ্ধাটাই বড় কথা, উপকরণ কোথাও মূল্যবান, কোথাও স্বল্প মূল্য হলেও। আলোচ্য গ্রন্থখানি এগারটি কবিতার সমষ্টি। কবি আপন সামর্থ্যমত কবিতা রচনা করে কবিগুরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিভিন্ন ছন্দে ও ভঙ্গীতে। রচনারীতির মধ্যে চমক দেবার মত কিছু নেই। সহজ সরল ভাষায় রচিত কবিতাগুলি। তবে কোন কোন কবিতা একই একঘেয়ে হয়ে উঠেছে অকারণ মৈর্ঘ্যের জন্যে। এবং একই কবিতায় (যেমন 'রাজর্ষি', 'ওগো কবি') একাধিক ছন্দের প্রবর্তনও পড়ার ব্যাঘাত জন্মায়।

শুরু শুরু মেঘ গরজে গরজে
গেয়েছিল তব জয়গান ·

এই ছন্দে সুরু করে, একই কবিতায় কবি লিখেছেন

সুদূর বলাকা সুরের বলাকা
যেও না যেও না চলি। ইত্যাদি

কিম্বা,

যে রাজর্ষি ভারতের
জ্যোতির্ময় বিগতের···

সঙ্গেই তিনি রচনা করেছেন,

কি কহিব আর
নমি বারংবার ইত্যাদি।

এই ত্রুটিগুলি ছাপিয়েও যে দুয়টি ধরা পড়েছে ; সেটি কবির অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা :

দেবতা পূজায় দেব কোন ভুল,
আকুলি উঠিছে প্রাণের দুকূল,
মানব-কুসুম এনেছি কুড়ায়ে
দুই অঞ্জলি ভরি।

রামায়ণ কি মহাকাব্য

॥ শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ, সাহিত্য-বিশারদ ॥

[লেখক লিখিতেছেন—সম্পাদিকা উজ্জয়ন্তীরত সবীসেষু, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ সালের উজ্জয়ন্তীরতে শ্রীযুতা সরকারের লিখিত 'রামায়ণ কি মহাকাব্য' প্রবন্ধ পড়িয়া তাহিলায় প্রতিবাদ না করিলে কর্তব্যচ্যুতি ঘটিবে। তাই এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ।...'। মতামতের জন্য সম্পাদিকা দায়ী নন।—সম্পাদিকা, উজ্জয়ন্তীরত।]

আপনার কাগজের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুতা সরকার লিখিত রামায়ণ কি মহাকাব্য প্রবন্ধ পড়িলাম। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ "কাব্যে উপেক্ষিতা" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, যার ফলে মূল রামায়ণ না পড়িয়া, শুধুমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণকে আশ্রয় করিয়া ঊর্মিলার দুঃখে বহু প্রাকৃত জনের চক্ষু বাষ্পাকুল অশ্রুসিক্ত হয়। লেখিকা কি জানেন বিবাহের পর ঊর্মিলা অযোধ্যায় আসিয়া বারো বৎসর রাজৈশ্বর্যের মধ্যে রাজপত্নী জীবন যাপন করিবার পর চতুর্দশ বৎসরে রাজ্যাভিষেকের শুভ সংবাদের প্রশ্ন উঠে? লেখিকার অবগতির জন্য বাল্মীকির মূল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৪৭ সর্গটা একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। সেখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে সীতা রাবণকে বলিতেছেন—

ঊষিত্বা বারুণ নক্তা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী ॥
তস্য ত্রয়োদশে বর্ষে রাজা যজ্ঞমতং প্রভুঃ।
অভিষেচয়িতং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ ॥

অন্বয়—ইক্ষ্বাকু রাজ-পরিবারে দ্বাদশ বৎসর নানা ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে আমি বাস করিয়াছি। ত্রয়োদশ বৎসরে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত আমার স্বামীর রাজ্যাভিষেকের পরামর্শ করিলেন।

অতএব সেই কার্যে উপেক্ষিতা মেয়ে ঊর্মিলা স্বামী সঙ্গ-বঞ্চিতা দুঃখিনীর জন্য লেখিকার দুঃখ প্রকাশ একটু বেশী হইলেও ক্ষতি ছিল না। ঐ একই কারণে চতুর্দশ বৎসরের যে অমূল্য জীবন তারা ত্যাগ করিল, সেই জীবনের অমূল্যত্বও অনেকখানি হ্রাস পায় নাকি?

তারপর লেখিকার উক্তি—"সীতাহারা রাম যে কেঁদেই সারা"। এই মহামূল্য তথ্য তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন জানি না। তাঁর নিকট অনুরোধ বাল্মীকির মূল রামায়ণখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন। তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে রাম সীতাহারা হইয়া আধুনিক উপন্যাসের নায়কের মত কেঁদে কেঁদে সারা হন নাই। মূল রামায়ণ না পড়িয়া এবং শুধুমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়া রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা করার মধ্যে আছে যাহাই থাকুক কতকটা জ্ঞানজ্ঞানের অভাবই সূচিত করে এবং বিদগ্ধ জনের নিকট উপহাসাস্পদ করিয়া তোলে।

এখানে লেখিকার অবগতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের "উত্তর চরিত" প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম—

"তাঁহার (রামচন্দ্রের) চরিত্রে বীর লক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অদর্শনে শুনিয়া অনুকূলের রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই তাহার উদাহরণ স্থল, তিনি শুনিয়াই মূর্ছিত হইলেন। তারপর দুর্মুখের কাছে অনেক কাঁদাকাটি করিলেন, অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তদ্বারে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এবং বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। যেমন—

হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! জনকাত্মজেহপরিবিদ্ধ-
বন্ধুতয়ে! হা নিমিজনকোৎপন্নেতি। হা পাবক
বিশুদ্ধতাপ্রতীতশীলেতি! হা রামমাত্রজীবিতে।

হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা প্রিয় তোকথাদিনি!
কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ!

এই স্থল স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাঁদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীর প্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্‌গণকে শুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে?" সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীর প্রকৃতি রাজা আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মূর্ছিত গেলেন না,—মাথাও কুটিলেন না,—ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না।...বলিলেন, "আমি সীতাকে পবিত্রা বলিয়া জানি—সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ। অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব। "যেমন অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্যে রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেই রূপ লক্ষ্মণকে সীতাবিসর্জনে নিযুক্ত করিলেন। লক্ষ্মণ সীতা-বিসর্জনান্তে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিলেন—

স দৃষ্ট্বা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে।
সেন্দ্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং হর্ষপ্রেমগ্রহঃ ॥৩

(উত্তরকাণ্ড, ৬২তম সর্গ)

অন্বয়ার্থ: অশ্রুপূর্ণনয়ন এবং দীন-ভাবাপন্ন শ্রীরামচন্দ্র দিংহ আসনে উপবিষ্ট। তারপর লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা-সূচক কিছু বাক্য বলায় রামচন্দ্র পরম প্রীতিপূর্বক লক্ষ্মণকে বলিলেন—

এবমুক্তঃ স কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
উবাচ পরমা প্রীত্যা সৌমিত্রিং বিজয়ৎসলঃ ॥১৭
এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
পরিতোষশ্চ মে বীর মম কার্যানুশাসনে ॥১৮
নিবৃত্তিশ্চাপগতা সৌম্য সন্তাপশ্চ নিবারিতঃ।
তববাক্যৈঃ সুকচিরৈরনীতোঽস্মি লক্ষ্মণ ॥১৯

(উত্তরকাণ্ড, ৬২তম সর্গ)

অন্বয়ার্থ: বিজয়োৎসব কাকুৎস্থ মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ সান্ত্বনাসূচক কথা শুনিয়া পরম প্রীতি পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন—লক্ষ্মণ! তুমি যাহা বলিলে সেইরূপই বটে। বীর! তুমি আমার আদেশ পালন করায় আমি প্রীত হইয়াছি এবং তোমার মঙ্গল হউক। আমার শোক এবং দুঃখ নিবৃত্ত হইয়াছে।

এই মহান্ ও মহীয়ান্ দৃশ্যের পরেও যদি রামকে সাধারণ মানুষ বলা যায়, তবে রাম অসাধারণ হইতেন কি প্রথম কিস্তিতে পিতৃসত্যের প্রতি করুণী প্রদর্শন করতঃ রাজা ও সীতা উভয়ই আকৃষ্টাইয়া থাকিয়া এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে লোকাপবাদে সীতা বিসর্জন না দিয়া সীতার জন্য রাজ্যত্যাগ করিয়া—যেমন অজয় এক্ত্‌ওয়ার্ড করিয়াছিলেন?

লেখিকার আর একটী উক্তি—"সময়োচিত বুদ্ধি দিচ্ছেন লক্ষ্মণ সান্ত্বনা দিচ্ছেন লক্ষ্মণ।" এও কি একটা মহাপরাধ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সস্ত্রীক পত্নীকে লোকাপবাদে বিসর্জন দিয়াছেন, তাঁর শোকগ্রস্ত হওয়া যেমন অপরাধ, আমার প্রাণসম অনুজ সেই শোকে তাকে সান্ত্বনা দিতেছে, সেও একটা অপরাধ। কোনটা গুরুতর অপরাধ—সান্ত্বনা দেওয়া না সান্ত্বনা নেওয়া? এসব গুরুতর অপরাধের জন্য যদি লেখিকা তাঁহাকে মহাকাব্যের নায়কের পদ হইতে খারিজ করেন তবে মহাকবি বাল্মীকি বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই লজ্জায় মুখ লুকাইতেন, তাঁহার রচিত মহাকাব্যের নায়ক এরূপ অপরাধে প্রমাণিত হওয়ায়। লেখিকার মতে মহাকাব্যের নায়কের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই, যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে যাওয়ার মত পাগলামী করিবেন না, রাজা হইয়া লোকাপবাদগ্রস্ত পত্নীকে ত্যাগ না করিয়া প্রজাদের মতামতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পত্নী-করে হাবুডুবু খাইতে খাইতে জাহাঙ্গীরের মত রাজ্যশাসন করিবেন, নিজের স্বার্থ নিজের ভোগ সুখ পত্নীর স্বার্থ পত্নীর ভোগসুখ ইহার চেয়ে বড় পৃথিবীতে আর কিছু নাই—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া সংসার পথে অগ্রসর হইবেন।

এইবার পর্ণশবরী নির্লজ্জ নির্বন্ধ সাহসের কথা। সূর্পনিখা রামকে দেখিয়া কামপীড়িতা হইল এবং তাঁহাকে সীতাকে ত্যাগ করিয়া তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে বলিল। তখন রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে তিনি

বিবাহিত, কিন্তু তাঁর অনুজ লক্ষ্মণ তখনো বিবাহ করেন নাই এবং করিতে ইচ্ছুকও। তাই তাহার নিকট গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেখিতে পারে। সূর্পনখাও তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল। তদুত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন যে রাম তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কাজেই তাঁহাকে (লক্ষ্মণকে) বিবাহ করিলে তার (সূর্পনখার) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব রামকে বিবাহ করাই তাহার পক্ষে সমীচীন। রাম নিশ্চয়ই তাহার মত সুন্দরী স্ত্রী পাইলে ঐ কুরূপা পত্নীকে ত্যাগ করিবে। সূর্পনখা এই কথা শুনিয়া আবার রামের নিকট গিয়া প্রণয় নিবেদন করিল। রাম সম্মত না হওয়ায় সে সীতাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। তখন লক্ষ্মণ খড়্গ হস্তে সীতাকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইল এবং খড়্গাঘাতে রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিল। এখানে নির্লজ্জ নির্ণয় লাইনা কার—সীতার না সূর্পনখার? স্ত্রী বর্তমানে স্ত্রীর সম্মুখে স্বামীর কাছে যে কামাতুরা নারী প্রেম নিবেদন করে এবং স্বামীকে পাবার জন্য স্ত্রীকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হয় সে লাঞ্ছিত, না যে স্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই নির্লজ্জ প্রেম নিবেদন দেখে এবং পরে রাক্ষসীর আক্রমণে যার জীবন সংশয় হয় সে লাঞ্ছিত?

লেখিকার ভাষায় 'মুগ্ধা নারী আপন রূপ যৌবন এঁদের পায় দিতে এসে কি উপহার পেল—তার আকাঙ্ক্ষা যতই অন্যায় হোক না কেন, তাকে কি অন্য উপায়ে তত্ত্ব ভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যেত না?" উহার উত্তরে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, এইরূপ প্রেম-নিবেদনের দাবী এবং তার যৌক্তিকতা বিংশ শতাব্দীর এই তৃতীয় পাদেও স্বীকৃত হয় নাই বা সহানুভূতিযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। আমরা অবশ্য ব্যগ্র ব্যাকুল চিত্তে সেই দিনের জন্যই অপেক্ষমান থাকিব যেদিন এই দাবী স্বীকৃতি হইবে এবং মহাকাব্যের প্রকৃত নায়কের উদ্ভব হইবে।

তারপর বালীবধ। সুগ্রীবের সহিত রাম মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরের উপকার করিতে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; ওদিকে বালী অত্যাচারী, ধর্মচ্যুত; কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী রুমাকে জোর করিয়া নিজের শয্যাসঙ্গিনী করিয়াছে, এক্ষেত্রে রাম বালীবধ করিয়া ধর্মরক্ষাই করিলেন। যুদ্ধে রাজনীতিতে ছলে বলে কৌশলে বিপক্ষকে পরাকৃত ও পর্যুদস্ত করা যায় ও তার সমর্থন। তাহা না হইলে ভীষ্মবধ, দ্রোণবধ, কর্ণবধ, জয়দ্রথ বধ, অভিমন্যু বধ, দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ প্রভৃতির জন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতেন বিদূষিত, নিন্দিত ও হেয়। জানি না শ্রীকৃষ্ণের এই হীন চক্রান্তে ও কাপুরুষতায় লেখিকা তাঁহাকেও মহাকাব্যের নায়ক পদচ্যুত করিয়া কতোয়া জারী করিবেন কি না। বালী নিজে সুগ্রীবের প্রতি যে অন্যায় করিয়াছে তাহাকে পত্নীচ্যুত দেশত্যাগী করিয়া, মৃত্যুর পূর্বে সেই অন্যায় সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অবহিত হয়, যখন রামচন্দ্র তাহাকে বলেন—

তদেতৎ কারণং পশ্য যেন ত্বং হি ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্বর্তসি ভার্যায়াং তাং ত্যক্ত্বা ধর্মং সনাতনম্ ॥১৮
অন্তঃপুরগতস্যাপি সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং বর্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্মকৃৎ ॥১৯
ভ্রাতৃভার্যাভিমর্শেঽস্মিন্ ন তেঽন্যঃ প্রতিপাদিতঃ ।২০
(অযোধ্যাকাণ্ড, ১৮শ সর্গ)

বালীর নানারূপ অপরাধ ও অন্যায়ের কথা রামচন্দ্র তাহাকে বলার পর বালী বলিল—

এবমুক্তস্তু রামেণ বালী প্রত্যবিতো দুঃখম্।
নহোষং রাঘবে ধর্মে বিগতনিশ্চয়ঃ ॥

অন্বয়ার্থ: রাম এই কথা বলিলে ধর্মতত্ত্বজ্ঞ বালী অতীব দুঃখিত হইলেও তাহাকে আর দোষ দিল না। তারাও শেষ পর্যন্ত স্বামীকে বধ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কোন দোষারোপ করে নাই, কারণ সে বালীবধের জন্য রামকে অপরাধী মনে করে নাই। তারা শ্রীরামকে বলিল—

আশ্বাসিতা তেন মহাত্মনা ত্বং
প্রভাব যুক্তেন পরন্তপেন
সা বীরপত্নী ধরণীং গতা যুধে
হুতেশরণা বিররাম তারা। ৭৫ (কিষ্কিন্ধা কাণ্ড ২৮তম সর্গ)

অন্বয়ার্থ:—বীরপত্নী হুতেশরণা তারা পরন্তপ প্রভাবশালী

মহাত্মা রামকর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে পরিশেষে ক্ষান্ত হইলেন।

অতঃপর লেখিকার ভাষায়—"এরপর বিভীষণের সঙ্গে মিত্রতাচরণে এবং গৃহশত্রুর সহায়তায় ভায়েদের স্নেহনীড়ে চিরকলঙ্কলেপন"। ভ্রাতার কর্ত্তব্য যদি হয় অন্যায়কারী ভ্রাতার বিরুদ্ধাচরণ না করা, পুত্রের কাজ যদি হয় অন্যায়কারী পিতার বিরুদ্ধাচরণ না করা, তবে সর্ব্বাগ্রে অপরাধী করিতে হয় বিদুরকে যে দুর্যোধন কর্ত্তৃক সমস্ত অপকর্ম্মের সমর্থক ধৃতরাষ্ট্রকে সমর্থন করে নাই, অপরাধী করিতে হয় প্রহ্লাদকে যে হিরণ্যকশিপুর কৃষ্ণদ্বেষী মনোভাব এবং তৎসম্পর্কীয় কার্য্যাবলী সমর্থন করে নাই। আমাদের পুরাণাদি গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি নাই, যেখানে অন্যায়কারী ভ্রাতার অন্যায় কার্য্য ভ্রাতা শক্তি দিয়া প্রতিরোধ করে নাই, অন্যায়কারী পিতার অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুত্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বাধার সৃষ্টি করে নাই। বিভীষণ পরপত্নী-অপহরণকারী, নানা দুষ্কার্য্যের নায়ক রাবণকে সমর্থন না করিয়াই যদি মহাপরাধ করিয়া থাকে, এবং রামচন্দ্রের বিভীষণের সহায়তা গ্রহণ করা যদি ভায়েদের স্নেহনীড়ে চির কলঙ্কলেপন হইয়া থাকে, তবে কোন ঘোরতর অসৎকর্ম্মের বিরুদ্ধে কাহারও প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হওয়া যেমন অপরাধ, তেমনি সেই প্রতিবিধানকার্য্যে কোন স্বার্থপরায়ণ আত্মীয়ের সাহায্য গ্রহণ তদোধিক অপরাধ এবং এই অপরাধ শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের সমস্ত সুসভ্য দেশের সমস্ত সৎ মানুষই এই অপরাধে অপরাধী।

লেখিকা আরও বলিয়াছেন—"ইন্দ্রজিৎ-বধ তবুই কি কাপুরুষোচিত, তবুই কি অন্যায়? আমার ত মনে হয় ভারতধর্ম্মের এত বড় অপমান পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই কম ঘটেছে। পৌরুষের এত বড় অবমাননা আর কোনও কাব্যে পড়েছি বলে মনে হয় না।"

রামায়ণ সম্বন্ধে এরূপ বিস্ময়কর অজ্ঞতা হাতের উল্লেখ না করিয়া বরং সহানুভূতির সহকার করে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়া নানা প্রচলিত গল্পগল্পের উপর ভিত্তি করিয়া যে কেহ রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইতে পারে, মূল রামায়ণের চেহারাখানা পর্য্যন্ত না দেখিয়া রামায়ণের চরিত্র বিশ্লেষণে এবং আদিকবির গুরুতর ত্রুটি আবিষ্কারে সাহসী হয়, তাহার এই সাহসকে স্পর্দ্ধিত প্রগল্‌ভতা ছাড়া আর কি বলিব? বাল্মীকির মূল রামায়ণের কাহিনী নিম্নে বিবৃত করিলাম—

রঘুনন্দন বক্ষ্যামি প্রস্তাবং যে হিতং বচঃ।
সাধ্বসং ত্যজ্যতাং সৌমিত্রির্বলেন মহতা বৃতঃ॥ ১০
নিকুম্ভিলায়াং সম্প্রাপ্তং হন্তুং রাবণিমাহবে।
ধনুর্গুণনিনর্দ্দৈস্তৈ রাক্ষসীবিষবিবোপমৈঃ॥ ১১

(লঙ্কাকাণ্ড, ৮৬তম সর্গ)

অন্বয়ার্থ:—রঘুনন্দন, আমি একটি হিতবাক্য বলিতেছি শুনুন—সেই রাবণনন্দন নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করিতেছে। সুমিত্রানন্দন সৈন্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় গমন করুন, তাহা হইলে উত্তম হইবে, ইনি উপস্থিত হইয়া বিষতুল্য বাণপ্রহারে তাহাকে বধ করিতে পারিবেন।

লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন। সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ রওয়ানা হইলেন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। একদিকে বহু সৈন্য ও সেনানী পরিবৃত লক্ষ্মণ, অন্যদিকে বহু সৈন্য ও সেনানী পরিবৃত ইন্দ্রজিৎ।

স রাক্ষসগণৈর্মুখ্যৈর্বৃতো মন্ত্রোদয়ীদৃতঃ।
নির্যযৌ নগরাদ্বীরঃ কৃতাবদনলোদিতঃ॥ ১১

(লঙ্কাকাণ্ড, ৯১তম সর্গ)

অন্বয়ার্থ:—পরে তিনি প্রধান রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যেন কালপ্রেরিত হইয়াই সত্বর নগর হইতে বহির্গত হইলেন। যুদ্ধ ক্রমেই ভয়ানক হইতে ভয়ানকতর হইতে লাগিল।

ততঃ সমভবদ্‌যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
গগণস্থানি ভূতানি লক্ষ্মণং পর্য্যবারয়ন্॥ ৬১

(লঙ্কাকাণ্ড, ৯১তম সর্গ)

অন্বয়ার্থ:—সেই সময় বানর ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ দেখিবার জন্য অসংখ্য প্রাণী আকাশ পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশেষে লক্ষ্মণ ঐন্দ্র নামক অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিল।

ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণং বিকৃষ্য তমজিহ্মগম্।
ঐন্দ্রাস্ত্রেণ সমাযোজ্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা॥ ৭১

তস্যোরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমদ্ভ্রাজিতকুণ্ডলম্।
প্রবধ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৭২
(লঙ্কাকাণ্ড, ৯১তম সর্গ)

অন্বয়ার্থ :—পরবীরহা লক্ষ্মণ ঐন্দ্র অস্ত্রকে আকর্ষণপূর্বক স্বয়ং মধ্যে ইন্দ্রজিতের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্রজিতের কিরীটকুণ্ডলাবৃত সুচারু মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের স্ব স্ব সৈন্যসামন্তসহ পরস্পরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের হাতে নিহত হন। এইভাবে লক্ষ্মণ বীরের যুদ্ধে ন্যায়যুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে কোন কপটাচরণের আশ্রয় না নিয়া সম্মুখসমরে ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন।

এতে কাপুরুষতাই বা কোথায়, ন্যায়ধর্মের অপমানই বা কোথায়? কৃত্তিবাসের রামায়ণকে মূলধন করিয়া এরূপ বিজ্ঞ সমালোচনার প্রয়াস হইতে লেখিকাকে ভবিষ্যতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

তারপর রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ। লেখিকার ভাষায় —"তারপর রাবণের মৃত্যুবাণ হরণে কি কাপুরুষোচিত পন্থাই না নেওয়া হইয়াছে"? এখানেও কৃত্তিবাসের জয় জয়কার। বিংশ শতাব্দীতে বসে যে মূল রামায়ণ একেবারেই না পড়িয়া এরূপ প্রজ্ঞাবানের বিজ্ঞতাসূচক ভঙ্গীতে গুরুগম্ভীরভাবে এরূপ অসারগর্ভ আলোচনায় অবতারণা করিতে পারে, মহাকাব্যের নায়কের নায়কোচিত গুণের অভাবের কথা সগর্বে ঘোষণা করিতে পারে, তাহা কল্পনাতীত। কৃত্তিবাসে আছে রাবণের মৃত্যুবাণ মন্দোদরীর নিকট ছিল। হনুমান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উহা অপহরণ করার পর সেই মৃত্যুবাণে রাবণের পতন ঘটে। লেখিকা ইহাকেই কাপুরুষোচিত এবং অন্যায় বলিয়াছেন এবং ন্যায়ধর্মের এত বড় অপমান পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই ঘটিয়াছে, ইহা আবিষ্কার করার গৌরবে হাসিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিয়া রাখুন রাবণের মৃত্যুবাণ বলিয়া কোন বাণ মন্দোদরীর নিকট ছিল না, কাজে কাজেই তাহা চুরির কোন প্রশ্নই উঠে না। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই উভয়ের প্রতি নানা অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া রাবণকে বধ করেন। ইহাই বাল্মীকি রামায়ণে প্রদত্ত ঘটনা।

যং তস্মৈ প্রথমং প্রাদাদ্ভগবান্ ভগবানৃষিঃ।
ব্রহ্মদত্তং মহাঘোরমব্যর্থং যুধি বীর্যবান্॥ ৪
(লঙ্কাকাণ্ড ১১০তম সর্গ)

অন্বয়ার্থ:—পূর্বে ঋষিবর অগস্ত্য তাহাকে যে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রবীর বাণ গ্রহণ করিলেন।

শম্বুকবধ উত্তরকাণ্ডের ঘটনা। অনেকেরই মতে উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রও এই মতের পোষক। উহার প্রধান কারণ লঙ্কাকাণ্ডের শেষে রামায়ণ পাঠের ফল বর্ণিত আছে। একটি গ্রন্থ শেষ হইয়া গেলেই সেই গ্রন্থ-পাঠের ফলের কথা বলা হয়। লঙ্কাকাণ্ডের পরিসমাপ্তিতে বর্ণিত আছে :—

ধর্মং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাঞ্চ বিজয়াবহম্।
আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্॥ ১০৪
যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পুত্র কামশ্চ পুত্রান্ বৈ ধনকামো ধনানি চ॥ ১০৬
লভতে মনুজো লোকে সর্বা রামাভিষেচনম্।
মহীং বিজয়তে রাজা রিপূংশ্চাপ্যধিতিষ্ঠতি॥ ১০৭
(লঙ্কাকাণ্ড, ১০৩ সর্গ)

অন্বয়ার্থ :—ইহলোকে যে মহান্ মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত, রাজগণের বিজয়াবহ এই দেবতুল্য আদিকাব্য শুনিবে, সে সর্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ধর্ম এবং যশলাভ করিবে। রামাভিষেকসম্বলিত এই আদি কাব্যকথা শুনিলে পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্র এবং ধনকামী ব্যক্তি ধন লাভ করিবে। মহীপতি এই কাব্য শুনিলে শত্রুগণসহ বসুন্ধরাকে জয় করিতে পারিবেন।

কাজেই মূল রামায়ণে এই উত্তরকাণ্ড না থাকায় ইহাতে বর্ণিত শম্বুকবধ কাহিনী রামায়ণের ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহার জন্য রামচন্দ্রকে দায়ী করা চলে না। তারপর সীতা বিসর্জন। পূর্বেই বলিয়াছি সীতা বিসর্জন লোকদুষ্টির জন্য নয়, লোকাপবাদের জন্য। লোকদুষ্টির কথা অবশ্য ভবভূতি উত্তর রামচরিতে বলিয়াছেন—

সতাং কেনাপি কার্যেণ লোকস্তারাধনং ব্রতম্।
যৎ পূজিতং হি তাভ্যেন যাক প্রাণংশ্চ মুক্তত।

অর্থাৎ—লোকের আরাধনা করা সাধুব্যক্তিদের পক্ষে সর্বতোভাবেই বিধেয় এবং এইটি তাহাদের পক্ষে মহৎ ব্রতস্বরূপ। কারণ পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছেন।

কাজেই দেখা যাইতেছে ভবভূতির উত্তরচরিতে যে রামচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে বাঙালীদের চরিত্রের সঙ্গে তাহার সৌসাদৃশ্য অধিকতর থাকায় বাঙালী সাধারণ সমাজ তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছে—যাত্রাগানে, রামায়ণ গানে, কথকতায়, সাহিত্যে এই বাঙালী রামই চিত্রিত, কথিত, আলোচিত। যেহেতু লেখিকা মূল রামায়ণের ধার ধারেন না, সেই জন্য এই রামকে অবলম্বন করিয়াই তিনি এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বাল্মীকিতে দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—

অন্যথাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং তত্ত্বাং যশস্বিনীম্।
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যা মহদাগতঃ।
অয়ন্ তু মে মহান্ বাদঃ লোকস্য হৃদিবর্ততে।
সৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ।

রামচন্দ্রের বক্তব্য যে মহীয়সীর অপবাদরূপ অকীর্তি আমি সহ্য করিব না। যে স্ত্রীর এইরূপ লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব এবং ইহাই রাজধর্ম।

রামচন্দ্র সর্বপ্রথমে রাজা, তাঁর সর্বপ্রধান কর্তব্য প্রজা-সাধারণের প্রতি। ব্যক্তিগত লাভক্ষতি, সুখদুঃখ সেখানে বড় নয়, স্ত্রীর অসুবিধা বা কষ্ট, পিতার, পুত্রের বা অন্যান্য পরিজনের স্বার্থ বা সুবিধা সেখানে বিচার্য নয়—কোনও মহাপুরুষের ক্ষেত্রেই বিচার্য থাকে না। তাহা হইলে বুদ্ধদেব পিতামাতা স্ত্রী পুত্রের দুঃখকে পদদলিত করিয়া, পতিধর্ম পিতাধর্ম সব বিসর্জন করিয়া জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য সংসার ত্যাগরূপ যে অন্যায় করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সর্বত্র পূজিত হইতেন না, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্ত্রী ও বিধবা মাতাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া তাঁদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন না করিয়া জগৎ-বরেণ্য হইতেন না। পরের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য ত্যাগস্বীকার জীবনের মহত্তম ব্রত, এবং সে ত্যাগে যত বেশী ব্যথা বাজিবে, যত বেশী ক্ষতিকর মনে হইবে, ততই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি যদি লেখিকার মতে শ্রীরামচন্দ্র রাজধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া পতিধর্ম পালনের জন্য, অর্থাৎ সীতাকে নিয়া রাজা অইব এডওয়ার্ডের মত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন এবং সেখানে সমাজ সংসার সমস্ত ভুলিয়া শুধু সীতাকে নিয়া সমস্ত জীবন অচ্ছিন্ন মিলনসুখ উপভোগ করিতেন তবেই সীতার প্রতি যথোচিত কর্তব্য করা এবং তাহাতেই রামের মহত্ত্ব সূচিত হইত। কিন্তু সে আদর্শে ভারত বিশ্বাসী নয়। নিজের বা পরিবারের স্বার্থসিদ্ধি বা সুখভোগ কোনদিনই সে জনসাধারণের চেয়ে বড় মনে করে নাই। বিসর্জন ও ত্যাগের ভিতর দিয়াই তার মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আত্ম-সুখসর্বস্ব ভোগসর্বস্ব যে ত্রৈণ রামের আদর্শ লেখিকার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত, তাহাকে বাল্মীকি মহাকাব্যের মহানায়করূপে চিত্রিত করিলে তিনি অবশ্য সুখী হইতেন এবং অনেকেই হয়ত বাংলা উপন্যাসের নায়কোচিত রামের স্ত্রী-প্রেমে মুগ্ধ হইতেন। তবে দুঃখের বিষয় ইউরোপের ভোগসর্বস্ব জীবনবেদ ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় হওয়ার সম্ভাবনা আজও অনুজ্জ্বল।

সাময়িকী

পনেরই আগস্ট ঃ আবার পনেরই আগস্ট ঘুরিয়া আসিল। পনের বৎসর আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। আমরা স্বাধীন ভারতকে বন্দনা করি। যাহারা ভারতবর্ষ স্বাধীন করিয়াছেন তাঁহাদের বন্দনা করি।

ভারতকে স্বাধীন রাখার দায়িত্ব আমাদের—আজকের যুবা-কিশোর-শিশু সম্প্রদায়ের। স্বাধীন হওয়ার পনের বৎসর পরে আজিকার যুবা-কিশোর-শিশুর দল স্বাধীনতার উৎসব পালন করিতেছে—তাহাদের উপর ভবিষ্যৎ ভারত নির্ভরশীল। তাহারা ভারতকে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে কতটুকু জানে, কতটুকু মনে করিয়া রাখিয়াছে, স্বাধীনতার অর্থ তাহারা জানে কি? তাহারা যখন আজ পনেরই আগস্ট দিবস পালন করিতেছে, তখন তাহাদের স্বাধীন হওয়ার মানে কি, পরাধীন হওয়ার কষ্টটা কি ছিল, স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় কিভাবে সেই সকলের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে অতীত ভারতকে, তাহার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকেও জানাইতে হইবে। অতীতকে ভুলিয়া যাওয়া মানুষের একটা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের মূল্য যত বেশীই হউক, অতীতের পটভূমিকায় তাহাকে না বুঝিলে কেবল যে তাহার সৌরব হানি হয় তাহা নহে, তাহার সবটুকু অর্থই ফুটিয়া উঠে না। তাই আজ পনেরই আগস্ট পালন করিতে বসিয়া আমরা যুবা-কিশোর-শিশুকে অতীত ভারতের কথা স্মরণ করাইয়া তাহার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আদর্শকে স্মরণ করিতে বলিব। যেমন বর্তমান ভবিষ্যতের তেমনি অতীত ভারতেরও কেবল রাজনৈতিক জীবনের কথা জানিলে চলিবে না, তাহার সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুতে সে কোন্ অবস্থায় ছিল, আজ এই সব দিকে এবং সবশুদ্ধ কোন রূপে সে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে, তাহাও দেখিতে হইবে।

ভারতবর্ষকে যখনই আমরা চিনিতে যাইব, তখন নিশ্চয়ই অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, বছর দুয়েক আগের বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষ যে রকম ছিল, আজকের ভারতবর্ষের রূপ সে রকম নয়। এমনও মনে হইবে, যেমন অনেকেই বলিয়াও থাকেন যে, ভারতবর্ষ তাহার স্বরূপচ্যুত হইয়াছে, তাহার ধর্ম হারাইয়াছে। এক কথায় এতদিন সে ছিল আধ্যাত্মিক, আজ সে জড় সর্বস্ব হইয়া ডুবিয়াছে বা ডুবিতে বসিয়াছে। কথাটা আংশিক সত্য। যে ভারতবর্ষ শুধু আধ্যাত্মিক ছিল, এবং আধ্যাত্মিকতাই যদি ভারতবর্ষের একমাত্র সত্তা কথা হইয়া থাকে এবং আধ্যাত্মিকতা বলিতে সাধারণতঃ যেমন বোঝা হইয়া থাকে যে জগৎ-নিরপেক্ষ ভগবানই একমাত্র সত্য, মায়াময় ব্যবহারিক সংসারকে ছাড়িয়া যাইয়া সেই ব্রহ্মলাভই একমাত্র পারমার্থিক সত্য বস্তু, তাহাই যদি আধ্যাত্মিকতার অর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ তাহার স্বরূপচ্যুত হইয়াছে, একথা বলা যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার এই অর্থ দীর্ঘ প্রচলিত হইলেও ইহাই গীতা-উপনিষদ্ বেদান্তের সবটুকু কথা নয়, তাই ইহাই সত্যকার ভারতবর্ষের সমগ্র স্বরূপও নয়। তাহা হইলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে এইরূপ সংসার পরিত্যাগী আধ্যাত্মিকতার শৈব্য হইতে মুক্ত করিয়া মুক্ত পুরুষ রূপে জগৎকে পুরুষোত্তম-রাজ্যে গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া আঠার অধ্যায় গীতা বলার প্রয়োজন হইত না, উপনিষদ্ও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিতেন না, 'বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে' অর্থাৎ যিনি বিদ্যা অবিদ্যা এই উভয়কে সহভাবে জানেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত ভোগ করেন। ভারতবর্ষের গীতা অর্জুনের মারফত বিশ্বকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার ব্রতে আহ্বান করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের

উপনিষদ্ 'বিদ্যা অবিদ্যা উভয়কে সহভাবে জানিতে বলিয়াছিলেন। আমরা কয়েক হাজার বৎসর পর্যন্ত এই মর্মার্থকে গ্রহণ না করিয়া তথাকথিত আধ্যাত্মিকতাকেই ঐকান্তিক করিয়া তুলিয়াছিলাম, জগৎকে একান্তভাবে হেয় করিয়া, ছোট করিয়া অজগৎকেই একান্তভাবে বড় করিয়া তুলিয়াছিলাম—যে জন্য জড়বাদের হাতে, জড়বাদীর হাতে আমরা মারই খাইয়াছি। অথচ গীতা অর্জুনকে জড়বাদী দুর্যোধনের অত্যাচারের হাতে মার খাইতে নিষেধ করিয়াই গীতা বলিয়াছেন, যোগেশ্বর কৃষ্ণ আর ধনুর্ধর পার্থের সমন্বয়েই এবং শ্রী, বিজয়, ভূতি, নীতি। গীতা একথা তো বলেন নাই যে ধনুর্ধরত্বের প্রয়োজন নাই, যোগেশ্বর হইলেই চলিবে। অথচ আমরা এই রকম বুঝিয়াই কয়েক হাজার বৎসর চলিয়াছি, যোগেশ্বরত্বের ধনুর্ধরত্বের সমন্বয়ে পূর্ণতার শান্তির সাধনা ভারতবর্ষের ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিলেন, '...এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায় এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে বিকৃতা এসে দাঁড়ালো—সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শংকরাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন'।

কেন কেমন করিয়া পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তিতে পরিণত হইয়াছিল, দার্শনিক কোন্ মনস্তত্ত্বের ফাঁকে পড়িয়া ভারতবর্ষ জড়বাদকে হেয় করিয়া ফেলিয়াছিল, স্বাধীন ভারতের সত্তাকার স্বরূপ জানিতে ও জানাইতে হইলে এ সকল কথা আজ জানিতে হইবে। ভারতবর্ষের পক্ষে তাহার রাজনীতির ইতিহাসটাই সবটুকু কথা নয়, ভারতবর্ষে রাজনীতি একান্ত স্পষ্ট হইয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থান দখল করিয়া তাহার সমাজ-জীবনকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা বেশী দিনের কথা নয়। তাই রাজনৈতিক ভারতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমগ্র স্বরূপকে আধিকার ছেলে মেয়েকে জানাইতে হইবে। সে সমগ্র স্বরূপের খবর রহিয়াছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ও দর্শনে। সে স্বরূপের গোড়ার কথা সংক্ষেপে এই—আসক্তি বিদ্বেষের বশবর্তী না হইয়া, প্রকৃতির সকল স্তরে বিচরণ করিয়া দেশ-কাল-পাত্রনিরপেক্ষ একটী এক-মানব গোষ্ঠী রচনার নিরন্তর প্রয়াস। এই পথে নিরন্তর প্রয়াসই জীবনমুক্তি—ইহাই আধিকার মানুষের সাধ্য। পনেরই আগস্টের স্মরণীয় দিনে দাঁড়াইয়া জাতির পুনর্গঠনের দিনে ভারতবর্ষের এই ইতিহাস এবং এই সাধনা সকলের নিকট তুলিয়া ধরিতে হইবে। ভারতবর্ষের এই পূর্ণ আত্মস্বরূপকে চেনাই পনেরই আগস্টের কাজ।

শ্রীযোগেন্দ্র মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অধিবীলগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

"পুরুষোত্তম cult-এ প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র—কি কথাই না তোমায় গোপাল বলিয়া গিয়াছেন? 'অল্প অস্তিও পূর্ণ, অধিক অস্তিও পূর্ণ।' এতদিন অল্পের কোন self-centered হইবার যোগ্যতা ছিল না। অল্প সার্থক অধিকের মধ্যে নিভিয়া গিয়া—এই হাইপথেসিসের—অনুমানের—উপর সব সমাজ গড়া। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু সেই মানুষও যে বৃন্দাবনে গিয়া তরুগুল্মলতাজন্ম কামনা করিবে, তাহা কে জানিত বা বিশ্বাস করিত? কৃষ্ণসখা উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। একটা hierarchy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উর্দ্ধ ধাপে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ স্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল, সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড় ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct ও equal relation। গায়ত্রী জপ ও সূচির জুতাসেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটা কুলীন হইবে এবং অপরটা অকুলীন হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর-পূজাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন?.....যদি কৌশলপূর্বক প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্ব হইতেও পুরুষোত্তম যতদূর, রজস্তম হইতেও পুরুষোত্তম ততদূর।.....এতদিনের সাধনা সব minus-এর সাধনা, নেতি নেতি। কৃষ্ণের সাধনা positive। সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।..... ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম, একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে।..... তাই আজ নোতুন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New Social Order, New Religious Order সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে না পুরুষোত্তম মিলিবে?....."

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের পত্র

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

শারদীয়া সংখ্যা ১৮৮৪, ১৩৬৯ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম, এ পঞ্চদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীবিভাগোপাধ্যায়

শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বল, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী,
শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বল, দুর্গা দুঃখনিবারিণী।

ভয়হরা ভবদারা ভৈরবী ভবানী,
হৈমবতী, হেমাঙ্গিনী, হরবিলাসিনী
সাকারা আকারা তারা দুর্গা নিস্তারিণী।

কৃষ্ণা চিন্ময়ী দুর্গা, দুর্গা দনুজদমনী,
চিদানন্দময়ী দুর্গা, দুর্গা দাক্ষায়ণী!

শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
শম্ভু-হৃদয়বাসিনী মুণ্ডমালিনী,
কৈলাসবাসিনী বামা, কৈবল্যদায়িনী।

বিশ্বময়ী বিশ্বেশ্বরী গৌরী কাশীশ্বরী,
দয়াময়ী ত্রিনয়নী শাম্ভবী শঙ্করী,
হরমনোরমা উমা, শ্যামা, শিবরাণী।

মহামায়া, যোগমায়া, যশোদানন্দিনী,
বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী, গণেশজননী,
রাজবালা, গিরিবালা, গিরীশমোহিনী।

গৌতমীয় তন্ত্রমতে (দুর্গা) শ্রীকৃষ্ণরূপিনী,
নারদপঞ্চরাত্র মতে (দুর্গা) শ্রীকৃষ্ণমোহিনী,
আনন্দময়ী অভয়া, দুর্গা আহ্লাদিনী।

LIBRARY

উদ্বোধন

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

৬৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

মহাপূজা *

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা ৪।৬।
ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুম্ মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥

ভাগবত ১০।২৯।১

শ্রীভগবান নিত্য বলিয়া তাঁহার জন্ম সম্ভবে না, কিন্তু তিনি যোগমায়া প্রভাবে জীব-হৃদয়ের যুগযুগান্তরের কলুষতা মুহূর্ত মধ্যে মুছিয়া ফেলিয়া অচেনা নূতনের মত প্রাণ ভুলান বেশে উঁকি দেন। তাঁহার ব্যয় নাই, ক্ষয় নাই, তিনি আত্মা, কিন্তু কি তাঁহার অচিন্ত্যলীলা। তিনি সেই লীলা প্রভাবে কত আদর-অনাদর, কত হাসি-কান্না, কত বিরহ-মিলন ও কত অভিমান-সোহাগের মধ্য দিয়ে জীবের প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া দিতেছেন! তিনি সকলের প্রাণ-মন অধিকার করিয়া বিহার করিতেছেন, অথচ সকলেই ভাবিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কাছেই আছেন, এবং তাঁহাকে লইয়াই লীলায় মত্ত। ধন্য মা যোগমায়া, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া ঠাকুর আমার ঈশ্বর হইয়াও মধুর; তিনি ঐশ্বর্যের দ্বারা জীবকে স্তব্ধ অপাপবিদ্ধ করেন, আবার মাধুর্যের দ্বারা তাঁহার প্রাণের মাঝে আপনার করিয়া লুকাইয়া রাখেন। মা, তুমি যে তাঁহার দ্বারা অর্থাৎ কৃপা-শক্তি। প্রেমময় ঠাকুর তোমাকে স্বকীয় (আপনার) ভাবে না দেখিয়া, স্ব (আপনি) ভাবে দেখেন। তুমি ও তিনি অভেদ, তুমি তাঁহার স্ব-প্রকৃতি। এখন মা, জীবের চিত্ত বড় মলিন ও প্রেমহীন; তোমায় দিবে চাহিয়া আছে, প্রার্থনা করিতেও জানে না। তুমি আমাদের হৃদয়-মাঝে তোমার পরাণ-সর্বস্বকে নিয়া প্রকাশিত হও। মা, তোমাকে আশ্রয় করিয়াই না সেই ব্রজধামে গোপী-বিনোদন শ্রীনিত্যগোপাল জ্যোৎস্নাময়ী শারোদ্ফুল্ল-মল্লিকা রজনীতে গোপীকুল নিয়া রাসবিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন? সেদিন জগতের কি আনন্দের দিন! মা, তুমিই না বৃদ্ধ তপস্বিনী শ্রীশ্রীপৌর্ণমাসী মূর্তিতে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মোহন লীলা-মাধুরী নয়ন ভরিয়া পান করিবার লাগি সেখানে প্রকট হইয়াছিলে? তুমিই না রাস-বিলাসের রজনী প্রভাতে তোমার প্রাণকৃষ্ণ ও প্রাণের দুলালী শ্রীরাধারাণীর বিরহভাববৈচিত্র্য আস্বাদন করিতে নন্দ-ভবনে ও বৃষভানুপুরে আনাগোনা করিতে? তুমিই না সৎ-কৃষ্ণের সঙ্গে আনন্দ রাধার মিলন করাইবার জন্য চিন্ময়ী-মূর্তিতে ব্রজে সদা বিরাজমান? মা, আমরাও ত আনন্দ হইতে জাত, আনন্দে সঞ্জীবিত এবং আনন্দই আমাদের একমাত্র গতি। তবে মা, এমন কৃপাময়ী তুমি থাকিতে আমরা সৎকৃষ্ণ পরশাতে বঞ্চিত কেন? দয়া কর, দয়া কর। আমরা তোমারই শরণাগত।

মধুকৈটভ-ভয়ে ভীত ব্রহ্মা জনার্দনকে যোগ-নিদ্রাগত দেখিয়া হরির চৈতন্য সম্পাদনার্থ অনুপমা যোগ-নিদ্রার স্তব করিতেছেন :—

* ১৩৩২ বঙ্গাব্দের প্রথম পর্য্যায় "উদ্বোধন ভারত" পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

স্বধাক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ৮৩।

মা যোগনিদ্রা, তুমি নিত্য অক্ষরূপা, ওঙ্কারস্বরূপিনী, তোমার প্রতি পাদবিক্ষেপে স্বধারস উছলিয়া উঠিতেছে। মা, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ওঙ্কারের এই তিনটী মাত্রা তুমি; আবার অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থিত যিনি, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, যাহা বিশেষের আশ্রয়ে আখ্যায়িত করিবার উপায় নাই তাহাও তোমার শ্রীঅঙ্গে বিলসিত।

"তেষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো
রসোঽপাম্ ওষধয়ো রসঃ ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য
বাগ্রসঃ বাচো ঋগ্রসঃ ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্গীথো রসঃ।
১।১।২
স এব রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথ ॥
৩। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

সর্ব্বভূতের রস পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল, জলের রস ওষধি, ওষধির রস পুরুষ, পুরুষের রস বাক্য, বাক্যের রস ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদের রস সামবেদ, সামবেদের রস এই ওঙ্কার। এই রসময় নিত্য নামই পরম পুরুষ নিত্যগোপালের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, আবার উহা অষ্টম অভিব্যক্তি বলিয়া সকল রসের লয় স্থান। সর্ব্বরস উহা হইতে উঠিয়া, উহাতে জীবন লাভ করিয়া উহাতেই একাকার হইয়া মিলিয়া যাইতেছে! বিশ্বের সর্ব্বরসের সার ঘনীভূত হইয়াই এই নিত্যনাম জীবের জাগো উদয় হইয়াছেন। "নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী," 'কত সুধারস ছানি গড়িল বিহি না জানি'! ধন্য জীব, ধন্য কলিযুগ!!

নবমী পূজা

এই নিত্যনাম যোগমায়া প্রকাশিত রস-লীলার আদি বীজ। যোগমায়া নিজের ভিতর হইতে সর্ব্বদেবশক্তি প্রকাশ করতঃ তাঁহাদের দ্বারা অনন্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অংশভূতা জীব-প্রকৃতি সমস্ত দেবশক্তির সাহচর্য্যে দেহের স্থান নামরূপগুণে ভূষিত হইয়া মহা ব্যক্তিকতার সহিত কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজিয়া শ্রীভগবানের ও সমস্ত দেবতার শক্তি পদদলিত করিবার আশায় বিচরণ করিতে লাগিল। জীব এইভাবে ধর্ম্মের গ্লানি জন্মাইল, জগতের সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল, দেবতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। হায় হত-ভাগ্য জীব, তুমি যে শ্রীভগবানের প্রতিবিম্ব; তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া সাজাইলে যে তোমাকেই সজ্জিত করা হয়, ইহা কি ভুলিয়া গেলে? সমস্ত দেবতারা যে তোমাদের নিত্যমিলন সংঘটিত করিবার জন্যই সযত্নে নয়নে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা যে সেই পরম পুরুষের মহাভিষেকের জন্য সমস্ত ভুবন-তীর্থবারি সংগ্রহ করিয়া তোমাকে সবরূপ-ভাবে আহ্বান করিতেছেন, কিংবা তোমাকে সেই যমুনা বিলাসী মুক্তবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মহাভিসারে সর্ব্বঅলঙ্কারে ও সর্ব্বগুণরাজিতে উজ্জ্বলিনী করিয়া পাঠাইবার জন্য প্রকাশ্য কর্ম্মপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুপ্তপ্রেম-মার্গে বিচরণ করিতেছেন, সে জন্য কি একবারও তুমি তৃণাদপি নীচ হইয়া তাঁহাদের পাদ-বন্দনা করিবে না? ধিক্ তোমাকে, ধিক্ তোমার প্রেমলাভ চেষ্টায়। ঐ দেখ কঠোপনিষদে নচিকেতা ধর্ম্মরাজ যমের নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। ঐ শোন ঈশাবাস্যোপনিষদের ঋষি প্রেম পরিপ্লুতচিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন :—

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্"—'হে অগ্নিদেব, যে পথে গেলে প্রেমবনে ধনী হইয়া প্রেমময়ের প্রেমালিঙ্গন লাভ করা যায় সেই পথে আমাদিগকে টানিয়া লও। তাঁহার চরণে প্রাণ মন বিকাইবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, তুমি আমায় সহায় হও।" এই ভাবে ব্যাকুল হইলে দেখিবে সকল দেবতারা তোমার মহাযাত্রার সময়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমাকে সেই প্রেমের পথে তুলিয়া দিবেন। তবে দেবতাদিগকে শ্রীভগবান্ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া দেখিলে তাঁহারা তোমার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইবেন বটে। 'দেবানাং পরার্দ্ধ্যোঽস্মদ্ব্রহ্মজ্ঞানোদেবান্ বেদ (১)।' যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানেন, দেবতাগণ তাহাকে পরাস্ত করেন। এখন মোহ সকলের চরণ-ধূলি নিয়োজুষণ না করিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা কি

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

কল্যাণকর হইবে? না, কিছুতেই না। আরও দেখ, সব দেবতারা যাঁহার চরণ-মকরন্দ পান করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, কোথায় তুমি প্রেমময় সেই ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করতঃ তন্ময় হইয়া যাইবে, আর কি-না তুমি সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া নিজেকে শ্রীভগবানের আসনে বসাইয়া নিজে স্বামী সাজিলে? ছিঃ, স্বামী হওয়া কি এতই সুখ? তুমি কি জান না, তিনি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা; তবে আর কেন সর্ব্বদেব-পরিবৃত শ্রীযজ্ঞেশ্বরকে সর্ব্বযজ্ঞ-ভাগ না দিয়া নিজে গ্রহণ করিতে লোলুপ হও? পার ত সর্ব্বযজ্ঞের ভিতর নিজকেও আহুতি দেও। তিনি 'অন্নাচরাচর গ্রহণাৎ', তিনিই রমণ, তিনিই রাম। তিল-তুলসী দিয়া তিল তিল করিয়া তোমার সকল 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নিঃ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা'। এই মন্ত্রে তাঁহাতে আহুতি প্রদান কর, তুমি ধন্য হইবে, তোমার অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

মহাষ্টমী পূজা

জীব এইভাবে শ্রীভগবানের ও দেবগণের নিকট হীন না হইয়া যখন মালিকতা ও ভোক্তৃত্বের মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিশ্বের সকল শক্তি ব্যথিত হইল, সকলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দেবতারা পৃথক পৃথক ভাবে সকলেই ধর্ম্ম-শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কেহই সক্ষম হইলেন না। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রীজ্ঞান-গুরুর শরণাপন্ন হইলেন। সর্ব্বদেবশক্তি শ্রীশ্রীগুরুর কৃপায় একত্র মিলিবার সুযোগ পায়। শিব গুরুর কৃপায় প্রথমতঃ তাঁহাদের হৃদয়ে নাম শক্তির প্রকাশ হইল। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, হিরণ্ময়বপু হিরণ্যগর্ভ শ্রীভগবান শ্রীগুরুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধক-হৃদয়ে হিরণ্ময় বীর্য্য আধানা করেন। এই বীর্য্য 'অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ রাধা'—অন্তরে যেইভাবে শ্রীভগবান আর বাহিরে দেহরূপে চিন্ময়ী পরাপ্রকৃতি শ্রীনিত্যনাম। মন্ত্রই এই ব্রহ্ম-বীর্য্য, ইহা অমোঘ। স্বামীর বীর্য্য যেমন স্ত্রী সময়ে আধানে করতঃ অতি সুন্দর ও মনোহর করিয়া তোলেন, দেবতারাও তদ্রূপ দীক্ষা-শক্তিতে আপনার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়া শূন্যের মত হইয়া মনোমোহন রূপের সাক্ষাৎ পাইলেন। সব দেবতার নিকট শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তোমার ইচ্ছা থাক, আর নাই থাক, নিত্য-প্রকাশশীল শ্রীশ্রীগুরু-বীর্য্য তোমার সর্ব্বস্ব আপনাতে আকর্ষণ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইবেই। দেবতারা যখন এই সর্ব্ব আকর্ষণকারিণী শ্রীগুরুদেবের মন্ত্রশক্তির বিকাশ বলিয়া নিজেদের লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি ইত্যাদিকে বুঝিয়া তাহাতে নিমজ্জিত দেখিতে পাইলেন, তখনই তাঁহাদের সম্মিলিত দেহ শ্রীভগবানের প্রকাশ ক্ষেত্র হইল। অমনি রূপ করিয়া তাঁহাদের সকল ফুটিয়া সেই চিন্ময়ী তনু প্রকাশিত হইল। শ্রীভগবানের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও জীব-লোকে আসিতে হয়।

নবমী পূজা

প্রথমতঃ শ্রীভগবানের একাধারে সর্ব্ব-প্রকাশক ও সর্ব্বাতীত বা গৌরকৃষ্ণ-রূপ দেবতারাই আস্বাদন করিতে পারেন, কিন্তু সাধক উহা ধরিতে ও বুঝিতে পারে না। সাধকের অহংতত্ত্বকে পরমলিত করিবার জন্য পরাশক্তিকে আবার জীবের পঞ্চকোষের অধিষ্ঠাত্রী শুধু প্রকাশকারিণী গৌরীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে হয়। দেবতারা এই শ্রী কৌষিকীমূর্ত্তি নিয়া জীবের মধ্যে আসিলেন এবং তাঁহার নানা রূপ-গুণাদির শ্রবণ কীর্ত্তনে মাতিয়া সাধকদিগকে ঐ শ্রবণ-কীর্ত্তনে আকর্ষণ করিলেন। সাধক তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রণব-রূপিনী আনন্দময়ী শ্রীশ্রীকৌষিকী দেবীর আবির্ভাব অনুভব করিল। সে এই অপ্রাকৃত স্বপ্রকাশ নাম-ধনকে 'সকলনিগমবল্লীচিৎফলম্ সৎস্বরূপম্' ও তাঁহার প্রকাশ-জনিত আনন্দকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ভোগ-লালসা নিয়া উহাদেরও বশ হইবার জন্য ছুটিল। "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাব-মজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।" অল্পবুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য, সর্ব্বোত্তম, পরম স্বরূপ না জানিয়া মায়াতীত অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তিভাবপ্রাপ্ত মনে করে। এইবার যাত্রা সুরে খেলা চলিল।

'এবার কালী তোমায় খাব।
(এবার) তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা করে যাব।'

এই খেলায় দু'জনার স্থান নাই। জীব যখন পরা-প্রকৃতিকে সাধারণ চক্ষে দেখিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করিলেন, তখন তিনি বলিয়া পাঠাইলেন 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্রে যো ময়ি পশ্যতি। যো ময়ি প্রতি-পন্নো লোকে স ময়ি ভবিষ্যতি॥' অর্থাৎ তিনি আমার নিত্য অব্যয় অহংকে খর্ব করিয়া তাঁহার অহং স্থাপন করিতে পারিবেন এবং আমার দর্প চূর্ণ করিয়া আমার ইচ্ছা ও কার্যের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারিবেন, তিনিই আমার ভর্তা।' অহংকারে মত্ত সাধক পরাশক্তির এই ভাষা বুঝিতে পারিল না। শিব-দূতী শ্রীগুরুশক্তিকে দূত করিয়া, সাধককে আত্মসমর্পণ করিতে উপদেশ দিতে পাঠাইলেন। পূর্বে যেতোয়া অন্তরে শ্রীশ্রীগুরু-শক্তির ভাষা বুঝিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। এইবার সাধকও শ্রীশ্রীগুরুশক্তিকে যথাসর্বস্ব বলিয়া একটু একটু বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে—'যন্মূলং তদুপাস্যতাং'। শ্রীশ্রীগুরুদেব সাধককে পরাশক্তির কোলে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু সে তাহা পারিল না। তা জীব পারিবে কেন? মা, আমরা যদি তোমার শ্রীচরণে কেন্দ্রীয় আত্মসমর্পণ করিতে পারিতাম, তবে আর ক্ষোভ ছিল কি? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জোর করিয়া তোমার জ্ঞানময়ের তত্ত্ব আস্বাদন না করাইলে, আমাদের কি সাধ্য যে আমরা তাহা ধরিতে, বুঝিতে ও আস্বাদন করিতে পারিব? আমরা তোমাকে কিছুই দিব না; তুমি আমাদিগকে তোমার আপন বলিয়া ধরা থাকে তবে পার তো আমাদিগকে যে প্রকারে হউক, তোমার মাঝে তোমার করিয়া রাখিও। যখন অযাচিতভাবে নাম-রূপে আমাদের হৃদয়ে উদয় হইয়াছ, তখন যাহাতে অচিরাৎ তোমাতে সর্বস্ব নিবেদন করিতে পারি, তাহার উপায় কর, শ্রীগুরু রূপে তুমিই একমাত্র গতি।

সাধক গুরুবাক্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিতে ধরিতে না পারায় শ্রীগুরুদেবের মন্ত্র-শক্তিই জীবের সর্বনাশিনী মূর্তিতে তাঁহার সর্বসিদ্ধি নিয়া সাধকের সর্বোপাধি তাঁহার মধ্যে সংহরণ করিতে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব-শক্তিময়ী, লাবণ্যময়ী মায়ের আবির্ভাবে সাধক নিজেকে ক্ষণে ক্ষণে দুর্বল ও কুৎসিত বলিয়া বুঝিতে পারিল। সে দেখিল, সে অসহায়, শক্তিহীন। জগতে যা কিছু সুন্দর ও চেতন তাহা মা; সে অচেতন শব। মা, "সৌম্যা সৌম্যতরাশেষা সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী"। 'তবৈব ভাস্তম্ অনুভাতি সর্বম্। তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' তাঁহার আলোকে সব আলোকিত। তাঁহার শ্রীচরণ-সেবা করিয়া সকলে আলোকস্নান করিতেছে! তাঁহার শ্রীচরণ সর্ব-শোভার আস্পদ। সে অনুভব করিল, ঐ নারী-মূর্তি তাহার সর্বস্ব ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন।

ভৈরবনাদিনী কেরে উন্মাদিনী
কিরূপে আমার রামা চিত্ত হরে?
কিরূপে আমিত্ব অহংকার তত্ত্ব
কিরূপে আমারে আকর্ষণ করে॥

শ্রীশ্রীনিত্যগীতি।

সে আরও দেখিল,

শ্রীযদবরণী কে রে মিনমণী
চরণে যামিনী ভাতে শতবারে।
কে রে উজ্জয়িনী সুধাংশুভালিনী
ভুবনমোহিনী, কে রে শিবোপরে॥

তুমি সাধক, তুমি যে কেমন কেমন হইয়া যাইতেছ? তোমার এত বীর্য, এত তেজ, এত অহংকার সব যে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে, তুমি যেন ধীরে ধীরে সব হারাইতেছ। ভয় করিও না, ঐ দেখ, তুমি যতই নুন্ন হইয়া যাইতেছ, ততই মা সুন্দরী হইতেও সুন্দরী হইতেছেন। তোমার সকল তাঁহার সর্বাঙ্গে মিশাইয়া ঈশ্বর হইয়াও তিনি মোহিনী মূর্তি ধারণ করিলেন। আজ তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, তুমি আজ নিজকে হারাইয়া মাকে পাইলে। তোমার সর্বাঙ্গের শোভা লইয়া তিনি তাহা নিজ অঙ্গে মাখিয়া দিলেন। ধন্য তুমি, ধন্য তুমি। সে আরও দেখিল,

হৃদ সরোজিনী চরণে নলিনী
চরণ দুখানি পরশে অন্তরে।
এ যে নবদাত্রিণী বৈরব্যাদায়িনী
শিব ক্ষয়কারিণী ধরাকর ঘরে।

মা কৈবল্যদায়িনীর শ্রীচরণ ধীরে ধীরে সাধকের হৃদয় অধিকার করিল। সে সেই বিশ্বের সকল শোভার খনি, যে 'চরণতলে হৃদয় ঢেলে পাগল পেল পাগলীকে' সেই মাতুল চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া, পূর্ব্বের অসুর স্বভাব ভুলিয়া গিয়া, মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল 'মা' আজ এ কি দেখিলাম! এতদিন তোমায় যেরূপে দেখিয়াছিলাম, আজ আর ত তোমার সে রূপ নাই। তুমি যে আজ আমার হৃদয়ের সবটুকু তোমায় করিয়া আনন্দ সাগরে ডুবাইলে! মা, আজ আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে। শিববাক্য শুনি নাই, তাই আজ লজ্জায় ঘৃণায় নিজের অস্তিত্বও রাখিতে সাধ হয় না। কোথায় আমি কামে অন্ধ, আর কোথায় তুমি দিব্য জ্ঞানানন্দময়ী প্রেমময়ী। মা, তুমি আমাকে বর দিতে আসিয়াছিলে, আমি কিন্তু তাহা না বুঝিয়া নিজেই বর সাজিতে চাহিয়াছিলাম! মা, আমার অভিমান, অহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্তরূপে এই কর, যেন আমার কিছুই আর আমার বলিতে থাকে না। আমার সর্ব্বভাব তোমাতে বিলীন হউক। তুমি আমাকে কৈবল্য দানে কৃতার্থ কর। এতদিন আমি প্রাণ পাইতে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলাম, আজ প্রাণ হারাইয়া প্রাণ পাইলাম, আজ মরিয়া বাঁচিলাম, আজ তোমার কৃপায় শিবত্বের আস্বাদন পাইলাম। তাই মা শিবানী, আমার সমস্ত অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তোমার শিবস্বরূপে অনন্ত কালের জন্য ডুবাইয়া রাখ। যাও ভাগ্যবান সাধক, মায়ের নিত্যানন্দময় কোলে তাঁহাকে জড়াইয়া থাক, তিনি তাঁহার স্নেহের অঞ্চলে তোমাকে ঢাকিয়া রাখিবেন; আর কত আদরের তুমি, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া মা কতই না আনন্দিত হইবেন। মা, তুমি শ্রীনিত্যগোপালময়ী; তুমি শ্রীনিত্য-গোপাল-মুখে একদিন বলিয়াছিলে, তোমায় কোলে উঠিয়া বালকের মতন তোমার সঙ্গে ক্রীড়ায় নিজে বিভোর হইব। সে দিনের কত বাকী? দয়া কর, দয়া কর।

ভাই নামসাধক, নিত্যধামের নিত্যনাম যখন প্রেমপূর্ণ কর্ণজ্ঞানতন্ত্র তোমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য কর্ণজ্ঞান-ভক্তি প্রেমানন্দ মূর্ত্তিতে সুধাসুধী ধারার মত অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতেছে, তখন সকলে মিলিয়া জোড় হস্তে উর্দ্ধনেত্রে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু অমানী ও মানদ হইয়া সেই কৃপাময়ী নাম-সুরধুনীর নির্ম্মল সর্ব্বতাপহারিণী ধারায় সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত কর; আমার বিমল জলপিপাসু ব্যক্তি যেমন ঘর্ম্মাক্তদেহে সকল পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া নির্ম্মল ঘর্ম্মবারি নিজের ও তাপিত তৃষিত জীবের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, তোমরাও তদ্রূপ সেই 'মধুর মধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং' নিত্যনাম-বারি তোমাদের পাত্রকোষে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ, তুমি নিজেও পান করিবে, আর সকলকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিবে। নাম স্বপ্রকাশ; তাঁহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা বাতুলতার নিদর্শন। যখন নাম তোমার জিহ্বায় বা কর্ণে স্ফুরিত হইবে, তখন আদর যত্ন করিয়া তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহাকে আসন স্বরূপে প্রদান করিও, নয়ন-জল তাঁহার পাদ্য হইবে। সকল শক্তি দিয়া তাঁহার নৃত্যে যোগদান করিও। কেমন করিয়া নাম তোমাকে শ্যাম-সুন্দরের প্রাণ-প্রিয়তমা করেন, তাহা বেশ করিয়া লক্ষ্য করিও, বুঝিবে কেমন দয়াময়ী শ্রীনাম-শক্তি। মা যোগ-মায়া, তোমার স্নেহ পরশে আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল, সুন্দর ও প্রেমপূর্ণ হউক; আমার প্রাণপ্রিয় যে শান্তি, সৌমর্য্য ও প্রেম-ভিখারী! তুমি শ্রীভগবানের যে ব্যাকুলতা নিয়া আসিয়াছ, তাহা আমার প্রতি রক্তবিন্দু মাঝে প্রবাহিত কর, আমি যেন শ্রীরাম-জীবন হনুমানের মত বুক চিরিয়া তোমাকে প্রতি অণুপরমাণুর ভিতর প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আমার বড় লোভ হয়, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তোমার মাঝে ডুবাইয়া দিয়া শূন্য হইয়া যাই! আমার যে আর কিছুই আমার বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় না; বড় সাধ যে আমার সর্ব্বস্ব দিয়া প্রাণ-বঁধুকে মনের মত সাজাইয়া দেই। মা, দশভুজা, সে দিন কবে হবে, যেদিন আমার সকল দেহ, প্রাণ মন তোমার মাঝে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার হইয়া যাইব। আমি যে আর আমার বোঝা বইতে পারি না। ঠাকুর, কতদিন তোমায় বলিয়াছি যে, এই সংসার আমার মত অলসের জন্য নয়, তবে কেন আমায় অনন্ত প্রয়োজনের মধ্যে রাখিয়াছ? যাহা অনায়াস-সাধ্য ও সহজলভ্য, তাহা ব্যতীত আমি আর কি নিয়া থাকিতে পারি, বলত? হে আমার সহজ-রতন, আমার সব প্রয়োজন মুছিয়া

খেলিয়া তুমিই আমার প্রয়োজন হইয়া ব'স ; আমার দেহ ও মনেও যেন আমার প্রয়োজন না হয়। আমার দেহ, মন সব তোমার সেবায় লাগুক। আমার সকল হারিয়ে ফুরাইয়া যাক্। তুমি ব্যতীত আর কিছুই যেন আমার প্রয়োজন বলিয়া বুঝিনা, ইহাই আমার শেষ সর্ব্বাধীন প্রার্থনা। এই দীন প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করিবে কি ?

বিজয়া

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত।
যো দরশনে পঁহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তনু মাহ।
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তনু মাহ।
যোহি বীজনে পঁহু বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত।
যাঁহা পঁহু তরসই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তনু ঠাম॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গৌরী।
সো মরকত তনু তোহে কি ছোড়ি॥

নিত্যগোপাল, সকল অঙ্গ দিয়া আমার সেবা এই ভাবে গ্রহণ করিবে কি ?

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবেশম্ ন মাম্ চরণাস্তিকম্॥

মিনতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

যাচিয়া মাগি এ বর—
যাহা করি, এই প্রার্থনা, যেন হয় তব প্রীতিকর।
উপরে তাকায়ে থাকি।
তব হয়, যাহা করিতেছি তব ভাল লাগিতেছে নাকি ?
ভক্ত আমি তো নই—
তবু যাহা করি জানাইয়া করি, জানিনাক তোমা বই।
স্বগতীয় অনুরাগে—
তোমার কথাই বলিতে শুনিতে শুনাইতে ভাল লাগে।
যেবি বিস্মিত হই—
ভুবন এবং ভুবনেশ্বরে প্রণাম পেলাম কই ?

২

মুখেই তুমি রও—
হে সর্বময় বুঝিতে পারিনে কি যে বট কি যে নও।
দোলাও সমুদ্র।
শিশিরের সাথে খেলা কর নয়ে ছায়া আর রৌদ্র।
শোনো তুমি ভালবাসি—
জীবাণুগণের কান্না এবং বীজাণুগণের হাসি।
করি তব নাম গান,
সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্ত্তা হে বালক ভগবান।
আমার হয়েছে সখ—
দয়াল গোপাল মোরে করে লও তব প্রিয় জীড়নক।

সামঞ্জস্য

॥ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

[রবীন্দ্রনাথকে আমরা সাহিত্যিক বলিয়াই জানি—কিন্তু ভারতীয় অচল স্থিতিধর্মী দর্শনকে তিনি সাহিত্যের ভাষাতেই কেমন করিয়া প্রতিবাদ জানাইয়া জীবিতের জীবন-ধর্মী দর্শনে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, এ্যারিস্টটেলের পরস্পর-বিপরীতের সহাবস্থান একান্ত অসম্ভবরূপ চিন্তা-ধারাকে জীবিত মানুষের প্রেমের মধ্যে তাহারা কি ভাবে মিলিয়া মিলিয়া রহিয়া জীবনকে অগ্রসর করাইয়া লইতেছে, তাহারই কথা তিনি তাঁহার 'শান্তিনিকেতনে'র পাতা জুড়িয়া বলিয়া গিয়াছেন। বর্তমান নিবন্ধটীতে সামঞ্জস্যের যে সুরটুকু ধ্বনিত হইয়াছে, জাতির জীবন-গঠন-প্রচেষ্টায় সে সুর সম্বন্ধে সচেতন হইলে ভারতবর্ষ কেবল বাঁচিয়া যায় না—বিশ্বসভ্যতার দ্বন্দ্ব-সমাকীর্ণ শক্তি-তাণ্ডবের মধ্যে তাহার সত্যিকারের অবদান উপস্থিত করিয়া ধন্যতর হইতে পারে। আমরা ছোটবড় সকলকে এই সুরের কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়া দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে তাহাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। একই সঙ্গে দুই হওয়া ও এক হওয়া, একই সঙ্গে গতি ও স্থিতি, একই সঙ্গে হাঁ ও না, সগুণ ও নির্গুণ যে কেমন করিয়া হয়, এই দুই রকমকে লইয়া ভারতবর্ষের দর্শন-জগতের যে চিরন্তন বিরোধ সেটা যে কেমন করিয়া কোথায় মিটিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেটা বুঝিয়া নিলে শ্রীশ্রীনিতাগোপালকে অনুসরণ করিয়া যে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের শাস্ত্রব্যাখ্যা ও জীবন-দর্শন, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। —সম্পাদিকা]

আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, বিদ্যুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যারা দিতি পুত্র ও অদিতিপুত্রের মতো পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যেই সর্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী, হাঁ যেমন না'কে কাটে, না যেমন হাঁ'কে কাটে, তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না, আবার তাদের বিকল্পরূপে থাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড, এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এই জন্যই যেন যে আমি অন্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারি নে, কিন্তু স্বার্থ জিনিসটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা তাই তিনি একেকে নিয়ে দুই করেছেন, আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, দুই যেমন সত্য একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকেও তো যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না—এ যে প্রেমের কাণ্ড।

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই জন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। স একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। তিনি এক এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই, অথচ বহু শক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির নিত্য প্রয়োজনসকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজন সকল বিধান করতে যান? তিনি যে প্রেম-স্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

স পর্যগাৎ শুক্রং, আবার তিনিই ব্যয়ৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অনন্ত দেশে তিনি শুদ্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্ত কালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি, গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটি মাত্র জায়গায় দেখতে পাই; সে হচ্ছে প্রেমে। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি—আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশী। সেইখানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল। প্রেমেতেই যেখানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতি গতি এক সঙ্গে নিয়ে আছে।

কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ বিপরীতমুখ, তারা বিপরীত পর্য্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই। যাকে ভালোবাসি তাকে যা দিই সেই দেওয়াটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়—সেখানে দেওয়াও যা পাওয়াও তাই। ভগবানও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ, এই যে প্রেমের খেলা খেলেছেন, এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করছেন। এই দেওয়া-পাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।

ধর্মশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই দুই না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ আর একটা কোটি নির্গুণ। তার একদিকে বলে 'আমি আছি' আর এক দিক বলে 'আমি নেই।' 'আমি' না হলেও প্রেম নেই, 'আমি' না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেই জন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে-সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের জোরেই চলে, সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বে বলে আমাদের অনন্ত উন্নতি—আমরা ক্রমাগতই তাঁর দিকে যাই, কোনো কালে তাঁর কাছে যাই নে। আমাদের উপনিষৎ বলেছেন, আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারি নে আবার তাঁর কাছে যেতেও পারি, তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও।

যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন সুস্পষ্ট করে আর কোথাও শোনা যায় নি। শুধু বাক্য ফেরে না, মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে এ একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেই তো যাঁকে একেবারে জানা যায় না তাঁকে এমনি জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা। প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত না জানাকে জঠরে করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না-জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জানতে পারে, কিন্তু প্রেমের জানায়, আনন্দের জানায় এমন করে জানতে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না। প্রেমের ভিতরকার এই এক অদ্ভুত রহস্য যে, সেখানে একদিকে কিছুই জানি নে সেখানে অন্য দিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে। তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।

ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায় মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াত করে না। বন্ধনকে নিঃশেষ করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে হবে, এই আমাদের প্রতি উপদেশ। স্বাধীনতা জিনিষটা যেন একটা চূড়ান্ত জিনিষ, পাশ্চাত্য দেশেও এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে, একথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেমে। সেখানে অধীনতা স্বাধীনতার কাছে এক চুলও মাথা হেঁট করে না। প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন। তা হলে তো তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন তা হ'লে সৃষ্টিই হত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো তাৎপর্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ, যে রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তা হলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা। তিনিই বন্ধু, তিনিই পিতা, তিনিই বিধাতা। এত বড়ো একটা আশ্চর্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্‌টা বড়ো কথা? ঈশ্বর শুদ্ধ মুক্ত, এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখিত্বে পতিত্বে বদ্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড়ো কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোটো করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এ রকম অন্ধ সংস্কারই আরও আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটোকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ—যেন গণিত-শাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে। তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি—যেন, সীমা জিনিষটা যে কি তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়। এর কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ। এক রূপ হতে আর এক রূপ, এক গুণ হতে আর এক গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি—এরই বা নাশ কোথায়! এরই বা সীমা কোন্‌খানে। সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুত্বে, যে অশেষ পরিবর্তন-পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এত বড়ো সাধ্য কার। বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি, কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়। অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনো মতেই অল্পতর নয়।

স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক আসনে বসে রাজত্ব করে এ কথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার এই দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় সেই হচ্ছে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব এই হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন, এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই, আবার প্রেমের যে অধীনতা, এত বড়ো অধীনতাই বা জগতে কোথায় আছে?

অধীনতা জিনিষটা যে কত বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্মে সেইটে আমাদের দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসংকোচে বলেছে ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন—সেই পরম গৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি তিনি মেনেছেন—নইলে আমরা আছি কী করে?

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে, তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিষকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি তো খুব দূরবার করতে পারতেন, কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পরিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমায় অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভালো করে না মিলছে, সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজছে। সেইখানে কত দুঃখ যে আসছে তার

সীমা নেই—চোখের জল ঝরে যাচ্ছে। ওগো প্রেমিক, তোমার প্রেমের ফল শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না, তুমি যে মন ভুলিয়ে হয়ে যাচ্ছে—তাই তো সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার নেবে—একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে অভিসারের সজ্জা হল না।

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ধম্মপদের চিন্তাধারা

॥ শ্রীমচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

যথাপি পুপ্পরাসিম্হা কাইর মালাগুণে বহু।
এবম্ জাতেন মচ্চেন কত্তব্বম্ কুসলম্ বহুম। ৪ ॥
পুত্ত মথি ধনম্ মথি ইতি বালো বিহঞ্ঞতি।
অত্তা হি অত্তনো নথি কুতো পুত্তো কুতো ধনম্। ৫ ॥
যোগো যথা একখনো যাতেন ন সমীরতি।
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা। ৬ ॥

॥ ধম্মপদ ॥ ভাবানুবাদ ॥

যেমন বিচিত্র পুষ্পে মালা গাঁথে শ্রেষ্ঠ মালাকর
আশ্চর্য নিপুণ হস্তে—ক্ষণময় ক্ষয়ের স্থবির,
তেমনি জীবন প্রেমী কর্মিষ্ঠ মানুষ মুখর
বিবিধ উজ্জ্বল কাজে নিজেকে সে প্রবর্তিত
করে দিতে পারে।
জন্ম-মৃত্যু স্রোতে বন্দী মানুষেরও মুক্তির পরমা
কর্মের মহান যজ্ঞ। যেহেতু জীবন মানে
কয়েকটি চলিষ্ণু প্রহর,
বহুধা কুশল কর্মে আত্মনিবেদন কর।
কর্তব্যেরা ডেকেছে তোমারে ॥ ৪ ॥

আমার রয়েছে পুত্র, ধন আছে—
এই সব মূর্খের সংলাপ,
অস্তিত্বের অন্ধ বোধ,—পরিণামী চিন্তার দুর্ভার
সদয়ে লালন করে। অথচ এ অনৃত প্রলাপ
একেবারে অর্থহীন। কারণ পৃথিবীতে
কেই বা কাহার?
কোথা পুত্র? কোথা ধন? আত্মবোধ
দুর্জ্ঞেয় বিষয়,—
(নৈরাত্ম জ্ঞানের শুধু প্রথাবদ্ধ অলীক শোভনা)
আসলে জানি না আমরা আমাদের
অস্তিত্বের নিভৃত ঠিকানা। ৫ ॥

[অন্য ছন্দ :]

বায়ুতে তাড়িত হয় না যেমন বৃহৎ গভীর
কঠিন পাষাণ, প্রজ্ঞাবানেরও হৃদয় তেমনি
স্থির সমাহিত; নিন্দা প্রশস্তিতে সে
সমান, অবিচল তার ঊর্ধ্ব শির ॥ ৬ ॥

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১৪)

...তিনি অদ্ভুত পুরুষ—তিনি কি করবেন জানি না, হয় তো অনেক কিছু করাবেন।...মেয়েদের জন্য অনেক কিছু করার আছে। মেয়েদের যে সম্মান দেওয়া হয়েছে এখানে, এর থেকে বেশী কেউ দিতে পারে নাই।...লোক আসবে—কিন্তু আমরা যদি এক-বুদ্ধি, এক-হৃদয়, এক-পথ না হই, তবে আমাদের এখানে আসা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় এখানে আসার মধ্য দিয়া একটা বিরাট কাজ তিনি করিয়ে নেবেন। ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম মানুষ।...নিত্যগোপালের আসন প্রতিষ্ঠিত হউক।...

১৫, ৬, ১৯৫৬।.....ওহে রাধে—আত্মনিবেদনময়ী মূর্ত্তিময়ী শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীরাধা...পরব্রহ্মমহিষী · ব্রহ্ম-প্রকাশ...নৈর্ঋতী, নির্গুণী,—তুমি সগুণা, তুমি নির্গুণা—আমার শ্রীরাধা...পরাপ্রকৃতি—তুমি নির্বাতীত শোভিতা প্রকৃতির মূর্ত্তিমতী মূর্ত্তি·· ব্রহ্মময়ী আমার শ্রীরাধা, যোগমায়া শ্রীরাধা—কৃষ্ণমনোমোহিনী—ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীরাধা, তুমি আত্ম-বিদ্যা—অযাচিত করুণায় আমার জীবনের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইলে—তোমার প্রতিষ্ঠায় লাগিয়া ঘুরিয়া বেড়াই···পরাপ্রকৃতি, আমার বুকের ধন—বৃষভানুদুলালী, তুমি বিরজের ঋষি, তুমি বিরজা, তুমি নবীনা, তুমি সনাতনী, তুমি সাবিত্রী, তুমি গায়ত্রী···আমার হৃদয়, আমার দেহ-মন প্রাণ সকলই তোমার—তুমি তাহা লও। চন্দন রবি রাধা নিত্যগোপাল সেজেছে—ওগো নিত্যগোপাল, তোমারই মাঝে আমি রাধাকৃষ্ণগৌর সব পাইয়াছি—আমার বুকে ঐ তত্ত্ব তুমি সঞ্চারিত করিয়াছ।...সেই নিত্যগোপাল, সেই কালাচাঁদ···নিত্যগোপাল তুমি আমার সব, আমার ধনজন জীবন—আমার দেহপ্রাণধন—আমার ইহকাল পরকাল সকলই তুমি—সখা সাথী বন্ধু পরম সুহৃৎ-স্বামী—সকলই তুমি—তোমায় বুকে লইয়া আমি চলিয়াছি—তুমি আমার আমি তোমার। আমি আর কাহারও নই। আমি তোমার ইহাই আমার পরিচয়—ইহাই আমার শেষ পরিচয়—আমি আমার নই—আমি তোমার। আমার কর্ম নাই, স্থান নাই—তোমার কর্ম আমার কর্ম, তোমার স্থান আমার স্থান - তোমার আমি আমার আমি—তোমার বিশ্ব আমার স্থান—তোমার পাদ-পদ্ম আমার স্থান।...নিত্যগোপাল, যাহারা আমার সঙ্গে আছে, তুমি তাহাদের আপন করিয়া লও, তাহাদের তোমার ভাবে ভাবিত কর...তোমার জ্ঞান, তোমার কার্য্য তাহাদের হউক—যাহারা আমার সেবা করিল, তাহাদের তোমার কর।...জ্ঞানানন্দ—তুমি জ্ঞান, তুমি আনন্দ—তুমি জ্ঞানের সাগর, তুমি আনন্দের সাগর—আমার প্রেমের সাগর—আমার স্বামী, নিত্যগোপাল, বন্ধু—'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী'—তোমার পথ আমার পথ—তুমি যে ছন্দে চলিবে, আমি সেই ছন্দে চলিব—তুমি কায়া আমি ছায়া—আমি তোমার হইয়া সারা বিশ্বের হইব, সারা বিশ্বকে বুকের মাঝে টানিয়া আনিব—নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল···

সন্ধ্যা—ওঁ···। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে গীতা-উপনিষৎ অর্জ্জুনকে শুনিয়েছিলেন।...ঋষিরা এই গীতা-উপনিষৎ অরণ্যে বসে শুনতেন। লোকালয় থেকে দূরে অনেক দূরে বসে শুনতেন—তাই তাদের নাম আরণ্যক। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে নাগরিক উপনিষৎ আলোচনা,—লড়াইয়ের মাঝে। আরণ্যক উপনিষদের আবেষ্টন আর নাগরিক উপনিষদের আবেষ্টনের পার্থক্য

যুদ্ধ—প্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের মাঝে গীতা শুনাইয়া অর্জুনকে দিয়া যুদ্ধ করাইলেন কেন? একদিকে শান্ত পরিবেশ—ব্রহ্ম-তত্ত্ব শ্রবণেচ্ছায় মিলিত হয়েছে, আর একদিকে ভ্রাতৃ-দ্বেষ বিরোধে দুই পক্ষ মিলিত, সমবেত যুদ্ধেচ্ছায়। কুরুক্ষেত্রটাকে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ নিজের চরণের ছোঁয়াচ দিয়ে ধর্মক্ষেত্রে গড়ে তুলেছেন। কুরুক্ষেত্রটাই আজ ধর্মক্ষেত্র—আমরাও এই ধর্মক্ষেত্রের বুকেই গীতা শুনব—দুর্যোধনরা শুনলেন না—শুনলেন অর্জুন। বনবাসী বেদান্তকে কৃষ্ণ নগরে নিয়ে এসেছেন—আমরা নগরে, লোকালয়ে, লড়াইয়ের মধ্যে আছি—এই লড়াইয়ের মধ্যে আজ বেদান্ত এসেছে।...কুরুক্ষেত্রটাকে কি ভাবে ধর্মক্ষেত্রে গড়ে তুলতে হবে তার আলোচনাই আঠার অধ্যায় ধরে করেছেন।... এই সংসার-অশ্বত্থ সনাতন এবং এটা ঊর্ধ্বমূল। সাধারণ গাছের মূল নীচে, ডালপালা উপরে—কিন্তু সংসার-রূপ বৃক্ষের মূল উপরে, ডালপালা নীচে। সংসার করতে হলে আগে মূলকে ধরতে হবে—নাক দিয়ে তো ভালে এটা যায় না। তাই আগে যদি সংসার করতে চাও—হবে না। মূল তো তুমি নও—তুমি যে সন্মূল। মূলের—ঊর্ধ্বমূলের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে হবে—সংসারের মূল সংসারে না—গোলোকে বৈকুণ্ঠে—আগে বাবা, তারপর সংসার।... কে তুমি? তুমি ব্রহ্ম পুত্র।...আমার বললে তুমি সংসারকে পাবে। পিতামাতা থেকে বঞ্চনা হও—অহংকার থেকে বঞ্চনা হলে কাণা কড়িও তুমি পাবে না—মূলের সঙ্গে যোগ না রাখ যদি কি খেয়ে বাঁচবে? যে পুঁজি নিয়ে গাছ তৈরী করেছিলে তার সঙ্গে অনন্ত রসপ্রবাহের যদি সংযোগ না থাকে, তাহলে অনন্তকাল সঞ্জীবিত থাকবে কি রকম করে? গীতার প্রথম কথা, কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করতে হবে, দ্বিতীয় কথা, এটা ঊর্ধ্বমূল—খাজটা তোমার নয়। ঊর্ধ্বমূল হতেই হবে—ভগবানকে ধরে মারিতে নাম; সংসার কর কিন্তু ভগবানকে ধরে সংসার কর। স্বামীর ঘর করতে যেমন স্বামী সবাইকে চিনিয়ে দেন, তেমনি সংসারে কোন্ বস্তুর স্বরূপ কি তাহা ভগবানের কাছ থেকে জেনে নিতেই হবে। এখানে আমার জন্য নয়—জন্য আমার গোলোকে পুরুষোত্তম লোকে—কিন্তু এখানে ভগবানের সংসার করব ভগবানের কাছ থেকে জেনে নিয়ে। গড়ে তুলতে হবে। নিজের আবার কাজ কি? অর্জুনকে যখন বলছেন, তোমার কাজ নয়, আমার কাজ কর—বুদ্ধি চালিও না—। বুদ্ধিভাষানী। তোমার বুদ্ধি দিয়ে গুরুকে, ভগবানকে বিচার করতে যেয়ো না—গুরুর বুদ্ধির সাথে না মিললেই বুঝবে তোমার ভুল হচ্ছে। শরণাগত হও···যাকে তো পেয়ে আছিই—আবার যাকে পাওয়া মানে যাকে প্রণাম করা—শরণাগত হওয়া···। শেষকালে অর্জুন বললেন, আমি চিনেছি তুমি সাগর, আমি নদী। তুমি অগ্নি, আমি স্ফুলিঙ্গ—করিষ্যে বচনং তব—গীতার এই শেষ কথা—তোমার দিয়ে এসেছি, তোমার কাজ করব।·· কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, অর্জুন, মন আমায় দাও—মন্মনা ভব মদ্যোর মন আমায়—অনন্যাকর্ত্যাতবুদ্ধি...বুদ্ধিনাশং আত্মতত্ত্ব্...নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রে গড়ে তুলতে পারবেই না.. শিষ্যস্তেঽহম্ সাধি মাং প্রপন্নম্। নরনারায়ণ আশ্রম বিশ্বকে গড়ে তুলবার বিরাট দায়িত্ব নিয়ে এসেছে—তাই কঠিন শৃঙ্খলা দরকার—হয় কর, নয় মর—এই সাময়িক শৃঙ্খলা আজ দরকার। নরনারায়ণ আশ্রমের সারথী নিত্যগোপাল···ধরার ধূলি হোক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম-মানুষ···।

১৩. ৩, ৫৬...সৌম্য—অশ্রেয়র মধ্যে তুমি নিয়ে এলে প্রেম—তুমি প্রেমের উদ্গাতা—ভবিষ্যিকীয় বাঞ্ছিত প্রেমকে তুমি সীমন্তিনী পতিতের মধ্যে ঘরে ঘরে বিলাইয়া দিলে—চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি—উচ্চনীচভেদ গিয়াছে তোমার মোহন আবির্ভাবে—তুমি খোলাবেচা শ্রীধরকে কোল দিলে—তুমি যেমন রূপ সনাতনের, তেমনি শ্রীধরের। তুমি পাপীরও বটে, পুণ্যাত্মারও বটে—ধনী নির্ধনের মধ্যে তুমি যোগসূত্র।...নিত্যগোপাল, তুমি সকল দ্বন্দ্বের মাঝে, জড় অজড়ের মাঝে, ব্রহ্ম মায়ার মাঝে যোগসূত্র। সকল বিচ্ছেদের মাঝে তুমি স্থাপন করিলে অচ্ছেদ বন্ধন। আমার নিত্যসুন্দর, আত্মা-অনাত্মার মাঝে তুমি যোগসূত্র—আত্মা অনাত্মা আজ এক হইবে—আজ আত্মা কাঁদে অনাত্মার জন্য, অনাত্মা কাঁদে আত্মার জন্য,

চৈতন্য কাঁদে অচৈতন্যের লাগি, অচৈতন্য কাঁদে চৈতন্যের লাগি—দুঁহু লাগি দুঁহু কাঁদে এক মহাসত্যের মাঝে। নিত্যগোপাল, তুমি আশ্চর্য যাদুকর—তোমার মোহন হস্তের স্পর্শে তুমি অসম্ভবকে সম্ভব কর।···তুমি মুকের মুখে ঢালিয়া দিলে অমৃত বাক্য। তোমায় দেওয়া বাক্য সার্থক হোক···মায়ের তপস্যায় পাওয়া বাক্য আমার অতপস্যায় ব্যর্থ না হয়—তোমার প্রসাদে পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্··· । তোমার কৃপায় শংকর বুদ্ধের মিলন হইবে··· সত্যিই তুমি আশ্চর্য যাদুকর—কেমন করিয়া এই দুই বিপরীতকে মিলাইলে, আর আমার মত অকিঞ্চিৎকরকে দিয়ে এত করাইলে! তুমি ধন্য, তুমি ধন্য—তুমি সত্য, তুমি সত্য! আমি তোমার—আমার দেহ-মন-প্রাণ তোমার হউক—আমার প্রাণের প্রাণ তুমি, আমার বুদ্ধির বুদ্ধি তুমি নিত্যগোপাল—অনৈক্যের বুকে ঐক্যের প্রতিষ্ঠাতা তোমার জয় হউক—তুমি ঐক্যের মন্ত্র শোনাও, প্রেমের মন্ত্র শোনাও কাহাকেও বাদ না দিয়া। বিপরীতকে, বিরুদ্ধকে লইয়া তোমার ঐক্য তোমার প্রেম ··সহস্র সহস্র গোপী এক মন এক প্রাণ হইয়া ছিল, তেমনি আজ মানুষকে এক কর, এক-প্রাণ কর—সংহত বিশ্ব গড়িয়া উঠুক—আমাদের নির্মল কর, পবিত্র কর, সুন্দর কর—তোমার সেবার মত করিয়া গড়িয়া তোল—রাগদ্বেষ দূর কর—চিত্ত হইতে হিংসা-বিদ্বেষ-আড়াআড়ি দূর কর।—এক-মন হইব, এক-প্রাণ হইব—সমানঃ মন্ত্র সমিতিঃ সমানী··· নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল···

শিষ্য।.....পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ-সাধনা নিজে আস্বাদন করে এই বিশ্বের বুকে স্থাপন করে গেছেন। পাঁচ হাজার বৎসর পরে নিত্যগোপাল বর্তমান জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাই আস্বাদন করবার সংবাদ নিয়ে এলেন। আজ এই প্রাণ-সাধনা শিখতে হবে। মনের সাধনায় আমি আমারটা নিয়ে থাকব। অতএব আর একজন তারটা নিয়ে থাকবে। কিন্তু প্রাণ সর্বত্রগ। আর একজনকে নিজের দলে আনবার কথা শোন—কালীয় দমন কাহিনী—কালীয় হ্রদের বিষাক্ত বাষ্পে গায়ের গাছপালা সব ধ্বংস হইয়া যায়। কৃষ্ণ খলসংযমনাবতার—খলের সঙ্গে কি করে ব্যবহার করতে হবে এবং কি করে তাকে বশে আনা যাবে—তারই কাহিনী। মনের সাধনা বৈরা কি তৈরা—যেমন মুক্তর তেমনি দন্তর···ভারতবর্ষের সারথী কৃষ্ণ—তাই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সে প্রাণসাধনাই করছে। ···একদিন কৃষ্ণ কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দিয়েছেন—কালীয় কৃষ্ণকে প্যাঁচ কসছে—তীর থেকে সবাই দেখছে···। কৃষ্ণ অদৃষ্টচেষ্ট—কালীয় যতই প্যাঁচ কসছে—কৃষ্ণ কিছু করছেন না—তাঁর কোন চেষ্টা মোটেই দৃষ্ট হচ্ছে না। এক তরফা লড়াই ভাগবতে প্রতিপাদ্য···প্রথম মানবপুত্র—সরীসৃপটাকে কৃষ্ণ বাড়িয়ে তুলছেন—নিজে বড় হচ্ছেন—কালীয়র ছিঁড়ে যাবার অবস্থা—কৃষ্ণকে ছেড়ে দিয়েছে—কৃষ্ণ উঠেছেন—কালীয় উঠেছে—চক্রভ্রমি খেলা খেলতে খেলতে সাপ এলিয়ে পড়ল—ক্লান্ত কালীয় শরণাগত হল। খল প্রকৃতির লোক, কূট তার্কিক লোককে সংযমন করবার কৌশল—নিজে বড় হও।···আক্রমণ করো না, নিজের দোষ নিজে দেখতে চেষ্টা কর। সাধক বড় হয়ে বড়ত্বের চাপে খলকে চাপ দেবে।···অন্যের দোষ সত্ত্বেও মানুষ ভাল হতে পারে। বড় হয়ে জবাব দেব—কৃষ্ণ অর্জুনকে বড় হওয়ার কথা শেখাচ্ছেন—দুর্যোধনকে নয়। সারা জন্ম এই নীতি নিয়ে চলেছি—বড় হয়ে জবাব দেব—অর্থে বড় নয়···মানুষ হয়ে বড়···। বরিশালের লোক জানুক যে বরিশালের বাইরেও আমার স্থান আছে—কারো হাতের মধ্যেই আমি পড়ব না···স্বল্প খরচে জীবন যাপন করব ·· অধিকতর সংযম, অধিকতর ধৈর্য, অধিকতর জীবন দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে বড় হয়ে ছোটর সঙ্গে লড়াই কর—মিথ্যাকে সত্য কথা বলে জয় করবে—সৎ ব্যবহারের দ্বারা অসৎ ব্যবহারকে জয় করবে। আমার প্রিয় দৃষ্টান্ত—আমার যেতে হবে বৃন্দাবন, মোগলসরাইতে ঝগড়া বাঁধিয়ে মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে যাব না।···এক তরফা দোষ মেনে নিতে চেষ্টা কর। Cross examination...অর্জুন দুই পক্ষকে দেখছেন...পাড়ার ছেলে খারাপ থাকুক—আমি একলা ভাল হব।

ক্রমশঃ

দৈহিক ক্ষুধা বনাম আত্মিক ক্ষুধা

॥ শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী ॥

কবি বলিয়াছেন, "কত অজানারে জানাইলে তুমি ..."। ইহা খুবই সত্য কথা। জীবনের পথে চলিতে চলিতে কত নূতন তথ্য ও তত্ত্ব, ব্যক্তি ও বস্তু, স্থান ও ঘটনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। সে পরিচয় যতই নিবিড় হয়, বাহিরের বস্তু ততই অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠে। এমনি করিয়াই আমাদের পরিচয়ের পরিধি প্রসারিত হয়, আমাদের জ্ঞানের গণ্ডী বিস্তৃতি লাভ করে।

অজানাকে জানিবার, অ-দেখাকে দেখিবার ও অ-পাওয়াকে পাইবার অদম্য জিজ্ঞাসা আছে বলিয়াই তাহার তাড়নায় ক্ষিপ্ত হইয়া মানুষ আজন্মই জীবন যাপন করিতে পারে না। কামনার বস্তু লাভ করিয়া তাহার চিত্ত যখন একান্তভাবে তন্ময় হইতে চায়, অমনি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে অদৃষ্ট লোকের আভাস ভাসিয়া উঠে, সে লোক হইতে আহ্বান আসিতে থাকে ভাবে ইঙ্গিতে ও গানে। প্রকৃতির যে-রহস্য যবনিকা সে লোককে আবৃত করিয়া রহিয়াছে, অনুকূল বায়ুবেগে সে ঘোমটা খসে খসে করিয়া যায়। অজানার আকর্ষণে নিশ্চিত আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যে পথে বাহির হইয়া পড়ে অনিশ্চিতের সন্ধানে। পৃথিবীর বুকে এমনি করিয়াই চলিয়াছে চির তৃষ্ণাতুর মানব যাত্রীর অন্তহীন পথ-পরিক্রমা। ভূল হইতে ভূগোলকে প্রবাহিত সে এষণা আজ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে পাড়ি জমাইবার জন্য পক্ষ বিস্তার করিয়াছে।

সেদিন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক বিতর্ক সভায় ইহাই ছিল বিতর্কের বিষয় বস্তু। যাঁহারা বস্তু-তান্ত্রিকতার বিশ্বাসী তাঁহাদের প্রতিপাদ্য ছিল ইহাই যে, মানুষের যতকিছু মহান কর্ম ও বিরাট সাধনার মূলে রহিয়াছে যেদনতী মানুষের দৈহিক ক্ষুধা। সেই ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া মানুষ যে প্রবে আপনাকে নিয়োজিত করে, এই সব সিদ্ধি তাহারই স্বার্থক পরিণতি। তাঁহাদের মতে, এই দৈহিক ক্ষুধাই সর্বাধারে মৃতসঞ্জীবনী সুধার সমতুল।

প্রতিপক্ষ তাহার জবাবে বলিলেন, মানুষের যাবতীয় কর্ম সাধনা ও সিদ্ধির মূলেই যদি দৈহিক ক্ষুধার অবদান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর এই বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা কি? অপরিমেয় ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ যে বিরাট সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সৃজনের কৃতিত্বের এক কাণাকড়িও রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য নয়। সে কৃতিত্বের মালিকানার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত রহিয়াছে প্রিন্টার্স, পাব্লিশিটার্স, প্রুফ-রীডার ও হকারদের জন্য। অতএব শতবার্ষিকী যদি একান্তই অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা হইলে তাহা করিতে হইবে এই সব ক্ষুধার্ত মেদনতী মজদুরদের।

মানুষের মুখর এষণা ও চেতনা সমূহের মূলে ক্ষুধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু সে ক্ষুধা ছাট ছাদ্‌মনের হাজার, যা দৈহিক ক্ষুধা নয়, তাহা মন বরাবের স্নেহ হাজার, অর্থাৎ আত্মিক ক্ষুধা। দৈহিক ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য কতটুকু খাদ্যেরই বা প্রয়োজন হয় এবং তাহা আহরণ করিতে আয়াসের আবশ্যকই বা হয় কতখানি। মনুষ্যেতর জীব জগতের পক্ষে যে যুক্তি প্রযোজ্য, সে যুক্তির নিক্তি দিয়া মানুষের আত্মিক শক্তির ও আকুতির পরিমাপ করা চলে না। মানুষের চাওয়া পাওয়ার মাপকাঠি তাহা নয়। কোন্ ক্ষুধার খাদ্যের সন্ধানে মানুষ সর্বোচ্চ নিরিখের জন্য কক্ষিমার ক্ষুধায় অভিযানে বাহির হয়? কোন্ সম্পদের সন্ধানে অতল সাগর-গর্ভে সে অবতরণ করে? কোন্ ক্ষুধার আহার্য আহরণের জন্য পৃথিবীকে আবর্তন করে, অসীম মহাশূন্যে পক্ষ বিস্তার করে গ্রহান্তরে যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে?

বিশ্বের দুই বিরোধী শক্তিশিবিরের প্রধানদ্বয় যদি কোন

দিন একই গ্রহে গিয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর বিরোধের জের যে তাহারা তথায় টানিয়া লইয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হতভাগ্য সে গ্রহ সেদিন আর্য্যাবীর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। স্বীকৃত বন্টন-নামা অনুযায়ী সে গ্রহের বসবাস স্থাপনযোগ্য স্থান হয়তো বন্টিত হইয়া যাইবে উভয় শিবির প্রধানদ্বয়ের মধ্যে। এমনকি, বালিনের মতই সেখানে দ্বিশক্তি নিয়ন্ত্রণ-পরিষদ গঠনও অসম্ভব হইবে না।

কিন্তু ইহা হইল পরবর্ত্তী চিন্তার কথা। যে আদিম প্রবৃত্তি মানুষের চোখে গ্রহান্তরের স্বপ্ন আঁকিয়া দেয়, কল্পনায় তুলি দিয়া দূর চোখে পরাইয়া দেয় মহাকাশের স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন, তাহার উৎপত্তিস্থল কিন্তু অন্যত্র ছিল না। তাহার ধ্যানের ও ধারণায় সে বহুলোক জড়-বিজ্ঞানের স্পর্শে পরিণত হয় বস্তুতন্ত্রের বাস্তব চিত্রে। ইহা সৃষ্টি নয়, ইহার নাম নির্ম্মাণ। স্রষ্টা ও নির্ম্মাতার মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা যাহাদের চোখে পড়ে না তাহারাই নির্ম্মাণকে সৃষ্টি আখ্যায় অভিহিত করিয়া মেহনতী মজদুরের অপমানে মুখর হইয়া উঠে।

একথার অর্থ ইহা নয় যে, দৈহিক শ্রমের কোন মর্য্যাদা নাই। বিশ্বের এই সৃজন-যজ্ঞে শ্রমিকদের অবদানও অবশ্যই অনস্বীকার্য্য। যজ্ঞের বেদী তাহারা নির্ম্মাণ করে, তাহারা আহরণ করিয়া আনে যজ্ঞের সমিধভার। কিন্তু বেদী রচনার জ্যামিতিক পরিকল্পনা ও পদ্ধতি তাহাদের নয়, দেবতার ধ্যানমূর্ত্তি তাহাদের ধারণায় ধরা দেয় না। বিশ্বের এই বিশাল কর্ম্ম যজ্ঞে সকলেরই নির্দ্দিষ্ট স্থান ও অবদান আছে। এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে একের স্থান অপরের দ্বারা পূর্ণ হইবার নয় এবং সে অবদানও বিনিময়-যোগ্য পণ্য সামগ্রী নয়। কবির অমর বাণী উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উক্তির উপসংহার করি :

"খুঁজিয়া লইতে দাও যার যেথা স্থান"।

জাগো

শ্রীরেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ধ্যানের দেবতা তুমি জাগো, জাগো নয়নাভিরাম।
হৃদয় নিঙাড়ি তোমা নিবেদিনু প্রাণের প্রণাম।
ঘুচাও সংশয়, মোহ, অবিদ্যার সর্ব্বগ্রাসী কালো।
নিষ্কলঙ্ক, বর্ণহীন আলো দাও, দাও শুধু আলো।
জড়বক্ষে দেখি যেন অপরূপ প্রাণের প্রকাশ।
নির্ব্বিশেষ দিব্য জ্যোতি পরিব্যাপ্ত করুক আকাশ।
মৌন প্রতিধ্বনি ভেদি আনন্দের আমৃত আহ্বান।
অমৃতের পুত্র গাক আঁধারের নিরঞ্জন গান।
সপ্তদীপা পৃথিবীর কোন্‌খানে তোমার উদয়?
গেল কত মাস বর্ষ, তবুও এলেনা জ্যোতির্ম্ময়।
'সম্ভবামি' বলেছিলে, এসো, এসো, কাঁদে জনগণ।
'উজ্জ্বল ভারত' গড় নবরূপে জাগি নারায়ণ।

মধুসূদনের কাব্য-কীর্তি

॥ শ্রীমিথিলরঞ্জন রায় ॥

কবি মাইকেল মধুসূদনের মহাপ্রয়াণে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি : "আমি অক্ষুণ্ণমনে ও অক্ষুণ্ণচিত্তে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালি জাতির গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে। যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি স্বয়ং প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য।"

উপরোক্ত কথা কয়টির মধ্য দিয়া সাহিত্য-সম্রাট কবি মধুসূদনের যে মূল্যায়ন করেছেন তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যে কোন জাতির জীবনেই সুকবির প্রভাব অপরিসীম। যে কোন জাতির সংস্কৃতিরই যথার্থ নির্দিষ্ট হয় তার সাহিত্য ও কাব্যের উৎকর্ষ দ্বারা। ইংরাজ জাতির ঘটনা-বিচিত্র ইতিহাসের মধ্য দিয়া এই সত্যই শাশ্বত হয়ে আছে যে, ইংরাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার সাম্রাজ্যও নয়, উপনিবেশও নয়, ইংরাজ জাতি এবং ইংরাজের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বৈভব সেক্সপিয়র। তেমনি জার্মাণজাতির গোয়েটে, ফরাসীর ভিক্টর হুগো, রুশদের পুশ্‌কিন ও তলস্তয়—জাতীয় উৎকর্ষ মূল্যায়নের ইহারাই নির্ভুল নিদর্শন!

কবি মধুসূদনের কাব্য-কীর্তি সম্বন্ধে অধুনা আমাদের আগ্রহ যে খুব বেশী নয়—সেকথা বলাই বাহুল্য। মধুসূদনের জন-প্রিয়তা আজ অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। তার কারণ প্রধানতঃ দুটি : (১) বহুল অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারজনিত জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতা, (২) অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠে যে শ্রম স্বীকারের প্রয়োজন তদ্বিষয়ে পাঠকের বিমুখতা। কিন্তু এই প্রতিবন্ধক দুটি অতিক্রম করলে সহজেই বুঝা যায় কেন তাঁর কাব্য বিশেষ করে মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ঈশ্বর গুপ্তই বাংলার সর্বপ্রথম আধুনিক কবি। গতানুগতিক দেবদেবীর স্তুতি গান আর অশ্লীলতাদুষ্ট ছড়া ও পাঁচালীর ধারা পরিত্যাগ করে গুপ্ত কবিই প্রথম বাংলায় বাস্তবধর্মী কবিতার প্রবর্তন করেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় রূপগত ঐশ্বর্য ও ভাবগত গাম্ভীর্যের অভাব থাকায় উহা সাময়িক লোকপ্রিয়তার অধিক স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। রঙ্গলাল ও অন্যান্য কেউ কেউ ইংরাজী কাব্যের আদর্শে কাব্য সাধনা করছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরাও অনুরূপ কারণে খুব বেশী সাফল্য অর্জন করেন নাই।

এই পরিস্থিতিতে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর। ভারতীয় পুরাণ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভাবধারার সম্মিলিত প্রভাব মাইকেলের অনন্যসাধারণ সৃষ্টির মূল।

বঙ্কিমের উক্তির উপসংহার : "কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—যে পথে যাইতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া যাও, তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।" প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনেই বর্তমান ভারতের রূপান্তর—এই পরিবর্তনের অন্যতম পুরোধা কবি মধুসূদন। বাংলা কাব্যের নব রূপায়নে মধুসূদনের অপরিসীম অবদান। তিনি পথিকৃৎ এবং স্রষ্টা। বাংলা কবিতার উপজীব্য এতাবৎ দেবদেবী, ধর্মবিশ্বাস, লোকশ্রুতি ইত্যাদির গতানুগতিক গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। মাইকেলই প্রথম দেবতা ও মানুষের স্থলে মানুষের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল প্রমুখ কবিগণ বাংলা কাব্যে নতুন ধারার প্রবর্তক বটেন কিন্তু যুগ-প্রবর্তক নহেন। বাংলার নব রূপায়নে মাইকেল মধুসূদন যুগপুরুষ। আধুনিক বাংলার মহাকাব্যের তিনিই প্রথম এবং প্রধান স্রষ্টা। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যোজনা তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্তি। "বঙ্গের নিধুর আমি ভাবি তারে মনে'

লো ভাষা, পীড়িতে তোমা পড়িল যে আগে মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে পায় যবে এ নিগড় কোমল চরণে" পয়ারের মৃদু লালিত্যে অভ্যস্ত বাঙালী পাঠক কল্পনাও করতে পারত না যে মিল্টনের গুরুগম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা কাব্য রচনা সম্ভব। এই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

মাইকেল এই সংশয়ের নিরসন ঘটিয়েছিলেন যতীন্দ্র-মোহনকে তাঁর প্রথম রচনা "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য" উপহার দিয়ে, বিস্ময় বিমুগ্ধ পাঠক প্রথম অনুভব করল বাংলা ভাষার এই অদ্ভুত অন্তর্নিহিত শক্তিকে। পরপর মেঘনাদ বধ কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা দ্বারা মাইকেল বাংলা কাব্যকে এক নূতন মহিমায় ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাংলা ভাষায় যেন এক প্রবল প্রাণ-প্রাচুর্য সঞ্চারিত হল। বীণাপাণির বীণার সাগর-তরঙ্গ উদ্বেলিত হল। বীণাযন্ত্রের মৃদু নিক্কন যেন হঠাৎ কোন যাদু প্রভাবে অমর মন্ত্রে ঝঙ্কারিত হল। বাংলা কাব্যের সুরে সমুদ্র-কল্লোল শ্রুত হল। বাংলা ভাষা যে গুরু ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবের যোগ্য বাহক—তার প্রমাণ দিলেন কবি মধুসূদন। গৌরব-সঞ্চারিণী ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাংলা রচনায়। ভাষা যে কতখানি বীর্যবন্তী ও উদ্দীপনী হতে পারে তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন ঐ রচনা। কবিযশ-প্রার্থী মাইকেল কাব্যসাধনায় অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন হিন্দু-কলেজের অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন ও ডিরোজিওর নিকট হতে। মাদ্রাজ প্রবাস কালে রচিত ও ইংরাজীতে প্রকাশিত "ক্যাপটিভ লেডী"র একখণ্ড তিনি উপহার পাঠিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাকের মারফৎ তদানীন্তন শিক্ষা-সচিব ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন মহোদয়কে। বীটন সাহেব ঐ পুস্তক খানা পাঠ করে গৌরদাস বসাকের মারফত মধুসূদনকে তাঁর ইংরাজী ভাষায় লব্ধ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির সাহায্যে স্বীয় মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বিদেশীর এই উপদেশ মাইকেলের পক্ষে মন্ত্রৌষধির ন্যায় কার্যকর হয়েছিল।

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা' সবে অবোধ আমি অবহেলা করি
পর ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ,
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
* * *
পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে॥

মাদ্রাজ প্রবাস হতে ফিরে মধুসূদন বাংলা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫৮-তে বাংলায় ফিরে আসেন এবং ইউরোপ যাত্রা করেন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। মাত্র ছয় বৎসর কাল (অর্থাৎ ১৮৫৬ থেকে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) হচ্ছে মাইকেলের কাব্য-রচনার প্রধান মৌসুম। এই স্বল্প পরিসর সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রধান প্রধান সৃষ্টি—তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য, মেঘনাদ বধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক আর বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসনাদি রচিত হয়।

বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে মাইকেলের সংশয় আর নাই। দূর প্রবাস হতে প্রিয় বন্ধুকে লেখা এক খানা চিঠির কিয়দংশ এর অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করে। ভার্সাই (Versailles) হতে এই চিঠিখানা লেখা হয়েছিল বন্ধু গৌরদাস বসাককে: "ভাই, সত্যই বলিতেছি, আমাদের বাংলা ভাষা অতি সুন্দর। কেবল প্রতিভাশালী লোকেদের হাতে ইহা মার্জিত হওয়া চাই মাত্র। আমাদের মধ্যে যাহারা তাহাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার দোষে এই ভাষা প্রায় জানেন না বলিলেই হয়, অথচ উহাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন, তাহারা অতি শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত।"

ইউরোপ প্রবাস কালে মধুসূদন কাব্য-সৃষ্টির আর এক নূতন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইউরোপ থাকা কালে তিনি চতুর্দশপদী কবিতা (সনেট) রচনায় প্রবৃত্ত হন। সুদূর প্রবাসে মনে হয় তাঁর চিত্ত যেন গৃহ-কাতরতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সনেটের ভাব ও বিষয়বস্তু-গুলি হৃদয়ের অনুষ্ঠিত, অকপট অভিব্যক্তি। তাঁর কাব্য ও নাটক প্রায় সবগুলিই নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু সনেটগুলি প্রায়শই আবেগাপ্লুতপ্রাণিত এবং লিরিকধর্মী। সনেটের

বিষয়গুলির মধ্যে আছে, কপোতাক্ষ নদ, তমসাতীরে, শ্রীকৃষ্ণ, বিজয়াদশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, জন্মদেব, কাশীরামদাস, ঈশ্বরী পাটনী, রামায়ণ, বঙ্গভাষা, শিবমন্দির ইত্যাদি অন্তরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিষয়সমূহ। ইউরোপের নানা জ্ঞানী ও গুণীব্যক্তির জীবনী ও বাণীও তাঁহার কবি-কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করত। এই সনেটগুলির মধ্য দিয়েই কবির স্বদেশপ্রীতি অতি সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে। খৃষ্টান মধুসূদনের বাহ্যিক দাহেবীয়ানার অন্তরালে যে অকৃত্রিম বাঙালী তথা ভারতীয় সত্তাটি লুকিয়ে ছিল তার প্রমাণ মেলে এই অনবদ্য কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে।

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে; ইত্যাদি

মধুসূদনের সনেটগুলি কবিত্বমাধুর্য এবং আঙ্গিক-নিপুণতায় অনবদ্য ও অতুলনীয়। মাতৃভূমি মধুসূদনের খাঁটি স্বরূপ যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে সনেটগুলির স্বচ্ছ মুকুরে। ভাষা জননী বঙ্গভূমির প্রতি কবির গভীর অনুরাগ, কবির দেশপ্রেম এবং ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা অভিব্যক্ত হয়েছে এই সনেটগুলিতে। মধুসূদন-কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ এই সনেটগুলি।

ইউরোপ প্রবাস কালে কবিকে অশেষ দুঃখ-দুর্গতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল, তার প্রধান কারণ তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণের প্রবঞ্চনা এবং নিজের অমিতব্যয়িতা। ইউরোপ প্রবাস থেকে ফিরে এসে কবিকে জীবিকার্জনের চেষ্টাতেই বোধ হয় বেশী ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর হতে আমৃত্যু উল্লেখযোগ্য রচনা বিশেষ কিছু নেই। মাইকেলের গদ্য গ্রন্থ 'হেক্টর বধ' এই সময়ের রচনা। এই বহু-বিতর্কিত ও বহুল নিন্দিত গ্রন্থটিই তাঁর প্রথম ও শেষ গদ্য রচনা। অন্ন-আধা, জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত মধুসূদনের জীবনের স্রোত ক্রমে শেষ হয়ে আসছিল—কাব্য নির্ঝরের কলধ্বনিও সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ প্রায়।

মধুসূদনের কবি-জীবন সৌরভ-সমুজ্জ্বল, কিন্তু ঐহিক জীবন মর্মন্তুদ বেদনা-করুণ। অসংযম, অমিতব্যয়িতা ও আবেগাতিশয্য তাঁর জীবনের মঞ্চে যে সকরুণ ট্রাজেডির অবতারণা করেছিল, তার তুলনা খুঁজতে গিয়ে শেষ বারণ ও এমিল জোলার বেদনাময় জীবন-সমাপ্তির কথা মনে পড়ে। মধুসূদন নিজেই তাঁর জীবনের ব্যর্থতা ও সকরুণ পরিণতির কথা বলে গেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় 'আত্মবিলাপ' কবিতায়। বিকৃত জীবনের শেষ খেদোক্তি উচ্চারিত হয়েছে এই কবিতাটির প্রতি ছত্রে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূর্ত অভিব্যক্তিরূপে এই কবিতাটির মূল্য সর্বাধিক। এই রচনাটিই সমাজ ও মানুষের প্রতি কবি মধুসূদনের বাণী:

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
কত মায় হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি মন কেমনে!

ভোগবাদী, আত্মদর্বস্ব, আদর্শবিহীন মানুষের প্রতি কবির এ যেন সাবধান বাণী। যাঁর জীবনের মধ্য দিয়া কবি তিক্ততা ও বিকৃতা আস্বাদন করেছিলেন। সেই শিক্ষাই ভবিষ্যত মানুষের অবগতির জন্য রেখে গিয়েছেন তাঁর শেষ বাণীরূপে।

সমসাময়িক ও অব্যবহিত কাব্য-রচনার রীতি ও পদ্ধতির উপর মধুসূদন সাময়িক প্রভাব বিস্তার করে থাকলেও তাঁর স্থায়ী প্রভাব বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত অল্প। মাইকেলের মহাকাব্য-রচনার প্রয়াস বঙ্গলাংশে কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেনকে প্রভাবিত করেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনিচ্ছাকৃত ছন্দে তাঁর কতকগুলি শ্রেষ্ঠতম কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু এ-ছাড়া মাইকেলের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে নি—একথা বলা অন্যায় হবে না।

উনিশ শতকে প্রাচ্য ভাবধারার সংস্পর্শে ও প্রভাবে বাংলা তথা ভারতে যে নবজাগরণের (যাকে বলা হয় রেনেসাঁস) সূত্রপাত হয়েছিল, মাইকেল মধুসূদন ছিলেন তারই অন্যতম পুরোধা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সমুদ্র-মন্থনে যে হলাহল উত্থিত হয়েছিল তা পান করে তিনিও

নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন—তাঁর ব্যর্থ ও বেদনাযুক্ত সাংসারিক জীবন সেই দুঃখময় পরিস্থিতির সাক্ষ্যই বহন করে। মাইকেল মধুসূদনের জনপ্রিয়তা আজ যতই ক্ষীণ হউক না কেন, বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর স্থান চির দিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। তাঁর কাব্য ক্লাসিকের মর্যাদায় পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যিকের তথাকথিত লোক-প্রিয়তা সম্বন্ধে জনৈক সাহিত্য-সমালোচকের একটি মূল্যবান উক্তি দ্বারা এই নিবন্ধের উপসংহার করি: On the literary stock-exchange reputations fluctuate notoriously, and it is premature to conclude that the people will not some day rediscover the poet.

'বলাকা'র পূর্বরঙ্গ

॥ অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥

একটি লোক-প্রচলিত ধারণা এই যে, 'বলাকা'-পর্ব রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহে একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার। বলাকার-রূপকে জীবন ও জগতের সচলতাকে প্রকাশ ও উপভোগ করাই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে বলাকা-ভাবের কিছুমাত্র আভাস নেই।

কথাটি পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। প্রথমেই মনে হয়, ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত যে-কথা কবির মনে কখনো জাগে নি, হঠাৎ ইউরোপ থেকে ফিরে এসেই সেইভাবে তিনি উদ্বাসরূপে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, এরকম উক্তি যেন ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাইরের প্রভাবের মূল্যকে আমরা অস্বীকার করছি না; কবির অন্তরের মধ্যে পূর্ব থেকেই তার কোনো বীজ ছিল কি না তাই ভাবছি।

১। ৩৪ বছর বয়সে লিখিত একটি কবিতার নাম 'অনন্তপথে' (চৈতালি)। কবিতাটি সামান্য। চৈতালির অধিকাংশ কবিতার মতোই সহজ ও অনলঙ্কৃত ভাষায় লেখা। ১২৯০ সালে এই গ্রন্থের সূচনায় কবি যা লিখেছিলেন (‘রবীন্দ্ররচনাবলী’), তার থেকে জানা যায় চৈতালী রচনা কালে কবি পতিসরের প্রায় নদী নাগরের বুকে বোটের জানালা বন্ধ ক'রে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছেন। মনের ক্যামেরায় ছোট ছোট ছবির ছাপ দিয়ে যাচ্ছে। এই লেখা কিছু বৃহৎ নয়, অল্প পরিধির মধ্যে লেখা। পূর্বোক্ত 'অনন্তপথে' কবিতাটিও সেই লেখারই ফল। ছোট্ট গ্রাম্য মেয়েটি গম্ভীর, কর্তব্যব্রত। ঘর থেকে ঘাটে আনাগোনা করে সংসারের কাজে। সে কবিকে জানে না, কবিও তাকে জানেন না। কিন্তু কবির বড় আগ্রহ ওই ছোট মেয়েটির জীবন-পথ অনুসরণ করার। এখন সে কুমারী। বিয়ের পর এই পল্লী ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে কোন্ অজানিত গ্রামে কোন্ দূর দেশে কার ঘরে বধূ হওয়ার জন্য। তারপরে হবে সে মাতা। তারপরে সব শেষ। কিন্তু সত্যই কি শেষ? কবির বিস্ময়-বিমূঢ় জিজ্ঞাসা :

তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়!

এই লাইনটি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কেন জানি না বলাকার ৭নং কবিতাটির (শাজাহান) কথা মনে জাগে। অবশ্য পল্লীবালা ও সম্রাট শাজাহানের মধ্যে যে ব্যবধান,

এই কবিতা দুটির পার্থক্য তার চেয়ে কিছু কম নয়। তবু শেষের পংক্তিটি পড়ে মনে হয় ঐ সামান্য মেয়েটির 'জীবনের পথ' বার বার তার পুরোনো জীবনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে—যৌবন, বধূজীবন, মাতৃত্ব, মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুতেই শেষ নয়— তারো পরে, হায়,

এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়!

২। চৈতালীর প্রকাশকাল ১৮৯৬। তার সাত বছর পরে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় 'উৎসর্গ'। উৎসর্গ কাব্য-গ্রন্থের সংযোজন অংশের ১নং কবিতাটির আরম্ভেই আছে নিম্নলিখিত জিজ্ঞাসা— হে পথিক কোন্‌খানে

চলেছ কাহার পানে?

পথিক তার উত্তরে বলছে: 'শয়ন তেয়াগি উঠিয়াছি জাগি চলেছি সাগরপানে'। বলাকার ৩৭ নং কবিতায় (ঝড়ের খেয়া) কবি বলেছেন সাগরের কথা—'নূতন সমুদ্র তীর পানে দিতে হবে পাড়ি'। উৎসর্গের উল্লিখিত কবিতার দ্বিতীয় প্রশ্ন: সে সাগর কোথা আছে? পথিকের উত্তর: 'যেথা এই নদী বহি নিরবধি নীল জলে মিলিয়াছে'। এই প্রসঙ্গে মনে না এসে পারে না বলাকার ৮ নং কবিতা (নদী)—যেখানে বলা হয়েছে যে, বিরাট নদীর জল অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি। তৃতীয় প্রশ্ন: পথিক তোমার জলে

যাত্রী কজন চলে?

বলাকার 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটির মুখ্য পাত্র যাত্রীদল: 'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল।' চতুর্থ প্রশ্নে আছে সাগরের দূরত্বের কথা: আর কত দূরে, আর কত দূরে

সেই তো শুধাই সবে।

'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটিতেও দেখতে পাই সকলে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে এসেছে দাঁড় হাতে নিয়ে। তাঁদের মুখেও অনুরূপ জিজ্ঞাসা—

'নূতন উষার কনক দুয়ার খুলিতে বিলম্ব কত আর'

এ কথা শুধায় সবে ভীত আর্তরবে।

কিন্তু বৃথা এ প্রশ্ন। কারণ কোথায় কবে গিয়ে তরী ঘাটে পৌঁছবে সে কথা কারও জানা নেই। শুধু জানা আছে:

তরঙ্গের সাথে লড়ি

বাহিয়া চলিতে হবে তরী। (ঝড়ের খেয়া)

উৎসর্গের আলোচ্য কবিতাটিতেও ঠিক অনুরূপ কথা বলা হয়েছে ভিন্ন ভাষায়—

যাত্রে যদি দুখ হবে না বিমুখ,

নিবাবে না উৎসাহ।

ওরে, ওরে ভীত, দুখিত তাপিত,

জয় সংগীত গাহো।

৩। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ নাম-কবিতায় (৩৬ নং কবিতা) যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তাকে সংক্ষেপে বলা যায় "নিত্য কেবল এগিয়ে চলায় সুখ।" এই সংক্ষিপ্ত ভাব-গর্ভ বাক্যাংশটী রয়েছে 'খেয়া' কাব্য-গ্রন্থের (প্রকাশ কাল ১৯০৬) 'পথের শেষ' নামক কবিতাটিতে। কবিকে একদিন ডাক দিয়েছিল পথ এবং সেই পথের নেশায় তিনি দুয়ার খুলে বাইরে এলেন। তারপরে আছে—

নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,

বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,

প্রতি পদেই অন্তর উৎসুক

অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে।

পাঠক লক্ষ্য করবেন বলাকার নাম কবিতায় (এবং ঐ গ্রন্থের অন্যান্য কয়েকটি কবিতায়) বিশেষভাবে ব্যবহৃত কতগুলি শব্দ আলোচ্য কবিতাটিতেও রয়েছে। যেমন অজানা, নিরুদ্দেশ, ঘর ছাড়া, অরণ্য, পর্বত প্রভৃতি। কেবল শব্দই নয়, শব্দ-জন্য চিত্রেও কিছুটা সাম্যের ইঙ্গিত রয়েছে। 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'—এই পংক্তিটিতে আছে পর্বতের আকাঙ্ক্ষা, আর 'পথের শেষ' কবিতায় দেখতে পাই—

প্রভাত-কালে আপন পানে চেয়ে

কী মোহ-গান উঠতেছিল গেয়ে,

উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে

অদূরের অরণ্য পর্বত।

আসলে পর্বত সর্বদাই নীরব ও নিষ্ক্রিয়। উভয় ক্ষেত্রেই পর্বতের উপর যা আরোপ করা হয়েছে তা কবি-চেতনা

ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪। এতক্ষণ আমরা যে কবিতা কয়টির কথা বলেছি তাতে বলাকার ভাব-সাদৃশ্য ও শব্দ-ব্যবহারের সমতা লক্ষ্য করা গেলেও বলাকার প্রধান চিত্রকল্পটি পাওয়া যায় নি। বলাকা বইটার নামকরণের মধ্যে যে কবিতার মর্মগত ভাবটি নিহিত রয়েছে তার জন্ম সম্পর্কে কবি বলেছেন—"কাশ্মীরে শ্রীনগরে কার্তিকের নির্মল আকাশ। পদ্মার মতো বিলম নদী আমার পায়ের তলায়। সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে ঝিলমের জলে অন্ধকার নেবে আসছে। বোটের ছাদে বসে আছি। নদীর স্রোত কালো রঙ্গে গেছে, ওপারে জমাট অন্ধকার, চারিদিক নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। এমন সময় বুনো হাঁসের দল হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।" ('বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা পৃঃ ১১৪)। এই থেকে ৩৬নং অর্থাৎ 'বলাকা' কবিতাটির জন্ম। কিন্তু কাশ্মীরের শ্রীনগরে বসে ১৩২১ সালের কার্তিক মাসে কবির যে উপলব্ধি তা কিছু অভিনব নয় তাঁর জীবনে। কারণ কবিই বলেছেন—"পদ্মার থাকতে এক এক সময় হঠাৎ শুনতে পেতাম হাঁসের দল চলেছে।" উপলব্ধি যেমন নতুন নয়, রবীন্দ্র-কাব্যে বলাকার চিত্রকল্প ব্যবহারও তেমনি নতুন নয়। "উৎসর্গ" কাব্যগ্রন্থের সংযোজন অংশের ৮নং কবিতার উপমাঞ্চলে কবি বলেছেন—

আমার চিত্ত আকাশ জুড়ে, বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে
জানি নে কোন্ সুদূর দক্ষিণপারে।

বলা যেতে পারে এগুলি নিতান্তই কবি-প্রসিদ্ধির অনুসরণে ব্যবহৃত হয়েছে, এর মধ্যে সেই ব্যক্তি-স্পর্শের প্রাণবত্তা নেই যা কি না কবি অনুভব করেছিলেন শ্রীনগরে ঝিলম নদীর বুকে বোটের ছাদে বসে। শ্রীনগর যাবার অনেক পূর্বে পদ্মার থাকতে কবি যে এক এক সময় শুনতে পেতেন হাঁসের দল চলেছে, সে সম্পর্কে কবির পূর্বোদ্ধৃত উক্তিই যথেষ্ট। কাব্যেও যে তার সমান জীবন্ত প্রকাশ রয়েছে তার প্রমাণ 'খেয়া' কাব্য গ্রন্থের 'দিদি' কবিতাটি (রচনাকাল ১৩১৩ বৈশাখ)। সন্ধ্যা-বেলার বর্ণনা দিতে-গিয়ে কবি বলেছেন :

সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে,
বাজল দূরে শাঁখ।
রুদ্ধবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক।

উদ্ধৃতাংশের দ্বিতীয়ার্ধে যা প্রকাশ পেয়েছে বর্ণনার দিক থেকে 'বলাকা' অপেক্ষা তাকে ছোট মনে করা চলে না। বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেঙে দিয়েছিল—এ অংশে 'খেয়া' ও 'বলাকা'র কবিতা-দুটির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তফাৎ এইখানে যে, 'খেয়া'র উপলব্ধি নতুন কোনো প্রেরণা সৃষ্টি করেনি, আর 'বলাকা'র উপলব্ধি নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এই নদী, বন, পৃথিবী, বন্ধুস্তরার মানুষ—সবলে এক জায়গায় চলেছে। তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ কে জানে। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের ছুটে চলার মতো এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানিনে, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী—'এখানে নয়, এখানে নয়'। এই সত্য সন্ধানটুকু বলাকার অন্যতম গৌরব।

ভাববার কথা

॥ শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ॥

বঞ্চনা, দুঃখ দারিদ্র্য মানুষের জীবনে যথা ও বিপদ বরণ দেখা দেয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার এই দুঃখ দারিদ্র্য ও অভাবে মানুষের সম্পদের হেতু হয় ইহাও সত্য। আবার ইহাও দেখা যায়, সম্পদের ক্রোড়ে বসিয়াও মানুষ সম্পদের অপচয় ঘটায়—আলস্যে ও পর-নির্ভরতায় মানুষের মত মানুষ হইতে পারে না।

আমাদের এক বন্ধুর ধারণাগুলি ছিল বিচিত্র ধরণের। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁহার চিন্তার মধ্যে ভাবিবার ও বুঝিবার কথা যথেষ্ট থাকিত। পাণ্ডু পুত্রগণের এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের চরিত্র আচরণ ও শক্তির তারতম্য সম্পর্কে বন্ধু বলিতেন: একই ভারত-বংশ, কিন্তু ভেদ প্রভেদ কত! কেন এই প্রভেদ শোন—পক্ষ পাণ্ডব পিতৃ-হারা। রাজপুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পদ প্রাচুর্য তাহারা পায় নাই, পায় নাই তাহা অধিকার। আর দুর্যোধনাদি ভ্রাতাগণ পিতৃস্নেহে রাজৈশ্বর্যে—রাজ্যের সম্পদের অধিকারে ও প্রাচুর্যে লালিত। এক পক্ষে ছিল অভাব—অনধিকারের বঞ্চনার বেদনা—দুঃখ। তাই তাহারা চরিত্রে, মহত্ত্বে, দুষ্কর সাধনায় শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছে—দুঃখ-ই তাহাদের মানুষ করিয়াছে। আর দুর্যোধনাদি কুরুপক্ষ সব কিছুর অধিকার পাইয়াও প্রাচুর্য ও সম্পদের অন্তই-চারিত্র খোয়াইয়াছে, অমানুষ হইয়াছে। এক পক্ষ বঞ্চিত, দুঃস্থ-রাজ্য উদ্ধারের জন্য দুষ্কর সাধনায় শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছে; অপর পক্ষ পররাজ্য অপহরণ ও ভোগ করিবার লালসায় শক্তির অপচয় ঘটাইয়াছে। বন্ধুর এই কথাগুলি উড়াইয়া দিবার মতো নহে।

আমাদের পরাধীন জীবনের এবং স্বাধীন জীবনের প্রসঙ্গে কথাটা বিচার করিতে পারি। বাংলার কথাই শুধু বলি। ভারত তথা বাংলাদেশ বিদেশী শাসনাধীন। পরাধীনতার দুঃখ-গ্লানি-বঞ্চনা রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয় আনিয়াছে—'শোষণে শুষ্ক কমলা ভাণ্ডার"। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাঙালী আমরা আত্মসমিত ফিরিয়া পাইতেছি, আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইতেছি—দেশ ও জাতিকে ভাল-বাসিয়া দেশের জন্য ও দেশের মানুষের জন্য ত্যাগ করিতে পারিতেছি—বঙ্কিমের কথায়—'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশ প্রেম', আমাদের পরাধীন জীবনেও আমাদের চরিত্র বলিষ্ঠ করিতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, 'আগামী ৫০ বছর জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য হউন'। আমরা পরাধীনতার দুঃখ বৈরের মধ্যে সেদিন চারিত্রিক সম্পদ আহরণ করিয়াছি। স্বাধীনতার অভাবেও আমরা মুষড়াইয়া পড়ি নাই; শত অভাবে ও বৈরে আমরা হতাশ হই নাই। আমরা জাতি হিসাবে বড় হইবার যাহা ধ্রুব পথ তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। সে ছিল আমাদের নবজাগরণের যুগ। সে যুগে বড় যে কয়টা বস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম তন্মধ্যে স্বদেশী প্রধান। স্বদেশীর মধ্যেই পাইয়াছি স্বদেশ সমাজ। স্বদেশের সকল কিছুর প্রতি মমতা, 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' এই সত্য চেতনা। এই স্বদেশীই ঘরের ভাক, ঘর ছাওয়ার ভাক—নির্মাণ যজ্ঞের দীপ্ত আহরণের ভাক,—এক কথায় স্বদেশী সমাজ, স্বদেশী শিক্ষা সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত ভাষা আচার রীতির ভাক,—গড়িয়া তোলার, কর্মের ভাক,—পর-প্রত্যাশা পরিহারের ভাক। সর্বোপরি দাস-বুদ্ধি পরিহার করা ও করানোর ভাক—যাহা দেশের পরম সম্পদ তাহা চিনিবার ও রক্ষা করিবার ভাক,—যাহা দুর্বলতা ও গ্লানি তাহা বর্জন করিবার ভাক! বাংলার জীবন-যৌবন সেই ডাকে সাড়া দিয়াছিল।

সার্ধশত বর্ষ পূর্বে পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ডাকিয়া শুনাইয়াছিলেন:

...“বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অন্তরাত্মা দীনভাব, শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্রাভাসকে এই খানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতে পারি—যে দিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে—'এ সমস্তই আমাদের, এ সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে, আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ—এই সুফলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্মে কর্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ, এ আমাদেরই কীর্তি—যে দিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দ-গানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কর্মমান”।

ইহাই স্বদেশীর, তথা দেশাত্মবুদ্ধির সেবা, ধর্ম-নিষ্ঠার আত্মপ্রতিষ্ঠার কর্মযোগে দীক্ষা গ্রহণের আহ্বান। আমাদের রাষ্ট্র-বশ্যতা সত্ত্বেও আমরা আত্মবিস্মৃত বিমূঢ় হই নাই। রাষ্ট্রীয় অনধিকারের বাধা আমাদের সমাজ-চিন্তা ও ভাবনা নিষ্ক্রিয় নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। যাহা হইলে ভাল হইত, তাহা লইয়া নালিশ পুঞ্জীভূত না করিয়া যাহা করিতে পারি তৎপ্রতি আমরা অবহিত হইতে বিরত হই নাই। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ভার আমাদের হাতে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া শাসন-শক্তি বা শাসক-জাতি আমাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা এমন চিন্তার দৈন্যও আমাদের ছিল না। আমাদের সমাজের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ধর্ম আমরাই রক্ষা করিব, উহার গ্লানি আমরাই দূর করিব, মূক মুখে ভাষা দিব, আমাদের বিদ্যা বিস্তারিত করিয়া দিব, আমাদের অজ্ঞতা কুসংস্কার আমরাই দূর করিয়া দিব, এই যে পরম আকুতি ইহাই আমাদের স্বদেশীর মূল কথা হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশ ও সমাজ-চিন্তায় সমাজ-সংগঠনের কার্যকরী প্রেরণা আনিয়া দিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বজ্রবাণীতে আলস্য-জড়তা-পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিয়া জাতিসেবার কর্মৈষণা আনিয়া দিতে লাগিলেন।

শিক্ষার পশ্চাৎপদ সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আমরা সেদিন কিন্তু রাজদ্বারে ধর্না দিতে যাই নাই। আমাদের স্নেহ-প্রীতিই আমাদের জাতির জন্য কাজ করিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব সরকার কতটুকু পালন করিয়াছেন? বাংলার বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠার মূলে সরকারী দাক্ষিণ্য নয়—স্বদেশের সেবা-নিষ্ঠাই উহার মূলে কাজ করিয়াছিল। শিক্ষালয় চিকিৎসালয় ব্যায়ামাগার আমাদের চেষ্টায় যত্নে অকৃপণ দানে গড়িয়া উঠিয়াছিল। দেশের আপদে বিপদে আমরাই, দরিদ্র দেশের আমরাই, আগাইয়া আগাইয়া গিয়াছি।

কলিকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দিল। তখন শহরের ক্লেদ-জঞ্জাল-আবর্জনা পরিষ্কার করার স্বেচ্ছাসেবীর ব্রত লইয়া আগাইয়া আসিলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, অগ্রগামী হইলেন ভগ্নী নিবেদিতা আর সব গুরুভাইগণ। এই আচরণ-নিষ্ঠ আহ্বানে সহরের ছাত্রদলও সাড়া দিল। একটা দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করিলাম।

কারণ লইয়া বিতর্ক থাকুক; কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই দেশাত্মবুদ্ধির ও দেশবাসীর প্রতি মমতার অভাবেই না মানুষের স্বার্থ-বুদ্ধি ও ভোগলালসা দুনিবার হইয়া ব্যাপক দুর্নীতির আমদানী করিয়াছে? স্বাধীনতা পাইয়াছি। সুতরাং ত্যাগের প্রয়োজন নাই, দেশকে ভালবাসার সংযমের প্রয়োজন নাই—এ যে সর্বনাশা বুদ্ধি। স্বাধীনতা সম্পদ—কিন্তু এই সম্পদ রক্ষার জন্য—সম্পদ কাজে না লাগাইবার জন্য চাই স্বদেশী যুগের দেশ-সেবার প্রেরণা।

বাংলার স্বদেশী যুগের স্মৃতি যাহাদের আজও অম্লান, তাঁহারা জানেন স্বদেশ সেবার প্রেরণায় বাংলার যুবকগণ সমিতিবদ্ধ হইয়া পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষালয়, ব্যায়ামাগার, গ্রন্থাগার, ব্যায়ামাগারই দুঃস্থের সেবার দায়িত্বই পালন করেন নাই, পল্লীর দুর্গম রাস্তাকে সুগম করিয়াছেন, অগম্য পথকে গমনযোগ্য করিয়াছেন—জলাশয়ের আবর্জনা পরিষ্কার করিয়াছেন। স্বদেশীর ঐক্য মন্ত্রে বিবেকানন্দের দুঃসাধ্য-

পরিহারের প্রেরণায় অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রয়োজনকে যুবকগণ আচরণের দ্বারা কার্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন।

আজ দেশ স্বাধীন। আজ লোকহিত কল্যাণ রাষ্ট্রকে জনসেবার দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। গঠনমূলক বহু কাজ আজ দেশের সরকার করিতেছেন। রাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পাঠাগার প্রভৃতি সরকারের আওতায়, উদ্যোগে, সাহায্যে গড়িয়া উঠিতেছে। স্বাধীন দেশের সরকার ইহা অবশ্যই করিবেন। কিন্তু ইহাও আজ লক্ষ্য করিবার যে, যতটা সরকার করিবেন, যেন তাহাই হইবে,—উহার বাহিরে আমাদের আর কিছু যেন করিবার নাই। স্বাধীন দেশের সরকার। সরকারের নিকট লোকে দাবী করিবে;—করিতে পারে। কিন্তু এই দাবী করা ছাড়া দেশ ও সমাজের জন্য আমাদের আর কিছু করার নাই, এমন মতিগতি যদি সাধারণকে পাইয়া বসে তাহা হইলে জাতি কখনো বড়, শক্তিমান হইতে পারিবে না; কিঞ্চিৎ রূপ বদলাইয়া পরমুখাপেক্ষিতা ও পর-প্রত্যাশার গ্লানিই আমাদের চরিত্রকে অভিযোগ-প্রবণ, নিন্দা-মুখর করিয়া তুলিবে। মনে রাখিবার যে, ব্যক্তিই সমষ্টিই জাতি। ব্যক্তির চরিত্র আজ যদি সমাজ-সেবা-বিমুখ বা উদাসীন হয় তাহা হইলে স্বাধীনতা-রূপ এই সম্পদে আমাদের ক্ষতিই করিবে। আজ অস্পৃশ্যতা রাষ্ট্রের বিধানে দণ্ডযোগ্য অপরাধ। কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? সমাজের এক পুরুষের পাপ বিংশ-পুরুষকেও রেহাই দেয় না। জাতি ভেদের গণ্ডী গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে থাকিবার কথা নহে; কিন্তু এক জাতির চেতনা আজিও কার্যকালে বিড়ম্বিত হইতেছে—আজিকার যুব-শক্তি উহার বিরুদ্ধে সংহত কৈ? পরাধীন যুগে যে দেশ-প্রাণতা ও ত্যাগ-বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল সে প্রয়োজন আজও আছে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে যেন উহা তিমিত। আজ স্বার্থ-চেতনা, কি লাভ হইল—ইহাই যেন বড় কথা। পল্লী অঞ্চল হইতে সংবাদ পত্রে অভিযোগ প্রকাশ পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহখানা খড়ে ছেয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জেলা বোর্ড, ম্যাজিষ্ট্রেট, শিক্ষামন্ত্রী কি মুখ্য-মন্ত্রীর নিকট বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও প্রতিকার হইল না। অর্থাৎ ছেলিয়া পড়া বিদ্যালয় গৃহটি আর খাড়া হইল না। এই যে সব কিছুর জন্য আবেদন নিবেদন করার প্রবৃত্তি, ইহা পরমুখাপেক্ষিতার মারাত্মক ব্যাধি। পল্লীর লোক, পল্লীর যুবকগণ যদি পল্লীর ছেলিয়া পড়া বিদ্যালয়ের গৃহখানা খাড়া করিতে পারিল না। কিন্তু পরাধীনতার দুঃখের দিনে, স্বদেশী যুগে তাহা পারিত। আজ পল্লীর একটি রাস্তার সামান্য অংশ বর্ষায় ভাঙিয়া গেলে সরকারের দৃষ্টি এবং মেরামতের অপেক্ষায় আশাবী বৎসরও তাহাই পড়িয়া থাকিবে, চলাচল দুর্গম হইবে, (সংবাদ পত্রে বিবরণ উঠে); তথাপি পল্লীর যুবকগণ উদ্যোগী হইয়া নিজেদের সামান্য রাস্তাটুকু মেরামত করিয়া লইবে না। যেন লইতে নাই। সরকার সব কিছুই করিবেন সরকার। কিন্তু জন-সেবার প্রেরণাও যদি আমরা সরকারের উপর বরাত দিয়া ঘোড়াইয়া বসি—তেমন কল্যাণ-চেতনায় ভরপুর হইয়া যাই, তাহা হইলে বলিতে হইবে দুঃখে অভাবে পরাধীনতায় আমরা মানুষ হইতেছিলাম, আজ স্বাধীনতার সম্পদের মধ্যে আমরা চরিত্রে হীন হীন হইয়া পড়িতেছি। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের বাংলায় ইহা পরিতাপের কথা।

স্বাধীনতা আসিল, কি সুবিধা পাইলাম?—অর্থ-উপার্জনের, স্বচ্ছন্দে থাকিবার, অধিক ভোগ করিবার কি সুযোগ আসিয়া গিয়াছে, ইহাই যদি হয় বড় কথা—তাহা হইলে জাতি ভোগসর্বস্ব হইয়া উঠিবে, আত্মসুখ ও আত্ম-পরতায় অপরের অন্ন কাড়িয়া খাইবে, ইহাই নিয়তি। আজ দেশময় দুর্নীতি যদি সত্য, তাহা হইলে দেশ-প্রাণতার অভাব ঘটিয়াছে, লোভ লালসা বাড়িয়াছে, ইহাও তেমন সত্য। অথচ ভারতের সভ্যতার ও সাধনার মর্মকথা ইহাই যে, এই জাতি শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই পাইবে তাহা নহে, ভারতের আত্মিক শক্তি আধুনিক বৈষয়িক ব্যাপারেও সম্পন্ন হইয়া শুধু ভারতকেই শ্রেষ্ঠ করিবে না, বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিবে, বিশ্ববাসীকে বাঁচিবার, অমৃত লাভ করিবার সন্ধান দিবে। ইহাই তো স্বাধীন ভারতের যুগ-নিষ্ঠ দায়িত্ব। ভারতের মহাপুরুষগণ ভারতবাসীকে যোগ্য হইবার জন্যই স্বাধীন ভারতের প্রয়োজন অপরিহার্য মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে বিশ্বের কল্যাণ সাধনের ভূমিকা গ্রহণ করিবে যে জাতীয় চরিত্র, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে উহা অর্জনের প্রেরণা কই, প্রয়াস কই, সেবা-বুদ্ধি ও ত্যাগ-নিষ্ঠা কই?

'বর্গী এল দেশে'

॥ অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥

বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ ছড়া। ইহা শুধুমাত্র শিশুর কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া যে পরিণত মনের নিকট কোন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা নহে—পরিণত বয়স্কের রস-মানসও ইহাদের মধ্য হইতে যথার্থ রস গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। ইহারা বাংলা দেশের এক প্রান্তে রচিত হইয়া ক্রমক্রমে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উপরোক্ত কারণেই বোধ হয় বিস্তার লাভ করিতে পারে। এই ছড়াকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র বাঙালীর মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্য-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে, এই কথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হইবে না। অধিকন্তু ছড়াগুলিতে যেমন কোন তথ্য নাই, তেমনই কোনও তত্ত্ব নাই এবং কোন বস্তুজ্ঞানও বোধ হয় ইহাদের রচনার ভিত্তি নহে।

এই কথার প্রমাণ স্বরূপ বাংলার একটি সুপরিচিত ঘুম পাড়ানি ছড়ায় বুলবুলি পাখীর উপর যে ভাবে এক মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছড়াটি এই—

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।—বাঁকুড়া

এই ছড়াটি সম্পর্কে পক্ষীতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রথম এবং প্রধান আপত্তি এই যে, বুলবুলি পাখী কখনও শস্য-খাদক (corn eater) নহে, সাধারণতঃ পাকা ফলের রস, ফুলের মধু, ছোট ছোট উড়ন্ত পোকা মাকড় খাইয়াই বুলবুলি জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ইহার ঠোঁটের গঠনই এমন যে, ইহা শস্যের শক্ত দানা কিছুতেই ভাঙিয়া আহার করিতে পারে না, কিংবা তাহা গিলিয়াও খাইতে পারে না। বাংলা দেশে যে-সকল বুলবুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই—Common in gardens and light scrub jungle, both near and away from human habitations. Large numbers collect to feed on banyan and pipal figs and winged termite swarms, Has no song such, but its joyous notes and vivacious disposition make it a welcome visitor to every garden. Its pugnacity make it a favourite with fanciers as a fighting bird and large stakes are wagered on bulbul fights. Food: Insects, fruits, and berries, peas and such like vegetables and flower nector. (Salim Ali, The Book of Indian Birds, Bombay, 1955, p. 9.)

সুতরাং বাংলার ছড়া রচয়িতাগণ বুলবুলি পাখী সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব্যতীতই কেবলমাত্র বুলবুলি শব্দটির ধ্বনিগুণে আকৃষ্ট হইয়া ইহার বিষয়ক এই ঘুমপাড়ানি ছড়াটি রচনা করিয়াছিলেন। এখানে 'ঘুমানো' 'জুড়ানো' 'এলো' কথাগুলির সঙ্গে বুলবুলি শব্দটি সুরের দিক হইতে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, বস্তুজ্ঞান বিসর্জন দিয়াও কেবল মাত্র সুরটি রক্ষা করিবার জন্য জননী এবং ধাত্রীগণ তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা বস্তু-সচেতনতা একেবারেই বিসর্জন দিতে পারেন নাই, তাঁহারাই ছড়াটিকে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই কারণেই এই ছড়াটির সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার পাঠ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামে ইহার এই পাঠটি শুনিতে পাওয়া যায়—

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল সগরী আইল দেশে।
টিয়া পাখী ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে॥

এই কথা সকলেই জানেন যে, ক্ষেতের ধান যখন

পাকিয়া আসে, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী আসিয়া সেই পাকা ধান খাইয়া যায়; টিয়াপাখীর হাত হইতে পাকা ধান রক্ষা করা কৃষকের পক্ষে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। জীবনের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়া যখন বাংলার কোন কোন অঞ্চলের পল্লীসমাজ এই ছড়াটি শুনিয়াছে, তখন অতি সহজেই বুলবুলির নামটি বাদ দিয়া সেখানে টিয়াপাখীর নামটি গ্রহণ করিয়াছে, বুলবুলির উপর এই মিথ্যা অপবাদ তাহারা সহ্য করিতে পারে নাই। কারণ, তাহারা নিত্যই প্রত্যক্ষ করে যে, বুলবুলি এক অতি নিরীহ পাখী, ইহা কাহারও অনিষ্ট করে না; মাথায় ঝুঁটি ও রাঙা কপিটি লইয়া কেবল নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়; ফুলের মধু, ফলের রস খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে।

অক্লেশকারী পক্ষী হিসাবে টিয়ার পরই চড়ুই। এমন কি টিয়া অপেক্ষা চড়ুই-ই ধান্য শস্যের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক। এই জন্য চীনদেশে চড়ুই পাখী নির্মূল করিবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার ফলে এমন মনে হইতেছে যে, আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র চীন দেশে আর চড়ুইয়ের অস্তিত্ব থাকিবে না। এই বস্তুজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই ২৪ পরগণার ছড়াটি 'চড়ুই পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে' এই ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চট্টগ্রাম প্রকৃতি স্থান অপেক্ষা ২৪ পরগণার অধিবাসীদের বস্তুজ্ঞান আরও প্রখর। ইহা দ্বারা বুলবুলির জীবনাচরণ সম্পর্কে যেমন তাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, চড়ুই সম্পর্কেও তাহাদের সেই প্রকার প্রখর বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পায়। সুতরাং দেখা যায়, দুইই যদিও ছড়ার লক্ষ্য, তথাপি একটি বস্তু-সচেতন মনও সর্বদা ইহার সৃষ্টিমূলে সক্রিয় হইয়া থাকে, বাস্তবে এবং কল্পনায় ইহা যথার্থ সাহিত্যের শক্তি লাভ করে। নতুবা একান্ত বাস্তব হইলে ইহা তথ্য বিবরণী হইত এবং একান্ত কল্পনা হইলে ইহা মৃদি মাটির সম্পর্কবিহীন হইয়া অলৌকিক হইয়া পড়িত।

বুলবুলি সম্পর্কিত বস্তু-সচেতনতার জন্যই এই ছড়াটি আরও নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ ধান খাওয়া বিষয়ে বুলবুলি সম্পর্কে অভিযোগ কেহই সহজে স্বীকার করিতে চাহে নাই; যেমন, চট্টগ্রামে প্রচলিত আর একটি ছড়ায় পাওয়া যায়—

মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল পরকী আইল দেশে।

শুলশুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে। চট্টগ্রাম ছড়ার মধ্যে শব্দ অপেক্ষা সুরের প্রয়োজন অধিক। বুলবুলি সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই ছড়াটিতে বুলবুলির নামটি ব্যবহারের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে সুরটি ধ্বনিত হইয়া থাকে, 'শুলশুলিয়ে'র মধ্যে তাহাই রক্ষা পাইয়াছে। এখানে বস্তুজ্ঞানেরও মর্যাদা রক্ষা পাইল, অথচ সুরটিও বিসর্জিত হইল না। তারপর 'শুলশুলিয়ে' শব্দদ্বারা কি অর্থ প্রকাশ পাইল, তাহার বিচারে ছড়ার শ্রোতা কিংবা আবৃত্তিকারিণী কাহারও কোনও প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের প্রয়োজন, কিন্তু ছড়ার রাজ্যে বিজ্ঞানের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং 'শুলশুলি' দ্বারাও কাজ চলিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যেখানে বস্তুজ্ঞান অস্বীকার করিয়া ছড়া রচিত হয়, সেখানে ছড়া পরিবর্তিত হইবারও সম্ভাবনা সর্বাধিক প্রকাশ পায়। কারণ, সুরের মনে বস্তুর ক্ষুধা মিটে না, ইহা জীবনেও যেমন সত্য, সাহিত্যেও তেমনই সত্য। তবে একান্ত বস্তুজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার প্রথম প্রেরণা দেখা দেয় না। সেইজন্য ছড়াটি প্রথম রচনার মধ্যে বস্তুজ্ঞানের অভাব দেখা দিয়াছিল; তারপর সমাজের মধ্য দিয়া ইহার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক অঞ্চলেরই রুচি, বস্তুবোধ ও বস্তুজ্ঞান দ্বারা তাহা সর্বদা মার্জিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জন্যই বুলবুলি চট্টগ্রামে গিয়া টিয়াপাখী এবং চব্বিশ পরগণায় গিয়া চড়ুই পাখীতে পরিণত হইয়াছে। তবে চট্টগ্রাম অপেক্ষা চব্বিশ পরগণার অধিবাসী যে অধিকতর বস্তু-সচেতন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বাংলার এই সুপরিচিত ছেলে ভুলানো ছড়াটি সম্পর্কে আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। দেখা যায়, কোন কোন অঞ্চলে গিয়া ছড়াটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়িত হইয়াছে

অর্থাৎ আরও কয়েকটি পদ মূল ছড়াটির সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহা ছড়াসম্পর্কিত সাধারণ নিয়মের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম নহে। তবে কি উপায়ে ইহার এই দীর্ঘীকরণ হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ রাজসাহী অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এই ছড়াটির এই প্রকার একটি পাঠ পাওয়া যায়, এই পাঠটি অন্যত্রও প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায়, তবে প্রত্যক্ষভাবে আর কোথা হইতেও তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। রাজসাহী অঞ্চলের পাঠে শুনা যায়—

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে ?
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি ?

আর কাঁটা দিন সবুর কর রতন বুনেছি। রাজসাহী।

ছড়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্যে বিশেষ কোন একটি কথা যদি কানে লাগিয়া যাইবার মত থাকে, তবে তাহাই বিস্তৃত করিয়া প্রকাশ করা হইয়া থাকে। প্রধানতঃ নূতন কোন বিষয় কিংবা চিত্র ইহার মধ্যে আসিয়া স্থান অধিকার করিতে পারে না। কিংবা কোন কোন সময় স্বতন্ত্র ছড়ার একটি বিচ্ছিন্ন অংশ আসিয়া ইহাতে জুড়িয়া যায়। এখানে দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় পদের খাজনা দেওয়ার ব্যাপারটিই পরবর্তী নূতন দুইটি পদে দীর্ঘায়িত করা হইয়াছে।

ধান বুলবুলিতে খাইয়া গিয়া খাজনা দিবার পথ বন্ধ করিয়াছে বলিয়া খাজনা পরিশোধ করিবার যে উপায়ান্তরের সন্ধান করা হইয়াছে, তাহা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। খাজনা দিবার দুর্ভাবনার উপর ভিত্তি করিয়া যে এই ছড়া রচিত হয় নাই, তাহা মূল পাঠটি অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, নূতন দুইটি পদের মধ্যেও এই দুর্ভাবনার কোন ছাপ আসিয়া পড়িতে পারে নাই। সুতরাং খাজনা দেওয়ার সমস্যা নিরূপণ ইহার আদৌ লক্ষ্য নহে। কয়েকটি শব্দ লইয়া একটু মৃদু গুঞ্জন সৃষ্টি করিয়া তাহা দ্বারা শিশুর নিদ্রার একটি কোমল পরিবেশ সৃষ্টি করাই ইহার লক্ষ্য। শেষোক্ত নূতন পদ দুইটির দ্বারা দিয়া ছড়াটির এই বিশেষ গুণটি রক্ষা পাইয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কোন কোন সময় নূতন ছড়ার স্বতন্ত্র পদ বিষয়-নিরপেক্ষভাবে আসিয়া অন্য আর একটি ছড়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। ইহারও দুই একটি ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে, যেমন—

আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গী এল দেশে।
চড়াই পাখী ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।
কিসের মালি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
বরা গাছে ফুল ফুটেছে লক্ষ্মীনারায়ণ।
সাত স্বর্গে সিঁড়ি দিতে রাবণ রাজা মরে।
খোকার মুখে বর্গী নামে যখন ঘুমের ঘোরে।

২৪ পরগণা।

ইহার মধ্যে দেখা যায়, আরও দুইটি পদ আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, তাহাতে দুইটি পদের ছড়াটি ষট্‌পদী হইয়াছে। এই দুইটি পদও স্বতন্ত্র একটি নূতন ছড়া, ইহাও ঘুমপাড়ানি সুরের প্রবাহ অনুসরণ করিয়া মূল ছড়াটির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

'বর্গী এল দেশে' এই মূল ছড়াটির বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলের পাঠ বাঁকুড়া জিলা হইতে এবং পূর্ব প্রান্তবর্তী অঞ্চলের পাঠ চট্টগ্রাম জিলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। যদিও মানভূম কিংবা সাঁওতাল পরগণা অঞ্চল হইতে ইহা সংগৃহীত হয় নাই, তথাপি মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা জিলার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ইহা প্রচলিত থাকা সম্ভব। বর্গীর আক্রমণের সময় কিংবা তাহার পরবর্তী কালে যে সকল পরিবার পশ্চিম বাংলার উপদ্রুত অঞ্চল হইতে জীবনের নিরাপত্তার সন্ধানে পূর্ব বাংলায় চলিয়া গিয়াছিল, তাহারাই সঙ্গে করিয়া এই ছড়াটিও লইয়া গিয়া পূর্ব বাংলায় প্রচার করিয়াছে। পূর্ব বাংলায় বর্গীর আক্রমণ হয় নাই। সেই জন্য বর্গী শব্দটির সঙ্গেও সাধারণ পূর্ববঙ্গবাসীর পরিচয় হয় নাই। সুতরাং ইহা যখন সেখানে প্রচার লাভ করিল, 'বর্গী' শব্দটির বিভীষিকা তাহাদের মধ্যে রক্ষা পাইল না, কিন্তু ইহার দুঃখটি কানে লাগিয়াছিল বলিয়া তাহা রক্ষা পাইয়া গেল। এই ভাবেই

'বর্গী' শব্দটি 'গোরকি'তে পরিণত হইল। 'গোরকি' কোন নূতন শব্দ নহে, বর্গী শব্দেরই ইহা উচ্চারণ বিকৃতি মাত্র। এই ভাবেই 'বুলবুলি'র পরিবর্তে 'ওলওলি' শব্দটিও কোন কোন অঞ্চলে গৃহীত হইয়াছে। তবে বুলবুলি শব্দটি বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচিত, কিন্তু তথাপি ইহার পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি; ইহার কারণ বুলবুলির ধান খাওয়া বিষয়ে আপত্তি।

একজন পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করিয়াছেন, চট্টগ্রামে প্রচলিত ছড়াটিতে যে 'গোকি আইল দেশে' উল্লেখ দেখা যায়, তাহার 'গোকি' শব্দটি আরবি শব্দ, অর্থ প্রদাহ। কিন্তু ছড়ায় অপরিচিত বিদেশী শব্দ কদাচ ব্যবহৃত হয় না। ছড়া শিশুর ভাষা, বিজ্ঞের ভাষা নহে; সুতরাং মুসলমান সমাজেও ছড়ায় অপ্রচলিত আরবী শব্দের কদাচ ব্যবহার হইতে পারে না। কারণ, বাঙ্গালী মৌলভি মৌলানার শিক্ষার ভাষা আরবী হইলেও মুসলমান শিশু কিংবা তাহার জননীর ভাষা সহজ বাংলা; আরবী ভাষায় তাহাদের কিছু মাত্র অধিকার নাই। বিশেষতঃ বর্গী শব্দটির সর্বত্র প্রচলন দেখিয়া এ কথা মনে করা কিছুই অসঙ্গত নয় যে 'গোকি' তাহারই উচ্চারণ বিকৃতি মাত্র। ছড়ায় অনুরূপ নিদর্শনের কিছুমাত্র অভাব নাই।

'বর্গী এল দেশে' ছড়াটির দ্বারা দ্বিরা আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র দুরবোধের অজুহাতে উপর নির্ভর করিয়া বিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া ছড়া সহজেই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার লাভ করিতে পারে। বর্গী সম্পর্কিত কোন প্রকার বাস্তব জ্ঞানের অভাব কিংবা শব্দটির দুর্বোধ্যতা ইহার ব্যাপক প্রচারে কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টাব্দ-উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার মধ্যে লোক-চলাচল যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, চট্টগ্রামে সংগৃহীত বর্গীর আক্রমণ সম্পর্কিত ছড়াটি তাহার বিশেষ একটি প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে। চট্টগ্রামে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে বর্গীর নামও নাই, বুলবুলির নামও নাই, তবে ধানও না দিতে পারার কথা এবং চড়ুইর নাম আছে এবং বুলবুলির স্থলে ধানখা পোকা নামক এক প্রকার শস্যনাশকারী পতঙ্গের উল্লেখ আছে, তথাপি ছড়াটির মধ্যে যে 'বর্গী এল দেশে'র সুরটিই শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

ধান খাইল ধানখা পোকে
গরু খাইল বেঁাকে।
আর বছরের ধানও দিমরু
চড়ইয়ার বউয়ারে॥

সুতরাং ইহাকেও 'বর্গী এল দেশে' শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। এই প্রকার দৃষ্টান্ত অনেক ছড়া দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও দেখা যায় অন্য কোন নূতন ছড়ার বহির্মুখী স্বতন্ত্র রূপের মধ্য দিয়া তাহা বাঁচিয়া আছে। 'আগডুম বাগডুম' ছড়াটি যে 'আইকম্ বাইকম' ছড়াটির মধ্য দিয়া আজিও বাঁচিয়া আছে, তাহা পরে আলোচনা করিব। উপরি উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্য দিয়াও তাহাই হইয়াছে।

মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত এই ছড়ার একটি আধুনিক রূপের মধ্য হইতে বর্গীর নাম লুপ্ত হইয়াছে, তাহার পরিবর্তে তাহাতে নাগরিক জীবনের শিশুর ত্রাস ছেলে ধরার নাম প্রবেশ করিয়াছে—

খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো কানাচে ঐ যে?
ঐ যে বাবা ছেলেধরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।
চোখ দুটো তার তাটার মত গালভরা দাড়ি।
ছেলে ধরা ঝুলি নিয়ে বেড়ায় বাড়ি বাড়ি। মেদিনীপুর।

ইহার মধ্যে আধুনিকতার স্পর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সংহত সমাজ-জীবনের মধ্যে অতি সহজেই যে ছড়াগুলি বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসে মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, নাগরিক জীবনের বিকৃতির জন্য তাহাদের মধ্যে আজ সেই প্রাণশক্তির অভাব দেখা দিয়াছে। মূল ছড়াটি হইতে উদ্ধৃত ছড়াটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল ছড়াটিতে যে একটি নিশ্চিন্ত স্নেহ-কোমল পরিবেশ রচিত হইয়াছে,—বর্গীর উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ইহার বর্ণনা কিংবা চিত্র কোন দিক দিয়াই যেমন ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে নাই, এখানে তাহা দেখা যায় না। শিশুর সম্মুখে ত্রাস সৃষ্টি করাই ইহার লক্ষ্য বলিয়া মনে

হয়। সেইজন্য 'চোখ দুটি তার আটার মত, গাল তথা দাড়ি' এই বর্ণনার ভিতর দিয়া একটি ভয়াবহ চিত্র উপস্থিত করা হইয়াছে। মূল ছড়াটির মধ্যে নদীর উল্লেখ থাকিলেও, তাহা বাস্তব জীবন অনুসরণ করিয়া তাহাতে আসে নাই. সুরের রেশটুকু অনুসরণ করিয়াই আসিয়াছিল। সেইজন্যই তাহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে নাই।

আমাদের ইংরেজী শেখা ও শেখানো।

(মৌখিক স্তর)

॥ অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভৌমিক ॥

(৩)

গুটিকতক প্রয়োজনীয় বাক্য কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শিখিয়ে নিয়ে তারপর সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কথোপকথন বলতে যেন আমরা একটানা অনেকগুলি বাক্য ব্যবহার করার চিন্তা না করি। প্রথম শিক্ষার্থী যদি একটি প্রশ্নের উত্তরে একটি বাক্য বলতে পারে, কিংবা একটি বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, তা হলেই যথেষ্ট বলে করা যেতে পারে।

ছাত্রকে আদেশ দিলে সে যদি মুখে কিছু না বলে আদেশ পালন করে, তা হলে বুঝা যায় সে আদেশটি বুঝেছে; কিন্তু সে যদি কি করল, তা-ও সাথে সাথে বলে, তবে সে আরেকটি বাক্যের সাথে পরিচিত হয় এবং ক্রিয়াটি আরও ভালভাবে বুঝতে পারে যথা—Nabin, open the door.—I am opening the door; নবীন এ ক্ষেত্রে দরজাটি খুলবে এবং সাথে সাথে বলবে। অবশ্য কি বলতে হবে সেটা তাকে আগেই শিখিয়ে নিতে হবে। শিক্ষক নিজে দরজা খুলতে খুলতে বলতে পারেন—I am opening the door। এই ভাবে শিক্ষকের আদেশ পালন করার কালেই ছাত্র কি করছে তা বলবে :—যথা I am opening my book, I am standing, I am sitting, I am running। এ ক্ষেত্রে What are you doing? এই প্রশ্ন করেও ঐ উত্তরগুলি পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু তা হলে প্রশ্নটিকে বাংলায় ব্যাখ্যা করে না দিলে ছেলেদের পক্ষে তার অর্থ বোঝা কঠিন হবে বলে মনে হয়। তার চেয়ে শুধু Present Coutinuous Tense দ্বারা কি কাজ তারা করছে সেটি বলতে পারলেই হবে।

মোটামুটি একে "Do and say" পদ্ধতি বলা যায়। এই ভাবে ছাত্র যা করবে মুখে তা বলবে। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :

Teacher—Jiten, open the door.

Pupil—I am opening the door.

Teacher—Hiren, come to the board.

Pupil—I am coming.

Teacher—Hari, stand up.

Pupil—I am standing.

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম শেখানোর ব্যাপারে Show me your head/hand/eye/nose ইত্যাদি প্রশ্ন করে This is my head/hand/eye/nose ইত্যাদি উত্তর আদায় করা যেতে পারে। শিক্ষক যে

অঙ্গটি দেখাতে বলবেন, নিজে প্রথমে সেই অঙ্গটি মেঝিয়ে দিলে কি দেখাতে হবে বুঝতে ছেলেদের কোন কষ্ট হবে না। সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন প্রশ্নটি একই প্রকারের হবে অর্থাৎ প্রশ্নের গঠনরীতি (structure) একই প্রকারের হবে; নতুবা ছাত্রেরা বুঝতে পারবে না, বাংলা করে সেটিকে বুঝানোর প্রয়োজন হবে।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম যা এইরূপ direct method এ শেখানো যেতে পারে—

arm (arms)	eye (eyes)	heel	shoulder
	face	knee	throat
back	finger (fingers)	leg	thumb
beard	foot (feet)	lip	tooth (teeth)
cheek	forehead	mouth	wrist
chest	hand (hands)	nail (nails)	
chin		neck	
ear (ears)	hair	nose	
elbow	head		

(বস্তুর নাম)

শ্রেণীতে যে সকল বস্তু আছে, সেগুলির নামও এই প্রকার direct methodএ অর্থাৎ মাতৃভাষার সাহায্য না নিয়ে শেখানো যায়। সেখানে প্রশ্নটির রূপ—What is this/that এবং উত্তরটির রূপ—This is a—অথবা That is a ——হবে। হাতের নাগালের মধ্যে যে জিনিষ রয়েছে সেটা বোঝাতে This এবং নাগালের বাইরের জিনিষ বোঝাতে That ব্যবহার করতে হবে।

এই ভাবে chair, table, black board, paper pen, pencil, bench, flower, garden, book, ink প্রভৃতির সাথে পরিচিত করা অর্থাৎ তাদের ইংরেজী নামের সাথে একটি অর্থপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে পরিচিত করা সম্ভব।

Harold E. Palmer তাঁর The Teaching of Oral English হইতে শ্রেণীতে যে সব জিনিষ দেখানো এবং তাদের ইংরেজী নামের সাথে পরিচিত করানো যেতে পারে তার একটা তালিকা দিয়েছেন :—

bag	letter
ball	lid
basket	looking glass
blackboard	map
bell	match
book	nail
bottle	newspaper
box (match box)	pen
brush	pencil
bucket (pail)	picture
button	pin
card	pipe
ceiling	plate
chain	post card
chair	pot
cigarette	ring
clock	room
cork	screw
corner (of room etc)	spoon
cover (of book etc)	stamp
door	stick
drawer	stone
envelope	table
feather	telegram
flag	ticket
floor	tin (can)
flower	tray
fork	umbrella
glass (tumbler)	wall
hole (made in card)	window
key	knife
	leaf

এ ছাড়া আরও অনেক জিনিষ শ্রেণীতে এনে রাখা

যেতে পারে এবং তাদের নামের সাথে পরিচিত করানো যেতে পারে। জিনিষগুলির গায়ে যদি তাদের ইংরেজী নাম লেখা থাকে, তবে বারবার দেখতে দেখতে লেখাগুলির আকৃতির রূপের সাথেও ছেলেরা ক্রমশঃ পরিচিত হবে।

Palmer তাঁর The Teaching of Oral English বইখানিতে ভাষা শিক্ষার তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন—

1. Receiving knowledge
2. Fixing it in the memory by repitition
3. Using the knowledge by real practice

প্রথমে শিক্ষকের মুখ থেকে ছাত্রেরা This is a book এই বাক্যটি শুনল। তারা এই নূতন বাক্যটির সাথে পরিচিত হ'ল, এটিকে গ্রহণ করতে অর্থাৎ শিখতে চেষ্টা করল। শিক্ষক অনুরূপ আরও অনেকগুলি বাক্য বললেন—

This is a table
This is a chair
This is a man ইত্যাদি

ছাত্রেরা This is a···এই sentence patternএর সাথে পরিচিত হ'ল এবং এর সঙ্গে কোন একটি বস্তু বা ব্যক্তির নাম যোগ করে দিলেই (book, table, chair, man, cow ইত্যাদি) যে সেই বস্তু বা ব্যক্তিকে বিশেষ ভাবে বোঝা গেল সেটা ধরতে পারল। দ্বিতীয় স্তরে—নূতন বাক্‌রীতিটি মনে রাখার ব্যাপার এবং নূতন নূতন ক্ষেত্রে ছাত্র যদি অর্জিত বিদ্যার পরিচয় দিতে পারে, তবে শেখাটা আর এক ধাপ অগ্রসর হ'ল। এখানেও শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। তিনি হয়তো বলবেন—

This is a chair
What's this ?
(Answer) It's a chair.
This is a table.
What's this ?
(Answer) It's a table.

তৃতীয় স্তরে—ছাত্র তার অর্জিত বিদ্যার পরিপূর্ণ ফল লাভ করবে যদি সে নিজের চেষ্টায় এখন নূতন নূতন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে পারে এবং অন্যকেও শেখাতে বা শিখতে সাহায্য করে। ছাত্র শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে বলতে পারে এবং অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারে—

This is a chair.
What's this ? (Pupil A asks pupil B)
(B answers) It's a chair.

এ পর্যন্ত ব্যবহৃত sentenceগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে কতকগুলির পৃথক পৃথক অর্থ নিতান্ত গৌণ, কোন একটি বাক্যের গঠন-কার্য্যের তারা ইট-কাঠ মাত্র। এগুলি বলা যেতে পারে structural words—উদাহরণ—

Ths is a/book
This is a/pen
This is a /pencil

This, is, a এই শব্দগুলি বাক্য গঠনের জন্য প্রয়োজন বটে, কিন্তু অর্থের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ নয়। প্রথম বাক্যটির প্রধান শব্দ book, দ্বিতীয়টির pen, তৃতীয়টির pencil। এদের বুঝবার জন্যই This is a এই তিনটি অপ্রধান শব্দের প্রয়োজন হয়েছে। ওদের যদি বলি structure words, book pen, pencil-কে বলব content words। ওদের যদি বলি ইট-কাঠ, এদের বলব সিমেন্ট।

'Is this a / desk ? Yes, it is.
Is this a / ruler ? Yes, it is.
Is this a / pencil ? Yes, it is.

উপরের তিনটি sentenceএ Is this a···Is, this, a-কে বলতে পারি structural words, আর desk, ruler, pencil কে বলব content words.

A.W. Frieby তাঁর Teaching English বইতে sentence structure-এর পারম্পর্য্য রক্ষার ব্যাপারে শিক্ষককে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলেছেন। Sentence বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি শব্দের বিশেষ স্থানে

অবস্থানের দ্বারা একটি অর্থ-সঙ্গতি। শব্দের স্থান-পরিবর্তনের সাথে যে অর্থেরও পরিবর্তন হতে থাকে এ উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে—tiger killed a boy ও a boy killed a tiger, he is coming এবং is he coming প্রভৃতি উদাহরণ।

ইংরেজী sentence-কে ভাগ করলে দেখা যাবে মোটামুটি তিন রকমের প্যাটার্ণ আছে—

1. Statement pattern
2. Question pattern
3. Request or command pattern.

প্রথম জাতীয় বাক্যে কোন একটি অস্তিবাচক বা নেতিবাচক ঘটনার উল্লেখ করা হয় মাত্র; I am the monarch of all I survery; I saw a snake when I was coming to school; I don't care what he says of me: The book is on the table. Ram came late.

দ্বিতীয় প্রকার বাক্যে প্রশ্ন করা হয়—

Is this a book?
Will you go to Calcutta...?
Are you coming to the show?
Whose book is this?

তৃতীয় প্রকার বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, নিষেধাজ্ঞা, ধমকানি ইত্যাদি বুঝায়:

Shut up!
Get out of the room!
Please let me have a look at your paper.
Give me a glass of water, please.

Frisby প্রথম সাত সপ্তাহের জন্য নিম্নলিখিত ৭টি sentence pattern দিয়ে শুরু করতে বলেছেন—

1st Lesson Unit

Sentence Pattern	Content words (vocabulary)
That is a	book, pencil, chair, ruler, desk etc.

2nd Lesson Unit

These are	books, pencils, chairs, etc.
Those are	

3rd Lesson Unit

Yes, it is a book, watch pen, pencil

Is that...? Yes, it is a

and plurals

4th Lesson Unit

What is this? It is a	basket, ball, black-board etc.
What are these? They're	books, pencils, toys, dolls etc.
What are those? They are	

5th Lesson Unit

A complete revision upto date

6th Lesson Unit

you, he, she, boy, girl and names.

He is
She is
and shortened forms

7th Lesson Unit

I am	Teacher, Mr.
We are	boys,
You are	girls, pupils
They are	

এই তিন প্রকার sentence pattern কে বাড়িয়ে সাত প্রকার করা যায়—

(a) I/saw
I/stand up

You/will go home
The book/is on the table

উপরের sentenceগুলির দুটি প্রধান অংশ।

(b) He/is/a/boy
We/played/football
One of us/will do/this

উপরের sentenceগুলির তিনটি প্রধান অংশ।

(c) He/gave/me/a book
Mother/told/me/a story

এই sentenceগুলির চারিটি প্রধান অংশ।

(d) There was a king.
There is a book on the table
There are six boys in the room

এই জাতীয় sentence There দিয়ে আরম্ভ করা হয়।

(e) Is he coming ?
Did he go to Calcutta ?
Will you come in the evening ?

এই জাতীয় sentenceএ auxiliary (সাহায্যকারী) verb-টি sentenceএর প্রথমে বসে।

(f) When did you come ?
What is this ?

এই জাতীয় sentence একটি প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে আরম্ভ হয়।

(g) Stand up
Come/here please

এই জাতীয় sentence-এ আদেশ, অনুরোধ প্রভৃতি বুঝানো যায়।

যে কোন sentence pattern শেখানোর ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য্য। সাধারণতঃ নূতন কোন pattern শেখাতে গেলে শিক্ষককে কিছু বলতে এবং করতে হবে। প্রথমেই প্রশ্ন করলে প্রশ্নটিও ছাত্রের কাছে দুর্বোধ্য হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং যে sentence patternটি শেখানো হবে তার মহড়া দিতে হবে একাধিকবার। যেমন শেখাতে হবে—This is a... এই sentenceটি। শিক্ষককে এ ক্ষেত্রে একটি পেন্সিল দেখিয়ে বলতে হবে—This is a pencil, পরে আবার একটি বল দেখিয়ে বলতে হবে—This is a ball. এই রকম তিন চারটি পরিচিত বস্তু (chair, table, desk ইত্যাদি) দেখিয়ে তিনি পরপর তাদের সম্বন্ধে This is a chair/table/desk ইত্যাদি বলে যাবেন।

তারপর তিনি প্রশ্নের অবতারণা করবেন—What is this ? It is a chair. এই উত্তরটিও তিনি নিজেই দেবেন। অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও তিনি প্রশ্ন করবেন এবং তিনিই উত্তর দিবেন।

এই বার তিনি এক একটি বস্তু দেখিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন—What is this ? ছাত্রদের উত্তর দিতে অসুবিধা হলে তিনিই উত্তরটি দিবেন এবং ছাত্রদের ঠিক উত্তরটি বলতে সাহায্য করবেন। এই ভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নূতন নূতন structure শেখাতে হবে। একটু অগ্রসর হলে ছাত্রদের একই সাথে দু'তিনটি প্রশ্ন-সূচক structure শেখানো সম্ভব হবে।

Is this a pencil ? Yes, it is.
Is this a pen ? No, it is not.
What is this ? It is a pencil.

ক্রমশঃ

আরণ্যক

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

বিখ্যাত শিকারী জিম্ করবেট্ তাঁর জীবনের অনেকখানি সময় নৈনিতাল পাহাড়ে কাটিয়ে গেছেন। রাণীখেতের কাছে তাঁর একটি নিজস্ব বাংলো ছিল। তিনি ওই অঞ্চলের দরিদ্র সাধারণ অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। ভারতের মাটিকে করবেট্ ভালো বেসেছিলেন বলেই বারবার ভারতের প্রসঙ্গে "মাই ইণ্ডিয়া" বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের অশিক্ষিত নিরক্ষর অতি দরিদ্র মানুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা যে কত গভীর ছিল তা'র পরিচয় তাঁর লেখা থেকেই পাওয়া যায়—"In my India, the India I know, there are four hundred million people, ninety per cent of whom are simple, honest, brave, loyal, hardworking souls .....among whom I have lived and whom I love....."

করবেট্ যে কত বড় শিকারী ছিলেন তার পরিচয় বিস্তৃত পাওয়া যায় তাঁর "ম্যান ইটার্স অব্ কুমায়ুন" গ্রন্থে। কিন্তু মানুষ হিসেবেও তিনি যে মহৎ ও হৃদয়বান ছিলেন তার পরিচয় আমাদের কাছে খুব বেশী ধরা নেই। তবে নৈনিতালের পাহাড়ী অধিবাসীদের কাছে একদা "জিম্ করবেট" নামটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। করবেট্ শিকারী ছিলেন, কিন্তু সাধারণ অর্থে নয়। অর্থাৎ অকারণ নিছক আনন্দের জন্য পশু হত্যা তাঁর নীতির বিরুদ্ধে ছিল। "ম্যান ইটার" বলে চিহ্নিত হ'লে তবে তিনি সেই বাঘটির ওপরে তাঁর রাইফেল তুলতেন। আর বাঘ শিকারে যাওয়ার সময় করবেট সঙ্গে লোকজন নেওয়া পছন্দ করতেন না। একটি ·২৭৫ বোরের রাইফেল ও পাঁচটি মাত্র বুলেট সঙ্গে নিয়ে তিনি অভিযানে বেরোতেন।

করবেট্ অরণ্যচারী ছিলেন। অর্থাৎ আরণ্যক জগৎকে তিনি ভালোবাসতেন এবং অরণ্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি মনে করতেন যে অরণ্যের পশু সভ্যজগতের মানুষের তুলনায় মহৎ ও হৃদয়বান। তাঁর ডায়েরি My India থেকে একটি ছোট্ট ঘটনা তুলে দিচ্ছি যার থেকে তাঁর ধারণাকে বোঝা সহজ হ'তে পারে।

• • •

রাণীখেতের কাছাকাছি গ্রাম কালাধুঙ্গি। কালাধুঙ্গি প্রায় জঙ্গলের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। এর সংলগ্ন যে বন, সে বনে আমি একদা বাঘের সন্ধানে ঘুরেছিলাম। আমার যতদূর জানা আছে সেই সময়ে এই বনটাতে পাঁচটি বাঘ, আটটি চিতা ও গোটা চারেক ভালুক অন্ততঃ বাস করতো। অবশ্য মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে হিমালয়ান ভল্লুক নেমে আসতো। মাইল চার পাঁচ দূরে হারেনাদের একটা আড্ডা ছিল। রাত্রের দিকে খাদ্যের খোঁজে হারেনাও হানা দিতো। এ ছাড়া পাইথন, নানা ধরণের বিষাক্ত সাপ, বনবেড়াল, বাঁদর হরিণ এ সব ছিলই।

কালাধুঙ্গিতে সেই সময়ে কাজ করতে এসে বাসা পাতলো একেবারে তরুণ একজোড়া স্বামী-স্ত্রী—হর কোয়ার ও কুন্তী। ওদের দুটি বাচ্চাও ছিল। নাম পুতলি ও পুণ্য। হর কোয়ার রাজমিস্ত্রীর কাজ করে দিন আটআনা মজুরি পেত। আর কুন্তী কখনও মুদির কাজ করত কখনও জঙ্গল থেকে ঘাস কেটে এনে বিক্রী করতো। তার রোজগার ছিল তিন আনা বা চার আনা। সকালে খাওয়া দাওয়ার পর দুজনেই বেরিয়ে যেতো। দু'বছরের পুতলি আর তিন বছরের পুণ্য একাই থাকতো ঘরে। তবে পাশের একটা বুড়ি ওদের ওপর চোখ

রাখতো। সন্ধ্যের সময় স্বামী স্ত্রী যখন ফিরে আসতো তখন এই বাচ্চা দুটো ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে আসতো মা বাপের কাছে।

প্রত্যেক শুক্রবার গ্রামে হাট বসতো। হাটের দিন বাজারে ছোটখাট একটা মেলা বসে যেত। একদিন এক শুক্রবারে হরকোয়ার আর কুন্তী একেবারে বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে যখন তাদের কুঁড়ে ঘরে এসে পৌঁছলো, তখন প্রায় সন্ধ্যে উত্তীর্ণ। ওরা এসেই চারিদিকে চাইতে লাগলো। কিন্তু পুতলি বা পুণ্য কোথাও নেই। পাশের বাড়ীর বুড়িটাকে জিজ্ঞেস করাতে সে জানালো যে দুপুর থেকেই ছেলে দুটোকে দেখা যাচ্ছেনা।

ওরা ভাবলো হয়ত খেলার ঝোঁকে বাজারের দিকে গেছে ছেলে দুটো। তারপর সেই সারাদিন অসুক থেকে যারা বাড়ী ফিরেছে তারা খুঁজতে বেরোলো তাদের ছেলেমেয়েকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'চারজন লোক সেই গ্রাম ও আশেপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে খোঁজ করলো। শেষে হতাশ হ'য়ে কাছাকাছি পুলিশ ফাঁড়িতে ডায়েরি করলো। দুটি শিশু যেন ভোজবাজির মত নিখোঁজ হ'য়ে গেল। তাদেরকে আর পাওয়া গেল না।

পরের দিন শনিবার ওরা আটাশ মাইল ঘুরে রামনগর পর্য্যন্ত ঘুরে এলো। রবিবারও সারাদিন ধ'রে খোঁজা-খুঁজি। কেউ বললো—এ ছেলেধরার কাজ। কেউ বললো—নিশ্চয়ই নেকড়ে কিম্বা হায়েনায় টেনে নিয়ে গিয়েছে। শুধু ওদের মা আর বাবা কখনও অপরিসীম আশায় চারিদিক তোলপাড় করতে লাগলো, কখনও বা শ্রান্ত হ'য়ে বসে রইলো।

অবশেষে হরকোয়ার আর কুন্তী নিরাশায় ভেঙে পড়লো। না খেয়ে সেই দু'জন ঘরের মেজেতে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে শুধু ভগবানকে ডাকতে লাগলো।

সোমবারের দিন একটি রাখাল একদল মোষ নিয়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরে আসছিল। তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় বাঘের ভয়। লোকটি মোষের দলের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ তার মনে হলো, তার সামনের মোষগুলো একটা জায়গায় থমকে দাঁড়াচ্ছে আর চারদিকে চাইছে। তারপর আবার হাঁটছে। লোকটি সেই জায়গাতে এসে চারদিকে চেয়ে যা দেখলো তাতে তার বিস্ময়ের সীমা রইলো না।

একটু ফাঁকা জায়গাতে দুটি শিশু পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে নিসাড় হয়ে প'ড়ে আছে। লোকটি হরকোয়ার ও কুন্তীর শিশু দুটির কথা শুনেছিল। কাজেই তার সন্দেহ রইলো না যে এরাই তারা। কিন্তু কে তাদের এখানে মেরে রেখে গেছে? এত নৃশংস কে হতে পারে?

লোকটি শিশু দুটির সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো। তাদের নগ্ন বুকে হাত দিয়ে মনে হলো—না, হয়ত মৃত নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে শিশুদুটিকে কাঁধে তুলে নিল; তারপর দ্রুত এগিয়ে চললো গ্রামের দিকে।

সে যখন গ্রামে পৌঁছলো তখন চারদিকে হৈ হৈ রব উঠলো। হর কোয়ার ও কুন্তী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো তাদের বাচ্চাদুটিকে। আর গরম দুধ খেয়ে সুস্থ হ'য়ে পুণ্য বললো—দুজনে খেলতে খেলতে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। তারপর পথ হারায়।

একজনের বয়েস দুই, আর একজনের তিন। তারা হারিয়েছিল শুক্রবার। খুঁজে পাওয়া গেল সোমবার। এই তিন দিন তারা গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেছে বা পড়ে থেকেছে। তাদের সামনে যে কোন হিংস্র প্রাণী আসেনি—এ কথা অবিশ্বাস্য। অন্ততঃ ওই বনপথে তারা নিশ্চয়ই বাঘ ভালুক বা নেকড়ের মুখোমুখী হয়েছে। অথচ তাদের দেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। অক্ষত দেহেই শিশুদুটি ফিরে এসেছে।

আমি একবার একটি বাঘিনীকে—একটা বাচ্চা ছাগল-ছানার কাছে এগিয়ে যেতে দেখে ছিলাম। মনের সেই অংশটা বেশ পরিষ্কার ছিল। ছাগল ছানাটি বাঘিনীটিকে দেখে ভাবতে আরম্ভ করলো। বাঘিনীটি যখন তার সামনে তখন সে নিজেই এগিয়ে গিয়ে বাঘিনীর মুখের সামনে তার কচি কোমল ঘাড়টি বাড়িয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত···ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তগুলি। দেখা গেল

বাঘিনী নাক বাড়িয়ে শিশু ছাগলের দেহের ঘ্রাণ গ্রহণ করছে। তারপর অরণ্যের রাণী ছাগল শিশুকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে গেল অরণ্যে।

গত মহাযুদ্ধের শেষে বিজয় পক্ষের কোন ব্যক্তি বলেছিলেন—যুদ্ধরত মানুষেরা এখন ব্যবহারে অরণ্যের পশুর মত জঘন্য হয়ে উঠেছে। আমি তাঁর কথার অর্থকে সমর্থন করি না। মানুষের সমাজ যদি আজ আরণ্যক সমাজের মত হতো তাহলে এই নৃশংস যুদ্ধ বিগ্রহ কোনদিনই সৃষ্টি হতে পারতো না। অরণ্যে শক্তিশালী অন্য দুর্বলতর অন্যের প্রতি যে অনুকম্পা প্রদর্শন করে সভ্যজগতের মানুষ তা করে না। অরণ্যের অধিবাসীরা অকারণে হত্যা করতে এগোয় না। কিন্তু সভ্য মানুষ বিনা কারণে আর একজন মানুষকে হত্যা করতে পারে।

প্রাচীন ভারতের আন্তর্জাতিক আইন

॥ অধ্যাপক রেজাউল করীম ॥

যে সব আইন বিধি ব্যবস্থার দ্বারা বিভিন্ন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহাই আন্তর্জাতিক আইন। কতকগুলি নিয়ম, আদর্শ, প্রথা বা রীতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এইগুলি বিভিন্ন রাজ্য মোটামুটি ভাবে মানিয়া চলে ও সকলের দ্বারা স্বীকৃত হয়। কি যুদ্ধের সময় কি শান্তির সময় সকল অবস্থাতেই এই আইনগুলি অত্যন্ত কার্যকরী। বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে ইউ, এন, ও বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক আইনের বলেই জগতে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। আধুনিক যুগে নিখিল বিশ্বের সকল জাতিই ইহার দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হইতেছে।

আন্তর্জাতিক আইন সাম্প্রতিক কালে যতটা ব্যাপক হইয়াছে অতীত কালে সেরূপ ছিল না। প্রাচীন যুগে এমন এক সময় ছিল যখন কোন প্রকার আন্তর্জাতিক আইনের অস্তিত্ব ছিল না। জোর যার মুলুক তার এই নীতিই তখন প্রবল ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কতকগুলি রীতি বা প্রথার সৃষ্টি করিল যাহা বিভিন্ন রাজ্য নিজেদের স্বার্থের জন্য স্বীকার করিল। শত শত বৎসর লাগিয়াছে মানুষের এই বোধশক্তি জাগ্রত হইতে। ভারতবর্ষ কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে কতকগুলি বিধি বা প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা কতকটা আজিকার যুগের আন্তর্জাতিক আইনের মত। প্রাচীন ভারত সচেতনভাবে আন্তর্জাতিক আইনের মূল নীতি রচনা করিয়াছে। ভারতের সেই গৌরবময় যুগের আন্তর্জাতিক আইন আধুনিক যুগের আইনের মত অতটা উন্নত নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ও এশিয়া ইউরোপের কোথাও যখন আন্তর্জাতিক আইনের অস্তিত্ব ছিল না তখন ভারতবর্ষে তাহার গোড়ার পত্তন হইয়াছে। ভারতের সেই অতীত যুগের দীর্ঘ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা হইতে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, সে যুগে কত সুষ্ঠুভাবে আন্তর্জাতিক আইনের মূল নীতিটা রচিত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক আইনের কতকগুলি সর্ত আছে—প্রথমেই থাকা চাই কতকগুলি স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য, যাহার উপর বাহিরের কোন

শক্তির কোনও প্রকার প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব থাকিবে না। প্রতিটি রাজ্য হইতেছে আন্তর্জাতিক আইনের 'ব্যক্তি'। এই প্রকার একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সংসর্গ থাকিবে। তাহারা পত্রালাপের মধ্যে নিজেদের সুবিধা অসুবিধা লইয়া আলোচনা করিবে। এই ধরণের আইন এক দিনে গড়িয়া উঠে না। ক্রমাগত নানা কারণে ইহা প্রসারিত হইতে থাকে। এই আইন কোন দেশের বিধান পরিষদে বা মন্ত্রী পরিষদে গৃহীত আইনের মত নহে। ইহার মধ্যে বাধ্য বাধকতা নাই। তবুও প্রথা বা রীতি অনুসারে বিভিন্ন দেশ ইহা মানিয়া চলে। যেখানেই একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য থাকে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, অথবা অবস্থার পাক চক্রে পড়িয়া হোক সেখানেই আন্তর্জাতিক আইন দানা বাঁধে। যাহারা এই আইন স্বীকার করে তাহারা পরস্পরের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে।

দেখা যাক, এই মানদণ্ড অনুসারে প্রাচীন ভারতে কোন আন্তর্জাতিক বিধি ব্যবস্থা ছিল কি না। ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে যে সব বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য ছিল তাহারা একই ধর্মভুক্ত হইলেও স্বতন্ত্র হইয়া থাকিত এবং স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাজ্য গঠন করিয়াছিল।

আর সেই জন্য এই সব স্বাধীন রাজ্যগুলি পরস্পরের সহিত সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে লাগিল। তখন স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি রীতি-নীতি, পদ্ধতি ও পলিসি গঠিত হইতে লাগিল যাহা কাহারও সার্বভৌমত্ব নষ্ট না করিয়াও এক রাজ্যের সহিত অন্য রাজ্যের একটা সম্পর্ক স্থাপন করিল। এই উদ্দেশ্যে যে সব বিধি রচিত ও স্বীকৃত হয় তাহাকেই বলিব আন্তর্জাতিক আইন বা বিধি। এই ধরণের আইন বা বিধি প্রাচীন ভারতে ছিল, যদিও তাহা এ যুগের বিধির মত অতটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় নাগরিক অধিকারের কথা। প্রাচীন ভারতে নাগরিকদের অধিকার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ছিল। কৌটিল্যের মতে স্বদেশীয় অধিবাসীদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার ছিল। তাহারা যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন তাহাদের আত্মজন বলা হইত। এবং বাহিরের অর্থাৎ বিদেশের লোক কোন রাজ্যে বাস করিলে তাহাকে পরদেশীয় বা পরজন বলা হইত। এই পরদেশীয় বা পরজনগণকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত, তবেই তাহারা নাগরিকের অধিকার পাইত। দেশের জন সংখ্যা কম ছিল। সুতরাং নানা ভাবে বিদেশের লোককে স্বদেশে ডাকিয়া আনা হইত। পরে তাহাদিগকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইত। পরদেশের লোকগণ যখন কোন দেশের নাগরিক হইত তখন রাজা তাদেরকে বিশেষ রাজাজ্ঞা দ্বারা নাগরিক করিয়া লইতেন। ভিন্ন দেশের পথিক, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক, তাপস, বণিক প্রভৃতি দেশে বসবাস করিতে চাহিলে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ভার-প্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট আবেদন করিতে হইত। তারপর তাদের কথা বিবেচনা করিয়া তাদেরকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইত।

একথা সর্বজন সত্য যে সে যুগে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। সুতরাং যুদ্ধের কতকগুলি বিধি রচিত হইয়াছিল। কোন্ প্রকারের যুদ্ধ যথার্থ ও কোন্ প্রকারের যুদ্ধ অযথার্থ সে সম্বন্ধেও প্রাচীন ভারতে স্পষ্ট ধারণা ছিল। যুদ্ধকে প্রাচীন ভারত অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। মহাভারতের শান্তি পর্বে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ ও নরহত্যার দ্বারা যে জয় লাভ হয় তাহাকে গৌরবের বিষয় বলা হয় নাই। মহাভারতের শান্তি পর্ব হইতে জানা যায় যে অনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধকে কবি কঠোর ভাবে নিন্দা করিয়াছেন। প্রথম যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধেও কবি সচেতন ছিলেন। যুদ্ধকে নিন্দা করিলেও প্রাচীন ভারত যুদ্ধের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে নাই। ভারতের মনীষীরা বুঝিয়াছিলেন যে যতই নীতি উপদেশ দেওয়া যাক না কেন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হইবেই। তাই তাহারা উচ্চতর মানবতার আবেদন দ্বারা যুদ্ধকে কম নৃশংস, কম ভয়াবহ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এমন সব বিধি নিষেধ রচনা করিয়াছেন যাহার ফলে যুদ্ধটা বহুলাংশে

নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। তাঁহারা সকল শ্রেণীর যোদ্ধার জন্য কতকগুলি নীতি ও আদর্শ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সে যুগের মনীষীরা বুঝিয়াছিলেন, যে কোন কারণেই হোক, যুদ্ধ অপরিহার্য্য। তাঁহারা আরও বুঝিয়াছিলেন যে নানা অবিচার ও অন্যায় দমন করিবার জন্য এবং রাজ্য রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে। তাই তাঁহারা নির্দ্দেশ দিলেন যে ক্ষত্রিয়কে যথার্থ যুদ্ধ করিতে হইবে এবং সর্ব্ব প্রযত্নে অযথার্থ যুদ্ধ পরিহার করিতে হইবে। আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক আইনএর পণ্ডিত গ্রোট (Grote, just war and unjust war-এর মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছেন প্রাচীন যুগের ভারতের স্মৃতী মণ্ডলীও সেই পার্থক্য করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা বলিতে পারি যে আধুনিক যুগে যে আন্তর্জাতিক আইন রচিত হইয়াছে ভারতের রচিত আইন তাহার পূর্ব্বগামী। তাঁহারা বহু পূর্ব্বে যুদ্ধকে মানবোচিত আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের মনীষীগণ যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারেও যুক্তি ও মানবত্বের উপর ভিত্তি করিয়া বিধি রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের একটা উদার আন্তর্জাতিক আদর্শদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক মর্য্যাদা (political status) কিরূপ ছিল তাহা এবার দেখা যাক। ভৌগোলিক দিক দিয়া ভারতবর্ষ ছিল অখণ্ড। তবুও রাজনৈতিক দিক দিয়া এই ভারত বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কোথাও ছিল রাজতন্ত্র, কোথাও ছিল অভিজাততন্ত্র আবার কোথাও ছিল গণতন্ত্র। শাসন ব্যবস্থা যে রূপই থাকুক না কেন, প্রত্যেক রাজ্যের ছিল স্বাধীনতা, ছিল শক্তি ও ক্ষমতা, আর ছিল রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব। রাজ্য শাসনের ভার ছিল এমন সব লোকের হাতে যাহারা এই কার্য্যে ছিলেন দায়দর্শী ও বিশেষজ্ঞ।

প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ রাজাই ছিলেন সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং এক দেশের রাজা যখন অন্য দেশের রাজার সহিত পরস্পরের স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া ভাবের আদান প্রদান করিতেন তখন তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দুটি রাজ্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনই করিতেন। ইহা দুজন ব্যক্তির মধ্যে আলাপ আলোচনা নহে। এক্ষেত্রে রাজারা তাঁহাদের প্রজাদেরই প্রতিনিধিত্ব করিতেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে অধিকাংশ রাজা সার্ব্বভৌম কর্তৃত্বের উপর দাঁড়াইয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিতেন।

যে সব নীতি বা বিধি রাজাদের সম্পর্কের নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করিত তাহা অনুন্নত অবস্থার আন্তর্জাতিক নীতি বা বিধি। সে যুগের রাজারা 'ধর্ম্মের' বিধি মানিয়া চলিতেন। কিন্তু এই 'ধর্ম্ম' শব্দটা ইংরাজি Religion অর্থে ব্যবহৃত হইত না। 'ধর্ম্ম' এমন একটা বিধি যাহার মধ্যে নিহিত আছে, নীতি, সত্যপালন, শাসনসৌকর্য্য, প্রজাপালন, বন্ধুরক্ষা, প্রতিশ্রুতিপালন ইত্যাকার সদ্‌গুণ। এই ধর্ম্মের অধীনটি রাজা প্রজা সকলেই স্বীকার করিতেন। সে যুগে হিন্দু-রাজ্যের আসল সার্ব্বভৌম শক্তি ছিল ধর্ম্ম। রাজারা তাহাদের ক্ষমতার উপরে এই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বকে মানিয়া লইতেন। ধর্ম্মের নির্দ্দেশটা সকলের উপর বাধ্যতামূলক ছিল। কি শান্তির সময়, কি যুদ্ধের সময় এই সব সর্ব্বজন-স্বীকৃত ধর্ম্মনীতিগুলি অমান্য করিলে দণ্ডভোগ করিতে হইত। সে দণ্ড এই ভাবে দেওয়া হইত—যাহারা অমান্য করিত, তাহারা সামাজিক দিক দিয়া পরিত্যক্ত ও অপাংক্তেয় হইত অথবা ধর্ম্মের দ্বারা নিন্দিত ও ধিক্কৃত হইত। আন্তর রাজ্য ও আন্তর্জাতিক বিধিগুলিকে সাধারণত মান্য করা হইত ও রক্ষা করা হইত। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উহা ভাবে একটা যোগা-যোগ ছিল যে তাহারা পরস্পরের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে রক্ষা করিয়া চলিবেন। ধর্ম্ম যে সব নীতি বাঁধিয়া দিয়াছিল সেগুলিকে মানিয়া চলা হইত। বৃহত্তর ধর্ম্মাদর্শের অনুরোধে এই যে সব বিধি নিষেধ মানিয়া চলা হইত তাহাই হইতেছে আন্তর্জাতিক আইনের মূল ভিত্তি। কখন কখন এই ধর্ম্মনীতি অমান্য করা হইত। কিন্তু যে অমান্য করিত তাহার আচরণের ঘোর নিন্দা করাও হইত।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন

কর্ণের রথ কর্দ্দমে বসিয়া গিয়াছিল তখন তিনি অর্জ্জুনকে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই ঘটনা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে প্রাচীনকালে বীর যোদ্ধাদের নিকট আশা করা হইত যে তাঁহারা যুদ্ধের সাধারণ নীতি ও বিধি মানিয়া চলিবেন। কর্ণের অনুরোধ অর্জ্জুন রক্ষা করিলেন না। তাহাতে কর্ণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন যে তিনি বীরোচিত কাজ করেন নাই এবং যুদ্ধের পবিত্র বিধি অমান্য করিয়াছেন। কর্ণ যে অর্জ্জুনকে ভর্ৎসনা করিলেন তাহা এই ধারণার জন্য যে, প্রত্যেক যোদ্ধাকে যুদ্ধের পবিত্র বিধি মানিয়া চলিতে হইবে। অর্জ্জুনের মত মহান যোদ্ধাও যদি সে বিধি অমান্য করেন তবে তিনিও নিস্তার হাত হইতে রক্ষা পাইবেন না। কর্ণ অবাক হইয়া ভাবিলেন অর্জ্জুন কেন এই সর্ব্বজন-গ্রাহ্য বিধি অমান্য করিতে গেলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন ভারতে দু-একটা ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ব্যতীত সার্ব্বজনীনভাবে যুদ্ধের কতকগুলি নীতি ও বিধি মান্য করা হইত।

মহাভারত হইতে জানা যায় যে কুরু পাণ্ডবদের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ভারতের বহু রাজা দুই দলের কোন না কোনটিতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব ছিল। দরকার হইলে এক রাজা অপর দেশের রাজার সাহায্যে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। আরও দু তিনটি উপায়ে বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ এই সব বিরাট রাজোচিত ব্যাপার রাজাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্বকে ত্বরান্বিত করিত। এই সব ঘটনা প্রমাণ করে যে সে যুগের রাজারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতেন না বরং পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনে সকল আগ্রহান্বিত ছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের মধ্যে এই যে মেলামেশা, ইহা কেবল হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এই প্রকার মেলামেশার ব্যাপারে অপর দেশের অন্য ধর্মাবলম্বী রাজারাও আনন্দে অংশ গ্রহণ করিতেন। এ রকম মেলামেশা হইতে আরও নানা প্রকার রাজনৈতিক সম্পর্কও স্থাপিত হইত। এই সব সম্পর্কগুলি আন্তর্জাতিক বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। এই ভাবে উক্ত আইন নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ও প্রসারিত হইল। ভারতের বাহিরের রাজ্যের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল বহু। এই সব যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন গঠন করিতে সাহায্য করিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ বহু দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। এই বিদেশী রাজার অভিযান ভারতের উপর বহু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রীকসম্রাটের বিরাট সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ইহার পরেই প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বিদেশের সহিত এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষ নিজের দেশের নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু অতঃপর এই বিচ্ছিন্ন ভাব কাটিয়া গেল। ভারত ইহার পর হইতে গ্রীক-জগৎ-সভার একটি প্রধান সদস্য হইয়া পড়িল।

আন্তর্জাতিক আইনের আর একটি অপরিহার্য্য পরিণতি হইতেছে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দূত বিনিময়। প্রাচীন ভারতবর্ষে দূত বিনিময় হইত। দূতের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাও হইয়াছে। দূত যখন কোন পররাজ্যে দৌত্যবৃত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন তখন তিনি নিজ রাজ্যের রাজার নিকট হইতে 'শাসন' পত্র লইয়া পররাজ্যের রাজাকে দেখাইতেন। বর্ত্তমান যুগে যাহাকে বলে 'credential', 'শাসন পত্র'টাও সেই রূপ ছিল। দৌত্য কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দূতগণ পররাজ্যের উচ্চপদস্থ সচিব ও কর্ম্মচারীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। পররাজ্যের সীমানায় ভারপ্রাপ্ত অফিসার, নগর ও গ্রামের অফিসার, বন-জঙ্গলের অফিসার ইহাদের সহিত দূত সখ্যতার ভাব স্থাপন করিতেন। দূত সব সময় দৃষ্টি রাখিতেন কেমন করিয়া পররাজ্যের গুপ্ত বিষয়গুলি জানিয়া লইবেন। পর রাজ্যের দুর্ব্বল স্থান কোথায় আর শক্তির কেন্দ্রই বা কি, এসবও তিনি কৌশলে জানিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। ইহা অবশ্য একতরফা ব্যাপার ছিল না। দূতের নিজের রাজ্যেও অপর দেশের দূত থাকিতেন। তিনিও এই ভাবে বিবিধ সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দৌত্য-প্রথার ফলে প্রত্যেক

রাজ্যের কিছু কিছু গোপন কথা অন্য রাজ্যের কর্তৃপক্ষ জানিয়া লইতেন। তাই বলিয়া কোন দেশই দূত বিনিময় প্রথা বন্ধ করেন নাই। কৌটিল্য বলেন যে, দূতকে সকল সময় অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হইবে।

সে যুগে দূত বিনিময় যেমন হইত, তেমনি প্রয়োজন হইলে দূতকে প্রত্যাহার করিয়া লইবার ব্যবস্থাও ছিল। কি কি কারণে দূতকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বলা হইত কৌটিল্য তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করিতেছি—

১। যে মিশন বা দায়িত্ব পালন করিবার জন্য পর-দেশে দূত প্রেরিত হইতেন, তাহা পূর্ণ হইলে দূতকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বলা হইত।

২। যে দেশে কৌত্যগিরি করিবার জন্য দূত প্রেরিত হইতেন যদি সে দেশে তিনি সম্ভ্যবহারের অভাব বোধ করিতেন অথবা যদি অন্য কোন কারণে উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইত, তবে দূতকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত।

৩। দূত যদি প্রেরিত রাজ্যের রাজার সন্দেহভাজন হইয়া পড়িতেন অথবা দূতের আচরণে অসন্তুষ্ট হইতেন তবে তিনি নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

৪। রাজার মৃত্যুর পর দূত পরিবর্তন হইত। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—রাজা হর্ষবর্ধনের দরবারে চীন-রাজ্যের একজন দূত থাকিতেন। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর এই দূতকে চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

৫। সর্বশেষ কারণ এই যে যদি দুটি রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হইত তবে দূতকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত।

প্রাচীন ভারতে ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দূত বিনিময় হইত। সর্বত্র দূতগণের প্রতি সম্ভ্যবহার করা হইত। দূত ছিল অবধ্য। মহাভারত ও কৌটিল্য এই কথার উপর অত্যন্ত জোর দিয়াছেন যে দূতের প্রাণ, সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সর্ব প্রকার যত্ন লইতে হইবে। দূতের জীবন নিরাপদ ছিল বলিয়া প্রাচীন ভারতে দলীয় সহযোগে দূত বিনিময় হইত।

প্রাচীন ভারতে যে সব আন্তর্জাতিক আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই প্রবন্ধে আমি একটি গ্রন্থ হইতে বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থটির নাম International Law and Interstate Relation in Ancient India, লেখক ডাঃ হীরালাল চ্যাটার্জি।

ভারতে আন্তর্জাতিক আইনের প্রথম যুগ হইতেছে বেদের যুগ। এই যুগে বহু উপজাতি ও জাতি পরস্পরের সহিত মেলামেশা করিয়াছিল। তার ফলে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে যুগে যুদ্ধ হইত, সন্ধি হইত, রাজনৈতিক মিতালি হইত, চুক্তি হইত। একটি যুদ্ধের কথা বেদে উল্লিখিত আছে—দশ রাজার যুদ্ধ। এই সব যুদ্ধ বিগ্রহ, সন্ধি চুক্তি প্রমাণ করে যে, সে যুগে আন্তর্জাতিক আইনের গোড়ার পত্তন হইয়াছিল। এমন কতকগুলি বিধি রচিত হইয়াছিল যাহা বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করিত।

আন্তর্জাতিক আইনের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হয় মহা-কাব্যের যুগ হইতে। এই যুগে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থার কতকগুলি মূল্যবান ধারণা বাস্তব আকার ধারণ করে। সেই সময় ভারতবর্ষ সভ্যতার উচ্চস্তরে উপনীত হইয়াছিল। সেজন্য ভারতে একটা body of rules & obligation অর্থাৎ কতকগুলি বিধিব্যবস্থা ও বাধ্যবাধকতার আদর্শ রচিত হইয়াছিল, যাহা রাজন্যবর্গ তাহাদের পরস্পরের সম্পর্কে মানিয়া চলিতেন। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের কতকগুলি বিধি সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। মহাভারতে আছে যে কুরুপাণ্ডবদের মহাযুদ্ধের পূর্বে যুদ্ধরত দুই দল যুদ্ধের কতকগুলি নিয়ম একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁহারা আরও স্বীকার করিলেন যে এই সব নিয়ম তাঁহারা কিছুতেই অমান্য করিবেন না। রাম ও রাবণ এবং কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যে বিখ্যাত যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অহর্নিশ হইতে বহু প্রাণি কোন না কোন পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। এদের প্রাণি অবশ্য প্রাণির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। এই সব যুদ্ধ প্রমাণ করে যে তখন ভারতে

জাতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য Law of Nation-এর মত নিশ্চয় কোন আইন বা বিধি ছিল। যুদ্ধের আইন, শান্তির আইন, শাসন নীতি, পর রাজ্যের সহিত বিস্তারিত আইন এই সব নিশ্চয় বিদ্যমান ছিল।

আজ রাজ্যের সম্পর্কের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব ও সখ্যতার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বিধির সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে এ সব সম্ভব হইত না। তৃতীয় যুগ আরম্ভ হইল আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় হইতে। এই যুগ দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে সহায়তা করিল। এই প্রকার সম্পর্ক স্থাপনের একটা ঐতিহাসিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে। ইহা আন্তর্জাতিক বোধকে জাগ্রত করিল।

জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব মানুষের মনে অহিংসা নীতির প্রভাব বিস্তার করিল। মানুষের দুঃখ কষ্টকে লাঘব করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল। এবং যুদ্ধকে নিন্দা করা হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হইল। বৌদ্ধ ধর্মযাজকগণ সারা বিশ্বের সহিত ভারতের একটা নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। ইহার ফলে সে যুগের আন্তর্জাতিক আইন আরও মহান নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রাচীন ভারতের আন্তর্জাতিক আইনের সর্ব্বশেষ যুগ হইতেছে গুপ্ত যুগের পতনের সময় হইতে মুসলিম শক্তির আগমন পর্যন্ত এই দীর্ঘ যুগ। এই যুগে ভারতে "একী করণের" প্রবণতা হ্রাস পাইল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা, রেষারেষিতে দেশ ভরিয়া গেল। প্রাচীন যুগের মহান আদর্শ মানুষ বিস্মৃত হইয়া গেল। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঘন ঘন যুদ্ধ হইতে লাগিল। আজ যিনি রাজপাটে বসিতেছেন, কাল হয়ত তিনি পথের ভিখারী। জাতীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। শক্তিশালী রাজারা দুর্বল রাজাদেরকে পরাস্ত করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। এই রূপ গণ্ডগোলের সুযোগে বিদেশাগত মুসলিম শক্তি ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু এই গণ্ডগোল-পূর্ণ যুগেও প্রাচীন যুগের আন্তর্জাতিক আইনের মূল সূত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হইত না। যুদ্ধের নীতি, শান্তির নীতি, নাগরিকের অধিকার জাতির অন্তরে এমন ভাবে দানা বাঁধিয়াছিল যে, গণ্ডগোলের মধ্যেও তাহা মানিয়া চলা হইত। তার পর আসিল মুসলিম শাসনের দীর্ঘ যুগ—সে কথা আর বলিব না—সে আর এক ইতিহাস।

আম্রমঞ্জরী

(কথানাট্য)

॥ শ্রীমন্মথরায় ॥

[বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোলপূর্ণিমা]

কৃষ্ণা। এমনটি তো আর কোন দিনই হয়নি সখি!

বিশাখা। কত যুগ আমরা এমনি ধারা ঘুরে ঘুরে রাধা-

একাবলী। পূর্ণিমার চাঁদ পাণ্ডুর হয়ে এলো। ঐ যা আর কতরাত মিছিমিছি জাগবে?

শশিকলা। মন্দিরের বাতিও নিভে এলো। এই কি

আমাদের বসন্তোৎসব!

শ্রীরাধা। উপায় কি সখি!

ললিতা। আমের মুকুল না হলে কি এ উৎসব কিছুতেই হবার নয়? কিছুতেই নয়?

তরলী। এমন দেশও তো রয়েছে যে দেশে সহকারের আকারও কেউ দেখে নি!

শ্রীরাধা। সে দেশে এ উৎসবও হয়তো নেই সখি।

[নিস্তব্ধতা]

ললিতা। তা হলে এক ঐ আমমুকুল অভাবেই আজ দোল খেলা হলো না বলো।

শ্রীরাধা। চাঁদ এখনো অস্ত যায় নি সখি—

ললিতা। বিশেষ বিলম্ব আছে বলেও মনে হচ্ছে না।

শ্রীরাধা। কে জানে কি হবে। শ্রীকৃষ্ণের খেলা না দেখেছো এমন তো নয়।…

ললিতা। হয়তো আজ না খেলাই তাঁর খেলা।

বৃন্দা। আশা দিয়ে নিরাশ করাই তাঁর সেরা খেলা, মর্মে মর্মে তা কে না বুঝেছে।

ললিতা। তবে কি আজ আমাদের এ উৎসব হবার নয়? উৎসব কি তবে আজ হবে না?

কস্তিকা। ঐ ঘুন ঘীপ…এই অগুরুচন্দন…ঐ আম্রির মুকুল—

তরলী। কণ্ঠের এই মালা—পায়ের এই নূপুর—

পদ্মা। এই মধুরাত্রি—

চন্দ্রাবলী। এই রূপ এই রস এই গান এই গন্ধ—

ললিতা। সবই আজ বৃথা হলো, ব্যর্থ হলো—শুধু ঐ এক আম্রমঞ্জরীর অভাবে।

অন্যান্য সখিগণ। শুধু ঐ এক আম্রমঞ্জরীর অভাবে!

বৃন্দা। কিন্তু কি করে বিশ্বাস করি সারা গোকুলে এই শুরা বসন্তে একটি সহকার শাখাও মঞ্জরিত হয়নি।

মধুমিতা। চোখে দেখছি যে। শীতই তো যেতে চাইলো না এবার এ দেশে।

পদ্মা। যা কোনো দিন দেখি নি, তাই তো এখন দেখতে পাই।

বিশাখা। সোনার গোকুলে এ কি অভাব! শুধু কি আমের শাখাতেই মুকুল নেই? বলবার নয়, তবু বলি, পাতায় পাতায় যেখানে ফল ধরতো, ফুল ফুটতো, সে দিকে একবার তাকাও দেখি—! শীতের ভয়ে যেন মুখ লুকিয়ে রয়েছে সব।

কস্তিকা। দেখে মনে হয় ওরা যেন ভয়ে মরছে! নিতান্ত না এসে নয়, তাই যেন কেউ এসেছে। পালাতে পারলেই ওরা বাঁচে।

শ্রীরাধা। চুপ—চুপ—

ললিতা। চুপ নয় সখি। কথাটা অলুক্ষণে সন্দেহ নেই, কিন্তু অহরহ ঐ তো দেখছি। সব যেন ভয়ে মরছে।

শ্রীরাধা। চুপ—চুপ—

বৃন্দা। বাইরে তো আর বলছিনে, তোমাকেই বলছি রাই, গোকুলে এ হলো কি? ফলফুলের কথা আমি ধরছি নে, ও না হয় প্রকৃতির খেয়াল। কিন্তু আমাদের কথা? যে বুকে ভয় ছিলো না, গোপীরও না, গোপীবল্লভেরও না, সেই বুকে এ কিসের ভয়।

শ্রীরাধা। ধীরে ধীরে আমরা কি যেন হারিয়েছি, আরো যেন কি হারাচ্ছি।

রোহিণী। ঐ কথাই অহরহ মনে হয়, অথচ চারিদিকে চেয়ে দেখি সবই তো রয়েছে। তবে হারালুম কি?

রেবতী। নিধুবন, নীপবন, রূপ যৌবন মান অভিমান, প্রেম-প্রীতি সবই তো রয়েছে—

সুচিত্রা। ফুলও তো ফুটছে—জ্যোৎস্নাও উঠছে—কিন্তু প্রাণ নেই যেন কারো। এ যেন বরফুল, এ যেন মরা চাঁদ।

পদ্মা। কি যেন হারিয়েছি আমরা।

ললিতা। কি যে হারিয়েছি জানি না। শুধু এই জানি—হারিয়েছি। ভালো লাগছে না সখি! কিছুই ভালো লাগছে না। বসন্তোৎসব ব্যর্থ হলো।

বিশাখা। কোথায় বসন্ত! ঋতুং ধর্ম শীত।

সুচিত্রা। বসন্ত নয়—বসন্ত নয়। মনের মাঝে এ বসন্তের

কোন সাড়াই তো পেলাম না—

পদ্মা। বাইরেও তার সাড়া নেই। নব মঞ্জরী নেই—নব পল্লব নেই।

কিশোরী। আসবে কি করে। শুকনো পাতা গাছ থেকে ঝরল না—নব মঞ্জরীর পথ আগলে আছে।

ললিতা। কিশোরীর কথা মিথ্যা নয়। ফাল্গুন মাসে বাতাস এসে শুকনো পাতা ফেলে দেয়—কুহুমার খুলে দেয়—তখনি—তখনি নবমঞ্জরীর দেখা পাই, আমের মুকুলের গন্ধ পাও—কৃষ্ণচূড়ার আগুন জ্বলে—অশোক শাখায় রক্ত দেখি। এবার কোথায় সেই উতলা বায়ু? কোথায় সেই ক'ড়ো বাতাস?

কিশোরী। বাতাস যেন স্তব্ধ।

শ্রীরাধা। চুপ—চুপ—। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এ অনিয়ম যাবে। প্রতিক্ষায় আসছে।

বিশাখা। আর এসেছে! বছরের মাঝে এই একটি রাত—যে রাতে জীবনের কাছে মৃত্যু হার মানে, প্রেম মৃত্যুকে জয় করে—সেই রাত আজ আমাদের ব্যর্থ হলো।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যর্থ হলো! সে কি রাধা?

সকলে। শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীকৃষ্ণ!

শ্রীরাধা। আর মুকুল? আম্রমুকুল?

শ্রীকৃষ্ণ। কই আর পেলাম, পেলাম না।

শ্রীরাধা। বসন্তোৎসব ব্যর্থ হলো। রাধার এক আম্রমুকুল আমরা পেলুম না—! দোল খেলা হ'ল না।

কৃষ্ণা। তুমি একা যে? তোমার সাথীরা কই?

বিশাখা। বৃন্দাবনের সেই বীরপুরুষগণ কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। আছে, তারা আছে—

চন্দ্রাবলী। থাকুন। ঐ চাঁদ দেখছি অস্ত যায়। আর কেন রাধা? আবীর কুহুম ফেলে দাও—

শ্রীরাধা। জীবনে এই প্রথম! এই প্রথম—যে আজ দোলপূজা হলো না! তোমার গায়ে আবীর দিতে পারলাম না, তোমার সঙ্গে রং খেলতে পারলাম না—

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা দেখছি কাঁদছো—

শ্রীরাধা। কাঁদছি! কেন কাঁদছি, সে কি তুমি বুঝছ না? এ রাত্রির ইতিহাস কি তুমি ভুলে গেছ কৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। হর-কোপানলে মদন-ভস্মের কথা। জানি সখি জানি। রতির সেই আকুল তপস্যাও জানি। মহাকাল যে মহাকাল—সেই মহাকালই পরাজিত হয়ে এই বিধান করেন যে বৎসরের এই বসন্ত পূর্ণিমায় মদন এক রাত্রির জন্য জীবনলাভ করবে। অতসুর শুধু লাভের সেই রাতটিই যে আজ—তাও জানি। এবং এও জানি আজ চূতমঞ্জরী দিয়ে সেই মদন দেবতার পূজা হলে তবেই হবে বসন্তোৎসব। কি না জানি রাধা?

শ্রীরাধা। তবে সেই চূত মঞ্জরী কই? কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। চূত মঞ্জরী হলো নব জীবনের প্রতীক। বৃন্দাবনে প্রাণের অভাব হয়েছে, তাই আম্র মঞ্জরীর দেখা নেই। মৃত্যুকে জয় করা মৃত্যুর কথা, বৃন্দাবন আজ ভয়ে মরছে। বৃন্দাবনে জীবন কই? প্রাণ কোথায়? বৃন্দাবনে আজ শুধু ভয়—শুধু ভয়।

শ্রীরাধা। তোমারো ভয়? তোমারো?

শ্রীকৃষ্ণ। আমারো। নইলে আমি এখনো—এখনো আমি—থাক সে কথা, সে কথা থাক রাধা। আম্র মঞ্জরীর আমরা সন্ধান পেয়েছি।

সকলে। সন্ধান পেয়েছো?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ সন্ধান পেয়েছি—কিন্তু—

সকলে। কিন্তু আনোনি কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। একটি মরা আম গাছ—সে গাছে বহু কাল কোনো পাতারই উদ্গম হয়নি, কিন্তু শুধু—

সকলে। শুধু—?

শ্রীকৃষ্ণ। সেই গাছেই, ঐ মরা গাছেই, এ রাজ্যে আর কোনো গাছে নয়—ঐ মরা গাছটিতেই এবার

নবমঞ্জরী—নব পল্লব—

ললিতা। মরা গাছ কি তবে বেঁচে উঠলো?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, বেঁচে উঠেছে।

বিশাখা। কোথায়? সে কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনে নয়—

ললিতা। তবে?

শ্রীকৃষ্ণ। মথুরায়।

চন্দ্রাবলী। মথুরায়? মিথ্যা কথা। শ্রীদাম সুদাম যেখে এসে বলেছে মথুরায় কেন, এ রাজ্যে কোথাও এবার আমমঞ্জরী নেই। তোমার এ মিথ্যা কথা শুনব—

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বাস না হয়, মথুরা থেকে অক্রূর মুনি এসেছেন, জিজ্ঞাসা কর—

শ্রীরাধা। অক্রূর মুনি! তিনি কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। কংস মথুরায় যজ্ঞের আয়োজন করছেন। সেই যজ্ঞে আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্যে অক্রূরকে পাঠিয়েছেন—

শ্রীরাধা। কংস! না—না, তুমি যেয়ো না—। আমার বুক কেন যেন শুধুই কাঁপছিলো। কেন কাঁপছিলো এখন বুঝছি। তুমি যেয়ো না—যেয়ো না।

শ্রীকৃষ্ণ। সেই অক্রূরই আমায় দিয়েছেন ঐ চূত মঞ্জরীর সন্ধান। গোটা দেশে ঐ একটি মাত্র আম গাছে জীবনের সেই পরম স্পন্দন।

ললিতা। বল—বল—তুমি আমাদের সে কাহিনী বল—

শ্রীরাধা। কোথায় সেই আম গাছ, কোথায় সেই নব-মঞ্জরী?

শ্রীকৃষ্ণ। অক্রূর মথুরা থেকে যাত্রা ক'রে রাত্রাপথে কারাগারে পিতা বসুদেব মাতা দেবকীকে আমাদের এই নিমন্ত্রণের সৌভাগ্য-বারতা জ্ঞাপন করতে যান। ভেবেছিলেন তাঁদের চরম দুঃখে তা হবে তাঁদের পরম সান্ত্বনা। কিন্তু গিয়ে দেখেন, সেখানে দুঃখ নয়, মহা-মহোৎসব!

বিশাখা। কোথায় মহোৎসব? কারাগারে?

শ্রীকৃষ্ণ। কারাগার আর সেটা নয়। সেটা আজ পরম তীর্থ।

[নিস্তব্ধতা]

শ্রীকৃষ্ণ। আমি চললাম রাধা—আমাদের বিদায় দাও—

শ্রীরাধা। কোথায় যাবে—কেন যাবে?

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ চূত মঞ্জরী আনতে।

শ্রীরাধা। কারাগারে?

শ্রীকৃষ্ণ। কারাগার আর সেটা নয়। সেটা আজ মহাতীর্থ।

শ্রীরাধা। আর এনে কি হবে! ঐ চাঁদ অস্ত যায়।

শ্রীকৃষ্ণ। চাঁদ কখনো অস্ত যায় না সখী! অস্তমিত হয় মন। আমমঞ্জরী যে চায় না, মন গেছে তার ম'রে। আমরা কি মরেছি সখী?

শ্রীরাধা। না মা, তুমি আমাদের চিরকালের চাঁদ। আমাদের এ চাঁদ অস্ত যাবে না কখনো।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে বিদায় দাও। শুধু আমায় নয়, আমাদের সবাইকে—। (থামিয়া) আমরা গিয়ে ফেনে আসি কি সে রহস্য, যাতে শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়।

বিশাখা। কোথায়? কংস যাজ্ঞের উদ্যানে না উপবনে?

শ্রীকৃষ্ণ। চারি দিকে পাষাণ প্রাচীর।···পাষাণ—পাষাণ—দয়া নেই—মায়া নেই—মমতা নেই—

চন্দ্রাবলী। রাজপুরীতে?

শ্রীকৃষ্ণ। রাজপুরীতে মরা গাছের ঠাঁই নেই সখী!

ললিতা। কারাগারে?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা বল কারাগার। আমি বলি স্বর্গ। জীবনের সেই মহাস্বর্গে অপূর্ব সেই আম বেদীমূলে মহা-মহোৎসব হচ্ছে! আলোর সেখানে পথ নেই, তবু সেখানে কি এক দুর্জেয় আলো। তম সেখানে পরাজিত, মৃত্যু সেখানে শক্তিহীন। নিষ্ঠিক চিত্তে প্রাণের প্রাচুর্যে গড়ে উঠেছে এক নব স্বর্গ। সেইখানে—সেইখানেই মরা গাছে আমের মুকুল ফুটেছে···এখানে নয়, কোনোখানে নয়, সেইখানে—

আত্মাহুতির সেই যজ্ঞাগারে—পিতা বসুদেব,
মাতা দেবকীর সেই সাধন-তীর্থে।

শ্রীরাধা। তুমি কবে ফিরবে? কবে তুমি ফিরবে?

শ্রীকৃষ্ণ। যে দিন এ দেশে আবার বসন্ত আসবে—
সেই বসন্ত, যে বসন্ত শীতের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত
সঙ্কুচিত নয়···যে বসন্তে আম মুকুলের অভাব
হয় না, যে বসন্তে উৎসব হয়, যে বসন্তে আমার
সকল প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, সবাইকে আমি
কাছে পাবো, বুকে টেনে নিতে পারবো—
তোমরা যারা এখানে রয়েছো তাদের—যারা
এখানে নেই তাদেরো।

আদি দেবতা

॥ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ॥

মেরুজ্যোতি পরিকীর্ণ কম্পমান সৃষ্টির সংহতি
অন্ধকার অপসৃত প্রথম উষার আঁখিপাতে
বহুবর্ণ সমারোহে বিচিত্র আকাশ প্রান্ত হ'তে
তুমি কি নামিয়াছিলে এ বিশ্বের হে আদি দেবতা?

তোমারে দেখেনি কেহ তবু তব অপরূপ রূপে
বিমোহিত চরাচর, তোমাপানে মুগ্ধ পৃথিবী,
পবনথ হ'তে তব ঝুলিত অলকদাম 'পরে
থরে থরে সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছে কবি।

ছন্দের ঝঙ্কারে কবি রচিয়াছে প্রশস্তি তোমার
কবি-বাক্য শব্দ-ব্রহ্মে লীন হয়ে করিছে প্রণাম,
আদি মানবের মনে তুমি ছিলে পরম বিস্ময়
আকাশ সূর্য্যের সাথী অনাদ্যন্ত হে আদি দেবতা!

অসংখ্য বিগ্রহে তোমা স্থাপিলাম মন্দিরে মন্দিরে
গন্ধবতী ধূপলীপে নানাবর্ণ কুসুম সম্ভারে
তোমারে করিনু পূজা, বর মাগি' কৃতাঞ্জলি পুটে
মনোরথ ব্যর্থ হয়; ভাবি মোর এই ত সুকৃতি।

অন্তরীক্ষে তুমি নাই? করেছ কি পাতালে প্রবেশ?
বক্ষের সম্মুখে তুমি তৃণসম উড়ে চলে যাও,
অরুণণ পৃথিবীরে বার বার করিয়া বঞ্চনা,
আত্মনির্ব্বাসিত তুমি কাল্পনিক হে আদি দেবতা।

আমার দেবতা আমি অন্তরে রয়েছি সমাসীন,
বিচিত্র ছন্দের মন্ত্রে আমি করি আত্ম-উপাসনা,
আমার আনন্দ সে যে পলে পলে ঊর্দ্ধাকাশ পানে
আলোকে মেলিছে পাখা দিগন্তে তাহারি প্রতিচ্ছবি।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(২০)

সকালে রক্তস্রোত প্রুফ দেখিতে থাকি, তখন টালীগঞ্জ হইতে কোন আসিল যে প্রতিভার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, থামিতেছে না, তাহার মেয়ে এখানে নাই। তখনই আমি Natrum Sulph 12× লইয়া রেণুর ওখানে যাই। সেখানে রেণুকে চিদানন্দকে মঠ হইতে লইয়া যাইবার জন্য বলিয়া সেখান হইতে N S 6×, F P 6×, N M 12× লইয়া প্রতিভার বাসায় যাই।...৪টার পূর্ব পর্যন্ত প্রুফ দেখি। তৎপর কাগজের ব্যাগটীর মধ্যে গীতা ও চশমা দুইটী লইয়া মঠে যাই।...৪-৩৫-এ পাঠ আরম্ভ হয়। 'মাত্রাস্পর্শাঃ', 'যং হি ন ব্যথয়ন্তি' শ্লোক পড়া হয়। 'নাসতো বিদ্যতে ভাব' শ্লোকটী শুরু আরম্ভ হয়। রেণু আসরের সময় যায়, চিদানন্দ প্রতিভার ওখানে গেলে পর। দয়া আসে খাবার লইয়া।...বন্ডীনবাবু প্রতিভার জন্য কাশার মুগারের স্পেসিফিক-এর কথা বলেন।...

১০ই মার্চ

সকালে প্রতিভার আবার নাক হইতে রক্ত পড়ে প্রচুর মাত্রায়। আমাকে ফোনে জানান হয়।...

১১ই মার্চ

৫টায় উঠিয়া ডায়েরী লিখি, প্রার্থনা করি, পরে প্রতিভার ওখানের জন্য বাহির হই।...উমাদিদি কাছের পার্ক হইতে দূর্বা ঘাস আনিয়া নিজে রস করিয়া দেয়। আমি দুধ, দূর্বার রস, আজিকার পত্রিকাটা আমার ব্যাগে লইয়া ১১।০টায় চলিয়া যাই। চিদানন্দ তখন আসিয়াছে। রেণু ৫টায় কলিকাতা ঘুরিয়া প্রতিভার ওখানে যায়। সে সেখান হইতে বাসায় আসিয়াছিল সকালে ১০টার পর।...সান্ত্বাদিন বরফ চলিতেছে। আধঘণ্টা পর পর ঝোল, ডাবের জল, কমলার রস, দুধ, সাবু ইত্যাদি।...

১২ই মার্চ

খুব ভোরে প্রতিভার ওখানে যাই। গত রাত্রি ১২টায় যমুনা, শঙ্করী ও হরিদাসী আসে। রেণুও বেড-প্যান লইয়া কিছু পরে যায়।...রেণু কলিকাতা যায় ৪টার পর ফেরে। নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়াছিল। প্রায় ১ ঘণ্টা কথা হয়। বর্তমান সমস্যাগুলি—মেয়েদের বাহির হওয়া ও ছেলেদের সঙ্গে মিলন আটকাইতে না পারা অথচ তদুপযোগী কোনও সাবধানতা অবলম্বন করিবার কোনও ট্রেনিং না-থাকায় বীভৎস পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমি ও রেণু প্রতিভার ওখানে যাই। ভাল আছে।...আমি ট্রামে অফিসে আসি। কিছু পরেই ধীরেনবাবু আসেন। তিনি 'খদ্দর ঢেউ' ও 'ঢেউয়ের গঙ্গা'র আলোচনা উত্থাপন করেন। তিনি উহা ভাল বুঝিতেছিলেন না। অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। চিদানন্দ আসে।...৯।০টায় আসি।...

১৩ই মার্চ

খুব সকালে মধুর বাসায় যাই।...প্রতিভার ওখানে যাই। সেখান হইতে ৮-২৫-এ আশ্রমে পৌঁছি। তখন রেণু আসিয়াছিল। আজ ত্রিফলাগুগুল খাই ও চোখে ওষুধ দেই। ২ ঘণ্টা পর রেণু যায়। দুপুরে প্রেসে, 'বুকস অব দি ওয়ার্ল্ড'-এ যায়। কলিকাতা হইতে সোজা প্রতিভার ওখানে যায়। সেখান হইতে এখানে আসে। ৪।০টার পর অফিসে যাই। সন্ধ্যার পরই

ষষ্ঠীশবাবু আসে। তাহার বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন একটী স্থিতিভূমির। তাহা নাই বলিয়াই সে আপনাকে সামাল দিতে পারিতেছে না। আমি আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বলি ও তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকিতেও বলি। পি সি ঘোষ বলিয়াছেন, এইরূপ একটী পত্রিকা ও বৎসর কলিকাতায় unseen? ইহা জেনার বিষয়। তিনি বিজ্ঞাপন দিবেন বলিয়াছেন।...আর্থিক ও লোকের সুবিধা হইলে যে-সব প্রতিষ্ঠানগুলি ঠাকুরের নামে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও বাহিরের সঙ্গে যোগ-সূত্রে গ্রথিত করার ইচ্ছা আছে। ওল্ডিপাড়ার উৎসব সম্বন্ধে এই কথা রেণু ও চিদানন্দের সামনে বলি।

১৪ই মার্চ

উজ্জলভারতের প্রুফ দেখি। ৮টার পর রেণু আসে। আজ ক্রমেন সন্ট ও মহাত্মিকলাভ হৃত যাই। আমি ১টার পর প্রতিভার ওখানে যাই। রেণু পরে যায়।... ১১টায় ফিরি ও প্রুফ দেখি। ২টার পর ষষ্ঠীনবাবু আসেন।...ধীরেন গাঙ্গুলী আসেন। তিনি 'গীতা জয়ন্তী' নামে একটি পুস্তিকা বাহির করিবেন, তাহাতে আমার লেখা দিতে বলিয়া যান। বর্তমানে 'ব্রহ্মসূত্র' পড়িতেছেন। পূর্বাপেক্ষা উহা এখন অনেকটা সহজ হইয়াছে। ধীরে ধীরে আরও হইবে। The ultimate metaphysical principle is the advance from disjunction to conjunction, creating a novel unity other than the entities given in disjunction. The novel unity is at once the togetherness of the 'many' which it finds, and also it is one among the disjunctive 'many' which it leaves; it is a novel entity, disjunctively among the many entities which it synthesizes. The many become one and are increased by one. In their natures, entities are disjunctively 'many' in process of passage into conjunctive unity. This category of ultimate replaces Aristotle's category of 'primary substance'.—Whitehead—P. 28-29. 'The term 'one' does not stand for the integral number 'one', which is a complex special notion...It stands for the singularity of an entity. P. 2. অফিসে ত্রিপুরাশংকরবাবু আসেন। ৮টার পর মালতী যায়। আমি ৯টার পর আসি।

১৫ই মার্চ

ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি। রেণু আসে ৮টার পর। কিছু পরেই নলিনী শংকর সহ আসে।...প্রেস হইতে ব্রহ্মসূত্রের একটা প্রুফ দিয়া যায়। রেণু শক্তি ঔষধালয়ে বিজ্ঞাপনের জন্য যায়। দেয় না। এখানে আসে ২টার পর। ২৸০টায় এম, বি, সরকার ও প্রেসে যায়। ১০টায় প্রতিভার ওখানে যায়। আমি ৪টায় প্রতিভার ওখানে যাই। ৫৷০ টায় অফিসে আসি।...ঢাকা মহাস্থবির মহাশয় ভীতন হইতে এক পত্র দিয়াছেন আগামী ২৪শে হইতে ২৬শে সেখানে অনুষ্ঠিত এক সমাজ সেবার সভায় যোগদান করিবার জন্য। এত কাজ এদিকে জমিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই উহা করিয়া উঠিতে পারিব না। পত্রিকাও হয়ত ২২শে আসিবে। একা রেণুর উপর ফেলিয়া কি করিয়া যাইব? প্রতিভাও নাই। কাজেও যাওয়াও হইবে না। বোধ হয়, পত্রিকার বিলম্বিত হইতেছে। ইহাকে এখন তাড়ানো দরকার শৃঙ্খলায় আনিবার জন্য। "উজ্জল ভারত"ই তো দাঁড়াইবার একমাত্র স্থান। বাসন্তী বাইজি-এর খাতাবাবু আসেন।...

১৬ই মার্চ

সকালে উজ্জলভারতের 'গীতা'-র প্রুফ দেখি। রেণু আসে। প্রেসে প্রুফ দিয়া আসে। আবার ১২টায় এখানে আসে।...৩-৩০-এ মঠে পৌঁছি।...আজিকার 'নাসতো বিদতে' ও...রোজ দুইটী আস্বাদিত হয়। ইহার মধ্যে 'অনাদিকা হরি তুমি', 'বংশীওয়ালা জগৎ উজালা' গান দুইটী গীত হয়। চোখের জলে প্রার্থনা জানাই।... (পাকড়াশী) জ্ঞানবাবুকে বর্তমানে N. S 6× ও F. P 6×

রোজ alternately ২বার খাইতে বলি ...। এত সঙ্কীর্ণ সময়ের কাজ গুছাইয়া উঠিতে যাওয়া সঙ্গতপর নয় বলিয়া চারুবাবুকে জানাই।...নিত্যগোপাল শতবার্ষিকী উৎসবের জন্য এখনই প্রস্তুত হওয়া উচিত, একটা তহবিল তুলিবার চেষ্টা করা উচিত—ইত্যাদি আলোচনা হয়।... আমি ১০টায় আশ্রমে ফিরি।...

১৭ই মার্চ

সকালে প্রুফ দেখি উদয়নাচার্যের। রেণু আসে, চোখে ঔষধ দেয়।...Process & Reality একটু পড়ি।...

১৮ই মার্চ

সকালে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি, Process and Reality পড়ি। রেণু আসে, ১০টায় যায়। প্রেস হইতে প্রুফ নিয়া যায়। রেণু ১১০ টায় বাহির হইয়া গেলে নিত্য সব কর্মের অন্তায় দিয়া আসে।...ছুলালীকে...'নিত্যগোপাল প্রাণারাম ব্রহ্ম আনানন্দ মাধব' গান করিতে দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুরের আশীর্বাদে 'মাধব' হইবে।...'The true method of discovery is like the flight of an aeroplane. It starts from the ground of particular observation, it makes a flight in the air of imaginative generalisation, and it again lands for renewed observation rendered acute by rational interpretation. The reason for success of this imaginative rationalisation is that, when the method of difference fails, factors which are constantly present may yet be observed under the influence of imaginative thought. Such thought supplies the differences which the direct observation lacks'. P. 5-6. রাত্রি প্রায় দশটায় ফিরি। 'Some synoptic vision has been gained'. P. 6.

১৯শে মার্চ

সকালে Russel-এর Mysticism and Logic পড়ি। রেণু আসে। 'Heraclitus: The things that can be seen, heard and learned are what I prize most.'—'The sun is new every-day'.—'The world which is the same for all, no one of gods or man has made, but it was ever, is now, and ever shall be, an ever-living Fire, with measure kindling, and measures going out'.—The transformations of Fire are first of all sea; one half of the sea is earth, half whirlwind.'—You cannot step twice into the same river, for fresh waters are ever flowing in upon you.' We step and do not step into the same river; we are and are not.'—Mysticism and Logic. কলিকাতা ঘুরিয়া রেণু ৪টায় আসে। ইতিপূর্বেই বীরেন ব্যানার্জী আসেন।...১০টায় আশ্রমে ফিরি।...

২০শে মার্চ

সকালে 'শ্রীনিত্যগোপাল' প্রবন্ধটী প্রায় শেষ করি। ইতিমধ্যে রেণু আসে।...পথে অকস্মাৎ সেন প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ। সন্তোষ মুখার্জী রোডের মোড়ে বীরেন মজুমদারের সঙ্গে দেখা। তাহার বন্ধুর বাসায় আগামী রবিবার ৪টায় গীতা আলোচনার যাইব ঠিক হইল। সকালে রাজশাহী হইতে শক্তিবাবু ও অপর একটী লোক আসেন। সেখানে বক্তৃতা দিতে যাইতে হইবে। রাত্রি ৯।...

২১শে মার্চ

উদয়নাচার্য ডাকে ফেরত যায়। সকালে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি, Mysticism and Logic পড়ি। রেণু আসে প্রায় ১টায়। ১০টায় আফিসে যাই। চিন্তামণি আসে। আগামী রবিবার ৯-৪-এর রাত্রির ঢাকা-গ্যালেক্সীতে রাজশাহী যাইব বলিয়া কর্মীসভার সেক্রেটারী শক্তিবাবু ও সৈদাবের সুন্দর মজুমদারকে ২ পত্র দেই।

২৪০টায় চিদানন্দ পোস্টাফিসে উদ্ধলতারত দিয়া আসে। 'It is only in marriage with the world that our ideals can bear fruit : divorced from it, they remain barren. But marriage with the world is not to be achieved by an ideal which shrinks from fact, or demands in advance that the world shall conform to its desires.'—Mysticism and Logic. P. 7. Four questions thus arise in considering the truth or falsehood of mysticism, namely : (1) Are there two ways of knowing, which may be called respectively reason and intuition ? And if so, is either to be preferred to the other ? (2) Is all plurality and division illusory ? (3) Is time unreal ? (4) What kind of reality belongs to good and evil ?'—Ibid. P. 11. ৯৪০টায় পর আশ্রমে ফিরি।...

২২শে মার্চ

৭৪০টায় পর বেণু আসে। উষাদিদী, নিত্যব্রত, বউরা, রাধুনী, বুহু প্রভৃতি ঠাকুরের ও আমার পায়ে আবির দেয়। আমিও কপালে দেই। ঠাকুরকে রসগোল্লা দেয়। কিছু পরে সুধাংশু আসে।...(নীহারের) গাড়ীতে...প্রতিভার ওখানে যাই। সেখান হইতে হরিদাসীর ওখানে যাই। সেখানে হরিদাসী আবির দেয়। ওনিলাম সে লোক মারফতে পায়ে দিবার জন্ত কিছু আবির ও মিষ্টি পায়ে হাটাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। আজ ১টা পর্যন্ত ট্রাম বাস বন্ধ। ছেলেরা যাহাতে অনাচার না করে সে জন্ত গার্ড ও পুলিস পাহারা।...৫টার পর দুই বীরেনবাবু আসেন। আমি বেণু তাহারা দুইজন... বীরেন মধুমদারের শ্বশুর ললিতবাবুর বাসায় যাই।... ৬টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। রাধাগোবিন্দ বসাক ও অন্যান্য রিটায়ার্ড গভর্ণমেণ্ট অফিসার উপস্থিত থাকেন। আজিকার আলোচনার মধ্যে 'It is only in marriage with the world' ইত্যাদির ব্যাখ্যা হয়। পত্রিকার ৩ মাসের ৮৲০ আনা দিলেন, মাসে মাসে কিনিয়া নিবেন বলিলেন। আমি ও বেণু আফিসে আসি। ৯৪০টায় আশ্রমে ফিরি।...সকালে 'Mysticism ও Logic প্রবন্ধটা শেষ করি। বেণু 'নিত্যগোপাল' প্রবন্ধ কপি করে।

২৩শে মার্চ

...ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি। আজ নিত্যগোপাল প্রবন্ধ শেষ করি। ৭টার পর আসি উষাদিদী ও বেণু বাসে মহানির্বাণ মঠে যাই।

২৪শে মার্চ

সকালে বেণুর ওখানে যাই ঠাকুরের উৎসবের চিঠি কয়েকটার ঠিকানা লিখিয়া চিদানন্দকে দিয়া মঠে পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত। সেখান হইতে প্রতিভার ওখানে যাই। কিছুটা সময় থাকিয়া আশ্রমে ফিরি। Mysticism and Logic-এর 'The Ultimate Construction of Matter পড়িয়া শেষ করি।...নীহারের মোটরে ৭-৩৫-এ (চিদানন্দসহ) রওনা হই।...ভোরে ঈশ্বরদি পৌঁছি। ওইখানে আসিতে পারিয়াছি।

২৫শে মার্চ

সকালে ৯৪০টায় রাজসাহী পৌঁছি। শক্তিভূতিবাবু স্টেশনে ছিলেন। টমটমে করিয়া আমরা সৌরেন্দ্র সুন্দর মজুমদারের বাসায় আসি।...৯৪০টার পর ধর্মসভায় যাই। প্রায় ৭টায় বক্তৃতা আরম্ভ হয়। সভাপতি করা হয় এখানের সংস্কৃত কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল একজন সনাতনী ব্রাহ্মণকে। বিষয় ভাগবত ধর্ম। 'যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়াহ্যাত্মলব্ধয়ে' শ্লোকখানা আবৃত্তি করি। বর্ণাশ্রম ধর্ম গ্লানিগ্রস্ত। 'আত্মানমনুশোচামি' শ্লোক বলি। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে, সন্ন্যাসী-গৃহীতে আজ শুধু বিভাগই নাই—বিকার উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং' শ্লোকে গুণ-বিভাগ, কর্ম-বিভাগই বলিয়াছেন, কিন্তু গুণ-কৌলীন্ত কর্ম-কৌলীন্ত আসিবার ফলে আজ সর্বত্র গুণবিকার ও

কর্মবিকার। এই বিকার দূর করিতেই ভাগবত ধর্মের উদ্ভব। প্রতি গুণের সঙ্গে, প্রতি কর্মের সঙ্গে যখন ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন গুণ হয় নির্গুণ, কর্ম হয় নৈষ্কর্ম্য। তখন বিকার থাকে, কিন্তু সেখানে বিকারের গন্ধ থাকে না। পুরুষোত্তম-দৃষ্টিতে আগে জীবন, আগে মানুষ, পরে শুচি অশুচি। সমগ্রের দৃষ্টি (synoptic vision) পুরুষোত্তম দৃষ্টি। এই সমগ্র দৃষ্টির ভিতর দিয়া বিশ্বের সব গুণ কর্ম দেখিতে হইবে। প্রতি মানুষ, প্রতি গুণ ও প্রতি কর্মের ভিতর divine possibility—ভাগবত সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহাকে ফুটাইয়া তোলাই ভাগবত ধর্মের প্রয়োজন। সবার উপরে মানুষ সত্য। 'শ্রোতব্যশ্চবিদুষৈব্' শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা শেষ করি।

২৬শে মার্চ

সকালে শৈলেনবাবুকে চিদানন্দ ও আমি হাত দেখাই।—হাতে নাকি আছে গুরুর দৃষ্টি থাকায় স্ত্রী-জন হইতেই আমার জীবনপথে চলিবার সহায় হইবে। উমাদিদি, মঞ্জু, রেণু, প্রতিভা, সুহৃদ, নীলু, সুধাংশু প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত। উমাদিদি ছাড়া আমার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ছিল। তাহার অনুরোধ বরিশাল কংগ্রেস-সভাপতি ৺তারিণীকুমার গুপ্তের হাতে দিয়াই আমি হইয়া ছিলাম 'বরিশালের ঘটোৎকচ'। মঞ্জু ব্রহ্মসূত্র ছাপাইবার খরচ দিতেছে। প্রতিভা সব 'কপি' করিয়া দিতেছে। রেণু সব কিছু করিতেছে। হাতে ring of solomon আছে। এখানের ১টায় খাই। বৈকালে এখানে তান্ত্রিক একটি ব্রাহ্মণ আসেন। তিনি বেশ আধুনিক। তিনি বলেন যে মহানামব্রতের আলোচনা শুনিয়াছি, তাঁহার আলোচনা religious, কিন্তু আপনার আলোচনা socio-religious; ইহা সম্পূর্ণ নূতন, যুগোপযোগী! তিনি গীতার পুরুষোত্তম-যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমি গুহ্য, গুহ্যতর, গুহ্যতম তত্ত্ব ও 'অজোঽপি সন্' শ্লোক আলোচনা করি। তিনি তৃপ্ত হন। ৮টায় বক্তৃতা আরম্ভ হয়। 'সিরিয়াসী' প্রসঙ্গ লইয়া আরম্ভ হয়। সমাজের বর্তমান সমস্যাসমূহের সমাধান কেমন করিয়া একমাত্র কৃষ্ণ-জীবনের মধ্য দিয়া হইতে পারে, কেমন করিয়া কালের সমস্যার সমাধান-মূর্তি কৃষ্ণ—ইহার আলোচনা হয়। 'মহানামধ্বনি' শ্লোক, 'বংশীওয়ালা জগৎউজলা' গান ও উল্লাসের ভিতর বক্তৃতা খুবই রসাল হইয়াছিল। নায়িক কৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠের ঠাকুর কেমন করিয়া নরসিংহ, রাম ও শ্রীকৃষ্ণের স্তরের মধ্য দিয়া ধরার বুকে অবতীর্ণ, তাহাও আলোচিত হয়। এখানের ১১টায় খাইয়া শুইয়া পড়ি। বৈকালে শৈলেনবাবু আমার কাছে বসিয়া কেনোপনিষদের ভূমিকা পড়েন, আমি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়া দেই।

২৭শে মার্চ

সকালে ভাই ভূপতির শিশু হিরণ কুমার রায় আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময়ে ভাই ভূপতিকে শ্রীনিত্যগোপালের হাতে সমর্পণ করেন। ভাই ভূপতি রামকৃষ্ণ-নিত্য-গোপালকে একদেহ বোধে ভালবাসিতেন। 'আমি তো তোমাকে চাহিনি', 'আমার এ কূলে ও কূলে দুকূলে গোকুলে' গান আবেগভরে গাই। তাহার পর আসেন নগেন্দ্রনাথ রায়। গত কলোর বক্তৃতা তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছে। বলিলেন ইহা নূতন রকমের। হিরণবাবু গ্রাহক হন্। গোপেন্দু সুন্দর মজুমদার (শৈলেনবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) আসেন। তাহার বাসায় বৈকালে জল-খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ জানান, তিনিও গ্রাহক হইবেন। কম্যুনিজম হজম করিতে হইলে পুরুষোত্তম-জীবন ও দর্শন ছাড়া গতি নাই। Truth in itself ও Truth for us-এর পার্থক্যের উপর বর্তমান সংঘর্ষ চলিতেছে। জটিলাকুটিলার সতীত্ব চলিবে না, চলিবে দ্রৌপদী ও রাধারাণীর সতীত্ব। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত নগেনবাবু দুপুরের আগে ও ২টার পর আসেন। তিনিও গ্রাহক হইবেন, টাকা পরে দিবেন।...৯টায় শৈলেনবাবুর স্ত্রী রাধারাণী ও পুত্র সুবীরের স্ত্রী প্রতিমার সামনে পুরুষোত্তম-জীবন আলোচনা করি, রামসুন্দরের আত্মপরিচয়ও বলি। পাকিস্থানের ৭টায় গাড়ী ছাড়ে, তাইরাই আসিতে

পাবিয়াছি।···৬টায় পৌঁছি। মহানির্ব্বাণ মঠে চিদানন্দের বিছানা নামাইয়া দিয়া আমি চলিয়া আসি।

২৮শে মার্চ

৫

প্রায় ৭ টায় আশ্রমে পৌঁছি···উমাঙ্গিনী মহুর বাসায় মঙ্গলবার সকালে গিয়াছে, আজও আসে নাই। কিছু পরে রেণু আসে। আসিয়া শুনিলাম, হেমন্তবাবু গত রবিবার সন্ধ্যার পর দেহত্যাগ করিয়াছেন। রেণু কলিকাতা কাগজের জন্ত ঢাকেশ্বরী, প্রেস ঘুরিয়া বাসায় খাইয়া ২টায় আসে। ৩টায় আমি ও রেণু নলিনীর ওখানে যাই। রাধু খবর পাইয়া আজ আসিয়াছে। সেখানে তাহাকে কিছু বলি। তাহার ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে চলিবার 'পথ' দেখাইবার ভার নিতে রাজী, আই-এ, বি-এ পাশ করাইব বলিলাম।···প্রায় ঘণ্টায় ফিরি।···

২৯শে মার্চ

খুব সকালে রেণুর ওখানে হইয়া প্রতিভার ওখানে যাই। সেখানে প্রায় ১ ঘণ্টা থাকিয়া আবার আফিসে আসি। প্রতিভার কাছে রাজসাহীর কথা বলি; প্রতিভা ব্যাপার তাহার ওখানে দিয়া আসিতে বলে রাধুকে দিয়া লিখাইয়া রাখিবে। রেণু প্রেসে...গিয়াছিল। চিদানন্দ আসে ২টায় কিছু আগে। তাহার সঙ্গে আমার কাছে সেই কত বৎসর আগে বিজয়ার দিনের স্বপ্ন 'ঠাকুর ভাবাবেশে বলিলেন শরৎ মনোহরপুকুরে এসে থাকুক', গুরুভ্রাতা সমষ্টির (৩জন) সাক্ষাৎ ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ, আমার বৃন্দাবন যাওয়ার কথা, প্রেমানন্দ (মন্মথ দত্তের) প্রসঙ্গ, কালোর মায়ের কথা, আমার সঙ্গে ঠাকুরের ছোট ছোট রহস্য—'শরৎ কাঁদিছে অকোর নয়নে, কি জানি কি ভাবিয়া মনে', ঠাকুরের কাছে মেয়েদের থাকার অনুকরণ তাঁহার ভক্তদের করার বিপদ ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গের আলোচনা হয়। ঠাকুরের সম্বন্ধে সকল অভিযোগ খণ্ডন করিবার সাহস আমার আছে। রামকৃষ্ণ কথামৃতের 'নিত্যগোপালের অবধূতাবস্থা' ও 'সাধু সাবধান' বাক্যের অসামঞ্জস্যতা। রেণু আসে ২টার পর। বরিশালের স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের হরকান্ত দাস আসে কংগ্রেসের কাজ করিয়াছে ইহার সার্টিফিকেট নিবার জন্ত। সোমবার আসিবে। সকালে আফিস হইতে আসার পথে ২টী কমলা ।/০ আনা মূল্যে কিনিয়া আনি। বুধু প্রভৃতি কমলার জন্ত তাড়াতাড়ি সব ভাত খায়। আমি বলি যে, ভাত খাইলে কমলা পাইবে। শিশুদের আনন্দ দেখিতে বেশ লাগে। সন্ধ্যায় আফিসে যাই। আমার পথ-চলিবার কথা রেণুর সঙ্গে হয়। আমার মত এমন করিয়া দেহ প্রাণ মন দিয়া, নিখাদ রক্তবিন্দু দিয়া বলা তো একদিন ফুরাইবে। তোমরা শিখিলে না। ৯টায় আশ্রমে ফিরি ···দুপুরে খাওয়ার পূর্ব্বে নিতার (রাধুনী) সঙ্গে তাহার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বুইকে নিত্যগোপালকে স্মরণ রাখিবার কথা বলি। নিতা আশ্রম চায়। পুরুষোত্তম দিবেন, বলিলাম।

সকালে একটা ব্রহ্মসূত্রের গ্রন্থ রেণুর ওখানে দিয়া আসি, চোখে ঔষধও লাগাই। তখন অনীতা আসিয়াছিল। সেখান হইতে আশ্রমে ফিরি।···৪টায় মঠে যাই। ···'য এনং বেত্তি হন্তারম্' শ্লোকটি আস্বাদিত হয়। হন্তা হত ও হননকে সবিশেষ স্তরে আস্বাদন করার বার্ত্তাই এখানে প্রচারিত। এতদিন হইয়াছে নির্বিশেষের সাধনা, বস্তুর সাধনা। অর্জ্জুনকে তো বাস্তবের ক্ষেত্রেই এই শ্লোকগুলি বলা হইয়াছে। রজোগুণের ক্ষেত্রেই অর্জ্জুনকে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হবার কথা বলা হইয়াছে। 'যাহার গুণ নাই, সে নির্গুণ, গুণের গুণ নাই। অতএব গুণই নির্গুণ।' এই হিসাবে রজোগুণও নির্গুণ। হন্তা, হনন ও হতের আজ একটা re-valuation দরকার। এতদিন উহাদের কোনও ব্রহ্ম-মূল্য ছিল না; তাই ছিল উহা অজ্ঞানতা। কিন্তু 'আজ' পুরুষোত্তম-মূল্য ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে হন্তা হনন ও হতের অন্তর্নিহিত ছন্দ আস্বাদনের ভিতর দিয়া। 'যস্ত নাহংকৃত ভাবঃ' শ্লোকটিরও ব্যাখ্যা হয়। হনন করিয়াই হনন না করিবার কৌশল শিখিতে হইবে। হনন না করিয়া হনন না-করার কৌশল নয়। হননের বুকে

না-জানের কথা, খাওয়ার বুকে না-খাওয়ার কথা ইত্যাদিই গীতা বলিয়াছেন।...প্রায় ১০টায় ফিরি।...

৩১শে মার্চ

...আজ কুসেন সন্ট যাই, রেণু চোখে শুধু দেয়, মহাত্রিফলাদ্য ঘৃতও খাই। কিছু পরেই গোপাল ও কানাই (হেমন্তবাবুর পুত্র) আসে।...আলোচনাদ্বারা স্থির হয় যে মঠে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইবে, উহাদের আত্মীয়বর্গ সেখানে প্রসাদ পাইবে, উহারা ১৫০।২০০ টাকা দিবে। মানুষ অনুমান ১০০ জন।...স্বাধীনে স্বাধীনেই প্রেম সম্ভব—কি নরে নরে, কি নরে নারীতে। পারস্পরিক পুরুষোত্তম মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া কেহ কাহারও অঙ্গ স্পর্শও করিতে পারে না। ইহার পর বিনয় আসে। কিছু পরেই আবার রেণু আসে। সে ও আমি আমার বাসায় যাই।...আমি অনেক কিছুই বলি...।...মানুষের অধঃপতনের একটা গভীর মূলও আছে। অধঃপতনের ভিতর দিয়া মানুষ অধঃপতিতদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া অধঃপতনের মূল ইতিহাস ও তাহা হইতে উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করিতে পারে। ঠাকুর তোমাকে উদ্ধার করিবেন বলিয়াই এত জ্বালা জ্বালাইয়াছেন। জ্বালা যাহাদের নাই তাহারা তো মৃত—তোমাকে অবলম্বন করিয়া ঠাকুর এই সম্প্রদায়ের মূল শক্তিকে নাড়া দিবার জন্য, বিস্তৃত করিবার জন্য তোমাকে টানিয়া আনিয়াছেন। তুমি সুস্থ হও, আমি অনেক কিছু পারিব। তোমার তেজস্বিতা আছে, ঠেলিয়া চলিবার সাহস আছে, সেই শক্তি ঠাকুরকে অর্পণ কর। ধন্য হও। শুক্রবার সতীশ মুস্তাফের জ্বাদ্ধ।...

১লা এপ্রিল

সকালে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি।...রেণু আসে, চোখে শুধু দেয়। সুধাংশু আসে...। আমি ৪টায় মঠে যাই, ত্রিগুণাশ্রমকে দেখি।...

২রা এপ্রিল

সকালে রেণু আসে, চোখে শুধু দেয়। মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত খাই। সকালে ১৮০ খানা স্যাসায় লিখি। কলিকাতা মেডিক্যাল, মেডিক্যাল, ডিসপিসারি, গর্ডন, হিন্দুস্থান প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া রেণু প্রায় ৪টায় এখানে আসে।...৪টার পর প্রতিভার ওখানে যাই...মঠে যাই...সেখান হইতে আহিরীটোলা আসি। ৯।৯॰টার পর আশ্রমে ফিরি। যাইতে বসার পরই গোসাঁই ও তাহার বড় আতা আসে। বউয়ের নাকি ইচ্ছা, কাজেই গোসাঁই প্রভৃতিরও, যেখানে হেমন্তবাবু শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানেই শেষকৃত্য করা। আমি বলিলাম, তাহাতে তো আপত্তি নাই, মঠে উৎসবের আলোচনা এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে আমাকে একটু অগ্রস্তুত হইতে হইবে। উহারা ঠাকুরের সেবার জন্যে মঠে ২০৲ টাকা দিয়া যায়। দেশ কাল আর্থিক অবস্থার দিক হইতে মঠে হইলেই শোভন হইত। বিধবীদের ইচ্ছা। আমার আর উহাদের কোনও ব্যাপারের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না।...রেণুকে আজ Specific no 1 দেই।...ইহাদের চিকিৎসা করিয়া দেখি।...

৩রা এপ্রিল

সকালে রেণু আসে। জ্যৈষ্ঠের জন্য 'সমগ্র দৃষ্টি' প্রবন্ধের পঠন করি। রেণু প্রেস, বোধে ডিউচুয়াল ইত্যাদি স্থান ঘুরিয়া ৪টার পর প্রতিভার ওখানে যায়, ৫টার পর ফেরে। আমি আজ আর যাইব না।...১২টায় মালতী আসে। তাহার আবার ৬টায় ডিউটি। সংসারে কেহই বেশী আপন নয়, বেশী পরও নয়। নিজের জীবন ও আদর্শ বজায় রাখিয়া যতখানি পারা যায় মানুষের জন্য করিতে হইবে। করার তো কূল-কিনারা নাই। কিছু সংক্ষেপ করা উচিত। সে ও আমি ৪-৫০-এ বাহির হই। আমি মঠে যাই।...

৪ঠা এপ্রিল

সকালে রেণু আসে। ব্রহ্মসূত্রের ৩৩-শ ফর্মের প্রুফ দেখি। ভাষাভূমিকা লিখি। দুপুরে রেণু কলিকাতা শক্তি ঔষধালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, এ মুখার্জি প্রভৃতির ওখানে

যায়, এখানে আসে ৪টার পর।...ভাস্তভূমিকায় লেখা হয়—সংসারী পিতার কাছ হইতে পাইয়াছি সন্ন্যাস-দীক্ষা, সন্ন্যাসী গুরুর কাছ হইতে পাইয়াছি সন্ন্যাস-দীক্ষা। মহুর টাকা দেওয়ার উল্লেখ ব্রহ্মসূত্রের ভূমিকায় থাকিবে কি না, তাহা জানিবার জন্য রেণু কাল ভোরে মহুর ওখানে যাইবে। ভাস্তভূমিকায় প্রতিভা ও রেণুর সেবার উল্লেখও করিয়াছিলাম। আমার সমস্ত পাণ্ডুলিপিই প্রতিভা নকল করিয়া প্রেসের উপযোগী করিয়াছে। সে ছাড়া এ কাজ কে করিত? রেণু ছাড়াও তো বাহিরই হইত না। রেণু নাম দিতে আপত্তি জানাইল। সত্যিই যাহারা আমার জীবনে 'এক', তাহাদের নাম করা তাহাদের সেবাকে ছোট করিয়া দেখা। তাহারা আমার সব কিছুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িত। আমার নাম যতদিন, ততদিন তাহাদের নাম থাকিবে।

৩রা এপ্রিল

সকালে রেণু মহুর বাসায় যায়। মহুই প্রকাশক হইবে, অর্থ সাহায্যের কথা না লিখিয়া শুধু লেখা হইবে 'চেষ্টায়'। তাহে লেখা আছে, স্ত্রী পুত্র কন্যারা আমার অগ্রগমনে বাধা দেয় নাই, বলাধানই করিয়াছে। নীহার বলে যে ইহা ঠিক না। রেণু বলে যে, সে সময়ের কথাই তো লেখা হইয়াছে। তখন তো সকলেই অড়াইয়া ছিল, প্রাণ সঞ্চারও করিয়াছে। আর বর্তমানে তাহারা কার্যে যুক্ত না হইলেও বাধা দেয় না। মহুও ইহা স্বীকার করে। রেণু এখানে আসে। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের তর্ক-বিজ্ঞান (I, A-এর পাঠ্য) অনেকটা পড়ি। ভাল লাগিতেছে। রেণু অবধূত তাহের ভাস্তভূমিকাটা দিয়া আসে। সে কলিকাতা ঘুরিয়া ৪টায় আসে। আমি ৫টায় প্রতিভার ওখানে যাই। আজ হইতেই ৪ বার স্পেসিফিক খাওয়া আরম্ভ হইল। সেখানে এক ঘণ্টা ছিলাম। রেণু আসে। তাহার সঙ্গে বর্তমানের সমস্যা-গুলির কেমন করিয়া পুরুষোত্তমদর্শনের দ্বারা সমাধান মিলিতে পারে, তাহার আলোচনা করি। সে ট্রাম পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসে। সেখান হইতে অফিসে আসি। রেণু কমলা ও আসুর দেয়। আসিয়া দেখি ধীরেনবাবু আসিয়াছেন। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা থাকেন। তাহার ওখানে ত্রিপুরারী চক্রবর্তী মহাভারত পাঠ করেন। পিতা পুত্রের শ্রাদ্ধ করেন—নিমি রাজা করেন তাহার পুত্রের জন্য। ধীরেন বাবুর কথাই বলেন।...সকালে ৯টার পর গুরুগৌরবানন্দ আসেন, ঠাকুরের জন্মোৎসবের চিঠি দেন। তাহাকে ১৲ টাকা দেই। আজ মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত (৪৲ টাকা দিয়া কেনা) বড় চামচের এক চামচ খাই, উহা ১৪ দিনের ঔষধ।

৬ই এপ্রিল

সকালে ব্রহ্মসূত্রের শেষ ফর্মার গ্যালি প্রুফ দেখি। পরে ডাক দেখিবার জন্য অফিসে যাই। সেখানে চন্দ্রোদয়-বর্তি দেই। রাজসাহী হইতে শৈলেন্দ্র ও গোপেন্দ্রবাবুরা চিঠি দেন...। রেণু কলিকাতা যায়। সে ১২-৪৫-এ বাসায় ফেরে। ১৮০টায় এখানে আসে। সকালে ৯টায় প্রথম যায় কবিরাজ আসেন।...আমি ও রেণু ৪টায় কিছু আগে মঠে পৌঁছি। ৪।০টায় ঠাকুরের সামনে পাঠ আরম্ভ করি। আজিকার পাঠে 'ন জায়তে ম্রিয়তে' হইতে 'নৈনং ছিন্দন্তি' শ্লোক পর্যন্ত আখ্যায়িত হয়। অবধূত ভাস্ত পড়িয়া ব্যাখ্যা করি। দেহের অমরত্বই জোর দিয়া বলি।...কিছু পরে যতীশবাবু আসে। সে 'মন্দিরা' ও 'অরণ্যাণ্ডের স্থবীর রায়ের কাছে আমার বরিশালের জীবনের অনেক কিছু শুনিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছে। আমি একটা স্থিতিভূমির প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়া বলি। এই চঞ্চলতার বুকে 'স্থিতি' না থাকিলে আত্মরক্ষার উপায় নাই।...রাইহরণবাবু আসেন। ৯।।টার পর আশ্রমে ফিরি।...

৭ই এপ্রিল

সৃষ্টির প্রভাতে মাতৃসাধনা

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

প্রতি মুহূর্তে মানুষকে সৃষ্টি করে বাঁচতে হয়। বিধাতা এমন আশ্চর্য কৌশলে এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন যে, প্রতি মুহূর্তে এ মৃত্যুর কবলিত হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে অতিক্রম করে নূতন সৃষ্টিকে সে সফল করে তুলছে। মানুষ প্রাত্যহিকতার অভ্যাসবারা এমন আচ্ছন্ন থাকে যে, প্রতি মুহূর্তের জীবন-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নূতন সৃষ্টির এই প্রবাহের খোঁজ রাখতে পারে না। সাধকের জীবনে সে তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়—নিজের জীবন দিয়ে সে কথা তিনি মানুষের কাছে উপস্থিত করেন। নূতন সৃষ্টির এই গূঢ় রহস্য কথা কয়েক হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষের সাধক যে ভাবে উপলব্ধি করেছিল, তারই পথ অনুসরণ করে ভারতবর্ষে আজও সার্থক সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক মানুষ বিশ্ব-শক্তির পূজা করে আসছে। বৎসর বৎসর এই পূজা ঘুরে ঘুরে আসে। প্রতি দিনই এ পূজার তত্ত্ব অনুধাবনযোগ্য, তবু বৎসরে একবার করে বড় করে, বেশী করে এ তত্ত্বানুসন্ধান এই পূজা করার অন্তরে নিহিত।

এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন কে? বিশ্বভূড়ে যে এক বিরাট শক্তি নানা ভাবে—ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ভাবে—প্রকাশিত হচ্ছেন তার সাথে আমার সম্বন্ধ কি?

এ জিজ্ঞাসা আজকের নয়—সৃষ্টির আদিম প্রভাতের। মানুষের ইতিহাস-পথ সর্পিল, জটিল, অনন্ত। সেই কত দিন থেকে সে রওনা হয়েছে, কত রকম বিচিত্র পথে নিজেকে সে আস্বাদন করে চলেছে, নিজের অন্তর্নিহিত অনন্ত হয়ে-ওঠার তাগিদে, অনন্ত জিজ্ঞাসা আর উত্তরের ঠেলাঠেলিতে অর্থাৎ বিশ্বভূড়ে সেই মহাশক্তি আমার ভিতরে বাইরে যেভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে চেয়ে একদিকে ভিতর থেকে ঠেলছেন, আর একদিকে বাইরে থেকে আকুল আহ্বান জানাচ্ছেন, সে আহ্বানে মানুষ কত রকম করে সম্পূর্ণতাকে কল্পনা করে চলেছে। সে যখন তার গুহার প্রথম দিকে দেওয়ালে নানা চিত্র এঁকে ছিল, তখনও তার অন্তর্নিহিত কথাটা যা ছিল, পথের অনেকটা অগ্রসর হয়ে সে যখন মাতৃ-মূর্তি কল্পনা করে তুলল, তারও ভিতরের কথাটা অনেকটা একই—ভিতরে বাইরে একটা সম্পূর্ণতাকে আস্বাদন করার প্রচেষ্টা, বিরাটের মধ্যে নিজেকে দেখা, নিজের মধ্যে বিরাটকে দেখা। এই ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস—তার সৃষ্টির ইতিহাস।

জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই তার চেতন অচেতন অবচেতন সত্তা দিয়ে যাকে সে উপলব্ধি করে, সে এই মা। মানব-শিশু তার অবোধ সত্তা দিয়ে তার ক্ষুদ্র ঘরে মাতৃত্বের মধ্যে যে দৈত সত্তার একাত্মানুভূতি আস্বাদন করে বড় হয়েছিল, তার পরিণত বুদ্ধির প্রাগর্ভ দিয়ে বিরাট বিশ্বের খেলাঘরে একই মাতৃত্বকে তার স-বোধ সত্তা দিয়ে আস্বাদন করে বড়তর হল। মাতৃপূজার পরিকল্পনা অর্থাৎ মহাশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস মানুষকে এনে দিল একদিকে সমস্ত আকুতি দিয়ে জড়িয়ে ধরার গভীর পরিতৃপ্তি, অন্য দিকে সেই আকুতির বিরাট মুক্তি। যে-মাকে আমার ছোট্ট ঘরের ছোট্ট আঙিনায় আমার ছোট্ট দেহ দিয়ে পেয়েছিলাম, সে মাতৃত্বের কাছে সে দিন আমার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনটাই বড় ছিল বলে, আমাকে সমস্ত বিরূপতা থেকে আবরণ করে রাখতে তাঁকে আমাকে আঁকড়ে রাখতেই হয়েছিল। কিন্তু পরিণত সত্তার অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন জড়িয়ে থেকেও মুক্ত থাকা। মাতৃপূজার কল্পনায় তারই আস্বাদন। বিরাটকে প্রিয় করে তোলা আর প্রিয়কে বিরাট করে তোলার মধ্যেই সঙ্গে জড়িয়ে থেকেও মুক্তি, মুক্ত থেকেও জড়িয়ে থাকা। এইটাই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের 'মদন মোহন' তত্ত্ব, উপনিষদের 'তাজেন তুঞ্জীথা', গীতার 'মাম্ একমি'-র সাথে 'রাধাঃ কৃষ্ণ' তত্ত্ব।

যা আপনতম, যা বিরাট—এ এক অভিনব মিষ্টি আস্বাদন। বিরাটকে আপন করে জানতে পারা খুব সহজ নয়—অনেক দিনের চেষ্টার ফল সেটা, আর সেটা ভগবানের স্বতোৎসারিত আশীর্বাদেরও ফল। সে জন্যেই অবতার-তত্ত্বকে বুঝতে গিয়ে পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হন, মূঢ় হন। আবার আপনতমকে বিরাট করে তুলতেও মানুষের মন বাঁধা পেত, বাঁধা পায়। অথচ আপাতবিরুদ্ধ বলে মনে হলেও মানুষ এটা পারে, পেরেছে। আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যাঁর অস্তিত্বের মধ্যে এক হয়ে ছিল, তাঁর থেকে আপনতম কে আছে? এই উপলব্ধিই তো মায়া সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন রূপে শক্তির যে খেলা চলেছে, আমার রক্ষাকারিণী সে-ই তো মাতৃশক্তি, তাঁর মধ্যে আমি তো ওতপ্রোত হয়ে এক হয়ে থেকেও স্বতন্ত্র! এই বিরাট বিশাল জগতে একদিকে যেমন দেখি আমি একা, আর এক দিকে দেখি সমস্ত কিছু—সচেতন অচেতন—সমস্ত কিছুর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে তবে না আমি আমি? 'বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি ক্ষণ মোরে টানিছে, আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শত কোটী কর হানিছে।' সমস্ত কিছুর মধ্যে শৈশবের সেই মাকে জড়িয়ে থাকার আদিম প্রাথমিক অনুভূতি—অথচ আজ আমি স্বতন্ত্র। মানব-শিশু যত বড়ই হোক, বুদ্ধি তার যত পরিণতিই লাভ করুক, জড়িয়ে থাকার একটা আকুতি তার দেহ থাকা পর্যন্ত থাকবে যদি সে বিকৃত হয়ে না ওঠে। অথচ আজ আবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি চাই, আজ মায়ের বুকে মাথা রেখে তাঁর বক্ষস্পন্দনের মধ্যে 'বিশ্বের', 'সর্বভূতে'র পায়ের ধ্বনি শুনতে চাই। মায়ের পূজায় নিজেকে লুটিয়ে দেওয়া—বুদ্ধি-প্রান্ত সমস্ত সত্তা কাছে বিশ্রাম চায়, সারা দিনের শ্রম-শ্রান্ত ক্ষুদ্র শিশুটির দিনান্তে মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ার মতই। কিন্তু কোথায় পাব বিশ্রাম? কে আজ আমার বুদ্ধি-সত্তাকে পরিতৃপ্ত করেও আমাকে তাঁর স্নেহাঞ্চল দিয়ে ঘিরে রাখবে, আমার সত্তাকে তাঁর মধ্যে আধান করতে দেবে? তিনি এই বিরাট মাতৃ-শক্তি—যে শক্তিকে মা বলে ডাকবার সাহস সাধক করেছে, যিনি মা হয়েও বিরাট। আজকের বৈজ্ঞানিক মনোবিশ্লেষণ যে কথাটা বলতে চায় যে, মানুষকে প্রণোদিত করে, চালায় তার intellect না, তার intuition—যে intuition-এর sublimation করতে না পারলেই সংসারটা হৃদয়হীনতার অসৌন্দর্যে জীবনকে—ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনকে—বিষিয়ে-তোলে, সেই intuition-কে বিরাটের মধ্যে নিয়ে এসে তাকে sublimate করবার খবর পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের সেই তাঁরা যাদের কাছে সামগ্রিক জীবন-তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছিল। Intellect-কে শতগুণ বাড়ালেও সে intellect দিয়ে intuition-গত জীবন পরিতৃপ্ত হয় না, উন্নত হয় না। দশ মাথার বুদ্ধি নিয়েও রাবণ এই জন্যই অসুর—এই জন্যেই সে নারী তাকে চায় না, তাকেও সে ভোগ করবার জন্য হাত বাড়ায়; কিন্তু intuition দিয়ে, আমায় জড়িয়ে থাকবার প্রবণতা দিয়ে, আমার প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে যদি কোন বিরাটকে আপনতম করে তুলি, সেইখানে মানুষের intellect তৃপ্ত সে বিরাট বলে, intuition তৃপ্ত সে আপন বলে। এইখানে মানুষের মুক্তি—মাতৃপূজার এই মুক্তির খবর আছে। তাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 'অখিলাত্মার আত্মা' হয়েই নন্দ-নন্দন, যশোদা-নন্দন, ব্রজ বালক ও ব্রজগোপীদের একান্ত পরম প্রিয়, 'গোপবধূটীবীটং ব্রহ্ম'। এইখানে মাতৃপূজার পরিকল্পনার গৌরব, বিরাট বিশ্বের মধ্যে নিজের স্থান খুঁজে পাওয়ার পরিতৃপ্তি। মানুষের দুটো self-কে তৃপ্ত করতে হবে—intellect আর intuition দুটোকে তৃপ্ত করে ভারতবর্ষের মাতৃপূজার কল্পনা চিরন্তন হয়ে থাকবে। Intuition-এর উন্নীতকরণ, ভাগবতী করুণের যে জলন্ত দৃষ্টান্ত অবতার-শ্রেষ্ঠ অথচ চির মন-ভোলানো পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণ রেখে গেছেন, মাতৃ-পূজার সেই তত্ত্বেরই ভিন্ন রূপ, ভিন্ন আবেষ্টন, যা সহজভাবে সমাজ-জীবনের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে ঐ বিরাট মায়ের কাছে চিত্তকে আধান করতে পারার পরিতৃপ্তি, আর বিরাটের মধ্যে বুদ্ধির প্রক্ষালন। সমস্ত চণ্ডী জুড়ে বিরাটকে আপন করে তোলারূপ মুক্তির এক ইতিহাস, এক জয়োল্লাস। বিশ্ব

ছুড়ে যে শক্তির খেলা, তাকে মানুষ এইভাবে দেখল।

এই শক্তির দুই রূপ—এক ভাবে আমাকে সে রক্ষা করে, আর এক ভাবে আমাকে সে বাধা দেয়। যা বাধা দেয় বলে দেখি, যা ক্ষত, সে কি একান্ত ভাবেই আমার বিরুদ্ধ? তা নয়। আমার ছোট্ট ঘরে যে দুহিতা মা আমার আদর করেন, আর তিনিই যখন প্রয়োজন বোধে মুণ্ডিতা হন, শাসন করেন, এঁরা কি দুজন ভিন্ন, এঁরা কি একই মা নন? চণ্ডীর মাতৃকল্পনায় মা নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। 'যে শক্তি আমাকে বাধা দেবে তার সাথে ব্যবহার শেখাবেন বলেই তিনি অসুর মূর্তিতে তাঁর আত্মপ্রকাশ—অসুর তো তাঁর সত্তা থেকে আলাদা কিছু নয়, ও তাঁরই ভিন্ন রূপ। মানুষের জীবনে চলার পথে, প্রতি মুহূর্তের সৃষ্টি-প্রবাহে শক্তি তিন ভাবে আমার বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে—চণ্ডীতে তাদের নামকরণ হল মধু-কৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ। এই তিন অসুরের সঙ্গে মাতৃশক্তি—সংরক্ষিণী শক্তি—কি ভাবে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন—তিন দিনের পূজায় তারই কথা রয়েছে।

বর্তমান অতীতেরই নিংড়ানো ফল; বর্তমান ও অতীতের যথামূল্যে তাদের স্বীকার করে চলা খুব সহজ নয়। অতীত অনেক সময়ই আমাদের ঘাড়ে ভূতের মত চেপে থাকে। ভাল মন্দ সম্বন্ধে যে ধারণা বংশ-পরম্পরা এবং আমাদের শিশুকালের শিক্ষা দীক্ষা ও আবেষ্টন থেকে আমরা পেয়ে থাকি, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভাল মন্দের revaluation করা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব সহজ নয়। যুগ-স্রষ্টারাই সে নূতন মূল্যবোধ নিয়ে আসেন, দিয়ে যান। কিন্তু তাকে তো আমরা গ্রহণ করব? এই গ্রহণ করার শক্তি প্রার্থনা করি সপ্তমী পূজার দিনে। অতীতের যে রূপ মধু-কৈটভকে মা যে শক্তি দিয়ে বধ করেছিলেন, জয় করে নিয়েছিলেন, মায়ের কাছে, বিশ্বশক্তির কাছে—আমার সেই প্রার্থনা সপ্তমী পূজার দিন।

অতীতের সংস্কারকে জয় করে যে সৃষ্টি করা গেল, তাকে তো ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা করতে পারব না—কেউ, একা সৃষ্টি করতেও পারে না, সৃষ্টি রক্ষা করতেও পারে না। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদে এর পরিচয় পাই। তাই সৃষ্টিকে রক্ষা করতে, সবের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে মিলন; সকলকে আপন করে তুলবার জন্য যে সঙ্ঘ-চেতনা, তাই-ই হল অষ্টমী পূজার দিনের কথা। এই সঙ্ঘশক্তিধারাই মা সেদিনের অসুর মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। 'সর্বদেবশরীরজ' অতুল এক শক্তি বিচ্ছিন্নতা-রূপ মহিষাসুরকে জয় করেছিলেন। আমরা যদি সর্ব মনুষ্য-শরীরজ কোন শক্তি সৃষ্টি করে তুলতে পারি, আমরা যদি বিচ্ছিন্নতাকে সর্বতোভাবে পরিহার করে সঙ্ঘবদ্ধ হই, তা হলেই মহিষাসুরের সঙ্গে জয়ী হব।

সৃষ্টির পথে এর পরের বাধা হচ্ছে যা আমি সৃষ্টি করলাম, গড়ে তুললাম, তাকে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা, তাকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাগাবার প্রচেষ্টা। জীবের স্তরে সংসার জুড়ে এইটে চলছে। আমার এবং আমার জন্য—অপরকে বঞ্চিত করে, অপরকে উপোস রেখেও কেবল আমাকেই কেন্দ্র করে যে মনোবৃত্তি কাজ করে, সেই মনোবৃত্তিকে জয় করবার সাধনা নবমী দিনের সাধনা। শুম্ভ-নিশুম্ভ শক্তিকে 'আমার' বলে ভোগ করতে চেয়ে ছিল, কিন্তু সর্বভূতময়ী যে শক্তি সকলের কাছেই মাতৃ-মূর্তিতে প্রকাশমান, তিনি তো কারো একলার নন, তাঁকে আমার করে ভোগ করা যায় না—তাঁকে সকলের করে, 'সর্বভূতেষু' করে তারপর গ্রহণ করতে হয়, পেতে হয়। এইভাবে মাতৃসাধনা করার পরেই বিজয়া লাভ, বিজয়া দিনের মিলনোৎসব। এই দিনে মা-কে আমরা আমাদের সমগ্র সত্তার প্রণাম নিবেদন করি, আর সর্বভূতকে আনাই আমাদের প্রীতি।

কাব্যের ত্রি-ধারা

॥ অধ্যাপক ফণিভূষণ বিশ্বাস ॥

কাব্যের বক্তব্য তিনটি। সেগুলি যেন ত্রি-মুখের কথা। তার লক্ষ্যও ত্রি-বিধ পক্ষের দিকে। প্রথমতঃ কবি যখন নিজের সঙ্গে কথা কন, সেখানে অন্য শ্রোতা থাকে না। সেখানে শ্রোতা উদ্‌গাতা স্বয়ং কবি। কবি তখন ঘরোয়া মনের ঘরণী। অন্তরের দিকে তাঁর টান। আবার কবি যখন জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন, তখন তিনি বাইরের মালিক। তাঁর সে শ্রোতার জনতা ছোট বা বড় হতে পারে। শ্রোতারা সেখানে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে লক্ষ্য, কবি উপলক্ষ্য মাত্র। তৃতীয়তঃ কবি যখন নাটকীয় চরিত্রের মাধ্যমে কাব্যিক ভাষায় কথা বলেন, তখন সেই চরিত্রগুলিই পক্ষ, কবি উত্তর-পক্ষ মাত্র। তখন কবির ভাষাই সেই পাত্র পাত্রীর মুখের কথা, সে কথায় গভীর তত্ত্ব থাকলেও, কবির তাতে কোন সত্ত্ব থাকে না। এই কারণে সেখানে কবি নিজে কি বলবেন, সেটা বড় কথা নয়, তার প্রধান কথা কোন্‌টা কার মুখে জানাবে। আর সেই হুকে কথাকেও হুকে দিতে হয়। তাই কবির সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্রগুলো পরস্পরে বাঁধা ধরা হুকের মাধ্যমেই কথা বলে।

মূলতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যের পার্থক্য সৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যগত। আর সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরও বাড়ে কমে। প্রথমতঃ সেই খাদের গলাকে উঠাতে হয় চড়া পর্দায়। প্রথমটায় কবির নিজের সঙ্গে কথাটা যেন সুরেরই আলাপ। তা আপন খেয়ালে গুনগুন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাবণে থাকে নাটকে উক্তির ছিঁটে ফোঁটা। আর তৃতীয় স্তরের কবির উক্তি কিন্তু নিছক কথন নয়, সেটা তখন পাত্র পাত্রীর বক্তব্য, নাটকীয় ভাষণ। এই ত্রি-বিধ কণ্ঠস্বরের কথা।

এখানেই প্রশ্ন উঠার কথা। জিজ্ঞাসাটা হবে কাব্যের 'নিবেদন' সম্পর্কে নয়, 'আবেদন' সম্পর্কে। কথাটা এই যে, কাব্যের আবেদন কি ত্রি-মুখী হবে? কান এবং চোখের কাছে? সে কান চোখ তোমার আমার সকলেরই হ'তে পারে। তার অর্থ হ'ল, শ্রোতা বা পাঠক হবে একাধিক। কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তবে কি ব্যক্তি বিশেষের জন্য কাব্য লেখা হ'তে পারে না? নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় দু'টি হৃদয় দু' দণ্ড মুখোমুখী হয়ে বসবার জন্য? সেই নিটোল মুহূর্তের কাব্য এক জনের কবিতা হতে পারে। এ যেন প্রেমের কবিতায় এক জনের বিশেষ কথা অন্য মনের চিরন্তন বাহন হতে পারে। এমন একজন সহৃদয় শ্রোতা হলে, কবি জনতার কথা নাও ভাবতে পারেন। এ হ'ল আত্ম-তদগত-চিত্ত কবি-মনের নিরঙ্কুশ কথা।

'লিরিক' বা গীতি কাব্যে ব্যক্তি-মনের নিবিড় স্পর্শ পাওয়া যায়। সে উপলব্ধির জগতে ব্যক্তি-মন জানাজানি করে। কাজেই প্রাণের সে উষ্ণতায় ক্ষণকালের বিষয় চিরকালের স্বীকৃতি পায়। তখন ব্যক্তি বিশেষের সেই একান্ত কথা, চিরকালের আবেদন নিয়ে কানের ভিতর দিয়ে সকলের মর্মে প্রবেশ করে। তখন একান্ত ভাবে রাধার সেই কৃষ্ণ নামে সর্বকালের বিরহিণী-রাধার মনে বিরহের বেদনা ঘনিয়ে তোলে। নিমেষ তখন অশেষ হয়ে সোপানে যেন পায় সমুদ্রকে। আর তখনি বিদ্যাপতির মত এক নিবিষ্ট প্রেমের আন্তরিকতায় কবি মাত্রই বলতে পারেন, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখিনু, তবু জুড়ান না গেল'। সে প্রেম তখন মানুষী গণ্ডীর মধ্যে সীমিত থাকে না, অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে আসে তার ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা।

এ যেন হৃদয়কৃতি যে কাব্যে স্বীকৃতি পায়, তাকে কোন কালের বিকৃতি স্পর্শ করতে পারে না। চির যুগের সত্যব্যঞ্জনায় সে কাব্য ঝলমল করে। সে কাব্যের প্রতিকৃতি

নির্জনতার কথা থেকে স্বয়ং যীশুর মতই বেরিয়ে এসে একটি ম্লান নারীকে দেখা দিয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ করে দিতে পারে। আর সেই অনুভূতির আতিশয্যেই একালের এক নগণ্য কবিও বলতে পারেন, 'কিস্ মি, হেভেন্ আই হ্যাভ্ ডেড্।' অথবা সেখানে বিদ্যুতেই সিন্ধু দেখাটা অসম্ভব নয়। মানুষের এ হেন যে শাশ্বত স্বভাব, কোন অভাবেই তার মৃত্যু নেই। তাই এই স্বভাব-কৃতির কাব্য চিরকালের সমস্ত বিকৃতিকে অতিক্রম করে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে—'দেয়ারইজ্ অল্ বি আর্থ ইজ নেচার ডেড্।' এমনতর অনুভূতির অভিব্যক্তি শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না। সে ব্রাউনিং-এর মত সর্ববাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলে 'ওয়ান ওয়ার্ড মোর'।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাব-ধর্মী কাব্য কিন্তু এহেন এক-মুখীতাকে মানতে চায় নি। কবি ব্রাউনিং-ই তার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর ওয়ান ওয়ার্ড মোর কাব্যই তার দৃষ্টান্ত। কবি সেখানে নারী পুরুষের প্রণয়াত্মক কথোপকথনের মধ্যেই তুলেছেন এক চমকপ্রদ প্রতিবাদের ঝড়। এক কথায় তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কোন মহৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই একক নয়, তা বহুধা বিচিত্র। অতীতের ফালমি-খেঁটে সেই বক্তব্যকেই সুকৌশলে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন—

র‍্যাফেল একশ' সনেট লেখেন—
তার প্রতিটির এমন যে,
সেগুলি যেন ছবার সূচ্‌নো
পেনসিলে আঁকা—
সেটা যেন কেবল ম্যাডোনার মূর্তি
চিত্রণেই ব্যবহৃত হয়ে ছিল।
জগৎ হয় তো দেখবে একটি কলেবর,—
সেই একক বস্তু কি,—তোমার মনে প্রশ্ন জাগাবে?
তোমার হৃদয়ে উপদেশ দেবে?—
তুমি আমি হয় তো সে অধ্যায়টি পাঠ করবো,
আর আমরা সকলেই কি পড়বো না? হয় তো পড়বো।
ম্যাডোনাকে দেখে মুগ্ধ হওয়ার আগে
তাকে একবার এক দেবদূত সৃষ্টি করেছিলেন,—
কাকে খুশী করবার জন্য?
তোমরা হয় তো কানে কানে বলবে—
রিয়াফিচেকে। তার সে মূর্তি ছিলে গড়া?
আমরা বলবো সে মূর্তি হ'লো—
তাদের কোমলতা দিয়ে গড়া,—
তাই নয় কি? বিশেষ অনুমান না করেও
আমরা কিন্তু বলতে পারি যে
এ সবই একক গভীর তাৎপর্যকে ছাড়িয়ে গেছে।

এই বিবৃতিধর্মী কবিতার পরিমণ্ডল দুটি। এক বিশিষ্টতায় ঘনিষ্ঠ ছোট জনতায় পরিচিত পরিবেশ। দ্বিতীয়টি হল অগণ্য জনতায় প্রোজ্জ্বল-বরণী। যতীন্দ্র মোহনের অন্ধ-বধূ কবিতায় এই প্রথমোক্ত পরিমণ্ডলটি এক নিবিড় আত্মীয়তায় কি ঘনিষ্ঠ। দুই আত্মজ সখী—বধূ ও সমবয়সী ননদের কথোপকথনে, এক অন্ধ গ্রাম্য বধূর অন্তর-বেদনায় কি সকরুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। আসন্ন বসন্তের সন্ধ্যায় পল্লীর ঘাটের পথে চলতে চলতে সংলাপের সূত্রে মনোজ্ঞ ভাষায় অন্ধ-বধূর উত্তর প্রত্যুত্তরে ফুটে উঠেছে—

পায়ের তলায় নরম মত ঠেকল এটা কি?
আছে একটু চল্‌না ঠাকুর ঝি।

এ যেন মর্ম-স্পর্শী সংলাপী চিত্র পৃথিবীর সাহিত্যেও দুর্লভ।

আরো ঘরোয়া দৈনন্দিন সংলাপের চিত্র পাই হাল আমলের একটি আধুনিক কবিতায়। সেখানে সামান্য কথার সূত্র ধরে কবি আমাদের নিয়ে গেছেন গভীর রস-লোকের পথে নিগূঢ় তত্ত্বলোকের দিকে। যেমন—

এখুনি নাটক শুরু হবে? তখনের পাশের তত্ত্বলোক।
চমকে তাকালাম সেদিকে,—কী আশ্চর্য প্রশান্ত দীপ্ত মুখ,
যেন পুণ্যশ্লোক ঋষি মূর্তি।
নাট্যাভিনয়? জিজ্ঞাসু দু'চোখ
ফিরিয়ে পাল্টা প্রশ্নই করি।...

...এ হেন কথাটা বলতে না বলতে
নেপথ্যের আড়াল থেকে বেজে উঠে হঠাৎ ঘণ্টাটি।—
সে সুর তত্ত্বলোকের মনে হেসে দিল কল্পনায় সলতে।

সেই চেতনায় অগ্রলোক বলছেন সমস্ত বিশ্ব আর্ট—
এক অপরূপ সঙ্গতির ঐকতান,—বাজছে অহরহ—
স্থলে-জলে অরণ্য পাহাড়ে রাত্রিদিন। অন্তরীক্ষেও শুনি,
কি আশ্চর্য রাগ রাগিনীকে নেপথ্যের অমৃত সঙ্গত
বাজাচ্ছে বিশ্ব-কনসার্টের সুরে পথে বিচিত্র ঝরঝুনী।

আরও ঘরোয়া সংলাপের সুর ফুটে উঠেছে সম্পাদক সমীপেষু শীর্ষক আধুনিক কবিতায়। এখানে সাহিত্য জিজ্ঞাসার তত্ত্ব-বিশ্লেষণের চিত্রটি কি হৃদয়গ্রাহী—

অর্ঘ্যের ঘূর্ণিতবাবু, আপনার হালের মাসিক
পত্রিকা খুলেই আমি 'বসুধার' সে ধারাবাহিক
উপন্যাসের বাকীটা এই মাত্র পড়ে উঠলাম :
শেষের অধ্যায় দুটো শেষ করে আজ ভাবলাম
আমরা আবার যেন ক্রমশঃই ফ্রত ফিরে যাচ্ছি,—
বিদ্যাসুন্দরের যুগে। উপন্যাসে যে চরিত্র পাচ্ছি
তাদের বুকের মধ্যে সংযমের কোন বালা নেই,
প্রবৃত্তির সে উগ্রতা যেন 'হাভি' ও 'চেকভকেই'
ফেলেছে বহু পিছনে।

সাহিত্যের এ অধঃগতি রোধের পথও বাতলে দিয়েছেন কবি। বলেছেন যে, কোন কিছু সৃষ্টি করবার আগে দেখতে হ'বে তার সাহিত্যিক মূল্যটা কি। আর সেই পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি হ'বে এহেন সর্বাত্মক—

.. ই-জোলার চোখে—
সব তন্ন তন্ন করে সমাজের প্রত্যক্ষ আলোকে
সমস্ত দেখতে হ'বে সমগ্রতার প্রতিফলনে,—
যা চিরন্তন স্বীকৃতি পাবে এই মনোবিকলনে!
অর্থাৎ সে দেখার জন্য চাই কিন্তু স্বচ্ছ আয়না :
তার জন্য লেখককে দিতে হ'বে অশ্রিম বায়না :
যার একটা থাকবে লেখকের দৃষ্টির সামনে,
এবং অন্য দর্পণটি সযত্নে থাকবে পিছনে
ঠিক লেখকের পিঠে। তার ফলে যে পথে যখন
লেখক যেমন ভাবে চলবেন,—ছবছ তখন
সে পথের অবিকল ছবি ফুটবে সেই আশিতে—
তেমনি নিত্য বিধিত হ'বে কাল সত্যের সাক্ষিতে।

পাশ্চাত্য কবি টেনিসনও তাঁর ইউলিসিসের জবানীতে সর্বকালের উদ্যমশীল দুঃসাহসী শক্তির মানুষের জীবন উপভোগের তাৎপর্যের কথা বলতে গিয়ে আত্মজীবনের অমর সংকল্পের উক্তি দিয়েছেন, আই উইল ড্রিঙ্ক লাইফ্ টু দি লিজ।...আবার কাব্যের ধ্যানলোক থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসেছেন দুঃখ কষ্ট জর্জরিত বাস্তব জনারণ্যে। সেখানে বৃহত্তর জনতার অমৃত উপস্থিতিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে আত্ম-জাগৃতির এই উদাত্ত বাণী—

কবি, তবে উঠে এসো যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
যতো দুঃখ, যতো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
যতোই দরিদ্র, ক্ষুদ্র, যতো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ সৈন্য মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

সত্যেন্দ্রনাথ 'গান্ধীজী' কবিতায় গৃহাভ্যন্তরের খেয়ালী মানুষদের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন গণ-আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য—

ঘরে দীপ জ্বালি ওরে ও খেয়ালী কি লিখিস হিজিবিজি?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্—গান্ধীজী গান্ধীজী।

অন্যদিকে নাট্য-কাব্যে আমরা শুনি কবির সৃষ্ট কুশীলবদের মুখে নাটকে আবার সংলাপ। আমরা যখন সেক্সপীয়ারের নাটক পড়ি, তখন আমরা তাঁর সৃষ্ট মানুষের কথা শুনি। কিন্তু ব্রাউনিং-এর নাটক পড়ার সময় আমরা বের পাই পাত্র পাত্রীর মুখে স্বয়ং ব্রাউনিং-এর কথা। তাঁরই কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্টই কানে আসে। তেমনি রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদন কাব্য-নাট্যে শোনা যায় গান্ধারীর জবানিতে স্বয়ং কবিরই যুক্তিতর্ক, তাঁর জোরাল ভাষণ।

এর ফলে কাব্যরস সৃষ্টি হ'লেও নাট্যকৃতি ব্যাহত হয়। নাট্য-কাব্যের স্বগতোক্তি ঘটনা সংঘাতের সূচনা করতে পারে, কিন্তু চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে না। ঘটনার সংঘাত এবং কর্ম-তৎপরতায় চরিত্র-সৃষ্টি হয়। আর হাসি-কান্নায় সন্দেহ-বিশ্বাস তাদের ধমনীতে বইয়ে দেয় যে প্রাণের

শকুন্তলা, নাটকের সেই জীবন্ত মানুষগুলি তখন চিরকালের স্বীকৃতি পায়। তারাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে নিজাদের মতই বলতে পারে, 'ভিনি-ভিডি-ভিসি' : আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। সেক্সপীয়রের সেই মহান নাট্যকৃতি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

আর নাটকের এই স্বগতোক্তি, যুক্তিবাদী সচেতন শ্রোতাদের মনে কেবলি ধাক্কা দিতে থাকে। তাতে নাট্য-ভাবের নাট্য-রস ব্যাহত হয়। তখন সচেতন শ্রোতাদের মন বিরক্তির ক্লান্তিতে ভরে উঠে। তখন অসহায় চরিত্রগুলোর চারপাশে কথাগুলো যেন ভীড় করতে থাকে। তখন যা চরিত্রগুলো দমকে দাঁড়িয়ে থাকে, নেপথ্য থেকে স্বয়ং কবিই তাদের জবানীতে কথা বলেন। এটা কিন্তু প্রকৃত নাটকের পক্ষে অনভিপ্রেত। তাই সমালোচকেরাও বলেছেন যে, dramatic monologue cannot create character, action forms character। কাজেই কাব্য-নাট্যে আমরা অবশ্য নেপথ্য থেকে কবির দ্বিতীয় কণ্ঠ শুনতে নারাজ। সেখানে পাত্র-পাত্রীর মুখে আমরা শুনতে চাই নৈর্ব্যক্তিক কথা,—যা সংযমে নিগূঢ়, আলাপে গভীর ও বাস্তবে সত্যই।

বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে মোর মাঝে এসে।
প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে ভার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনায়—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন?
কিন্তু, কেন।

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীবিত্যাগোপাল—

[illegible] সম্পাদিকা—শ্রীমতী [illegible] এম. এ পক্ষে [illegible]

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র-ধর্ম্মের ভেদের কাটলে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটি স্বয়ংমূল্য আস্বাদন—ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম আস্বাদন করায় জীবনের অতিগ (transcendential) দিক, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (immanent) দিক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুইই। তাইতো তিনি জীবন-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম্ম বা একান্ত রাষ্ট্র অচল। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ' (ভোজপতি কংসের মৃত্যু) বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্ম্মপতিরূপে 'তত্ত্বং পরং যোগিনাম্' (যোগিগণের পরতত্ত্ব কৈবল্য)।

শ্রীপুরুষোত্তমাবন্ধ

উদ্বোধন

কার্ত্তিক, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১৫)

…যেহেতু অন্তে দুটামি করে, সেইজন্য আমাকেও দুষ্টামি করতে হবে?…নিত্যগোপাল, পিতা, পিতা, মানুষকে তুমি ক্ষমা কর।…প্রত্যেক মানুষ ব্রহ্ম; তুমি ব্রহ্ম হতে এসেছ।…সারাজীবন আমি একতরফা দরে এসেছি—জ্যেঠতাত ভাইরা বিষয় থেকে বঞ্চিত করেছিল—কিছু বলি নি, বলেছি—আমার লাউ লক্ষ্মৌ থেকে আসবে—ঝগড়া করলে কেউ কিছু পায় না—তুমি কটুকথা কও, আমি হেসে কথা কইব। পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যবহার এই খলসংযমনের একটা বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।…কথায় মীমাংসা হবে না—বড় হও, দোতরফা লড়াই করো না—বাক্য সংযম কর, চিত্ত সংযম কর—বাবার কোলে এসে বসো।…

১৭. ৬. ১৯৭৬। গোরা…গোলোকনাথ আজ ধরায় ধূলায়—

এদেশে ওদেশে বহুত অন্তর জানয়ে সকল লোকে।
এদেশে ওদেশে মাথামাথি আছে একথা কহোনা কাকে।

—আমার গৌর এই গোপন কথা শুনাইয়া গেলেন—গোলোক ভূলোক এক করিয়া গেলেন—চৈতন্য-অচৈতন্য, চিৎ-জড় একই সূত্রে গ্রথিত। গোলোকের সৌন্দর্য-মাধুর্য আজ একত্র আস্বাদিত—অজড়ের সঙ্গে আজ জরা-মরণশীল মানুষের মিলন—নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে একত্র হইয়া রয়—ঈশ্বর মানুষ, মানুষ ঈশ্বর।…যে কথা বলিবার নয় সেই কথা বলিবার জন্য গৌরসুন্দর আসিলেন—গোলোকের প্রেম এই অপ্রেমের দেশে বলিবার জন্য এই মায়ার বুকে, এই বিচ্ছিন্নতার বুকে সর্ব্বধর্ম্মময় প্রভু স্থাপন সর্ব্ব ধর্ম—আত্মার মাঝে ভেদের অভাব…সকল জীবকে একই ব্রহ্মসূত্রে আবিষ্কার করিতে গৌর নিত্যগোপাল ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া আসিলেন—সকল ভেদের মাঝে একই অভেদ স্থাপন করিতে, সকল বিচ্ছিন্নতাকে একই সূত্রে প্রকাশ করিতে আসিলেন নিত্যগোপাল। নিত্যগোপাল, বিয়োগের দেশে তুমি যোগ—বিযুক্ততার মাঝে তুমি যুক্ততা, যোগ-সূত্র; সকল ছাড়াছাড়ির মাঝে তুমি কোলাকুলি; সকল বাহিরের মাঝে তুমি অন্তর, সকল অন্তরের মাঝে তুমি বাহির। তুমি দূরে তুমি অন্তিকে—তুমি ব্রহ্ম বিদ্যাপতি আমার নিত্যগোপাল, আমায় ঐক্যের অমৃত পান করাও। সকলই আমি বলিয়া বুঝিব—আমি ব্রহ্ম—বিশ্ব আমার বাহিরে নয়—বিশ্ব আমার বুকের মাঝে—আমি সর্বং—এই ব্রহ্মবিদ্যা আস্বাদন করিবার অধিকার দাও।…আমার বাহিরে যাহা কিছু দেখিব তাহাই আমাকে পরাস্ত করিবে—আমি অন্তর বাহিরে একই তত্ত্ব বুঝিব—এই বিশ্বে একই ধন, একই শক্তি, একই ধনভাণ্ডার—কাহারও কিছু নাই—সব তোমার। আমার ধর্ম বলিয়া কিছু নাই—ধর্ম তোমার।…আমার মমতা চুকাইয়া দাও—আমার বলিয়া কিছু নাই—তোমারি বিশ্ব, তোমারি সম্পদ—তোমার চরণে মাথা ঠুকিয়া যতটুকু আমার। তোমার আমি শুধু সেবাই করিব—সেবকের মিলিবে শুধু

বজ্রাশিরাসিনঃ, সকলের ভোগের শেষ যাহা তাহাই অমৃত, তাহাই আমার—অন্নাধিকার তোমার বিষে—আমি শুধু উচ্ছিষ্ট-ভোগী; বিশ্বনাথ, তোমার প্রসাদভোজী—আমি অন্নরাগ লইব না অহঙ্কার বশে—ওগো ভোক্তা, আমি অবশেষ অমৃত লইব, বিষের উচ্ছিষ্ট লইব—তোমার বিষের দুয়ারে···তোমারই সেবা করিব—জীবের সকল ভোক্তৃত্ব-অহংকার চূর্ণ হউক—আমায় অমৃত দিয়াও। ভোগের পথে মৃত্যু—অহংকারপূর্ব্বক ভোগ দুর্ভোগ—আমি ভোগ করিব না—ওগো বীর দুনিয়ার মালিক—ওগো রাজাধিরাজ—তোমারই ভোগে অধিকার—তুমি ভোগী হইয়াও যোগী—আমি প্রসাদ কুড়িয়া যোগী হইব। নিত্যগোপাল, ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ।

১৭. ৯. ৫৩—সন্ধ্যা। আজ আর বেশী কিছু বলব না—দু ঘণ্টা এর আগেই আলোচনা করেছি। একটা কথা শুধু বলি, প্রাণ কখনও ফাঁকি দেয় না—বাক্যমন সবাই ফাঁকি দেয়, বুদ্ধিমানেরা ফাঁকি দেয়, কিন্তু প্রাণ, অন্ধ বিনা, সে ফাঁকি দিতে জানে না। আমি এই প্রাণোপাসনা নিয়েছি—কোন সম্পর্কের সঙ্গেই ফাঁকি নেই নাই—পিতা-ভ্রাতা-বন্ধু-গুরু কোন সম্পর্ককেই ফাঁকি দেই নাই। তোমরাও দিয়ো না—যোহাই ভগবানের, যে সম্পর্কের যে অর্থ সেই অর্থে তাকে নিও, ফাঁকি দিয়ো না···সকল সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে ব্রজের সম্পর্ক—সকল সম্পর্ককে প্রাণ ঢেলে বাস্তব সত্তায় পরিণত কর, সার্থক হও।·· আমার জীবনে নিত্যগোপালের আশীর্ব্বাদ আছে, তা তোমাদের হউক—কিন্তু আশীর্ব্বাদও চিরদিন থাকে না।···

১৮, ৯, ৫৩ সকাল।···নিত্যগোপাল, তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার, আমার সকল দেহ মন প্রাণ লইয়া তোমায় নমস্কার, আমার উদ্ধত অহংকার তোমার পায়ে লুটাইয়া দেই···আমার নমস্করণের মধ্য দিয়া তুমি আমার জীবনে প্রকাশিত হইবে···এই দেহ মন প্রাণ তোমার বেদীর মত হইবে—নমস্করণের ভিতর দিয়া তুমি আমার জীবনে প্রবেশিবে—আমার অহংকার দিয়া আমি বাধা দিব না—তোমার প্রবেশপথে আমার বুদ্ধির কুটিলতা দিয়া আমি বাধা দিব না···আমার জীবনে তুমি রমণ করিবে—রাম রাম ···আমার সকল দিয়া আমি তোমায় আনন্দ দিব—সকল দেহ মন প্রাণ লইয়া তোমায় আহ্লাদ দান করিব।··· তোমার অবাধ প্রবেশে আমার জীবনে বাস্তব হউক—সেই তুলসী তিল তোমার চরণে বিকাইব—আমায় আমি তোমায় সঁপিনু—রামনারায়ণ নিত্যগোপাল, আমার হৃদয়ের রাজা, তুমি অবাধে আমার হৃদয়ে তোমার আসন বিস্তার কর—আমার জীবনে তোমার আসন বিস্তার কর। সকল বুদ্ধির মাঝে তোমার বুদ্ধি ফুটিয়া উঠুক—তোমায় নমস্কার। স্বামী, তোমায় বিশ্বমানবের আমি পূজারী।—নিত্যগোপাল, আমার আত্মপূজা গ্রহণ কর—তোমার সেবার দিন আমার ফুরাইয়া গেল। নয়ন জলে তোমার পা ধোয়াইব, আমার গঙ্গাজল এই নয়ন গঙ্গাজলে তোমার পা ধোয়াইব—তোমার চরণ বুকে ধারণ করিব। আমি তোমারই মাঝে আমাকে হারাইয়া ফেলিব—আমার হৃদয় ফুল হউক—আমার স্বামী, জগন্নাথ—আমার পূজার দিন নিকটে এল, আমার স্বামী, তোমায় নমস্কার, অকপটে, বুদ্ধির সকল চালাকী ছাড়িয়া দিয়া তোমায় নমস্কার, হাতে কিছু না রাখিয়া তোমায় নমস্কার। আমার কোন অভিসন্ধি নাই—আমি ধর্ম্ম চাই না, অর্থ চাই না—বিষ্ণু চাই না···শুধু তোমায় নমস্কার—তোমার চরণতলে পড়িয়া রহিব, ইহাই আমার সার্থকতা···আমার মস্তকে তোমার চরণ শোভা পাইবে—তোমার চরণ লইয়া আমি অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইব।···তোমায় নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার—তোমায় নমস্কার—। ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।—নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল।

সন্ধ্যা। ওঁ নমো ভগবতে ভক্ত-ভগবতে নিত্য-গোপালায়...। যে প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করা হল, সে মন্ত্রে নিত্যগোপালকে ভক্ত-ভগবান বলা হল। কেন? ভক্ত-ভগবান মানে ভক্তের ভগবান তা নয়—ভক্ত এবং ভগবান। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান যদি শুধুই ভগবান হতেন তাহলে ভক্তের যে একটা নিজস্ব মূল্য, নিজস্ব মর্য্যাদা আছে—সেটা চাপা পড়ে যেত।...ঈশ্বর তিনি যিনি জীবের সাথে সমান ব্যবহার করেন না—ঈশ্ ধাতু অধিনীকরণ বুঝায়। ভগবান

তা নয়—তিনি ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করেন—ঈশ্বর শুধু কাঁদেই ওঠেন, ভগবান কাঁধে নেনও। এই যে দুইয়েরটা দুইয়ে বদলে নেওয়া, এইটে বোঝাতেই ভক্ত ভগবান বলা হয়েছে।...measure—মাপ।.. ভক্ত-ভগবান দুইই সম স্বার্থ—ভগবান ভক্তের দুঃখ বোঝেন, ঈশ্বর বোঝেন না—তিনি শোষক, ভগবান শোষক।...সম্মান পাওয়া ও সম্মান দেওয়া দুটো এক সঙ্গে থাকতে হবে।...যে প্রণাম পায় সে পুরুষ, সে প্রণাম করে সে প্রকৃতি; যে ভোগ করে সে পুরুষ, যে ভোগ যোগায় সে প্রকৃতি। এই হচ্ছে পুরুষ প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য। প্রত্যেককে এই দুই-ই হতে হবে, তাহলেই উপাধি-মুক্তি।.. মেয়ের ভিতর পুরুষ আছে, পুরুষের ভিতর মেয়ে আছে—পুরুষেরাই শুধু সম্মান পাবে, মেয়েরা শুধু দেবে, তা নয়, মেয়েরাও সম্মান পাবার অধিকার রাখে।...পুরুষ প্রকৃতি একই সঙ্গে গৌর ...। মাথা উঁচু করে থাকার মধ্যে আছে পুরুষত্ব। মাথা নীচু করে থাকা মেয়েত্ব। দুই যোগ্যতাই আজ সকলের থাকতে হবে। একতরফাত্ব আজ আর চলবে না—কথা শোনাতে চাও, কথা শুনতে শেখো, অপরের কথা শুনতে চাও।...পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে খুঁজতে চাওয়াই মুক্তি!...সংসারী, বিষয়ী লোক নিজের স্বার্থপরতা দেখতে পায় না, অন্যের স্বার্থপরতা ঠিক দেখে।...অন্যের কাছে জিজ্ঞেস কর তোমার ব্যবহারে সে দুঃখিত কি না।...যা চাও তা মানুষকে দিয়ো, যা দেবে তাই পাবে।...সেই গল্প জান যে বৃদ্ধা মা-কে তার পাখনা খেতে দিত—... যা করবে, তাই পাবে।...কর্তৃত্ব করবে?—তাহলে দাস হতে হবে। সেবা কর, কর্তৃত্ব পাবে।...পরস্পর-বিনিময় ধর্ম বিশ্বে প্রকাশ করে গেছেন শ্রীনিত্যগোপাল—তাই তাঁকে ভক্ত-ভগবান বলি।...নিত্যগোপালের পায়ে যদি মাথা ঠেকিয়ে রাখতে পারি, তবেই বেদান্ত লিখতে পারব।...কর্তা হতে চাইলে বেশীদিন কর্তৃত্ব টিকবে না। ভগবান ভক্ত হবেন, ভক্ত ভগবান হবে—রাধারাণীকে কৃষ্ণ সাজিয়ে দিলেন পুরুষের মত, কৃষ্ণকে রাধা সাজিয়ে দিলেন মেয়ের মত।...পুরুষের পুরুষত্বের অহংকার, মেয়ের মেয়েত্বের হীনতা-বোধ দুইই বর্জন, দুই-থেকেই মুক্ত হতে হবে...ন সে রমণ, ন হাম রমণী...যার অহং নাই, তার অহংকার প্রতিষ্ঠিত—যার অহং রয়েছে, তার অহং ধূলিসাৎ হবেই...।

১৯. ৬. ৫৬।...সোনার কমল গোরা ধূলায় লুটায়—ভবিষ্যিকির বাঞ্ছিত ধন ধূলায় লুটায়—ধরার ধূলির মান প্রতিষ্ঠিতে—প্রাণের মান প্রতিষ্ঠিতে প্রজ্ঞা আর প্রাণের কোলে গড়াগড়ি যায়—গৌর একাধারে পুরুষ-প্রকৃতি।... রাধার আত্মনিবেদন জীবের হওয়া দরকার...অমানী মানদ হইয়া, সকল গর্ব চূর্ণ করিতে ধূলায় লুটায়। সকলের অহংকার চূর্ণ করিতে, বিশ্বে যাহা কিছু লাঞ্ছিত নিপীড়িত শোষিত তাহাকে সম্মান দান করিতে রাধাতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব—চম্পকবরণী রাধা নিত্যগোপাল সেজেছে...জয় নিত্যগোপাল —অজড়ের জয়, জড়ের জয়, আকারের জয়, নিরাকারের জয়, ব্রহ্মের জয়, মায়ার জয়—আমার নিত্যগোপাল সর্বসমন্বয়মূর্তি।...পরস্পর বিবদমান যাহারা, পরস্পরদ্বেষী যাহা তুমি সেই সকলেরই যোগসূত্র—যাহারা একে অপরকে অস্বীকার করিয়া চলিয়াছে, তুমি তাহাদের মহাপ্রেম, মহামৈত্রী। তুমি বিয়োগের মাঝে যোগ, তুমি ত্যাগের— বিত্তাগের মাঝে পূরণ, পরস্পর পরিপূরণ;...যাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাহারা যে এক অন্যের পরিপূরক তুমি তাহা শিখাইয়া দাও—ব্রহ্মের পরিপূরক মায়া, মায়ার পরিপূরক ব্রহ্ম, একের পরিপূরক বহু, বহুর পরিপূরক এক—এই ব্রহ্মবিদ্যা আমি আস্বাদিব—নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল কর্ম জ্ঞান ভক্তি পরস্পর পরিপূরক, দেহমন আত্মা পরস্পর পরিপূরক...। নিত্যগোপাল, আমার প্রাণনাথ, জগন্নাথ...তুমি সজ্ঞের মাঝে মহামিলন, প্রাণনাথ জগন্নাথ—ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ...নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, নিত্য-গোপাল...।

ক্রমশঃ

শিক্ষার বিভিন্ন সম্ভাব্য মাধ্যম

॥ অধ্যাপিকা মীরা রায় ॥

কেবল লেখাপড়া শেখা মানেই শিক্ষা পাওয়া নয় এবং বইয়ের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা-বিস্তার করা ছাড়াও সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শ, মানব-সভ্যতার নানান কীর্তি-কথা, এইগুলো ছড়িয়ে দেবার জন্যে আরও নানা মাধ্যমের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। প্রধানত আমি বলব এ প্রসঙ্গে ছবি জিনিসটাকে কেমন কোরে শিক্ষার মাধ্যম কোরে তোলা যায়। তাছাড়া সভ্যতা কেবল মাত্র পুঁথির পাতাতেই বিকশিত হয়ে ওঠে নি। অন্যান্য সব ললিতকলা রয়েছে যে গুলির মূল্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিছুমাত্র অল্প নয়। সেগুলির এ মূল্য সম্বন্ধে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা, তাদেরকে অবহিত কোরে তোলা অতি প্রয়োজনীয়, তাদের শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ কোরে তোলার জন্যে। এবং পুঁথির পড়া বস্তু যদি রঙে রূপে চোখের সামনে দাঁড়ায়, সে বস্তুটা মনে ছাপ ফেলতে পারে বেশী কোরে, এবং স্পষ্টতর ভাবে। চক্ষু ছাড়া শ্রবণেন্দ্রিয়কেও আহ্বান করা যেতে পারে শিক্ষার কাজে অনুরূপ সহায়তা করার জন্যে। পড়া জিনিস কানে শুনলে সেটা আরও পাকা হ'য়ে মনে বসবে।

প্রথম কথা ছবি আসবে কোত্থেকে। পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে ছবির বই ও নানা এমনি বই ঘেঁটে ঘেঁটে প্রয়োজন মাফিক ছবিগুলি সত্বর সংগ্রহ করতে হবে। নতুন কোরে আঁকিয়ে নেবার খুব দরকার হবে না; বিশেষতঃ ইউরোপীয় চিত্রীরা বোধহয় কোন বিষয়কেই রঙে তুলিতে ফলিয়ে তুলতে বাকী রাখেন নি। তারপর তাদেরকে বাঁধানো। ব্ল্যাক্‌বোর্ডে বা পিনবোর্ডে এগুলো আঁটাই ছবিদের, বারের দিক থেকে। এরপর সাজানো। সাজাতে হবে অপেক্ষাকৃত নীচুতে, দর্শক যাতে অনায়াসেই ভাল কোরে দেখতে পান। পাশা-পাশি serially সাজিয়ে যাওয়া হবে—এক একটা বিষয়, এক একটা যুগ হয়তো এক একটা দেয়াল জুড়ে বা ঘর জুড়েই উপস্থাপিত হোল। নিদারুণ দেয়ালগুলি ছবিতে ছবিতে কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে ব্যাকেল-চার্চ বা অন্যান্য গীর্জাদি দেখলে কিছুটা বোঝা যায়। ব্যাখ্যা সম্বলিত ছবিগুলি সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র, বিদ্যালয়, লাইব্রেরী ইত্যাদির দেওয়ালকেই অলঙ্কৃত করে না, রেলওয়ে স্টেশন ধরণের যে সব স্থানে বাধ্য হয়ে লোককে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় সেগুলিও যদি চিত্রমণ্ডিত করা যায় এবং চিত্রগুলিকে যদি এমন ভাবে এমন জায়গায় সন্নিবিষ্ট করা যায় যে সহজেই নয়ন-মনকে আকৃষ্ট করে, চট্ কোরে নজরে পড়ে, তাহলে অল্পশিক্ষিত মানুষ তার ফালতু সময়-টুকুকে, (যে সময়টি বাধ্য হয়ে তাকে রেলের লাইন বা ছুলিদের বদন বা নিকৃষ্টতর কিছু দেখেই নষ্ট করতে হোত) সে সময়টিকে সার্থক করে নিতে পারে। বিদ্যালয় সম্বন্ধে অবশ্য কথাগুলি বিশেষভাবেই প্রযোজ্য, তবে উচ্চতর শ্রেণীর দেয়াল ছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ নীচু শ্রেণীতে ছবি আঁটলে সেগুলি কম দেখার আগেই কত বিকৃত, অবশেষে নিশ্চিহ্ন হবে সম্ভবতঃ। (অবশ্য ছবিতে কি ঘটনা দেখানো হচ্ছে জানতে এবং ফলে শিখতেও শিশু-চিত্ত চাইবে)।

এখন, ছবির বিষয়বস্তু। কি সম্বন্ধে, কি বিষয়ে ছবিগুলি হবে? কত রকমেরই যে হ'তে পারে তা একমুখে বুঝি বলার নয়। বিদেশের প্রাকৃত জন ছবি বোঝে, রং রেখার তারতম্য ধরতে পারে, চিত্রশৈলীর বিভিন্নতা, রকমফের, আপেক্ষিক উৎকর্ষ মোটামুটি নাকি সমঝ করতে পারে। আমাদের দেশ-বাসীর চোখ কি অমনি ক'রে শিক্ষিত করা যায় না? আপাততঃ আমি ছবি হিসাবেই ছবির মূল্য দেবার কথা বলছি, পরে জ্ঞানবিস্তারের মাধ্যম বা সহায়ক হিসাবে

ছবির কি স্থান, কি করণীয় সে কথায় যাচ্ছি। শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অঙ্গে অঙ্গেই নামাবলীর মত ছাপ দেওয়া হবে না (যেন একজন ঢুকেই বুঝতে পারে এটা সারস্বতভূমি; চারদিক ঘুরে বেড়িয়ে চোখ বুলিয়ে যখন সে বেরিয়ে আসবে তখন যেন দর্শক সমুদ্ধতর মন নিয়ে যেতে পারে, অনেক জেনে ও আরো জানার কৌতূহল নিয়ে), যে সব স্থানেই বহু মানুষ দীর্ঘক্ষণের জন্যে সমবেত হয়, অপেক্ষা করে বাধ্য হ'য়ে, সেই সব স্থানেই মানব সংস্কৃতির বাহাই করা পুষ্পগন্ধে যথাসম্ভব শোভিত হবে। হাসপাতাল ডাক্তারখানার অপেক্ষা করার ঘরগুলি, রোগসমূহের লক্ষণ, প্রতীকারের উপায় ইত্যাদি ছবি ও লেখা দিয়ে ব্যাখ্যা করবে অপেক্ষমান কর্মহীন ব্যক্তির কাছে। সহজবোধ্য সরলতম বাংলা ব্যবহার হবে কিন্তু হেলাফেলা দায়সারা কোরে নামমাত্র জ্ঞান দেয়া হবে না, (কৃপা কোরে যেন)। যথাসম্ভব বেশী জানাবার চেষ্টা হবে, মনোজ্ঞ আকর্ষণীয় সুরে। মন-ভক্তি ছবি ও লেখা থাকবে, যেন যতক্ষণ এ ঘরে থাকা যায় ততই লাভ এ মনে করা যায়। খুব মনে ক্ষতক্ষণ বসে থাকা যায়, আপনি চোখ যেয়ালের ছবি আর বড় বড় লেখাগুলিতে পড়বে। ট্রেনের ভেতরের (ট্রাম বাসের ভেতরেরও) যেয়ালগুলিই যেন ফাঁকা থাকবে? অনেক অফিসের, যেখানে সাধারণ মানুষকে বহুক্ষণ ধরা দিতে হয়, সম্বন্ধেও ওই কথা।

শুধু যদি উচ্চতর বিদ্যালয় বা কলেজ ইত্যাদির কথা আসে তখন? স্কুল-কলেজে যে সব ছেলেমেয়েরা আসে অধিকাংশই তারা অল্পশিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের। তাদের বাড়ীতে, আশেপাশে, তাদের সমস্ত পরিমণ্ডলেই শেখবার দেখবার জানবার মত কিছু নেই। বিদ্যালয়ে যে কদিন কাটায় সেই হোল তাদের জীবনের স্বর্ণযুগ। তারপরই তারা দীন, নীরস, সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র অন্ধকূপে কর্ম-জগতে (কটা বাঙালীর ছেলে সমুদ্রে বা আকাশে কবি রোজগার করে? অধিকাংশই তো আপিসের ডেস্কে ঝুঁকে থেকে থেকে কুঁজো হয়) ঢুকবে। বিরাটের সঙ্গে, নিখিলের সঙ্গে চোখোচোখি করবার, উঁকি মেরে আকাশ দেখবার একমাত্র গবাক্ষ তাদের ঐ কলেজ। কলেজকর্তৃপক্ষ মিউজিয়মে তাই যথাসম্ভব মানবজাতির সেরা কীর্তি-গুলোর কিছু কিছু নমুনা বাছাই কোরে চোখের ওপর ধরে ছেলেমেয়েরা দেখে (সম্ভবতঃ জীবনের প্রথম ও শেষ দেখা) একটু স্বাদ যাতে পেতে পারে সুন্দরের, মহতের। (বলা যায় না কেউ কেউ হয়তো অনুপ্রেরণাই পেয়ে যেতে পারে এ থেকে।) র‍্যাফাএলের ম্যাডোনা দেখে উত্তর জীবনে গ্রাজুয়েট ছেলেমেয়ের মনে যেন অজ্ঞ অশিক্ষিত জনের মতই প্রতিক্রিয়া না হয়। সুন্দরকে দেখে চেনবার ও শ্রদ্ধা করবার চোখ ও মন যেন চিত্র-শোভিত কলেজ করিডর দিয়ে হেঁটে হেঁটে তার খানিক তৈরী হয়। যে ছেলের পড়া ছমাস পরেই কোন কারণে সাঙ্গ হোল, যে সায়েন্স বা কমার্স পড়ে, যে হয়তো শুধু বেড়াতেই এসেছে, সেও, সেক্সপীয়রের সঙ্গে র‍্যাসিনেরও সঙ্গে যেন একটু পরিচিত হয়ে তবে কলেজ থেকে অসুন্দর বাস্তবজগতে পুনঃ প্রবেশ করে।

ছেলেরা যাতে এ লেখাগুলি, ছবিগুলি শুধু অলস কৌতূহলে অর্ধনিমীলিত চোখে না দেখে তার জন্যে যাতে একটা কোরে quizz programme করা যায় পাঁচটা পাঁচটা কোরে ছেলে নিয়ে A টিম B টিম। একটা প্রশ্ন A টিমের জন্যে, আরেকটা B টিমের। পুরস্কার অমূল্যের হোক্ তবু ছেলেরা এতেই উৎসাহিত হবে। চোখ খুলে দেখবে যেয়ালগুলি, কেননা প্রশ্নগুলির উত্তর ওই যেয়ালেই থাকবে, ওই সব ছবিতে, ছবির ব্যাখ্যাতে।

শিক্ষকদের যেয়ালপত্রিকা থাকবে একটা লম্বা চৌকো সরুয় তক্তা বা ব্লেকবোর্ড যাতে লেখাগুলি···পিন্ দিয়ে আঁটা যাবে সহজে। প্রত্যেক সপ্তাহে যে যা সুন্দর বা জানবার মত জিনিস দেখেছেন শুনেছেন পড়েছেন, সংক্ষেপে সরল ঘরোয়াভাবে জানাবেন (Readers' digest-এর মত)। প্রত্যেক সপ্তাহেই একটা না একটা বড় ঘটনা ঘটেছিল পৃথিবীতে। সেদিনটা শুধু স্মরণ করানো নয়, তার আসল তাৎপর্যটি বোঝানো থাকবে। "আজ ১৪ই জুলাই। ফরাসীরা আজকের দিনে, ফেলে

দিয়ে যাওয়া যেন ছেড়েছিল"। এমনি নিরীহ ভাবে, যেন কথার কথা খোসগল্প হচ্ছে এমনি ভাবে, লেখাটা হবে; নয়তো ঘটমটো বেখলেই পড়ার বিতৃষ্ণাকামর আভাস পেয়ে ছাত্র আর ওটা পড়ে দেখবে না—এড়িয়ে যাবে সযত্নে। ঘটনা জানানোটা কিছু নয়, তার বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সৌন্দর্য বা মহত্বকে যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় বিশদভাবে। সত্য হলেও কুৎসিত বা অশুভ বস্তুর সঙ্গে খুব পরিচিত না করানোই বুদ্ধিমানের। (যেমন ক্লিওপেট্রার হৃদয়হীন বিলাসলীলার ছবিগুলি তেমন না দেখিয়ে শুধু তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও শেষে প্রেমের মহিমা তাকে সত্যি কত জ্যোতির্ময়ী করে তুলল, সত্যিকার সাম্রাজ্ঞী হল বৈরিণী সেই সব দৃশ্য দেখানোই মঙ্গলের)। কোন বই থেকে হয়তো চিত্তাকর্ষক অংশ খানিকটা তোলা হল উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে। পাশে লেখক-পরিচিতি রইল একটু, কোথায় তাঁর বৈশিষ্ট্য, এ লেখায় কোথায় সেই বৈশিষ্ট্য ফুটেছে তাও একটু রইল। অন্যদের সঙ্গে প্রয়োজন হলে তাঁকে তুলনা কোরেও বিচার করা রইল। ছাত্রের কৌতূহল জাগতে পারে যেখান থেকে অমন সুন্দর উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে সেই আসল বইটিই পড়ে দেখতে। সময় কাটানোর উপায় ছেলেদের বাৎলে দেওয়া হবে। ছেলেরা যে বই ফুটল সে বইই লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়ে, জানে না কোনটা আসল কোনটা মেকী। তাদের জন্যে ভাল বইএর list কোরে ঝুলিয়ে রাখা যায়। (ছেলেমেয়েরা নিজেদের, হয়তো বা পারিবারিক, অভাব অসুবিধা, ব্যক্তিগত সমস্যার কথা জানাতে যেন উৎসাহ ও ভরসা পায় তেমন কথাও বলা হবে।) পরিচয় যদি জানা থাকে কি কি বই ছেলেরা পড়ছে সেটা খুব সুবিধের। ওদের কাঁচা মন, পছন্দমত বই পড়িয়ে পড়িয়ে ইচ্ছানুযায়ী তৈরী করে নেয়া যায়। অন্য বই issueই করা হবে না। অপার গ্রন্থসমুদ্র, আর্দ্ধেক ছেলে, কেউ বলে দেবার নেই বলে, হয়তো শুধু খানকতক ছবিই ফুরোলে, মুক্তো পাশেই পড়ে রইল। অথচ শিক্ষকরা যদি বই বাছাই ব্যাপারে ছেলেদের নির্দেশ যেন তবে বৃথা ওরা যাবে বই পড়ে সময় নষ্ট করতো না। যাবে যে বইটা সে জানেই যে নেই, মহাতৃপ্তিতে পড়ে।

প্রত্যেক কলেজের আওতায় মিউজিয়ম ধরণের একটা ঘর থাকবে। তাতে ছাত্ররা (বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এক একজন এসেছে) নিজ নিজ অঞ্চলের লোকসাহিত্যের পাণ্ডুলিপি থেকে আরম্ভ কোরে পুতুল পট pottery, কাঁথা, কাপড়, খেলনা, আলপনা, কাগজ কাটা ইত্যাদির নমুনা জোগাড় কোরে এনে জড়ো করবে। লোককথাগুলি ছাপিয়ে দেওয়া হবে পরে, এ শুনলে ছেলেমেয়েরা সমধিক উৎসাহী হয়ে মা দিদিমা বুড়ো-বুড়ীদের খুঁচিয়ে অনেক কিছু উদ্ধার কোরে আনবে। সেই সব বিচিত্র গ্রাম-সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ কিছুটা কলেজে কলেজে রক্ষা পাবে যা partition ও শিল্পায়নের ফলে লুপ্তি ও ক্ষয়ের নিশ্চিত পথে। বিভিন্ন মেলার ব্রতকথা, রূপকথা, পালাগান, কেচ্ছা, পদব্রাব, প্রবাদ প্রবচন, শিলকী বাঁধা, পালপার্বণ, বিয়েসাদীর গীত, ছেলেভুলানো ছড়া, ছোটদের খেলার ছড়া, বাইচাষ গান, ঘাটুগান, গোসেবার মন্ত্র, ancient rites practices, সামাজিক আচার আচরণ, নিয়মকানুন, রীতিনীতি প্রথাপদ্ধতি, বিংবদন্তী, ঝড়বৃষ্টি থামানোর ভুক, চোর তাড়ানোর মন্ত্রাদি, হোলির গান, সোহিনী কীর্ত্তন, সারি, জারি কোনটা যেন চিরতরে বিস্মৃত হয়ে না যায়। সবাই কদর দিচ্ছে দেখে ছেলেরা ঘরের জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

সত্যমত জগতে যা কিছু সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, মহান তারই নমুনা, sort out কোরে ওদের কচি অন্তরে ঘোরে দেবার বর্তমানে এই তো একটি মাত্র পেয়ালা—বিদ্যায়তন। ক্লাসে শুধু বিশ্লেষণ শুনে শুনে সাহিত্যবোধ, কাব্যরস উপলব্ধি করবার শক্তি খুব জন্মায় না। সুন্দর আবৃত্তি কিন্তু কিছুটা স্বপ্ন, কিছুটা মোহ সঞ্চার করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কৃত্তি মিত্র শম্ভু মিত্রকে দিয়ে কিছু বিখ্যাত বাংলা কবিতার আবৃত্তি, বিশেষত যে কবিতাগুলি বিদ্যালয়ে পাঠ্য হয় সাধারণতঃ, record করিয়ে নিলে হয়। রেডিওর চেয়ে গ্রামোফোন

থাকাই উচিতব বিদ্যায়তনের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। শেক্সপীয়ারের বড় বড় নাটকগুলির রেকর্ড কলেজের নিজস্ব থাকবে; অন্যান্য playsও, যখন যে বছর যে নাটক পাঠ্য হয় তারই রেকর্ড কলেজের থাকবে। গভর্নমেণ্টের কিছু হস্তক্ষেপও প্রয়োজন,—যে সব নাটকের রেকর্ড করা হয় নি বা মেলে না সেগুলি কোন ভাল বিলিতী নাট্য সম্প্রদায়কে দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিতে হবে। মাক্‌বেথ বা ওথেলো যে অভিনীত হবে বোলেই লেখা হয়েছিল, সেটা ছেলেদের বোঝাতে হবে। এদের 'নাটকত্ব' নাট্য-রসটুকু যে কোথায় গ্রামোফোন যন্ত্রের কানে শুনে শুনে ছেলেরা তা বুঝবে। এক একটা দৃশ্য ক্লাসে পড়িয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হোল, তারপরই বই হাতে কোরে slow কোরে রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে শুনবে ছেলেরা। যখন খুশী, যতবার খুশী। গ্রামোফোনের দৌলতে ছেলেদেরকে অভিনয়-শিক্ষা দেবেন পৃথিবীর সেরা যত অভিনেতারা। একঘেয়েমী কাটবে, interest বাড়বে। তেম সিডন্স বর্ণডাইকে দিয়ে সব দরকারী কবিতার (অর্থাৎ সাধারণতঃ যে সব ইংরাজী কবিতা text হিসাবে নির্বাচিত হয়) রেকর্ড করিয়ে নিলে হয়। ওঁর আবৃত্তি না শুনলে ইংরাজী কবিতার মাহাত্ম্য music বস কিছুই যেন বোঝা যায় না। তাছাড়া prosody বুঝতে সুবিধা হবে। শেক্সপীয়ারের কিছু কিছু দৃশ্য, শুধু stage reading নয়, এলিজাবেথীয় period costume পরেই ছাত্ররা অভিনয় করবে। কত রকম আজে বাজে নাটক ছেলেরা অভিনয় করে, আর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বাদ যাবেন কেন? ওই রেকর্ড শুনতে শুনতেই ছেলেদের কান তৈরী হবে এবং অনুরূপ ভাবে আবৃত্তি ও অভিনয় তারাও করতে পারবে। পোষাক ছাত্রীরাই সেলাই কোরে নিতে পারবে, পুঁথিপত্র ঘেঁটে, বিলেতী নাট্যসম্প্রদায়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ কোরে কিছু শেক্সপীয়ার যুগের costume তৈরী করিয়ে নিতে হবে। নির্মলেন্দু লাহেড়ী, ছায়াদেবী, শিশির ভাদুড়ী, রবীন্দ্রনাথ এঁদের আবৃত্তির রেকর্ড যোগাড় করতে পারলে খুব ভাল হয়। দেশবিদেশের বিখ্যাত এবং representative গানের সংগ্রহ রাখতে হবে। 'মার্সেইয়েজ' ইত্যাদি রাখতে হবে। 'মার্সেইয়েজ' ইত্যাদি গানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও তাৎপর্য ছেলেদেরকে অবিশ্যি আগেই বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে এর উদ্দীপনা উন্মাদনাময় সুরটি তারা কিছুটা উপভোগ করতে পারে। ইংরাজী দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল এঁদের ওজস্বিতাপূর্ণ গানগুলি যোগাড় করতে হবে।

আবার ছবিতে আসি। বড় বড় কোরে দেয়ালে ভারতবর্ষের, বাংলার মানচিত্র আঁকা থাকবে, নজরে যাতে পড়েই এমন জায়গায়। ইংরাজী সাহিত্যে সমুদ্র আর জাহাজ অনেক জায়গা জুড়ে আছে। জাহাজের বড় ছবি থাকবে; poop deck prow ইত্যাদি কোন্‌টা যে কি তা সেই সেই জায়গায় লেখা থাকবে। তলায় বা পাশে এমনি ব্যাখ্যাও থাকবে। নাইট, পাদ্রী বা ঘোড়ার ছবিতে তাদের সাজের বিভিন্ন অংশগুলির কি নাম ছবির ওপরেই লেখা লেখা থাকবে। সব যেন অনায়াসে পড়া যায়, আপনি নজরে আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে সব কবিতা সাধারণতঃ পাঠ্য থাকে তাদের চিত্ররূপ থাকবে, যেখানে যেখানে সম্ভব অর্থাৎ যে কবিতাগুলিতে pictorial quality বেশী। প্রতিটি দেয়াল হবে picture gallery। শেক্সপীয়ারের নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্ররূপ থাকবে কয়েকটা বড় বড়। আজকাল তো অভিনয় কালে তোলা ফোটোই পাওয়া যায়। বহু খ্যাতনামা চিত্রীরাও শেক্সপীয়ার থেকে subject নিয়েছেন।

ক্রমশঃ

শিশু-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক কমলেশ ভট্টাচার্য

মহাকবি বাল্মীকি, ব্যাসদেব এবং কালিদাস জগৎ বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বকবি। প্রাচীন মহাকবিদের সাথে রবীন্দ্রনাথের এইখানে একটি প্রভেদের কথা বলা যেতে পারে যে, তিনি সর্বশ্রেণীর, সর্ব মনের এবং সর্ব বয়সের জন্য কাব্য রচনা করেছেন। ভারতের চির-অবহেলিত শিশু-সাহিত্য তাঁর কৃপা লাভে বঞ্চিত হয় নি। অমৃতের সন্তান আমাদের দেশের শিশুগণ তাঁর অমৃতময় শিশু-সাহিত্যের স্বাদ লাভ করে মানব-জীবন ধন্য ক'রছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন হাজার হাজার কাব্য, সংগীত রচনা করেছেন তেমনি তাঁর লেখা শিশু-সাহিত্যও সংখ্যায় নগণ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা শুধু শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যই লেখা হয় নি। সাহিত্যের রাজ্যে এই শিশু-সাহিত্য শিশুও নহে। রবীন্দ্র-রচিত সাহিত্যের অন্য যে কোন বিভাগের সহিত উহা তুলনীয়। শিশুদের উপলক্ষ্য ক'রে লেখা হলেও এই সকল শিশু-সাহিত্য সকল বয়সের আনন্দ বিধান করে। সত্যিকারের শিশু-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে উহা সমস্ত বয়সের সীমার ঊর্ধ্বে। জগৎ-বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক বিডুলর্সা, ঈষপ, গ্রীম প্রভৃতির কথা চিন্তা করলে এই সত্য উপলব্ধি হবে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত শিশু-দরদী। যেমন ব্রহ্মকে জানবার জন্য ব্রহ্মচর্য তেমনি শিশুকে জানবার উপায় শিশু-পরিচর্য্যা বা শিশুর ভাবে ভাবুক হওয়া। শিশুর কোমল মনের মত নিজের মনকে প্রস্তুত না করলে, শিশুর ভাবের সাথে নিজের মনের যোগাযোগ করতে না পারলে শিশু-সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি ছিল। তিনি ছিলেন বাহিরে বৃদ্ধ, অন্তরে কচি শিশুটি। তাঁর মন শিশুর মত সরল ছিল। শিশু-মনের সকল খবর তাঁর জানা ছিল! তাঁর রচিত শিশু, শিশুভোলানাথ এবং ছড়া প্রভৃতি পাঠ করলে সহজেই এসব বুঝতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন, শিশুর কাছে মানুষ ও ইতর প্রাণীতে ভেদ নেই। 'সমব্যথী' কবিতায় দেখতে পাই—

যদি খোকা না হয়ে আমি হ'তাম তোমার টিয়ে,
তবে পাছে যাই মা উড়ে—
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে।

বিচিত্র সাথ কবিতায় দেখতে পাই, শিশু সব সময় নীরস পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকতে চায় না, সে চায় চুড়িওয়ালার মত চুড়ি বিক্রি করতে, বাগানের মালীর মত বাগানে কাজ করতে এবং পাহারাওয়ালার মত রাত্রিকালে পাহারা দিতে।

শিশু যে অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় ও কল্পনাপ্রবণ, রবীন্দ্রনাথ একথা ভাল ভাবে জানতেন। 'মাষ্টারবাবু' কবিতায় আমরা দেখতে পাই, শিশু নিজে বেত হাতে মাষ্টার হয়েছে এবং তার আদুরে বিড়ালছানাকে ছাত্র করে পড়াতে বসেছে।

শিশু আশুতোষ। ভোলানাথ শিবের সাথে শিশু-চরিত্রের মিল। ভোলানাথ শিব ভূত ভবিষ্যতের ধার ধারে না। বর্তমান নিয়ে তার কারবার। শিশুও বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত। শিবের মত আবার কখন কখন তার রুদ্র মূর্তি, ক্ষণে ক্ষণে খুশীমত সে সব ভেঙে চুরমার করে দেয়। কবির কাছে তাই শিশু ভোলানাথ।

"ওরে মোর শিশু ভোলানাথ
তুলি দুই হাত—
যেখানে করিস পদ্ম পাত
ভীষণ তাণ্ডবে তোর নত ভগ্ন হ'য়ে যায় সব
আসন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে।

কবি শিশুর এই আত্মভোলা ভাব নিজের জীবনেও চেয়েছেন। তিনি চান শিশুদলে মিশতে; শিশুদের অনুরোধ করেন—

"ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
মোরে তুচ্ছ বলে
নিয়ে তোর তাণ্ডবের দলে—
মেরে চিত্তে মোর সকল খেলার ঐ মোর
খেলনা ভাঙার খেলা—
যে আমারে বলি।"

ছড়া শিশুদের কাছে কত প্রিয়, রবীন্দ্রনাথ সে কথা ভাল ভাবেই জানতেন। বাংলা সাহিত্যে ছড়ার অভাব লক্ষ্য করে তিনি নাতি নাতনীদের জন্য প্রচুর ছড়া রচনা করেছেন। তিনি বলতেন, ছড়াগুলি প্রকৃত শিশু-সাহিত্য। তাহারা মানব মনে আপনি জন্মেছে। প্রাচীন ঋক্‌বেদ ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণের স্তবগান উপলক্ষ্যে রচিত। আর মাতৃহৃদয়ের দুগ্ধ দেবতা খোকা খুকুর মুখ হইতে ছড়ার উৎপত্তি। তিনি আরও বলেছেন,—"মেঘ যেমন বারি-ধারায় নামিয়া ধরিত্রীকে উর্বর করে, ছড়াগুলিও সেইরূপ স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনারূপ বৃষ্টিধারা শিশু হৃদয়কে উর্বর করিতেছে"। রবীন্দ্রনাথ-রচিত ছড়াগুলি অপূর্ব। শিশু-মনে উহা সহজেই দোলা দেয়। তাঁর ছড়া—

"সুবলদাদা আনল টেনে
আদম দিঘীর পাড়ে
লাল বাঁদরের নাচন সেথায়
রাঙ ছাগলের ঘাড়ে
ঘর বাড়ীর ঘাটের কাছে যেমনি হাঁড়ি পড়া
আৎকে উঠে কাঁখেরটুকে
বউ ফেলে যায় ঘড়া।"

অথবা—

চিনি পানা খেয়ে খুশী—
ভিজেবাজী খায় কাতলা
চাঁদা মাছের সঙ্গ জুটল না আর পাতলা।'

ছড়ার সহজ-প্রিয়তা তার অসম্ভব, অদ্ভুত, অর্থহীন এবং খাপছাড়া স্বভাবে। রবীন্দ্রনাথের ছড়ায় এ সকলের কোনটির অভাব নেই।

রবীন্দ্রনাথ শুধু অবসর-পাঠ্য শিশু-সাহিত্য রচনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেছেন। ভাল পাঠ্য পুস্তকের চিরদিনই অভাব, সে যুগে একেবারেই অভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ-রচিত সহজপাঠ, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ এক সময়ে সকল বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে স্থান পেয়েছিল। বাংলাদেশে বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষকগণের অভিমতে সহজ পাঠের মত বিদ্যালয়-পাঠ্য মাতৃভাষার পুস্তক আজিও দুর্লভ।

আজ রবীন্দ্রনাথের শততম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বাংলা শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান, নিবেদন করি তাঁর পায়ে কোটী কোটী প্রণাম, প্রার্থনা করি তাঁর সেই অমর জীবনের এক কণা জ্যোতি, যে জ্যোতি আজকের এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে পথ দেখাবে কোটী কোটী নিপীড়িত মানবাত্মাকে।

আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট

॥ শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বিটি, ডি, এল্, ই ॥

ভারতীয় অলঙ্কার তত্ত্বের বিবর্তনে কয়েকটি পর্ব দৃষ্ট হয়। প্রথম পর্বটি আরম্ভ হয়েছে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তার শেষ পরিণতিটি পাওয়া যায় ভরতাচার্যের মধ্যে। ভরতের আবির্ভাব কাল নিয়ে বহু মতবিরোধ আছে; তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে সেটা হচ্ছে খৃঃ-পূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক। ভরতের "নাট্যশাস্ত্রে" যে সমস্ত পূর্ব-সূরীদের উল্লেখ আছে, তাঁদের কোনও গ্রন্থই আজ পর্যন্ত আমাদের হাতে আসে নি। অনেকে ভরতকেই রসবাদের আদি গুরু রূপে মনে করেন। কিন্তু "রাজশেখর" প্রভৃতির গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে রসবাদের আদি আচার্য্য হচ্ছেন নান্দিকেশ্বর। তবে তাঁর লেখা কোনও গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ভরতের পর ছ সাতশো বছরের কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। এর পর আমরা তাদহ ও দণ্ডীর যুগে এসে দেখতে পাই অলঙ্কার শাস্ত্রটা তখন একটা সংহত রূপ নিয়েছে এবং বিভিন্ন মতবাদের মূল কথাগুলি বীজাকারে লেখা দিয়েছে।

তাদহ দণ্ডী প্রভৃতির সাহিত্য-সমীক্ষা একটা নূতন যুগের সৃষ্টি করলো। এই যুগটি প্রায় তিন শো বছর ধরে চললো, সাহিত্যিক প্রাণবস্তুর সন্ধান চললো নানা দৃষ্টি-কোণ থেকে। তথাকথিত "প্রস্থানভেদের" ভিত্তি রচিত হলো এই যুগে। এই যুগে ভারতীয় অলঙ্কার তত্ত্বটা সমৃদ্ধ হবে বামন, লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক প্রভৃতির আলোচনার মাধ্যমে। এই যুগের শেষ আচার্য্য হলেন আনন্দ বর্দ্ধন।

আনন্দ বর্দ্ধনের পরে এলেন অভিনব গুপ্ত, কুন্তক, মহেশ্বর, ধনঞ্জয়, ধনিক, ভোজ, মহিম ভট্ট প্রভৃতি। পূর্ববর্ত্তী যুগে যে সমস্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় এই যুগটিতে অর্থাৎ ৯ম শতকের মধ্যভাগ থেকে ১১শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে। এই যুগটিতে তর্ক বিতর্ক সমর্থন আক্রমণ ব্যাখ্যা সমীক্ষার মধ্য দিয়ে সাহিত্য-তত্ত্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গড়ে উঠলো।

কিন্তু যে কোনও একটা তত্ত্বের সার্থক পরিচয় পেতে হলে সেই তত্ত্বটি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের একটা সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে তত্ত্বটিকে দেখা হয় বলেই গড়ে ওঠে বিভিন্ন সম্প্রদায়গত মতবাদ। তারও প্রয়োজন আছে। তা না হ'লে কোন জিনিষের সব দিকগুলি বুঝতে পারা যায় না। এর পরে প্রয়োজন হয় সমস্ত মতবাদের সংশ্লেষণ সমন্বয় ও একীকরণ। সেটা না হলে খণ্ড খণ্ড মতবাদগুলি হয়ে ওঠে অন্ধের হাতী দর্শনের মতই অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা মাত্র। ভারতীয় অলঙ্কার তত্ত্বের বিবর্তনে এই সমন্বয়ের একটা পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় মম্মট ভট্টের মধ্যে।

এই সমন্বয়ের একটা প্রথম ও সার্থক চেষ্টা দেখা গেছলো আনন্দ বর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্তের মধ্যে। তবে তাঁরা একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের (ধ্বনিবাদ) সৃষ্টি করে ছিলেন বলে তাঁদের সমন্বয়ের আচার্য্য বলা চলে না। সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত মতবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় মম্মট ভট্টের মধ্যে। তাঁর সংশ্লেষণী প্রতিভার ফল হচ্ছে কাব্যপ্রকাশ। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরবর্তী যুগে যাঁরাই অলঙ্কার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই এই সমন্বয়ী দৃষ্টি নিয়েই পূর্ণাঙ্গ কাব্যতত্ত্বেরই আলোচনা করেছেন; কোনও একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জয়গান করেন নি।

আনন্দ বর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্তের মত মম্মট ভট্টও কাশ্মীরের অধিবাসী এবং অভিনব গুপ্তের ধ্বনিত পথেই ইনি ধ্বনিবাদের আলোচনা করেছেন। এঁর বিখ্যাত

গ্রন্থ "কাব্যপ্রকাশে" ধ্বনিবাদ ছাড়া রস, রীতি, গুণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। এই গ্রন্থে "উদাত্ত" অলঙ্কারের উদাহরণ প্রসঙ্গে ভোজ রাজের উল্লেখ আছে, আবার এঁর কাব্যপ্রকাশের টীকা রচনা করেছেন যাদশ শতকের জয়ন্ত। কাজেই বুঝতে পারা যায় মম্মটের আবির্ভাব কাল হচ্ছে ভোজ রাজের পরবর্তী আর জয়ন্তের পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ একাদশ শতকের শেষ দিকে কিংবা যাদশ শতকের গোড়ার দিকে।

কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থটি দশটি "উল্লাসে" (পরিচ্ছেদে) বিভক্ত। এইটুকু পরিসরের মধ্যেই কাব্যতত্ত্বের প্রায় সমস্ত দিকগুলিই (নাট্য-কলা বাতীত) আলোচিত হয়েছে। এর কারিকা সংখ্যা হচ্ছে ১৪৩টি এবং বিভিন্ন আকর গ্রন্থ থেকে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ৬২০টি।* ফলে এর মধ্যে সম্পূর্ণতার সঙ্গে সংক্ষিপ্ততার সমন্বয় ঘটেছে এবং গ্রন্থটি নিখিল ভারতের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে রস-শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে আদৃত হয়েছে। পূর্ব-সূরীদের প্রায় সমস্ত তত্ত্বগুলিই এই গ্রন্থে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় আলোচিত হয়েছে এবং সেই আলোচনাগুলি উত্তর-সূরীদের নূতন গবেষণার প্রেরণা জুগিয়েছে। ফলে এই গ্রন্থটি ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তবে সমগ্র "কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থটি সবটাই মম্মটের লেখা কিনা এই নিয়ে পণ্ডিত মহলে কিছুটা বাদ-বিতণ্ডা আছে। খুব সম্ভবতঃ "অলট" নামে একজন পণ্ডিত কাব্য-প্রকাশের খানিকটা অংশ (দোষপ্রকরণ) লিখেছিলেন।

মম্মটের কাব্য-সংজ্ঞার মধ্যেই তাঁর সময়ের চৌহদ্দির একটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য-সংজ্ঞা হচ্ছে "অদোষৌ সগুণৌ সালঙ্কারৌ চ শব্দার্থৌ কাব্যম্" অর্থাৎ "দোষহীন ও গুণযুক্ত কোন কোন ক্ষেত্রে নিরলঙ্কার শব্দার্থের নাম কাব্য"। এই সংজ্ঞার মধ্যে কয়েকটি পর্ব লক্ষণীয় :

১) "দোষহীন ও গুণযুক্ত" এই কথাটির মধ্যে "গুণ বাদ" এবং "রীতি-বাদের" স্বীকৃতি আছে।

২) "কোন কোনও ক্ষেত্রে নিরলঙ্কার" এই উক্তিটির মধ্যে "অলঙ্কার-বাদে"রও সমর্থন আছে। মম্মটের মতে অলঙ্কার ছাড়া কাব্য হয় না বলেই চলে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অলঙ্কারটা যদি অস্ফুট হয়, তা হলে কাব্যের ক্ষতি হয় না। ('সর্বত্র সালঙ্কারৌ, ক্বচিৎ তু স্ফুটালঙ্কার-বিরহে অপি ন কাব্যস্য হানিঃ")।

৩) শব্দ ও অর্থের মিলনে যে সাহিত্য হয় এই মতবাদটির স্বীকৃতি আছে "শব্দার্থৌ" কথাটির মধ্যে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় মম্মট জগন্নাথের মত শুধু শব্দ (যুঃ রমণীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্) বা বিশ্বনাথের মত "বাক্য" (যুঃ বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্) শব্দগুলি ব্যবহার না করে "শব্দার্থ" কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই "শব্দার্থ" কথাটির প্রয়োগ তাঁদের কাব্য-সংজ্ঞার মধ্যে পাওয়া গেছলো। তাঁর কাব্য-সংজ্ঞা ছিল "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্"।

মম্মটের সংজ্ঞার মধ্যে রস বা ধ্বনির স্পষ্ট উল্লেখ নেই বটে, তবে রস বা ধ্বনিবাদের স্পষ্ট স্বীকৃতি তাঁর গ্রন্থের মধ্যেই আছে। শব্দ ও অর্থের শক্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ব্যঞ্জনার কথা আলোচনা করেছেন এবং ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনিটা যে আভিধানিক অর্থ বা লক্ষণিক অর্থের চেয়ে উচ্চতরের জিনিস, সেটা তিনি প্রতিপন্ন করেছেন।

পরে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ হিসাবে তিনি "ধ্বনিকাব্য", "গুণীভূত ব্যঙ্গ কাব্য" এবং "চিত্রকাব্য" এই তিনটি বিভাগ (ধ্বন্যালোকের অনুকরণেই) স্বীকার করেছেন। তিনি ভরত বর্ণিত আটটি রসকেই স্বীকার করেছেন আর বলেছেন "শান্ত" রসটি শুধু কাব্যের পক্ষেই প্রযুজ্য।

গুণ ও দোষের বিচার প্রসঙ্গে তিনি তাদের রসাত্মকতার দিক দিয়েই আলোচনা করেছেন, নিছক শাব্দিক সম্পর্কটার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তাঁর মতে রসই কাব্যের আত্মা এবং গুণ হচ্ছে শৌর্যাদির মতই সেই আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত জিনিস। মম্মটের মতে অলঙ্কার হচ্ছে আভরণাদির মত। সেটা

* দোষপ্রকাশের গ্রন্থ-উদ্ধৃতি সংখ্যা ১৪০-এর অধিক।

কাব্যের] আত্মা নয়, বহিরঙ্গ কুণ্ডলের মতই পদার্থ, যুক্তযুক্ত হলে সেটা কাব্যের আত্মা রসের উপকার করে বটে, তবে সেটা কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে একেবারে অপরিহার্য্য নয়।

এই জাতীয় আলোচনা থেকে মনে হয় মম্মটের কাব্যসংজ্ঞার মধ্যে ধ্বনি বা রসের প্রসঙ্গ না থাকলেও তিনি এ গুলির কাব্য-প্রাণত্বের কথা স্বীকার করেছেন। ফলে কেউ তাঁকে "ধ্বনিবাদের" একনিষ্ঠ শিষ্য ও ব্যাখ্যাতা ও "অভিনব গুপ্তের ধক্ষিণ হস্ত" বলে পরিচয় দিয়েছেন, কেউ বা তাঁকে "রসবাদের" প্রধান আচার্য্য বলে মনে করেছেন। তাঁর এই দুটো পরিচয়ই সত্য।

মম্মট বামন-বর্ণিত দশটি গুণকে স্বীকার না করে আনন্দ বর্দ্ধন বর্ণিত তিনটি মাত্র গুণকেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন "ওজঃ" "প্রসাদ" ও "মাধুর্য্য" এই তিনটি গুণের মধ্যেই বামনের দশটি গুণের বৈশিষ্ট্য গুলি নিহিত থাকে। তা ছাড়া বামন-বর্ণিত কয়েকটি গুণ আসলে গুণই নয়, সেগুলি হচ্ছে শুধু দোষের অভাব মাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই গুণগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে দোষই, গুণ নয়। যেমন বামনের "শ্লেষ" (শব্দের কঠিনতা), "সমাধি" (শব্দগুলির উত্থান পতন) ও "উদারতা" (শব্দ নৃত্য) এগুলি "ওজো" গুণেরই (গদ্য রচনার গাঢ়ত্ব) অন্তর্গত। বামনের "অর্থ ব্যক্তি" (সহজে অর্থ-প্রতীতি) হচ্ছে "প্রসাদ" গুণেরই নামান্তর। "সমতা" (শব্দ বিন্যাস জন্যে সমত্ব) জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রেই একঘেয়েমির সৃষ্টি করে। সুতরাং সেটা "দোষ", গুণ নয়। আর "সুকুমারতা" (শব্দের কোমলতা) ও "কান্তি" (ঔজ্জ্বল্য) হচ্ছে "শ্রুতি কটুতা", "গ্রাম্যতা" "অশ্লীলতা" প্রভৃতি দোষের অভাব মাত্র। কাজেই এই সাতটি গুণের পৃথক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। ফলে বামন-বর্ণিত দশটা গুণের তালিকা থেকে সাতটিকে বাদ দিয়ে পড়ে থাকে মাত্র তিনটি গুণ; যথা "প্রসাদ" (শব্দের সরল রচনা) "মাধুর্য্য" ও "ওজঃ" গুণ। এই তিনটি মাত্র গুণকেই মম্মট তাই স্বীকার করেছেন। "মাধুর্য্যোজঃ প্রসাদাখ্যা ত্রয় তে ন পুনর্দশঃ"।

এই ভাবে অহেতুক গুণের সংখ্যা বৃদ্ধিটা (যেটা ভোজ রাজের সময় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়েছিল) মম্মট পছন্দ করেন নি। ভোজ রাজ যেখানে ২৪টি শব্দগুণ আর ২৪টি অর্থগুণ অর্থাৎ মোট ৪৮টি গুণের স্বীকার করেছিলেন, মম্মট সে জায়গায় মাত্র তিনটি গুণকেই স্বীকার করেছিলেন। তা ছাড়া শব্দ-গুণ ও অর্থ-গুণ এই উপ-বিভাগটিও তাঁর কাছে নিরর্থক বলে মনে হয়েছিল।

তাঁর মতে রসের উপলব্ধির ও উপভোগের জন্য শুধু তিনটি গুণই যথেষ্ট। 'ওজ' গুণ মনের বিস্তার করে, এবং 'বীর ভয়ানক' ও 'রৌদ্র' রসের সহায়তা করে।" প্রসাদ গুণ সাধারণ ভাবে অর্থ বোধের সহায়ক বলেই সব রকম রসেরই 'ব্যাপ্তি' ও 'বিকাশে' সেটা সাহায্য করে। মাটিতে ছড়ানো কাপড়ের উপর দিয়ে জল যেমন সহজেই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, অথবা শুষ্ক ইন্ধনের উপর দিয়ে অগ্নি যেমন সহজেই বিস্তৃত হয়ে পড়ে, প্রসাদ গুণের প্রভাবে সব রসই তেমনই সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। 'মাধুর্য্য' গুণটা সাধারণতঃ প্রীতি প্রেম বিরহ মিলনের ব্যাপারে বা হৃদয়ের 'দ্রুতি'র (বিগলিত করার) ব্যাপারেই বিশেষভাবে প্রযুজ্য। রসের উপলব্ধিতে হৃদয়ের যে 'ব্যাপ্তি' 'বিকাশ' বা 'দ্রুতি'র ব্যাপার ঘটে, সেগুলি এই তিনটি গুণের দ্বারাই সম্ভব হয়। এখানে এ কথা স্মরণীয় যে মম্মটের এই রস ভিত্তিক গুণের আলোচনাটা ধ্বন্যালোকের অনুসরণ করেই করা হয়েছে। তবে গুণ সম্বন্ধে রস-ভিত্তিক আলোচনাটা যে ধ্বন্যালোকেই প্রথম হয়েছে তা নয়। ভট্ট নায়ক তাঁর 'মুক্তিবাদে' দেখিয়াছিলেন যে রসের ভোগের ব্যাপারে গুণগুলি সহায়তা করে থাকে।

গুণ সম্বন্ধে মম্মটের মতবাদটি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক সমর্থিত ও পুনরুক্ত হয়েছে তাঁর "সাহিত্য দর্পণে"।

মম্মট পদদোষ, বাক্যদোষ ও অর্থদোষ সম্বন্ধে যা আলোচনা করেছেন সেটাও পরবর্ত্তী কালে বিশ্বনাথ এবং প্রায় সমস্ত আলঙ্কারিক কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল।

মম্মট ষোলটি পদদোষের স্বীকার করেছেন, যথা শ্রুতিকটুতা ছুত সংস্কারত্ব, অপ্রযুক্ততা, অসমর্থত্ব,

নিহতার্থত্ব, অনুচিতার্থত্ব, নিরর্থকত্ব, অযাচকত্ব, অশ্লীলত্ব, (ত্রিবিধ) সন্দিগ্ধতা, গ্রাম্যতা নেয়ার্থত্ব ক্লিষ্টত্ব অপ্রতীতত্ব বিরুদ্ধমতিকারিত্ব এবং অসন্দিষ্ট বিধেয়াংশত্ব।

বিশ্বনাথ তার সাহিত্য দর্পণে ঠিক এই কয়েকটি পদ দোষই স্বীকার করেছেন যথা—

দুঃশ্রব (১) ত্রিবিধাশীলা (২) অনুচিতার্থ (৩) অপ্রযুক্ততা (৪) গ্রাম্য (৫) অপ্রতীত (৬) সন্দিগ্ধ (৭) নেয়ার্থ (৮) নিহতার্থতাঃ (৯) অযাচকত্ব (১০) ক্লিষ্টত্বং (১১) বিরুদ্ধ-মতি কারিতা (১২) অসন্দিষ্ট বিধেয়াংশতাবন্ধ (১৩) পদবাক্যয়ো দোষা কেচিৎ অবশ্যেষু পদাংশাদিপি পদে পদে নিরর্থক (১৪) অসমর্থত্বে (১৫) চ্যুতসংস্কারতা তথা (১৬) গত

(বিঃ দ্রঃ এখানে পরিগণনার সুবিধার জন্য) অধিকাংশ ক্ষেত্রে পঙ্‌ক্তিগুলি ভেঙ্গে লেখা হয়েছে।

সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য এই পদগুলির অর্থ যেখানো হচ্ছে যথা—

১) শ্রুতিকটুতা বা দুঃশ্রবত্ব—কর্কশ শব্দের প্রয়োগ (Cacophony)

২) অশ্লীলত্ব (Indecent expression) এটা তিন রকমের হয় যথা—

ক) লজ্জা জনিত

খ) ঘৃণা জনিত

গ) অমঙ্গল জনিত

৩) অনুচিতার্থত্ব—বর্ণনীয় রসের বিরোধী শব্দের প্রয়োগ (use of unbecoming or improper word যথা—

'সূরা অবরতাং যান্তি পশবৃত্তা রণাধরে' (বীরবৃন্দ যুদ্ধ-রূপ যজ্ঞে পশুর মত নিহত হয়ে অমরত্ব পায়) এখানে বীরদিগকে পশুর সঙ্গে তুলনাটা অনুচিত হয়েছে।

৪) অপ্রযুক্ততা—ব্যাকরণ-দুষ্ট না হলেও যে সব শব্দের সচরাচর প্রয়োগ নেই এমন শব্দের ব্যবহার (use of obsolete words) যেমন 'ভাতি পদ্মঃ সরোবরে' এখানে পদ্ম শব্দটির পুংলিঙ্গে প্রয়োগ ব্যাকরণ-দুষ্ট না হলেও অপ্রচলিত।

৫) গ্রাম্যতা—অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রচলিত শব্দের ব্যবহার (Vulgarism)

৬) অপ্রতীতত্ব—অর্থাৎ সাধারণ সাহিত্য রচনায় বিশেষ কোনও একটা শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার (Use of technical or highly specialised words in general literature)। সাহিত্যটা সাধারণের উপভোগের সামগ্রী। তার বক্তব্যটাকে বিশেষ এক শ্রেণীর পারিভাষিক শব্দে বর্ণনা করলে সেটা সকলের অধিগম্য হয় না। সেটা এক জাতীয় বক্রতা এবং অপরাধ।

৭) সন্দিগ্ধত্ব—যেখানে শব্দের দু রকমের অর্থ থাকে আর দুটো অর্থ সমন্বেই পাঠকের মনে সন্দেহ জন্মাতে পারে (Ambiguity)—এ জাতীয় রচনা হেঁয়ালিরই নামান্তর।

৮) নেয়ার্থত্ব—অর্থাৎ এমন একটা লাক্ষণিক অর্থের প্রয়োগ যেটা অসুন্দর বা অপ্রয়োজনীয় (unpoetic use of secondary meaning of a word) যেমন "হে সুন্দরি, তোমার মুখখানি কমলে পদাঘাত করেছে" (কমলে চরণাঘাতং মুখং সুন্দরি তেঽকরোৎ)। এখানে পদ্মের চেয়ে সুন্দরীর মুখখানি সুন্দর এটা বোঝাবার জন্য "পদাঘাত" শব্দটির লাক্ষণিক অর্থে প্রয়োগটা সার্থক হয় নি।

৯) নিহতার্থতা—শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ (use of non current meaning) "যেমন যমুনা সলল (জল) আকাশ পরিব্যাপ্ত করেছে" এখানে 'জল' অর্থে 'সলল' শব্দের প্রয়োগ ঠিক হয় নি; 'সলল' বলতে আমরা নৈস্তব্য বিশেষত্বকেই বুঝি, 'জল' বুঝি না।

১০) অযাচকত্ব—যে শব্দের যে অর্থ নয় এমন অর্থে তার প্রয়োগ (false analogy of meaning) যেমন "শিশুরা বর্ণমালাস্তে" গানে বর্ণ আদান করছে"—এখানে "আদান" মানে "দান" নয়, "গ্রহণ"; কিন্তু দান অর্থেই তার প্রয়োগ হয়েছে।

১১) ক্লিষ্টত্ব—যে ক্ষেত্রে জটিল পদ-সংস্থানের জন্য অর্থ বোধে কষ্ট হয়। (Involved construction)

১২) বিরুদ্ধ-মতিকারিতা—যে ক্ষেত্রে অভিপ্রেত অর্থের বদলে তার বিপরীত একটা অর্থের প্রতীতি হয় যেমন "তুরঙ্গের তথানীশ"। এখানে "তথানীশ" শব্দটির

প্রয়োগ করলে মনে হবে "তব"-পত্নী "তবানীর" অন্যতর "ঈশ" বা স্বামী আছে। কিন্তু এ রকম মনে হওয়াটা লেখকের অভিপ্রেত নয়।

(১৩) অবয়ই বিধেয়াংশতা—বাক্যের মধ্যে বিধেয় অংশটাই প্রধান; কিন্তু তাকে অপ্রধান হিসাবে দেখানো হলে এই দোষ হয় যেমন "স্বর্গ প্রাপ্তিকা কিমুচ্যন্তে নৈ; কি মেরিছু হৈ" অর্থাৎ—স্বর্গ প্রাপ্তি-টিকা সূচন-কীর্ত বৃথা যোয় বাহু স্বর্গ যেন" (প্রাপ্তিকা—ছোট প্রাপ) এখানে বাহুর বৃথাত্ব হচ্ছে বিধেয়, কিন্তু ঐ বিধেয় অংশটি তৎপূরুষ সমাসের পূর্ব পদে নিবিষ্ট হওয়ায় তার অর্থটা অপ্রধান হয়ে পড়েছে।

(১৪) নিরর্থকত্ব—ছন্দাদির মিলের জন্য অর্থহীন শব্দের প্রয়োগ, যেমন "মুক মানং হি মানিনী", এখানে 'হি' শব্দটির কোনও অর্থ নেই।

(১৫) অসমর্থত্ব—যে শব্দের যে অর্থ হয় না এমন অর্থে তার প্রয়োগ (Malapropism) যেমন কুরু হস্তি কুশোদরী (কুশোদরী হচ্ছে যাচ্ছে। এখানে "যাচ্ছে" এই অর্থে "হস্তি" শব্দটি খাটে না; গমনার্থ প্রকাশে হন্ ধাতুর সামর্থ্য নেই।

(১৬) চ্যুত সংস্কারত্ব—ব্যাকরণ বহির্ভূত (idiom) অশুদ্ধি।

এই সব পদ দোষ ছাড়া মম্মট অনেকগুলি বাক্য দোষ (solicism), "অর্থদোষ" ও "রসদোষের" উল্লেখ করেছেন। এগুলি প্রায় অবিকৃত ভাবেই বিশ্বনাথ কর্তৃক অনুকৃত হয়েছে। তবে দোষের শ্রেণী বিভাগের ব্যাপারে দুজনের মধ্যে সামান্য অমিল আছে। মম্মট স্বীকার করেছেন চারটি দোষ (পদগত, বাক্যগত, পদার্থগত ও রসগত), আর বিশ্বনাথ বলেছেন দোষ পাঁচ রকমের, যথা পদগত পদাংশগত বাক্যগত অর্থগত ও রসগত।

তারপর থেকে বামন পর্যন্ত সকলেই দোষকে গুণের বিপরীত ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন। মম্মট কিন্তু সে ভাবে দোষের আলোচনা করেন নি। তাঁর মতে রসই হচ্ছে কাব্যের প্রাণ, কাজেই রসের প্রতীতিতে যে জিনিসটা অসুবিধার সৃষ্টি করে সেইটেই হচ্ছে দোষ। বিশ্বনাথও ঠিক এই মতেরই পুনরুক্তি করেছেন। তাঁর মতে দোষের সংজ্ঞা হচ্ছে "রসাপকর্ষা দোষাঃ" (যেটা রসের অপকর্ষ ঘটায়, তারই নাম দোষ)।

এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়। দোষের বিচারটা এত দিন ধরে হয়ে এসেছে "গুণ-ভিত্তিক"। মম্মটের বিচারে সেটা হয়ে উঠলো "রস-ভিত্তিক"। অথচ মম্মটের কাব্য সংজ্ঞার মধ্যে রসের কোনও প্রসঙ্গই নেই। কাজেই তাঁর নিজেরই কাব্য সংজ্ঞার বিচারে তাঁর দোষের তত্ত্বের মধ্যে একটা অসঙ্গতি থেকে যায়। বিশ্বনাথের দোষ-সংজ্ঞায় সে অসঙ্গতি নেই, কারণ বিশ্বনাথের কাব্যের সংজ্ঞা হচ্ছে "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। এখানে "গুরুযাত্রা বিস্তার" বিশ্বনাথ মম্মটের কাছে ঋণী হয়েও তাঁকেই পরাজিত করেছেন।

মম্মটের মতে অলঙ্কার জিনিষটা কাব্যের প্রাণস্বরূপ নয় এবং অলঙ্কারহীন রচনাও কখন কখন সুকাব্য হতে পারে। তবে কবি কৃতির ব্যাপারে অলঙ্কারের প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করেন নি এবং তার কাব্য প্রকাশে শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কার ও মিশ্র অলঙ্কার নিয়ে ৬৭টি অলঙ্কারের আলোচনা করেছেন। এখানে স্মরণীয় যে ভরত স্বীকার করেছিলেন ৩টি মাত্র অলঙ্কার (একটি শব্দালঙ্কার এবং তিনটি অর্থালঙ্কার), অলঙ্কার প্রস্থানের আচার্য ভামহ স্বীকার করেছিলেন৩ ৯টি, আর মম্মট করেছিলেন ৬৭টি অলঙ্কার। মম্মটের পরে এই সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশ্বনাথ স্বীকার করেছিলেন প্রায় ৭০টি অলঙ্কার আর জয়ন্তক স্বীকার করেছিলেন ৮৮টি।

এই সমস্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে মম্মট নিজে কোনও নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন নি। তাঁর বাহাদুরি হচ্ছে পরিচ্ছন্ন যুক্তি পরম্পরার সঙ্গে পূর্ব-সূরীদের মতবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা। তাঁর "কাব্য প্রকাশে" শুধু অভাব ছিল নাটক সম্বন্ধে আলোচনার। এই অভাবটি পূর্ণ করেছেন বিশ্বনাথ হেমচন্দ্র বিদ্যানাথ প্রভৃতি।

এই অসম্পূর্ণতাটুকু সত্ত্বেও মম্মটের সমন্বয়ী চেষ্টা খুবই সময়োপযোগী ও সার্থক হয়েছিল। তাই সারা ভারত-বর্ষেই 'কাব্য প্রকাশ' আদৃত হয়েছিল। তার টীকাও

প্রকাশিত হয়েছিল প্রচুর। আজ পর্যন্ত প্রায় ৭০টি টীকার সন্ধান পাওয়া গেছে এই গ্রন্থের উপর। অবশ্য এই টিকার প্রয়োজনও খানিকটা ছিল। মম্মটের ভাষা খুব সংহত ও সংক্ষিপ্ত বলেই খানিকটা কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিল। 'ধ্বন্যালোকের মধ্যে যে সমন্বয়ের চেষ্টার আরম্ভ হয়েছিল, তার একটা পূর্ণ পরিণতি এলো 'কাব্যপ্রকাশে'র মধ্যে। ফলে উত্তর কালের আলঙ্কারিকরা পেলেন একটা নূতন পথ-নির্দেশ।

ধ্বনিবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা অভিনব গুপ্ত ভরতের রসবাদেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। কাজেই তিনি রসবাদ ও ধ্বনিবাদের দোটানার পড়ে ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর এই দ্বিকোটিক প্রেমের একটা মীমাংসা হয়েছিল। একটিকে ত্যাগ অন্যটিকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে সেই মীমাংসাটা হয় নি। তিনি দুটি মতবাদকেই গ্রহণ করে তাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। এই সমন্বয়টি হয়েছিল তাঁর 'রসধ্বনি'র উপস্থাপনে। 'রসধ্বনি'টা কি জিনিস?

ধ্বনিবাদী হিসাবে তিনি ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলেছেন, অথচ এ কথাও বলেছেন যে রস ছাড়া কোনও রচনাই কাব্যত্ব পায় না। তাই তিনি বলেন 'রসের' সঙ্গে (অর্থাৎ আবেগ-ভিত্তিক অথচ আবেগ-বিনির্মুক্ত আত্মাভিমানতার সঙ্গে) একটা 'ধ্বনি' বা অন্য বাচ্য রমণীয়"ইঙ্গিত যুক্ত হলে তবেই রচনাটা কাব্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে। এইটেই হচ্ছে অভিনব গুপ্তের 'রসধ্বনির' তাৎপর্য্য।

রসবাদের বিবর্তনে অভিনব গুপ্তের হাতে 'রস' জিনিসটা 'ধ্বনির' সাহচর্যে খানিকটা কৌলীন্য পেলো বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত সেটা কাব্যের 'আত্মা' হিসাবে স্বীকৃতি পেলো না। সেই স্বীকৃতিটা অবশ্য তাঁর ছিলেন মম্মট, আর সুচিন্তিত ঘোষণায় প্রচার করলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'বাক্যং রসাত্মক কাব্যম্' এই কাব্য-সংজ্ঞায়। কাজেই রসবাদের প্রতিষ্ঠায় মম্মটের স্থান হচ্ছে অভিনব-গুপ্ত আর বিশ্বনাথের মধ্যবর্তী—সেটা কালের বিচারেও বটে, আর কাব্য তত্ত্বের বিচারেও বটে। মম্মট ধ্বনিবাদের ব্যাখ্যাতা হিসাবেও কাজ করেছেন, আবার বিশ্বনাথের রসবাদের পথ তৈরী করে দিয়েছেন। এই হিসাবে তিনি ধ্বনিবাদের ও রসবাদের মধ্যে একটা স্বর্ণ সেতুর কাজ করেছেন।

রসবাদের বিবর্তনের ইতিহাসটা বিচিত্র। তার সূচনা হয়েছে সব মতবাদের আগে। ভরতের সময় তার রীতিমত বয়ঃসন্ধি কাল। কিন্তু কাব্য রাজ্যে তাঁর অভিষেক হল অনেকের পর। গুণবাদ, রীতিবাদ, অলঙ্কারবাদ, ধ্বনিবাদ পর পর এলো এবং কাব্যের আত্মা হিসাবে স্বীকৃতি পেলো অথচ যে রসকে ভরত পর্যন্ত কাব্যের বীজ এবং কাব্যের ফল বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন সেই রসকে কাব্যের আত্মা হিসাবে প্রথম স্বীকার করা হল ভরতের আবির্ভাবের ১২।১৩শো বছর পরে বিশ্বনাথের কাব্য-সভায়। কাব্য রাজ্যে রসবাদের এই অভিষেক উৎসবে একটি শক্তিশালী নেপথ্য নায়ক হচ্ছেন মম্মট ভট্ট।

বন্ধুবরেষু

॥ শ্রীসুগত ॥

এক বন্ধু অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে সেদিন বলছিলেন, মানুষের উন্নতির জন্যে অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু মানুষ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে আর 'মানুষ'কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বন্ধুর এ অভিযোগ সত্য, অত্যন্ত নির্মম সত্য।

অন্যান্য দেশের কথা জানি না, (অবশ্য আজ সর্বত্রই যন্ত্রের সমাদরই বেশি, এবং মানুষকেও সেই ছাঁচে পরিণত করা হচ্ছে) আমাদের দেশের মানুষের দিকে তাকালে সত্যিই বড় হতাশ হয়ে পড়তে হয়। পোশাক-পরিচ্ছদে, তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ বেশ কেতাদুরস্ত হয়ে উঠেছে; নানা উৎসবাদির প্রাচুর্যও দিন দিন বেড়ে চলেছে, মহাপুরুষদের জন্মতিথি, মৃত্যুতিথি স্মরণ করারও একটা ফ্যাশন এসেছে সর্বত্র, কিন্তু মানুষের মধ্যেকার 'মানুষের' জাগরণ হচ্ছে না। মানুষ সত্যিই দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। যে গুণগুলো মানুষকে সত্যিকার 'মানুষে' পরিণত করে, সেগুলো যেন দিন দিন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মানুষ মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট একটা যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে যেন।

মানুষকে আমরা শ্রেষ্ঠ জীব বলি। অন্যান্য জীবের মধ্যে যা আছে, মানুষের মধ্যেও সেই দোষ-গুণগুলো আছে কম বেশি, কিন্তু মানুষের মধ্যে আরও অনেক-গুলো বেশি গুণ আছে, যে-গুলো অন্য জীবে নেই, এবং সেইখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। পশু পশু হয়েই জন্মায়, এবং পশু হয়েই মরে। কিন্তু মানুষ মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মায় বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে মানুষ হয়ে ওঠে। এই 'মানুষ হওয়াটা' মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাই যখন আমরা কোন মানব সন্তানের মধ্যে মানবোচিত গুণের অভাব দেখি, তখন আক্ষেপ করে বলি, অমুক বাবুর ছেলেটা 'মানুষ' হল না। কিম্বা কখনো কখনো কোন মানুষের কাজকে 'পশু'র মত বলে নিন্দা করে থাকি।

আমরা অনেক কিছু করছি। অনেক সুখ-সুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে; অনেক আরামে জীবন যাপন করার নানাবিধ সামগ্রী আবিষ্কার করছি; কিন্তু 'মানুষ' হচ্ছি না। বরং অশিক্ষিত বন্য অবস্থায় আমাদের মধ্যে যৌথ যে গুণগুলো ছিল, সেই গুলোও যেন ধীরে ধীরে নির্বাসিত হচ্ছে আমাদের মধ্য থেকে। তাই আমরা আর মানুষের দুঃখ দেখে ব্যথা পাই না, অপরকে বঞ্চিত করে নিজে সুখ সুবিধা ভোগ করতে একটুও লজ্জা বোধ করি না, নানা রকম অকর্ম কুকর্ম করে বেশ যেন গৌরব বোধ করি ইত্যাদি বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেগুলো পুরোপুরি মনুষ্যত্ব বিরোধী, অথচ আজকের সভ্যজগতে —জগতের কথা বাদ দিয়ে যদি আমাদের স্বাধীন দেশের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে সেই স্বাধীন দেশের সর্বত্র— নানাভাবে তা বেড়েই চলেছে। এবং তার জন্যে যে আমরা খুব বেশি চিন্তিত, তাও মনে হয় না। চিন্তিত হ'লে নিশ্চয়ই তার প্রতিকারের জন্য আমরা সবাই মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। এই সমস্যাটাই আজকের সবচেয়ে বড় সমস্যা, এবং এই সমস্যার কোন সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা হচ্ছে না দেখে মন বড় বেদনার্ত হয়ে উঠছে।

কেবল জড়জগতের উন্নতির দিকেই যদি আমাদের সমস্ত চেষ্টা, উদ্যম ব্যয়িত হয়, তাহলে প্রতিদিনের খাওয়া-পরা, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতির অভাব মিটবে সত্য, কিন্তু মানুষ কি শুধু ওইটুকুর জন্য জন্মেছে। শুধু যে ওই টুকুর জন্যেই জন্মায়নি, তার চাওয়া যে আরও অনেক বেশি, এ কথা মনে আসছে না কেন?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে সেই পবিত্র-সুন্দর

ছবিখানি : প্রচণ্ড অভাব-অভিযোগের তাড়নায় উত্তেজিত হয়ে নরেন এসেছেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর, আমার কিছু করে দাও, আর যে এ দুঃখ দারিদ্র্য সইতে পারি না।

ঠাকুর বললেন, যা না, যা, মা'র কাছে গিয়ে বল না। মা নিশ্চয়ই তোর কথা শুনবে।

নরেন গেলেন মার ঘরে, কিন্তু ভুলে গেলেন এক নিমেষে সমস্ত জাগতিক অভাব অভিযোগের কথা। তাঁর মধ্যে জেগে উঠলো এক অমৃতপ্রার্থী মানুষ। সে চাইলো মার কাছে, বিবেক, বৈরাগ্য মনুষ্যত্ব।

প্রতিদিনের প্রয়োজনকে ছাপিয়েও একটা চিরদিনের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন মানুষের। অন্য কোন জীবের নয়। মানুষকে তাই সেই প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করতে হয়। সফলতা বিফলতা যাই আসুক। সেই চেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের আপন পরিচয়। এই চেষ্টার অভাব আজ সর্বত্র। যা পেলে সে সত্যিকার স্বাধীনদেশের সুস্থ নাগরিক বলে আত্ম-পরিচয় দিতে পারে বিশ্ববাসীর কাছে সেই ঐশ্বর্য পাওয়ার চেষ্টাও নেই এবং না থাকার দরুণ বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ নেই।

সব দেখে শুনে মন থেকে বেদনা সরাতে পারছি না কিছুতেই। কারণ প্রতিদিন চোখের সামনে যা দেখছি, তা' অস্বীকার করি কী করে, এবং এই দেখাই আমাকে বড় হতাশ করে তুলছে। আমি আশাবাদী। কিন্তু আঘাতে আঘাতে এই আশার সৌধ যে আমার ধ্বসে পড়ছে। জানি না, তোমরা কী ভাবছো, কতটুকু খুশি আছ, প্রতিদিনের জীবন থেকে আগামী-দিনের কী সম্ভাবনার আভাস পাচ্ছ। আমি কিন্তু বড় নিরাশ হয়ে পড়ছি। প্রীতি নিও।

অবসরে

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

কত কথা মনে পড়ে : সব কথা বেদনা-রঙিন।
জীবনের এক একটি দিন
কেটে গেছে, গেঁথে গেছে সাথে সাথে তার
একখানি মালা বেদনার।
সে-বেদনা নানাধিক হ'তে
এসেছে এ জীবনের আলোছায়া-ঘেরা পথে পথে :
ছড়ানো বিছানো ছিল এধারে ওধারে ;
তুলেছি সে-বেদনার ফুলগুলি আলোকে আঁধারে,
আর গেঁথে রেখেছি নীরবে।
জানি সে আমার সাথী হবে
একদিন—যখন সকলে
(যারা ভরে রেখে যেন দিনগুলি কলকোলাহলে
তারপর সরে যায় একদিন, থাকে নাকো আর)
সরে যাবে বহু দূরে ; সেদিন আমার
এ রঙিন মালাখানি একান্ত আপন
হয়ে রবে সারাটি জীবন।

ফেলে-আসা জীবনের বেদনার গানগুলি নিয়ে
আগামী দিনের পথে একা একা দুই পা বাড়িয়ে
চলবো একটু ক'রে, ক্লান্তগতি শিথিল চরণ
হোক না, নেই তো ক্ষোভ। তারপর আসুক মরণ
যখনই ইচ্ছা তার। ফেলে রেখে ধরণীর পরে
আমার সে-মালাগাছি যাব চলে প্রসন্ন অন্তরে।
সাথে নিয়ে যাব নাকো কোন গ্লানি, কোন অভিযোগ,
যেটুকু পাওয়ার ছিল, পেয়েছি তো, করেছি তো ভোগ,
অবহেলা করিনি তো, থাকিনি তো ঘুরে ঘুরে সবে,
এ জীবনখানি পূর্ণ ক'রে
দিয়েছি যে ; দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই কোনখানে :
যাত্রা সুরু আর যার হবে নব জীবনের পানে।

দ্রৌপদী

।। শ্রীপ্রতিভা রায় ।।

আমরা কলিযুগের মানুষ। কলিযুগ কলহের যুগ, পচন ধর্মের যুগ, সেই কারণেই বর্ত্তমানের সর্ব্বক্ষেত্র আজ কলহের কোলাহলে মুখরিত হইয়া গিয়াছে। ভাগবত কলি-যুগের যে সমস্ত লক্ষণ দিয়াছেন, সে সমস্তই আমাদের সমাজ-জীবনে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। দ্বাপরের শেষে কলির প্রথমে এই পচন ধর্ম্মে গ্লানিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল ধরণী। ধরণীর সেই ভার হরণ করিতে শ্রীভগবান ধরার বুকে অবতরণ করিয়া সেই পচনের বুকে এক নব ভারত গঠনের বীজ বপন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেই যুগে সেই বীজ ধারণ করিয়াছিলেন যে যে ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রের এক মহীয়সী নারী চরিত্রের কিছু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। সেই নারী জীবনের ইতিহাস বিরাট এবং আশ্চর্য্য রহস্য মণ্ডিত। মহাভারতের প্রধান অংশই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেননা, তিনিই শত লাঞ্ছনার অশ্রু-সিঞ্চনে নব-ভারত রচনার বীজ অঙ্কুরিত করিয়া ভারতের ইতিহাসকে সৌরভময় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই মহীয়সী নারী জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন পাঞ্চাল দেশের দ্রুপদ রাজার গৃহে, যাঁহার জীবন কথা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মণ্ডিত ও তেজদীপ্তে উজ্জ্বল।

পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদ এবং কুরু-পাণ্ডব কুলের গুরু দ্রোণাচার্য্য বাল্যকালে বন্ধু ছিলেন। দ্রোণাচার্য্য একদিন দারিদ্র্যের পীড়নে ব্যথিত হৃদয়ে বাল্য বন্ধু রাজা দ্রুপদের নিকট কিছু ভিক্ষার্থে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু সেদিন রাজা দ্রুপদ দরিদ্র ব্রাহ্মণের বন্ধুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। সেইদিন অপমানে বেদনায় ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া দ্রোণাচার্য্য হস্তিনায় নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। কুরু বংশের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতার সারল্যে দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের অস্ত্র শিক্ষা দিবার উপযুক্ত গুরু মনে করিয়া তাঁহার উপর রাজপুত্রগণের অস্ত্র শিক্ষা দিবার ভার অর্পণ করিলেন। কুমারগণের অস্ত্র শিক্ষা হইয়া যাইবার পর গুরু দ্রোণাচার্য্য একদিন প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের নিকট গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ অপমানকারী দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট আনিয়া দিতে বলিলেন। প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুন সানন্দে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। রাজা দ্রুপদকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দ্রোণাচার্য্য বিদায় দিলেন। দ্রুপদ রাজা এই ভাবে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অপমানিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য দেশে যাইয়া এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে উৎপত্তি হইল কন্যা যাজ্ঞসেনীর, দ্রোণ-দ্রুপদের লড়াইয়ের ভিতর দিয়া মহাভারতের এক বিরাট ধ্বংসের বীজ রূপে কন্যার জন্ম হইল। কিন্তু সেই বীজের উৎপত্তি হইল যজ্ঞ হইতে, সেই জন্যই বুঝি তাঁহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত চলিয়াছিল এক আত্মাহুতির যজ্ঞ। মহাভারতের ধ্বংস-লীলার বীজ যেমন তিনি, আবার তদপেক্ষা চরণে আত্ম-সমর্পণের মূর্ত্ত বিগ্রহও তিনিই। বীজ পচিয়াই নূতন গাছের অঙ্কুর হয়, দ্রৌপদীর জীবনও পচন-ধর্ম্মময় গ্লানিপূর্ণ ধরার বুকে ধ্বংসের রক্তারক্তির লীলাভূমির মাঝে নূতন আত্ম-সমর্পণময়ী ভাগবত ধর্ম্মের নবযুগ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইলেও দ্রুপদ রাজা তাহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। অসাধারণ রূপ-গুণসম্পন্না কন্যা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনের হস্তেই সমর্পণ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প মনে মনে করিয়াছিলেন। যেদিন জানিতে পারিলেন জতুগৃহের অগ্নিদাহে পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যু হইয়াছে, সেদিন তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে অগ্নিদাহে পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যু, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয় ভাবিয়া, দ্রুপদ্ধা বেদব্যাসের সহিত পরামর্শ করিয়া বীরত্বের পরীক্ষা

করিবার জন্য এক অপূর্ব্ব কৌশলে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা রচনা করিলেন। এক সোনার মৎস্য তৈয়ী করিয়া শিল্পি দ্বারা তাহার চক্ষু তৈয়ী করিয়া বহু উর্দ্ধে স্থাপন করিলেন এবং তাহার নীচে মন্ত্রপূত এক চক্র অবিরাম ঘুরিতে লাগিল, একটি পাত্রে মাটিতে জল রাখিয়া দিলেন, সেই জলের ভিতর মৎস্যের ছায়া দেখিয়া সেই ঘূর্ণায়মান চক্রের ভিতর দিয়া মৎস্যের চক্ষু বিদ্ধ করিতে পারিবেন তিনিই সর্ব্বগুণসম্পন্না দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ করিতে পারিবেন। এইভাবে পাঞ্চাল রাজ্যে স্বয়ম্বর সভা সজ্জিত হইলে সেই সংবাদ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দ্রৌপদীর অসামান্য রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভারতের সমস্ত রাজেন্দ্রবর্গ পাঞ্চাল রাজ্যে আসিয়া সমবেত হইলেন। জতুগৃহ হইতে পলায়ত ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ-বেশধারী পঞ্চ-পাণ্ডবের নিকটও সেই সংবাদ পৌঁছাইল, তখন তাঁহারা মাতা কুন্তী দেবী সহ পাঞ্চাল রাজ্যে আসিয়া এক কুটিরে আশ্রয় লইলেন এবং স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন।

পাণ্ডবের সখা আশ্রিত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণও দাদা বলরামকে সঙ্গে করিয়া সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে একে সমস্ত রাজেন্দ্রবর্গ সেই ঘূর্ণায়মান চক্রের ভিতর দিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে গিয়া ব্যর্থ-চেষ্টা হইয়া সবাই অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এই চক্র ভেদ করিয়া আমার ভগিনী কৃষ্ণকে গ্রহণ করিতে পারেন তবে চেষ্টা করিয়া দেখুন। তখন ছদ্মবেশী অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রণাম জানাইয়া অনায়াসে ধনু তুলিয়া লইয়া সেই মৎস্যের চক্ষু ভেদ করিয়া মাটিতে ফেলিলেন। দ্রৌপদী ফুলের মালা লইয়া অর্জ্জুনকে স্বামীত্বে বরণ করিতে গেলে অর্জ্জুন তাহাকে নিষেধ করিলেন, দ্রৌপদী মালা লইয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সভাস্থলে তুমুল গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। বড় বড় বীরেরা যে কার্য্য করিতে সক্ষম হইল না, একজন ব্রাহ্মণ তাহা করিয়া দ্রৌপদী কন্যা লইয়া যাইবে ইহা রাজেন্দ্রবর্গ সহ্য করিতে পারিলেন না। চারিদিক হইতে অর্জ্জুনের উপর বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। দ্রৌপদী সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন—আমার জন্য আজ এই অনর্থের সৃষ্টি হইল, এখন কি উপায় হইবে? অর্জ্জুন বলিলেন—দেবী, তোমার ভয় নাই, দাঁড়াইয়া দেখ যুদ্ধের পরিণতি কি হয়, বিপদ কালে বিপদের বন্ধু প্রাণ-সখা গোবিন্দকে স্মরণ কর, তিনিই তোমাকে এই বিপদ-সিন্ধু হইতে ত্রাণ করিবেন। দ্রৌপদীর নারী-জীবনের প্রথম আত্মনিবেদন যাহা তিনি স্বামীর জন্য আনিয়াছিলেন, সেই শুভক্ষণ তাহার জীবনে রণ ঝঞ্ঝাৎকারের মাঝে সেই অন্য নিবেদন পরম পতি, পরম সখা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিবেদিত হইল। দ্রৌপদী আকুল পরাণে হে কৃষ্ণ, হে সখা, হে বিপদের বন্ধু গোবিন্দ, তুমি এই বিপদ সিন্ধু হইতে আমাকে, আমার পিতা ও পিতৃ রাজ্যকে রক্ষা কর বলিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে বাম হস্ত তুলিয়া দ্রৌপদীকে অভয় প্রদান করিলেন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া সমস্ত রণস্থল কম্পিত করিয়া তুলিলেন। এই তো দ্রৌপদীর চলার পথ সুরু হইল, একদিকে জীবনভর অনন্ত লাঞ্ছনা, অনন্ত বিপদ, অন্য দিকে ভগবানের অনন্ত করুণা, অনন্ত ভালবাসার স্পর্শ। তাহার সারাজীবনের ইতিহাস শুধু লাঞ্ছনা, শুধু বেদনার ভরা। সেই বেদনায় হৃদয় ব্যথিত হইয়া তিল তিল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আত্ম সমর্পণ হইয়াছিল। তাঁহার জীবন ধৈর্য্যে, সংযমে, বিশ্বাসে, নির্ভরতায় ছিল ভরপুর।

যুদ্ধাবসানে পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে লইয়া মাতৃ কুটির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা মাতা কুন্তীদেবীকে ডাকিয়া বলিলেন মাগো, কি ভিক্ষা আজ আমরা আনিয়াছি বাহির হইয়া দেখ। কুন্তীদেবী চারিদিকে রণ কোলাহল শুনিতেছিলেন, অনেক রাত্রি হইয়া গেল সন্তানগণকে না দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন সময় পুত্রদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন যাহা ভিক্ষা আনিয়াছ পাঁচভাই বণ্টন করিয়া লও। হায়, মাতৃ-বাক্য অলঙ্ঘনীয়, পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন! কি এক অভাবনীয় অপরূপ ব্যাপার দ্রৌপদীর জীবনে ঘটিয়া গেল!

কিন্তু এই জটিল ঘটনাকে কেমন করিয়া তিনি দিব্যভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন দ্রৌপদীর আত্ম-সমর্পিত জীবনে ইহাও দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়।

দ্রৌপদী-চরিত্রের কি মাধুর্য্য! সারা জীবন লাঞ্ছনা তাঁহার অনেক হইয়াছিল, কিন্তু লাঞ্ছনার ভিতর পড়িয়া কখনও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে দেখা যায় নাই বা ব্যবহারে অসৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় নাই বরং তেজস্বিতার পরিচয়ই পাওয়া গিয়াছে। যেদিন পাশায় হারিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছিলেন, সেদিন বিনা প্রতিবাদে এই অপমান তিনি স্বীকার করিয়া লন নাই। দ্রৌপদীর নিকট প্রেরিত দূত প্রতিকামীর দ্বারা দ্রৌপদী বলিয়া পাঠাইলেন যুধিষ্ঠিরকে, তিনি অগ্রে আমাকে কিম্বা আপনাকে দ্যূত মুখে বিসর্জ্জন দিয়াছেন? দ্রৌপদীর জীবনে যেমন ধর্ম্ম-চরণ ছিল, নীতি-বোধ ছিল, তেমনই দর্পও ছিল প্রচুর। এই দুই দিক মিলাইয়াই তাঁহার জীবন এত সুন্দর হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের এই সৌন্দর্য্যের মূলে ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবিড় ভালবাসা। মানুষের জীবনে যদি আদর্শ-বোধ না থাকে, ঝঞ্ঝাটময়ী প্রকৃতির টানে সে যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা তাহাই দাঁড়াইয়াছে। কোথাও কাহার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, ভালবাসা নাই! শ্রদ্ধাই মানুষকে ধারণ করে, স্রোতের মুখে রক্ষা করে। কৃষ্ণ-সভায় দ্রৌপদীর যে লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল তাহাতে তো তাঁহাকে চরম করিয়া পূজ্য-পূজা ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারিত, তাহা তো সে দিন করে নাই। লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী কৃষ্ণ সভায় দাঁড়াইয়া বার বার ভীষ্ম পিতামহ ও গুরু দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনারা বলুন সত্যই কি আমি পণে হারিয়া দুর্য্যোধনের দাসী হইয়াছি? তাঁহারা কেবল মাত্র বলিয়াছিলেন তোমার স্বামীদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিবার সাহস সেদিন অহঙ্কোপী পিতামহ বা গুরু দ্রোণাচার্য্যের ছিল না।

দ্রৌপদীর স্বামীরা তো লজ্জায় অপমানে মৌন মূক হইয়া বসিয়া ছিলেন। অসহায় দ্রৌপদী সে দিন কাহারও প্রতি দোষারোপ না করিয়া বা কাহারও প্রতি বিরক্ত না হইয়া তাঁহার জীবনের চির সঙ্গী পরম সখা, বিপদের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যে যাহার শরণ লয় সে তাহাকে রক্ষা করে। শরণাগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন দ্রৌপদী। অরেরেরে মুক্ত জীবন ছিল তাঁহার। কৃষ্ণ সভা হইতে যখন স্বামীদের সহিত বন গমন করিতে-ছিলেন, তখন মাথার কেশ এলাইয়া দিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন, আজিকার অপমানকারী দুঃশাসনের রক্ত দিয়া এই কেশ বাঁধিব! কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা! কিন্তু কালকে তিনি অস্বীকার করিয়া তখনই একটা কাণ্ড ঘটাইলেন না, কালকে স্বীকার করিয়া ঘটনার অপেক্ষায় রহিলেন। এই ধৈর্য্য পুরুষোত্তমে আত্মসমর্পিত জীবনেই সম্ভব হয়। দ্বৈত বনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অত্যাচারেও তাঁহার ধৈর্য্য হারাইতে দেখা যায় নাই। আবার এই দ্রৌপদী বিরাট গৃহে বিরাটের শ্যালক কীচক কর্ত্তৃক অপমান নীরবে সহ্য করেন নাই, তাহার উপযুক্ত শাস্তি তিনি তাহাকে দিয়াছিলেন। কখন কোথায় কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সে সম্বন্ধে স্থান কাল পাত্রের মাত্রা-বোধ, পথ চলার ছন্দ-বোধ ইহাই তো মানুষের মনুষ্যত্ব।

দ্রৌপদী রাজকন্যা ও রাজরাণী হইয়াও স্বামীদের সহিত পথে পথে কত কষ্টেই দিন যাপন করিয়াছিলেন; কত বিপদের সম্মুখেই না তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু বিপদের দিনে তিনি সখা শ্রীকৃষ্ণকে কাছে পাইয়াছেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপে যেদিন সবাই মরিতে বসিয়াছিলেন সে দিনও শ্রীকৃষ্ণ ছুটিয়া আসিয়া সেই বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই তো কুন্তী দেবী একদিন বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ রে, দুঃখ বিপদ যেন আমাদের চিরদিন থাকে। কৃষ্ণ বলিলেন, কেন পিসিমা তুমি দুঃখ বিপদ চাহিতেছ? কুন্তী বলিলেন, কৃষ্ণ, যে দিনই আমরা বিপদের মধ্যে পড়িয়াছি সেই দিনই তো বিপদের বন্ধু তুই, তোর ঐ চাঁদ মুখখানা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। যে বিপদ তোকে কাছে আনে সে তো বিপদ নয় রে কৃষ্ণ, সেই তো আমাদের সম্পদ, পাণ্ডু-পুত্রদের

সখা তুই—এই তো তাদের পরম সম্পদ। মানুষের একটা জায়গায় যদি স্থিতি-ভূমি না থাকে, গতির টানে সে তো নাজেহাল হইবেই। ভগবান, গুরু, পিতামাতা বা স্বামী যে কোন একস্থানে যে স্থানটা ক্ষুদ্র নয়—যাহার জীবন শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পিত হইয়া ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে সেই স্থানে যদি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না থাকে, মানুষ বিপদ সাগর উত্তীর্ণ হইবে কি করিয়া? আদর্শে যদি মানুষ স্থিত থাকে শত দুঃখ লাঞ্ছনা তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে পারে না, সেই সব জীবনে দুঃখ রসই জোগায়। মানুষ এমন একটা নিশ্চিন্ত স্থান যদি না পায় যাহার কাছে সুখ দুঃখের সকল কথা বলিয়া, প্রাণের যত কিছু আবদার অভিমান জানাইয়া হাল্কা হইতে না পারে, তাহা হইলে সংসারে পথ চলা দুরূহ। যেদিন শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট শেষবারের মত যুদ্ধ পাণ্ডবের আপোষ করিতে যাইতে ছিলেন, সেদিন কি আবদার করিয়া, কি বেদনার সহিত না দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—সখা, আজ জানিলাম দ্রৌপদীর কেহ নাই, তুমিই একমাত্র আমার সখা ছিলে, আমার দুঃখে তুমি দুঃখ পাইয়াছ, আমার হাসিতে তুমি হাসিয়াছ; আজ বুঝিলাম আমার সে স্থানটুকুও নাই, কেন না এত লাঞ্ছনার পরও তুমি আপোষ করিতে যাইতেছ? একটা কথা মনে রাখিও, আমার এই কেশ দেখিয়া যাও, (যাহা কুরু সভায় অপমানের দিন খুলিয়াছিল,) প্রতিজ্ঞা করিয়াছি শত্রুর রক্তে রঞ্জিত করিয়া এই কেশ বাঁধিব। কি তেজস্বিনী রমণী দ্রৌপদী! আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমার মূর্ত্তি দেখিয়াছি যেদিন দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে অশ্বত্থামা গোপনে আসিয়া হত্যা করিয়া গিয়াছে। "অতলস্পর্শী শোকের নিবিড় ছায়া নেমে এসেছে দ্রৌপদীর জীবনে। তার প্রাণাধিক বীর পুত্রগণকে সুপ্ত অবস্থায় হত্যা করেছে গুরুপুত্র অশ্বত্থামা। পুত্র-হন্তা অশ্বত্থামাকে বন্দী করে এনেছেন ভীমার্জ্জুন। অশ্বত্থামাকে কি দণ্ডাদেশ করবেন তার প্রতীক্ষায় চেয়ে আছেন দ্রৌপদীর বিষাদ-মলিন মুখের দিকে। ধৈর্য্য ও ক্ষমার জীবন্ত প্রতিমা, পুত্রশোকে উন্মাদিনী কৃষ্ণা বললেন—গুরুপুত্র গুরুবৎ। আচার্য্য দ্রোণ তোমাদের গুরু, তাঁর অবর্ত্তমানে অশ্বত্থামা আজ গুরুরূপে বর্ত্তমান—স এব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে। পুত্রশোকে আমি অবসন্ন, আচার্য্যা গৌতমীকে (দ্রোণপত্নী) পুত্রশোকে বদ্ধ হতে দেখলে আমি বাঁচব না—মা রোদীদস্ত জননী গৌতমী পতি দেবতা। গুরুপুত্রকে মুক্তি দাও।'

সাধারণ মানুষে কি এই ধৈর্য্য, এই ক্ষমা সম্ভব। এইখানে দ্রৌপদী-চরিত্র আরও মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। দ্রৌপদীর জীবন অপূর্ব্ব। এই অপূর্ব্বতা তাঁহার জীবনে কোন্ পথ ধরিয়া আসিয়াছিল, ইহা বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। সেই পথ হইল একটা গতি-ধর্ম্মাত্মক আদর্শের কাছে আত্ম সমর্পণ, যে আদর্শের মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের মেয়েরা আজ অন্নের জন্য ঘর ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইল কিন্তু জীবনের আদর্শ ঠিক করিয়া লইল না। তাই পথে বাহির হইয়া তাহারা লাঞ্ছিতই হইতেছে, আত্ম মর্য্যাদাই তাহাদের পথের ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের সমস্যা আদর্শ ও অন্নের। জীবনে অন্নও চাই, আদর্শও চাই। আদর্শ বাদ দিয়া শুধু অন্নে পেট ভরিলেও তো জীবন ভরিবে না, জীবনের হাহাকার ঘুচিবে না। আজও নিজেদের চলার পথ সম্বন্ধে মেয়েরা চিন্তা করুক, ইহাই আমার বক্তব্য।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫০—

(২১)

সকালে বেণু আসে, ব্রহ্মসূত্রের ৩৮শ ও ৩৯শ কর্মের ও ভাস্করভূমিকার প্রুফ দিয়া যায়। তাহা দেখি।...বেণু ১টায় পরই আসে, প্রুফগুলি নেয়ে। আমি ৮টার পর প্রতিষ্ঠার স্থানে যাই।...

৮ই এপ্রিল

সকালে বেণু আসে। ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি।... কি শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া সমাজ দাঁড়াইয়াছে! পুরুষোত্তম-দর্শন ছাড়া উপায় আছে কি? পূর্বের সত্য-অসত্য, পবিত্রতা-অপবিত্রতার মানদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে, অথচ নূতন যুগের উপযোগী কোন মানদণ্ড স্থাপিত হয় নাই। তাই এই দুরবস্থা—ইহা প্রতিষ্ঠার স্থানে আলোচনা হয়।...

৯ই এপ্রিল

সকালে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখি। বেণু আসে।... বরিশালের অধিনাশ ঘোষ আসে।...শিশির ব্যানার্জী সেই কালীপূজার দিন আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যাইবার পর এই প্রথম আসে। হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করি। ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকিলে আমি যে impersonal হইয়া তাহার রাহুতাপ কাজে লাগিতে পারিব না তাহা আজ স্পষ্ট ভাবে বলিলাম। হৃদয় দিয়া আমি চলি, আমার হৃদয় ঠাণ্ডা থাকিলেই তবে আমি কাজ করিতে পারি। সে বলে, আমার কাজই সে করিতেছে। আমার কাজ করিবার জন্যই সে ঘুরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। আমি বলিলাম—আমার কাজের হিসাবও তো আমাকে মাঝে মাঝে দিতে আসিতে হয়। যেখানে প্রতি পদবিক্ষেপে কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে এত দিন ঘুরে ঘুরে থাকিয়া কিছুতেই কাজের ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিতে পারে না। আমি ও আমার কাজ দুই-ই সমান ভাবে সত্য।...কংগ্রেসের অবস্থা সম্বন্ধে সে (সতীনাথ) প্রশ্ন করে। কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত উৎরাইয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। পররাষ্ট্রনীতিদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ভারতবর্ষ পক্ষপাতবিনির্মুক্ত নীতি, সত্যাগ্রহীর নীতিই গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে স্থির থাকিলে সে সব বিপদ কাটাইয়া উঠিবে। আফিসে বীরেন ব্যানার্জী আসেন। তাহার সঙ্গে 'objective immortality'-র কথা হয়, তিনি প্রবাসীর বহুদিন পূর্বের 'শিল্পে সৌন্দর্য্য' প্রবন্ধের কথা বলেন; উহাতে আত্মা-অনাত্মার সমন্বয়ের কথা আছে। ২৬শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের যুগান্তরের লেখার কথাও হয়। ৯টার পর আসি।...

১০ই এপ্রিল

সকালে বেণু আসে। ১০টার পর যায়।...খাওয়ার পর পোস্টাফিস...কলিকাতা যাই। আমি ৫টায় আগে হরিদাসীর স্থানে যাই।...আজ সকালে গ্রাহকদের ব্যাপার লিখিয়া ফেলি। কিছুটা 'সমগ্রদৃষ্টি' প্রবন্ধটাও লিখি।...প্রেস হইতে ৩৮শ, ৩৯শ, ফর্মার ও ভূমিকার ফাইল কপি দিয়া যায়। ঠাকুরের সাক্ষাৎ কৃপা ছাড়া এই বই বাহির হওয়া (মোটামুটি নির্ভুল ভাবে) কিছুতেই এমন অল্প মানুষ দিয়া সম্ভব হইত না। মনু, বেণু ও প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করিয়া নিত্যগোপাল এই কার্য্য করিলেন। তাঁহার জয় হউক।...

১১ই এপ্রিল

সকালে বেণু আসে। ফেলিয়া দিবার মত বইগুলি

যাহিরা বাহির করে। ৯টার পর আমি প্রতিষ্ঠায় ওখানে যাই।...সেখান হইতে আফিসে যাই। রেণু কলিকাতা যায়, আমি আশ্রমে ফিরি। প্রায় ৪টায় রেণু আবার আসে।...বসনাবাবু আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্যের রূপ কি হইবে, ধর্ষিতা একটী নারীকে তাহার ভ্রাতৃবধূরূপে ঘরে নিতে পারেন কি না, ইত্যাদি সোজা প্রশ্নগুলির আলোচনা হয়।...আশুবাবুর ওখান হইতে ১০খানা বাঁধা ব্রহ্মসূত্র দিয়া যায়।...

১২ই এপ্রিল

...আমি মঠে যাই। সেখানে শ্যামসুন্দরানন্দ ও পরমানন্দের সঙ্গে ঠাকুরের অনন্যতা ও সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সন্ধ্যার পর আফিসে ফিরি। তাহার কিছু পরে রেণু নূতন রকমের বাঁধা ৩ খানা ব্রহ্মসূত্র নিয়া আসে।...

১৩ই এপ্রিল

আজ শ্রীনিত্যগোপালের শুভ আবির্ভাব-তিথি। সকালে রেণু আসে। প্রার্থনান্তে ব্রহ্মসূত্র-অবধূত ভাত (ভাল বাঁধা) নিবেদন করি। তাহার পরই আফিস হইতে বই নিয়া মহুর বাসায় আমি ও রেণু যাই। ট্রামে ননিবার সঙ্গে দেখা। মহুকে একখানা দেই।...সেখান হইতে বরাবর হরিদাসীর বাসায় যাই। ট্রামে তুলসীর সঙ্গে দেখা। তাহার সঙ্গে আমার (মঠের) ট্রান্সফার হওয়ার কথা হয়। আমি স্পষ্টতঃই অস্বীকার করি। মঠের অনেকের আপত্তি আছে। আমি তাহা জানি। আমাকে পরিপাক করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। হরিদাসীকে ব্রহ্মসূত্র দেই। ৮৲ টাকা দেয়।...মঠে আসি। ঠাকুরকে বই দেই। রেণু সিঙ্গনকে ধরিবার জন্য আগেই চলিয়া আসে। আমি ১০টার পর প্রতিষ্ঠায় ওখানে যাই। তাহাকে ব্রহ্মসূত্র দেই। নিত্যব্রতর সঙ্গে সকালে সত্যব্রতর জন্য ১খানা ব্রহ্মসূত্র পাঠাইয়া দেই।...৩টার পর আমি উষাদিদী ও রেণু মঠে যাই। জনরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়। বৈকালে পতিতপাবন, অবনী সরকারের সঙ্গে আলোচনা হয়। সন্ধ্যার সময়ই আমরা চলিয়া আসি।...

১৪ই এপ্রিল

বাংলা নববর্ষ

সকালে সকলে প্রণাম করে। রেণু আসে। তাহার পর নীহার ও রেণু কেমন আছে জানিবার জন্য মহুর বাসায় যাই।...রিকসায় চলিয়া আসি কালীঘাটের ভিক্ষ ঠেলিয়া। কি ভিক্ষ। মনে হইতেছিল এই সংস্কারের ভিতর কমিউনিজম ঠাঁই পাইবে কি? রেণু তাহার পর যায়, তখন বেলা প্রায় ১১টা।...ফুলালীও সত্যব্রতর সঙ্গে আসিয়াছিল। ২টার পর মালতী আসে। কিন্তু আগেই রেণু আসে। সে ঠাকুরঘরের আলমারির বইগুলি ঠিক করে ব্রহ্মসূত্রের স্থান করিবার জন্য। যে কাজ করিতে থাকে আমি প্রতিষ্ঠায় ওখানে যাই।...সেখান হইতে মঠে যাই।...স্নেহলতা ঘড় নামে একটি মেয়ে আমাকে খুঁজিয়া বাহির করে। সে এখানে আসিয়াও নাকি আমাকে খুঁজিয়া গিয়াছে।...মঠে অন্যান্য সঙ্গে দেখা...সঙ্গে চলিবার রূপ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কমল যেমন বলিয়াছিল, যাহা পাইয়াছি, তাহার বেশী দাবী করি না—ইহাই মনে রাখিতে বলি।...১০টার অনেক পরে আশ্রমে ফিরি।...

১৫ই এপ্রিল

রেণু সকালে আসে, এখান হইতে ৯টার পর প্রেসে ও টুইডে যায়। প্রেসে প্রুফ দিয়া আসে। সেখান হইতে ফিরিয়া খাইয়া আবার রবিবাবুর ওখানে যায়।...সেখান হইতে ২।১ আড্ডায় গিয়া ৩টার পূর্ব্বে এখানে পৌঁছায়। ঠাকুরের অন্নোৎসবে নীলু একটী চিঠি দেয়। হৃদীর মনি-অর্ডার করিয়া ৯৲ টাকা পাঠাইয়া দেয়।...সকালে ২।পার লিখি; ৯৷০ টার পর আশ্রমে ফিরি। 'The art of progress is to preserve order amid progress and to preserve change amid order. Life refuses to be embalmed alive. The more prolonged the halt in some unrelieved

system of order, the greater the crash of the dead society. 'Order is not sufficient, What is required, is something much more complex. It is order entering upon novelty so that the massiveness of order does not degenerate into mere repitition; and so that the novelty is always reflected upon a background of system'. Process and Reality. P180.:- যতীনিবাবু···'অথর্ববেদের উপযোগিতা' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ দিবেন।

১৬ই এপ্রিল

নীহার! নীহার! নীহার! মনু! মনু! মনু! সকালে রেণুর ওখানে যাই। রেণুকে নীহারের ওখান যাইতে বলি। নীহারের বাসায় যায়।···৯॥০টার পর আসি। রাত ১২টার পর ফোন আসে নীহারকে কে খুন করিয়াছে। তখনই আমি উষাপিসী ও নিত্যব্রত ট্যাক্সীতে যাই। মনুও আহত। তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থা ভাল নয়। তবে রক্ত বন্ধ হইয়াছে। মরফিয়া দিয়া রাখিয়াছে। বুকেতরা ব্যথা। ঠাকুরই জানেন কি তাহার ইচ্ছা। কোন্ পথে তিনি নিয়া চলিয়াছেন, জানি না।···

১৭ই এপ্রিল

···কোন্ মহাপ্রয়োজনে ঠাকুর নীহারকে সরাইয়া লইলেন? একটী কানা কড়িও তো সেখানে একটী মোহর না রাখিয়া ঠাকুর কাড়িয়া লন না। কী সেই মোহর?··· আমার এই আমাতা-শোক কি নিতান্তই গতানুগতিক? আমার তাজা বুকে কোন্ সংগঠন গড়িয়া উঠিবে? 'বিপদের ঝটিকা যদি মর্মমর্ত্ত ছিন্ন ভিন্ন করে, সবার প্রতীক্ষায় আমি নয়ন স্থাপন করিয়া রহিব'—এই বাণী বিশ্বনাথ-সমীপের কাছে বলি।···৪টার পর বেণু বর্ধা হইতে আসে। আমি রেণু, নিখিলাই সুরেনসহ ঠাকুরের সেবায় ফুলবিল্বপত্র দিয়া শেষ যাত্রার আশীর্বাদ জপে দিয়া আসি আমার শেষ করণীয়। পুরুষোত্তম-গতিপথে আমার আশীর্বাদ রহিল। দিবা পুরুষোত্তম-দেহ দাহ করে। রেণু-নিভা ১১টার পর হাসপাতালে যায়। রেণু-বুই ৪টার পর হাসপাতালে যায়। রেণু রাত্রিতে আমার কাছে থাকে।···

১৮ই এপ্রিল

সকালে ঠাকুরের সামনে বেদনাভরাক্রান্ত হৃদয়ে চোখের জলে আর্তনাদ করিয়া প্রার্থনা করি। বুকটার মধ্যে যে vacuum-এর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তো ঠাকুর তোমাকেই পূর্ণ করিতে হইবে।···আমার সেবা-সহচর নীহার, তুমি কি মনুকে আমার আবার ফিরাইয়া দিয়া গেলে? মনু তাহার এই বৈধব্য লইয়া সার্থক হইবে যদি সে আবার বিশ্ববাসীর সেবায় লাগিতে পারে। তাহা হইলে এই মরণ সার্থক হয়। ঠাকুরের 'দানকে' যেন অপমান না করি।···

১৯শে এপ্রিল

সকালে সুস্থভাবে প্রার্থনা করি।···রেণু ১১টার সময় হাসপাতালে একবার যায়, আবার ২টার পর যাইয়া ৪টা পর্যন্ত থাকে।···

২০শে এপ্রিল

সকালে প্রার্থনা করি।···রেণু জয়াকে নিয়া আসে, রেণু বাসায় যায়। ভুবনাম জয়াকে হাসপাতালে দিয়া আসে। জয়া ১২টার পর বিশ্বনাথের জিপে আসে।··· তিনি 'শরণ', তিনি 'ধাতক', তিনি মঙ্গলনিধান। 'করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়া কোথা নিয়ে যায় কাহারে'—ইহাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করি। মনজনের মত বিহ্বল হইয়া পড়িলে বেদান্ত তত্ত্ব লেখার কোনও অর্থ হয় না। পরিবেশন বেশ ভয়াবহ হইয়াছে, তবুও তো হজম করিতে হইবে।···

২১শে এপ্রিল

খুব সকালে রেণু আসে। সে ৭॥০টার পর হাসপাতালে যায়।...রক্তমুক্ত, ৩১শে চৈত্র নিবেদন করা হয়, প্রকাশক মধু; আর ওরা বৈশাখ এই ঘটনা। খুব drastic step নেওয়া হইয়াছে। যেন এখনিও আর রাখা চলিবে না। যেজন্যই কি মধুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিবার জন্য এত আকস্মিকভাবে এই ব্যাপার সংগঠন করিল? ধীরেনের মধ্যে তিনিই 'ঘাতক'। মধুকে মোড় ফিরিয়া অনন্ত ভাগবত সম্ভাবনার মধ্যে ঠাঁই করানোই কি এই হত্যার গূঢ় প্রয়োজন?...রেণু প্রুফ দেখে। আমি ২টার পর ব্যাপার লিখি, তখনই যতীনবাবুরা আসেন। এক হাতে লেখা, সঙ্গে চোখের জল। চলিতেই তো হইবে। বীরের মত না থাকিলে এ সংসারে খাড়া চলিবে না। হরিদ্বার যখন যাই নাই, তখন সব ঘটনার মামলা করিতেই হইবে, প্রতি বর্ষের বিশ্লেষণ ও রূপ আবাহন করিতেই হইবে। যীশুখৃষ্টের অপমৃত্যু, সক্রেটিস প্রভৃতির, শ্রীকৃষ্ণেরও তো অপমৃত্যু! সব অপমৃত্যুতেই দুর্গতি হয় না। নীহারের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে।...রেণু এখানেই আফিসের কাজ করে,...

২২শে এপ্রিল

রেণু সকালে আসে। ৮টার পর জয়া আসে, জয়াকে সত্যব্রত হাসপাতালে দিয়া আসে...মধু কি আবার পূর্ব্বেকার ২৫ বৎসরের খাতে ফিরিয়া আসিয়া সেখান হইতে যাত্রা সুরু করিবে? আমি মধুর পিতা ও গুরু। তাহাকে তো বিশ্বের পথ চিনাইয়া দিয়াছি। তাহাকে সঙ্গে লইয়া গয়না, বর্দ্ধমান, কালনা, নবদ্বীপ, শিবোড়পুর, শ্রবণ আইল অমাবস্যের সময় ৮০ মাইল tour করিয়াছি। আজ তাহাই কি আবার সামনে আসিবার জন্য ঠেলা-ঠেলি করিয়া এই কাণ্ড ঘটাইল বট বীজের মত? রেখি পড়িয়া থাকিয়া কি গূঢ় প্রয়োজন ঠাকুরের। রেণু ১০টায় ফিরিয়া আসে। এখনি রাত্রিতে সোয়।

২৩শে এপ্রিল

...রেণু হাসপাতালে গেলে তবে নিত্যব্রত চলিয়া যায়।...রেণু এখানে আসে ৪টার পর। মধুর জ্বর নাই। প্রতিভা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসে। ৯টার পর যায়। চিদানন্দ ৬টায় আসে। রেণু ও সে ব্যাপার মিলায়।...দুপুরে রেণু মধুকে গান গাইয়া শোনায়।...

২৪শে এপ্রিল

রেণু ৮টায় এখান হইতে যায়। আফিসের কিছু কাজ ও খাওয়া সারিয়া ১২টার কিছু পূর্ব্বে মধুর ওখানে যায়। ...মালতী ৩টার পর আসে। রেণু আসে ৪॥০টার পর হাসপাতাল হইতে। তাহারা ব্যাপার মিলায়।... জিতেন ও মন্মথবাবুর সঙ্গে শোকের গূঢ় প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা হয়।...দুপুরে রেণু মধুকে কবিতা পড়িয়া শোনায়—'দুঃখের বেশে এসেছ' ইত্যাদি। মধু বলিয়াছে, আমায় ২৭ বৎসরের সংস্কার তো আর মুছিয়া যায় নাই। পথ যে আরও একটা আছে তাহা জানি। তবে বড় কষ্ট। ৮টার আজ বাসন্তী বাইণ্ডিং হইতে উজ্জ্বলভারত (বৈশাখের) ৫০০ আসে। বাকী ৩০০ কাল আসিবে।.....এত ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়া এই মাসের পত্রিকা বাহির হইল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার খাতা দেখিবার নিমন্ত্রণ আজ আসিয়াছে। কাল সভা হইবে, যোগদান করিতে হইবে।...

২৫শে এপ্রিল

উজ্জ্বলভারত আজ ডাকে দেওয়া হয়। রেণু এখানে স্নান করিয়া যায়, তাহার পূর্ব্বেই চিদানন্দ আসিয়া অনেকটা পত্রিকা বাঁধে। আজই প্রায় সব ডাকে সেট করা হয়। রেণু ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছায়, সেখানে ১টার মধ্যে কাজ করিয়া প্রিসিডেন্সি হইতে চেক আনে, ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়নে দেখা করে। ৩টার পূর্ব্বে ফেরে। নলিনী তাহার পুত্র শঙ্করসহ এখানে সকালে আসে।...দীনেশ রায় ও তাহার স্ত্রী আসে।... চারু মাইতির এক চিঠি আসে যে মাসের মাঝামাঝি সেখানে এক সভায় যোগদান করিবার অনুরোধ জানাইয়া।...সন্ধ্যার আগে রেণু চলিয়া যায়। ৯॥০টার পরে আসে। আজও রাত্রিতে এখানে

শোয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কথা-বার্তা হয়।…

২৬শে এপ্রিল

রেণু সকালে যায়।… ২৯টা কি, পি, করিয়া রেণু ব্যাঙ্কেও যায়। ১২টার পূর্বে ছাদপাতালে যায়।… রেণু ৩টার পর বাথগেট হইতে চেক নিয়া চলিয়া আসে বাসায়, বৈকালে আর আসে না।…৯।৹টার পর আসে। …ধীরেনবাবুর কাছে 'শ্রীনিত্যগোপাল' প্রবন্ধ ভাল লাগিয়াছে।…১৯১৯ হইতে বক্ষের ভিতর দিয়া লড়াই করিতে করিতেই চলিয়া আসিয়াছি। একদিকে mechanical nature, অপর দিকে organic nature। ইহার মধ্য দিয়া আমি চলিয়াছি। চাই আজ organic nature-এর স্পর্শ, প্রাণস্পর্শ। organism গড়িয়া তুলিতে পারিলেই সব দিক বজায় থাকিত। ঘরে বাইরে, আবেষ্টনে, সংসারে সন্ন্যাসে সর্বত্র লড়াই। সমরাগত আমি!

২৭শে এপ্রিল

রেণু এখান হইতে সকালে বাসায় যাইয়া প্রতিভার ওখানে যায়।…সন্ধ্যার একটু পরে সূর্য্য আসে।… সূর্য্যের সঙ্গে ছিল আমার হৃদয়গত যোগ। সে আমাদের জন্য কত কিছু করিয়াছে, জগদীশবাবুর বাসায় আমার যাবতীয় ভার সে লইত। ছেলেদের যখন বরিশালে জলবসন্ত হয় এবং আমি কলিকাতায়, তখন সূর্য্য পাহারা দিয়াছে। সূর্য্যের দান অপরিসীম। বাবার শ্রাদ্ধে সে কাকরঘা গিয়াছিল। তাহার উপর ছিল ভাণ্ডারের ভার।…

২৮শে এপ্রিল

…ধীরেন মজুমদার ও তাহার স্ত্রী আসিয়া খবর দেন যে ব্রজেন চক্রবর্তী মারা গিয়াছেন লো ব্লাডপ্রেসারে, ঠাঁহারে শ্মশানে আনা হইয়াছে। আমি একবার দেখিয়া আসিলাম, মুখে হাত বুলাইয়া আসিলাম। ধীরেন মজুমদার আমার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম পর্যন্ত আসেন।… সকল দুর্যোগকে সুযোগ রাখিয়া যিনি সুযোগে গড়িয়া তুলিতে পারেন, তিনিই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। মানুষ দুর্যোগকেও সুযোগে গড়া চাই। 'A pull from within, a push from without—ইহাই চলিতেছে সৃষ্টির সর্ব স্তরে। ভগবানের টান যায় যায় আসে; সাড়া না দিলে জীবন শুকাইয়া যায়। তখন আর সাড়া আসে না। জগদীশবাবুর রাজযোগের গল্প বলি। সুহৃৎবাবু নীহারের ঘটনার সম্বন্ধে রেণুর চিঠি পাইয়া আপিসে আসেন। দুপুরে সুধাংশু আসে।

২৯শে এপ্রিল

সকালে রেণু এখান হইতে প্রতিভার বাসায় গিয়া বাড়ী ভাড়া ২৮ টাকা ও প্রতিভার রেশন-কার্ড ও টাকা দিয়া আসে রেশন আনিবার জন্য। সেখান হইতে বাসায় যায়। খাওয়ার পর ১২টার এখানে আসে।…রেণু প্রতিভাকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর ঘরের আলমারী ঠিক করে 'ব্রহ্মসূত্র' রাখিবার জন্য। ৩টা পর্যন্ত ওখানে।…সংগঠনের কি রূপ আসিতেছে, তিনি জানেন।…

৩০শে এপ্রিল

সকালে রেণুর সঙ্গে নারী প্রকৃতির passivity ও ও পুরুষের প্রেরণাদাতৃত্বের আলোচনা হয়। নারী যদি প্রেরণা না দিতে পারে, আগ বাড়িয়া কাজ না করিতে পারে, পুরুষের নির্দেশ মানিয়াই শুধু চলে, তাহাতে না হয় পুরুষের সৃষ্টিকারের আনন্দ, না হয় প্রকৃতিরই চরম সার্থকতা।৮ চিন্তানন্দ আসে। তাহার সঙ্গে 'ধর্মন্ কামিনাং নৈব্রহ্মং' ও বর্তমানে স্ত্রী-জিত পুরুষ সম্বন্ধে সে গৃহীই হউক বা সন্ন্যাসীই হউন আলোচনা হয় এবং আমাদের কি বক্তব্য তাহাও বলা হয়। রেণু বিশ্ববিদ্যালয়ে …। ১২টার পর ট্যাক্সীতে ব্রহ্মসূত্র ৪৮৪খানা আসে। বহু বৌ ও প্রতিভা সেগুলিকে ঠাকুর ঘরের ও নম্বরানীর ঘরের আলমারীতে রাখে।…

রেণু সকালে বাসায় যায় এবং 'আনন্দং প্রাপ্তি' প্রবন্ধটা ৩টার সময় শেষ করে। তখন ম্যাট্রিকের খাতা আনিতে বঙ্গবাসী কলেজে যায়।...বৈকালে অরুণ ও যতীন ব্যানার্জি আসে। অরুণের সঙ্গে শোকের প্রয়োজন, ব্যাখ্যা, আমার ব্রহ্মসূত্র প্রকাশে নীহারের দান ও আমার লেখা ভাষ্যগুলি দেখানো ও অন্যান্য আলোচনা ১ ঘণ্টার উপর হয়।...

৩রা মে

সকালে রেণু মন্মথবাবুর বাসায় গিয়া ব্রহ্মসূত্র দিয়া ও ৯৲ টাকা লইয়া বাসায় চলিয়া যায়।...আজ আর রেণু রাত্রিতে এখানে শোয় না।...

৪ঠা মে

সকালে ৮টার পর সূর্যসেন আসে। সে ব্রহ্মসূত্রের দাম ৯৲ টাকা ও হরিদাসের বাবদ ৯৲ টাকা ও হরিদাসের উজ্জলভারতের চাঁদাবাবদ ৪৲ টাকা দিয়া যায়।...রেণুর চিঠি পাইয়া শিশির আসে ২টার পর। যায় ৭টারও পর। সে উজ্জলভারতের ৪৲ টাকা দিয়া যায়। নির্বিশেষ জীবন যাপন না করিলে যে বিশেষের ক্ষেত্রকে গড়িয়া তোলা যায় না, বিশেষ ক্ষেত্রই যে মানুষকে প্রাণ করে, শিশিরকে ইহা আমার বরিশালের সেই রাজা বাহাদুরের হাতেখড়ীতে বক্তৃতা, ৭দিন হরতাল ঘোষণা, চক বাজারের ব্যবসায়ী মহলে প্রতিক্রিয়া, আমার সেখানে দুর্গামোহনবাবু, সুরেশ গুপ্ত ও মুকুন্দ দাসকে নিয়া অশ্বিনীবাবুর কাছে যাওয়ার কথা, স্বাধীনতাকামীদের দ্বারা তখনই ৩দিনের জন্য হরতাল পালন ও ৩ দিনের জন্য পরে বিবেচনার প্রতি-শ্রুতি দানের ইতিহাস বর্ণনা করি।...

৫ই মে

আমি ও রেণু রিক্সায় (শীতলাতলা হইতে) হরিদাস মজুমদারের বাসায় যাই...হরিদাসের সঙ্গে কথা হয়।... হাঁটিয়া আফিসে আসি, তখনই আশ্রমে চলিয়া আসি। শরীরটাকে যেন টানিয়া টানিয়া আনিতে হইতেছে। পা দুইটা যেন ক্লান্ত।...আমি অর্ঘ্য ও প্রতিশ্রুতি সন্ধ্যায় বাহির হই। ১৯ দিন পর আজ সন্ধ্যায় আফিসে গেলাম।...

৭ই মে

...মিঃ চ্যাটার্জী রেণু প্রতিভার লেখা খুব পছন্দ করেন, নারী-প্রগতির জন্মকথা তাহার ভাল লাগিয়াছে। বাঙ্গালা-দেশে মেয়েদের শোচনীয় পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া দুঃখ করেন। মেয়েদের একটা prostitution চলিতেছে। কি উপায়?...বীরেনবাবু আসেন।... সুধাংশু আসে। মোক্ষদা আসে, নীহারের খবর শুনিয়া মর্মাহত হয়।...৫টায় নকুল ঘোষ আসে।...আমি সকালে উজ্জলভারতের গীতা-অংশের প্রুফ দেখি। মানুষ যখন চলিয়া যায়, তখন সে-ই শুধু পুরাতন বাস পরিত্যাগ করে, তাহাই নয়, যে-আবেষ্টন সে ফেলিয়া যায়, সে আবেষ্টনকেও নাড়াচাড়া দিয়া গড়িয়া উঠিবার পথ সুগম করিয়া দিয়া যায়। আমাদের আবেষ্টন যেন নূতন হইয়া গড়িয়া উঠে। রথীন্দ্রের চলিয়া যাওয়ায় বীরেনবাবুর আবেষ্টন নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

৯ই মে

রেণু ৮৷৩০টায় এখান হইতে যায়। আমি বৈশাখ মাসের সাময়িকী 'পাকিস্থান রাষ্ট্রগঠন' লিখি।...মেয়েদের স্বামী থাকা আর না থাকায় কত পার্থক্য!...এত লোভ ও নারী সম্বন্ধে পুরুষ সমাজের উদাসীনতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে আত্মরক্ষা যে একান্তই অসম্ভব।...পায়ের হাঁটুতে ক্লান্তি অনুভব করি।...

১০ই মে

রেণু উজ্জলভারতের প্রুফ দেখে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রাইটার্স বিল্ডিং-এ যায়, অমল হোমের সঙ্গে দেখা করে। এখানে আসে ৩টায়।...স্থির হয় কাল ৯টার পর হইতে রেণু ৫টা পর্যন্ত মন্থর ওখানে (নাদিং হোমে) থাকিবে, সেখানে বসিয়া কাগজ দেখিবে।...মুক্ত জীবন-ধারার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীনিত্যগোপাল অনাদি অনন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সব গড়িয়া। নিত্যগোপাল, সুখে দুঃখে

তুমি আমার, আমি তোমার। রাত্রি ১টার পর আসি। রেণু প্রায় ১০টায় আসে, এখানেই খোয়।...

১১ই মে

রেণু এখান হইতে সকালে যায়, ৯।০ টায় মন্নুর ওখানে নার্সিং হোমে যায়।...পাবনা হইতে মতীন্দ্র অস্ত্র চিঠি লেখে, খোকার...জ্বর...। সকল দিক দিয়া আবেষ্টন যেন বিশ্ব হইয়া উঠিয়াছে।. 'বিপদের ঘটিকা যদি ধ্বংসকর্তা ছির কির করে, সবার প্রতীক্ষায় নয়ন স্থাপন করিয়া রহিব'—তিনি আসিবেন, ইহা বিশ্বাস করি।...

১২ই মে

রেণু সকালেই বাসায় যায়। প্রেস হইতে শেষ কর্মীর অর্ডার নিয়া যায়। ১০টার পর পোষ্টাফিস হইয়া নার্সিং হোমে যায়। কুসুমের চিঠি আসে। খোকার জ্বর ১৭°৩-এ নামিয়াছে। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মেনিনজাইটিস হইয়াছিল। মঙ্গলবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত দিনরাত্র জলের ধারা চলিয়াছে।...৯টায় আশুবাবু (বাসন্তী বাইণ্ডিং) আসেন। বাঁধানো বাবদ যে টাকাটা আমাদের দেয়, সে টাকাটা তিনি নিবেন না এবং এ সম্বন্ধে একটি কথাও না বলিতে অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম, যদি আমি টাকাটা কখনও মেয়ের কাছ হইতে পাই, তবে আপনাকে দিতে হইবে। আপনার যদি অবস্থা স্বচ্ছল হইত, আপনার প্রাপ্যের অবমাননা আমি করিতাম না। তিনি বলিলেন, আপনার প্রচার কার্য্যে টাকাটা লাগাইয়া দিবেন, আমি নিব না। আমি বলিলাম, অন্ততঃ আপনার যদি টাকার এমন ঠেকা হয় যাহা দিতে পারি, তবে চাহিয়া নিবেন।...বাহিরের লোক হইতে রক্ষা করা যায়, কিন্তু মনুর সঙ্গে লড়াই করিয়া মনুকে রক্ষা করা যায় না। সেখানে ছাড়িয়াই দিতে হয়। ৯।০টার পর আমি ও প্রতিভা আসি। রেণু ১০টার পর আসে। ওইতে ১১ টায়ও পর হইয়া যায়। কালও রেণু যাইবে। আজ কথা কাটাকাটি হওয়ার পর রেণু কাল না গেলে মন্নু আরও সেবা পাইবে। হরেন চ্যাটার্জী আসে ৪টার পর। কাল নীহারের ৩০ দিন। বৈকালে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিব। হরেন ও আশুবাবুকে বলি আসিতে।

১৩ই মে

রেণু সকালে বাসায় গিয়া খাইয়া শশীবাবুর ওখানে খাওয়া দিয়া আসে। ১২টার পূর্ব্বে নার্সিং হোমে যায়। বড় বৌ বিশ্বনাথের গাড়ীতে এখানে পৌঁছে ১১টায়ও পর, সঙ্গে কিছু পঙ্কফুল ও রজনীগন্ধা নিয়া আসে। বিশ্বনাথ পদ্ম ও রজনীগন্ধা মন্নুর ওখানে নিয়া গিয়াছিল। প্রতিভা সকালে জয়ার বাসায় গিয়া জয়াকে বৈকালের অনুষ্ঠানে (নীহারের ৩০-শ দিনের অনুষ্ঠান) যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া আসে। জয়া প্রায় ৪টায় আসে। ছয়টার পূর্ব্বে হরেন চ্যাটার্জী আসে। 'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী' গান দিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।.. বড় বৌ ও প্রতিভা ফুলমালা ঠাকুরকে সাজায়। ২টি গানের পর আমার আলোচনা আরম্ভ হয়। আজকেই মন্নু ও নীহারের বিবাহ হয়। নিত্যগোপাল আমার বড়র ঠাকুর। তাঁহার শ্রীচরণেই ইহাদিগকে নিবেদন করিয়াছিলাম। শ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীচরণতলে নীহারের স্থান থাকুক, তাহার পুরুষোত্তম-গতি লাভ হউক। তাহার চলিয়া যাওয়ার ফলে যে বক্সাধারা জাগ্রত হইয়াছে, তাহা দিয়া আমরা আমাদের পরিবার, আমার জীবনকে অধিকতর সুগঠনের ভিতর গড়িয়া তুলিতে পারি—পুরাতন বাস অর্থাৎ আবেষ্টন যেন নূতন দিব্য ভাবে গড়িয়া ওঠে—তবেই হইবে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সার্থকতা। বিশ্বের নরনারী, ধূলিকণার কাছে নীহারের দিব্য জীবন লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।...রেণু আমার বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার কিছু পর-নার্সিং হোম হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছে। ধীরেনবাবু 'নিষ্ক্রৈগুণ্য ভবার্জুন' প্রবন্ধটী ছাপায়, যাহা সে বর্ত্তমানে লিখিয়াছে।... হাতন হইতে আবার ২৯শে মে বক্তৃতার যোগদান করিবার জন্য চিঠি আসিয়াছে।

১৪ই মে

রেণু সকালেই খাতা দেখিবার জন্য চলিয়া যায়, রাত্রি ১০টায় পূর্বে আর আসে না।...১০টায় শিশির আসে। সে ১২টা হইতে ৩টা পর্যন্ত 'উজ্জলভারতে'র কাজ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, আমার কাছে আসিতে চাহিলে ভগবান তোমায় ঠাং ভাঙিয়া দিবেন, না আসাই ভাল। তখন সে একদিন বাইবেলখানি পুকুরে পড়া, বুকে চোট পাইবার কথা বলে। আমার কাছে আসার পথে হয়তো জীবনই যাইত। শরীর-মন আমার 'ব্রত', এই ব্রতভার বুক চিঁড়িয়া যোগের খবর, সামনে নূতন সংগঠনের খবর পাইবার জন্যই আনু-পাতু করিতেছি। শিব সতী-বিরহের মধ্যে যোগস্থ হইয়া নূতন পথ-চলার প্রেরণা লাভ করেন, অর্জুনও বিষাদের ভিতর পুরুষোত্তম-যোগের সন্ধান পাইলেন। সংসারের যাবতীয় বিপদের ঘটনার ভিতরে পুরুষোত্তম-প্রেরণা লাভ করিবার experiment-ই তো করিতেছি। এখানেই তো সংসার-সন্ন্যাসের সমন্বয়। এ দিকটাকে এড়াইয়া তো ভগবান চাই নাই। নীহারের চলিয়া যাওয়ার ভিতর দিয়া কোন্ নূতন প্রেরণা আসিতেছে, তাহারই অপেক্ষায় আছি। এখন পর্যন্ত ব্রতভাবে পরিপাক করিয়া নূতনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাইতেছি না।...সতীশ মুখার্জী রোডে যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা, আমায় এখানে আসিতে ছিলেন। পুরোর জিনপেনলাগীর প্রেমিত ৪৲ টাকায় কেরত রসিদ আসে। সতীন সেনকে দেখা করিবার জন্য পোস্টকার্ড দেওয়া হয়, সে কলিকাতা আসিয়াছে। আমার বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছে মহুর বর্ত্তমানে কি করা উচিত, তাহা লিখিয়া দিবার কথাই সত্যব্রত আজ সকালে বলে। আমিও তো এই public opinion-এর কথাই বলিতেছিলাম। ৯টায় পর আমি ও প্রতিভা আসি।...

১৭ই মে

রেণু ও প্রতিভা সকালেই যায় পত্রিকার ব্যাপার লাগাইবার জন্য...মহুর সিজারে যে মহুর ভাগ্য নির্ধারিত হইবে না, ইহা মহুকে বড় বৌ জানাইয়াছে।...মহুকে কাল একাদশী করাইয়াছে। যে রোগী আজও হাসপাতালে, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া তাহার জন্য এই উপবাসের ব্যবস্থা! যাহা খাইয়াছে তাহাতে পেট ভরে নাই। ৫টায় কিছু পূর্বে আফিসে যাই।...৯টার পর আমি ও প্রতিভা আসি। যাইতেই পত্রিকা প্যাক করা শেষ হয়। ১০টায় রেণু আসে। অমাকে ৫টার পর সত্যব্রত হাসপাতাল হইতে নিয়া আসে। সে আফিসে যায়। সেখানে কিছুটা ব্যাপার লাগায়। ৯টায় বাড়ী যায়।

১৮ই মে

রেণু সকালে যায়, ৮।০টায় পত্রিকা পোস্টে দেওয়া হয়। ৭টা পত্রিকায় টিকিট লাগানো হইয়াছিল না, পোস্টাফিস হইতে পিওন আসিয়া খবর দিয়া যায়। রেণু গিয়া লাগাইয়া দিয়া আসে। সকালে নার্সিং হোম হইতে নীরোদ প্রতিভাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য ফোন করে।... মহু আসিতেছে, তাহাকে দেখা দিতে লজ্জা, সঙ্কোচ, শঙ্কা, বেদনা হইতেছে। আহাকে তো এই আঘাত হইতে আমার বুক দিয়া রক্ষা করিতে পারি নাই। আমার আজ আর আফিসে যাওয়া হয় নাই।...

রেণু সকালেই বাসায় যায়, ৭৷০ টায় সময় আসে। আজ মহু নার্সিং হোম হইতে আসিল ১১৷০টায়।... রেণু ১টায় বাসায় যায় আর আসে রাত্রি ৯টায় পর। আফিসে বগলা গুহ, রাইহরণবাবু আসে।...

২০শে মে

...প্রস্রাব খুব অল্প অল্প হয়। অনেকক্ষণ বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিলে কিছু হয়, সব হয় না। স্পেসিফিক গ্রুবিটি ১৩...খাই।...সন্ধ্যায় প্রস্রাবের উদ্বেগ বাড়ে।

২১শে মে

ক্রমশঃ

সাময়িকী

নূতন আহ্বান ঃ বহুদিন ধরিয়া তৈরী হইয়া শেষ পর্যন্ত কমুনিষ্ট চীন ভারতভূমি কলঙ্কিত করার প্রয়াসকে স্পষ্টতর করিয়া যাহাকে বলে যুদ্ধ তাহারই অবতারণা করিয়াছে। ভারতবর্ষ একটা নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। ভারতবর্ষকে আজ আত্মরক্ষার জন্য ব্যাপক একটা সশস্ত্র আক্রমণ ঠেকাইতে হইবে। এ অবস্থাটা ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারেই নূতন। ইংরেজ-বিতাড়নে শস্ত্র ব্যবহার করিয়া সাময়িক অস্ত্যাগ সে রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাসটা শস্ত্রের নয়। ইংরেজ আমলের পূর্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকা দীর্ঘদিন পর্যন্ত যাহা ছিল তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ অনেক ছিল বটে, কিন্তু আজকের চীন-আক্রমণ যেমন সমগ্র ভারতের বিপদ এবং সমগ্র ভারতকে এক করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে এমন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে এক হইয়া সমগ্র জনসাধারণের সহায়তায় শত্রু বিতাড়নের প্রয়াস করিতে হয় নাই বা করা হয় নাই। ইংরেজ বিতাড়নের সময় আই-এন-এ-র প্রচেষ্টাতে একটা সমগ্র জনসাধারণের প্রতি সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান ছিল, এবং জনসাধারণ তাহাতে সাড়াও কিছু দিয়াছিল—কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতের বুকে বসিয়া বহিঃশত্রু প্রতিরোধের জন্য জাতির নিকট এই যে সশস্ত্র অভিযানের আহ্বান—এ আহ্বান ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন বলিলে ভুল হয় না।

যে ভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইয়াছে তাহাতে অনেক কিছু যোগ্যতা অর্জন করিয়া তাহার পরে স্বাধীনতা পাইতে হইলে জাতির পক্ষে যে কতকগুলি সুবিধা হয়, সে সুবিধা-লাভের সৌভাগ্য তাহার হইয়া উঠে নাই। মহাত্মাজীর আহ্বানে আসমুদ্র হিমাচল সেদিন জাগিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু কর্মকে নিন্দিত করিয়া, জ্ঞানকে কর্মের পারমার্থিক অগৌরব ঘোষিত করিয়া যাহার অভ্যুত্থানায় রচিত হইয়াছিল, যে অভ্যুত্থানায় তাহার দেহের শিরায় শিরায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষকে কর্মবিমুখ, গতিবাধ, আয়াসী, উদ্যমহীন করিয়া তুলিয়াছিল, স্বাধীনতা আন্দোলন সে জগদ্দল পাথরকে একেবারে গলাইতেও পারে নাই, সরাইতেও পারে নাই। তাই রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হইয়াও স্বাধীন জাতির গৌরব লাভ ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। তাই স্বাধীনতার এত বৎসর পরেও আমরা ঠিক সুস্থ ও সবল মানুষ হইতে পারি নাই। তাই আমরা আপিসে দশটায় যাইয়া বারোটার কাজ আরম্ভ করি। সারা দিনে কোন মতে ঘণ্টা দুই তিন কাজ করিয়া বাকি সময়টা অপরের নিন্দায় কিংবা একেবারেই অশোভন অশালীন আলোচনায় কাটাইয়া পাঁচটার পর 'over-time' লইয়া খাতা লিখি, তাই ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ানোটাই আমাদের সকল প্রচেষ্টার অন্তরালের কথাটি হইয়া থাকে; তাই খাদ্যে এমনকি ওষুধে পর্যন্ত ভেজাল এ দেশের ধনী অনেক সহজেই মিশাইয়া চলিতেছে, জাতীয়তা, নিয়মানুবর্তিতা আজও এদেশের এতটুকুও আয়ত্ত হয় নাই বলা চলে। এই জাতীয় ভারতবর্ষের নিকট শত্রু ঠেকাইবার যুদ্ধের আহ্বান যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, সে অবস্থাকে অভিনন্দিত করি।' যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে সে রাজনৈতিক আলোচনা জাতিগঠনের প্রয়াসে অপ্রয়োজনীয় বলা চলে। আমরা ভাবিতেছি—এই নূতন পরিস্থিতিতে জাতিকে সব দিক দিয়া আর কতটুকু যোগ্য, যোগ্যতর করিয়া তোলা যায়, কর্মকে সে কতটুকু বেশী ভালবাসিয়া করে, দেশের একটা অংশ 'মিলিটারী ডিসিপ্লিনে'র মধ্যে কিছুকাল থাকার ফলে দৈনন্দিন জীবনে আরও খানিকটা নিয়মানুবর্তিতা শেখে কিনা, তার বাঁচিয়া থাকার প্রয়াসটা এতদিনের পরাধীনের মুক্তির স্বপ্নে বর্তমানের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বৃদ্ধির বদলে একটা ইহলৌকিক 'সামগ্রিক চেতনা' লাভ হয় কি না—আমরা

তাহাই আনিতেছি। পরলৌকিক মুক্তির বদলে আমরা যে ইহলৌকিক 'সামগ্রিক চেতনা' লাভের কথা বলিলাম, ইহাতে হয়তো অনেকে আৎকাইয়া উঠিয়া বলিবেন—এ কী অভারতীয় কথা হইল! আসলে ইহা অভারতীয় কথা নয়, তথাকথিত অভারতীয় কথা। পারলৌকিক মুক্তির নেশায় ভারতবর্ষ ইহ-জীবনে মানুষ হইবার কথা ভুলিয়াছিল, আজও প্রায় ভুলিয়াই আছে। এতদিন অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ জানিত দেশের রাজ-সিংহাসনে মুসলমানই থাকুক কিংবা ইংরাজই থাকুক, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তুচ্ছ অনিত্য ইহ-জীবনের বাহিরে যে চিরদিনের পরকাল রহিয়াছে, সেখানে মুক্তি পাইলেই পারমার্থিক লাভ হইল, তাহা অপেক্ষা কাম্য আর কিছু নাই। আজ ভারতবর্ষকে ইহ-জীবনে মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিতে হইবে, আমার ইহ জীবনের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধাটুকুই যে সবটুকু জীবন নয়, সে কথা মনে রাখিয়া 'ব্রহ্মত্ব' লাভও করিতে হইবে। সেই জন্যই তাহাকে 'সামগ্রিক চেতনা' লাভের কথা বলা হইল—এই সমগ্রতার মধ্যে সে একই সঙ্গে একই সময় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব, বিশ্বাতীত সত্তায় সত্তাবান থাকিয়াও প্রত্যেকটার অতীত থাকিবে। সেইখানে ভারতবর্ষের সন্ন্যাস। আজিকার আধ্যাত্মিকতা এইখানে—উপনিষদ্ ভাগবত গীতার আধ্যাত্মিকতাও এইখানে—তাই উহা অভারতীয় কথা নহে। সামগ্রিক চেতনা-বোধ আনিতে ভারতবর্ষের নূতন স্থিতি সহায়তা করুক, অভাবগ্রস্ত সমরে-বার্তাবহনকারী [illegible] শ্রীনিত্যগোপালের নিকট ইহাই সভক্তি প্রার্থনা [illegible] নূতন আহ্বানে ভারতের জনসাধারণ সাড়া দিয়াছেন—[illegible] জনসাধারণ ইহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী তৎপর হইবেন—[illegible] আমরা করিব।

কিন্তু আমাদের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা এই যে, এই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া জাতি যেন সবশুদ্ধ আরও কয়েক ভাগ বেশী 'মানুষ' হয়। এখনও মড়ার মত জীবন যাপন করিতেছি, শক্ত ঠেকান প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া গালি উঠিয়া শক্ত ঠেকাইলাম, তাহার পর আবার সেই standardless অলস অনড় জীবনে ফিরিয়া গেলাম—সেই গাল-গল্প, সেই কর্মসূচী, সেই নিরলসতাবর্জিতার অভাব, সেই উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা—এইটি না হয়। আমরা যেন সবশুদ্ধ আরও একটু মানুষ হই—এই প্রার্থনা এবং এই চেষ্টাই সবলে করুন—ইহাই আমাদের আবেদন। ভারতবর্ষ পর রাজ্য আক্রমণ করে নাই, যুদ্ধ যাহাতে না হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও ভারতের নেতৃবৃন্দ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও যখন ঠেকান গেল না, শক্তিমত্তা লোভীর যে আমার করিয়া সব কিছুকে পাইতে চাওয়ার মনোবৃত্তি—অসুরত্ব—চিরদিন ছিল, কম বেশী চিরদিন থাকিবে, সেই অসুরত্বকে দমন করিতে সমগ্র দেশবাসী এক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইল, আজিও যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কাছে বসে প্রাপ্ত হউক, আজিকার দিনে এই প্রার্থনা জানাই। শত্রুকে কেবল অস্ত্র-শক্তিদ্বারা পরাজিত করা যাইবে না, সর্ব বিষয়ে—নিজেদের চরিত্রে স্বভাবে, কর্মে, জ্ঞানে, প্রেমে—বড় হইতে হইবে, ইহাও স্মরণ রাখিতে জাতিকে বার বার বলি। যে একতা ও সর্বতোভাবে বোধের অভাব বা একটা একাংশকে নিজের বলিয়া বুঝিয়া লইয়া তাহারই ভাল মন্দের মাপকাঠিতে সমগ্র ভারতীয়কে বিচার গত কিছু দিন হইল ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে, বর্তমান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া সে অবস্থা হইতে আমরা যেন মুক্তি পাই। তাই এই নূতন আহ্বানকে অভিনন্দিত করি।

শ্রীহরি মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
শ্রী প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

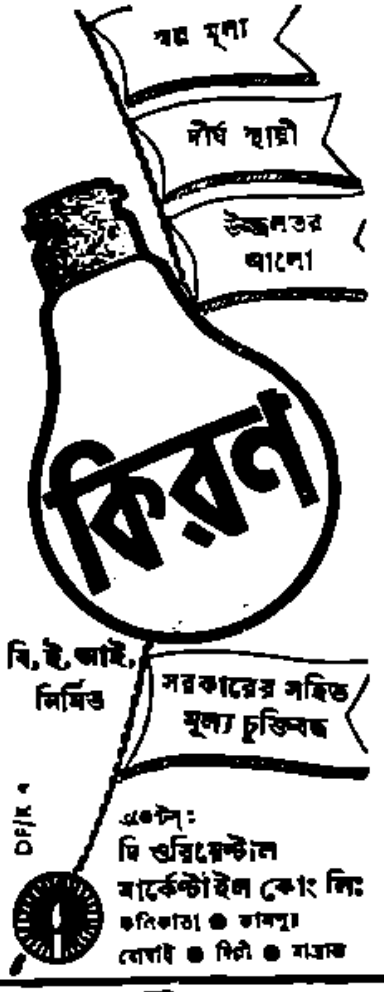

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না;
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ • কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

UNIVERSITY CALCUTTA GENERAL LIBRARY

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীনিত্যগোপাল—

[illegible] সংখ্যা ১৮৮৫, ১৩৬৯ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম, এ পঞ্চদশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র-ধর্ম্মের ভেদের কাঁটলে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটি স্বয়ংমূল্য আস্বাদন—ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম আস্বাদন করায় জীবনের অতিস (transcendental) দিক, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (immanent) দিক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুইই। তাইতো তিনি জীবন-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম্ম বা একান্ত রাষ্ট্র অচল। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ' (ভোজপতি কংসের মৃত্যু) বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্ম্মপতিরূপে 'তদ্ধং পরং যোগিনাম্' (যোগিগণের পরতত্ত্ব কৈবল্য)।

শ্রীপুরুষোত্তমপ্রবন্ধ

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks
কর্মযোগী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	আচার্য জগদীশ
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ
বাংলার বিদুষী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া

শ্রীশীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ॥ গড়িয়াহাট মার্কেট ॥

সূচীপত্র : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯, ১৮-৮-৪

১।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত অধ্যাপক ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২১
	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত শ্রীরেণু মিত্র	৩২৬
	শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ জন্মদিনে (কবিতা) বিষ্ণুপদ রায়	৩৩০
	স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ স্মরণে (কবিতা) শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ	৩৩৪
৫।	স্বামীজী স্মরণে—শ্রীসনাতন মণ্ডল	৩৩৬
৬।	স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীর স্মরণে জিতেন গাঙ্গুলী	৩৩৮
	প্রভুপাদ পুরুষোত্তমানন্দজীর স্মৃতি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি (কবিতা) রমণীমোহন সরকার	৩৩৯
৮।	প্রার্থনাকালীন ভাষণ (১৬) শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৩৩৭
৯।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (২২) ১৯৫৮	৩৪৫
১০।	পুস্তক পরিচয়	৩৪৬
১১।	সাময়িকী : শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অন্তর্ধান অরুণকুমারী গাঙ্গুলী	৩৪৯

বিজ্ঞপ্তি

আগামী পৌষ মাসে 'উজ্জলভারত' পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষ শেষ হইবে। যাঁহারা এখনও চাঁদা মনে করিয়া পাঠান নাই, অথচ যাঁহারা নিশ্চয়ই চাঁদা দিবেন জানি, তাঁহাদিগের নিকট এই অনুরোধ যে তাঁহারা দয়া করিয়া বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা অনতিবিলম্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

কার্য্যাধ্যক্ষ
নিবেদক
উজ্জলভারত
C/o নরনারায়ণ আশ্রম
পোঃ : অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

উদ্বোধন

অগ্রহায়ণ, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ জয়ন্তী

॥ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(১৯৬২ সালের ১৮ই নভেম্বর রবিবার নরনারায়ণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত)

ওঁ আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ পুরুষোত্তমানন্দৌ॥

পূজনীয়া মাতৃমণ্ডলী ও সমবেত সজ্জনবৃন্দ,

নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের শুভ আবির্ভাবে তিথি স্মরণ করে আমরা এই পবিত্র আশ্রম প্রাঙ্গণে মিলিত হয়েছি। গত বৎসর এমনি এক শুভদিনেও আমরা এখানে এসেছিলাম। গত বৎসর যাঁদের দেখেছিলাম তাঁদের অনেককেই আজও দেখছি। আপনারা অনেকেই স্বামীজীকে দেখেছেন, তাঁর প্রাণস্পর্শী ভাষণ শুনেছেন, উদ্বোধনে তাঁর লেখাও পড়েছেন। আপনাদের থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই আজ আমার মনে পড়ছে। স্বামীজী মানুষকে কত ভালবাসতেন আমি তা মর্মে মর্মে জানি। তাঁর সমাধি প্রাঙ্গণে আপনাদের দেখে, আমাদের অগোচরে স্বামীজী যে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি পাচ্ছেন, আজি তা অনুভব করছি। তাঁর আনন্দের কথা স্মরণ করে আশ্রমের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই আর তাঁকে বারবার প্রণাম করি।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, কত মহাপুরুষের আবির্ভাব এখানে ঘটেছে, এই বিচিত্র জগৎ ও জীব সম্বন্ধে কত রহস্যময় কথা তাঁরা বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শ্রীমৎ-পুরুষোত্তমানন্দ আমাদের জন্য কি-প্রয়োজন রেখে গেছেন আজ তাঁর এই ৮০তম জন্ম-বাসরে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটু আলোচনা করবার চেষ্টা করছি।

স্বামীজীর কথা বলতে গিয়ে আমার কেবলি মনে পড়ছে প্রথম যেদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল রাসবিহারী এভিনিউএর বাটীতে। সে আজ ১৩।১৪ বছর আগের কথা। সুখে দুখে, সম্পদে বিপদে অনেক মানুষের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে—কোন কথা মনে আছে, অনেক কিছুই বিস্মৃতির অতল জলে ডুবেছে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে যে স্বামীজীর সঙ্গে কস্মিন কালে আমার কোন পরিচয় ছিল না, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে একেবারে আপন জন করে নিলেন। কোন পারিবারিক দুর্দিনকে আমি তখন ছিন্ন ভিন্ন। তাঁর স্নেহে এসে শোকের তীব্র জ্বালা ভুলে গেলাম। তারপর প্রায় ১৩।১৪ বছর কেটে গেল, তাঁর সঙ্গে আমার কতবার দেখা হয়েছে, কত কথা হয়েছে দিনে রাতে, তিনি বেরুবার চাকুরিয়ার বাটীতে রাত্রিতেও ছিলেন, কিন্তু ঐ প্রথম দিনের কথা যখন মনে আসে তখন এক অপূর্ব প্রশান্তিতে দেহ মন ভরে যায়। দীর্ঘ কাল তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সুদীর্ঘকাল তাঁর মুখে তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি কিন্তু সে আদর, সে স্নেহ, সে ভালবাসা আর কোথাও পেলাম না। মহন্ত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে

মানুষ যদি এমনি করে মানুষকে ভালবাসতে পারে। এই ভালবাসা প্রাণের কথা, হৃদয়ের কথা! বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে না। বুদ্ধি কেবল বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, ঘুরে ফেরে দেয়। প্রাণের স্পর্শেই মানুষ মানুষের কাছে আসে। স্বামীজীর জীবন-দর্শনে তাই প্রাণবাদ একটী প্রধান কথা।

পুরুষোত্তমানন্দজীর কর্মবহুল জীবন বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। জীবনে তিনি কত কাজ করেছেন, কত সঙ্ঘ-সমিতি গড়েছেন, কত বক্তৃতা দিয়েছেন, কত লেখা লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমি তাঁকে কখন জামা গায়ে দিতে দেখিনি। তিনি নগ্নপদেই চলাফেরা করছেন। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী কিন্তু ভগবানলাভের জন্য হিমালয়ের গুহায় বসে কখন ধ্যানমগ্ন হন নি। ভগবানকে পাওয়ার জন্য তাঁর কোন আলাদা সাধনা ছিল না। মানুষ কি করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা পারস্পরিক প্রীতি এবং একটা উচ্চ আদর্শের মধ্যে বাস করবে, সেই কথাটা মানুষকে বলবার জন্য অত্যন্ত লিপ্ত হয়েই তিনি সমাজের মধ্যে, মানুষের মধ্যেই ছিলেন। উপনিষদের ভাষায় তিনি লিখছেন—নির্লিপ্তের লিপ্ততাই সৃষ্টির গোড়ায় বর্তমান। 'আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পরি বাঁধা সবার কাছে' আজন্ম সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দের জীবন যাপনের মূলে ছিল এই নির্লিপ্তের লিপ্ততা। এই মূল প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের কাছে। এই চিন্তা-ধারা ভারতে সুপ্রচলিত ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা চিন্তাধারা থেকে পৃথক এবং পৃথক বলেই শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের কথা আজও মানুষের কাছে প্রায় অপরিচিত হয়েই আছে।

সাহিত্যের ছাত্র হলেও ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম শাস্ত্রের প্রতি ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দুঃখভারে পীড়িত হয়ে যখন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনলাম গীতাপাঠে শান্তি আসে, তখন থেকে শ্রীগীতা আমার মাথার মণি। এমনি যখন আমার মনের অবস্থা তখন আমি স্বামীজীর সংস্পর্শে এলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামীজীর কাছে গীতার ব্যাখ্যা শুনতাম। কিন্তু গীতার যে অর্থ আমি মনে মনে ধারণা করতাম, আর স্বামীজী যা বলতেন, অনেক জায়গায় তা মেলে না। প্রথম প্রথম তাঁর কথা আমি বুঝতে পারতাম না, এখনও যে সব বুঝেছি তাও নয়, তবে তাঁর ভাবসম্পদের একটা মোটা-মুটি ধারণা আমার হয়েছে, তারই কিছু আভাষ আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

নরনারায়ণ আশ্রমের লাঞ্ছন-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধনের প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত আছে, সেই পতাকাতেই স্বামীজীর জীবন দর্শনের মূলীভূত কথা পাওয়া যায়। পতাকার গৈরিক বর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বা সন্ন্যাসের দ্যোতক, আর লাঞ্ছন মাটির বুকে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীক। লাঞ্ছন-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা ব্রহ্মজ্ঞানকে পায়ের তলে ধরার ধূলিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্কল্পকে বহন করছে। সংকল্প বাক্যে স্বামীজী লিখছেন—'পুরুষ-প্রধান ভারতীয় ঋষি সত্যতার সৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কাম-প্রধান সভ্যতা চকল বাহিরে মনুষ্যত্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। ঋষি সভ্যতার সৃষ্টি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি—কোন একটিই একান্ত সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি সৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি-পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোঠে মাঠে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখাল-রাজমূর্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্য্যান্বিতরূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়েই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া (গীতাশাস্ত্রের মাধ্যমে) বিশ্বজনের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষীরাজা জনক'।

স্বামীজীর প্রচারিত তত্ত্বকে সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যেতে পারে—জড়াদ্বয় সমন্বয়ের সৃষ্টি বা হৃদয়ধর্মী সামগ্রিক জীবনবাদ। মানবজীবন একটা সমগ্র বস্তু। ধর্মনীতি, অর্থনীতি-রাজনীতি সমাজনীতি-সংসার-সন্ন্যাস এদের

মধ্যে কোন কোঠাভাগ নেই, তারা water tight-compartment নয়। গোটামানুষকে এমন টুকরো টুকরো করা যায় না। কিন্তু মানুষ আমরা আজ কত রকমের—কেউ বা বৈদান্তিক, কেউ বা রাজনীতিজ্ঞ, কেউ ধার্মনিক, কেউ কবি, কেউ দার্শনিক, কেউ জ্ঞানী, কেউ ভক্ত—কেবল নই শুধু মানুষ। মানুষকে বাদ দিলে সব ফাঁকি; তখন ধর্মও বিলাসিতা, রাজনীতিও বিলাসিতা, বিজ্ঞানও বিলাসিতা। একের পর যত শূন্য দাও, একের মূল্য দশগুণ করে বেড়ে যায়; এক মুছে দাও, শূন্যগুলি কেবল ফাঁকি। মানুষ হওয়াই সেই একবস্তু। ভারতের সাধনা সর্বাগ্রে মানুষ হওয়া, তারপর আর যা কিছু। মানুষ হয়ে আর যা কিছু হয় তা সবই তাঁহার অনুচর, আর মানুষ না হয়ে কবিত্ব, দার্শনিকতা, বৈজ্ঞানিকত্ব সবই অহঙ্কার।

ভারতের ধর্ম তার সাধককে অভীমন্ত্র শিক্ষা দেয়—কারণ সে অভয়ার সন্তান। যে ধর্ম মানুষকে নির্ভীক করে না, সে হীন ধর্ম ভারতের নয়। ধর্মের বিলাসিতা আমাদের গ্রাস করেছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বামীজী লিখছেন—'যেদিন খোল করতাল হরিনাম seditious বলে ইংরেজ ঘোষণা করবে সেদিন বুঝব অভয়ার সন্তান জেগেছে। ৬০ লক্ষ সন্ন্যাসী বৈরাগী থাকতেও যে দেশ ইংরেজের নিত্য পদাঘাত চোখের উপর দেখছে, তাদের কি একটা ধর্ম? তা নিষ্ফল ক্লীবত্ব! যে ধর্মের সামান্য অনুষ্ঠান করলে ভয় তো দূরের কথা মহাভয় থেকেও মুক্ত হয়—তারা কি না আজ অবিদ্যা-সাধক ইংরেজের পদপিষ্ট। যে মন্ত্রে একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্লীবত্বের মহাপঙ্ক থেকে টেনে তুলেছিলেন, ভারতকে আজ সেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে।

"অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ মায়া ছাড়িয়ে ব্রহ্মের অতি মূলা দিয়ে সংসারকে হেয় জ্ঞান করেছে—তাই তার কাছে ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা, মায়াময়। পাঠান মোগল ইংরেজের লাথি ঝাঁটা খেয়েও আমরা পরপারের মুক্তির জন্য ছুটেছি। ব্রহ্ম ও মায়া, সংসার ও সন্ন্যাস, বেদান্ত ও রাজনীতি—এরা নাকি একসঙ্গে থাকতে পারে না। আলো-আঁধারের মত এরা নাকি পরস্পর বিরুদ্ধ, বিপরীত। শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের বিশ্বাস অথচ তাঁর সৃষ্ট জগতে অবিশ্বাস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যখন প্রাণ্য রাজ্য জয় করে কি লাভ বলে অস্ত্র ত্যাগ করলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রিয়তম শিষ্যকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—ক্লীবের মত এসব কথা আর বোলো না—তুচ্ছ রাজ্য সম্বন্ধে—ওঠ, দৃঢ়সঙ্কল্প কর, যুদ্ধে তুমিই জয়ী হবে—যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ। ব্রহ্ম-মায়া, স্থিতি-গতি, সন্ন্যাস-সংসার—যত সব পরস্পর বিরুদ্ধ বিপরীতের সমন্বয়-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই আমাদের ভগবান, পরমদেবতা। মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী। শ্রীকৃষ্ণই জড়জগতের বুকে আদর্শ মানবের একটি পরিপূর্ণ ছবি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান,—তিনিই আবার রাজনীতিবিদ্, কংস-জরাসন্ধ-শিশুপাল-হন্তা, গীতা-বক্তা, আরও কত কি। প্রচলিত সব মতধারাধারাই তাঁর জীবন ও ধর্মের ব্যাখ্যাত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব-রসময়-মূর্তি। শ্রীকৃষ্ণ কেমন? যার কাছে যেমন।

মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভৃতাং শাস্তা
স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতেঃ বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।

যোদ্ধাদের দৃষ্টিকোণে শ্রীকৃষ্ণ, বজ্রের মত কঠিন, মল্লসমাজে তিনি নরশ্রেষ্ঠ, নারীদের কাছে মূর্তিমান মদন, গোপসমাজের তিনি একান্ত আপন জন, শ্রীকৃষ্ণ অসৎ রাজন্যবর্গের ভয়দাতা, দেবকী-বসুদেবের কাছে তিনি শিশু, [illegible]য় নৃপংস কংসের তিনি যম, অবিদ্বানদের দৃষ্টিতে তিনিই বিরাটরূপে বিরাজমান, যোগীগণের পরতত্ত্ব বৈকুণ্ঠও তিনি, তিনিই আবার বৃষ্ণিকুলের পরমদেবতা। পরস্পর বিরুদ্ধ সর্বপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আখ্যায়িত হবার উপযোগী এমন একখানি সমগ্র জীবন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসরাজসভায় দাঁড়িয়েছিলেন। যিনি কংসের মৃত্যু বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্মপতিরূপে যোগিগণের পরতত্ত্ব বৈকুণ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে রাষ্ট্র ও ধর্মের কোন পার্থক্য ছিল না। ধর্ম ও রাষ্ট্র একই অখণ্ড জীবনের দুইটি

স্বাংমূল্য আস্বাদন। ধর্ম আস্বাদন করার জীবনের আদর্শের দিক, রাষ্ট্র আস্বাদন করার বাস্তব জীবনের দিক। দুইএরই সমান প্রয়োজন। এই আদর্শকে বর্জনে সাহিত্যে জীবনে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই স্বামীজীর 'উদ্বোধন ভারত' পত্রিকা। সর্বোপাধিমুক্ত এই জীবনের ভিত্তি প্রেম। এই জীবন ও প্রেমকে ধারণা করা সহজ নয়। তাই পুরুষোত্তমানন্দ যখন কৃষ্ণ কথা বলেন আমাদের শুনতে বেশ ভাল লাগে কিন্তু বুঝতে পারি না। পুরুষোত্তমানন্দ এই জীবনের অধিকারী ছিলেন এবং এই জীবনদর্শনের কথাই বলে গেছেন।

পুরুষোত্তমানন্দ সন্ন্যাসী হয়েও রাজনীতিবিদ্, সমাজ-সংস্কারক, প্রধান জননেতাকে তাঁর জীবনেও ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না। যখন স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়েছে, স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করবার জন্য যুবক দেশ মেতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রচণ্ড ঘাঁটি অশ্বিনী কুমারের বরিশাল। বক্তার মঞ্চে উঠে একদিন বললেন স্বামীজী—বল নাই, ভয় পালাবে। এই সব কালেক্টারী আপিস আদালত জেলখানা স্বাধীন জাতিকে ভয় দেখাবার কৌশল—অভ্যাস সন্তানেরা তা মানে না—সব ধ্বংস কর। পরদিন শরৎ ঘোষ ধৃত হলেন, জেলে গেলেন। বরিশালের হাট বাজার বন্ধ হ'ল, ধাঙড় মেথর আবর্জনা ময়লা সাফ বন্ধ করল। সমস্ত প্রধানী বেষ্টিত ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রাস্তায় বেরিয়েছে—সব ধ্বংসের করবার জন্য। বেলা তখন ৯টা। কালেক্টারী অফিসের কেরাণী তখনও সমাধার আর জন রবের জেলাই ছিলে আপিস যাচ্ছে। বরিশালের এক জন প্রতিষ্ঠিত তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। আপিসযাত্রী তাঁকে কেরাণীদের দেখিয়ে তারা বললে—সাহেব, এদের দিয়ে ময়লা সাফ করাও, আজও এদের ঘুম ভাঙে নি। তখনকার বরিশালে এমনি ছিল সন্ন্যাসী-রাজনীতিবিদ্ শরৎ ঘোষের প্রভাব। এ কাহিনী আমি সেদিন শুনলাম শ্রীসমাদ্দারের মুখে। তৎকালীন বরিশালের জেলা চিকিৎসক শ্রীতারিণী গুপ্ত বললেন—শরৎ ঘোষ সন্ন্যাসী না বিপ্লবী—আমি বুঝতে পারি না।

বিপ্লবধর্মী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবন ছিল স্বামীজীর আদর্শ। বিপ্লবাত্মক এই সামগ্রিক জীবনবাদের কথা পুরুষোত্তমানন্দ আমাদের জন্য দিয়ে রেখে গেছেন তাঁর উপনিষদ্-ব্রহ্মসূত্র-গীতার অনুভূত-ভাষ্যে। তিনি বুঝেছিলেন কোন নূতন চিন্তাধারা ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর হৃদয়গত করতে হলে প্রস্থানত্রয়ের মাধ্যমেই বলতে হবে, নইলে ভারতবাসীর কাছে তা গ্রাহ্য হবে না, কারণ শাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা ও আচরণ করা তাঁর যুগান্তরবাদী মূল-মূল সংস্কার।

ভারতবর্ষ জোর দিয়েছে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের দিকে, অন্যান্যরা জোর দিয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের দিকে। উভয়েই সমগ্রসত্যকে অস্বীকার করেছে। বিপরীতের, বিরুদ্ধের সহাবস্থান কেউই স্বীকার করে না, কারণ ব্রহ্মমায়া, পুরুষ-প্রকৃতি, সন্ন্যাস-সংসার আলো-আঁধারের মত পরস্পর বিরুদ্ধ, একসঙ্গে থাকতে পারে না। জগতের যত কিছু অসঙ্গতি অসঙ্গল সব এই সমগ্রসত্যকে অস্বীকারের জন্য। পরস্পর বিপরীত মিলিয়াই জগতের সৃষ্টি। তাদের মধ্যে প্রভেদ আছে অথচ এই দুই মিলিয়াই সমগ্র সত্য। বিপরীতকে অস্বীকার করে পরিপাক করা যায় না। বিরুদ্ধকে পরিপাক করবার পথ প্রাণের প্রীতির মধ্যে তাদের স্বীকার করে তাদের যথাস্থান যথামান নির্দেশ করা।

যে জীবন-দর্শনের কথা পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর শ্রীগুরু কৃপার চোখের জলে সারা জীবন বলে বেড়িয়েছেন—সে কথাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাতেও রেখাপাত করেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত পরস্পর একান্ত বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনটাই বাদ দিলে চলবে না, আবার তাদের বিরুদ্ধ রূপে থাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড, এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে।

পরস্পর বিরুদ্ধকে মেলাতে না পারলে জগতের শান্তি হবে না—একথা গীতার শেষ শ্লোকে সঞ্জয়ের মুখেও

শুনেছি। ব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জয় স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতা শুনেছিলেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে গীতা শোনাবার সময় সঞ্জয় বললেন সেই অদ্ভুত কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ শুনে এখনও আমার দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

সঞ্জয় বললেন—আমার নিশ্চিত অভিমত এই যে—জগতের মঙ্গল সম্পদ শান্তি তখনই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন যোগেশ্বর ও ধনুর্দ্ধরের মিলন হয়।

এই শ্লোকের উপর ডঃ রাধাকৃষ্ণান টীকনী করছেন—When Plato prophesied that there would be no good government in the world until philosophers become Kings, he meant that human perfection was a sort of marriage between high thought and just action. This according to the Geeta, must be, for ever, the aim of manu.

আমরা ক্ষুদ্র জীব, সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। স্বার্থের বশে আমরা পরস্পরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। অথচ এই মানুষের মধ্যেই রয়েছে একটি ব্রহ্ম-মানুষ, যার সাথে অপরের কোন বিরোধ নেই। পুরুষোত্তমানন্দজী এ সত্য সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতেন বলেই সব মানুষকে বুকে তুলে নিয়ে তাদেরকে ব্রহ্ম-মানুষ করবার চেষ্টা করতেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এইজন্যই তিনি মানুষকে এত ভালবাসতেন। এই ছিল তাঁর সারাজীবনের ইতিহাস। আজ তিনি দেহগতভাবে আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এই মানুষ হবার আহ্বান চিরদিনের মানুষের কাছে অম্লান থাকবে উজ্জলভাবে প্রকাশিত তাঁর অগণিত প্রবন্ধে, উপনিষদ্-ব্রহ্মসূত্রে-গীতার ব্যাখ্যায়। তাঁর জন্মদিনে আপনারা এসেছেন, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা তাঁর লেখাগুলি পড়ুন।

আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্যের উপসংহার করছি। স্বামীজীর বাণী ও সাধনা রূপ লাভ করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমে ও উজ্জলভারত পত্রিকায়। বাগুইআটি পল্লীতে আসার পর ক্রমে ক্রমে এখানে স্থাপিত হয়েছে পাঠাগার, বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র, মহিলা শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়। স্বামীজীর লেখা বইগুলিও ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। নানা দুর্যোগ বিপর্যয়ের মধ্যেও সকল দিকেই আশ্রমের অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। এতগুলি ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের সকল দায়িত্ব আশ্রমের কর্মসচিব শ্রীমতী রেণু মিত্র নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। সত্য বটে কর্মের মূলে সৎ প্রেরণা ও নিষ্ঠা থাকলে কোন কিছুই অসাধ্য হয় না, তবুও আপনাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনারা সম্মিলিতভাবে আশ্রমের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতিতে শ্রীমতী রেণুকে সক্রিয় সহযোগিতা করুন। দুর্বল শরীর নিয়ে আশ্রম-কর্মের প্রতি তাঁর এই নিষ্ঠা আমাকে বিস্মিত করেছে। বাগুইআটিস্থিত এই আশ্রম আমাদের সকলের, এই আশ্রমের গুরুদায়িত্ব পালন স্বামীজী শুধু একা রেণুর উপর নয়, আমাদের সকলের উপরও ন্যস্ত করে গেছেন। আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টায় স্বামীজীর আদর্শ সফল হোক—ইহাই আমার একান্ত কামনা। সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় আমি সশ্রদ্ধ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে প্রণতি জানাই।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

(নরনারায়ণ আশ্রমে অশীতিতম জন্ম-সভায় পঠিত)

ওঁ নমো ভগবতে ব্রহ্ম-ভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায় ॥

ওঁ আজানুলম্বিতভুজং কমলায়তাক্ষম্ সঙ্কীর্তনৈক পিতরৌ কলিমার্দয়ন্তম্। শ্রীচৈতন্যপ্রেমঘন নরনারায়ণদেবীম্ বন্দে সদ্গুরুবরং পুরুষোত্তমানন্দম্ ॥

পূজনীয়গণ এবং বন্ধুগণ,

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের হয়ে, নর-নারায়ণ আশ্রমের হয়ে এবং আমার নিজের দিক থেকে আপনাদের আমি সাদর সম্ভাষণ জানাই। আপনারা যাঁরা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা জানেন মানুষকে তিনি কত ভালবাসতেন। তাই তাঁকে স্মরণ করে আপনারা যে আজ তাঁর সমাধিস্থানে সমবেত হয়েছেন, এতে তাঁর যে কত আনন্দ হচ্ছে, সে কথা কোন্ ভাষায় আপনাদের জানাব? তাঁর আনন্দ আপনারা গ্রহণ করুন। বছর পাঁচেক আগে পরম মঙ্গল ভাগবত-কথা কইতে কইতে একদিন তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন, আর বাস্তব জীবনে ফিরে আসেন নি। পুরুষোত্তম-জীবনকথা বলাই তাঁর জীবনের একমাত্র প্রয়োজন ছিল, তাই আজ, তাঁর এই আশীতিতম জন্ম উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করে যখন আপনারা এসেছেন, তখন সবাই মিলে আমরা তাঁর প্রাণ প্রিয়তম পুরুষোত্তম-কথা একটু বলি, তাঁর আনন্দ আমাদের উপর ঝরে পড়ুক।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তমানন্দ পেয়েছিলেন তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল (যোগাচার্য শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ অবধূত) দেবের মধ্য দিয়ে। নিত্যগোপালের স্পর্শ লাভের পর থেকেই একটা প্রবল প্রাণ-সমুদ্র তাঁর মধ্যে গর্জন করে উঠল। সে প্রাণ কি বস্তু? যে প্রাণ নিয়ে পরস্পরবিরুদ্ধধর্মাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করে এই মাটির বুকেই হৈল ব্রহ্ম সমন্বয়কে সার্থক করে গেলেন, যে প্রাণ বর্তমান জটিল জীবনের সমাধানমূর্তি হিসাবে শ্রীনিত্যগোপালের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে একজন নির্বিকল্প সমাধিস্থ পুরুষ হয়েও ঘোষণা করল 'আমি বিশ্ব-নাগরিক', কিংবা 'এই বিশ্বই আমার মহাশ্রম', কিংবা 'নিত্য অনিত্য সমন্বয় বা আত্মা অনাত্মা সমন্বয়। জ্ঞান অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। সাকার আকার নিরাকার সমন্বয়। জড় অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়', সেই প্রাণ শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে আধান করলেন। আর পাক নিই লাখুক কুনো তথা-কথিত ভাল মানুষ শরৎকুমার ঘোষ ক্রমে একজন নূতন মানুষে, একজন বিপ্লবী মানুষে পরিণত হলেন; ধর্মে, পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে—জীবনের সব জায়গাতেই এক নূতন সামগ্রিক বিপ্লবের কথা, নূতন সংগঠনের কথা বলতে থাকলেন। ১৯১৯ থেকে তাঁর এই নূতন রূপ স্পষ্টতর গতিতে প্রবাহিত হল—শরৎকুমার ঘোষ ইডুদ মাষ্টারী ছেড়ে দিলেন। তাঁর বুকের মধ্যে যে প্রাণ গর্জন করে উঠেছিল তারই মোরাঘে পাঁচ মনের একটি পরিবারকে মাথায় করেই শরৎ ঘোষ চাকরী ছেড়ে পথে দাঁড়ালেন। সেই থেকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চের জ্ঞান হারাবার মুহূর্তটি পর্যন্ত পুরুষোত্তমানন্দের কি কাজ ছিল? ঐ কৃষ্ণ-কথা কওয়া। যে কৃষ্ণকে দীর্ঘ বহু হাজার বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষ জেনে আসছিল, সে আমা-

শোনা মন্ত্রিয়ে আটকানো কৃষ্ণ-কথা তিনি বলে নি। যে-কৃষ্ণ দুর্বোধ্য জটিল চিরবহস্তময় জীবনের কথা বলে দুর্বোধ্য জটিল, যে-কৃষ্ণ ব্রজবালকদের কাঁধে নিয়েও এবং ব্রজ-গোপীদের সঙ্গে রাস করেও এবং কুরুক্ষেত্র মহাসমরের একজন রাজনৈতিক নায়ক হয়েও ব্রহ্ম, যে-কৃষ্ণ অখিলাত্মার আত্মা হয়েও পরস্পরবিরুদ্ধ বহু ক্ষেত্রে বিচরণ করে সর্বাত্মক সর্বদৃতময় জীবন-চেতনা রেখে গেছেন বিশ্বের বুকে, সেই জটিল কৃষ্ণের জীবনকে বর্তমানের জটিল কুটিল বহু সমস্যা—পরস্পরবিরোধী বহু সমস্যা-পীড়িত বিশ্ব-সভ্যতার সামনে উপস্থিত করার কথাই সারা জীবন ধরে পুরুষোত্তমানন্দ বলে গেছেন। কৃষ্ণকে যুদ্ধের দামামাগোলের মধ্যে গীতা শোনাতে হয়েছিল এবং ঐ আবেষ্টনের মধ্যেও কি করে পরা শান্তি ও পরম আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়, তারই কথা বলতে হয়েছিল। আমাদেরও আজকের জটিল জীবন-সংগ্রামের কলরবের মধ্যে এর সমাধান করে কি করে এর অতীত হওয়া যায়, ভাগবত জীবনের অধিকারী হওয়া যায়, তারই কথা শোনা প্রয়োজন—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ এমনই কৃষ্ণকে আমাদের জটিল জীবনের এমনিই সমাধানরূপে উপস্থিত করে গেছেন। ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে আজ পরিবার সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বজনীন জীবন কি করে যাপন করা সেইটে সমস্যা—শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক জীবনকে উপস্থিত করে পুরুষোত্তমানন্দ সেই সমস্যার সমাধান করেছেন। ব্যক্তি থেকেও কি করে আমরা সমাজ হতে পারি, সংসার থেকেও কি করে এর অতীত থাকা যায়, তার দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করবার অবকাশ এখানে নেই—এইটুকু শুধু বলি যে অংশে পূর্ণতা দর্শন আর কৃষ্ণকে অবতারের ঘনানন্দ জেনে উভয়ের সমন্বয় দর্শনই এর মূলে। অংশে পূর্ণত্বদর্শনের সূত্র শ্রীনিত্যা-দিয়েছেন তাঁর 'অন্ন অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ' ইত্যাদি সূত্রে। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত যে-সমস্ত ধারণাগুলোকে আমরা বিরুদ্ধ বলে-জেনে তাদের সহাবস্থান একান্ত অসম্ভব বলে মনে করে আসছিলাম, আজকের যুগচেতনায়, আজকের আবেষ্টনে, আজকের বিজ্ঞানে দেখি সেগুলি একত্র থাকতে পারছে, থাকা উচিত; আর পুরুষোত্তমানন্দের কৃষ্ণ-জীবনের আলোতে দেখি সে সবই পরিপূর্ণ অর্থ বহন করে সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পুরুষোত্তমানন্দের এই বিরুদ্ধধর্মী সমন্বয়ের কথা বোঝা মানুষের পক্ষে খুব সহজ হয় নি, যে জন্য হাজার হাজার লোক নিষ্কর্ম মৌনতায় তাঁর ভাষণ শুনেছে, বিস্মিত হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু কিছুই ধরে রাখতে পারে নি—কেননা অভ্যস্ত চিন্তাধারায় তা বিপরীত। তাই প্রাণের মধ্যে তাল লাগলেও বুদ্ধিতে তার নাগাল পাওয়া সহজ ছিল না। ১৯১৯ থেকে তিনি এই সব কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, তাঁর রাজনীতির জীবনেও তিনি এই কথাই বলেছেন, যে জন্য চরকা-তত্ত্ব বলতে বলতে তিনি রাধা-তত্ত্ব বলেছেন—যা জনসাধারণের পক্ষে যেমন দুর্বোধ্য হতো, তেমনি পুলিশী কর্তাদের পক্ষে হতো চোখ-ধাঁধানো, যারা মনে করত, যে-মানুষ রাধাকৃষ্ণগৌর বলে কাঁদে, সে আর এমন কি একটা মারাত্মক রাজনীতির কথা বলবে? কিন্তু রাধা কৃষ্ণ গৌর যে স্বাধীন, স্বরাই বা মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জলন্ত বিগ্রহ, সে কথা কেউ জানে না। চরকা আর রাধা কেমন করে পুরুষোত্তমানন্দের কাছে এক হয়ে এল? কেননা দুই-ই পোষণ-তত্ত্বকে বহন করে এনেছে—চরকার মতই শ্রীরাধা নিপীড়িতা প্রকৃতির মর্যাদাপূর্ণ স্বাধিকার লাভের মহিমময়ী দৃষ্টান্ত—জগতের কাছে তারা দুই-ই আত্মমর্যাদা ও পোষণের ধর্ম প্রকাশ করেছে—এই জন্যই পুরুষোত্তমানন্দ চরকা ব্যাখ্যা করতে করতে শ্রীরাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। পুলিশী রিপোর্টারেরা অনেক সময় শাস্ত্রব্যাখ্যা মনে করে পুরুষোত্তমানন্দের বক্তৃতা রিপোর্ট করে নি-রটে কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক অভিভাষণ যে সহস্র সহস্র মানুষের প্রেরণা জুগিয়েছিল সেদিন, সেকথা যারা সেদিনের অসহযোগ আন্দোলনের খবর রাখেন, তাঁরা জানেন। তাঁরা জানেন পুরুষোত্তমানন্দের বক্তৃতায় কেমন করে মানুষ উদ্দীপিত হয়েছে, কেমন করে সহস্র সহস্র টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরে ভারতবর্ষের ও বিশ্বের চিন্তাধারা ও পরিবেশ এত দ্রুত পাল্টে গেছে যে, আজ যেটা সহজ বলে মনে হচ্ছে, সেদিন যে সেটা একেবারেই সুবোধ্য না,

এ কথাটাও যেন আজ ভুলে গেছি। এই চল্লিশ বৎসরে পরিবর্তিত আবেষ্টনের মধ্যে বসে পুরুষোত্তমানন্দ-কথিত শ্রীনিত্যগোপাল তথা-শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আমরা অনেকটা বুঝি। আমার ক্ষুদ্র জীবনের যে বিশ বাইশ বৎসর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সান্নিধ্যে ও তাঁর সঙ্গে কেটেছে, তাতে নিজেই দেখেছি বাইশ বৎসর আগে তাঁর কথা মানুষ কতটুকু বুঝত, আর আজ কতটুকু বেশী বোঝে। আর বিশ পঁচিশ বৎসর বেঁচে থাকলে দেখব পুরুষোত্তমানন্দের কথা মানুষ বুদ্ধি দিয়ে শুধু বুঝছে না, বুদ্ধি দিয়ে খুশী হয়ে তাঁকে জীবনে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছে। যাই হোক, পুরুষোত্তমানন্দের বিরাট প্রাণ এখন কতকগুলি কথা বলে গেছে যা ব্যাপকতায় ও গভীরতায় সীমাহীন হয়ে অনির্বচনীয় মহিমায় উজ্জ্বল। তেমনি তাঁর জীবন।

পরস্পর বিপরীতকে মেলাবেন বলেই পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে আমরা যাকে বিপরীত ও বিরুদ্ধ বলে জানে সেই সব ঘটনার সমাবেশ। একদিকে তিনি আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত, নিজের মধ্যে নিজে থাকতে তিনি ভালবাসতেন; আবার তিনি মানুষের জন্য কেঁদে গেছেন—মানুষের বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত জটিল জীবনে সমাধানের প্রণালি জানবার কথা শোনাবার জন্যই মানুষ মানুষ করে তাঁর কান্না। পরিবারকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীতি ও মর্যাদা দিয়েও শুধু পরিবার জীবনে তৃপ্ত ছিলেন না বলেই সমাজ-সেবা, রাষ্ট্র-সেবা, বিশ্ব-সেবার ব্রত নিয়েছেন, সন্ন্যাসী হয়েছেন। যতদিন তাঁর পরিবার তাঁর আদর্শগত জীবনের পরিপন্থী হয় নি, ততদিন সমগ্র পরিবারকে সঙ্গে করেই তিনি রাজনীতি করেছেন, সন্ন্যাসী-জীবনে সর্বকে রেখেও সর্বাতীত হওয়ার ব্রত, বিশ্ব-হিতব্রত প্রচার করেছেন। যখন সেটা সম্ভব হয় নি, যখন বাইরে থেকে তাদেরকে সঙ্গে রেখে ব্যাপকতর জীবনের আদর্শ প্রচার অসম্ভব হয়ে উঠল, তখনও অন্তরের মধ্যে তাদের সম্পর্ককে তিনি অক্ষুণ্ণ রেখে, পরিপূর্ণ শ্রীতি দিয়ে চলেছেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও তাই রাজনীতিক্ষেত্রে সমস্ত প্রাণ দিয়ে যোগদান করেছিলেন, অথচ তার আবর্তের মধ্যে পড়ে যান নি। বাস্তব জীবনটাকে তার সমস্ত সৌন্দর্য মাধুর্য নিয়ে, তিনি পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করলেও সারাজীবন ধরে কৃচ্ছ্রতাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ঈষদুষ্ণ-জীবনটাতে একটা জ্বালা ছিল, মাস্টারী জীবনে সেটা প্রতিদিনের ব্যবহারে চামড়ে পরিণত হল, পরবর্তী কালের অধিকাংশ কাটল খালি গায়ে, বাকিটা কাপড়ের অর্ধেক গায়ে দিয়ে। ভুগেও ছিল না ৪০ বৎসর। খাওয়া তাঁর যত সাধারণ হতে পারে। আধিক স্বচ্ছলতা কোনদিন ছিল না, কোনমতে দিন যাওয়ার অবস্থা থেকে একটু ভাল হলেই তা অপরের সেবায় ব্যয়িত হয়েছে, কখনও নিজের ভোগে লাগে নি। একমাত্র প্রাণভরা গভীর ব্যাপক এত সীমাহীন মানুষের আতিথ্যতা ছাড়া তাঁর চলায়-ফেরায় বলায়, খাওয়া-পরায় শোয়ায় কোথাও এতটুকু আতিথ্যতা ছিল না। বার বার তিনি বলেছেন, 'আমি ছেঁড়া মানুষের দলের লোক', অথচ বিশ্বকে তার বাস্তবতায় তিনি স্বীকার করেন। ঐ একজন ছেঁড়া মানুষের মহানন্দে পড়ে থাকতে সক্ষম একজনের মধ্যে যে জ্ঞান-ভক্তি প্রেম-কর্মের এতখানি ব্যাপকতা গভীরতা ছিল, সাধারণ ভাবে বিরুদ্ধ বলেই এটা বুঝা পড়তে সময়ের প্রয়োজন। কত স্বল্প ছিল তাঁর প্রয়োজন, অথচ কত গভীর ব্যাপক ছিল তাঁর প্রাণের পরিবেশ! সে প্রাণ যতদিন ধরে মানুষের কাছে ছুটে উঠবে, প্রকাশিত হবে। বর্তমান যুগ হৃদয়-ধর্মের যুগ—বুদ্ধির কারসাজি, পরের অপকারের সামনে শুদ্ধ মানুষ ভাবছে আজ বাঁচবার পথ কোথায়—ছুটেও উঠছে তার কাছে পথের ইঙ্গিত—সে এই হৃদয়ের পথ। পৃথিবী জুড়ে যত বম্ব্ স্যাটম্ বোমা তৈরী হোক, কিংবা নয়া সাম্রাজ্যবাদী কম্যুনিষ্ট চীন যত আস্ফালনই করুক—সমস্ত পৃথিবীর জনসাধারণ আজ শ্রীতিপূর্ণভাবে মিলেমিশে বাঁচতে চায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও। কেউ কারো দ্বারা শোষিত হবে না—সবাই মিলে বাঁচব—এই যে বোধটা জেগেছে এরই মূলের তত্ত্বটী হচ্ছে শ্রীনিত্যগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ-প্রচারিত সমাধির সাথে 'আমি বিশ্বনাগরিক'-তত্ত্ব কিংবা অন্য অনেক সময়ের তত্ত্ব। যে জিনিষটা এসে গেছে, এসে যাচ্ছে তারই দার্শনিক সূত্র

দিলেন নিত্যগোপাল ৮০।৯০ বৎসর আগে, আর ব্যাখ্যা করলেন পুরুষোত্তমানন্দ বছর চল্লিশ আগে থেকে। অস্ত্র-শস্ত্র চিরদিন পৃথিবীতে থাকবে; এমন কোনও দিন হবে না যে অস্ত্র নেই পৃথিবী জুড়ে—শ্রীকৃষ্ণকেও মহাভারতীয় ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য অস্ত্র-যুদ্ধের পরশ নিতে হয়ে ছিল। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে মনোবৃত্তি নিয়ে—তুমি ভোগ করবার জন্য, নিজের মতবাদকে জোর করে আরেক জনের উপর চাপিয়ে দেবার জন্য, তোমার শক্তির অহংকারের খোরাক যোগাবার জন্য অস্ত্র ধারণ করলে, না দুর্বলকে রক্ষা করতে, নিজের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে, লোভীর অত্যাচার থেকে মানুষকে রক্ষা করতে অস্ত্র ব্যবহার করলে? তাই অস্ত্রশস্ত্র থেকেও আজকের পৃথিবীর মনোভাব সবাই মিলে মানুষের মত বাঁচার দিকে—প্রত্যেক দেশের বহু ঘটনা ও চিন্তাশীলদের কার্যকলাপব্যক্য তারই সাক্ষ্য দেবে। তাই আজকের যুগটা হৃদয়-ধর্মের যুগ—বাস্তব দৈনন্দিন পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্ব-জীবনকে স্বীকার করেও তার অতীত হয়ে এই হৃদয়-ধর্মকে ছড়িয়ে দেবার যুগ—নিত্যগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ তারই কথা বলে গেছেন, আচরণ করে গেছেন। বাস্তব জীবনটাকে স্বীকার করতে গেলে মানুষ ভোগী হয়ে পড়ে, তাই লোভাতেই সেটাকে মিথ্যা মায়াময় দুঃখ ইত্যাদি বলে মনস্তত্ত্বকে চোখ ঠার দিয়ে চলবার জীবন-বিরোধী সাধনা নেয়। নিত্যগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দ নিজেদের জীবনের আজীবন স্বতাবসুলভ দৃষ্টান্ত আর স্বল্প প্রয়োজনের অতি সাধারণ জীবন যাপনদ্বারা এই প্রমাণ করে গেছেন যে, বাস্তব-জীবনটা যেমন মিথ্যে মায়াময় নয়, তেমনি ভোগের ক্ষেত্রও নয়। ব্রহ্মজ্ঞানের মত সত্য হয়ে এ ব্রহ্মজ্ঞান আস্বাদনের ক্ষেত্র এবং সেবার ক্ষেত্র—বিশ্বে প্রতি বস্তু বা ঘটনা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে পরস্পরকে সেবা দিয়ে চলবে—এইখানেই বিশ্ব সত্য। এইটেই সর্বক্ষেত্রজ্ঞ ও সর্বক্ষেত্র-বিচরণকারী সো-গোপসংবাবৃত অখিলাত্মার আত্মা পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণের জীবন তত্ত্ব।

এই চিন্তাধারা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আচরণ করে গেছেন, প্রচার করে গেছেন এবং এই চিন্তাধারা দিয়েই ১৯১৯-এ তিনি বেদান্তের ভাষ্য লিখেছিলেন এবং ১৯৩২-এ আগস্ট আন্দোলনে যুক্ত হয়ে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন এগারখানা প্রধান উপনিষদ্ ও গীতার ভাষ্য লিখেছেন, শ্রীনিত্যগোপালের জীবনের তত্ত্ব প্রস্থাপন করেছেন 'শ্রীনিত্যগোপাল জীবনে ও দর্শনে' গ্রন্থে। এ ছাড়াও রয়েছে অনেক ভাষণ পত্র ইত্যাদি আর রয়েছে তাঁর প্রস্থাপিত 'উজ্জলভারত' পত্রিকা। একটা চিন্তাধারা মানুষের কাছে উপস্থিত করে বিপর্যস্ত পথহারা মানুষের চিন্তাধারার সামনে নূতন যুগের পথ-রেখা এঁকে দেওয়াই তাঁর প্রধান কাজ ছিল। তাই যখন যেখানে গেছেন—রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা এই দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারের জন্য নানা স্থানে পরিভ্রমণ—সব সময় মানুষের চিন্তার দৈন্য দূর করতে ও চিন্তার জট খুলতেই প্রয়াস পেয়েছেন—ব্যক্তিগতভাবে, দলবেতভাবে—তাঁর সহস্র সহস্র ভাষণের মধ্য দিয়ে, তাঁর সকল লেখার মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখা বইগুলির সঙ্গে আপনারা তেমন পরিচিত নন বটে, কিন্তু উজ্জলভারতকে আপনারা অনেকেই জানেন। শেষের দিকে এই উজ্জলভারতের মাধ্যমেই তাঁর কথা মানুষের কাছে উপস্থিত করে আসছিলেন। তারপর ১৯৫০ সনের মার্চ মাসে একপ্রকার কপর্দকহীন পুরুষোত্তমানন্দ এই বাগুইআটি গ্রামে তাঁর নয়নারায়ণ আশ্রম নিয়ে আসেন। মাত্র দুই বৎসর এখানে তিনি দেহ নিয়ে উপস্থিত ছিলেন, তারপর সর্ব মানুষের হাতে তাঁর আশ্রমকে সমর্পণ করে দিয়ে তিনি তাঁর দেহকে সরিয়ে নিলেন। আজ তাঁর আত্মিক উপস্থিতি নয়নারায়ণ আশ্রমের আনাচে কানাচে। যে-কথা ও যে-জীবন নিয়ে তিনি এসেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও প্রয়োজনীয়তা সমাজ-জীবনে ছিল বলেই তাঁর পুণ্য দেহকে বহন করে নয়নারায়ণ আশ্রম ধনবল ও জন-বল না থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাজ ও কথাকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলতেন, আমার কাজ তুতে করে—সর্বভূতই তাঁর কাজ করছে। তিনি যে সকল প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন—তাঁর গ্রন্থপ্রকাশ, উজ্জলভারত সম্পাদনা, জনসংযোগ ও জনসেবার ক্ষেত্র হিসাবে নয়-নারায়ণ প্রয়াগার, মহিলা শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র, বয়স্কা শিক্ষা

কেন্দ্র—সেগুলি ভালভাবেই চলছে। চারদিকের বাড়ঘরা কাশগুলি উঠে যাওয়ায় বহরা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাবে জেনে যাতে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আশ্রমে ভালভাবে থাকে এবং তার মধ্য দিয়ে জনসংযোগ সহজতর হয় সেইজন্য গত ফেব্রুয়ারী মাসে আশ্রমে একটি নিম্ননিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যালয়টি অনুমোদন করে বিদ্যালয়-গৃহ এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের দুইটি আবাসগৃহের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন। বিদ্যালয় গৃহটির আজকের দিনে উদ্বোধন করা হবে—আপনাদের সকলের আশীর্বাদে শিক্ষার কাজ ভালভাবে চলবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত চারজন শিক্ষিকা এখন শিক্ষাদান করছেন। শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রে দেহী ব্লাবোর্ন ডিপ্লোমা কোর্স গত দুই বৎসর হল খোলা হয়েছে—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এ বছরে ৮জন পরীক্ষা দিয়েছেন। লাইব্রেরীর কাজও মোটামুটি সন্তোষজনক—বর্তমানে ২০৪৫টি বই আছে, পাঠক সেবকদের ৮৮ জন সভ্য আছেন। এইভাবে সমাজ সেবার কাজ চলছে। তবে প্রত্যেক বিভাগের কাজই যে আরও ভালভাবে করার অবকাশ আছে এবং করা উচিত তা আমরা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করি এবং সাধ্যমত ভাল করতে সচেষ্ট থাকি। তাঁর 'উদ্বোধন' একরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলছে, বলেন্না লোকাভাব। স্বামীজী দেহরক্ষার পর চার বৎসরে চারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, এ বছরে গ্রন্থপ্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আপনাদের আশীর্বাদে আগামী বৎসরে যাতে আবার গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারি, তারই প্রতীক্ষা করছি।

আজ আপনারা তাঁকে স্মরণ করে এসেছেন, আপনারা তাঁর কথা ও কাজকে বহন করে চলবেন —এই আশীর্বাদ আপনাদের কাছে ভিক্ষা করে পুনরায় আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাই। জয় হোক বিশ্বের পুরুষোত্তম-সন্তার, জয় হোক শ্রীনিতাগোপাল-পুরুষোত্তমানন্দের, জয় হোক সর্ব মানুষের।

শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ-জন্মদিনে

॥ শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ॥

মাটি আর মাটি নয়
নয় শুদ্ধ পৃথিবীর ভালবাসা, সুখ-দুঃখ
শোক-তাপ-জ্বালা।
পৃথিবী আনন্দময়, আনন্দময় প্রাণীকুল,
বৃক্ষ লতা, কীট পতঙ্গ, জীব জন্তুকুল,
আনন্দ হ'তে জাত এই বিশ্ব নিখিল
চঞ্চল সংসার সমাজ।

এ সত্য সর্ব সত্য
এ সত্য যুগের যুগে উজ্জ্বল প্রখর
ভেঙে গেছে ঘুম তার,
টুটে গেছে সমীরের ক্রন্দন জ্বালা
লজ্জা ঘৃণা ভয় ক্রোধ।

এ পৃথিবী মিথ্যা নয়
মিথ্যা নয় সংসার সমাজ
এ পৃথিবী আনন্দলোক, ব্রহ্মলোক
চিরানন্দের লীলার খেলায়,
প্রতি বালু বিন্দু রেখা
আনন্দের স্পন্দনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল।

আমরা অমৃতের সন্তান
এ কথা ভুলিয়া গেছি;
কালের করাল ছায়া তাই গ্রাসিয়াছে চারিদিক
বিষাক্ত হ'য়েছে যত সমাজ সংসার
আনন্দের নগরীতে প্রেতের নৃত্য তাই চলে অবিরাম।

ওরে ভাই মুছে ফেলো
সাধুত্বের মান অভিমান
বিদ্যার অহংকার তার,
ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব দুঃখদান
সহজ মানুষের বেশে এলো
যে সাজে যুগে যুগে
আসেন ভগবান।

অন্তরে বিভেদ রোষ, তুচ্ছ অভিমান
মুখে মুখে সাধু বুলি
দিনের মাহাত্ম্য প্রচার
এই আজ দিকে দিকে চলে অবিরাম—
স্রষ্টার সৃষ্টি কলংকিত আজ
আমাদের নিষ্ঠুর নিপীড়নে।

ফাঁকি দিয়ে মেকির পসরা
যারা আজ সত্তা বলে করিতেছে প্রচার
এসেছে সময় তাদের
কালের করাল ছায়ে মৃত্যু অনিবার।

ভেঙে ফেলো ভেঙে ফেলো তুচ্ছ দিয়ি
অহং বিরাট
মনুষ্যের যত কিছু মান অভিমান
কৌলীন্যের তুচ্ছ বেড়াজাল,—
নেমে এলো নেমে এলো
হে বিদ্বান, কুলীন, ধনিক-বনিক
সহস্র সহস্র মানুষের ভীড়ে
যেখানে এখনো কাঁদেন
নর নারায়ণ।

সাধুত্ব স্বীকৃত নয়
নয় শুধু অন্যায়ের শাস্তিকামী সে তো,
এক হাতে বজ্রসম মহাবীর্য তেজ
আর হাতে ধরে প্রেম শান্তির প্রতীক
মহান বিপ্লবী সাধক
হ'য়ে আজ অবতীর্ণ পৃথিবীর ঘরে
তাদের চরণ স্পর্শে পৃথী হ'বে ব্রহ্মময়
এই তো আকাঙ্ক্ষা আমার চির-জনমের।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য
সত্য দেহ-দেহী
পুরুষোত্তম সৃষ্টি-কোণে সবকিই যে সত্য বলে জানি।
এ পৃথিবী ব্রহ্মলোক
জ্যোতির্ধামের দিব্য সৃষ্টি মাঝে
হীন হেয় তুচ্ছ সে তো
আমাদের সংকীর্ণ সংঘাতে।

দেবতা এসেছে নেমে
ধরণীর ধূলি' পরে—
এ পৃথিবী মৃত নয়, তুচ্ছ নয়, মায়া নয়,
এ পৃথিবী আনন্দলোক, ব্রহ্মলোক
পুরুষোত্তম পরশে মধুর!

এই বাণী এই ব্রত ল'য়ে জীবনেতে
এসেছিলে হে মহান
আমাদের পর্ণ কুটীরেতে,
তোমাকে স্মরণ করি আজ।
হে ঋষি-দ্রষ্টা ঋষি, ক্রান্তদর্শী কবি।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ স্মরণে

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
(নরনারায়ণ আশ্রমের অন্যতম পরিচালক)

নির্যাতিত নেতা তুমি জ্ঞানের প্রতীক
লোকসেবা কীর্তি তব, দেশহিত ব্রতী।
ছড়ালে জ্ঞানের বীজ সবাকার মনে
স্বমুকণ্ঠে প্রচারিয়া ধর্ম-মহারথী ॥

সেবা-ধর্ম ছিল তব জন্মগত পণ
দেশ সেবা লাগি তুমি লইলে সন্ন্যাস।
বল বীর্য দেখাইয়া স্বাধীনতা রণে
দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিলে আপ ॥

অতুল সাত্ত্বিকদম জ্ঞানের সাধক
বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণ দীনের শরণ।
দাসত্ব মোচন আর জাতির কল্যাণে
দুঃখ দৈন্য কারাবাস করিলে বরণ ॥

নিত্য ধর্ম কর্ম করি অনন্ত হৃদয়ে
জনসেবা দেব-সেবা নামান্তর সার।
সত্য বুঝি অবিচল প্রণয় অন্তরে
আর্তত্রাণ করে গেলে ভব পারাবার ।

অস্থায়ী চলন ক্ষীণ ভুবন মাঝারে
স্থবির অক্ষয় কীর্ত বিদ্বজন কিবা।
সর্বত্র সিন্ধুর বাস নাহি ব্যবধান
আকাশ অনল বায়ু গিরি মনোলোভা ॥

"পিতা নোঽসি" মহাবাক্য করিয়া স্মরণ
'জীবদেহে নারায়ণ রহে বিদ্যমান'।
জিতেন্দ্রিয় মহাপ্রাণ যোগাক্রান্ত মনে
অমৃতত্ব লাভ তব লভি এই জ্ঞান ।

সর্বভূতে নিগূঢ়াত্মা পরব্রহ্ম জানি
সর্বতত্ত্ব বিশুদ্ধ যে অজ অব্যয় সদা।
ওষধি ও বনস্পতি ধরে ছায়া যার
তাঁহার শরণ লভি ভ্রম যথা তথা ॥

অন্ধকারের ওপারে সূর্যোদয় হেরি
আদিত্য বর্ণের শোভা ভুবনে অতুল।
নাহি অন্য পথ বিনু পরমার্থ লাভে
পরম পুরুষ প্রিয় বিষ্ণু সমতুল ॥

সর্ব পাশ মুক্ত তুমি তাঁহাকে জানিয়া
বিরাজিত যিনি সদা সবার অন্তরে।
সর্বাধিপ মহেশ্বর ব্রহ্মযোনি প্রভু
তাঁহারে ধারণ করি হৃদয় প্রান্তরে ॥

যাত্রীর নায়ক তুমি নহ শুধু আজ।
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করি পথ ঋষি সাজ ॥

স্বামীজী স্মরণে

শ্রীসনাতন মণ্ডল
(নরনারায়ণ আশ্রমের জন্মসভায় পঠিত)

ঠিক পাঁচ বছর পূর্বে এই জন্মদিনের শুভক্ষণে স্বামীজীকে বাগুইআটী এসে এই আশ্রমে দেখেছিলাম। শ্রীগৌর-কান্তি। গেরুয়া কাপড় পরে হাসি মুখে সভাপতির আসনের পাশে বসে। সুন্দর সন্ন্যাসী। মনে দ্বিধা জাগলো। ভাবলাম, আমরা সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না যাদের কথা থেকে সন্ন্যাসীরা নির্লিপ্ত, অতএব এখানে এসে কি হবে!

বক্তৃতা শুনলাম। কিছু বুঝলাম না। কিন্তু মনের দ্বিধার কুয়াশার মধ্যে খানিকটা প্রভাতের অরুণাভাস জাগলো। ঠিক সন্ন্যাসীর মতো কথা উনি বললেন না। অথচ সংসারীরও মতো কথাও নয়! আশ্চর্য নতুন কথা! কী সে কথা?

আমরা প্রজ্ঞাবাদী ভারতবর্ষের লোক। জানতাম, সংসারটা হেয় এবং এ সংসারের ওপারেই ভগবানকে খুঁজতে হবে। তাঁকে পেতে হলে জটিল কুটিল এই সংসারকে পরিত্যাগ করে সহজ সরল ব্রহ্মচর্য নিয়ে বনে যেতে হবে। কেন? তার বহু ইতিহাস আছে। সংসারে বিচরণ করে অনেক মুনি-ঋষিও যে প্রকৃতির কবলে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছেন,—এ ইতিহাস আমাদের আছে। তাই সবকিছু ত্যাগের সন্ন্যাসই যে আমাদের 'শ্রেষ্ঠ পথ' এ কথা প্রজ্ঞাবাদী ভারতবর্ষ দৃঢ়ভাবে ধরে ছিলো, কিংবা বলা যায় কম বেশী এখনও তাই ধরে আছে। কিন্তু হায়, এতে তার শেষ রক্ষা হবে না। অনেক মুনি-ঋষি ব্যর্থ হবার পর স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাই ধরার বুকে এ জগতের সঠিক রহস্য প্রচার করবার জন্যে নেমে এলেন। সেটা কি? সেটা হচ্ছে প্রাণবাদ। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, আজ সব কেড়ে গেছে, প্রাণ নিয়ে দিতে হবে পাড়ি। প্রাণবাদ নেমে এলো। পুরুষোত্তম-জীবন নেমে এলো। আমাদের সব গেছে। এখন প্রাণ নিয়ে দিতে হবে পাড়ি। প্রাণের কথা কি? প্রাণ সংসারটাকেই বা কি বলে? সন্ন্যাসকেই বা কি বলে? প্রকৃতিকেই বা কি বলে? এ নতুন সুরে জানবার আহ্বান নিয়ে বিশ্বের সামনে প্রাণ নেমে এলো। তারই কথা শোনালেন শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ।

প্রাণের ধর্ম কি? প্রাণের পথই বা কি? প্রাণের পথ সমগ্র সৃষ্টির। প্রাণ কাউকে বাদ দেয় না। প্রাণ সবাইকে নিয়ে হাত ধরাধরি করে চলে। প্রাণের ধর্ম সমন্বয়। প্রাণের সৃষ্টি একান্ত ব্রহ্মের দিকেও নয়, একান্ত প্রকৃতির দিকেও নয়। ব্রহ্ম-প্রকৃতিকে সমন্বয় করে পরিপূর্ণ এক আশ্চর্য নতুন পথ। এই পথের সংবাদ শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ। মহাপ্রভুর সময়ে, অর্থাৎ সেই সাড়ে চারশো বছর আগে ইচ্ছা থাকলেও এই পথের সবটুকু খবর তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি।

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি।

রায় রামানন্দের মুখে ঐ শ্লোক শ্রবণে মহাপ্রভু তার মুখ চেপে ধরেছিলেন। কেননা তখনও এই তত্ত্ব বলার সময় আসে নি। এ ছাড়াও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আর একটা করুণ ঘটনা আমরা জানতে পারি। ছোট হরিদাস একজন চৈতন্য-ভক্ত, হরিদাস প্রভুকে কীর্তন শুনাতেন। পুরুষোত্তমবাসী ভগবান আচার্য একদিন চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ

করেছিলেন। প্রভুর ভোজনের জন্য নানাবিধ ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উত্তম অন্ন হলে প্রভুর সন্তোষ জন্মাবে, এই ভেবে আচার্য নিধি মাইতীর ভগিনী মাধবী-দেবীর কাছ থেকে কিছু উৎকৃষ্ট চাউল আনবার জন্যে ছোট হরিদাসকে বললেন। আচার্যের কথা-মত হরিদাস দেবীর কাছ থেকে কিছু চাউল আনলো। যথাকালে প্রভু ভোজন শেষে অন্নের অনেক প্রশংসা করলেন এবং কার দ্বারা এই অন্ন সংগৃহীত হয়েছিলো—তাও জেনে নিলেন। তারপর চৈতন্যদেব নিজ গৃহে গিয়ে গোবিন্দকে আদেশ দিলেন, ছোট হরিদাসকে যেন আর তাঁর কাছে আসতে না দেওয়া হয়।

অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিল।
নিজ গৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল॥
আজ হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥

এই কথা শুনে হরিদাস মর্মাহত হলো এবং তিনি দিন কিছু না খেয়ে রইলো। হরিদাসের কি অপরাধ হয়েছে কেউ বুঝতে পারলো না। স্বরূপাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন; তিনি বললেন, হরিদাস বৈরাগ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ করেছে এবং সেই জন্যেই তাকে দণ্ডিত করা হয়েছে। মাধবীদেবী পরম বৈষ্ণবী হলেও নারী তো বটে. বিরাগীর পক্ষে যে কোনো নারী-সম্ভাষণই অনুচিত। এক বছর কেটে গেলো। হরিদাসকে মহাপ্রভু আর ক্ষমা করলেন না। তখন হরিদাস প্রভুপদহীন জীবন তুচ্ছ ভেবে ত্রিবেণীতে প্রাণ বিসর্জন করলেন।

হরিদাসের এই নগণ্য অপরাধে স্বরূপাদি ভক্তগণ অনুরোধ করা সত্ত্বেও মহাপ্রভু ক্ষমা করেন নি। এ ঘটনাতে তৎকালীন মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণ অন্তরে মর্মান্তিক ব্যথা পেয়েছিলেন এবং স্বয়ং গ্রন্থকর্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করবার সময়ও নিদারুণ ব্যথা অনুভব করেছিলেন এবং আমরা হরিদাসের করুণ কাহিনী পড়েও কম ব্যথা পাই নি।

মনে প্রশ্ন জাগে।

স্বয়ং মহাপ্রভু কি কোনো ব্যথা পান নি?

হ্যাঁ, পেয়েছিলেন।—সবার চাইতে বেশীই পেয়েছিলেন ব্যথা। কিন্তু তাঁর কোনো উপায় ছিলো না। তৎকালীন 'অজাতবাদের' এবং ধনী কুলীন পণ্ডিত সমাজের দারুণ প্রভাব বাধ্য হয়ে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিলো। এসব তাঁর নিজ মুখের উক্তি হতেই পাই—

"প্রভু বোলে, শুন সার্বভৌম মহাশয়
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া
বাহির হইনু শিখা-সূত্র মুড়াইয়া॥

তিনি তথাকথিত সন্ন্যাসী ছিলেন না। কিন্তু তবুও চাপে পড়ে তাঁকে তথাকথিত সন্ন্যাসীর মতো কাজ করতে হয়েছে। এই ব্যথা, মানবের জন্য অন্তরে এই যে প্রাণ-ঢালা ঋণ—এই ঋণ পরিশোধ করতেই তিনি শ্রীনিত্যগোপাল কলেবর ধরে ধরার বুকে প্রকট। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়ে যে প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, যার উত্তরের সন্ধান সেদিন কেউ খুঁজে পায় নি—আজ পাই তার সমাধান শ্রীনিত্যগোপালে। যে নগণ্য অপরাধে মহাপ্রভু হরিদাসকে বর্জন করতে হয়েছিলো, তার শত-সহস্র অপরাধী যতো পতিতাকে, যতো আরব সন্তানকে নিত্যগোপাল পায়ে স্থান দিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। শ্রীনিত্যগোপাল-দর্শনে জীবনে এমনি বহু ঘটনার উল্লেখ আছে।

পাঁচ বৎসর আগে এই নিত্যগোপালের নিত্য পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে দেখে ভাল লাগল। বর্তমান যুগ-ধর্ম তাঁর কাছে শুনলাম। প্রকৃতি কাছে না রেখে যে সাধনা, যে নির্বিকারত্ব—তার যুগ আজ চলে গেছে। রূপরসগন্ধকে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা আস্বাদন করেও যে নির্বিকার থাকা, অচ্যুত থাকা সম্ভব,—এইটাই আজকের দিনের সাধনার বস্তু। এইটাই ব্রজের পথ—ভাগবতের পথ। সে পথ পুরুষোত্তমানন্দ সারা জীবন আচার ও প্রচার করে দেখিয়ে গেছেন—এই পথে চলেই আমরা ধন্য হবো—বিশ্ব ধন্য হবে।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীর স্মরণে

শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী
(নবনারায়ণ আশ্রমের সভায় পঠিত)

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলী ও মা ভাই বোনেরা—

আজ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ৮০তম জন্ম-তিথি উপলক্ষে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নবনারায়ণ আশ্রম-প্রাঙ্গণে আমরা স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ, ভক্ত, অনুরাগী ও দরদী জন-সাধারণ সমবেত হয়ে প্রতি বছরের মত এবারেও তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ; চিন্তা ও প্রাণ-প্রাচুর্যে সে অন্যান্য জীব থেকে পৃথক ও উন্নত। তাই প্রতিটি মানুষের জীবন-ধারা অন্য সকল জীব থেকে পৃথক। বিশেষতঃ মানুষের জীবনে চলার পথের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, কেবলমাত্র জৈব প্রয়োজনে আহার বিহার মৈথুন-এর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়, একমাত্র মানুষই স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারম্পর্য্য তথা রহস্য উৎঘাটন করতে সক্ষম। মহাপুরুষগণ যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের চলার পথের নিশানা দিয়ে গেছেন, তবুও মানুষ বারবার ভুল করেছে, ঠেকেছে শিখেছে—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আজ মানুষ প্রাচ্যদেশের প্রভাবে ভোগটাকেই জীবনে একমাত্র সত্য বলে গণ্য করেছে; ত্যাগ, তিতিক্ষা আজ তার নিকট কল্পনা বিলাস বলে উপেক্ষিত। আবার ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা মানব জীবনকে সুন্দরে যেখেন নাই, সর্বস্ব জীবন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এর ফল কোন ক্ষেত্রেই ভাল হয়নি। তাই আজকার যুগের দাবীতে নরকে নারায়ণের স্থানে উন্নত করতে হবে। ত্যাগ ও ভোগ, আদর্শ ও বাস্তব কোনটাই একক সত্য নয়; সমন্বয়ই হবে চলার পথ—সেই পথের ছক এঁকেছেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। জীবনের সর্বস্তরে অনুশীলনে উপলব্ধি করেছেন শ্রীনিতাগোপাল এবং সংস্থাপিত করেছেন তাঁর বিভিন্ন গুপ্তকে তত্ত্বাকারে। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। আজ তিনি সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু নিত্যগোপালের সেই তত্ত্বের আদর্শে রূপায়িত করেছেন নব-নারায়ণ আশ্রমকে; একে পীঠস্থান করে তোলার দায়িত্ব পরবর্তীদের। নিত্য-গোপালের সেই বাণী I am a cosmopolitan, 'এই বিশ্বই আমার মহামঠ' আজিকার সংঘর্ষাকুল ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীতে আশার আলো বহন করুক—শান্তির নির্দেশ দিক, ব্যক্তি সত্তা সমষ্টি সত্তার মধ্যে মিলিত হউক পরিপূর্ণ মর্যাদা নিয়ে ও পরিশেষে, শ্রীগুরু পুরুষোত্তমানন্দের জন্মতিথি বাসরে আজ এই প্রার্থনাই করি—'ধরার ধূলি হোক্ ব্রহ্ম ধূলি, ধরার মানুষ হোক্ ব্রহ্ম-মানুষ।'

প্রভুপাদ পুরুষোত্তমানন্দজীর স্মৃতি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

॥ শ্রীরমণীমোহন সরকার ॥

(নবনারায়ণ আশ্রমের জন্মসভায় পঠিত)

হে পুরুষপ্রবর,
শিক্ষাব্রতী ছিলে যবে ছাত্রেরা তোমার ভাবে
বিমোহিত হ'ত সদা তাদের প্রভাবে।
স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলে যেই ক্ষণে
তোমার ভাষণ শুনে মুগ্ধ হ'ত সবে।
যখনি দেশ মাতার বারতা হ'ত প্রচার
নয়নে ঝরিত তব অশ্রু কণা তবে।
তোমার ভাষণ শুনে মুগ্ধ হ'ত শ্রোতৃগণে
দেশের কাজে নিযুক্ত হ'ত সে প্রভাবে।
তোমার আত্মীয়গণ তোমাকে দেখি' তখন
বুঝিল দেশ সেবায় আত্মবলি দিবে।
ঝরিশাল ছেড়ে আসি পশ্চিমবঙ্গেতে পশি
দেখিলে কূটনীতি প্রচারিছে সবে।
চির দিন ভাব তব সরলই ছিল সব
সরলে কুটিলে আর মিলিল না তবে।
তাই কূটনীতি ছাড়ি সত্যধর্ম্ম পথ ধরি
সেবিলে শ্রীনারায়ণে স্বভাব বৈষ্ণবে॥
৺নারায়ণ কৃপা করি ছাপিলেন কৃপা করি
নিত্যগোপাল রূপে তোমার পূজবে॥
তাঁহাকে গুরু মানিয়া আনন্দে ময় হইয়া
মুক্ত হইলে তুমি তাঁহার প্রভাবে॥
বিমল ধর্ম্ম জগতে পশিয়া আনন্দ চিতে
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের ভাব জাগে তবে॥
ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ ভাব যাতে দূর হয় সব
আসিল ভাব তোমার প্রচারিতে তবে॥
তাই এ আশ্রম তুমি করিলে প্রতিষ্ঠা স্বামী
মুগ্ধ এই পল্লীতে নির্জ্জনে নীরবে॥
দেশ বিভাগের পরে এলে দেশবন্ধুপুরে
প্রথম দর্শন তব পাইলাম এবে॥
তখন যে কি আনন্দ দিয়েছিলে তুমি বন্ধু
তাহা ত তাষায় ব্যক্ত হইবে না এবে॥
মনে হয়েছিল মোর প্রভুর এ কৃপা মোর
নতুবা স্বচক্ষে আমি দেখিব কি তবে॥
কিছুদিন গেল যবে আশা মোর হ'ল তবে
আমার মনোবাসনা পূর্ণ ই হইবে॥
হেসে প্রভু নারায়ণ বুঝিয়া আমার মন
সিদ্ধান্ত করেন তার বিপরীত ভাবে॥
বছর যেতে না যেতে গেলে ত ধর্ম্ম সভাতে
ধর্ম্মালোচনায় লেখা ভাজিলে এ ভবে॥
সে কথা শুনিয়া আমি বুঝিলাম গেল স্বামী
বৈকুণ্ঠ ভবনে ধর্ম্ম কথা বলি সবে॥
প্রার্থনা তোমায় করো মোরেও দিও আনন্দ
নিয়ে তোমারি কাছে হ'তে এই ভবে॥
৺পুরুষোত্তমানন্দজীর জয় দেও সবে,
সবাই মনে আনন্দ অবস্থি পাইবে॥

প্রার্থনাকালীন ভাষণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১৬)

সন্ধ্যা—ওঁ নমঃ···। শ্রীনিত্যগোপাল এসেছেন—তিনি এসেছেন—এই কথাটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যগোপালকে বললেন, 'তুই এসেছিস, আমিও এসেছি'। একটা বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে দুই ভাই এসেছেন।···সাধনায় এরা সিদ্ধিলাভ করেছেন সেটা কোন কথা নয়; এমনভাবে এঁদের সম্বন্ধে ভাবতে হবে না,—এরা এসেছেন গভীর উদ্দেশ্য, বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে।... যে উদ্দেশ্যে এসেছেন সেটা হচ্ছে সমন্বয়...শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ সরল জীবনের সমন্বয় দিয়েছেন···। শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন সরল ছিলেন তার একটা দৃষ্টান্ত···তাঁর ভাগ্নে দিদিমাকে যে ভাষা বলত, সেই ভাষা তিনিও বলতেন—বলতেন, শালা, তুই আমায় মাকে ছাড়বি না, তোর মাকে আমি ছাড়ব।..অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের মা তাঁর ভাগ্নের দিদিমা, দিদিমাকে অনেক কথা বলা যায়, যা অপরকে বলা যায় না। এমনি সরল, খুব সরল, সংসারের কোন ঝঞ্ঝাটে নেই—সহজ সরল, অনাড়ম্বর।··আজ আমাদের পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের মধ্যে বসে জটিল কুটিল জীবন···তদুপরি অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই জটিল কুটিল জীবন নিয়েই আজ মানুষকে ব্রহ্মাস্বাদন করিতে হইবে; এরই মধ্যে বসে এই জীবনের সমন্বয়, সমাধান শ্রীনিত্যগোপালের।···কালী আত্মা যীশুর নামে সমাধি নিত্যগোপালেরও হতো, কিন্তু বিপরীতধর্মী জড় ও অজড় অর্থাৎ পরস্পর বিপরীতের সমন্বয়ের কথা বলে নিত্যগোপাল সমন্বয়ের পথে আরও এগিয়ে গেলেন।··এতদিনের যোগ ব্যক্তিচারের যোগ, অব্যক্তিচারের যোগ কি করে হয় তার ব্যবস্থা নিত্যগোপাল দিয়েছেন।··· ভক্ত-ভগবান counterpart; পিতা পুত্রের বল, পুত্র পিতার বল, গুরু শিষ্যের বল, শিষ্য গুরুর বল—পূজা পেলে ইষ্টের বল বৃদ্ধি হয়। একের ভালবাসা পেলে অপরের বল বৃদ্ধি হয়। ভক্ত ভগবানেও তাই। এই-ই ব্রহ্মলীলা।···নিত্যগোপাল কর্মের সঙ্গে জ্ঞান ভক্তির সমন্বয় করেছেন।···সংসারে কর্ম জ্ঞানের ভালমন্দ আছে, ভগবানের কাছে নেই। সংসারে ভাল খাদ্য মন্দ খাদ্য আছে···কুকে নেই···। তাঁর খাদ্য পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং—ভাল ভাল জিনিষ—রসগোল্লা সন্দেশ দিতে হবে তা কুকে নেই—পাতা ফুল জল আর যে কোন ফল—যত ছোট ফলই হোক্—দিলেই কৃষ্ণ খুশী। ভক্তির কথাই হল ছোটদের সম্মান দেওয়া—যা নোংরা, যা ছোট তাকেই অবলম্বন করে ভক্তিবাদ জন্মেছে।···তাই গোবিন্দের প্রিয় শাক, প্রিয় যত ক্ষুদ্র ফল।···কারণ শাক সবলে দিতে পারে, রসগোল্লা সন্দেশ তো সবলে দিতে পারে না।··· ছোট কাজ ছোট কাজ নয়,—উপনিষদে ছোট কাজ বলে কিছু নেই—শিষ্যকে গুরু রাখতে দিলেন গুরু—বললেন, একটা গরুকে একশ গরু করে নিয়ে আসতে হবে—দিনের পর দিন ধৈর্য, তিতিক্ষা দিয়ে যে কোন ছোট কর্ম দিয়ে এই যে সাধনা সেটাই ভগবদ্ সেবা।···যাকে আপাতদৃষ্টিতে ছোট বলে মনে হয় সেটাও ব্রহ্ম-কর্ম এবং এই পথেই তা হয়।···ঘৃণা করতে নিষেধ—ছোট হলেও সে কাজ করতে ঘৃণা করো না। সেই কবে বেরিয়েছি—আমার সহযোগী যারা তারা সব ঘরে ফিরে গেছেন। আমি আজও পথে—আমি ছেঁড়া মাদুরের দলের লোক —আমি ভালবাসি শাক—বৃন্দাবনে শাক ছাড়া ভোগ লাগে না।···ছোট যা কিছুকে ভালবাস, ছোট মানুষকে ভালবাস।···শহর ও গ্রামের পার্থক্য স্মরণ রেখো। এখানে এসেছি···তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও কাজ আসবে, কাজ হবে। ···জাতির জীবনের সকল দিকের অগ্নিমান্দ্য দূর হবে

নিত্যগোপালের সাধনায়···পরস্পরের সঙ্গে মিলনে শক্তি থাকবে। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক·· আমি তোমাদের সেবা করবার জন্য ব্যগ্র।···আমি যেদিন থাকব না তোমরা সেদিন যদি আমার থেকে অধিক শক্তি নিয়ে নিত্যগোপালের কথা শোনাও, তবে না ঠাকুরের কাজ হবে? তোমরা বলবে, তোমরা পাঠ করবে, আমি শুনব—এই তো চেয়েছিলাম। মেয়েকে ছিয়েও চেষ্টা করেছি—হয় নি! বলি তো, যে যাঁর-শক্তি আছে, এস, আমি নিত্যগোপাল-কথা কইব।···আমি মূর্খ, তবু বেদান্ত দিয়েছেন, তোমরাও পাবে। পণ্ডিতরা যাতা বলেন, আমি না হয় তা বলব···।

২০, ৬, ৫৬ ।:..[যার যেন মোর সকল ভালবাসা তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে—এই গানটী করেন।]...সকল ভালবাসা এক তোমার ভালবাসা—তোমার পানে আমার চিত্তের সর্বতোমুখী গতি প্রধাবিত হউক—নিত্যগোপাল পানে আমার সকল ভালবাসা প্রধাবিত। আমার সকল গভীর আশা তুমি শোনো—তোমার কানে পৌঁছাক—তোমারই প্রতীক্ষা করিব এই আশা তোমার কানে পৌঁছাক। নিত্যগোপাল, চিত্ত মন যখন যেথায় থাকে, সাড়া যেন দেয় তোমারি ডাকে। যখন যেথায় থাকে—সুখে দুঃখে ভালোতে মন্দতে সুখেতে অসুখেতে।···তুমি ডাক অহরহ তুমি ডাকিতেছ; তোমার ডাকের আর বিরাম নাই—শয়নে স্বপনে তুমি ডাকিতেছ—যেন বধির হই না—তোমার ডাকে যেন সাড়া দেই—দিন রাত তুমি ডাক—তোমার ডাকের বিরাম নাই—জীবের কানে কানে তুমি ডাক—আমি যেন বধির হইয়া না থাকি—সকল ঘটনায় যে তোমার আহ্বান শুনিতে পাই, সকল পরিস্থিতিতে তোমার আহ্বান যেন শুনিতে পাই...বাহিরের এই ভিক্ষাঝুলা খালি নিঃশেষে যেন খালি হইয়া যায়—আমি ভিক্ষায় যাহা পাইয়াছি, মাথা বিক্রয় করিয়া দামের মত যাহা পাইয়াছি সব খালি হইয়া যাউক—আমায় তোমাদারা পূর্ণ কর।···আমি প্রথমানবপু হইব—আমার বাহিরের পাওয়া শেষ হইয়া যাক্—তের বুদ্ধির ভিতর দিয়া পাওয়া শেষ হইয়া যাক—আমার অবৈতাবৃত পান করাও।...যেমন সন্তান মাতৃগর্ভে থাকিয়া ভিতর হইতে পায়, আমি তেমন করিয়া পাইব—আমি অপমানের পাওয়া লইব না—ভেদবুদ্ধির ভিতর দিয়া পাওয়া আমার ঘুচাইয়া যাক্···অন্তর মম গোপনে যাক ভরে—তোমার প্রাণের গোপন স্থানে, তেমন গোপন স্থানে আমার অন্তর করিয়া যাক যেমন সন্তানকে মা গোপনে দেয়, কেউ জানে না, তেমনি গোপনে আমি তোমার দান লইব—আমি বাহিরের কিছু লইব না···প্রাণের দেওয়া নেওয়া গোপনে হয়—কেউ জানে না—যে দেয় যে নেয় সে বোঝে প্রাণে প্রাণে—আমার বুদ্ধি প্রাণের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাক।·· বুদ্ধির পাওয়া বানিয়ার পাওয়া, এই বণিকবৃত্তি নিঃশেষ হইয়া যাক।...হে প্রিয়, হে অন্তরতর, জীবনে যা কিছু সুন্দর সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে তোমার গানে...আমি তোমার সুরে সুর মিলাইব, আমি তোমারই গান গাহিব, তোমার ছন্দে ছন্দ মিলাইব—তুমি যে ছন্দে কথা কহিতে, যে ছন্দে বিচরণ করিতে আমি সেই ছন্দ শিখিয়া লইব—সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে—আমার জীবনবীণায় তোমার গান ঝঙ্কার দিবে।···আমার সকল ভালবাসা তোমার পানে ধাবিত হউক—স্ত্রীপুত্রকন্যার ভালবাসা লইয়া তোমায় ভালবাসিব—মানুষ যেমন বিষয় ভালবাসে, আমি তেমনি বিষয়ের মত তোমায় ভালবাসিব—মানুষ যেমন বিত্ত সঞ্চয় করে, আমি তেমনি তোমায় সঞ্চয় করিব—তুমি স্বামী, তুমি পুত্র, তুমি বন্ধু, তুমি স্ত্রী···তোমার আসন সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিব···তোমাকে আমি বিশ্বের সকলের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করিব—এই তো আমার আশা—আর তো আমি কিছু চাই নাই।···সূর্যালোকও তোমার বাঁশি বাজে—সূর্যের আলোকের মত তোমার বাঁশি বাজে···। যার সঙ্গে এক হতে পারব না, যে আমার সঙ্গে এক হতে পারবে না, সেখান থেকে কিছু যেন আমি না নেই—এই দুইয়ে মিলে যে পাওয়া সেই তো অমৃত পাওয়া।···নিত্যগোপাল, আমি তোমার সঙ্গে নাড়ীর যোগে যুক্ত হব—আমি গোপনে বড় হয়ে বিশ্বের মধ্যে এসে তোমার কথা কইব।···আমি স্নেহের ব্যবসা করতে পারব না—আমি কাউকে শোষণ করতে

পাবব না—তাই তো আজ আমার কেউ নেই—তাঁরি যেই নি বলেই তো, সোধন করি নি বলেই তো কেউ নেই…। নিত্যগোপাল, I will grow from within —আমি বাইরে কবির, আমি ভিতরে বড়…। স্বামী, নিত্যগোপাল, ভিতরে তুমি রাজরাজেশ্বররূপে ফুটিয়া ওঠ।…পেটের মধ্যে মা-সন্তান যেমন অবৈত, সৎ স্বামী সতী স্ত্রী যেমন অবৈত, নিত্যগোপাল, আমি তেমনি করে তোমার সঙ্গে অবৈত হব।…বাইরে রেখে এবং বাইরে থেকে যে দেওয়া নেওয়া তা তো ব্যবসাদীর পাওয়া—তেমন দেনা-পাওনা যেন আমার না থাকে—বৃন্দাবনের দেনা-পাওয়া আমার হোক…। এমন করে কেউ আমায় দিলে না, আমারও পাওয়া হল না।…রমণ রমণী ভাব যেখানে নেই—না সো রমণ না হাম রমণী—এই অবস্থায় যে প্রেম, সেই প্রেম আমায় দান কর… ।প্রাণের পরিবার, প্রাণের সমাজ, প্রাণের বিশ্ব গড়িয়া উঠুক…প্রাণের বুদ্ধিই বুদ্ধি, হৃদয়হীনের বুদ্ধির কোন মূল্য নাই…নিত্যগোপাল, মানুষকে তুমি সবল কর, সহজ কর, অভিসন্ধিমুক্ত কর…।…

২১, ৬, ৫৬…নিত্যগোপাল, সংসার সন্ন্যাস তুমি এক ভিত্তিতে স্থাপন করিলে…। গৌর, তুমি সন্ন্যাসী হইয়াও মায়ের লাগিয়া ও স্ত্রীর লাগিয়া জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র পাঠাইলে—সন্ন্যাস সংসার প্রেমের মাঝে এক—এই সত্য তুমি বলিয়া গেলে। গৌর সুন্দর, মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধকে তুমি নিত্য মূল্য প্রদানিলে। সমস্ত সম্বন্ধ ব্রহ্মসূত্রে গাঁথা—ব্রহ্মসূত্রে গাঁথা প্রকৃতির এই সম্বন্ধ অনন্ত—মায়ার সম্বন্ধ নয়, শুধু ব্যবহারিক সম্বন্ধ নয়। ব্যবহারিকের বুকে পারমার্থিক স্থাপন করিলে নিত্যগোপালরূপে, তুমি জল-সিঞ্চন করিলে, বলিলে মহা-নিষ্কাবস্থায় গার্হস্থ্য সন্ন্যাস এক বলিয়া বোধ হয়—উপলব্ধি হয়। আমি সংসারী হব, আমি সন্ন্যাসী হব—সকলের সঙ্গে সকল সম্বন্ধকে আমি নিত্য বলিয়া বুঝিব। নিত্যগোপাল, তুমি নিত্য সন্ন্যাসী, নিত্য সংসারী—তোমার কাছে সব নিত্য…। ব্রজধাম নিত্য কৃষ্ণের দেশ, নিত্য রাধার দেশ, নিত্য ব্রজগোপীর দেশ। ব্রজধাম—নিত্য ব্রজধাম দেখা সন্ন্যাসী হইয়া সংসারী হইতে হয়।…শ্মশানে আমিত্ব পোড়াইয়া, দেহ-মনপ্রাণ পোড়াইয়া, নিবন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে হয়। শিব দুর্গা বৃন্দাবনের পথে দাঁড়াইয়া… মরণের বুকে জীবনের আস্বাদন—মৃত্যুর বুকে অমৃতের আস্বাদন…আমার চির আকাঙ্ক্ষিত ব্রজধাম—শোষণহীন দেশ বৃন্দাবন—যেখানে কেবল শোষণ—নিত্যলীলার দেশ, নিত্যানিত্য সমন্বয়ের দেশ। নিত্যের বুকে ক্ষয়ের আস্বাদন আমার বৃন্দাবন।…বৃন্দাবনের আমার সকল নিত্য হউক—নিত্য দেহ, নিত্য প্রাণ, নিত্য মন, নিত্য আনন্দ, নিত্য বিজ্ঞান, নিত্য আত্মা। আমার নিত্যগোপাল জীবন-ধন, জীবন-বল্লভ—সখা বন্ধু শরণ সুহৃৎ স্বামী—সকল সম্বন্ধের ব্রহ্ম-মূল্য আস্বাদিব—সবাই ছাড়ুক, আমি ছাড়িব না। আমার নিত্যগোপাল—ময়ি তে, নাহং তেষু অবস্থিতঃ—আমাতে তাহারা, তাহাদের মধ্যে আমি নাই…নিত্যগোপালোঽহম্—তুমি আমার আমি তোমার, তুমি আমি আমি তুমি—আমার বেদনার ঠাকুর—তুমি বেদ, তুমি বেদনা…তোমার মহিমায়, তোমার মাধুর্যে তুমি জাগ, সমাধি-নিদ্রা হইতে তুমি জাগো নিত্যগোপাল… ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ম-ধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ ··

সন্ধ্যা। ওঁ নমো…। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ একাদশ স্কন্ধে (ভাগবতে) কি গুণ কি দোষ বলেছেন—যে যে অধিকারে নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ। প্রত্যেক মানুষ এক একটা অধিকার নিয়ে জন্মেছে—জন্মাবার পরেই এক একটা অধিকার পায়—পিতা বা পুত্র গুরু বা শিষ্যের অধিকার এক নয়। নিষ্ঠা অর্থ নিশ্চিতরূপে থাকা—সেই অধিকারে সম্যকরূপে থাকা—সেই গুণ। অমুকে গুণবান অর্থ তিনি যে অধিকার ভগবানের কাছ থেকে বা সমাজের কাছ থেকে পেয়েছেন, তাতে তিনি সুষ্ঠুভাবে স্থিত আছেন। এই অধিকার লঙ্ঘন করলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়। দেবতারাও কখনও কখনও অধিকারে বিচ্যুত হন, মানুষও।…আধিকারিক দেবতা মানে bureaucratic god…।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫১—

(২২)

...ধীরেন ডাক্তার ৮টায় পত্র আসে।...বলে যে প্রস্টেটগ্ল্যাণ্ড একটু enlarged হইয়াছে। ঔষধ দিয়া গেল। ঔষধ ওবার খাই। কিছুটা flow easy হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ easy হয় নাই। সতীন সেন আসে...রেণু ১২টায় এখানে আসে, সুরমার সঙ্গে কথা কয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যায়, আবার ১০টার পূর্ব্বে আসে। রাত্রিতে এখানে থাকে। আমি দুপুরে ভাত ও সুখতার রোল খাই, ২বার বালি, ১বার রোল, রাত্রিতে দুধভাত। যাদবনবাবু ২বেলা আসিয়া রেণুর খাতা ঠিক করিয়া দেয়। জ্যোতির্ময় লাহিড়ী ও টেক্স বুক কমিটী-র সেক্রেটারীর নিকট রেণু ফোন করে।...

২২শে মে

আজও সকালে উষা-রেণু-প্রতিভা প্রার্থনা করে। আজিকার আহারও গতকল্যকার মত...। ৮।০ টায় পর বিভা সরকার আসে...। সীতা যে ভারতীয় নারীত্বের শেষ বিগ্রহ নয়, রাধা না হইলে যে ভারতীয় নারীত্বের অপূর্ণতাই সূচিত হয়, রমণীত্ব ও মাতৃত্বের সমন্বয়ই যে পরিপূর্ণ নারীত্ব, ভারতবর্ষ যে জোর দিয়াছে মাতৃত্বের উপর এবং পাশ্চাত্য জোর দিয়াছে রমণীত্বের উপর এবং এদেশের বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন, 'রমণী জননী জননী রমণী'— ইত্যাদি কথা আলোচনা হয়।...

২০শে মে

আমি আজ সকালে ঠাকুর ঘরে গিয়া প্রার্থনায় যোগ দেই। সতীন সেন আসে। তাহার সঙ্গে যোগাযোগ আমি ও সত্যব্রত কথা বলি মধুর বিষয়ে।...মধুর কাছে আমি তাহার জীবনের পথ ঠিক করিবার কথা বলি।...

২৪শে মে

...'নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ৯টায় পত্র ফিরি।...

...সংসারের চিতর আদর্শ প্রতিষ্ঠার হড়াহড়িতে যেন আর পারিয়া উঠিতেছি না। ব্যর্থই কি হইলাম।... আমি ও প্রতিভা-রেণু একত্র ৯।০টায় আসি।...সকালের দিকে দুর্গামোহনবাবু ও নলিয়া আসে।...

সকালে 'সমগ্র দৃষ্টি' প্রবন্ধটা একটু লিখি। কুসুমের এক পোস্টকার্ড আসিয়াছে; তাহার জ্বর হইতেছে... ডাক্তারের ঔষধ খায় না,...সে এইরূপ নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন? আমার আর বেদনার অন্ত নাই। কি আর আমি করিব? অযাচিত কল্যাণ করিতে গেলে এই লাঞ্ছনাই প্রাপ্য। কিন্তু এ প্রকৃতি কি আর বাকী কয়টা দিনে বদলাইতে পারিব?...মধুর ব্যাপারেও লাঞ্ছিত হইতেছি। উহারা ব্যবসায়ী; ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিদ্বারাই উহারা পরিচালিত, আদর্শের বা জীবনের কোনও ইঙ্গিতের খবর উহারা রাখে না। উহাদের সঙ্গে আমার মিল হইবে কেন? ..আমি ভাবি রেণুর 'অরবিন্দ' হওয়ার কথা, মধু ভাবে বড় হইয়া এন, সি, রায় এণ্ড কোং-র ব্যবসা চালাইবার কথা। আমি পথাশ্রিত হইয়াছি, তবুও তো পথ চলিব। বেদান্তের তায় সত্যব্রতর উপর দিব

ভাবিয়া ছিলাম, সে তার সে না লইলে যেখানে ডুবাইয়া দিব ইহাও বলিয়া ছিলাম। কিন্তু ডুবানো তো হয় নাই। কেউ না হয় না করিল, আমি আপন মনে আপনার ছন্দে চলিয়া যাইব, যতটুকু পারি কল্যাণের পথ দেখাইয়া। আমি, প্রতিভা ও রেণু প্রায় ৬টায় আফিসে যাই।...রেণু প্রায় ৪টায় এখানে আসে। আবার আসে ১০টায়, এখানেই শোয়।...বিশ্বনাথ ব্রহ্মসূত্রের ২৲ টাকা দেয়, উজ্জলভারতের বাকি ২৲ টাকা দেয়।...

২৮শে মে

সকালে 'সমগ্র-দৃষ্টি' প্রবন্ধ একটু লিখি।...বিপ্লবী মনোবৃত্তি না থাকিলে, কোনও জায়গায় 'no' বলিবার সাহস না থাকিলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে থাকা ও সারাজীবন লাঞ্ছিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।...

২৯শে মে

...সকালে 'সমগ্র দৃষ্টি' প্রবন্ধটা একরূপ শেষ করি এবং দুপুরে প্রতিভা উহা নকল করে।...মৃত্যুঞ্জয় জানার এক পত্র লইয়া গঙ্গাপ্রসাদ মহাপাত্র আসে সেখানে একটি সভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইতে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমি যাইব না বলিয়া দেই। ৬টার পর ধীরেন ব্যানার্জ্জী আসে। সে তাহার দ্বিতীয়বার লেখা 'নিষ্প্রেরণা তথাকথিত' প্রবন্ধটী শুনায়। এবার পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা improve করিয়াছে।...প্রায় ৯টায় চাকুরিয়ার নকুলবাবু আসেন। তিনি এক ঘণ্টা থাকেন।...

৩০শে মে

ভোরে প্রার্থনার পর ৬-৫ মিনিটে মন্মথবাবুর ওখানে রওনা হই। যাইবার পথে অতীনবাবুকে ডাকি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাজার পর্য্যন্ত যান। তাহাকে ব্রহ্মসূত্র দিবার কথা বলি। ব্রহ্মসূত্র যখন বরিশাল বক্তৃতাপাড়ার বাসায় বসিয়া লিখিতে আরম্ভ করি, তখন একটী প্রার্থনাসভার অনুষ্ঠান হয়। আমি প্রার্থনা করি এবং অতীনবাবু লিখিবার কলমটা আমার হাতে দেন।...এই দিক হইতে উহা তিনি পাইবার অধিকারী। মন্মথবাবুর ওখানে এক ঘণ্টা থাকি। তিনি আমাকে মতের সম্বন্ধে যথাবর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া ঘুরে থাকিতে বলেন; যদি সে শরণাগত হইত, তবে হয়ত আমার উপর বর্ত্তাইত বটে। কিন্তু সে তো আমার উপর নির্ভর করে না। আমার একটী পাবলিক লাইফ আছে, যেটুকে নিয়া তাহার অভিভাবকরূপে দাঁড়ানো আইনসঙ্গতও হইতে পারে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগ্রত হইতে পারে, যাহা আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। মন্মথবাবু এইরূপই বলিলেন। আজ 'সমগ্র-দৃষ্টি' (synoptic vision) প্রবন্ধটা সম্পূর্ণ হয়।...দেহ-মন যেন শুষ্ক হইয়াছে, অথচ ছোটা দরকার। আমাকে যে 'উজ্জলভারত' লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে।...

...পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হইলে যেমন সব চেয়ে মেধাবী ছেলের আনন্দ, জটিল রোগী পাইলে যেমন কৃতী ডাক্তারের আনন্দ, জটিল আবেষ্টন-যুক্ত মানসিক রোগী পাইলেও তেমনি পুরুষোত্তম-উপাসকের আনন্দ। 'Every one is a pilot in a calm sea', কঠিনতম আবেষ্টনকে পরিপাক করিয়া, অধীকৃত করিয়া আগাইয়া যাইতে পারাই তো কৃতিত্ব। জটিল আবেষ্টনের সামনে দাঁড়াইতে না পারিয়া ছিটকাইয়া পড়ার মত দুর্ব্বলতা একজন পুরুষোত্তম-উপাসকের পক্ষে সাজে না। রেণুর সঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচনা হয় অনীতার ব্যাপার লইয়া। কেহ জ্ঞান-পূর্ব্বক বিধি মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, কেহ বা অজ্ঞান পূর্ব্বক যেমন বর্ত্তমানের কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন মেয়েরা। জ্ঞানপূর্ব্বক বিধি লঙ্ঘনকারীরাই পথ দেখাইবে ঐ সব জ্ঞানপূর্ব্বক বিধি লঙ্ঘন না করে যাহারা তাহাদের! কাজেই ইহাদের কত বড় সহিষ্ণু হইতে হয়। টুনকো মন লইয়া পুরুষোত্তম-সেবা হয় না। কত আঘাতই না জীবনে পাইয়াছি, সহিয়াছি, ঘুরে তো সরিয়া দাঁড়াই নাই। আজও তো সকল আঘাতের মাঝে যেখানের মানুষ সেখানেই দাঁড়াইয়া আছি। আমা হইতেও অধিকতর যোগ্য দেখিতে চাই

যাহারা আমার কাছে কাছে থাকে। নইলে অগ্রগমন সম্ভব হইবে কি করিয়া? ১টার পর আমি ও প্রতিভা ফিরি। ১০টার পর রেণু আসে। নবদ্বীপ হইতে অনরঞ্জন রায় এক পোস্টকার্ড লেখেন—৫ই বৈশাখ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু ও আমার বিপদের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া, ছয়েকমাসের উজ্জয়ন্তারত্তও চাহেন।

২রা জুন

সকাল ৮টার পর মলিনী তাহার এক পুত্র সহ আসে। সে রাখার জন্য আমার বাসায় গিয়াছিল।... আজ ওরা জুন বরিশালের বরদাকান্ত ব্যানার্জীর মৃত্যু দিবস, হরিদাস বাবুর বাসায় ৪টায় সভা। সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু শরীরের অসুস্থতাবশতঃ যাইব না ঠিক হয়। কিন্তু ৪-২০-তে মলিনা ও দিলীপ (সরলাবাবুর পুত্র) আসে। যাইতে বাধ্য হই। হাঁটিয়া সদানন্দ রোডের মোড় পর্যন্ত যাই। সেখান হইতে অক্ষয়বাবু, দুর্গামোহন বাবু ও আমি ট্যাক্সীতে সীতারুন যাই। সেখানে কামিনী গাঙ্গুলি, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা। সভায় গুণদা সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, জিতেন দত্ত, সুশীল দত্ত, মনোরঞ্জন মুখার্জী, তারক চন্দ্র, বিপিন দাস, হরিদাস মজুমদার, অতীন চক্রবর্তী, জিতেশ গুহ, সুধাংশু, কিছু মহিলা—সব শুদ্ধ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে সভাপতির কিছু বলার পর আমি প্রার্থনা করি, পরে দুর্গামোহনবাবু সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করে, পরে গুণদাবাবু, মনোরঞ্জন মুখার্জী, কামিনী গাঙ্গুলী এবং সর্বশেষে সভাপতি আবার বলেন। অক্ষয়বাবু সভাপতি ছিলেন। সভায় হেয়ার্স কর্মকার উজ্জয়ন্তারত্তের গ্রাহক হইতে প্রতিশ্রুতি দেয়।... আমাদিগের পক্ষে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া গতি নাই। তাহাতেই যদি শেষ রক্ষা হয়। তাহার সেদিন সত্যব্রতর সঙ্গে কথা হয়। আমি আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলাম না। রেণু ৯৪০টায় পর আসে, তাহার পরীক্ষার খাতা আর মাত্র ৯টি বাকি।...রেণু আজ আর সাধারণ আসে নাই। কাহারও কাছে যেন আর কিছু দাবী না করি।

৩রা জুন

রেণু এখান হইতে ৮টায় পর যায়।... জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত ৮টার সময় আফিসে আসিয়া ফিরিয়া যায়।... মন্ত তাহার ঘরে গিয়া সারাদিন কাঁদে আমার উপর অভিমান করিয়া। আমি আর কি করিব? আমি স্নেহহীন। সত্যই তো। জীবনে কাহাকেও আমি ভালবাসি নাই। তবে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি, তৃপ্ত করিতে পারি নাই।...৩টায় যতীন বাবু আসেন। তাহার সঙ্গে ধীরেনবাবুর লেখা 'নিস্ত্রৈগুণ্য তবার্জুন' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ত্রিগুণের মধ্যেই নিস্ত্রৈগুণ্য হইবার কথাই ভগবান বলিয়াছেন। অর্জুনের ক্ষেত্র রজোগুণের ক্ষেত্র, সেখানেই তাঁহাকে নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে হইবে। মোহের নির্ভশত্ব আমরা শিব-জীবনে সতীবিরহে আস্বাদন করিয়াছি। ভাগবত মতে 'কৈবল্যও নরকায়তে'। 'কৈবল্যং নরকায়তে'—প্রবোধানন্দ সরস্বতী। Law of excluded middle বর্জ্জনে অচল। 'How much' ব্রহ্ম এবং 'how much মায়া' প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে রহিয়াছে, তাহারই আজ বিচার করিতে হইবে। ৪৪০টার পর আমি রেণু আফিসে যাই। প্রতিভা পরে যায়। আজ রেণুর খাতা দেখা শেষ হয়।...

৪ঠা জুন

...ছেলেমেয়েরা বা যে-কেহ যদি বলে যে, আমি ভালবাসি না, তবে বলিবার আমার কিছু নাই। কেননা, যাহা দিয়া ভালবাসা প্রমাণ করা যায়, তেমন কিছুই আমি করিতে পারি নাই। তবে হৃদয় আমার সাক্ষী, আমি দৃষ্টি রাখিয়াছি, কল্যাণের পথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, আদর করিয়াছি। বড় বৌর কাছে সেই পূজার বেলায় করিয়া সত্যব্রত, নিত্যব্রত ও তুলারাম কাপড়ের জন্য কাঁদিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করি। ঠিকই তো, আমি কিছু করি নাই। চারু মহান্তির আবার একটী পোস্টকার্ড আসে; ২১।২২শের সভায় যোগদান করিতে পারিব কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। শরীর মন ও আবেষ্টনের যাহা অবস্থা তাহাতে সম্ভব নয়, উচিতও নয়। মন্মথ বাবুকে দিয়া উহা জানাইয়া দিব। কুসুমের কোনও চিঠি আসিল না। রেণু পোস্টাফিসে, ব্যাঙ্কে যায়, পরে কলিকাতায়

যায়। হিন্দুস্থান, বেঙ্গল বিস্কার্স, লেক ডিস্পেন্সিটের চেক লইয়া আসে। বেচে প্রায় ৩টায়। তার পেটের বেদনাটা বেশী।...৯টার পর আমি ও রেণু ফিরিয়া আসি। যাদবদাদা আসিয়া ২টা চিঠি মুসাবিদা করিয়া দেয়।...

৫ই জুন

সকালে রেণু এখান হইতে সিধা খাতাগুলি লইয়া শশীবাবুর বাসায় দিয়া আসে...রেণু দুপুরের পর আবার আসে...'মহৎ অতিক্রম' প্রবন্ধ আষাঢ় মাসের জন্য লেখে ও পড়িয়া শুনায়। আজ আর কলিকাতা যায় নাই। পোষ্টাফিস ও ব্যাঙ্কে গিয়াছিল মাত্র।...কোনও এক জায়গায় আমার দেহ রক্ষিত হয় এবং সেখানে কর্মকেন্দ্র, বিদ্যাকেন্দ্র ও ভক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠে—ইহা মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়। কেওড়াতলায় ছাই হইয়া যাইব, নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব, ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সব ইচ্ছাই তো মানুষের পূরণ হয় না। যেমন তেমন করিয়া কিছু করিবার ইচ্ছাও তো নাই। ৯টার পর আমি ও রেণু আসি।

৬ই জুন

সকালে রেণু মন্মথবাবুর কাছে যায়...রেণু সেখান হইতে হাঁটিয়া লেক মার্কেটে গিয়া পাট শাক ও আম (প্রতিভা ও এখানের জন্য) কিনিয়া এখানে দিয়া যায়। যাইবার সময় বৃষ্টি নামে। কলিকাতা ঘুরিয়া ৫টার পর আসে। ইহার পূর্ব্বে সুধাংশু আসে। সুধাংশু 'অথর্ববেদের উপযোগ' (যতীনবাবুর লেখা) পড়িয়া শুনায়, আনন্দবাজারেরও কিছুটা। আজ 'শিক্ষক' সমালোচনা লিখি, প্রতিভা তাহার নকল করে।...রেণু বোনেদের, বোম্বে মিউচুয়াল, কুসুম প্রোভাক্ট প্রভৃতি স্থানে যায়।...আমি ও রেণু ৯॥০টায় এখানে আসি।...আজ দুপুরে পাটশাকের ডাল খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়াছি; পাটশাক আমার বড় প্রিয়।...

৭ই জুন

সকালে সাময়িকী 'সংবিধান সংশোধন ও মৌলিক অধিকার' লিখি। কিন্তু পরেই জিতেন কুমারী আসে। আমার এখানে ও মন্থর কাছে থাকে। গত ফেব্রুয়ারীর দাঙ্গায় পীড়িত একটি মেয়ের কথা বলে। সে এখন উন্মাদ। সে একদিন জিতেনের গাড়ীতে জিতেনের আসনে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে। সে যাহাকে দেখে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'মাথা ঘাড়ে জোড়া লাগিবে তো'? তাহার ৩টী পুত্রকে তাহারই সামনে মুসলমানরা খুন করিয়াছিল। সেখানে অর্দ্ধ উন্মাদের সংখ্যা প্রচুর। জিতেন ব্রহ্মসূত্র নেয়, ৯টাকা+১৲ টাকা দেয়...১৲ টাকা মন্থর ফল খাওয়ার বাবদ। রেণু ব্যাঙ্ক হইয়া মেট্রোপলিটান, কীমার ইত্যাদি স্থান হইয়া ৩টার পর এখানে আসে।... বরিশালের লালু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা; সে এখানে আমার জন্য দাঁড়াইয়া।...আমি ও রেণু ৯টার পর আশ্রমে আসি।...

৮ই জুন

সকালে কুসুম ও নীলুর নিকট নিজের হাতে প্রায় ২ মাস পরে চিঠি লিখি। আমার হাতের চিঠি পাইবার জন্য উহারা অস্থির। আমিও উহাদের কাছে পাইবার জন্য কতই না ব্যাকুল, ঘুরে ঘুরে আর যেন থাকিতে বা রাখিতে ইচ্ছা হয় না। টালিগঞ্জের বাসা সম্বন্ধে প্রতিভার সঙ্গে আলোচনা হয়। তাহার উপরই নির্ভর! কাহারও 'আমি' লইয়া কাড়াকাড়ি করা আমার ধর্ম্ম নয়। তবে আমার ইচ্ছা আছে। 'কেবল' পুরুষের ইচ্ছা প্রকৃতি পূরণ করিলেই প্রকৃতির মুক্তি। নচেৎ প্রকৃতি নিজের মধ্যে নিজে পরিবর্ত্তিত হইলেও কেবলা হয় না।...রেণু ইণ্ডাষ্ট্রিতে যায় সকালে, ২টার পূর্ব্বে ফেরে। ২॥০টার পর এখানে আসে। ৪॥০টার পর রেণু সহ হরিদাসীর ওখানে যাই। তাহার নিকট আমার জন্য মাসিক কিছু দিবার কথা বলে। সে ৭টাকা রাজী হয়। রেণুর তাহার ভাইয়ের সঙ্গে থাকা সম্ভব হইবে না। অভিসের ও তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর খুঁজিতে বলা হইল। স্বতন্ত্র স্থানে নরনারায়ণ আশ্রমের কথাও হয়।...কুসুমকে আর ওখানে থাকিতে না দিয়া

এখানে আনার প্রস্তাব হয়। সুবোধের ঐ স্থানের উপর অভিমান টান। কিন্তু শরীরের অবস্থা, গোপা ও আমার কাছে কাছে থাকার লোভে হয় তো এখানে আসিতে চাহিলেও চাহিতে পারে। অফিসে যাই, ইতিমধ্যে প্রতিভা গিয়াছে। রাইহরণবাবু আসে। যাপনবাবু আসে, হিসাব ঠিক করে। আষাঢ় মাসের প্রথম বর্ষের প্রুফ দেয়। ১টার পর আমি ও প্রতিভা আসি। বিমুর একটা চিঠি আসিয়াছে…।

১ই জুন

…আজ সকালে প্রেসের অরুণবাবু আসিয়া প্রুফ নিয়া যায়। সে ব্রহ্মসূত্র ছাপাইবার জন্য কপি দিতে বলে। বলে সবটা ছাপাইতে ১০ মাস তো লাগিবে, তাহার মধ্যে টাকার বন্দোবস্ত হইবেই। কাহারও কাছে যেন থাকিব না। টাকার বন্দোবস্ত না করিয়া হাত দিব না। এখান হইতে বাহির হইয়া কোথায়ও আমার থাকার, আশ্রম করিবার ভাবনা ঠিক নয় বর্তমান পরিস্থিতিতে। একা ঝাঁপ দিলে কাজ হয় না। কাজ করিতে হইলে চাই একটি সঙ্ঘ তা যতই ছোট হউক না। প্রথম যখন নবনারায়ণ আশ্রম করি, সে-ও দুঃসাহসিকতার কাজ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেরা তিন জন, মেয়ে ও সর্বোপরি ছিল উষাদিদী। আমার শরীরও শক্ত ছিল। উষাদিদী এক দিক সামলাইয়াছে, ছেলেরা tour-এ সঙ্গে গিয়াছে ইত্যাদি। বিপ্লবও বুদ্ধিপূর্বক হওয়া চাই। 'অনপেক্ষ পৌরুষম্' বিপ্লব আরম্ভ করিলে তাহাও ব্যর্থ হয়। উল্কাগতায়ত যেদিন দাঁড়াইবে, সেই-দিনই বাহির হইবার পথ খুলিয়া যাইবে। ৯-৩০টায় রেণু আসে। আমি ও রেণু ৯টায় অফিসে যাই। যাপনবাবু আসিয়া ব্রহ্মসূত্রের হিসাবটা উল্কাগতায়তের সঙ্গে ঠিক করিয়া যেন।…এতগুলি বই রহিয়াছে, সম্পাদ তো কম নয়। কিন্তু এখানে থাকিলে সেগুলিকে বিক্রয় করাও সম্ভব হইবে না। এখান হইতে বাহির হওয়া আমার সকল দিক দিয়াই উচিত। কিন্তু সময় সাপেক্ষ। আর কি সময় পাইব? সময় যে শেষ হইয়া আসিল। অথচ কত কাজ রহিয়া গেল। উপনিষদের ভাষ্যগুলি ছাপানো হইল না, পাণ্ডুলিপিও সবগুলির লেখা নাই। কে করিবে এত কাজ?

১০ই জুন

রেণু সকালে সুবোধ যে-র বাড়ী যায়; ৬ জনের বাবদ ২৪ টাকার চেক আনে। সেখান হইতে টুইশনে যায়। বাসায় আসিয়া খাওয়ার পর আবার কলিকাতা যায়। এখানে আসে ৩১০টার পর।…সুধাংশু-ডাঃ কালীকিঙ্করবাবুর গীতার সত্যানুবাদ লইয়া আসে। পুরুষোত্তম যোগের শেষ অংশ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক, 'এবা ব্রহ্মবিদিতা' শ্লোকের অনুবাদগুলি ঠিক হয় নাই। আমার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দাঁড়াইলে যে-কেহ যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, লক্ষ লোকের মধ্যে একজন হইতে পারে, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি।… 'আমি ভালবাসি না'—ইহাই আমার উপর দুনিয়ার অভিযোগ। অথচ এইটেই বোধহয় সব চেয়ে মিথ্যা। আমি যে সত্য নির্বোধ, তাহা কেহ বলে না। সত্যাগ্রহীর পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার নাই। কেননা তাহাতে কতকগুলি ভালবাসার প্রমাণ-সূচক কাজের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু কাজদ্বারা কি প্রেমের প্রমাণ হয়? আর 'আমি ইহা করিয়াছি', 'উহা করিয়াছি' বলা কি অশোভনই যদি বলে, 'করিলেন কেন'? কি উত্তর দিবার থাকে? আমি অপরাধী—ইহাই আমার একমাত্র সমর্থন। সত্যই তো, যেমন করিয়া ভালবাসিলে ভাল-বাসার প্রমাণ মিলিত, তাহা তো পারি নাই। শক্তিতে আমি ছোট, শক্তি ভালবাসার পশ্চাতে না থাকিলে সে ভালবাসার প্রমাণ হয় না। ১টার পর আমি রেণু ও প্রতিভা আশ্রমে ফিরি।

১১ই জুন

…অফিসে বৈশাখ (১৩৫৮) মাসের শনিবারের চিঠি হইতে 'মানুষ যা চায়' প্রবন্ধটী রেণু পড়িয়া শুনায়। কেন

যাগিল, আমাদেরই কথা নূতন ৮:-এ বলা হইয়াছে।··· ১১·টায়ও পর আমরা ফিরি।

১২ই জুন

সকাল ৯টায় অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য···আসে।···তাহাকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ ও অপূর্ণ প্রবন্ধ পড়ানো হয়। সে পাঠক। সে যদি পুরুষোত্তম-দর্শন রীতিমত বুঝিয়া লইত, সে অধিতীয় হইতে পারিত, জীবনও ধন্য হইত। সে বিনয়ী। ব্রাহ্মণত্বের অভিমান তাহার নাই। বিপ্রত্বের জন্য সাধনাও সে করিয়াছে প্রচুর। আমি তাহাকে আপন মনে করি—ইহা তাহাকে বলি। সে রক্তসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ড নেয়। ৩।৪ দিন পরে টাকা পাঠাইবে। ১১·টায় সুধাংশু আসে। তাহার পর রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া আসে। সুধাংশু তাহার লেখা কবিতা শুনায়। সে কিছু ন্যাপার লেখে। মানুষের সব বৃত্তিই দুইটী বস্তুকে লইয়া প্রকাশিত হয়—কাম প্রকাশ পায় নর ও নারীকে লইয়া। এতদিন চেষ্টা চলিয়াছে নারীকে ঘরে ঘরাইয়া নিষ্কাম হইতে। এখনও তাহা সম্ভব হয় নাই। নারীর তরফ হইতে প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে প্রচুর। নর নারী যদি প্রাণখোলা, মন খোলা হইয়া পারস্পরিক মর্যাদা রক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়, কাম কি, কামে নর ও নারী কাহার কোথায় কেমন করিয়া মর্যাদার হানি হয় ইত্যাদি আলোচনা করে, তবেই কাম-সংযমের অকাম হইতে পারে। মহর্ষিদেবের মধ্যে এই প্রচেষ্টাই চলিয়াছিল। রাসলীলার গূঢ় প্রয়োজন ইহা। কিন্তু মহর্ষিদেবের সাধনার মধ্যে মানুষের বিষয়রূপের দিক, বিষকর্মের দিক আস্বাদিত হয় নাই বলিয়া তাহা সার্বজনীনভাবে আস্বাদিত হয় নাই। উহা নিছক ব্যক্তিগত হইয়া গিয়াছে।···জীবনে যতদূর পারিয়াছি সকলের দৃষ্টি আমার পথের দিকেই পরিচালিত করিতে চাহিয়াছি, সেইজন্যই আমি আজ মুক্তিমুক্ত, একা। সকলকে যার যার নিজস্ব সাধনার দোপাতার ফুলের মত ফোটা করিয়াছি। আমার কাছের সংস্রবের অভ্যাস চলিয়াছে বৈশব হইতে। তাহার ফল ভাগাভাগি। তাহা সহিয়াই চলিয়াছি। দিয়াছে কাহারও দিকে টানা নাই। শুকতারাদের মঠ করিয়াছেন, আমার লোভ হয় নাই। আমি আমি, তাহারা তাহারা। পরিমল মৈত্র রক্তসূত্র বাবদ ৯টাকা দেয়। ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। ১১টায় পরে আমরা ফিরি···।

১৩ই জুন

সকালে শ্রাবণ মাসের প্রবন্ধ 'কৃষিসেনা'র পঠন করি। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ৩রা জুনের বক্তৃতা উদ্ধৃত করি। যাহার সঙ্গে ঝগড়া, তাহার সঙ্গে বসিয়াই ঝগড়ার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। নচেৎ ঝগড়ার সত্যিকার মীমাংসা হয় না। এতকাল সব বিরোধী পক্ষকে শুদ্ধ করিয়া অবিরোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে; বেদান্তের ভাষ্যকারেরাও এই পথ ধরিয়াছেন। আমি চলিয়াছি স্বতন্ত্র পন্থা ধরিয়া। সমন্বয়ের মধ্যে পক্ষ-প্রতিপক্ষকে যথা যথা বৈশিষ্ট্য সহ মিলাইতে হইবে—ইহাই আমার সাধনা। কাহারও জন্য দুয়ার বন্ধ থাকিবে না—কি বাহিরে যাইতে বা বাহির হইতে ঘরে প্রবেশ করিতে। যাহারা অত্যাচারী তাহারা দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘরে থাকিতে চায় এবং বাহির হইলে আর ঘরে নিতে চায় না, যেমন মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষদের ব্যবস্থা। এবং ইহাকেই ইহারা বলিয়াছে 'প্রেম'। ঘরে থাকায়, বাহির হইবার বা বাহিরে গেলে আবার সসম্মানে ঘরে আসিবার সুবিধা মেয়েদের নাই। আমি এমন পরাধীন করিয়া মানুষকে রাখিতে চাই না বলিয়াই মানুষ আমার উপর অবিচার করে। যাহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকের জন্যই তো আমার দুয়ার খোলা রহিয়াছে। আমার আকাশধর্ম। ভালবাসে এবং ভালবাসে না—এই দুইয়ের যাহার সম্বন্ধে সত্য, তিনিই সত্য ভালবাসেন। প্রজ্বলিত ভালবাসার মূলে রহিয়াছে 'রাগ', না-ভালবাসার মূলে আছে 'দ্বেষ'। সত্য প্রেম রাগদ্বেষবর্জিত। রেণু ৬টায় কলিকাতা হইতে ফেরে। মন্মথ রায় ও অমল হোম গ্রন্থনবার জন্য নিবেন। 'আনন্দ প্রাপ্তি' প্রবন্ধ সুধাংশু রায়ের খুব ভাল লাগিয়াছে। মন্মথবাবুর নাতনী গ্রাহক হইবেন। আমরা ৬টায় আফিসে যাই। ৮টায় উপর প্রামাণিক তাহার এক বন্ধুসহ আসে। তাহাকে

'আনন্দ প্রেস্টি' যেন পড়িয়া শোনায়। বয়া আসে ৮টায় কিছু আগে।...

১৪ই জুন

নীলুর একটা চিঠি আসে। তাহার ম্যাট্রিক পড়ার উদ্দেশ্য অর্থাগমের সুবিধা নাকি, নিছক আত্মতৃপ্তি নয়—ইহাই সে জানাইয়াছে। মেয়ে নষ্ট করিয়া পড়িবার লোভ তাহার নাই। অর্থাগম নিশ্চয়ই জলপাইগুড়িতে সম্ভব নয়, তাহা হইলে কলিকাতা নিশ্চয়ই আসিতে হইবে। ওদিকের সকল অসুবিধা কাটাইয়া সে যদি আসিতেই পারে, তবে এখন আসিলে সে তো উজ্জয়িনীর কাজই করিতে পারে। সে যদি আসিয়া উজ্জয়িনীর ভার লয়, উজ্জয়িনী হইতে তাহাকে এখনই তো কিছু দেওয়া যাইতে পারে, তাহার ম্যাট্রিক পড়াও সম্ভবপর হয়। সে আসিলে তাহার সঙ্গে আমরাও বল পাইব, উজ্জয়িনীও তাহার পথে যথেষ্ট আগাইয়া যাইতে পারিবে। সকলেরই এখন আসিয়া জড় হওয়া উচিত।... উজ্জয়িনীকে আমরা করিয়া যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে সকলে মিলিয়া কর্ষণ করিলে যথেষ্ট ফল ফলিতে পারিত।... রেণু আসে ৩টায়। প্রতিভা ৪টায় টালিগঞ্জে যায়। আমরা ৬টায় আফিসে যাই। বীরেন গ্যানার্জী ও নকুলবাবু আসেন। 'নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জুন' আবার পাঠ হয়, নিয়া আসি। নকুলবাবু বেশীরকম নির্বিশেষের উপর জোর দেন, তাহার কারণ তাঁহাদের মতবাদে ওপ-কোশীয় আছে। সমতল কুলীন হইলে নির্বিশেষ সবিশেষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেই। বীরেন চৌধুরীর কাছ হইতে খবর পাইয়া একটী যুবক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে। তাহার সঙ্গে কম্যুনিজম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। Class ও mass-এর dialectic-এর মোহে তাহারা পড়িয়াছে। How much class, how much mass প্রতি মানুষে আছে তাহাই বিচার্য। একান্ত mass নাই, একান্ত class-ও নাই। Law of excluded middle কম্যুনিজমকে বিপন্ন করিবে। ৯টায় পর আমি প্রতিভা যেণু আসি।

১৫ই জুন

সকালে বেশ বর্ষা। আজ দেশবন্ধু ও আচার্য রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী। দেশবন্ধুর স্মৃতির জন্য কেওড়াতলায় সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সন্ধ্যায় কীর্তন। রেণু প্রেসে দ্বিতীয় ফর্মের দ্বিতীয় প্রুফ দিয়া আসে। প্রেস হইতে বাসায় গিয়া খাইয়া ২টায় এখানে আসে হিসাবের খাতা লইয়া। মৃণালও আসে। টালিগঞ্জের একটী ছেলে আসে স্বপ্ন ও কল্পনা কি তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য।...মাখনবাবু আসেন, যতীশবাবু আসেন। যমুনা এক চিঠি দিয়াছে... কাহাকেও কিছু বলিবার যো নাই, কেহ কিছু বলিবেও না অথচ দায়িত্ব আছে বলিয়া করিতেও হইবে আমাকে—এমনই একটী অসহায় অবস্থার মধ্যে আমি আছি। দায়িত্ব নাই বলিলেই তো দায়িত্ব যায় না। দায়িত্ব যে স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে বর্তায়। অথচ মানুষ সহযোগ করিবে না।...ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়নের এ্যাকাউন্টে আমার proprietorship থাকিবে না। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদিকা এই দুই নামে এ্যাকাউন্ট থাকিবে। তাহা হইলে আমি মরিয়া গেলে succession certificate ছাড়াই যেণু operate করিতে পারিবে। Succession certificate নিয়ার পরে কাজ করিতে হইলে কাজ অচল হইবে।

১৬ই জুন

সকালে বাহির হইয়া রেণু প্রকাশ সরকার, হরেন বসু প্রভৃতির বাসায় যায়। প্রকাশের টাকা পাই, সেখানে আবার গিয়া নিমন্ত্রণও খাই। দুপুরের পর এখানে আসে। নীলুর নিকট লেখা হয়, কলিকাতায় আসিয়া উজ্জয়িনীর ভার নিলে কিছু কিছু দেওয়াও যাইতে পারে, ম্যাট্রিক পড়াও চলিতে পারে। সুবোধের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বলা হইল। আমাদের সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের পার্থক্য এই যে, আমরা অবিদ্যাকেও ভগবানের পারমার্থিকী শক্তি বলিয়া মনে করি। বৈষ্ণব দর্শন বিদ্যাশক্তিকেই ভগবৎশক্তি বলেন, গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি সেই বিদ্যাশক্তির প্রকাশ। ইহাতে 'লীলা' আর এ জগতের মধ্যে থাকে না, লীলা হয় transcendental, অথচ চিন্ময় জগৎ, চিন্ময় মাটি পরস্পর বিরুদ্ধ। ইহার

কোনও মীমাংসা না দিতে পারিয়া ইহারা 'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা' শ্লোক বলিয়া পরস্পরবিরুদ্ধতার প্রশ্ন চাপা দেন। বর্ত্তমান যুগে Law of Excluded Middle যে অচল, ইহা সে যুগে ধরা পড়ে নাই। আমাদের মতে বিদ্যাও ভগবানের পরকীয়া শক্তি, অবিদ্যাও। বৈষ্ণব-দর্শন কর্ম্মের অনন্তত্ব স্বীকার করে না বলিয়া কর্ম্মত্যাগের পরে গোলোকে যাইতে হয়। এ সম্বন্ধে তাহারা মায়া-বাদীদের সঙ্গে একমত। শুধু মায়াবাদীদের ব্রহ্ম নির্বিশেষ আর ইহাদের ব্রহ্ম নাক চক্ষু-মুখওয়ালা। ইহাদের প্রেম বৈকর্ম্ম্য, যেমন মায়াবাদীদের জ্ঞান নৈকর্ম্ম্য। * কর্ম্মক্ষেত্র দুইয়ের দৃষ্টিতে বন্ধন। তবে বৈষ্ণব দর্শন মায়াবাদের পর "one step further" পা বাড়াইয়াছে। কিন্তু অবিদ্যাকে প্রাণ খুলিয়া স্বয়ংমূল্য দিতে না পারার ফলে তাহারা মায়াবাদের ফলেই driven হইতেছে। অবিদ্যাকে স্বীকার করিলেই 'অবতার'বাদের অর্থ পরিস্ফুট হয়। ৬টায় আমি ও রেণু আফিসের জন্য বাহির হই। পথে বৃষ্টি আসে। সদানন্দ রোডের মোড় হইতে বিকাশ যাই। আমি সকালে ২য় ও ৩য় বর্ষের উদ্যমকারতের হিসাব দেখি। অনেকগুলি ভুল—প্রায় ৫.৬ শত টাকার খরচের দিকে না লিখিবার ভুল—ধরা পড়ে। মাখনবাবুকে সেগুলি রেণু সন্ধ্যায় পড়াইয়া দেয়। প্রতিভা প্রায় ৮টায় আফিসে যায়। আমি প্রতিভা ৯টায় আসি। রেণু ১০টার পর আসে। অত রাত্রিতে বৃষ্টির মধ্যে, নির্জনতার মধ্যে আসিবে বলিয়া ভয় হইতেছিল।

১৭ই জুন

সকালেই রেণু চলিয়া যায়। প্রতিভার সঙ্গে কথা হয়। যাহারা কেবল অভিযোগ করে, তাহাদের দৃষ্টি নিজের যাহা সত্যকার সম্বল আছে—হউক তাহা কাণা-কড়ি—যাহা হইতে রওয়ানা হইলে সে যে কোনও উৎকৃষ্ট পরিণতিতে পৌঁছাইতে পারিত, যেমন আমার অভিপতি তারাপ্রসন্নবাবুর অবস্থা, তাহার দিকে আদৌ দৃষ্টি থাকে না। আশে পাশে না তাকাইয়া মানুষের সত্যই যাহা আছে, তাহা হইতেই যাত্রা সুরু করিতে হইবে। তবেই সফলতা মিলিবে। যমুনাও অভিযোগ করে, মনুও অভিযোগ করে। যমুনাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য অনেক কিছু বলা হইয়াছিল। আমি ৮টার পর দীনেশ রায়ের ওখানে যাই। দীনেশ-রায় মেসে গিয়াছে।···রেণু কলিকাতা হইয়া···এখানে আসে ২টার পর। যতীনবাবু আসেন।···'অথর্ব বেদের উপযোগ' সম্বন্ধে কথা হয়। 'অসুর' শব্দটি বেদে নিন্দাবাচক নহে, উহা laudable। ইন্দ্রকেও বেদে 'অসুর' বলা হইয়াছে। পার্শীরা উপবীত নেয়, তাহাদের মন্ত্র 'যেথান্ ইনাম্'। যতীনবাবুকে অসুররা যে laudable, তাহার যুক্তি দেখাইয়া একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলা হয়। আমি ও রেণু আগে অফিসে যাই···।

১৮ই জুন

সকালে হিসাবটা আবার একটু দেখিবার চেষ্টা করি। কিন্তু সুবিধা পাইলাম না, চেক বই দরকার। 'ভূমিসেনা' প্রবন্ধটি লিখিতে আরম্ভ করি।···রেণু সকালে বাহির হইয়া সরোজ মাইতী ও যেমন্ত ঘাসের টাকা সংগ্রহ করে। পোষ্টাফিস ও ব্যাঙ্ক হইয়া কলিকাতা যায়। অমল ঘোষ ব্রহ্মসূত্রের টাকা দেয়···। রেণু এখানে আসে ২টার পর ···আমি রেণু প্রতিভা ৬টায় বাহির হই।···পথে যাইতে যাইতে আলোচনা হয়—এখানেই সূত্রপাত হইয়াছিল—রেণুর জীবনে এমন একটী সমগ্রভাব থাকা দরকার, যাহা না হইলে সঙ্ঘ গড়িবে না। সে তো কাহারও প্রতিপক্ষ নয়। তাহাকে যে উৎ-আসীন হইতে হইবে। পক্ষ-প্রতিপক্ষের উপরে সকলের সব বরদাস্ত করিয়া, অথচ কাহারও সঙ্গে জড়াইয়া না পড়িয়া সকলকে আবরিয়া চলিতে হইবে। আমি তো এই পথে চলিতে চাহিতেছি বলিয়া কেহ আমাকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই। অবশ্য সকলকে পাই নাই—এ কথা সত্য। 'যদি তে ন চাহুঃ তেষবস্থিতঃ'—এই ভাব লইয়া ভালবাসিয়া চলিতে হইবে। আমার সঙ্গে যাহারা আছে, সকলেরই তো এইভাবে সাধনা করা দরকার। না হইলে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে কি করিয়া। চলিয়া যাইবার দুঃখ যদি আমার না থাকিত, তবে এখনও কেন তাহাদের প্রসঙ্গ তুলিয়া বেদনা বোধ করি? ছাড়িলেই যাহারা ছাড়িয়া দিতে পারে, তাহাদের সঙ্গ হয় না। আমি ও প্রতিভা ৯টার পর চলিয়া আসি। রেণু কাল হইতেই আর রাত্রিতে এখানে শোয় না। *

১৯শে জুন

ক্রমশঃ

---

* আষাঢ় ১৩৬৯ (পঞ্চদশ বর্ষ) সংখ্যার ১৯৫০ সন শেষ হইয়া ১৯৫১ আরম্ভ হইয়াছে, শ্রাবণ হইতে ১৯৫১ লিখিতে হইবে, কিন্তু আমার ভুলে উহা ১৯৫০ই লেখা হইয়া আসিতেছে। এজন্য পাঠকগণের নিকট মার্জনা চাই।—সঃ উঃ।

পুস্তক পরিচয়

ভারতে শক্তি সাধনা প্রথম খণ্ড—শ্রীঅমূল্যনাথ চক্রবর্তী, মূল্য ৭৲ টাকা; পৃষ্ঠা ৩৮৭। প্রকাশক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ২৩৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পরিবেশক এস, সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা ১২।

'ভারতে শক্তি সাধনা' বইখানি দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। বইখানি বিদ্বজ্জনদ্বারা প্রশংসিত। ইহার পরিচিতি দান করিয়াছেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, ডি-লিট মহাশয়, ভূমিকা লিখিয়াছেন ডক্টর যোগেশ চন্দ্র বাগল তর্ক-বাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ডি-লিট মহাশয়। বইটি চারখণ্ডে সমাপ্ত হইবে—প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে! প্রথম খণ্ডে শাস্ত্রে শক্তি সাধনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পরবর্তী খণ্ডগুলির আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ—

দ্বিতীয় খণ্ড—মহাশক্তির স্বরূপ ও মহিমা, তন্ত্রসাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদাবলী ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ড—শক্তি সাধনার ইতিহাস, তান্ত্রিক সাধক ও আচার্যগণের জীবনী ও একান্নপীঠ শক্তিপীঠের আলোচনা।

চতুর্থ খণ্ড—বঙ্গ, দর্শনে শক্তিতত্ত্ব, কাশ্মীরীয় শৈবাগম, দক্ষিণ শৈবাগম, ত্রিপুরারিতত্ত্ব ও উপসংহারে সমন্বয়ের আয়োজন।

প্রথম খণ্ডটিতে বিভিন্ন শাস্ত্রে শক্তি-সাধনা আলোচিত হওয়ার আগে লেখক শক্তির স্বরূপ—বিজ্ঞানে শক্তির স্বরূপ, ষড়্দর্শনে শক্তির স্বরূপ, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ', কিংবা 'শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্ন'। দৃষ্টিভঙ্গিটি ভাল লাগিল। বইখানি দীর্ঘ দিনের কঠিন শ্রমের ফল এবং তাহা গভীর গবেষণা প্রসূত। ইহা বুঝিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতেও কেবল শ্রম, অভিনিবেশ ও সময়ই লাগিবে তাহা নয়—বিদ্যারও প্রয়োজন। কেননা বইটি অনেক বিদ্যার ফল। আমরা মূর্খ, বইখানি হৃদয়ঙ্গম করিবার মত বিদ্যা নাই—তথাপি যে দৃষ্টিভঙ্গি এই সমস্ত রচনাকে প্রণোদিত করিয়াছে, সে দৃষ্টিভঙ্গিটি ভাল লাগিয়াছে। সেই ভাল লাগা দিয়া অপণ্ডিতও বইটি পড়িবে—ইহা বুঝিতেছি, পণ্ডিতেরা তো করিবেনই। আমরা পরবর্তী খণ্ডগুলির অপেক্ষায় থাকিলাম। ভারতবর্ষের সাধক কত রকম ভাবেই না জীবনের আস্বাদন করিয়াছেন—তাহারই এক দিকের ইতিহাসও যে কত বিচিত্র—বইখানির মধ্যে তাহার সুন্দর নিদর্শন আছে। আমরা অনুসন্ধিৎসু ও চিন্তাশীল পাঠককে বইখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এটুকু বলিতে পারি, পাঠক আনন্দও পাইবেন, জ্ঞান অর্জনও করিবেন।

সাময়িকী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মোৎসব ঃ উন্মাদাবাস এবং নয়নারায়ণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের তত্ত্ব অধিতিথি অমতিথি-গিয়াছে বিগত ৩০শে কার্তিক ১৩৬৯, শুক্রবার (ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৬২) কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে। ঐদিন শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের সমাধিস্থান নয়নারায়ণ আশ্রমে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবনদেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেব (যোগাচার্য শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেব)-এর বিশেষ পূজা করিয়া আশ্রমবাসীরা অঞ্জলি প্রদান করে এবং এই উপলক্ষে ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯ রবিবার (১৮ই নভেম্বর) সর্বসাধারণের সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের শিষ্য ভক্ত ও গুণগ্রাহীবৃন্দ উৎসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। রবিবারও শ্রীনিত্যগোপালদেবের বিশেষ পূজা ও অঞ্জলি প্রদান করা হয়। সকালে বালা-ভোগের প্রসাদ প্রায় তিন শত জনকে দেওয়া হয়। তারপর দ্বিপ্রহরের ভোগের পর প্রায় হাজার খানেক লোক খিচুরী প্রসাদ পাইয়া থাকেন। অতঃপর বিকাল ৪৷৷০ টায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের তথা শ্রীনিত্যগোপালদেবের জীবন-দর্শন আলোচনা করিবার জন্য এক জনসভার অধি-বেশন হয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে ভালবাসেন এমন অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণও অনেক উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিশু ও বড় মিলাইয়া প্রায় শ' পাঁচেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কয়েকজন শ্রীমৎ স্বামিজী সম্বন্ধে বলেন। লিখিত প্রবন্ধ কবিতাগুলি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হইল। ইহা ছাড়া বন্ধুবর শ্রীচুনীলাল মিত্র শ্রীমৎ স্বামিজী সম্বন্ধে কিছু বলেন।

এ বিশেষ দিনটিতে নয়নারায়ণ আশ্রম পরিচালিত নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নব নির্মিত গৃহটির উদ্বোধন করেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষার ডেপুটি চিফ ইন্সপেকটর শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলেন। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা কিছু আবৃত্তি গান করে। সভা-শেষে সকলকে লুচি দিয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। স্থানীয় জন-সাধারণ এবং দূরবর্তী বন্ধুবান্ধবগণের সহযোগিতায় সারা-দিনের অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যাওইআটি গ্রামে নয়নারায়ণ আশ্রম স্থাপিত হইবার বহু পাঁচেক আগে তাঁহার দিন-লিপীর একস্থানে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'আমার দেহ কোন এক আয়গায় রক্ষিত হয়, এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞান কেন্দ্র, ভক্তিকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র গড়িয়া উঠে, ইহা মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়।...কিন্তু সব ইচ্ছাই তো মানুষের পূরণ হয় না'। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ছিলেন না এবং কোন ব্যক্তিগত সুখ কোনের কামনাকেও বরণ করেন নাই—তাঁহার মধ্যে দিয়া বর্তমান যুগ-ধর্মের একটা দার্শনিক রূপ ও পথরেখা জনসাধারণের নিকট অঙ্কিত হইয়া যাইবে—ইহাই তাঁহার জীবন-ধারণের প্রয়োজন ছিল—তাই তাহারই ক্রম পরিণতিতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ইচ্ছা সফল হইতেছে দেখা যাইতেছে। শ্রীনিত্যগোপাল ও শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের ইচ্ছা অমরুক, হউক—আমরা তাঁহার ইচ্ছাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি, আজ এই দিনে তাঁহাদের নিকট এবং সর্ব মানুষের নিকট এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

সর্বসাধারণের সহযোগিতায় শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ইচ্ছা রূপ লইতেছে, তাই সর্বসাধারণের কাছে আমরা এই দিনে একটি বিশেষ আবেদন জানাই। স্বামিজী লিখিত পুস্তকগুলি সর্বসাধারণের ঠিক বোধগম্য না হইলেও এগুলি চিন্তার রাজ্যে, সমস্ত জগতের দার্শনিক ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ। বিশেষ মনীষীবৃন্দ একদিন এ জিনিষ পাইয়া

খুশী হইবে, সমস্ত মানুষের একটি বিরবপূর্ণ শোভনতম সামগ্রিক দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য এ এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এখনও অনেক বই প্রকাশিত হইতে বাকি। সকলের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, গ্রামিন্দীর বইগুলি প্রকাশ করার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হইয়া আসুন। ইহা জাতীয় সম্পদ। শক্তিবন্ধ সরকারের নিকট আমরা আবেদন করিয়াছি, সর্বসাধারণের নিকটও সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি—বইগুলি শীঘ্র প্রকাশিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন! জন্য শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের জন্য, জন্য শ্রীনিত্যগোপালের জন্য!

শরৎকুমারী পাঠাগার: ব্যক্তি ও জাতির জীবনে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা আমরা যে একটু একটু বুঝিতেছি, তাহার একটি পরিচয় পাইয়া খুশী হইলাম। মেদিনীপুর জেলার খাদুলীবাসিত গ্রামে (পোঃ কলগ্রাম) শরৎকুমারী পাঠাগার বলিয়া কিছুদিন হয় একটি পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্যোক্তা কয়েকটি যুবক: গ্রন্থাগারাধ্যক্ষের নাম অবনীরঞ্জন দাস অধিকারী, সহ-গ্রন্থাগারাধ্যক্ষের নাম বিশ্বরঞ্জন দাস অধিকারী। ইহাদের উদ্যোগ আনন্দদায়ক। ইহারা অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিকে সভাপতি সহসভাপতি কিংবা পৃষ্ঠপোষক করিয়াছে বটে, তবে তাঁহারা যে কেবল নামে মাত্র, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইহারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হইলেও যে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহশীল এবং জনসাধারণকেও সেদিকে আকর্ষণ করিবার মনে লইয়া একটি কর্মপ্রচেষ্টায় প্রবৃত্তমান, ইহা দেখিয়া আনন্দ হইল। ইহাদের পাঠাগার এখনও ছোটটি, তবু দেশের সর্বত্র এইরূপ প্রচেষ্টা থাকিলে যুবকেরা যতটা সময় অশোভন ব্যর্থ আড্ডা দিয়া সময় কাটায়, তাহার পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

পাঠাগারটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহাতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তাহারা ১৬ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছে—উহাতে কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর সারগর্ভ কয়েকটি উক্তি সহ রবীন্দ্রপরিচয় হিসাবে কবির জীবনের কয় ঘটনা তারিখ সহ উল্লেখ করিয়াছে। কেবল রবীন্দ্র জীবনের ঘটনাই উল্লেখ করে নাই, পাশে পাশে সমকালীন ঘটনা বলিয়াও কয় ঘটনা উল্লেখ করিয়াছে। মাত্র পৃষ্ঠা ধরিয়া এই ভাবে কবি পরিচিতি এবং কয় সমকালীন ঘটনা পাঠকের সামনে উপস্থিত করিয়া শেষে কবির একটি সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় দিয়াছে। জিনিষটা বেশ ভালই লাগিল। সেই সঙ্গে শরৎকুমারী পাঠাগারের বিস্তৃত বিবরণও দিয়াছে। ইহাতে পাঠাগারের বিজ্ঞাপন যেমন হইয়াছে, তেমনি কবির জীবনের ও সমসাময়িক ঘটনাবলী সকলের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক হইয়াছে। তবে উদ্যোক্তারা যদি পাঠাগারের সংবাদগুলি আগে না দিয়া রবীন্দ্রনাথের সংবাদগুলি আগে দিয়া পরে পাঠাগারের সংবাদ দিতেন, তাহা হইলে উহা আরও শোভন হইত। আমরা গ্রন্থাগারটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

শ্রীযুক্ত মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অধিমীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইন্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

"আমি বিশ্বনাগরিক।"

"নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়।
জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার
সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়।
সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়।
জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-
অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-
অদ্বৈত সমন্বয়।
সর্ব্ব সমন্বয়।"

—শ্রীবিত্যাগোপাল—

ঐতিহাসিক সংখ্যা ১৮৮৪, ১৩৬৯ সম্পাদিকা—শ্রীরেণু মিত্র এম, এ পঞ্চদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে কেহ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পার্থক্য দেখে নাই। কেন আমরা রাষ্ট্র-ধর্ম্মের ভেদের কাটলে আটকাইয়া পড়িব? একই অখণ্ড জীবনের দুইটি স্বয়ংমূল্য আস্বাদন—ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র। ধর্ম্ম আস্বাদন করায় জীবনের অতিগ (transcendential) দিক্, রাষ্ট্র করায় জীবনের অনুগ (immanent) দিক। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি, রাষ্ট্রপতি দুইই। তাইতো তিনি জীবন-বল্লভ। শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষে একান্ত ধর্ম্ম বা একান্ত রাষ্ট্র অচল। যিনি 'মৃত্যুঃ ভোজপতেঃ' (ভোজপতি কংসের মৃত্যু) বলিয়া রাষ্ট্রপতি, তিনিই ধর্ম্মপতিরূপে 'তত্ত্বং পরং যোগিনাম্' (যোগিগণের পরতত্ত্ব কৈবল্য)।

শ্রীপুরুষোত্তমপ্রবন্ধ

প্রার্থনাপরায়ণ ভাবণ ৩৬২
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
চীনা পরিব্রাজকদের ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা
অধ্যাপিকা অরুণিমা দাস
যৌবনের গান (কবিতা)
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
শিক্ষায় বিভিন্ন সম্ভাব্য মাধ্যম (২)
অধ্যাপিকা মীরা রায়
পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্র-মানস
শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী (১৯৫১) ৩৬৬
সাময়িকী : যুদ্ধ ও সাধু

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

নিবে কালি শুকায় না,
কিন্তু কাগজে দ্রুত শুকায়।

রঙের যথেষ্ট গভীরতা, তবু
অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

সুলেখা কালি

• • • অন্য কোন কারণে না হলেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে • • •

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

বিজ্ঞপ্তি

উজ্জ্বলভারতের পঞ্চদশ বর্ষ শেষ হইল। গ্রাহকদিগের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন শীঘ্রই ষোড়শ বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা পাঠাইয়া দেন।

ইতি
কার্য্যাধ্যক্ষ, উজ্জ্বলভারত
গ্রাম : বাগুইআটি
পোঃ : অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

উদ্বোধন

পৌষ, ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ ১৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

প্রার্থনাকালীন ভাবণ

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত—

(১৭)

ইন্দ্র বরুণ ব্রহ্মা—এরা সব আধিকারিক দেবতা। ইন্দ্রের অধিকার জল দেওয়া, ব্রহ্মার অধিকার মানুষের বুদ্ধি বাড়লে দেওয়া—এরা সব কুকর্ম অবজ্ঞা করলেন—নজরে চুরী করলেন।...ক্ষমতা হাতে পেলে সকলেরই মাথা খারাপ হয়—...মানুষকে শোষণ করে, তখন বিদ্রোহ বিপ্লব হয়। তারা এই ভাবেই তাদের নিজেদের অধিকার নষ্ট করেছে—শিবরাও যদি নিজ অধিকার ডিঙিয়ে যায়, তবে পুরুষোত্তমের কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে...। কথা আছে সমুদ্র কখনও তার বেলাভূমি লঙ্ঘন করে না—তোমরা কেউ নিজেদের অধিকারের অপব্যবহার করো না...প্রত্যেকে যদি অধিকার রক্ষা করে চলে তবে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা হয়।...যার যা অধিকার তাই দিয়েই তুমি ভগবত সেবা কর...কারো উপরে রান্না করবার, কারো উপরে বাগান করবার, কারো উপরে বই লিখবার, কারো উপরে বই পড়বার ভার। তোমার অধিকারে তুমি স্থির থাক...। মহাপ্রভু সম্বন্ধে কথা আছে—মর্যাদালঙ্ঘন প্রভু না পারেন সহিতে...। পিতার অধিকার পিতা রক্ষা করুন, পুত্রের অধিকার পুত্র। প্রত্যেকে তার তার অধিকার নিয়ে যদি ভগবানের, সমাজের সেবা করে, তবে সেই তার গুণ। চোখের অধিকার আর কানের অধিকার এক নয়—কারো অধিকার কর্মে, কারো অধিকার জ্ঞানে—যার যার অধিকার নিয়ে সে সেবা করুক। অবশ্য কর্মী জ্ঞানী হবে না, জ্ঞানীর কর্ম থাকবে না, তা নয়, তবে এক একজন এক একটা ঝোঁক নিয়ে জন্মায়—সেইজন্য কেউ জ্ঞান-প্রধান কর্মী, কেউ কর্ম-প্রধান জ্ঞানী—সকলে সবটায় মধ্যে হুটোপাটি আরম্ভ করলে সেটাতে সুখ কিছু গড়ে ওঠে না। নিত্যগোপাল করুন আমরা যেন প্রাণের পথে চলি।...

২২. ৬. ৫৬। ['তোমারই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'-এই গানটী করেন]...নিত্যগোপাল, আমার ধ্রুবতারা, সকল অশ্রুর, সকল চঞ্চলতার, সকল অস্থিরতার মাঝে তুমি স্থির ধ্রুবতারা ··, এই উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রে তুমি ধ্রুবতারা—আমি তোমারই পানে চাহিয়া পথ চলিব। আমি আর কভু হব না কো পথহারা—অকূল সমুদ্রে, এই ঘটনা-বহুল সমুদ্রে তুমি দিশারী—তুমি অগ্রবর্তী, তুমি চলিয়াছ ধ্রুবপথ ধরিয়া—আমি তোমারই অনুবর্তন করিব। সকল জটিলতার মাঝে তুমি ধ্রুবতারা, তুমি সমাধান, আমার প্রাণ-পুরুষ। যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাক—সর্বত্র তোমারই প্রকাশ—তোমারই লাবণিমা মাধুরিমা বিশ্বের সর্বত্র। ধনীর অট্টালিকায়, ভিখারীর কুটীরে...দেবালয়ে বেশ্যালয়ে তোমারই আসন প্রতিষ্ঠিত থাক—আকুল নয়নে চাই তোমারই করুণাধারা—আমায় প্লাবিত কর, আমার অন্ধকার কাটাইয়া দাও।...তোমার আলোকে বিশ্বকে দেখিয়াছি আমি নূতন করিয়া·· যখন অন্ধকার আসে, ব্যথায় ব্যথায় যখন দিশেহারা হই, তখন তোমারই কিরণ-ধারার স্পর্শ আমাকে প্লাবিত করুক,...তোমারই জীবনালোকে বিশ্বের সকল অর্থ ভাসিয়া উঠুক—সকল সম্পর্কের অর্থ ভাসিয়া উঠুক...। নিত্যগোপাল আমার হৃদয়ের বন্ধু, আমার হৃদয়ের ধ্যান—তোমার হাসি, তোমার আদরে কথা বলা, সাহস স্নেহময়তা মনে পড়ে—আমার দাঁড়াইবার স্থান আমি খুঁজিয়া পাই না।... নিত্যগোপাল, কখনও বিপথে যদি গমিতে চাহে যদি অমনি ও মুখ স্মরি সবলে সে হই হারা—তোমার স্নেহের অপমান হয় বলিয়া সবলে হারা হই—আমার স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র আনন্দ মুছিয়া ফেলিব—তোমার সত্তা, তোমার চৈতন্য, তোমার আনন্দ আমার হউক···তোমার

বিশ্ব, তোমার যা কিছু তা-ই আমার হউক...তোমার আমি আমার আমি হউক...নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল...ধরার ধূলি হউক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মানুষ।...

সন্ধ্যা...—নরনারায়ণ আশ্রমের উদ্দেশ্য ধরার ধূলিতে ভগবানের আসন পাতা...ভারতবর্ষ এতদিন জগতের ওপারে ব্রহ্মকে খুঁজেছে—নিত্যগোপাল এই মাটিতে ব্রহ্মকে খুঁজে পেতে বলেছেন। দুইজন এসে ছিলেন—যাযাবর নিত্যগোপাল—কথামৃতে আছে সে কথা...। ভাগবতে রন্তিদেবের কাহিনী আছে—

'ন কামরেঽহম্ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ

—অখিল দেহভাকদের আর্তি রন্তিদেব নিতে চাইছেন—পরাগতিও চাইছেন না, পুনরায় মা-হওয়াও চাইছেন না।...চাইছেন মানুষের সেবা...। নরনারায়ণ আশ্রমের উদ্দেশ্যও মানুষের সেবা।...(উপস্থিত কয়েকজন রিফিউজীকে দেখে) তোমরা নিজেরা সপ্তাহে সপ্তাহে আলোচনা করে নিজেরা চিত্ত-শুদ্ধি কর, পরিবার পরিচ্ছন্ন জীবন লাভ কর, সঙ্ঘবদ্ধ হও...।

২১, ৬, ৫৬।...শ্রীরাধা বিশ্বপ্রকৃতির বিধা ব্রহ্মময়ীরূপ—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে—কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণকায়িনী ব্রহ্মময়ী শ্রীরাধা...প্রকৃতির সার্থক রূপ শ্রীরাধা।...প্রাণের প্রাণ, মনসো মনঃ নিত্যগোপাল, তুমি অগ্রগামী—এই পথে তোমার আগে এ যুগে কেউ যায় নাই—তুমি যুগদ্রষ্টা... তোমায় বুকে লইয়া সেই কবে বাহির হইয়াছি, কত এল, কত গেল...আমার চলিবার শক্তি দাও—রথ আর চলে না—আমি শরণাগত—সবাই যখন ছাড়িয়া যায় তুমি কোলে করিয়া রাখিয়াছ—আমায় আগলিয়া রাখিতেছ—আমি তোমারই কথা জপিব, তোমারই কথা বলিব—প্রতি মুহূর্তে প্রতি ক্ষণে আমি তোমার। নিত্যগোপাল, বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মূল সূত্র তুমি রাখিয়া গেলে, বিশ্ববৈচিত্র্যের ঘন বিগ্রহ নিত্যগোপাল...আমার সকল প্রারব্ধ সঞ্চিত ক্রিয়মান ভস্মীভূত হউক তোমার প্রেমের আগুনের মাঝে। সকল সঞ্চিত প্রারব্ধ ক্রিয়মান ভস্মীভূত হইয়া তোমার পথে রওয়ানা হইবার মত তাহাদের দেহমনপ্রাণ কর। অতীতের সব দুঃখ লইয়া নূতন যাত্রা হয় না...সান্ত্বনা' সামীপ্য, সাষ্টি...এই পঞ্চবিধ আখ্যান লইয়া তোমারই পথে যাত্রা সুরু করিব...আমার সকল অতীত তোমার প্রেমে আপ্লুত হউক, সকল বর্তমান, সকল ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠুক। যে যুগ ভাঙিয়া পড়িল, সে যুগের আমি কেউ নই—যাহারা সামনে আগত নবীন বিশ্বের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তাঁহারা আসুন, আমরা পুরাতন সমাজ, পুরাতন রাষ্ট্র, জরাজীর্ণ পুরাণো সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পুরাণের চাপ হইতে মুক্ত হইয়া নবীন সম্বন্ধ লইয়া মানুষে মানুষে নূতন সম্বন্ধ গড়িব। নিত্যগোপাল, নূতন বিশ্বের তুমি আদি গুরু, আদি মানব; তোমারই চরণে শরণাগত হইয়া ভবিষ্যৎ বিশ্ব গড়িব, নবীন বিশ্বের নবীন মানুষ হইব—কে কোথায় আছ দুর্জয় সংকল্প লইয়া আস, আমরা নবীন বিশ্ব গড়িব, উজ্জ্বল ভারত গড়িব।... ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্ম মানুষ। হরিবোল হরিবোল...

সন্ধ্যা।...আমার নিজের জীবনের কথা যখন ভাবি, তখন আশ্চর্য হয়ে দেখি এই জীবনকে কিরকম করে নিত্যগোপাল এইখানে এনেছেন! আমি ভাবি, তোমরা হয় তো ভাব না। ভাবতে হয়—কোথা থেকে রওনা হয়েছিলাম, কোথায় এসেছি। ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী পথে দাঁড়িয়েছিলাম আর কোনদিন চাকুরী করব এই আশা নিয়ে নয়। পাঁচ জন আমায় খাওয়াবার লোক ছিল—যাদের কাছে আসিয়েছিলাম—তিনি লিখলেন একলার সন্ন্যাস বুঝি, কিন্তু একটা পরিবার নিয়ে বুঝি না। কত কষ্ট পাবে! অজানার পথে ঝাঁপ দেয় যারা, আপন জন তাদের কি সমর্থন করতে পারে?...কলকাতায় এলাম—চাকুরী করতে তো আসিনি—কেন এসেছি, কে জানে? অজানার পথে এসেছি...আমহার্স্ট স্ট্রীটের কর্ম-ব্যস্ত জনবহুল রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে একদিন মনে হল এ সংসারে সকলেরই কাজ আছে, আমার শুধু কাজ নেই!

মুখ থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল 'অন্ন রাধে'। অল্পদিনের মধ্যেই নিত্যাইবাবু (গুরুভাই) প্রস্তাব করলেন, তুমি বেদান্তের ক্লাস নেখ।...কিন্তু খাব কি? টাকা সংগ্রহের প্রশ্নে সি আর দাশের নাম উঠল, তিনি রাজী। বললাম, সেখানে যাব না—সেখানে গেলে এই দাঁড়াবে যে আমার আপন জনেরা তার বইতে অক্ষম, গুরুভাতারা অক্ষম, সাহায্য আনতে হলো পরের কাছ থেকে। এতে আপন জনদের নিন্দিত করা হয়। তদুপরি তিনি ধনী—আমার পরীক্ষা চাইবেন, তিনি বেদান্তের এই নূতন ভাষ্যে। কি বুঝবেন যে তাঁর কাছে পরীক্ষা দেব?... আলাপ আলোচনার পর স্থির হল রানীবাবু প্রভৃতি গুরু-ভাইদের দেওয়া টাকা থেকে মাস মাস ৫০ টাকার ব্যবস্থা হবে।...লিখতে আরম্ভ করলাম...শংকর রামানুজ কাউকেই তো অস্বীকার করতে পারি না, অথচ মানতেও পারি না...যাকে যাকে সামনে কোনো আলো ছিল না এমন কত দিন হয়েছে! মাথা গুঁজে পড়ে থাকতাম...ঐ নিত্যা-গোপালের পায়ে মাথা রেখে পড়ে থাকতাম...আবার আলো আসত...এক বৎসর পরে সেই বেদান্ত নিয়ে কলকাতায় এলাম...। অতীতের সংসার রাখি নি, ভবিষ্যৎ রাখি নি...অজানার পথে চলে এসেছি...এই ভাবে এই খানে এসে পৌঁছেছি...। তোমরাও এমনি আসতে পারবে...। পিছনের নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে এসেছি—all boats burnt—পিছনের দিকে তাকিও না—আমি ছেলেখেলা করতে আসি নি—অতীতের বিশ্বের সকল সম্পর্ক আমি ছেড়ে এসেছি...যদি ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাও, এখনও সময় আছে।...military discipline-এর মত discipline মেনে চলতে হবে... নিত্যগোপাল ছাড়া আমার কেউ নাই...। প্রোগ্রামটা আমার, তোমাদের নয়, তোমরা অনুসরণ কর। সর্বদা মনে রেখো এটা আশ্রম, আশ্রমে শৃঙ্খলা চাই, আর চাই সকলের সাথে মিলেমিশে চলতে পারা—মিলেমিশে চলতেই হবে...। আমি রাগ করি, সেই রাগে কেহ দেখতে পেলে পথ পাবে...নিত্যগোপাল একমাত্র আলো...এই আলোর জন্য সকলে ছেড়েছে...

২৪, ৬, ৪৬।...নয়নারায়ণ, নয়নারায়ণ, নয়নারায়ণ—বাঁশি বাজে.. আমার দেহপ্রাণমন লইয়া বাঁশি বাজে... প্রাণ ঢালিয়া বাঁশি বাজে...নিত্যগোপাল, তোমার বাঁশী শুনিয়া সেদিন অজানা পথে বাহির হইয়াছিলাম—সেদিন ভাবি নাই, ভাবনার অবসর ছিল না—প্রাণের আলোয় ছুটিয়া চলিয়াছি—আজও ছুটিয়া চলিয়াছি—সেদিন যাহারা সঙ্গে ছিল তাহারা সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—নিত্যগোপাল, আমার তুমি নিঃসঙ্গ কর...সকলের ছাড়িয়া যাওয়ার বেদনায় তোমার মূর্তিমান বেদ—সকল বেদনায় তুমি শান্তি—তোমার বাঁশী তুমি শুনাইও—আমি শুনিব—একাই চলিব—আমার কিছু নাই, আমার সকল না থাকা তুমি দিয়াছ...আমার পরম বৈরাগ্য দাও, পরম তিতিক্ষা দাও, পরম তপস্যা দাও—আমি তোমার, সকল দেহমনপ্রাণে আমি তোমার।...তোমার বিশ্বে আমি তোমার...আমি আর কাহারও নই—আমি সর্বতোভাবে তোমার হইব। তোমার মাঝে আমি আমায় মুছিয়া ফেলিব। স্বামী, নিত্যা-গোপাল, আমায় নিত্যগোপালময় কর, আমার দেহমনপ্রাণ নিত্যগোপালময় হোক। নিত্যগোপাল, সর্বস্ব ধন আমার, তোমার নাম লইয়া পথে বাহির হইয়াছি, দেখা দাও, আমায় দেখা দাও...।

সন্ধ্যা—...আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য...। প্রথমে দর্শন—তিনি কেমন করে চলেন বলেন তা দেখতে হবে...বিক্ষিপ্ততা দূর করতে হবে অবিক্ষিপ্ত একজন পুরুষের সান্নিধ্যে এসে..। তোমাদের কাছে আমার এক কথা—তোমরা আমার জীবনের বাইরে থাকলে আমি কিছুই করতে পারি না—নিত্যগোপাল যে ব্রহ্মবস্তু তা বুঝতে হলে আমার মধ্যে তো আসতে হবে... ভিন্ন থাকলে তোমার মত পরিচ্ছিন্ন কিছু পাবে, ব্রহ্ম-বস্তু পাবে না।...আগে চার চক্ষের মিলন—আমি যে রকম দেখছি তোমরা যদি সে রকম না দেখ তবে তো আমার দেখা হয় না...আমার যেন একলাই চলে যেতে না হয়—তোমরা এসেছ, আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমার জীবনে তাঁর যা আশীর্বাদ তাই পাও, এই আমি চাই।...তাঁর ইচ্ছা আমার জীবনে জয়যুক্ত হউক...।

ক্রমশঃ

চীনা পরিব্রাজকদের ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাসম্পর্কে অভিজ্ঞতা

॥ অধ্যাপিকা অরুণিমা দাস ॥

বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির খ্যাতি ভারতের বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতের বাহিরে বিশেষ করিয়া চীন হইতে অনেক পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন ভারতের শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতির সহিত পরিচয় লাভ করিতে।

চীন হইতে যে সকল পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ফা-হয়েন, হুয়েন সাঙ্ ও ই সিঙ্ এর নামই সমধিক প্রসিদ্ধ।

তাহাদের ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য। ফা হয়েন এদেশে আসিয়াছিলেন চীনের বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির জন্য বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করিতে। এই জন্য ফা-হয়েন বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ফা-হয়েন যে সময় ভারত ভ্রমণ করেন, সে সময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব উত্তর পশ্চিমে উদ্যান হইতে পূর্বে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার সময় বৌদ্ধ ধর্মের শুধু প্রসারই হয় নাই তাহা স্থায়ীত্বও লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আঠারটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক দলেরই একজন করিয়া গুরু ছিল। কিন্তু ফা-হয়েন মহা-সঙ্ঘিকা, সারাস্তিত্যবাদ ও মহিমাসাসক এই তিনজন নেতারই নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে তক্ষশীলাকে একটি বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু ফা-হয়েনের বিবরণীতে এখানে কোন বৌদ্ধমঠ ছিল কি না সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। শ্রাবস্তী নগরে পূর্বে একটি বিদ্যালয় ছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিকট শ্রাবস্তী নগরীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। গৌতম বুদ্ধ এখানে দীর্ঘ চব্বিশ কাল বাস করিয়াছিলেন, আর কোথাও এত দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন না। কুশনগর যেখানে বুদ্ধদেব দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন সেখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ফা-হয়েন যে সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে পাটলীপুত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি সুন্দর মহাযান মঠ ও একটি হীনযান মঠ ছিল। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ-বিধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত সত্য ও ধর্মের সন্ধানে এখানে আসিত। কেবল অল্প বয়স্ক ভিক্ষু ও অনভিজ্ঞদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাই যে ছিল তাহা নহে, বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ধার্মকদের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। এখানে কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। এখানকার পণ্ডিতদের মধ্যে রাধাস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ফা-হয়েন মঞ্জুশ্রী নামে আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

মঠ পরিচালনা। রাজা, বণিক ও জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করিয়াই দেশের মঠগুলি পরিচালিত হইত। দাতাদিগের বংশধরেরা তাঁহাদের পূর্ব পুরুষদের দানের মর্যাদা রক্ষা করিতেন। রাজারা যখন ধর্মযাজক-দের কিছু দান করিতেন তখন তাঁহারা তাঁহাদের রাজ-মুকুট খুলিয়া ফেলিতেন। রাজা মন্ত্রী ও আত্মীয়গণ সম-ভিব্যাহারে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে যাজকদের খাওয়াইতেন। মঠের সন্নিকটে যে সমস্ত পরিবার বাস করিত তাহারা ধর্মযাজকদের যাহা প্রয়োজন তাহা প্রচুর পরিমাণে যোগান দিত যাহাতে ধর্মযাজকদের কোনও রূপ অভাব বোধ করিতে হইত না।

ধর্মযাজকদের কর্তব্য। ধর্মযাজকদের নিত্যকর্ম ছিল

ধর্মকার্য্য করা, সূত্র আবৃত্তি করা এবং ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকা।

শিক্ষা পদ্ধতি। ব্রাহ্মণ্য যুগের মতই বৌদ্ধ যুগেও মৌখিক পাঠদান করাই ছিল শিক্ষাদান পদ্ধতি। পাঠ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিবার রীতি তখনও চলিত ছিল না। ফা-হুয়েন লিখিয়াছেন যে তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একই গুরুকে বিভিন্ন ছাত্রদের মুখে মুখে শিক্ষাদান করিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু গুরুর পাঠ লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না। ফা-হুয়েন ভারতে আসিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিতে, তাই মৌখিক ভাবে শিক্ষাদান করিতে দেখিয়া তিনি নিরুৎসাহ হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের বহু মঠ পরিদর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু মাত্র দুইটি মঠে তিনি কিছু সংখ্যক পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। মৌখিক পাঠদান পদ্ধতি উত্তর ভারতেই প্রচলিত ছিল কিন্তু পূর্ব্ব ভারতে এই পদ্ধতির কিছু পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল।

সংস্কৃত ভাষার জন-প্রিয়তা। বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। পাটলিপুত্র মঠে ফা-হুয়েন তিন বৎসর অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। মঠে শিক্ষা ও শাস্ত্রের সম্মানের জন্য স্তূপ নির্ম্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসে সুপরিচিত প্রচারক যথা সারিপুত্র, মহা-মৌদ্গল্যায়ন ও আনন্দ প্রভৃতির স্মৃতির উদ্দেশে মঠে স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইত এবং পূর্ব্বাঞ্চ যাত্রকেরা এই সকল স্তূপে পূজা দিতেন। ভারতেরা সাধারণতঃ যাদুবের এবং ভিক্ষুণীরা আনন্দের পূজা করিত। কারণ ইনিই তথাগতকে অনুরোধ করিয়াছিলেন নারীদিগকে গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইতে অনুমতি দিবার জন্য। অভিধর্ম্ম, বিনয় ও সূত্র প্রভৃতি ধর্ম-গ্রন্থের উদ্দেশেও স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইত এবং এই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপকেরা এই স্তূপগুলিকে পূজা করিত।

আতিথেয়তা। ধর্মযাজকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাসে অতিথিদের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। যখন কোন অপরিচিত ধর্মযাজক আসিতেন, মঠের বাসিন্দাগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিত, তাঁহাদের পরিধেয় ও ভিক্ষা পাত্র বহন করিত, পা ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিত, মালিশ করিবার তেল এবং আহার পানীয় ইত্যাদি দেওয়া হইত। অতিথি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর তাঁহাকে তিনি কত বৎসর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করা হইত এবং সেইরূপ মর্য্যাদা অনুযায়ী তাঁহার বাসস্থান ঠিক করা হইত। অতিথিদিগকে মঠে সাধারণতঃ তিনদিন থাকিতে দেওয়া হইত এবং তাহার পর তাঁহাদের বাসস্থান ঠিক করিয়া লইতে অনুরোধ করা হইত।

সমবেত মিলন। ব্যক্তিগত ভাবে পড়াশুনা ও ধ্যান করা ভিন্ন ধর্ম যাজকগণ একত্রে মিলিত হইতেন ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা করিবার জন্য। এই সম্মেলনে তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করিতেন।

অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও দ্রাতব্য সংস্থা। ফা-হুয়েনের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বৌদ্ধ ভিন্ন অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব জনসাধারণের উপর ছিল না একথা বলিলে ভুল হইবে। একমাত্র মধ্য ভারতেই ছিয়ানব্বইটি ধর্মসম্প্রদায় ছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজ সংখ্যা নগণ্য ছিল না। এই সকল অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির দান ও পরোপকার ছিল বিখ্যাত। ইহারা পথের ধারে পান্থ নিবাস স্থাপন করিতেন। এখানে পথিক ও ধর্মযাজকদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল হিন্দু, সেই জন্য সেই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান মগধেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এখানকার অধিবাসীদের অবস্থা ভাল ছিল। ধর্ম ও পরোপকার বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সর্বদাই ইহারা ব্যগ্র থাকিত। সহরের বৈদ্যেরা দ্রাতব্য চিকিৎসালয় ও দানসত্র খুলিতেন। দেশের দরিদ্র ব্যক্তিগণ, অনাথ শিশুরা, বিধবা ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ এই সকল দানসত্রে আশ্রয় লাভ করিত। সেখানে তাহাদের আহার, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। যেমন উচ্চ আশ্রম ও দ্রাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইত তেমনি আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য দেবালয়ও স্থাপিত হইত।

হুয়েন সাং এর বিবরণ। ফা-হুয়েনের দুইশত বৎসর

পরে হুয়েন সাং ভারত ভ্রমণে আসেন। কা-হুয়েনের সময়ে ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে ধারা প্রচলিত ছিল হুয়েন সাং-এর ভ্রমণকালে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হুয়েন সাং বলিয়াছেন দেশের বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই ছিল পবিত্র ও সম্মানিত। ব্রাহ্মণদের সুনামের জন্যই ভারতকে বলা হইত ব্রাহ্মণ দেশ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যের আর একটি নমুনা পাওয়া যায় যে সংস্কৃতই ছিল শিক্ষিত সমাজের ভাষা। বড় বড় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাও এই ভাষাতেই লিখিতেন।

বেদপাঠ। ব্রহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থাতে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক ভাবে চারিটি বেদ পাঠ করিতে হইত। এই সময় বেদ আর মুখে মুখে ছিল না, লিখিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ করিয়াছিলেন তাঁহারাই বেদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

শিক্ষাপদ্ধতি। গুরু মহাশয় ছাত্রদের মৌখিক ভাবে পাঠদান করিতেন। কোনও লিখিত পুস্তক ছিল না। এই জন্য গুরু মহাশয়ের যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হইত। ছাত্রদের অন্তর্নিহিত চিন্তাশক্তি জাগাইয়া তুলিয়া যাহাতে তাহারা সর্ববিষয়ে নিজস্ব মতামত গঠন করিতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হইত। শিক্ষকেরা যে কোন বিষয়ের সাধারণ ভাবে অর্থ বুঝাইয়া দিয়া পরে তাহার গূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেন। ছাত্রদের মধ্যে কাজ করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তাহাদের আরব্ধ কাজে সফলতা লাভ করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইত। স্মরণশক্তি ছাত্রদের বুদ্ধি বিকাশের জন্যও চেষ্টা করা হইত। বুদ্ধিমান কিন্তু অলস ছাত্রদের পশ্চাতে লাগিয়া থাকিয়া বার বার তাহাদের উপদেশ দেওয়া হইত যাহাতে তাহারা সার্থক ভাবে শিক্ষা কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারে। শিক্ষাকাল দীর্ঘই ছিল বলা যায়। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত ছাত্রদের শিক্ষা চলিত। শিক্ষা শেষে স্থির চিত্তে ছাত্রগণ সংসারে প্রবেশ করিত। শিক্ষা সমাপনান্তে সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্বে ছাত্রগণ সাধ্যানুযায়ী গুরুদক্ষিণা দিত।

হুয়েন সাং-এর সময়েও ভারতে একদল নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারীর সন্ধান মিলিত যাহারা শিক্ষা ও সত্যের সন্ধানে সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছেন। সেই সকল ব্রহ্মচারী প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর জীবন যাপন করিতেন। এই সকল জ্ঞানযোগী আমরণ ব্রহ্মচারীদের সম্বন্ধে হুয়েন সাং বলিয়াছেন যে, তাঁহারা জ্ঞানের সন্ধানে সংসার হইতে দূরে নির্জনে জীবন যাপন করিতেন। যদিও তাঁহারা মান অপমানের অনেক ঊর্ধ্বে বিরাজিত ছিলেন তথাপি তাঁহাদের খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। শাসন কর্তাদের কোন প্রলোভনই এই সকল শিক্ষানুরাগীদের রাজ-সভায় হাজির করাইতে পারিত না। রাষ্ট্র শিক্ষিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সম্মান করিতেন; এই জন্য ইহারা সরকার ও সাধারণের নিকট হইতে প্রচুর সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করিতেন। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা ধার্মিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা অর্জন করাই পছন্দ করিতেন। তাঁহারা জ্ঞানোপার্জনই অধিক সম্মানজনক মনে করিতেন এবং দারিদ্র্যের মধ্যে কোনরূপ লজ্জার কারণ আছে বলিয়া মনে করিতেন না।

প্রধান হিন্দু শিক্ষাধারার লক্ষ্য ছিল এমন কিছু সংখ্যক ছাত্র সৃষ্টি করা যাহারা জ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবেন। যে কালে হিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে দলে দলে এরূপ ছাত্র বাহির হইয়াছিল যাহারা শিক্ষার বেদীমূলে জীবনের অন্য সকল অভিলাষই বলি দিয়াছিলেন। বর্তমান কালে বিদ্যালয়গুলিতে যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয় তাহাতে আর যাহাই হউক শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষানুরাগ জাগরিত হয় না। কিন্তু প্রাচীন কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির একমাত্র লক্ষ্য ছিল কিশোর বয়স্ক ছাত্রদের মনে সত্যের সন্ধান ও জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা জাগরিত করা।

হুয়েন সাং ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন—ইহা হইতেছে রাজা ও সাধারণের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা। শিক্ষার প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধার প্রধান কারণ হইতেছে যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্মান ও

প্রভার জন্য লালায়িত ছিলেন না। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞান ও নীতির অপূর্ব সমাবেশ দেখা যাইত। জ্ঞানের সন্ধানে এই সকল শিক্ষার্থীরা সংসারের সব কিছুই এমনকি স্নেহ ভালবাসা ত্যাগ করিতে দ্বিধা করিতেন না। জ্ঞান লাভ করিয়াই তাঁহারা আনন্দ পাইতেন এবং সত্যের সন্ধান পাইলেই তাঁহারা নিজেদের সম্মানিত বোধ করিতেন। তাঁহাদের জীবন যাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ এবং অভাব ছিল কম। তাই তাঁহারা আদর্শের অনুসন্ধানে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করাকে অপমানজনক মনে করিতেন না। হুয়েন সাং-এর মতে এই সকল জ্ঞানানুসন্ধানী ব্যক্তিরা সংসার ত্যাগ করিতেন জগতকে শিক্ষা দিবার জন্যই।

যৌবনের গান

॥ শ্রীসচিকেতা ভরদ্বাজ ॥

আমি সে হঠাৎ আসে। সামান্যতম প্রস্তুতি নেবার
অবসর দেয় না কো। আহা এই ছোট ছোট
কোমল শরীরে
দুরন্ত যৌবন আসে সুতীক্ষ্ণ ঝড়ের মত—হারাধন হৃদয়ের
তীরে
শিশির সবুজ সব ছিন্নভিন্ন, অন্ধ এক উপপ্লাবী আবেগে
অধীর
উজ্জ্বল দেওয়ার বন। তবু এস আজ এই তারাজ্বলা রাত্রির
তৃতীয় প্রহরে
ওপরে আকাশ রেখে আমরা শপথ নেই—: দুরন্ত দুর্বার
আমাদের যৌবন শেষ হতে দেব নাকো সময়ের শরে
রাত্রির কলঙ্কে ক্ষীণ ; অপমৃত্যু হতে দেব না কো
ছলিত ছিন্ন নীল কলস শয্যার অন্তরাগে। জাগো, জাগো
যে যেখানে আছে জাগো। সাবধান ওরে যাত্রি, দাঁড়ী
হুঁশিয়ার।
মধুকর সাবধান! কিছুতে ভোবে না যেন। ঘর ছাড়িয়ে
চলো দূরে
আরো দূরে—সত্যের ঘনিষ্ঠ উপকূলে। তারপর দেখি ঘুরে
ঘুরে
ঘুরায় প্রদীপ জেলে পারি কি না আর এক সূর্যের আয়োজনে
অন্য এক পৃথিবী গড়ে দিতে। রাত্রির সন্ধায় নয় দীপ্ত এক
ভোরের সন্ধায়
আমরা প্রদীপ্ত হই। তোমার আমার নয় স্থির জেনো মনে—
পবিত্র এ যৌবনের ভার মানুষের অধিদেবতার,
যে মানুষ দেবোত্তর স্নেহহীন সাধ্যের-সংগ্রামে।
অরণ্য-পর্বতে চলো—নগরে কন্দরে চলো—
চলো গ্রামে গ্রামে
তোমার প্রস্তুতিক্ষণ রক্তাক্ত সংগ্রামে
প্রতি জনপদে চলো! ছলো ছলো আর্যাবর্তের
দুঃস্বপ্নের বোঝা ঘাড়ে রেখে
অনেক এগিয়ে চলো, প্রশস্ত এ যৌবনের আয়ের জিজ্ঞাসা
স্পর্শিতে উত্তীর্ণ কর। ধ্যাননীল বসুধার ব্যবহার দেখে
আমরাও শিখে নেই সে দুরন্ত তপশ্চর্যা—রূপায়ত প্রাণের
সাধনা :
ফাল্গুনের ফুল হোক ফলনত বৃক্ষের বন্ধনা,
হেমন্ত-হিরণ্য হোক উদাম আষাঢ়ের সবুজ বিদ্রোহ।
ব্যক্তির বিলাস ভাঙো! যৌবনের অনিবার্য মাংসাত্মিক মোহ
মুক্ত কর। শক্তিরে মুক্তি কর সঙ্ঘের সংহত উত্তাপে।

শিক্ষার বিভিন্ন সম্ভাব্য মাধ্যম

(২)

॥ অধ্যাপিকা মীরা রায় ॥

কলেজে যে সব মেয়েরা পড়তে আসে সাধারণত তাদের বেশীর ভাগ হচ্ছে অল্প শিক্ষিত গরীব ঘরের মেয়ে। বাড়ীতে এবং তাদের সমগ্র পরিমণ্ডলেই বিশেষ কিছু দেখবার শোনবার জানবার scope নেই। ঘসেমেজে কোনমতে B.A. ডিগ্রীটি নিয়ে এরা হয় School mistress হবে, কেউ বা কেরাণী হবে, অধিকাংশ কাঁদে উঠাবে ঘরকন্নার জোয়াল। কলেজ-জীবনটুকুই এদের জীবনের একমাত্র সৌরভের অধ্যায়, স্বর্ণ যুগ। মানবেতিহাসের যা কিছু মহৎ সৃষ্টি, সত্যতার শিল্পের সাহিত্যের যা কিছু সুন্দর তার সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটবার একমাত্র মাধ্যম এদের কাছে কলেজ। কাজেই মনে হয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের, অধ্যাপকদের দায়িত্ব হবে কর্তব্য হবে যথা-সম্ভব তার ভাল ও সুন্দর জিনিষ বেছে নিয়ে গিয়ে এদের সামনে ধরা,—মানুষের যা কিছু বড় অর্থাৎ কালোত্তীর্ণ রচনা তার কিছু কিছু specimen কলেজরূপ মিউজিয়মে সাজিয়ে রাখা, এরা একটু চেনে ও দেখে শুনে হবে বলে। কলেজ বাড়ীটি শুধু মিস্ত্রী আর কন্ট্রাক্টার আর এঞ্জিনীয়রের রচনা হবে না, শুধুই ইট কাঠ লোহা কাঁচের যোগফল হবে না, এটা যে একটা বাণীমন্দির সেই ছাপ তার অঙ্গে অঙ্গে নামাবলীর মত কোরে লেখা থাকবে। একটা সিল্কিন ম্যাডোনার ছবি দেখেও গ্রাজুয়েট মেয়ের মনে যেন নিতান্ত সাধারণ নিরক্ষর অজ্ঞ অশিক্ষিত জনের মতই প্রতিক্রিয়া না হয়। বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে তার এই পরিচয় সাধন হবে বিভিন্ন মাধ্যমে, মানব-সভ্যতা তো কেবল-পুঁথির পাতাতে বিকশিত হয়ে ওঠে নি, মেয়েদের শিক্ষা আসবে চোখের, কানের ভিতর দিয়েও।

ছবিতে ছবিতে কলেজের দেয়ালগুলি ঢাকা থাকবে—তাতে তাদের সৌন্দর্যও বাড়বে। কিভাবে ছবি মূর্তি ইত্যাদি সাজানো হবে তার ধারণা পাওয়া যাবে আর্ট কলেজ, ডোমেস্টিক সায়েন্স কলেজ, ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল, মার্বল হাউস্ এগুলির কথা মনে করলে; হাতের আরও কাছে রয়েছে ব্যাণ্ডেল গীর্জা। যে সব ছবির পরস্পরের মধ্যে কোন ধরণের মিল রয়েছে—Series মতন, সেগুলিকে একজায়গায় (পাশাপাশি বা যা হোক কোরে) রাখা হবে, প্রয়োজন মত serial নম্বর দিয়ে দিয়ে। Old book shop থেকে, পুরানো বই থেকে ছবি জোগাড় হবে—কাঁচে বাঁধাই নাই বা হোল, কেন্ট রঙের চৌকো পেস্ট বোর্ডে সেগুলি এঁটে এঁটে দিলেই চমৎকার দেখাবে। প্লাষ্টারে এঁটে নিলেও হয়। ইওরোপের আর্টিষ্টরা তো মনে হয় জগতের কোন জিনিসই বাঁকতে বাকী রাখেন নি। সব সময় ভাল ছবির সন্ধানে থাকতে হবে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে প্রয়োজন মত।

এখন ছবিগুলি কিসের হবে? কি ধরণের ছবি চাই? কিসের যে নয় তাই বলা যায় না। দেশবিদেশের মহাপুরুষ, শিল্পী, বিপ্লবী, সমাজ-সংস্কারক ইত্যাদির ছবি, দেশবিদেশের সমাজ-বিবর্তন সংক্রান্ত ছবি, ইতিহাসের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, পৃথিবী-বিখ্যাত গ্রন্থগুলির চিত্ররূপ, যতটা সম্ভব। ইংরাজী সাহিত্যে সমুদ্র, জাহাজ, নাইট, যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা প্রতি পদে পাওয়া যায়। এ সবের প্রত্যেকটির বড় বড় পরিষ্কার ছবি থাকবে এবং এদের প্রতি অক্ষরটির, প্রতি পরিচ্ছদটির নাম, বর্ণনাদি সঙ্গে থাকবে, তীরচিহ্ন যুক্ত হয়ে। এক একটি ঘর এক এক ধরণের ছবি ও লেখায় পূর্ণ থাকবে। মনে করা

যাক্, একটা ঘর ভর্তি বেবল মইল—লেক্সপীয়ারের নাট্য-বর্ণীয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দৃশ্য যেমন লেডি ম্যাকবেথ-এর sleep-walking এর দৃশ্যটি। এগুলির তো আরো সুবিধা। বড় বড় অভিনেতাদের অভিনয়ের ফোটোই জোগাড় করা যাবে।

এমন এই ছবিটির পাশেই থাকবে ছবিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা। পূর্ববর্তী আখ্যানটুকু সংক্ষেপে দিয়ে বৃত্তমান ঘটনার ভেতর দিয়ে লেডি ম্যাকবেথের কি চরিত্র ফুটেছে তা লেখা থাকবে। সবচেয়ে ভাল হবে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রের পরিপূর্ণাঙ্গ ও যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট আলোচনা যদি সহজতম, সরলতম ভাষায় (এবং বাংলা ভাষায়) এখানে দেওয়া যায়। যে মেয়ের কলেজে পড়া কোন কারণে ছমাস অন্তেই বন্ধ হোল, যে মেয়ের বি. এ. তে ম্যাকবেথ নেই, যে মেয়ে বিজ্ঞান কি কমার্স পড়ে, যে লোক কলেজে বেড়াতে এসেছে তারাও কৃতার্থ হবে, মেয়েরে কলেজ-প্রাঙ্গন থেকে শুধু লেক্সপীয়ারের স্বাদ পেয়েছি বলেই নয় Racine-র পরিচয় পেয়ে। আর ইংরেজীতে কাঁচা যে ছাত্রী সেও প্রথম কলেজে ভর্তি হয়েই এই লেখাটুকু পড়ে, ছবিটি দেখে অনেক তৈরী হয়ে থাকবে।

ছবিগুলি সাজানো হবে বেশ নীচুতে যাতে ভাল-ভাবে দেখবার বা পড়বার জন্যে আয়াস করতে না হয়। Casual ভাবেই মেয়েরা এগুলো দেখবে, অজ্ঞাতসারে শিখবে।

ছবি	আ	লো	চ	না

অথবা মনে করা যাক, দেখাতে চাই growth and development of Renaissance। পাতা পাতা relevant ছবি চাই, সব মিনিস আবার ছবিতে দেখানো যায় না, সে gapটুকু আলোচনা দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। প্রতি ছবির তলাতেই অবশ্য ব্যাখ্যা থাকবে (Browning-এর ছবির তলাতে রইল তাঁর কাব্যের characteristics, তাঁর philosoply of life etc.।

১	২	৩	৪	৫
ছবি	ছবি	লেখা	ছবি	ছবি
ব্যাখ্যা	ব্যাখ্যা		ব্যাখ্যা	ব্যাখ্যা

পর পর পর পর systematically ছবিগুলি সাজানো হবে।

Art for art's sake-এ থাকবে। বিষয়ের প্রাকৃতজনও ছবি বোঝে, রং রেখার তারতম্য গুণাগুণ সমন্ধ করতে পারে; আমাদের ছেলেমেয়েদের চোখকে কি অনুরূপ ভাবে দীক্ষিত করা যায় না ? একখানা গোটা ঘর পূর্ণ করা হবে, মনে করা যাক, renaissance school-এর representativeদের অঙ্কিত ছবি দিয়ে; এদের দিকে মেয়েদের চোখকে মনকে খোঁচা মেরে আকৃষ্ট কোরে ঘাসিয়ে টেনে আনতে হবে। দিতে হবে sensational শিরোনাম, যেমন যেন gemini pictur-এ বা হিন্দী ফিল্ম নতুন released হবার সময়। মোনালিসার মাথায় মোটা কোরে লেখা রইল—'জগতের সব চেয়ে বিখ্যাত ছবি"—এমনি ধারা। তলায় এবং পাশে পাশে থাকবে ছবিটির ব্যাখ্যা, তার বৈশিষ্ট্য কোথায়, সৌন্দর্য কোথায়, তার পরিচয়, শিল্পীর এবং তার school-এর characteristics-এর আলোচনা। যে এ বিষয়ে বিশদতর জানতে চাইবে তার জন্যে পাশেই পেরেকে মোটা ইলাষ্টিকে ঝোলানো থাকবে হাতেই লেখা একটি পুস্তিকা যাতে মোটামুটি এ বিষয়ে সব essential তত্ত্ব (এ বিষয়ে) আলোচিত থাকবে সরলতম বাংলা ভাষায়। অথবা আরো ভাল হয় যদি ছবির তলায় একটি ঈষৎ হেলানো (desk এর মত) ব্র্যাকেট বা ছোট তাক মতন থাকে। তার ওপর বইটা থাকবে। মলাটটি হবে শক্ত কিছুর (কাঠের) এবং পিছনের মলাটটি ব্র্যাকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, স্থায়ীভাবে সাঁটা থাকবে পেরেক দিয়ে। এই ভাবেই থাকবে তাচ, ক্লেমিশ, ইমপ্রেশনিস্ট ইত্যাদি school-এর representative ছবিসমূহ। পাশের ব্যাখ্যাতে পরিষ্কার বোঝানো থাকবে impressionism কি চায়, আলোচ্য ছবিতে impressionism কোথায় কি প্রকারে ফুটেছে। কাংকা school-এর, অবতার,

ছবি থাকবে, তার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব যে কোথায় পাশেই তা লেখা থাকবে। থাকবে Constable এর স্বীয় মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের চিত্র। প্রতিটি চিত্রের সৌন্দর্য কোথায়, appeal কোথায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দিয়ে বলিয়ে দিতে হবে। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত i.e. Greek Latin বিভিন্ন সাহিত্যের ইতিহাস এবং বিশ্ব-ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাগুলি ছবিতে প্রতিফলিত করে দেখাতে হবে। ছবির পাশের বা তলার লেখায় ঘটনার বিষয়বস্তু, পটভূমিকা, ঘটনার significance বর্ণিত থাকবে। Joan-কে ফরাসী পুরুতরাই ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছে,—(ছবির তলায় পরিষ্কার কোরে বোঝানো থাকবে) কেন, কি কারণে?—না, তখনো Europe এ nationalism জাগে নি; ধর্মতন্ত্র, ক্যাথলিক হায়রার্কিই বড়, ভগবান যাদের monopoly (!) তাদের বাদশাহী দুর্গে Joan যা দিয়েছিল, তাই। Napoleon রাশিয়া থেকে ফিরছেন—কি কষ্ট। এ ঘটনার কি back-ground, বিশ্ব-ইতিহাসে এর significance কি?

কত জিনিস ছবিতে দেখানো হবে! বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের সামাজিক জীবন, বিভিন্ন সাহিত্যিকের জানীতব্য আলেখ্য; তলায় তাঁর জীবন দর্শনের মূল সূত্র গুলি; আমাদের অধ্যাত্ম অতীত বিপ্লবীদের ছবি—শুধু significant জিনিসগুলি তলায় লেখা থাকবে যাতে ছাত্রেরা inspiration পায়: উদাস কবের ছবির তলায় রইল তাঁর সিংহ বীর্য্যের, প্রতিভার, দুঃখবরণের আত্মত্যাগের বিবরণগুলি। এঁদের বর্তমান অবস্থার সংবাদও দেওয়া উচিত। (যার চেহারা জানা নেই একটা outline করনা কোরে এঁকে রাখব বা chinese কালিতে সেটা ভরে দোব। তাৎপর্য: এঁর রূপ অজ্ঞাত। এতে কৌতূহল আরও হতে পারে।) মানবেন্দ্র রায়ের আশ্চর্য জীবনী, তাঁর নূতন মতবাদের একটু পরিচয়, নীট্‌শে, ভায়উইন, কাণ্ট, হেগেল, শোপেনহাওয়ার প্রত্যেকের মূল বক্তব্য খানিকটা বোঝানোর প্রয়াস থাকবে ছবির তলায়। সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটলের ছবি দিলবে, হোমারেরও কল্পিত ছবি আছে। ইজাইলাস্ ইউরিপিডিস্ সফোক্লিসের কি গতি হবে? Encyclopaedia ঘাঁটতে হবে। (Macy-র 'Hist of World lit. to be consulted।) তলটেয়ারের ছবির তলায় রইল তাঁর অপূর্ব কর্মক্ষমতা, শক্তিমানের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার তেজ, নিপীড়িত দুঃখীজনের প্রতি তাঁর মমতা, (কি কোরে বা তাঁর রচনা ফরাসী বিপ্লবের সহায়ক হয়েছে সেকথা) এবং বিদ্রূপকারী তাঁর পাণ্ডপত্যাস্ত্রের কিছু পরিচয়, কিছু concrete example; Cleopatra-র লীলাখেলা তেমন না দেখিয়ে আত্মহত্যার ভেতর দিয়ে অবশেষে তার মহত্ত্ব যে কেমন কোরে দেখা দিয়েছে বুঝিয়ে দেওয়া। (ভয়াবহ বস্তু, সত্য হলেও, খুব বেশী না দেখানই ভাল, শুধু শুভবুদ্ধি আর সৌন্দর্য্য বোধকে জাগিয়ে তোলা); ক্লিওপেট্রাকে শেক্সপীয়ার, ছাইভেন, বার্ণার্ড শ' এঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। তাঁদের এক একজনার approach কোথায় যে অপরের সঙ্গে মিলছে, বা না মিলছে সেসব এখানে দেখা যায়। এটা উদাহরণস্বরূপ বলায়। এমন বহু জিনিসই আছে যা নানা যুগে নানা মনীষীর দ্বারা বিভিন্ন রূপে interpreted হয়েছে। পাশাপাশি সেগুলিকে রেখে দেখান যে, কোন একটি বিষয় বস্তুকে কত ভাবেই না treat করা যেতে পারে। e.g. Dr Faustus: Prometheus। Don Quixote বলেছে wind mill আক্রমণ করতে—এ ছবিটির তলায় ছোট্ট কোরে গল্পটা রইল আর রইল inner significance। সার্ভেন্টিস্ কোন্ যুগের লোক, কাকে ব্যঙ্গ করেছেন এখানে, কেন? কোন্ মৃতকল্প পুরুগর্ত সামাজিক রীতিকে বিদ্রূপাঘাতে ধূলিসাৎ করলেন—এমনি ভাবে দেয়ালের পর দেয়াল চলবে, পর পর পর পর সব methodically age-wise, idea-wise arrange করা। জনতা ব্যাস্টিল ভাঙতে চলেছে—গিলোটিন্ হচ্ছে এই সব চিত্র প্রসঙ্গে আলোচিত হবে ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি, বিপ্লবের ক্রমপরিণতি।

সর্বদা যা-ই পড়ব, দেখব, শিখব সেগুলির নির্য্যাস মেয়েদের চোখের সামনে তুলে ধরা যায় যিনা সেই

খেয়াল রাখতে হবে। দেওয়াল পত্রিকা বার করবেন শিক্ষকরা। কিছু হাঙ্গামা নয় বা আড়ম্বর নয়। নরম একটা তক্তার বা পিস্‌বোর্ডের টুকরো ঝুলানো থাকবে, তাতে আমাদের লেখা কাগজগুলি pin up কোরে কোরে দেব। তাতে লম্বু গুরু সব থাকবে—কি কি নিয়ম মানলে, প্রক্রিয়া করলে চোখ ভাল থাকে বলে শুনেছি এও থাকবে বা "আজ ১৪ই জুলাই-এর উৎসব—আজকের দিনে ফরাসীরা ক্ষেপে গিয়ে ব্যাষ্টিল জেল ভেঙেছিল" এর বিস্তৃত unofficial ঘরোয়া ঘরোয়া আলোচনাও থাকবে (অর্থাৎ মেয়েরা যেন পড়া পড়া গন্ধ পেয়ে সরে না পড়ে), constructive ভাবে অবসর কাটাবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত suggestion থাকবে, ইত্যাদি বা মহত্তর চর্চার কথা থাকবে—সে যখন যেমন। মেয়েরা যাতে মন দিয়ে ছবিগুলি দেখে, লেখাগুলো পড়ে তার জন্যে মাসে মাসে সাধারণ জ্ঞান সংক্রান্ত Quisz progamme হবে—প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দেয়া হবে। A টিম B টিম কোরে প্রতি বারে হয়তো দশ দশ বুড়িটি কোরে কোরে মেয়ে নেওয়া হোল। প্রাইজ-এর প্রলোভনও থাকবে (দু' একটা কার্ব্বার জিনিসেই যথেষ্ট)। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিদ্বেষকে খোঁচা মেরে জাগিয়ে তোলবার জন্যে আনাচে কানাচে pointed প্রশ্নাদি ছড়ানো থাকবে—মোটা মোটা কালো অক্ষরে ছোট ছোট কার্ডে।

বইপত্র consult কোরে, উৎপল দত্তের ও বিলিতী থিয়েটার দলের সঙ্গে যোগাযোগ কোরে পারলে মেয়েদের দিয়েই কিছু এলিজাবেথীয় costume সেলাই করিয়ে নিতে হবে। মেয়েরা stage-reading করবে মাঝে মাঝে। গিরীশ ঘোষ, নীরেনবাবু ইত্যাদি কৃত বড় বড় সেক্সপীরির নাটকগুলির অনুবাদ সংগ্রহ করতে হবে। মেয়েরা সেক্সপীরির সম্বন্ধে সেজে প্রথমে বাংলায় একটি বিশেষ নাটকের অভিনয় করল (সপ্তাহে—সপ্তাহান্তে—একটি কোরে scene, এভাবে করলেও ভাল হয় অর্থাৎ sceneটি class-এ পড়ানো হোল, তারপরই অভিনীত হোল), তারপর হয়তো বা ইংরিজীতে করল; সেক্সপীরির ইংরাজী নয়, শিক্ষকশিক্ষিকাকৃত তার modern English renderingটা (যেখানে আবশ্যক সটীক, অর্থাৎ সেক্সপীয়র যেখানে এক লাইন লিখেছেন শিক্ষিকা হয়ত সেটিকে পাঁচ লাইনে সরলীকৃত করেছেন। চেষ্টা রাখতে হবে যাতে কোথে নাট্যরস খুব বেশী না হ্রাস পায়)। সেক্সপীয়ারের অভিনয় এবং শ্রেষ্ঠ অভিনয় বারবার শুনে শেখবার এবং উপভোগ করবার জন্য কিছু record ও gramophone কিনতে হবে। মাঝি-মাল্লিক pin যেমনভাবে সরেস অলিভিয়ার আমাদের ছাত্রদেরকে নীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা অভিনয় শিক্ষণে লেগে যাবেন; যত খুশী slow কোরে দিয়ে বই যাতে কোথে শোনো। যেমন লোকে 'সিরাজউদ্দৌলা' গ্রামোফোন record এ শুনে শুনে তার নকল করতে শেখে। মেয়েরা তাই শিখবে এবং একদিন stage-এও অনুরূপ ভাবে অভিনয় কোরে পাঁচজনকে চমৎকৃত ও আনন্দিত করতে পারবে। সেক্সপীয়ার যে আসলে নাটক লিখেছেন এবং নাটক যে ভারী সুন্দর জিনিস এ তো জানা চাই। শিশির ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কিছু আবৃত্তি, রবীন্দ্রনাথের কিছু বক্তৃতার record চাই। ইংরাজী সাহিত্যের, ইংরাজী কবিতার অপরূপ সৌন্দর্য কোথায় বোঝবার জন্যে চাই Dame Sybil Thorndyke-এর কিছু আবৃত্তির record। সরকারী হস্তক্ষেপ দরকার—যে বছর যে play পাঠ্য, তার record না থাকলে করিয়ে নিতে। কবিতাটি শিক্ষক শিক্ষিকা আগে ভালো কোরে বুঝিয়ে দিলেন, তারপরই আবৃত্তির recordটি দিলেন—শুধু analysis-এর পর আসল সৌন্দর্যটি বোঝবার জন্যে, আবৃত্তি করতে এবং prosody শেখবার জন্যেও বটে।

দেশবিদেশের প্রতিনিধিমূলক কিছু গানের record থাকবে। ফরাসী মার্সেইয়েজের উদ্দীপনা উন্মাদনাময় সুর কিছুটা উপভোগ করবার জন্যে ছেলে-মেয়েদের আগে বুঝিয়ে দিতে হবে ফরাসী বিপ্লবে এ গানের স্থান কি, কতটুকু তার অবদান। (বোঝিংএর

মেয়েদের linguaphone দেয়া যায়, যাতে তারা conversational ইংরেজীটা শেখে।) বিজেন্দ্রলাল, মধুসূদন এঁদের গুরোধিতাপূর্ণ, দেশাত্মবোধ সঙ্গীত জোগাড় করতে হবে।

ভারতবর্ষের ও অন্যান্য মহাদেশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মঞ্চীন ম্যাপ ইচ্ছে করলে দেয়াল জুড়ে আঁকিয়েও রাখা যায়। কোন কোন ছবি সম্বন্ধে curiosity জাগাবার জন্যে তলাতে 'বলো তো এটা কিসের ছবি, কি হচ্ছে এখানে?' লেখা থাকবে 'উত্তর দেখ ওপাশে রয়েছে উল্টো করে লেখা'—যেন খাঁ খাঁ একটা।

পরশমণি

॥ শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য ॥

হায় ভেবেছি তোমার কাছে সেই তো আমার জয়,
জানি, সকল পাওয়ার পরশমণি তারই মাঝে রয়।
আমার যত ছিলে তুমি
অঙ্গ হয়ে এলো নামি,
গ্রাবনে তার ঘুরে ফিরে হলো তোমায়
সেই তো আমার জয়।

পাছল মেঘে প্রণয় নামে বাঁপে ধরার প্রাণ
হে বিষময়! তখন পাঠাও তোমার ভাঙল বান।
তাইতো প্রিয় তোমার পায়ে
প্রণাম আমার যাই জানাবে
মোর বিরহে পাই যেন গো সরব পরিচয়,
সেই তো আমার জয়।

পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্র-মানস

।। শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায় ।।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মহামানব বিশ্বজননীর অঙ্কের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। যোত্রদান করে বলিয়া যেমন সূর্যের সার্থকতা, তদ্রূপ কবির সার্থকতা তাঁহার কবিতা রচনায়। তবে কবি রবির সার্থকতা সম্পর্কে এই যুক্তি সম্পূর্ণ প্রযুজ্য নহে। কেননা বিশ্বের দরবারে কবি বলিয়া পরিচিত হইলেও ভারতবাসীর অন্তরে তিনি কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্, সুসাহিত্যিক ও দেশ-প্রেমিক হিসাবেই পূজ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থগুলির সহিত সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। এক্ষণে তাঁহার পত্রসাহিত্যের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, 'অনেক দূরে থাকার প্রধান সুবিধা হইল, চিঠির আনন্দ উপভোগ। চিঠি তো বেশী কথা বলে না, কিন্তু সেই খানেই তার দাম। হাজার কথায় যা হয় না, চিঠির কয়েকটি পদে সেই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন হয়'। তিরোভাবের পূর্বদিন পর্যন্ত তাঁহাকে অজস্র চিঠি লিখিতে হইয়াছিল। তিনি ছিলেন ভ্রমণ-বিলাসী। অন্বেষণকে জয় করিতে, অজানাকে জানিতে এবং অচেনাকে চিনিতে তাঁহার অভিলাষ ছিল দুর্দমনীয়। অবকাশ পাইলেই তিনি দূরের দিকে পাড়ি দিতেন। কখনো নূতনের পরশে কবি-অন্তর পুলকে ভরিয়া উঠে, পরক্ষণেই পুলকের নীলাকাশ দুশ্চিন্তার মসী মেঘে আচ্ছাদিত হয়। দুশ্চিন্তার ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় পত্র প্রেরণ ও সংবাদ আদান-প্রদান। বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীকে যদি দর্পণ বলিয়া আখ্যাত করি, তবে বিনা দ্বিধায় বলা যাইবে যে, এই দর্পণে রবীন্দ্রনাথের দুঃখাপেক্ষা সুখের তথা যন্ত্রাপেক্ষা কবির অন্তর পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

শান্তির পূজারী রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতই চাহিয়াছিলেন যে, শান্তি-নিকেতন এমন এক আদর্শ-বিদ্যালয় হউক যেখানে থাকিবেনা দলতা, হিংসা, দ্বেষ ও অশান্তি এবং পাশাচার। তদ্রূপ অধ্যাপক সুহৃৎকুমারকে লিখিলেন, 'ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক,—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা আমাদের শান্তিনিকেতন।..... শান্তি-নিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আগ্নির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে।" বিলাতের আন্দোলন তখন জমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল বলিয়া কবি দুঃখিত হইয়া শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবের পর শান্তিনিকেতনের কী অবস্থা হইবে এই দুশ্চিন্তা কবি আর একখানি পত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন—'আমি যখন বিদায় নেব, যখন থাকবে সংসদ, পরিষদ ও নিয়মাবলী তখন স্বাধীনতা ও কর্মের সামঞ্জস্য সংঘটিত এই ব্যবস্থা থাকবে না।.. কিন্তু যারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ তারা একে বিশ্বাস করে না। এরপরে ইস্কুল মাষ্টারের ঝাঁক নিয়ে তারা অতি বিশুদ্ধ অ্যাধিতিক নিয়মে চাষ বাসবে, শান্তিনিকেতনের আকাশ ও প্রান্তর ও শাল-বীথিকা বিমর্ষ হয়ে তাই দেখবে ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। তখন তাদের নালিশ কি কোনো কবির কাছে পৌঁছবে।"

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নির্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে (১৩ই এপ্রিল ১৯১৯) তাহাতে কবি-চিত্তে বেদনা-বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবি ইংরাজ-প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি প্রত্যাখ্যান করিতে মনস্থ করেন। ফলে যে কবি তাঁহার উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়া ভাইসরয়কে চরম পত্র লিখিলেন। স্থানাভাবহেতু কবির সেই চরম পত্রের অনুবাদ কথাংশরূপে নিম্নোদ্ধৃত করিলাম—"...হতভাগ্য

পাঞ্জাবীদিগকে যে ভাবদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই সব প্রয়োগবিধির বিশেষত্ব আমাদের মত কয়েকটি আধুনিক ও পূর্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন।...যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে আমাদের গবর্নমেণ্ট রাজধর্ম-বুদ্ধি লুপ্ত করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম-নিয়মের অনুযায়িক মহত্ত্বাশয়তা অবলম্বন করা এই গবর্নমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আমি এইটুকুমাত্র করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহুকোটি যে ভারতীয় প্রজা অন্ত আবশ্যিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণী দান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অন্তকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসম্মানের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনার মধ্যে অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মানচিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাঁহাদেরই পাশে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদার চিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণ বশতঃ বড়ো দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অন্ত এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতি-দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।" এবম্প্রকার মানব প্রেম তথা স্বদেশপ্রেম সত্যই দুর্লভ !! দেশকে তিনি জননী এবং দেশবাসীকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন বলিয়াই তাঁহার ন্যায় মহামানবের পক্ষে এ হেন স্বার্থত্যাগ সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান, জপ-তপ সব কিছুই ছিল দেশ এবং দেশবাসী। সেই যুগে তিনি ছিলেন রাজনীতির গুরু এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত তাঁহার পত্রগুলিই এই সাক্ষ্য বহন করে, ইহা অতিরঞ্জিত নহে।

রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির কবি বলা হয়। কোনোপ্রকার কৃত্রিমতা যাহাকে বলা হয় 'আর্টিফিসিয়াল' তাহা তাঁহার নিকট আসা দূরের কথা, স্থান লাভও করে নাই। মুক্ত প্রকৃতিই কবির সাহিত্য-ক্ষেত্র। প্রকৃতির সরল-সরস বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। শিলঙে বাসকালীন একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন—"পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি...। চেয়ে চেয়ে মনে হল ঐ একটি দেবদারুর মধ্যে যে ভাবল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো...। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে এগিয়ে চলবে"। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতির মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের আভাষ পাইয়াছিলেন,—অনুরূপ পত্রগুলি সেই সত্যতা প্রমাণ করে।

রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিই ছিলেন না,—দার্শনিকও ছিলেন। অল্প কথায়, সীমায়িত যুক্তিতে তিনি দর্শন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন—অথচ এমনভাবে করিতেন যাহাতে সহজবোধ্য হয়। দেবতায় উপলব্ধি সম্বন্ধে একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের যে ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি, তিনি যত বড়, তার সমস্তটা যদি আমাদের সামনে আসতো, তা হলে আমরা সইতে পারতুম না। যতই উপরে উঠিনা কেন তিনি আমাদের ছাড়িয়ে যান না, বরাবর আমাদের সঙ্গী হয়ে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন। বুদ্ধিতে বুঝতে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চলতে থাকে। তাইত তাঁকে বন্ধু বলতে আমাদের বাধে না। তিনিও তাঁর ওপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন। এত ওপরে চড়ে যান না যে তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হয়ে ওঠে।" কত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, কত সরল যুক্তি। যে-ঈশ্বরকে আমরা রীতিমত ভয় করি, যাহার সহিত

আমাদের বিরাট ব্যবধান তাঁহাকে তিনি করিয়াছেন 'বন্ধু', আর বিরাট ব্যবধানকে করিয়াছেন 'নিকট'।

অন্তরে চির নূতন, চির সজীব থাকিলেও দৈহিক দিক হইতে কবি ক্রমে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। ১৩০৪ সালের শুভ ১লা বৈশাখ কবি রাণী দেবীকে যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে কবি তাঁহার কর্মজীবনের কথা প্রকাশ করিলেন—"এবার আমার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল। একে বলা যেতে পারে শেষ অধ্যায়।... আমার বীণায় অনেক বেশী তার—সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড়ো কঠিন। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবিই আমাকে মানতে হল—কোনোটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার সুরের গানের আসর জমে না।...অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার অধিষ্ঠিতি।...আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম দ্বৈরাত্ম্য আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর ও এমন প্রবল কান্না।"

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পত্র লেখার গণ্ডী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। কতকগুলি তাঁহার জীবদ্দশাতেই "ছিন্নপত্র," "পত্রাবলী" ও "পথে ও পথের প্রান্তে" নামক পুস্তকগুলিতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন "রাশিয়ার চিঠি" প্রভৃতি পুস্তকগুলি সর্বজনবিদিত। পাশ্চাত্য দেশে পত্রসাহিত্য বহুদিন ধরিয়া সাহিত্যের অন্যতম একটি অংশরূপে জনপ্রিয়। কিন্তু ভারতবর্ষে বিখ্যাত ব্যক্তিদের লিখিত অনেক পত্র থাকিলেও, উল্লেখযোগ্য পত্র-সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। এই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার প্রতিটি পত্র সাহিত্যগুণান্বিত। আমাদের দেশের পত্র সাহিত্যের ভাণ্ডারকে অপূর্ব রত্নরাজিতে পূর্ণ করিয়াছেন তিনি। এই সকল পত্রগুলি সাহিত্যগুণান্বিত তো বটেই, কিন্তু সকলের উপরে পত্রগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-পুরুষটি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রগুলির মধ্যে আমরা কেবল কবি বা ভাবুক রবীন্দ্রনাথকে পাই না, আমরা পাই মানুষ রবীন্দ্রনাথকে। গভীর স্বদেশপ্রেম, প্রকৃতি-প্রীতি ও ভগবদ্‌সাধনা সমস্ত মিলিয়া যে পূর্ণ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, তাহারই চরম প্রকাশ উল্লিখিত পত্রগুলি।

'...দূরের সঙ্গে নিকটের অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধ-পথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অন্তরশক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

তাই আমি এই বলি, লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটিই গোড়ার কথা।...'

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

—১৯৫১—

(২৩)

সকালে রেণু সহ হাঁটিয়া আফিসে যাই, সেখানে সাময়িকীটা শুনিবার জন্য। রেণুকে ডিম সিদ্ধ, ২টি রসগোল্লা ও একটি জিলাপী রেণু আনিয়া খাওয়ায়। রেণু ডাকটিকিট সংগ্রহের কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। কোনও ভ্রুক্ষেপ করে নাই। আসিবার সময় দুই আনার ডালমুট কিনি ও এখানের শিশুদের বিতরণ করি। কিন্তু পরেই মিহু দক্ষিণেশ্বর হইতে ফলাদহ আসে···। রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া ৪টায় এখানে আসে।···মিহুকে মহাপ্রভুর সেই কয়েকটা লাইন বলিয়া দিলাম যাহার মধ্যে আছে, 'অতন্দ্রিতা রাখ যাহে লোক-ব্যবহার। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার'॥ পথ ঘুলিয়া যায়, টানাটানি করিলে আরও শক্ত হয়। এখানে স্থান প্রস্তুত হইলে আসার অসুবিধা হইবে না। ৩টার পর বীরেন ব্যানার্জী আসে।···শ্রীকৃষ্ণকে 'কুশলো হি অবকর্ম্মাণি' বলা হইয়াছে। ছোট বড় সব কর্ম্মেই তিনি কুশল। কি অদ্ভুত। কেন জানি না তাঁহার চরণে প্রেমের ফাঁদি গাদিয়া গিয়াছে। তিনি ছাড়া আমার কিছুই নাই।···সত্ত্ব নির্গুণ যদি ব্রহ্মসৎ, তবে সত্ত্ব-নির্গুণ, রজো-নির্গুণ, তমঃ নির্গুণও ব্রহ্মসৎ। ইহাকেই তো তন্ত্রপ্রদীপে বলা হইয়াছে নির্গুণ সত্ত্ব, নির্গুণ রজঃ, নির্গুণ তমঃ। ইহার পরই হরিদাসী আসে রেণু সহ। সে মন্ময় সঙ্গে কথা কয়। পূর্ব্বের মত সে যে আর সংসার করিতে পারিবে না, তাহারই ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে নীহারের এই অকস্মাৎ চলিয়া যাওয়ার ভিতর দিয়া। ঠাকুর ঘটনার মোড় ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।···

২০শে জুন

সকালে প্রাবণের জন্য 'ভূমি নৈমিক' প্রবন্ধটী শেষ করি। স্নানের পর রেণু আসে। কিন্তু পরেই প্রেসে প্রুফ দিয়া আসিতে পাঠাই। সেখান হইতে আবার ফেরে। ৩০টার পর কুসুম প্রোডাক্টে যায়, বিজ্ঞাপন নিয়া মেডিকেল কলেজে চিদানন্দের সঙ্গে দেখা করে, মন্ময় জন্য খদ্দরের কাপড় কেনে আমার জন্য। আফিসে ফেরে ৭ টার পর। আমি ও প্রতিভা ৬ টায় আফিসে যাই। পথে আলোচনা হয়—এ সংসারটা সরল রেখায় চলে না, চলে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া (spiral)। 'সরল রেখায় চলা'র আহ্বান বলিয়া যখন বাঁকাইয়া চলিবার জন্য ধাক্কা আসে, আঘাত আসে, তখন তাহা অপ্রত্যাশিত বলিয়া প্রথমে মনে করি। কিন্তু যে জানে যে চলিবার মাঝে মাঝে বাঁকাইয়া যাইতে হইবে, সে তো পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকে, তাহার উহা বিপদ মনে হয় না, বিপদ আসেও না। সরল-বঙ্কের সমন্বয়ে এই জগৎ। তাই শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিম, কৃষ্ণের জগৎটাও বঙ্কিম। সরল-বঙ্কিম পথ চলার সাধনা শিখানোই পুরুষোত্তম কৃষ্টির লক্ষ্য।···একটু পরেই চারুবিকাশ নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় আসেন, তাঁহাকে শনিবারের চিঠির 'মানুষে যা চায়' পড়িতে বলি। পড়ার মধ্যে যতীশ দাশগুপ্ত আসে।···ধনী কুলীন পণ্ডিত কাহারও সঙ্গে সহজে বনিবনাও হওয়া সম্ভবপর নয়। ইহাদের বিরুদ্ধেই আমার অভিযান। কাণাকড়ি লইয়া চলিয়াছি, সেই কাণাকড়ি দিয়াই সকলকে জয় করিতে চাই। কাহারও কাছে আত্ম-বিক্রয় করা চলিবে না। পাইব একদিন হয়তো অনেককেই কিন্তু তাহা কাণাকড়ির সাধনার ভিতর দিয়া—ইহা যতীশকে বলি। কলিকাতাকে আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা আমার প্রবল, সময় সুযোগের অপেক্ষায় আছি। প্রায় ১০টায় আশ্রমে আসি ও প্রতিভা ফিরি।···রেণুর আত্ম-রক্ষার জন্য ঐ বাড়ী ত্যাগ করা উচিত এবং—এর টাকার

চাপ হইতে মুক্ত হওয়া উচিত। ঠাকুর আমাকে মুক্তি দিয়াছেন যে, আমি কাহাকেও অর্থ দেওয়ার চাপ দিয়া ভালবাসা দাবী করার সুযোগ পাই নাই। আমাকে ভালবাসা না বাসা তাহাদের ইচ্ছা ও প্রাণের উপর নির্ভর করে।

২১শে জুন

সকালে শ্রাবণ-মাসের জন্য গীতা-ভাষ্য লেখি।... প্রেস ও হিন্দুস্থান ঘুরিয়া রেণু এখানে আসে ২টায়। শ্রাবণের প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করে, আগেরটী ঠিক হয় নাই।...ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। তাহার কাছে শুনিলাম অম্বুজা ঘোষ সম্পাদিত 'জনসেবক' পত্রিকায় (বোধহয়) বিপিন পালের মৃতিপূজা উপলক্ষে বক্তা হিসাবে বিপিন পাল, লালমোহন ঘোষ ও আমার নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঠাকুরের সেবায় এই বক্তৃতা শক্তি লাগিত বাকী বয়েকটা দিন, সার্থক হইতাম। বলার সাধ মিটে নাই, বিষয়ও ফুরায় নাই, অথচ আমি নীরব। বেদনায় বুক ভরিয়া উঠে, এমন কাহার হয়? ঠাকুর ঠাকুর! ছুটিবার জন্য আমও তো প্রাণ পাগল। একেবারে যে মনে মনে ফিক। তবুও প্রতীক্ষায় থাকিব।.. আগামী সোমবার রেণু প্রতিভাকে লইয়া ট্রপিক্যালে যাইবে, ধীরেন (ডাক্তার) সেখানে থাকিবে। সুধাংশুকে ব্রহ্মসূত্রের ২য় খণ্ড দেওয়া হইল আজ। নীলুকে পাঠানো হইয়াছে। কুসুমকে পাঠাইয়া দিব। আমার যাহা-কিছু সম্বল, তাহা পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেই মুক্তি। ইহারা সকলে কাছে থাকিত, ইহাদের নিয়া অভিমান করিতাম। আমি এখনও শুকাইয়া যাই নাই, যদি যাই, এখনও গর্জন আমার বুকের মধ্যে রহিয়াছে। আমি নিভিয়া যাই নাই, সেদিনের মত প্লাবন আনিবার শক্তি আজও আমার আছে। সুযোগ আসিবে। ৯।০ টার পর আমি ও প্রতিভা আসি। মন্ত্র অনুবাদী করে নাই। মিহুকে বলিয়া দেওয়া হইল না, যোগদান করিবে না।...

২২শে জুন

সকালে গীতা ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি ঠিক করি এবং 'কলিকাল ও শ্রীকৃষ্ণ' প্রবন্ধের 'কলিযুগ' লক্ষণ আশ্রম হইতে তুলি। রেণু আসে ২টার পূর্বে।...৩টার মধ্যেই বারাণসী যাইবি: হইতে ৮০২ খানা পত্রিকা দিয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞাপনের অংশ ওলট পালট হইয়া গিয়াছে...এক রকম না একরকমের ত্রুটি যে-কোন ভাবেই থাকিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যার পর খুব ঝড় হয়। রাস্তাঘাট সব ডুবিয়া গিয়াছিল। ৯টার পর যখন আমি ও প্রতিভা আসি, তখন রাম বিহারী ও রসারোডের মোড়ে জল ঠেলিয়া আসিতে হইয়াছে। প্রেসের ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছিল, বিশুঙ্খল কাজ করা কি দুরূহ! 'সর্বারম্ভাঃ হি দোষেন আবৃতাঃ' কথা ঠিকই।...রেণুর তাহার মায়ের সঙ্গে স্বতন্ত্র স্থান করা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বতন্ত্র স্থান রেণুর করিতেই হইবে। আফিসে যাইতে নিশীথ কুণ্ডুর সঙ্গে সতীশ মুখার্জী রোডের মোড়ে দেখা। সে 'শ্রমীবের কথা' নামে একটী পাক্ষিক পত্রিকা রায়গঞ্জ হইতে বাহির করিয়াছে।...

২৩শে জুন

...প্রতিভা...ট্রপিক্যাল হইতে ফেরে ১২।০টায়, রেণুও। রেণু যাওয়ার পর প্রেসে যায়।...যাহার জন্য যাহা করা উচিত ও সম্ভব—তাহা আমি করিয়াছি—ইহাই আমার আত্মতৃপ্তি। জীবনে যার যার স্থানে রাখিয়াছি, কাহাকেও কোল পীঠ করি নাই। তাই কেহ আমাকে ধরিয়া ফেলিতে পারে নাই। একটা বিরাট কর্মস্রোত, মানুষের যাওয়া-আসা আমাকে সকল বন্ধন হইতে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল। আমি ছিলাম নিরাপদ; ইহাই 'যোগমায়া-সমাবৃত'। নবদ্বীপে রোজ কত মানুষ আসিয়াছে—গৃহী বৈরাগী যুবক বৃদ্ধ নর নারী! সর্বদা তাহাদের নিয়া আলোচনায় ডুবিয়া থাকিতাম। রাজনৈতিক জীবনের তো কথাই নাই, কি লোকসঙ্কট ছিল সঙ্গে সঙ্গে! সারাদিন থাকিতাম কর্মব্যস্ত, মানুষ নিয়া হৈ হৈ। আমার অবসর ছিল কৈ? আমি ছিলাম সব-কিছুর মধ্যে যুক্ত। আমার জীবনে কত ভয়ের, কত

মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন, কত বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষই যে আসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার ব্রাহ্মত্বের, ক্ষত্রিয়ত্বের, শেষে বৈশ্যত্বের দিক দিয়া কত মানুষের সঙ্গেই পরিচিত হইয়াছিলাম, যুক্ত হইয়াছিলাম! আমার জীবন কি বৈচিত্র্যপূর্ণ, কি সমস্যাবহুল, কি জটিল। ইহার সম্পূর্ণ সমাধান বর্ত্তমান সময়ে একরূপ অসম্ভব। তবুও তো চলিতেছি। আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে কেহ পারিবে না। রাত্রি ৯।০টায় আমি ও প্রতিভা আসি।

২৪শে জুন

সকালে ধীরেন ব্যানার্জীকে লইয়া রেণু জিতেন গুহের কাছে যায়।...রেণু আসে ৮।০টার পর, রেণু ও প্রতিভা যায় এবং ১০টার পর হোয়াইট প্রিন্টিং কাগজ, নারী-প্রগতির জন্মকথা, অন্যান্য জিনিষ লইয়া ঠেলা আসে। আরও কিছু বাকি থাকিয়া যায়। দীর্ঘকাল পরে প্রতিভার কলিকাতায় বাসা গেল। কি ইহার ইঙ্গিত? Concentrate করাও আজ দরকার হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের অগ্রগতির জন্য। একতন্ত্র, একপ্রাণ, একমন হইলে আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা দিতে কেহ পারিবে না—এ সম্বন্ধে আমার এতটুকুও দ্বিধা নাই। রেণু ২টার পর আসে। বইগুলি যথাস্থানে রাখে।...বই গুছাইবার পর রেণু বলিল, এখানের arrangement disturb না করিয়াই রাখা হইয়াছে। সৃষ্টির arrangement disturb না করিয়াই ফাঁক দিয়া আগাইয়া যাওয়া যায় এবং তাহাতেই সৃষ্টি আবার গড়িয়া উঠে। ৫টার পর আমরা আফিসে যাই। আফিসে যামিনী গোস্বামী ও তাহার পুত্র নারায়ণ রাত্রি ৮টার পর আসে।... সকালে আমি ধীরেন ব্যানার্জীর প্রবন্ধটী ঠিক করি এবং জাগরণের জন্য খণ্ডে বন্দিমুক্তির আরও যে লেখা আছে তাহা পড়ি। রেণু ও প্রতিভাকে ৪০৲ টাকা দেওয়া হয়।... হোয়াইট প্রিন্টিং কাগজগুলি (২০ রীম) আমার ঘরে আমার খাটের পাশেই রাখা হয়।...কাগজ ও বইয়ের চাপে চাপা পড়িবার অবস্থা আমার।

২৬শে জুন

খুব ভোরে রেণু মিহুকে আনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর যায়। বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া আসিতে আসিতে প্রায় ১০টা হয়। ইতিমধ্যে পাকল আসে কয়েকটী আম লইয়া। সে উজ্জয়িনীতায়তের ৪৲ টাকা দিয়া যায়। মিহুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর পাকল চলিয়া যায়। পাকল ও তাহার কন্যা দুপুরে এখানে প্রসাদ পায়।...৩টার পর মিহুকে নিয়া প্রতিভা মহানির্বাণ মঠে যায়। রেণু একবার প্রেসে ও দীপ্তি দর্শনের স্থানে যাইয়া এখানে আসে ৩টায়। আমি ও রেণু আফিসে যাই। কিছুটা পরে ধীরেন ব্যানার্জী আসেন। ইতিপূর্ব্বে রেণু আমাকে 'অচল পত্র' শুনাইতেছিল। কি নোংরা। কলিকাতায় এত হাঙ্গা, এত বিশ্রী কাগজ চলিতে পারে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ২।১টা বিষয় ধীরেন বাবুকেও শুনানো হয়। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে 'অশ্বত্থামা হতঃ' ইহা বলিতে বলিয়াছিলেন—সেই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ ছিল বলিয়াই যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন হইয়াছিল, মিথ্যাভাষণের জন্য নয়, কেননা সত্য-মিথ্যা কি তাহা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা যুধিষ্ঠির বেশী জানেন না। জয়া আসে...। মদনগ্রাম হইতে গোপাল অধিকারী প্রেরিত কেদার নামে একটী ভদ্রলোক আসিয়াছিল সকালে আমাকে সেখানে কম্যুনিজম প্রতিরোধ করিতে যাইবার জন্য। বর্ত্তমানে পারিব না বলিয়া দিলাম, মনুর জন্য ও আমার শরীরের জন্য। রেণু দক্ষিণেশ্বর হইতে মিহুকে নিয়া আসিয়া এখান হইতে প্রতিভার বল লইয়া ট্রপিক্যালে দিয়া আসে।

২৭শে জুন

খুব সকালে প্রার্থনার পর বেহালা যাই, আমার সঙ্গে রেণু ও মিহুও বাহির হয়। তাহারা বাসে দক্ষিণেশ্বর যায়, আমি ট্রামে বেহালা যাই। রেণু দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া প্রতিভাকে নিয়া ট্রপিক্যালে যায়।...নীলুর এসেন্সোপ পাই। সে আসিবে, তবে অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে পারিবে না।...অনেক দিন পরে প্রাণে প্রাণে একটা সত্যিকার তৃপ্তি পাইলাম নীলু আসিবে শুনিয়া। সে

আসিলে তাহার কার্যের ভিতর দিয়া তাহার সমস্ত ভার নেওয়াও কিছু অসম্ভব নয়,...রেণু কলিকাতা ঘুরিয়া এখানে আসে ২টার পর।...গিয়া দেখি মাখনবাবু হিসাবের খাতা ঠিক করিতেছেন।...

২৮শে জুন

প্রার্থনার কিছু পর আমি ও প্রতিভা যাই রেণুর ওখানে। কিছু পরে আমরা একত্র হইয়া হাঁটিয়া মহিম হালদার ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত যাই, আমি ভাগিনেয়দের বাসায় যাই এবং উহারা বাসে মেডিকেল কলেজে যায়। সেখানের ডাক্তারকে দেখানো সারিয়া ট্রপিক্যালে যায়। পরে উভয়ে চলিয়া আসে প্রায় ১০টায়।...রেণু কলিকাতা বৃষ্টির মধ্যে ঘুরিয়া প্রায় ৪টায় এখানে আসে।...আষাঢ় মাসের পত্রিকায় আরও ভুল ধরা পড়িয়াছে।...আজ সারা দিন মনে হইতেছিল, সকলের উপর সকল দাবী করা ছাড়িয়া দিব কি না। অনেকের উপরের দাবী আজ আর করি না। দাবীর মধ্যে সন্তোষ থাকে না, 'যা দিয়েছ তাই পেয়ে প্রভু সুখী আছি আছি হয়ে'-র অবকাশ আছে। কিন্তু এইরূপ সুখে থাকার অন্তরে যদি বিষাদযোগ না থাকে, মানুষ সামনের বাধা দেওয়ার আবেষ্টনকে হয়ত করিবে কি করিয়া? চাওয়ার দাবী যেমন মাত্রাছাড়া হইতে পারে, হওয়ার দাবীও মাত্রা ছাড়া হইতে পারে। যাহা চাই, তাহা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব কি না তাহাও তো বিবেচ্য। আরও হওয়ার দাবী বারবার করিলে যে হইবে তাহার মন দমিয়া যাইতে পারে। তবে সত্যই অগ্রগমন যে চায়, সে পথের ভুল হওয়ার ভয় তো পায়ই না, বরং যে ভুল দেখায়, তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুধু ভুলই দেখান, 'চক্ষুরুন্মিলিতং যেন'। আর আমার কি দাবী? মানুষ হও, আগাইয়া যাও।...

২৯শে জুন

আমি আজ 'কলিকাল ও শ্রীকৃষ্ণ' প্রবন্ধ (ভাদ্রমাসের জন্য) লেখা শেষ করি। রেণু ভোরে সুহৃৎবাবু, প্রিয়দা-রঞ্জনবাবু, হরিদাসীর ওখানে যায়। সুহৃৎবাবুর কাছে উজ্জলভারত প্রিয়—তাহাও বলিলেন।...নীলুকে পত্র দেয়—উজ্জলভারতের যথেষ্ট future possibility আছে, উহা সকলেরই মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করিতে পারিবে যদি নীলু আসিয়া ইহার অফিসের ভার নেয়।... মাখনবাবু আসিয়া হিসাব মিলান। আগের হিসাবের চেয়ে দ্বিতীয় বৎসরে ৫০০৲ টাকারও বেশী খরচ হইয়াছে, অথচ লেখা হয় নাই—বাহির হইল।...দীনেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন সাহিত্যিকের উজ্জলভারত সম্বন্ধে বেশ একখানি appreciation আসিয়াছে। সত্যিই উজ্জলভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, যদি 'তাহাকে প্রাণস্পর্শ দিয়া ঘিরিয়া রাখা যায়; বুদ্ধির প্রখর তাপে সে শুকাইয়া যাইবে। উজ্জলভারত ব্রহ্ম-সম্পদ—ইহাই তাহার অন্তর্নিহিত কথা।...

৩০শে জুন

প্রার্থনার মধ্যেই রেণু আসে, তাহার আজ জন্মদিন। আমার পুরুষোত্তম-সেবার পথে তাহার জন্মগ্রহণ সার্থক হউক—ইহাই আজিকার দিনের প্রার্থনা। কিছু পরে সে যায়। আমি সাময়িকী 'বনমহোৎসব' কিছুটা লিখি।... কুপার ষ্ট্রীটে মিসেস রায়ের কাছে রেণু যায় প্রেসের বর্ত্তমান ঘটনাবলী জানাইতে, কিন্তু তাহারা বিলাত গিয়াছে। রেণু ডালহৌসী ও প্রেস ঘুরিয়া ২টার পর এখানে আসে।...উজ্জলভারতের উপর জ্যোতির্ময় লাহিড়ী, নিখিলবাবু, প্রমোদবাবুদের অভিমত চাওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা ভাল অভিমত দিয়াছেন;...।

২রা জুলাই

সকালে 'বনমহোৎসব' (সাময়িকী) লেখা শেষ করি এবং 'কলিকাল ও শ্রীকৃষ্ণ' প্রবন্ধটী revise করিয়া রাখি। রেণু সকালে ধীরেন ডাক্তার, বিভা সরকার, সুহৃৎবাবু ও এন্ সি গুহ কোংতে যায়। বিভা সরকার ৮৲ টাকা রক্তসূত্র বাবদ দেয়। ২টার পর রেণু কলিকাতা গিয়া ৪টার মধ্যে এখানে ফেরে।...৪টার পর যতীনবাবু 'অসুর' নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আনেন। তিনি 'আপদী' নামে

গুরু গোবিন্দসিংহের একখানি বইয়ের অনুবাদ বাহির করিতেছেন। তাহার মুখবন্ধ হইতে 'হুকীধর্মের উৎপত্তি' অংশের একটী part দিয়া যান উত্তরায়ণে ছাপাইবার জন্য। আচার্য্য শঙ্করের ক্রমবিবর্ত্তন হিসাবে রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণদ্বারা ব্রহ্ম ও বিদ্যার সমন্বয় হইতেছে, এবং আমরা যে ব্রহ্ম অবিদ্যার সমন্বয়ের তত্ত্ব বলিতেছি তাহার আলোচনা হয়। জীবনের সকল aspect-কে চাপা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু একদিন উহা অন্তপ্রকাশ করিবেই। পরাশর, বিশ্বামিত্র, সৌভরি প্রভৃতির জীবনে তাহাই ঘটিয়া উঠিয়াছে। 'রিপু' শব্দের অর্থ 'রু' হইয়া যায় রিপুগুলি যাহার স্পর্শে। অহঙ্কারী জীবের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধের পরিণাম ফলেই হয় রিপুর সৃষ্টি। অহম্ যখন 'পুরুষোত্তমোঽহম্', তখন কাম ক্রোধাদি সব জীবন, জীবনের প্রকাশ ও আস্বাদন। বিকৃতিহীন কাম ক্রোধ হয় যেমন বিকৃতিহীন বায়ুপিত্তকফ হয়। বায়ু অর্থই বায়ু-বিকৃতি নয়, পিত্ত অর্থই পিত্তবিকৃতি নয়, কফ অর্থই কফ-বিকৃতি নয়। সুস্থ বায়ুপিত্তকফ যেমন সত্য, সুস্থ কাম-ক্রোধ লোভ তেমনি সত্য। এইরূপ না হইলে শিব-রামাদির 'মোহ' ব্যাখ্যাই করা যায় না।...

৩রা জুলাই

সকালে আফিসে যাই, পথে জ্ঞানবাবুর (আসানসোল) সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা।...৯টার পর মনোরঞ্জন গুপ্ত।...তাহার সঙ্গে কম্যুনিজমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা হয়। উহারা সমষ্টির উপর জোর দিয়াছে, ভারতবর্ষ সমষ্টি কেমন করিয়া ব্যষ্টিসত্তায় distributed হয়, তাহার পথ দেখাইবে। মনোরঞ্জন গুপ্ত বলিল, অরবিন্দ, গান্ধীজী ও আপনি তো এই পথের কথাই বলেন। 'Thesis on a higher plane is synthesis'—ইহাই হইবে ভবিষ্যতের সত্য। ভারতবর্ষ ইহার অধিকারী। আমার 'সংবিধান সংশোধন ও মৌলিক অধিকার' সাময়িকী পত্রিকে বলি।...রেণুর ছাতা নিয়া আমি এখানে আসি।...

৪ঠা জুলাই

সকালে রেণুর ছাতাটা দিয়া আসিবার জন্য যাই। কিন্তু পরেই ফিরি।...গত কলাই ব্যাঙ্কার্স ইউনিয়নে আমি সম্পাদক ও রেণু সহ সম্পাদিকা এই দুই জনের প্রোপ্রাইটারশীপে এ্যাকাউন্ট খোলার দরখাস্ত দিলাম। আমি মরিয়া গেলে কাম একেবারে অচল হইবে—তাই এই ব্যবস্থা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। নীহারের চলিয়া যাওয়ার পর succession certificate নিয়া যে ফ্যাসাদ, তাহাতে এ সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর গতি নাই। প্রতিভারও মত মিলাম, সে ইহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। খাওয়ার পর রেণু সুমারেশে হাওড়ায় যায়। সেখানে হইয়া লর্ডস এবং এম, বি সরকারে যায়। লর্ডস-এ দুইজন গ্রাহক করিয়াছে। এম, বি, সরকার বিজ্ঞাপন দিবে।...এত বড় কলিকাতা সহরে আজ দুইটী মানুষের প্রাণের মধ্যেই বিচরণ করিতেছি, আমার যাবতীয় কথাবার্ত্তা, সুখ দুঃখের কথা তাহাদের কাছেই কহিতেছি। ঠাকুর আমাকে প্রাণস্পর্শের মধ্যে চিরদিন রাখিয়াছেন। যাহার প্রাণ যখন যখন বিমুখ হইয়াছে, তখনই সেখান হইতে সরাইয়া নিয়াছেন। প্রাণের ভিতরেই আমার আনাগোনা, প্রাণের ভিতরেই আমার গতিবিধি; প্রাণের অন্ন, প্রাণের অর্থই আমার ভোগে লাগে।...

৫ই জুলাই

সকালে ব্লক দেখি। রেণু সকালে ধীরেন বসু, হরেন রায় ও সুধীর সরকারের ওখানে যায়।...রেণুকে লইয়া আমি নিত্যব্রত ও রেণু যাই। ১৪০টাকা দিয়া একটা রথ কিনিয়া দেই। আমিও পিছন পিছন আশ্রম পর্য্যন্ত আসি। পিতৃহীন বালকের জন্য এই কিনিয়া দেওয়াটা প্রাণ চাহিল।...রেণু পাপর ও আলুর চপ কিনিয়া নেয় আমার জন্য। আজ জগন্নাথ পথে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি আজ পথের ঠাকুরের, তাই পথের মানুষ তাঁহাকে ঘিরিয়া টানিয়া চলিয়াছে। ঠাকুরের এই সার্ব্বজনীন রূপই তো উপভোগ্য; তিনি আজ commoner। আমার জীবনও তো এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। যাহা-কিছু সর্ব্ব-

সাধারণের আমলের ভিতরে, তাহাই আমার ভাল লাগে। যাহাতে কাহারও ঈর্ষা আকৃষ্ট হয়, এমন কোনও জিনিস নিজের বা ছেলেপুলেদের জন্য কম পাড়িয়াছি কিনিয়াছি। আমি রবীন্দ্রনাথের 'পনেরো আনা'-র দলের। আমি চাই প্রাণস্পর্শ: উহা না পাইলেই হাপাইয়া উঠি।···নীলুকে পাইলে উজ্জনভারত আর আটকাইবে না। মালতী যদি রেণুর সঙ্গে বাহিরে বাহিরে কাজ করিত, নীলু আমার লেখা বইগুলি ও আফিসের ভার নিত, তবে নিশ্চিন্তই উজ্জন-ভারত দাঁড়াইয়া যাইত। দেখি ঠাকুরের কি ইচ্ছা। আমাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতেই হইবে।···

৬ই জুলাই

সকালে আফিস ঘুরিয়া কৃষ্ণনগরের শঙ্কর মিশনের এক ব্রহ্মচারী আসেন তাহাদের ওখানে আগামী ৩০শে আষাঢ় তাহাদের পরম গুরুদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য 'কর্মজীবনে বেদান্ত' বিষয়ে। অনেক চিন্তার পর যাওয়া স্থির করিলাম। না যাইতে যাইতে ক্রমে যাওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে, মনও দুর্বল হইবে। তাঁহারা শনিবার আসিবেন।···পোস্টাফিস, ব্যাঙ্ক, এম, বি, সরকার ও প্রেস ঘুরিয়া রেণু প্রায় ৪টায় এখানে আসে।···

৭ই জুলাই

সকালে রেণু আসে, প্রুফ দেখে, যায় ১২।০টায়।··· কয়েকদিন হইতে রেণুকে বলা হইতেছে তাহার জীবনাদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হইতে।···ইহাকে জীবনে আস্বাদন করিতেই হইবে, শুধু কাগজে কলমে রাখিলে চলিবে না। আমি যতদূর দেখিতেছি, আমার এখানে রেণু প্রতিভাদের ভিতর দিয়াই নিত্যগোপাল প্রচারিত হইবেন,···। ঠাকুর যে ইহাদের জীবনে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছেন—ইহা কি কম গৌরবের কথা। এ সম্বন্ধে সন্দেহ বা সংশয় থাকিলে চলিবে না। তিনি নিজেকে কৃষ্ণ ও আমাকে রাধারূপে দেখাইয়াছিলেন। ইহা তো শুধু স্বপ্ন নয়। তাঁহার দ্বারা corroborated। সেই উপলব্ধির ভিতর দিয়াই তো ইহাদিগকে আমি টানিয়া লইয়াছি, অন্য কোনও অভিসন্ধি আমার ছিল না। আজ এ সম্বন্ধে রেণু প্রতিভার সঙ্গে আলোচনা হয়। আজ ইহাদিগকে ইহাদের জ্ঞানের স্বরূপ, ভক্তির স্বরূপ, কর্মের স্বরূপ কি তাহা জানিতে হইবে। 'আত্মাকে জান'। নিত্যগোপালকে সারা জীবনে প্রকাশ করাই ইহাদের আত্মস্বরূপের কথা।

৮ই জুলাই

সকালে রেণু হুগলীর সরকারের বন্ধুকে গ্রাহক করিবার ও প্রেসে প্রুফ দিয়া আসিবার জন্য কলিকাতা যায়, বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে শরৎবাবু ও রবীন্দ্রনাথের ওখানা গ্রন্থাবলী আনে। ১টায় এখানে আসে, ২টায় পর সেলস প্রমোশান ও এম বি সরকারে যায়। এম বি সরকার ঈশোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র (১২।০) কিনিবে রেণুর অনুরোধে। ২।৩ দিন পর টাকা দিবে।···এ দিকে বাজার খরচ বাবদ বেহালা হইতে কিছু পাঠাইতেছে না। কি করিব এ বিষয়ে কোনও আলোচনা করিবার প্রয়োজনও তাহাদের নাই। দায়িত্ব এড়াইবার বুদ্ধি কি ভাল? থাকিলে দিবে, না দিতে পারিলেও কি করা উচিত তাহার পরামর্শ করা উচিত। কাহার সঙ্গে আলোচনা করিব? আমি কি অর্থোপার্জনের জন্য বাহির হইব? কে আমাকে কাজ দিবে? বেদনায় বুকটা ভরিয়া উঠিল। আমাকে দিয়া কাজ হইবে, অথচ এতটুকু ভার বহিবার শক্তি আমার নাই। তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকাই তো উচিত; কিন্তু থাকিতে দিবে কে? এখান হইতে চলিয়া যাওয়াও তো বর্তমান অবস্থায় সঙ্গত নয়, শোভন নয়। কাহার উপর ফেলিয়া যাইব? উমাদিদিরই বা কি হাল হইয়াছে। সম্ভব হইলে টাকার সব দায়িত্বই আমরা নিতাম। নোংরামি তো জীবনে করি নাই; কাহারও সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটিও করি নাই। মহৎ টাকাও তো বেশী খরচ করা চলিবে না। একদিন এখানের ভার প্রতিভা-কুসুম কিছা করিয়া ৩৪ টাকা মণি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া বহন করিয়াছে। তাহাদেরও তো নাই। রেণুর

হাতে থাকিলে তাহা নিতে পারিতাম। আমি ও প্রতিভা ৪টার পর আফিসে যাই। কিছু পরে রেণু ফেরে। সন্ধ্যার পর ডাকাত দাশগুপ্ত আসে। একদিন বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া গ্রাহকদের সাহায্যেই পত্রিকা চালাইব—এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলাম। সে শুনিয়া খুশী হইল।…

৯ই জুলাই

সকালে আফিসে যাই, দুই ঘণ্টার উপর থাকি।… খাওয়ার পর বাহির হইয়া রেণু রাইটার্স বিল্ডিং, সুনীল দাস, নলিনী দত্ত, মন্মথ রায় প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া ৪টার পর ফেরে।…(আফিসে) শরৎচন্দ্রের কর্মজীবন পাঠ হয়। গত সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রের 'যোবর্দ্ধমার কল' পাঠ হইয়াছিল। ধীরেন ব্যানার্জী আসেন।…তখন বলিলে তো অভি-যোগের সুরেই বলা হইত, আমার কৃত বাতলানো হইত না।…আমি এই উপলক্ষে মন্থর বিবাহের সময় আত্ম আত্মীয়ের নিমন্ত্রণ না হওয়া ও মুকুন্দ দাসের যাত্রার প্রাক্কালে সময়ে আমার নিমন্ত্রণ না-হওয়ার ব্যাপারে যাহা আমি করিয়া ছিলাম, তাহা বলিলাম। জীবনে আমি কাহারও কোনও ব্যাপারকে আমার ব্যাপার মনে না করিয়া তাহার সম্বন্ধে কোনও অপসিদ্ধান্ত করি নাই। কাহারও বাড়ী গেলে আমার প্রাপ্য মর্য্যাদা যদি কেহ না দেয়, আমি তাহাকে দিয়া তাহা নেওয়াইয়া তবে আসি। সত্যব্রতের বিবাহের ব্যাপারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও বলি।…

১০ই জুলাই

সকালে 'দেবীসূক্ত' প্রবন্ধটা শেষ করি, প্রতিভাকে নকল করিবার জন্য দেই। প্রাথমের তৃতীয় কর্ম্মার প্রথম ফর্ম দিয়া যায়। ৭টার পর জয়ার পুত্র দেবুকে নিয়া রেণু এস সরকারের বাসায় যায়, সেখানে ৩০৲ টাকায় তাহার টিউশান ঠিক হয়। ১১টার পর হোটেলে জানবাবুর ওখানে যায়, আসিবার পথে ব্যাঙ্ক ও সোস্যাইটিতে যায়। ২টার পর এখানে আসে।…প্রায় ১২টায় শম্ভু মজুমদার …আসেন, দক্ষিণেশ্বরে যে International Guest House হইতেছে, তাহার কথা বলিতে। তিনি তাহার সঙ্গে যুক্ত। ভারতীয় ঐতিহ্য, বৈদিক ধর্ম্ম যজ্ঞের রাখা ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য বলিতে কোন্ ঐতিহ্য বুঝিব? যে ঐতিহ্য সকল বিরোধীদের মুখ বন্ধ করিয়া বিরোধের নিষ্পত্তির কথা বলিয়াছেন, অবিরোধ অধ্যায়ের ভাষ্য লিখিয়াছেন সেই ঐতিহ্য রক্ষা তো বর্ত্তমানে চলিবে না। কিছু পরে তিনি চলিয়া যান।…

১২ই জুলাই

…প্রতিভা মৈত্রের 'শ্রী' হইতে গোপেন্দু সাংখ্যতীর্থের 'বেদ ও বাঙ্গালী', নগেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পূজাহুষ্ঠানে বৈদিক রূপ', সুরেশ দেবের 'ভারতীয় সংস্কৃতি' পড়িয়া শুনায়। কয়েকদিন হইতেই 'রেশনিং ও কালোবাজার' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখার কথা মনে হইতেছে। রেশনিং-এর বিধি থাকিবে অথচ চোরাকারবার থাকিবে না—ইহা মনস্তত্ত্ব-বিরুদ্ধ। বিধির কর্ম্মই হইতেছে প্রসারিত না হওয়া এবং সহজ জীবনকে সঙ্কুচিত করা। তাই বৃন্দাবনে রক্ষার সঙ্গে, ইন্দ্রের সঙ্গে, বরুণের সঙ্গে প্রাণের সংঘর্ষ হইয়াছিল। বিধি কখনও প্রাণের দাবী স্বীকার করে না—অথচ প্রাণের দাবী প্রাণীমাত্র স্বীকার করিতে বাধ্য। বিধি চায় প্রাণের দাবীকে সঙ্কোচ করিতে, প্রাণ তাহা চায় না। তাই বিধিকে ফাঁকি দিতে সে চোরাকারবারের আশ্রয় নেয়। বিধি ও প্রাণ পরস্পর-বিরোধী। যতদিন প্রাণ বিধির সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না করিতেছে নিজের বিস্তার সাধন না করিতেছে, ততদিন চোরাকারবার বন্ধ হইবে না। বিধি বিচারমূলক, প্রাণের সঙ্কোচমূলক। প্রাণ যদি স্বেচ্ছায় এই সঙ্কোচন না মানিয়া লইবার সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ না করে, রাষ্ট্র বিপন্ন হয়, বিধি তুলিয়া দিতেও পারে না, চোরাকারবার বন্ধ করিবার শক্তিও তাহার থাকে না। সেই জন্য চাই বুদ্ধিমূলক বিধি ও প্রাণের দাবীর সঙ্গে সমন্বয় বিধান করিবার উপযোগী তত্ত্বপ্রচার, নেতাদের তদনুযোগী পুরুষোত্তমজীবন যাপন ও জনসাধারণকে এই সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা।…রেশনিং ও কালোবাজারের দ্বন্দ্ব দৃষ্টান্ত হইতেছে প্রচলিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ও উহার পাশা-পাশি ব্যভিচারের অস্তিত্ব। প্রাণধর্ম্মের উপর বর্ণাশ্রম

স্থাপিত না হইলে কোনও অনুষ্ঠান বিশেষদ্বারা সমাজকে সুস্থ করা যাইবে না। সেই জন্য চাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের প্রচার।

১৩ই জুলাই

…সকল মিশনের গৌরচৈতন্য ফোন করিয়া বলে যে সে ১২টায় সময় আসিবে, আমি যেন প্রস্তুত থাকি। সত্যেন শাস্ত্রী, হরিপদ চ্যাটার্জী, বিমলদাস আসিতে পারে। সঙ্গে ৩ খানি ঈশ, কেন, ২ খণ্ড ব্রহ্মসূত্র, উদ্বোধন ভাদ্র ও সংখ্যা, আষাঢ় ৪ সংখ্যা নেওয়া হইল।…১-৩০-এ গাড়ী বলিয়াছিল। অথচ এখানেই আসিয়াছে গৌরচৈতন্য ১-৩০-এ। কাজেই যাওয়া হইল না।…৪টায় কিছু পরে গৌরচৈতন্য আসে ট্যাক্সীতে, তখনই রওয়ানা হই।… ৯টার পূর্বে আশ্রমে পৌঁছি। মহাবীর চৈতন্য তখন আশ্রমে ছিলেন না। আসিলে তিনি পা ছুঁইয়া প্রণাম করেন, আমি কোলে টানিয়া লই। সত্যেন শাস্ত্রী তাহার পুত্র 'পথিক' সহ কিছু পূর্বেই আসিয়াছিল।…অনেকদিন পূর্বে এই স্থানে গিয়াছিলাম নিত্যগোপালের কাছে। সে এখানের স্কুলেই মাষ্টারী করিত। ইহাই অনাথেশ্বর শিব-মন্দির। বেদনা বোধ হইল নিত্যগোপালের জন্য।

১৪ই জুলাই

.. বারাকপুরের সুরেশ নীরোগী আসেন। তাহার সঙ্গে গীতার আলোচনা হয়—'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে', 'এষা তে অভিহিতা সাংখ্যে', 'বাসিষাং পুরিশয়ে বাসং' 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবং'—গুহ্য গুহ্যতর গুহ্যতম তত্ত্ব বিষয়ে। তিনি ব্যাখ্যার গূঢ় তত্ত্বে আকৃষ্ট হন। তিনি স্কুলের পরিদর্শক ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। দুপুরের পর বৈদ্যনাথবাবু নামে এক ভদ্রলোক—'ইউনিয়ন বোর্ড'-এর সম্পাদক—আসেন ও আলাপ করেন। অনবরত কথা বলিতেছি দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ দাস (মুচি, ওখানের একজন কর্মী) বেদনা বোধ করেন। আমাকে বিশ্রাম দিবার জন্য তিনি কৌশল করিয়া বলেন, 'আমরা এত টাকা খরচ করিয়া আসিয়াছি, আমাদের কথা বলা হইল না'। ইহা বলিয়া বৈদ্যনাথবাবুকে বিদায় দিলেন। শেষে বলিলেন, 'আমার কোনও কথা নাই। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি যাতায়াত নেই। আপনাকে তো ৬টায় বক্তৃতা দিতে হইবে'। আমি মুগ্ধ হইলাম। ওখানে মহাবীর চৈতন্যের কাছে ইহার উল্লেখ করিলে সকলেই খুব আনন্দ-উপভোগ করিল। ৫।০ টায় পর একটা রিক্সে টাউন হলে যাই। দুপুরে হরিপদ চ্যাটার্জি আসিয়াছিল। সে-গ্রাহক হইল, ৩৲ টাকা দিল। কেনোপনিষদের নগদ ১৲ টাকা দিল। ৬টার পরই বক্তৃতা আরম্ভ হয়, সভাপতি ওখানকার অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। সৌর উদ্বোধন সঙ্গীত গায়, 'আমরা নূতন করিয়া গড়িব প্রেমের বৃন্দাবন।' পরে রাধারমণ ঘোষ সংক্ষিপ্ত সেবানন্দ পুরী ও আর এক ভদ্রলোক কিছু বলেন। পরে সত্যেন শাস্ত্রী, পরে আমি 'গিরিধারী' দিয়া আরম্ভ করি, কর্ম কৌশলের কথা বলি। আমার উদ্বোধন ও প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যের কথাও বলি।…

১৫ই জুলাই

সকালে ৬-৫৫-র গাড়ী ধরিবার জন্য আমি ও রাধারমণ দাস (টালিগঞ্জের টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র) একই রিক্সায় ৬টায় কিছু পূর্বে রওয়ানা হই।…অনাথেশ্বরকে প্রণাম করিতে নিত্যগোপালের কথা মনে হইল, চক্ষু অশ্রুাক্রান্ত হইল। মহাবীর চৈতন্যকে উদ্বোধন ও আমার দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিলাম, 'স ঐক্ষত'—দেখাই তো ব্রহ্মের কাজ। সকলেই প্রণাম করিল, আমিও মহাবীরকে হৃদয়ে তুলিয়া লইলাম।…সকল মিশনের কর্মীদের মধ্যে একটা প্রাণ-স্পর্শ উপলব্ধি করিলাম। কত দূর হইতে সন্ধের টানে বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছে, ইহারা যেমন কর্মী, তেমনি ভক্তিমান।…

১৬ই জুলাই

ক্রমশঃ

সাময়িকী

যুদ্ধ ও সাধু ঃ ভারতবর্ষ সাধুর দেশ—চোখ বুজিয়াই যদি বলি যে অন্ততঃ ষাট লক্ষ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে আজও আছেন তাহা হইলেও বোধহয় ভুল হয় না। কিন্তু পরকালের মুক্তিপ্রয়াসী ভারতবর্ষের এই সাধুসমাজ কোনদিন ইহকালের মুক্তির কথা ভাবিয়া দেখেন নাই—কেননা ইহার কোন প্রয়োজন-বোধ ইহাদের ছিল না। তাঁহারা ইহলোকে যে ভাবেই থাকুন না কেন তাহার জন্য এতটুকু মাথা না ঘামাইয়া পরলোকের মুক্তি লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। এইজন্য ভারতবর্ষের কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী মিলিত হইয়াছেন, কিন্তু বহুশত বৎসর পরাধীন থাকিয়াও কোনদিন তাঁহারা আলোচনা করেন নাই যে এই পরাধীনতা দূর করিবার জন্য তাঁহাদের কিছু করণীয় ছিল না। তবে যে-ভারতবর্ষের ইহকাল সম্বন্ধে উদাসীনতা ভারতবর্ষের বাস্তব জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল, সেই ভারতবর্ষের পাশাপাশি আবার শিবাজী-রামদাসের জীবনকে অঙ্কিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিতেছেন, তাহাতে দেখি কৃষ্ণ বহুবার অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, দুর্যোধনাদির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, কল্যাণপ্রসূ সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ সৃষ্টি করিতে হইবে—তবে তাহা বিজিত অহংকারের উপর দাঁড়াইয়া নয়, তাহা অর্জুনের ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়—ইহাকে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা মনে করিতে হইবে। কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা মানেই সমগ্রের প্রতিষ্ঠা—তাহাও রহিয়াছে। কর্মকে কৃষ্ণ-কর্ম, সমগ্রের কর্ম মনে করিয়া কল্যাণধর্মী যে দৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহাই গীতার কৃষ্ণ-বাণী। রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলিতেছেন—শিবাজী গুরুর কাছে সর্বস্ব অর্পণ করিলে গুরু বলিতেছেন,

এই আমি দিনু করে তোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্বার
তোমারে করিনু বিশ্ব ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন
পালিবে যে রাজধর্ম, জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

—কিন্তু এ চিন্তাধারা ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই—গীতাকেও তাহারা পারলৌকিক শাস্ত্র করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া জীবনকে বাস্তব-বিরোধী, পঙ্গু, ক্লীব করিয়া তুলিয়াছিল। তাই শত শত বৎসর ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী কৃষ্ণ নাম করিয়া এবং না করিয়াও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছেন, বাস্তব-জীবনে মানুষের মত বাঁচি ও স্বাধীনতা লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার কথা ভাবিয়া দেখেন নাই।

এ তো গেল সন্ন্যাসীদের কথা। কিন্তু ভারতবর্ষের কোটি কোটি গৃহীর মনকেও এই চিন্তাই প্রভাবিত করিয়া আছে যে, সন্ন্যাসই জীবনের শ্রেষ্ঠ পরম অর্থ, তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগা যে সন্ন্যাসী হইতে পারিল না, তবে যেমন তেমন করিয়া কোন রকমে সংসার-জীবনটাকে কাটাইয়া দিতে পারিলেই হয়, চাহিয়া থাকিতে হইবে পরকালের দিকে, তাহা না হইলেই সর্বনাশ। এই মনোবৃত্তিতে কেহ স্বাধীন থাকুক বা পরাধীন থাকুক, দেশের লোক খাইতে পাউক বা না পাউক, কোন কিছুরই জন্য মাথা ঘামানর প্রয়োজন কেহ বোধ করে নাই। তারপর কিছুদিন ইংরেজের অধীনে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া ভারতবাসীর গৃহী সম্প্রদায় বুঝিতে পারিয়াছিল যে, পরাধীনতার মত আত্মাবমাননাকর অবস্থা আর নাই। সেই উপলব্ধির ফল ভারতবর্ষের রাজনীতিক স্বাধীনতা। কিন্তু এই দীর্ঘ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতবর্ষের সাধু সন্ন্যাসীরা কয়জন যোগ দিয়াছিলেন? ষাট লক্ষ সন্ন্যাসীর মধ্যে বলা যাইতে পারে খুব বেশী হইলে ষাট

মন যোগ দিয়াছিলেন। প্রাচীন কালাবধি বহু বহু সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথা বাদই দিলাম, সংসারের সমস্ত কর্মকেই যাহারা প্রচুর ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং ইহাকে মায়ার খেলা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারেন না, কিন্তু আধুনিক কালে গঠিত এবং দেশের লোকের নানাবিধ সেবামূলক কাজ যাহারা অনেক করেন, সেই সব সম্প্রদায়ও রাজনীতিকে অত্যন্ত কীর্তির চক্ষে দেখিয়াছেন এবং এ পর্যন্ত সযত্নে পরিহার করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদেরও সংবিধানে লেখা থাকে—এখানে কোন রাজনৈতিক আলোচনা হইবে না।

কিন্তু বিগত ২৩. ১২. ১৯৬২-তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত পি. টি. আই কর্তৃক সরবরাহকৃত একটি সংবাদে হৃদয় উৎফুল্ল হইল। সংবাদটী নিম্নরূপ—

'"Sadhus come too'—A large number of saffron-clad Sadhus held a meeting here at the confluence of the Gandak and the Ganga early this week and resolved unanimously to undergo military training to defend their country from Chinese aggression.

One of the sponsers of the meeting Mauji Baba said his fingers had so long counted beads for Lord Krishna and now under his (Lord Krishna's) dictates they would click triggers for the defence of their motherland.

The meeting was attended by representatives of thirty different sects of Sadhus.—(PTI)"-Amrita Bazar 23.12.1962

—'সাধুরাও আসিলেন : এই সপ্তাহের প্রথমে গঙ্গা ও গণ্ডকের সঙ্গমস্থলে হলুদ বসন পরিহিত বহু সংখ্যক সাধু এক সভায় মিলিত হইয়া চীন আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য সামরিক শিক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে মৌজীবাবা নামে একজন বলিলেন, তাঁহার আঙুলগুলি এতদিন কৃষ্ণের নাম জপ করিয়াছে, সেই কৃষ্ণেরই নির্দেশে নিজ-মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাঁহার সেই আঙুল আজ বন্দুকের ঘোড়াকল টিপিবে। সভায় সাধুদের ত্রিশটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন।'

অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষের পক্ষে এ এক অভিনব সংবাদ। যে-কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিয়া অত্যাচারীর হাত হইতে দেশ রক্ষা করিয়া মানুষের মত বাঁচিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, সেই-কৃষ্ণের সেবক হইয়া মাতৃভূমিকে পরের হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্রত না লইলে যে কৃষ্ণ-বিরোধী কাজ হয়—এ কথা যদি লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসীর মধ্যে একজনও বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের সাফল্য এবং জাগতিক পরিবেশকে পুনর্গঠন করিয়া সুস্থ ও সুখী জীবন যাপন করার যে সাধনা ও সিদ্ধি তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার আত্মোপভোগের পশ্চাতে যে মনোবৃত্তি থাকে সেই মনোবৃত্তি ভোগের মনোবৃত্তি, কেবল আরও চাই-এর মনোবৃত্তি—এ মনোবৃত্তি আর যাহাই হউক বিশ্ব-নাগরিকত্ব বোধের মনোবৃত্তি নয়। তাহারা যখন অপরকে সাহায্য করে তখন তাহা কতটা অপরেরই তাদের জন্য আর কতটা অপরকে খানিকটা ভাল করিয়া না লইলে নিজে বেশী ভাল থাকা যায় না, তাহার জন্য—তাহা বিশেষ ভাবে বিচারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইংল্যাণ্ড আমেরিকা অথবা রাশিয়া চীন—সকলের মনোবৃত্তি সম্বন্ধেই এ কথা বিচার্য। অপরে সব দিক দিয়া ভাল হইয়া উঠুক, তাহার স্বাধীন সত্তা তাহার থাকুক অথচ উভয়ে যা সকলে মিলিয়া মিশিয়া একই আকাশের নীচে একই চন্দ্র-সূর্যের আলোয় বাঁচিয়া থাকিব—এ মনোবৃত্তি পাশ্চাত্যের শক্তিমানের কাছে কি? বলা যাইতে পারে এ মনোবৃত্তি ভারতবর্ষের আছে—অপরেরটা কাড়িয়া খাইবার বুদ্ধি তাহার কোনদিনই ছিল না—সেই সঙ্গে ছিল না অপরের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার বুদ্ধিও। ভারতবর্ষের চিন্তাধারা পৃথিবীর বহু দেশ স্বেচ্ছায় সানন্দে গ্রহণ

করিয়াছে, ভারতবর্ষ সামরিক শক্তি সাহায্যে অপরের ভাল করিতে যায় নাই, আবার নিজের দেশকেও অত্যাচারীর হাত-হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, পরের গোলামী, পরের সাম্রাজ্য করিয়াও কৃষ্ণ নাম জপ করিয়া মরে করিয়াছে খুব কলিল। আজ তাহাকে অপরের অত্যাচার, অপরের গ্রাস করিবার বুদ্ধির নিকট নতি স্বীকার করিলে চলিবে না, সেখানে তাহাকে বীর্যের সঙ্গে দাঁড়াইতে হইবে, অথচ অপরকে অত্যাচার না করিবার, অপরেরটা কাড়িয়া না খাইবার যে তাহার চিরন্তন মনোবৃত্তি সেই মনোবৃত্তিও যাহাতে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া নষ্ট না হয়, সেই দিকেও বিশেষভাবে সচেতন থাকিতে হইবে। আত্মতৃপ্ত হইতে গিয়া যে ভারতবর্ষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভুলিয়া গিয়াছিল, দেশের লোক অনাহারে রোগে শক্তিহীনতায় অবাজকতার ভরে নামিয়া গেলেও মুষ্ঠ স্বাস্থ্যবান শ্রীঅঙ্গ ধারণ করিবার প্রেরণা বোধ করে নাই, সে ক্লীব আত্মতৃপ্তি হইতে যেমন আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তেমনি যে আত্মতৃপ্তির অভাবে কেবলই পরের ঘাড়ে চাপিয়া বসিতে ইচ্ছা করে, পরের ভাল করিবার যুক্তির অন্তরালে নিজের স্বার্থান্ধতাকে তৃপ্ত করে, সে অভাব-হইতেও যেন ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা করিতে পারে। এইখানেই হইবে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। আজ সমুদ্রপারের একদল যখন দেশরক্ষা কর্মে নামিয়া পড়িলেন, তখন যেমন ক্লীবত্বের অপবাদ ঘুচিতে আরম্ভ করিল যুক্তির অবসান হইতেছে, তেমনি যে আত্মতৃপ্তিতে ভারতবর্ষ কখনও পরাধীন আক্রমণ করিয়া নিজের ঔদর পূরণ করিতে চাহে নাই, কিংবা পরের ধন নিজের ঘরে আনিয়া জোগাইবার কর্ম নৈতিক প্রকাশের সৃষ্টি করে নাই, কিংবা বিজ্ঞানের শক্তি-মদে সংযমে নিরস্ত হওয়ার প্রয়োজন প্রতীয় জানিয়াও মনের অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া মরে নাই, সেই আত্মতৃপ্তি যেন হারাইয়া না ফেলে এজন্য চিন্তাও হইতেছে। কর্ম বন্ধনের কারণ বলিয়া প্রচারিত যে ভারতবর্ষ, সে আজ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া পাশ্চাত্যের কর্ম প্রেরণকে ভয় করিতেছে—কৃষ্ণ যে কর্ম অর্জুনকে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, সে কর্ম তো সেখে নাই। কথা এইখানে। কৃষ্ণের কর্মে বন্ধন নাই, কিন্তু আত্মবৈষয়িক কর্মে তো বন্ধন আছেই—সাধুসমাজ যখন কৃষ্ণের নির্দেশে দেশরক্ষাব্রত গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, তখন পাশ্চাত্যের মত (এবং সর্বদেশীয় বিষয়াসক্ত জীবের মত) আসক্তি-বিদ্বেষের টানাপোড়েনে যেন কর্ম না করেন। আবার তাঁহারা কর্ম স্বরূপতঃ মিথ্যাই—কেবল আজ নিতান্ত প্রয়োজন বোধেই ইহা গ্রহণ করা হইল, দুই দিন পরে ফুরফুরাই বলিয়া ফাঁকিয়া ফেলিলেই হইবে, এ মনোবৃত্তিতেও যেন কর্ম গ্রহণ না করেন। জ্ঞানে যদি কৃষ্ণের আনন্দ, জ্ঞান যদি কৃষ্ণস্বরূপ, কর্মেতেও কৃষ্ণের আনন্দ, কর্মও কৃষ্ণের স্বরূপ—এই চেতনা ভারতবর্ষের রক্তের মধ্যে ঢুকাইতে হইবে। তাহা হইলে সে কর্মতাগের ক্লীবত্ব-হইতে রক্ষা পাইবে, আবার সংগঠনশক্তি সাধনায় যে আত্মতৃপ্তি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, তাহাও হারাইয়া বিশ্বের দরবারে একেবারে ফেউলিয়া বনিয়া যাইবে না।

বিজ্ঞানী বিশ্বের দরবারে আজ ভারতবর্ষের স্থান কি? আপাতিক বিশ্বের কোন ঘটনাস্রোতই কি ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারিবে? কত দিনে পারিবে! বিজ্ঞান ও কারীগরির ক্ষেত্রেই যে সে শুধু পিছাইয়া আছে তাহা নয়, দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবন-বোধেও সে এখনও অনেক পিছনে। পাশ্চাত্যের কোনো ছেলে কি কখনো তাহার কর্মে ফাঁকি দেয়? পাশ্চাত্যের কোনো ছেলে কি প্রত্যুষে জলের কলে ঘড়ি বাঁধিয়া জল নিয়া যাওয়ার পর যতক্ষণ কল খোলা থাকে, ততক্ষণ জলের জল পড়িয়া যাইতে থাকে? এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। শুধু ভারতবর্ষের একটা কিছু দিবার আছে—সেটা হইতেছে ঐ একটা চিন্তাধারা। সে চিন্তাধারায় বিশ্বটা জোড়েও বেশী নয়—ব্যক্তি জোড়েও নয়, সমষ্টি জোড়েও নয়। জোড়ে দুই থাকিলেই পরেরটা কাড়িয়া খাইবার প্রবৃত্তি হয়। মনস্তত্ত্বের ভাষা একতার জোড়ে লাগে, অদ্বিতীয়ের বহুর জোড়ে বা অদ্বিতীয়ের জোড়ে হারাইবার ভয় প্রবল হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের এক জোড়া 'সর্ব' নয়, ব্রহ্মনিরপেক্ষ বহু বা অনেক জোড়েও 'সর্ব' নয়।

সর্ব-ও যেমন নয়, তেমনি জোর করিয়া কল্যাণ করার প্রচেষ্টাও কল্যাণ-বুদ্ধি-প্রসূত নয়—উহাও ভোগবুদ্ধিই। ভোগবুদ্ধিই অত্যাচার করার বুদ্ধি। আমার জন্য বা আমার সমাজের জন্য এই আরও চাই—এ বুদ্ধিই বিশ্বে অশান্তির এক কারণ। অপর কারণ আমি যাহা বুঝিলাম তাহাই সর্বাপেক্ষা ভাল এবং তাহা অন্যের ঘাঁচায় অপরকে বুঝাইতেই হইবে, গ্রহণ করাইতেই হইবে—এই বুদ্ধি। তোমার ভাল কথা তুমি লোককে শোনাও, বোঝাও—কিন্তু শক্তির চাপ দিয়া শুনাইও না। ভালত্বের শক্তির চাপও অত্যাচারই। আর তুমি যাহা ভাল বলিতেছ তাহা সকলের জন্যই যে ভাল তাহাও নয়। আর একজন যদি তোমার কথা না-ও গ্রহণ করে তবু তুমি ও সে—শক্তিমান ও দুর্বল, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ক্ষুদ্র ও অক্ষুদ্র, ধনী ও দরিদ্র সবাই মিলিয়াই বাস করা যায়। আজকের যুগের কথা এইটাই। এইটা সম্ভব শুধু তখনই যখন বিশ্বটাকে সেবাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতে পারিব—বিশ্বেশ্বরের সেবাক্ষেত্র, বিশ্বের মানুষের সেবাক্ষেত্র। এই চিন্তাধারাটাই আজ ভারতবর্ষ বিশ্বকে দিতে পারিত—বিশ্ব আজ চিন্তাক্ষেত্রে পঙ্গুই। ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের জন্য অন্তর, চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয়। সামগ্রিক সমন্বয়ের এই চিন্তাধারা গ্রহণ করিলে সাধুরা সাধু থাকিয়াও দেশরক্ষার জন্য শক্তিমানের অত্যাচারের প্রতিবাদে বন্দুক ছুঁড়িতে পারিবেন, বন্দুকধারীরা সাধু হইতে পারিবেন। বিশ্বে তখনই শুধু শান্তি ও কল্যাণ—সাধুত্ব যেখানে অচল অনড় ক্লীবত্বে পর্যবসিত হয় না। কিংবা শক্তি—তা অস্ত্রেরই হোক বা জ্ঞানবিজ্ঞানেরই হোক যেখানে অত্যাচারের যন্ত্রণা না হয়। সে ক্লীব সাধুত্ব বর্তমান যুগে অচল, সে অত্যাচারী শক্তিও বর্তমান যুগে চলিবে না। তাই গঙ্গুক ও গঙ্গার সমন্বয়স্থলে মিলিত হইয়া হনুমন্তর পরিহিত সাধুর দল যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন,* তাহার জন্য তাঁহাদিগকে আমাদের অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিকট এবং সকলের নিকট এই চিন্তাধারা উপস্থিত করি।

শ্রীবেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম পোঃ অশ্বিনীনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জলভারত

—পঞ্চদশ বর্ষ—

১৩৬৮ মাঘ—১৩৬৯ পৌষ, ১৯৬২

বর্ষসূচী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদিকা

শ্রীরেণু মিত্র

উজ্জলভারত

সত্যনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম বাগুইআটি

পোঃ অশ্বিনীনগর

২৪ পরগণা

উজ্জ্বলভারত

১৩৬৮ মাঘ—১৩৬৯ পৌষ, ১৯৬২

বার্ষিক সূচী

অবসরে (কবিতা)
শ্রীশান্তশীল দাশ

অভিসার (কবিতা) ২৪
শ্রীশান্তশীল দাশ

আকাশ হল আনন্দ (কবিতা) ৩৬
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

আঁখিজল মুছিবার (কবিতা)
শ্রীরঞ্জিতবিকাশ মুখোপাধ্যায়

আদি দেবতা (কবিতা) ২৭৩
শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের কথা
সম্পাদিকা

আমাদের সময়কার শান্তিনিকেতন ১৩৭
শ্রীঅবনীনাথ রায়

আমাদের ইংরেজী শেখা ও শেখানো ...১৭৬, ২১৫, ২৫৭
অধ্যাপক তারাপদ ভৌমিক

আমি বিশ্ব-নাগরিক (কবিতা) ১২২
শ্রীবাণীবিভূষ সেনগুপ্ত

আমমঞ্জরী (কথানাট্য)
শ্রীমন্মথ রায়

আরণ্যক
শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী

আর্কেস্ট হেমিংওয়ে
শ্রীকেশবকুমার ভট্টাচার্য্য

আলতামিরা গুহাচিত্র ২৯৮
শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্বোধন উৎসব ৫৩
অধ্যাপক কপিলকুমার বিশ্বাস

এক-জাতীয়তা
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

একটী পত্র
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

কন্নড় শৈব সাহিত্য (২)
শ্রীবিকুপদ ভট্টাচার্য্য

কবি এলিয়টে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব
শ্রীমুখিকা মিত্র

কাব্যের ত্রিধারা
অধ্যাপক কপিলকুমার বিশ্বাস

খেয়া ঘাটে (কবিতা) ৬৩
শ্রীঅনিল কুমার সমাজদার

গোবিন্দ সিংহের ইসলাম নিষ্ঠীকা
শ্রীযতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়

চলতি-পথ
শ্রীহাসিরাশী দেবী

চীনা পরিব্রাজকদের ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা
অধ্যাপিকা অরুণিমা দাস

জাগো (কবিতা)
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

জ্যোতির্ময় (কবিতা)
শ্রীবিকুপদ রায়

দৈহিক ক্ষুধা বনাম আত্মিক ক্ষুধা
শ্রীজগদানন্দ বাজপায়ী

দ্রৌপদী—শ্রীপ্রতিভা রায় ৩০৬

ধর্মপদের চিন্তাধারা (কবিতা) ২৩৮
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্র-মানস
শ্রীশঙ্করনাথ চট্টোপাধ্যায়
পরমপ্রকাশ শ্রীনিত্যগোপাল
শ্রীরেণু মিত্র
পরম আহ্বান (কবিতা) ২০৩
শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য
পরমার্থি (কবিতা) ৩৬২
শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য
পুণ্যভূমি অযোধ্যা
শ্রীবিভা সরকার
পুস্তক সমালোচনা : সহ প্রণাম ২১৯
পুস্তক পরিচয় : ভারতের শক্তি সাধনা ৩৪৮
প্রদীপ (কবিতা) ৪০
শ্রীসুন্দরবরণ চক্রবর্তী
প্রভুপাদ পুরুষোত্তমানন্দজীর স্মৃতি উপলক্ষে
শ্রদ্ধাঞ্জলি (কবিতা) ৩৩৬
শ্রীরমণী মোহন সরকার
প্রাচীন ভারতের আন্তর্জাতিক আইন
অধ্যাপক রেজাউল করীম
প্রার্থনাকালীন ভাবণ—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ প্রদত্ত
৮, ৩৩, ৬৪, ৯৪, ১১৫, ১৪৭,
১৭৩, ২০৪, ২৩৯, ২৮৯, ৩০৭, ৩৫১
বন্ধুবরেষু ২৯, ৫১, ৮২, ১১১, ১৯৫, ৩০৪
শ্রীসুব্রত
বলাকার পূর্বরঙ্গ
অধ্যাপক বিমলেন্দু ভট্টাচার্য
বসী এল দেশে ২৫০
অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য
বিদ্রোহী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ
বিশ্ববিদ্যা বর্ণচ্ছটা ১৬৭
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
বিস্মৃতপ্রায় মহিলা কবি ৫৯
শ্রীআনন্দকুমার রায়
বেদান্ত ও শ্রীঅরবিন্দ ৫৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
ভাববার কথা ৮৯
শ্রীনলিনীবিনোদ গুহ
মধুসূদনের কাব্যরীতি
শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
মহাকাল ১৬৫
শ্রীবিশ্বনাথ সাহা
মহাপূজা ২৫
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
মায়ী
কুমারী শিপ্রা রায়
মিনতি (কবিতা) ৪০
শ্রীসুন্দরবরণ মল্লিক
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
যৌবনের গান
শ্রীচিদেকতা তরফদার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রকৃতি
শ্রীতারক দাশগুপ্ত
রামায়ণ কি মহাকাব্য
শ্রীবিভা সরকার
রামায়ণ কি মহাকাব্য
শ্রীমনাথবন্ধু বেদজ্ঞ, সাহিত্যবিশারদ
রূপসী (কবিতা)
শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য
লাঞ্ছন-লাঞ্ছিত সৈরিক পতাকা
শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ
শান্তি ও সমন্বয় ১৩৩
শ্রীকল্পলতা তালুকদার
শিক্ষায় বিভিন্ন সম্ভাব্য মাধ্যম
অধ্যাপিকা মীরা রায়
শিশু-সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ২৩৬
অধ্যাপক কমলেশ ভট্টাচার্য

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ৩২১
অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
শ্রীরেণু মিত্র
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-স্মরণে (কবিতা) ৩৩৩
শ্রীবিষ্ণুপদ রায়
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী ১৮৪০-৪১ ১১, ৪১, ৬৭, ৯৭, ১২৩, ১৫৪, ১৮১, ২০৭, ২৭৪, ৩১০, ৩৪০, ৩৬৬
শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ৮৪
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পারলৌকিক সাহিত্য
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
সহজ-মানুষ ১৯৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
সামঞ্জস্য ২৩৫
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাময়িকী
২০শে জানুয়ারী
২৬শে জানুয়ারী
ষোলপূর্ণিমা
নবনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ সংবাদ
সজনীকান্ত দাস
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৮৭
ছুটি ১১৩
ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র ১৪৩
নবনারায়ণ আশ্রম সংবাদ ১৭১
ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৯৭
১৫ই আগষ্ট ২২৬
নূতন আহ্বান ৩১৮
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ জন্মোৎসব ৩৪৯
শরৎকুমারী পাঠাগার
সুযোগ ও দুর্যোগ (গল্প)
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ
সৃষ্টির প্রভাতে মাতৃ-সাধনা ২৮৭
শ্রীরেণু মিত্র
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ স্মরণে (কবিতা) ৩৩৭
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীর স্মরণে ৩৩৫
শ্রীজিতেন গাঙ্গুলী
স্বামীজী স্মরণে ৩৩৩
শ্রীসনাতন মণ্ডল

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা (গীতার শ্রেষ্ঠ সংস্করণ)	৬·০০	ভারত-আত্মার বাণী
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	৫·০০	Soul of India Speaks
কর্মবাণী	১·২৫	শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা
শ্রীশ্রীচণ্ডী	২·০০	পকেট গীতা

সুলেখক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০	রাজর্ষি রামমোহন
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০	আচার্য জগদীশ
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
বাংলার ঋষি	৩·০০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ
বাংলার বিপ্লবী	২·০০	রবীন্দ্রনাথ
বাংলার মনীষী	১·২৫	জীবন গড়া

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ, বি. টি,

বিদ্যাসাগর	২·২৫	বঙ্কিমের গল্প

প্রয়োগমূলক নূতন ধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান ব্যবহারিক শব্দকোষ ৯·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী : ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। ॥ পড়িয়াহাট মার্কেট ॥

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বজায় রাখিতে চাই

বিশুদ্ধ

মাখন ও ঘৃত

★

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সরকার ডায়েরী

ঘৃত ও মাখন প্রস্তুতকারক

৩২ ভূপেন বসু এভিনিউ

• কলিকাতা ৪